লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্র-সূচী।

কালিদাস ও ভবভূতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আখ্যানবস্তু।

অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক, এবং অনেকেরই মতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" সেইরূপ উত্তররামচরিত ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করিতে হইলে, এই দুইখানি নাটকের তুলনা করিলেই চলিবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আখ্যানবস্তু কালিদাস মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতে লইয়াছেন। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডেও শকুন্তলার উপাখ্যান বিবৃত আছে, এবং সেই গল্পের সহিত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সমধিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অনেকের মতে পদ্মপুরাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরবর্ত্তী রচনা। বস্তুতঃ ইহা কালিদাসেরই শকুন্তলা নাটক কাব্যাকারে গঠিত। সে জন্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানই যে এই নাটকের মূল গল্প, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যানের সারাংশ এই,—

শকুন্তলা বিশ্বামিত্র মুনি ও মেনকা অপ্সরার সন্তান; অরণ্যে বর্জ্জিত হইয়া মহর্ষি কণ্ব কর্ত্তৃক লালিত হয়েন। তিনি যখন যুবতী, তখন একদিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হয়েন। সেখানে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে একাকী ফিরিয়া যান।

মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানবলে সমস্ত জানিলেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে গান্ধর্ব্ববিবাহই প্রশস্ত বলিয়া সেই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। পরে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার এক পুত্র হয়। কণ্বমুনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে রাজসদনে প্রেরণ করেন।

শকুন্তলা রাজসভায় উপনীত হইলে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দৈববাণী হইলে তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বিবাহবৃত্তান্ত রাজার স্মরণ ছিল। কিন্তু তিনি লোকলজ্জাভয়ে শকুন্তলাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

এই গল্পটি কালিদাস তাঁহার নাটকে এইরূপ সাজাইয়াছেন;—

প্রথম অঙ্ক।

দুষ্মন্তের মৃগয়ায় বাহির হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিতি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের পরিচয় ও প্রেম। শকুন্তলার সহচরী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সে বিষয়ে উৎসাহদান।

।

দুষ্মন্ত ও বয়স্য। রাজার মৃগয়ায় নিরুৎসাহ ও বয়স্তের সহিত শকুন্তলা সম্বন্ধে আলাপ। রাজাকে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য সেনাপতির নিষ্ফল অনুরোধ। তাপসদ্বয়ের প্রবেশ ও রাক্ষসগণের বিঘ্ননিবারণের জন্য রাজাকে অনুরোধ। মাতৃ-আজ্ঞাচ্ছলে দুষ্মন্তের স্বীয় বয়স্যকে বিদায়-দান ও দুষ্মন্তের তপোবনে পুনঃপ্রবেশ।

তৃতীয় অঙ্ক।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের প্রেমজ্ঞাপন ও গান্ধর্ব্ববিবাহের প্রস্তাব। সহচরীগণের সে বিষয়ে সাহায্য-দান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দূরে বিরহিণী শকুন্তলা; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপন। শকুন্তলাসমক্ষে দুর্ব্বাসার প্রবেশ ও অভিশাপ। আশ্রমে কণ্বের প্রত্যাবর্ত্তন ও শকুন্তলাকে গৌতমী ও তাপসদ্বয়ের সহিত পতিগৃহে প্রেরণ

এই অঙ্কে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শকুন্তলাকে এক অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দিয়া যান।

পঞ্চম অঙ্ক।

রাজসভায় রাজা দুষ্মন্ত। গৌতমী ও তাপসদ্বয় সহ শকুন্তলার প্রবেশ, প্রত্যাখ্যান ও অন্তর্ধান।

পঞ্চম অঙ্কাবতার।

ধীবর, নাগরিক ও রক্ষিদ্বয়। অঙ্গুরীয়ের উদ্ধার।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বিরহী রাজার বিলাপ। স্বর্গ হইতে ইন্দ্রের আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি।

সপ্তম অঙ্ক।

স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে হেমকূট পর্ব্বতে দুষ্মন্তের আগমন। তৎপুত্র-দর্শন ও শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।

দেখা যাইতেছে, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত এই নাটকের বিশেষ কোনও বৈষম্য নাই। কালিদাস মূল উপাখ্যানকে পল্লবিত করিয়াছেন মাত্র। প্রধান বৈষম্য এই যে, (১) মহাভারত অনুসারে মহর্ষির আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র হইয়াছিল; কালিদাসের নাটকে তাঁহার প্রত্যাখ্যানের

পরে তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; (২) মহাভারতের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, সেই সভামধ্যেই গৃহীতা হইয়াছিলেন; নাটকে বিচ্ছেদের পরে মিলন স্থানান্তরে হইয়াছিল। (৩) সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

যেমন কালিদাস তাঁহার গল্পটি মহাভারত হইতে লইয়াছেন, সেইরূপ ভবভূতি উত্তরচরিতের আখ্যানবস্তু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামায়ণের উপাখ্যানটি এই,—

রাম লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রজাগণ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটাইল। রাম স্বীয় বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ তপোবন-দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনবাস দিলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাহার পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি তপোরত শূদ্রক রাজাকে বধ করেন। পরে অশ্বমেধযজ্ঞোপলক্ষে বাল্মীকি লব ও কুশকে লইয়া রামের রাজসভায় আসেন। সেখানে লব ও কুশ বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গান করে। রাম তাহাদের চিনিতে পারেন, এবং সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সীতার সতীত্ব প্রজাসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করেন। অভিমানে সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করেন।

ভবভূতি তাঁহার নাটকে গল্পটি এইরূপ সাজাইয়াছেন,—

প্রথম অঙ্ক।

অন্তঃপুরে সীতা ও রাম। অষ্টাবক্র মুনির প্রবেশ। তাঁহার কাছে প্রজারঞ্জনার্থ জানকীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে রামের প্রতিজ্ঞা। আলেখ্য দর্শন করিতে করিতে সীতার তপোবন-দর্শনে ইচ্ছা-প্রকাশ। দুর্মুখের প্রবেশ ও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ-বিজ্ঞাপন ও রামের সীতানির্ব্বাসনে সংকল্প।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রামের পঞ্চবটী বনে প্রবেশ ও শূদ্রকের শিরশ্ছেদ। রামের জনস্থান-দর্শন।

তৃতীয় অঙ্ক।

বাসন্তী, তমসা ও ছায়াসীতার সমক্ষে রামের বিলাপ। (এই অঙ্কের বিষ্কম্ভকে তমসা ও মুরলার কথোপকথনে প্রকাশ পায় যে, রাম হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিকে সহধর্ম্মিণী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন)। বনবাসান্তে প্রসববেদনায় সীতা গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করেন, এবং পৃথ্বী ও ভাগীরথী তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন, এবং তাঁহার যমজ কুমারদ্বয়—লব-কুশকে মহর্ষির হস্তে অর্পণ করেন।

জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যার বিলাপ; লবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ।

পঞ্চম অঙ্ক।

লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সেই যুদ্ধের বর্ণনা। লব, কুশ ও চন্দ্রকেতুর সহিত রামের সাক্ষাৎ ও কুশের মুখে বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ-গাথা শ্রবণ।

সপ্তম অঙ্ক।

রামের সীতানির্ব্বাসন অভিনয়-দর্শন। রামের সহিত সীতার মিলন।

ভবভূতি মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ, রামায়ণের রাম বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ ছলে সীতাকে বনবাস দেন; ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জন ব্রতে বিনা ছলে জানকীকে নির্ব্বাসিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, ছিন্নশির শম্বূকের দিব্যমূর্ত্তি-গ্রহণ, ছায়াসীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ রামায়ণে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য— রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কবিদ্বয় মূল উপাখ্যান উক্তরূপ বিকৃত করিলেন কেন?

কালিদাস শকুন্তলার পুত্র দ্বারা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে লব-কুশের কাহিনী কবির মনে উদিত হইয়াছিল। এ ব্যতিক্রম কবিত্ব হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। মিলন সম্বন্ধে বৈষম্যও উক্তরূপ কবিকল্পনা। কিন্তু প্রধান বৈষম্য অভিজ্ঞান ও অভিশাপ সে উদ্দেশ্যে কল্পিত হয় নাই। একটি গুরুতর উদ্দেশ্যে কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন।

আমরা দেখি, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের অন্তর্গত করায় একটি ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাহাতে দুষ্মন্ত বাঁচিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাঁহাকে তাঁহার নাটকের নায়ক করিয়াছেন, তিনি মূল উপাখ্যানে এক জন লম্পট রাজা; তিনি বহুপত্নীক; মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করেন। তিনি যে একটি সুন্দর কুসুমকলিকা দেখিলেই তাহাতে উড়িয়া বসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে মুগ্ধা বালিকার প্রকারান্তরে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পলায়ন করিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহার পরে রাজসভায় বা অন্তঃপুরে সে লজ্জার কথা যে প্রকাশ করিবেন না, বা স্বীকার করিবেন না, তাহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্তকে ধার্ম্মিকপ্রবর কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা রূপে অঙ্কিত করিয়া-

ছেন। সেই জন্য কালিদাস তাঁহাকে কলঙ্ক হইতে দুইবার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ;—প্রথম বার, গান্ধর্ব্ববিবাহে ; দ্বিতীয় বার, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপে।

এই নাটকে বর্ণিত দুষ্মন্তের চরিত্রটি মানসিক অণুবীক্ষণে দেখিলে তাঁহাকে বেশ রসিক পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে কণ্বের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, কবি বলিয়া না দিলেও পাঠক বুঝিবেন যে, তাহার সহিত বৈখানসের কথিত "দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় নিযুজ্যে"র বেশ একটু সম্পর্ক আছে। এই আকারান্ত শব্দটি রাজার বেশ একটু কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে। রাজা যে উত্তর করিলেন,—উত্তম! "তাং দ্রক্ষ্যামি", তাহা নিতান্ত উদাসীন ভাবে নহে। তাহার পরে সখী সহ শকুন্তলাকে আশ্রমোদ্যানে দেখিয়া তিনি যে ভাবিলেন,—"দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ", তাহাও যে ঠিক কলাবৎ হিসাবে ভাবিলেন, তাহা নহে। তাহা হইলে তাহার পরই "ছায়ামাশ্রিত্য" লুকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন কি ছিল? যেখানে মনে পাপ, সেইখানেই লুকাচুরী। তিনি চৌরের মত লুক্কায়িত হইয়া সখীত্রয়ের কথোপকথনে তিনটির মধ্যে শকুন্তলা কোনটি তাহা যখন জানিলেন, তখন তিনি এ হেন রত্নকে "আশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে" এই বলিয়া কণ্বমুনিকে যে "অসাধুদর্শী" কহিলেন, তাহা হৃদয়ে করুণরস উদ্রিক্ত হইবার ফলে নহে। তিনি "পাদপান্তরিত" হইয়া এই তাপসী বালাকে দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

> "ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
> স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
> বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
> কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ ॥

পাঠক দেখিতেছেন, রাজার লক্ষ্য প্রধানতঃ কোথায়? পরেই সোজাসুজি কবুল-জবাব, "অভিলাষি মে মনঃ"।—পাঠকের সর্ব্ব সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল।

কিন্তু এই সঙ্কটে কলিদাস দুষ্মন্তকে খুব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা লালসায় দীপ্ত হইয়াও শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন ; তিনি শকুন্তলার জন্ম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

> সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
> প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।

পরে যখন তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা মেনকার গর্ভজাতা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা, তখন তাঁহার মন হইতে একটা প্রকাণ্ড ভার নামিয়া গেল। তিনি স্বগত কহিলেন,—

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

এই স্থানে কবি দেখাইলেন যে, রাজা কামুক বটে, কিন্তু লম্পট নহেন। এই মানসিক বিপ্লবে তাঁহার মনুষ্যত্ব যায় নাই, এবং তিনি কামান্ধ হইয়াও বিবেকচ্যুত হয়েন নাই। তিনি পিপাসু-নেত্রে শকুন্তলাকে দেখিতেছেন সত্য, তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই আপনারই উপভোগ্যা বিবেচনা করিতেছেন সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন। তখন বুঝি, যাহাই হউক, তিনি বালিকাকে ভ্রষ্টা করিয়া পলায়ন করিতে চাহেন না, তাঁহার সংকল্প সাধু।

কামকবিগণ বিবাহ জিনিসটাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গদ্যময় বিবেচনা করেন। স্বর্গীয় প্রেমে বিবাহ যেন একটা বাধা। তাঁহাদের মতে বিবাহ একটা অতি অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট। তাঁহারা ভাবেন যে, কাব্যে ইহার স্থান নাই।

Platonic loveএ বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। কারণ, তাহার ভবিষ্য ইতিহাস ঐ প্রেমেই পর্য্যবসিত। কিন্তু যেখানে যৌন মিলন, সেখানে বিবাহ অপরিহার্য্য ব্যাপার। বিবাহ না থাকিলে এই মিলনটি পাশব ক্রিয়ামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর প্রেম জিনিসটা দাঁড়ায় গিয়া—কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন কামসেবায়। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, এ মিলন কেবল আজিকার জন্য নয়, ইহা ক্ষণিক সম্ভোগ নহে, ইহার একটা মহা ভবিষ্যৎ আছে, এ মিলন চিরজীবনের। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, নারী কেবল ভোগ্যা নহে, সম্মানার্হা। বিবাহ গৃহে সুখের উৎস, সন্তানের কল্যাণের হেতু, সামাজিক মঙ্গলের উপায়। ইহার উপর কেবল ব্যক্তির শান্তি নহে, সমস্ত সমাজের শান্তি নির্ভর করে। বিবাহই কুৎসিত কামকে সুন্দর করে, উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়; বিশ্বসৃষ্টিকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পশুদের মধ্যে বিবাহ নাই, অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ নাই। বিবাহ সভ্যতার ফল। ইহা কুসংস্কার নহে, আবর্জ্জনা নহে, বিপত্তি নহে।

কাব্যে কি বিবাহের স্থান নাই? কাব্যে তবে স্থান আছে বুঝি উচ্ছৃঙ্খল কামসেবার, নগ্নমূর্ত্তিদর্শনে উদ্দীপিত লালসার উত্তেজনার, এবং পাশব সংযোগের ক্ষণিক উন্মাদনার? বিবাহচ্ছলেও কাব্যে এ সব ব্যাপারের বর্ণনা স্বকার-

জনক। সব মহাকাব্যে এ বীভৎস ব্যাপার উহ্য থাকে। কেবল ভারত-চন্দ্রের মত কামকবিরা তাহার বর্ণনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। বিনা বিবাহে এ ব্যাপারের বর্ণনা ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকার।

মহাভারত-কারও এই বিবাহ কাব্যে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন; পাশব সঙ্গমের বর্ণনা করেন নাই। আর কালিদাস এক জন মহাকবি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত লালসা সুন্দর নহে—কুৎসিত। তিনি কুৎসিত আঁকিতে বসেন নাই, সুন্দর আঁকিতে বসিয়াছেন। তাই তিনি বিবাহ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন। চন্দ্র সুন্দর; আকাশ সুন্দর; পুষ্প সুন্দর; নির্ঝরিণী সুন্দর; নারীর আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু ও সরস রক্তিম অধর সুন্দর। কিন্তু মানবের অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্যের কাছে এ সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে নারীর সুগোল বাহু ও পীন বক্ষ লজ্জা পায়। কর্ত্তব্যের অপেক্ষা সুন্দর কি আছে? এই কর্ত্তব্যজ্ঞান লালসাকেও আলোকিত করে, বীভৎস কামকেও সুন্দর করে। বিবাহকে বর্জ্জন করিয়া লালসাকে চিত্রিত করিলে তাহা সুন্দর হয় না, কুৎসিত হয়। যাহারা কামী, তাহাদের যে এই চিত্র ভাল লাগে, তাহা এ চিত্র সুন্দর বলিয়া নহে, তাহাদের কামকে উদ্দীপ্ত করে বলিয়া।

আর এক স্থলে কবি দুষ্মন্তকে অত্যন্ত বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যখন রাজা রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি অনায়াসে ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এক জন কামুক, বিশেষতঃ এক জন বহুপত্নীক রাজা ত এরূপ করিয়াই থাকে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কবি অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়া দুষ্মন্তকে বাঁচাইয়া লইলেন। তিনি যাইবার সময়ে শকুন্তলাকে যে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা যায় যে, রাজার বিস্মৃতি লম্পটের বিস্মৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাজার হাত ছিল না। এমন কি, কবি ধর্ম্মভয়ই এই শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কারণ বলিয়া দেখাইয়া লইলেন। কবি এ বিষয়টি এমন কৌশলের সহিত নাটকে প্রবেশ করাইয়াছেন যে, ইহা যে মূল গল্পের একটি প্রধান অঙ্গ নহে, কোনও মতে তাহা অনুমান করা যায় না।

চতুর্থাঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় নিষণ্ণা। দুর্ব্বাসা আসিয়া কহিলেন, "অয়মহং ভোঃ।" শকুন্তলা অন্যমনা, শুনিতে পাইলেন না। —স্বাভাবিক। তাহার পরে অনসূয়া শুনিতে পাইলেন, দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন,—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

অনসূয়া দেখিতে পাইলেন যে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি দ্রুত যাইয়া মহর্ষির পদতলে পড়িয়া কহিলেন,—আমাদের প্রিয়সখী বালিকা, তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। দুর্ব্বাসা শেষে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কোনও আভরণ অভিজ্ঞান স্বরূপ দেখাইলে রাজার স্মরণ হইবে।—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে অনসূয়া কি প্রিয়ংবদা দুষ্মন্তের অভিশাপের কথা আর শকুন্তলাকে বলিলেন না। যাইবার সময় স্বতঃ-উদ্বিগ্না শকুন্তলার মনে একটা আশঙ্কা জাগ্রত করিয়া লাভ কি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে দুষ্মন্তের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া কহিলেন যে, "রাজর্ষি যদি তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে এই অভিজ্ঞানটি তাঁহাকে দেখাইবে।" —সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই অভিজ্ঞান লইয়াই শকুন্তলা নাটক। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ না থাকিলেও এই অভিজ্ঞানের বৃত্তান্তটি আগাগোড়া নাটকের আখ্যানের সহিত খাপ খাইত; কেবল দুষ্মন্তকে ধর্ম্মদার-প্রত্যাখ্যানকারী লম্পটরূপে চিত্রিত করিতে হইত, এইমাত্র।

ভবভূতিও একবার রামকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন। বাল্মীকির রাম নিজের বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য পতিপ্রাণা সীতাকে ছলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ভবভূতি দেখিলেন যে, তাহাতে রামের চরিত্র মলিন হইয়া যায়। সর্ব্বত্র ন্যায়বিচারই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার কাছে এক দিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে ন্যায়বিচার। বংশ যাউক, রাজ্য যাউক, নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিব না—এইরূপই তাঁহার মনের অবস্থা হওয়া উচিত। বংশমর্য্যাদা-রক্ষা আর কন্যার বিবাহ দেওয়াও

ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম—ন্যায়বিচার। রাম জানেন যে, সীতা নিরপরাধিনী। যে রাজা বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ নিরপরাধিনীকে নির্ব্বাসিতা করেন, সে রাজার বংশমর্য্যাদা-রক্ষা হয় না, সে রাজা সবংশে নির্ব্বংশ হন। ভবভূতি দেখিলেন যে, এ রামে চলিবে না। তাই অষ্টাবক্রের সমক্ষে রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে,—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

ভবভূতি দেখাইলেন যে, রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন। সেই প্রজারঞ্জন-রূপ কর্ত্তব্যপালনের জন্য রাম নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিলেন। এইরূপে ভবভূতি যত দূর সম্ভব রামের চরিত্রকে দোষশূন্য করিয়া লইলেন।

ভবভূতি আর এক স্থলে রামকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা শূদ্রক যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহার শিরশ্ছেদের পরে যে তিনি দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জনস্থান দেখাইতে লাগিলেন, এরূপ ব্যাপার রামায়ণে নাই। রামায়ণের রাম, শূদ্রক শূদ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করেন। ভবভূতি দেখিলেন, এ অত্যন্ত অবিচার। পুণ্যকার্য্যের জন্য প্রাণদণ্ড? এ রামে চলিবে না। তাঁহার রাম তাই কৃপা করিয়া তরবারি দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করিলেন।

কিন্তু কবিদ্বয় এরূপ কেন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, অলঙ্কার শাস্ত্র বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে এক শাস্ত্র আছে। যিনি যত বড় কবিই হউন না কেন, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরাকালে সকলকেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইত। যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমন কি, যাঁহারা বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অন্ততঃ মুখেও বেদ মানিয়া চলিতে হইত। এই কবিদ্বয়কেও সেই অলঙ্কার শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইয়াছে। এই অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিধান এই যে, নাটকের যিনি নায়ক, তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত ও দোষশূন্য করিতেই হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম অত্যন্ত কঠোর, এবং ইহা নাটককারের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু গানের তাল, নৃত্যের ভঙ্গী, কবিতার ছন্দ, সৈন্যের গতি—সব মহৎ জিনিসের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। নিরঙ্কুশ বলিয়াই যে কবিরাও নিয়মের শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা নহে।

নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্য ও নাটক সুকুমার কলা। নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্যে এত সৌন্দর্য্য। তবে এ নিয়ম উচিত কি অনুচিত, তাহাই বিচার্য্য।

আমার বিশ্বাস যে, নায়ক সর্ব্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাবিৎগণ কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। Shakespeareএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা, বা রাজপুত্র; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন, এবং Othello এক জন General) ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতই তাঁহাদের চিত্রের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। Homerএর ইলিয়ড রাজায় রাজায় যুদ্ধ লইয়া রচিত।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে এ মত মানিয়া চলা হয় না। মহাকবি Ibsen-এর রচিত বিখ্যাত সামাজিক নাটকগুলির নায়ক সকলেই গৃহস্থ। বস্তুতঃ গৃহস্থের ব্যাপার লইয়াই "সামাজিক নাটক"। স্পেনীয় ও ওলন্দাজ ও ইংরাজ চিত্রকরগণ সামান্য মনুষ্য ও দৃশ্য চিত্রিত করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন। কিন্তু Shakespeareএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির সহিতIbsenএর নাটকগুলির বোধ হয় তুলনা হয় না। সেইরূপ Rubens বা Turnerএর নাম বোধ হয় Raphael, Titian, Michael Angiloর সহিত এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মটি সাধারণতঃ ঠিক। বিষয় উচ্চ না হইলে নাটকের কার্য্যাবলীর একটা গরিমা অনুভূত হয় না। কোনও মহাচিত্রকর শুদ্ধ একটা ইঁটের পাঁজা চিত্রিত করেন নাই। হয় ত তিনি ইষ্টকস্তূপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু এই চিত্র কখন Raphaelএর Madonnaর সহিত একাসনে স্থান পাইবে না। কোনও শ্রেষ্ঠ নাটককার (Ibsen পর্য্যন্ত) কেরাণীকে নাটকের নায়ক করেন নাই। লেখকের ক্ষমতা এরূপ চরিত্রাঙ্কনে পরিস্ফুট হইতে পারে; তাহাতে সূক্ষ্ম বর্ণনা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ নাটক Shakespeareএর Julius Ceasarএর সহিত এক পংক্তিতে বসিতে পাইবে না। এরূপ চিত্রে বা নাটকে দর্শক বা শ্রোতার হৃদয় স্তম্ভিত বা স্পন্দিত হয় না—কেবল কলাবিতের প্রকৃতিবিজ্ঞানে একটা সহর্ষ বিস্ময়

হয় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত মহা রচনা কেবল ঐরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে না। যেখানে কলাবিদের নৈপুণ্যই মনে উদিত হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ব্যাপার। অতি মহৎ ব্যাপারে দর্শক বা শ্রোতা চিত্রকর বা কবির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে, তাহার রচনায় অভিভূত হইয়া যাইবে। যখন Irving অভিনয় করিতেছেন, তখন যদি মনে হয় যে, বাঃ! Irving ত সুন্দর অভিনয় করেন, তাহা হইলে সে উত্তম অভিনয় নহে। যখন শ্রোতা Hamletএর কাহিনীতে Irvingএর অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তখনই বলিব, এই উত্তম অভিনয়। গ্রন্থকার সম্বন্ধেও তাই। যে নাটক পাঠ করিতে করিতে পাঠক মনে করিবে,—গ্রন্থকারের কি কৌশল, কি ক্ষমতা, কি সূক্ষ্ম দর্শন, কি সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ইত্যাদি, সে নাটক অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক নহে। যে নাটক পাঠককে তন্ময় করে, পাঠকের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে, পাঠকের জ্ঞান লুপ্ত করে, তাহাই অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক।

রাজার প্রেম, রাজার যুদ্ধ, রাজার উন্মত্ততায় অমনই একটা মোহ আছে। "রাজা" কথাই একটা ভাবের আধার। সে ভাব এই যে, ইনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি, সকলে ইঁহাকে মানে, সমস্ত জাতির তিনি মহিমা, বন্ধন, কেন্দ্র। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোক তাঁহাকে দেখিতে রাস্তায় জড় হয়। তিনি রাজসভায় বসিলে লোক তাঁহার পানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে। রাজার ব্যাপারে একটা যেন নিগূঢ়ত্ব আছে। রাজা উঠিলে, রাজা উঠিলেন! রাজা শয়ন করিলে, রাজা শয়ন করিলেন! রাজা লম্পট হইলেও তিনি রাজা। রাজার ঘটনা শুনিতে ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত ভালবাসে। তাই দিদিমা গল্প করেন,—এক যে ছিল রাজা, তিনি একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন কি না—এক সুন্দরী রাজকন্যা। রাজকন্যা না হইলে গল্প জমে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজার বিষয় বক্তা কি শ্রোতা কিছুই জানে না।

কিন্তু আমার বোধ হয় যে, অনেকটা সেই জন্য এই ব্যাপারে এতখানি মোহ। যে বিষয় জানি না, অথচ যাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু কখনও কখনও শুনিতে পাই, তাহার বিষয়ে আরও জানিবার কৌতূহল হয়। তাহার উপর এ আর কেহ নহে, রাজা। ঊর্দ্ধনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে হয়; তাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ সৈন্য সমরক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাঁহার অর্থ প্রত্যহ লক্ষ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে; তাঁহার প্রাসাদ যেন একটা কক্ষাবলির অরণ্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ জমকালো মনে হয়।

নাটককারগণও রাজকাহিনী বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারাও একটা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র চান—যেখানে কার্য্যের গতি অবাধ। সমুদ্র নহিলে তরঙ্গ দেখাইয়া সুখ নাই!

এই জন্যই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকেরই নায়ক রাজা। বিষয় মহৎ হইল। তাহার উপর সেই রাজা যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেন ত বিষয় মহত্তর হইল।

আমি বিবেচনা করি যে, নাটকের বিষয় মহৎ হইবে, এ নিয়ম সঙ্গত। তবে রাজাকেই যে নায়ক করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। গৃহস্থের মধ্যেও মহৎ প্রবৃত্তি দুর্লভ নহে! এক জন সামান্য ব্যক্তিও কার্য্যে প্রকৃত বীর হইতে পারে। প্রকৃত শৌর্য্য, প্রকৃত সাহস, প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা—সামান্য ব্যক্তির সামান্য কার্য্যাবলিতেও প্রদর্শিত হইতে পারে। গৃহস্থও নাটকের নায়ক হইতে পারে।

তবে সে গৃহস্থ মহৎ হওয়া চাই। নায়ক সর্ব্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরহিত হইবেন, ইহা একটু বেশী রকমের বাধাবাঁধি নিশ্চয়। এরূপ কঠোর নিয়মের দোষ—(১) সব নাটকই কতকটা এক ছাঁচে ঢালা হইয়া যায়; (২) চরিত্রটি অতিমানুষিক হইয়া যায়, স্বাভাবিক থাকে না; কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের কিছু না কিছু দোষ আছেই। মনুষ্যে দুষ্প্রবৃত্তির একেবারে অভাব থাকিলে সে মানুষ আর জীবন্ত মানুষ হয় না। সে কতকগুলি গুণের সমষ্টিতে পরিণত হয়। Idealistic শ্রেণীর নায়কে ইহা চলে। কিন্তু Realistic Schoolএর নাটকও জগতে আছে, এবং তাহাও আবশ্যক। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, এক জন লম্পট বা পাষণ্ড কোনও নাটক বা কাব্যের নায়ক হয় না। তাহা চিত্রিত করিয়া জগতের সৌন্দর্য্য দেখানো যায় না। যাহা প্রকৃত, তাহাই সুন্দর নয়। যাহা প্রকৃত, তাহাই যদি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই সুন্দর;—এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সুন্দর শব্দটিরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কুৎসিত আছে বলিয়াই "সুন্দর" নামে কতকগুলি পদার্থকে পৃথক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অসুন্দরকে নাটকের নায়ক করিতে নাই। কোনও মহা চিত্রকর বা কবি অসুন্দর ব্যক্তি বা পদার্থ আলেখ্যে কেন্দ্রীয় চিত্র করিয়া আঁকেন নাই। তবে সুন্দরকে তুলনায় আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য কুৎসিতকে চিত্রিত করা যাইতে পারে।

মহাকবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় মহৎ বটে, কিন্তু তাঁহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই। Hamletএর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতস্ততঃ করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাঁহার প্রধান দুঃখ Regan ও Gonerill তাঁহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন। পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—Ingratitude thou marble hearted fiend ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এত দূর অন্ধ হইলেন যে, প্রমাণ না চাহিয়াই সাধ্বী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth ত নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেই সব চরিত্র-দৌর্ব্বল্যের বা পাপ-প্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলত বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goetheর Faust এও তাই।

কিন্তু Shakespear এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নায়কদিকের চারি দিকে তাহারা একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamletএ Horatio, Polonius, Ophelia; Learএ Kent, Fool, Edgar, Corklin; Othelloতে বিশুদ্ধচরিত্রা Desdemona ও তাঁহার সহচরী; Macbethএ Banquo ও Macduff; Antony and Cleopatraতে Octavious; Julius Caesarএ Brutus ও Portia নায়কদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি shakespere কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্ব্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার সমধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন। বিরাট ক্ষমতা, বিরাট বুদ্ধি, বিরাট বিদ্বেষ, বিরাট অসূয়া, বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাঁহার সমধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু, পরদুঃখকাতর বৃদ্ধ বা ভক্ত চৈতন্য বোধ হয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগের মহত্ব তিনি যে একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্যকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁক জমকের নীচে স্থান দিয়াছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

পুরীপ্রান্তে।

১

শোকাচ্ছন্ন, পুরীপ্রান্তে শান্তির আশায়
ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে।
বিষণ্ণ সায়াহ্ন দূর-দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিনমুখী তরল তিমিরে।

২

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর শ্বাস ;
সরোষে আক্রোশে ঊর্ম্মি আক্রমিছে বেলা
বিগত বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস ;
জীবনে মরণে আজ সম অবহেলা !

৩

জমিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি' কুণ্ডলি',
কাঁপিতেছে পূর্ব্বাকাশ—অপূর্ব্ব সুষমা !
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ ; উচ্ছলি' উজ্জ্বলি'
উদ্ভাসি' বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা।

৪

কল্ কল্, ছল্ ছল্, মত্ত অট্টহাস,
উদ্বেল উদ্দাম সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া।—
কত আশা, কত ভাষা, কত অভিলাষ
আলোড়িয়া মর্ম্মস্থল উঠে ঘর্ঘরিয়া !

৫

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে !
মহিমায়—গরিমায় ভীষণ মহান !
বিমূঢ়—আনন্দে ভয়ে সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে !—
কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ-গর্ব্ব-অভিমান।

৬

তরঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্ত্তন,
নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল।
অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
ছন্দোহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল।

৭

হেথায় প'ড়েছে জ্যো'স্না, হোথা ভেসে যায়,
সেথায় বিজলী-জ্বালা উঠে জ্বলি' জ্বলি'।
প্রলেপিয়া শুভ্র ফেন কুল-বালুকায়,
কাতরে নিশ্বসি' সিন্ধু কেঁদে যায় চলি।

৮

দূরগিরি, মেঘ সম, মেঘে গেছে মিশি';
বায়ুর হিল্লোল মিশে সাগর-কল্লোলে;
চন্দ্রালোকে সুপ্ত ধরা, স্তব্ধ দশ দিশি;
একা সিন্ধু, ক্ষুব্ধ দৈত্য, গর্জ্জে দৃপ্ত রোলে!

৯

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায়।
ওই সাগরের যেন আজীবন গান
আছাড়িয়া পড়ি' কূলে, নিমেষে মিলায়!

১০

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে;
উড়িছে তির্য্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই শূন্যে, এই কাছে, দূরে,
যেন শুভ্র চন্দ্রকণা স্রোতে ওতপ্রোত।

১১

পুলকে ঝলকে প্রান্ত, শ্লথ নিদ্রালসে,
শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি'।
ক্বচিৎ তড়িৎ-ক্ষীণ—ঈষৎ উল্লসে;
কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সরি'

১২

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি' ফেনরেখা সরে ধীরে ধীরে।
ভাবিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে।

১৩

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি!
মুহূর্ত্ত-বিকার-মাত্র, ওই ঊর্ম্মি-প্রায়—
ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুখ—ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্বমাঝে অতি অসহায়!

১৪

বৃথা এই জন্মমৃত্যু, বৃথা এ জীবন?
অদৃষ্টের ক্রীড়ণক, সৃজনের ত্রুটী!
বিধাতার কোন ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি'!

১৫

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়—
নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী!
জাগিছে ধূসর সিন্ধু নব-নীলিমায়,
সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

১৬

হে ধর্ম্ম! হে দারুব্রহ্ম! কেন কর্ম্মভূমে
মানব-অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম?—
লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি ক্ষুব্ধ আত্মা—লুব্ধ অবিশ্রাম?

১৭

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
গড়িতেছি স্বর্গরাজ্য—ভবিষ্য কল্পনা,
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা?

১৮

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
তবু ত বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি'।
অস্থির বাসনা হ'তে, হে বিশ্ব-শরণ,
তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি'?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

জগৎ-কথা।

১

জড়ের কথা বলিবার পূর্ব্বে, জড় পদার্থ বলিতে আমরা কি বুঝি, সেটা স্পষ্ট বুঝা আবশ্যক। কোন্ শব্দটা কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিব, সেটা আগে স্থির করিয়া না লইলে বড় গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। লেখক এক অর্থে লিখিতেছেন, পাঠক অন্য অর্থ মনে করিয়া পড়িতেছেন, এরূপ প্রায় ঘটে; ফলে অকারণ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়া যায়; মনে নানারূপ খট্‌কা থাকে, তাহার মীমাংসা হয় না।

জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে, যাহা চেতন নহে, তাহাকে জড় বলিত। আমার মধ্যে এমন এক জন কেহ বা কিছু আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে, তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই তাহার জ্ঞাতা। আমি জ্ঞাতা, আর সমস্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। চন্দ্র, সূর্য্য, ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু কর্ণাদি অবয়বও আমার জ্ঞানের বিষয়; এমন কি, আমার অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, যাহার সাহায্যে আমি চন্দ্র সূর্য্যের ও ইট কাঠের তত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, যে মন কর্ত্তৃক সমাহৃত সেই তত্ত্বকে পরিপাক করিয়া কাজে লাগাই, সেই মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। কেবল আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ; আর যাহা কিছু আছে, তৎসমগ্রই আমার জ্ঞানের বিষয় ও স্বয়ং চৈতন্যহীন জড় পদার্থ। অতএব চন্দ্র সূর্য্য ইট কাঠ হইতে আমার মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত জড় পদার্থ।

প্রাচীন দার্শনিকদিগের এইরূপ বিচারপ্রণালী আমাদের নিকট আপাততঃ হেঁয়ালির মত ঠেকে। ইহার তথ্য-নির্ণয় লইয়া এখন সময় নষ্ট করিব না।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে জগতের দুইটি অংশের কথা শুনা যায়; একটার নাম Mind, আর একটার নাম Matter; যে শাস্ত্র Mindএর তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাহাকে আজকাল মনোবিজ্ঞান (Mental Science) বলা যায়; আর যে শাস্ত্র Matterএর তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান বা জড়বিজ্ঞান (Physical Science) বলা যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের হিসাবে কিন্তু এ কালের মনোবিজ্ঞানেরও অনেকটা অংশ জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

সে যাহাই হউক, পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যাহাকে Matter বলে, আজ কাল বাঙ্গলার 'জড়' শব্দটিকে সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে জড়ের অর্থ ব্যাপকতর; হালের ভাষায় উহার অর্থ সঙ্কীর্ণ। আমরা এই গ্রন্থে 'জড়' শব্দটি এই আধুনিক সঙ্কীর্ণ অর্থেই প্রয়োগ করিব। ইংরেজিতে যাহাকে Matter বলে, আমরা তাহাকে জড় বলিব।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই বা জড় পদার্থের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। কোন্‌টা জড়, কোন্‌টা জড় নহে, ইহার মীমাংসা আপাততঃ সহজসাধ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, এই মীমাংসা লইয়া বহুদিন ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। তাপ, আলোক, তাড়িত প্রভৃতিকে এককালে জড়ের পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হইত; এখন আবার সদর্পে বলা হয়, উহারা জড় নহে; জড়ের ধর্ম্ম মাত্র। ফলে কোন্‌টা জড়, আর কোন্‌টা জড়ের ধর্ম্ম, ইহার নির্ণয় বড় কঠিন ব্যাপার।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলেই গোল মিটিয়া যাইবে; যে জিনিসটা সেই সংজ্ঞার ভিতর পড়ে, তাহা জড়; যাহা পড়ে না, তাহা জড় নহে। কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে, কোনও সংজ্ঞাই ষোল আনা কাজে লাগে না; প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা গোল থাকে। সম্প্রতি আমরা সেই গোল-ব্যূহ ভেদের প্রয়াস পাইব না। কোন জড়ের কতিপয় সংজ্ঞা, যাহা নানা পণ্ডিতে নানা সময়ে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব, এবং অতি সংক্ষেপে দেখাইব, প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা আপত্তি উঠে।

(১) যাহার ওজন বা ভার আছে, তাহা জড়। আপত্তি—একালের পণ্ডিতেরা আকাশ নামক একরূপ জগদ্ব্যাপী পদার্থ মানিয়া লন, উহার ভার আছে কি না, তাহার প্রমাণ নাই; অথচ উহা জড়।

(২) যাহার দেশব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ যাহা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহা জড়। ইহাতেও আপত্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা 'শক্তি' নামক আর একটা পদার্থ অঙ্গীকার করেন, তাহা জড় নহে; অথচ তাহার স্থানব্যাপকতা আছে। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি এই শক্তির পর্য্যায়ভুক্ত।

(৩) যাহা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই জড়। ইহাতে আপত্তি আসে, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা জড় স্বয়ং, না জড়ের ধর্ম্ম?

অলমতিবিস্তরেণ। আরও অনেক সংজ্ঞা আছে; প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র; কোনটিই নির্দোষ নহে; অতএব এখানে আর পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই।

কাজটা কিন্তু ভাল হইল না। পুঁথির আরম্ভে বলিয়াছিলাম, শব্দের অর্থটা স্পষ্ট না বুঝিয়া তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আমরা জড়ের তত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম বটে, কিন্তু জড়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না।

চুলচেরা পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে পারিলাম না বলিয়া এইখানে পুঁথি বন্ধ করিলে চলিবে না। কোনও রকমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ অত্যন্ত মোটা হিসাবে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন যেমন বিপত্তি ঠেকিবে, তেমনি তেমনি তাহা হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

চূণ পাথর, ইট কাঠ, জল বায়ু, এই সকল জিনিসকে আমরা জড় বলিয়া গ্রহণ করিব। আমার শরীরটা, অথবা যে অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস প্রভৃতি মশলায় আমার এই ভঙ্গুর দেহ-যন্ত্র নির্ম্মিত, তাহাও জড়। এই হইল জড়ের স্থূল অর্থ। এখন এই স্থূল অর্থেই কাজ চলিবে। এই মোটা অর্থ গ্রহণ করিয়া চলিলে আপাততঃ কোনও মোটা ভুলের আশঙ্কা থাকিবে না।

যে মোটা অর্থে জড় শব্দ ব্যবহার করিলাম, সেই মোটা অর্থে জড়ের মোটামুটি তিন অবস্থা দেখা যায়—কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা। ইট কাঠের কঠিন অবস্থা, তৈল জলের তরল অবস্থা, আর বায়ুর বায়বীয় অবস্থা।

এইখানে একটু ভাষাবিভ্রাট আসে। বায়ুর অবস্থা ত বায়বীয় হইবেই, উহা কি আর জলীয় বা তৈলীয় হইবে? 'কঠিন' ও 'তরল' যেমন দুইটি অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ পাওয়া গেল, সেইরূপ এই তৃতীয় অবস্থা-জ্ঞাপক আর একটি বিশেষণের ভাষায় অভাব রহিয়াছে। একটা বায়ুর সহিত আমাদের চিরকালের পরিচয়; তাহাতেই আমাদের শ্বাসক্রিয়া চলে; উহাই ধরিতে গেলে প্রাণবায়ু। আমরা সেই বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি। কিন্তু সেই বায়ুর মত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ 'বায়বীয়'-অবস্থাপন্ন আরও নানা 'বায়ু' আছে। তাহার সহিত সাধারণের তেমন পরিচয় নাই; সোডা-ওয়াটারের বোতল খুলিলেই একটা বায়ু বেগে বাহির হইয়া আসে, উহা

প্রাণহানিকর বায়ু। সহরের রাস্তায় আলোক দিবার জন্ত যে গ্যাস জালান হয়, উহাও এক বায়ু। সোডাওয়াটারের বায়ুও বায়ু, জালানী গ্যাসও বায়ু, আর আমাদের চিরপরিচিত বায়ুও বায়ু; এই বায়ুবিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটি নূতন নামের সৃষ্টি করা নিতান্তই আবশ্যক। পাঠককে তাবার গোলের ধাঁধায় ফেলিলে লেখকের অধর্ম্ম হইবে।

ইংরেজিতেও এককালে ঐরূপ বায়বীয়-অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ শব্দের অভাব ছিল; এক air শব্দ চলিত ছিল; নূতন নূতন আবিষ্কৃত বায়ুকেও air বলা হইত। কেহ fixed air, কেহ inflammable air, কেহ dephlogisticated air। ইংরেজেরা gas এই শব্দটি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই ভাষাবিভ্রাট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আমাদিগকেও সেইরূপ একটা শব্দ আহরণ করিতে হইবে।

কেহ কেহ gas শব্দটি বাঙ্গলা হরপে লিখিয়া গ্যাস নামটি ভাষায় চালাইতে চাহেন। আমি তাহাতে কিছুতেই সায় দিব না; ঐ শব্দ ঐরূপে লিখিলে ভাষার ধাতের সঙ্গে মিশে না; বড় কদর্য্য দেখায়। একটা সভ্যতর শব্দ চাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নানাবিধ বায়ুর উল্লেখ আছে,—প্রাণ, অপান, ব্যান ইত্যাদি। ঐ সকল বায়ু সম্পূর্ণ কাল্পনিক না হইলেও, ঠিক কি অর্থে প্রযুক্ত হইত, বলা কঠিন। কাজেই উহাদের কোনটিকে লওয়া চলিবে না। তবে উহাদের মধ্যে একটা সাধারণ অংশ আছে;—'অন্' ধাতুর অস্তিত্ব। আমরা ঐ অন্ ধাতুটাকে কাজে লাগাইতে চাহি। সংস্কৃতে বায়ুর পর্য্যায়ে 'অনিল' শব্দ আছে; উহা অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমরা জোর করিয়া ঐ অনিল শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে, অর্থাৎ যে কোনও বায়বীয় পদার্থের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিব। বায়ু শব্দটি চলিত ভাষায় এত প্রচলিত যে, উহাকে নূতন অর্থ দেওয়া চলে না; অনিল শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় আছে; অথবা সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় আছে; চলিত বাঙ্গলা, যাহা লোকমুখে প্রচলিত, তাহাতে অনিল শব্দের ব্যবহার নাই। কাজেই উহাকে এই নূতন ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

শব্দ যখন সৃষ্টি করা চলে না, তখন প্রাচীন শব্দকে নূতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই। সকল ভাষাতেই এইরূপ করিতে হয়; বাঙ্গলাতেই বা না করিলে চলিবে কেন?

অতএব জড়ের ত্রিবিধ অবস্থা। কঠিন অবস্থা, তরল অবস্থা ও অনিল অবস্থা। ইট কাঠ কঠিন; তেল জল তরল; আর বায়ু আর আলানী গ্যাস আর সোডাওয়াটারের হাওয়া এখানে অনিল।

তিনটি 'অবস্থা' বলা গেল। কেন না, একই জড়পদার্থ তিন রূপ গ্রহণ করিতে পারে; উহাদের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে মাত্র, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। যেমন জল।—উহা কঠিন হইলে বরফ হয়; আর অনিল হইলে অদৃশ্য হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

সোনা রূপার মত কঠিন পদার্থ উত্তাপ পাইয়া তরল হয়। আবার কর্পূরের মত কঠিন পদার্থ উবিয়া গিয়া অনিলে পরিণত হয়। ইহা সকলেই জানেন, সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা লইয়া এখানে বাড়াবাড়ির দরকার নাই।

৩

কঠিন পদার্থ আবার নানা রকমের। উহাদের নানা গুণ, নানা ধর্ম্ম। গোটাকতক প্রধান ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সোনা, রূপা, তামা ঘাতসহ; আঘাত করিলে ভাঙ্গে না; হাতুড়ির ঘায়ে সোনা রূপার পাতলা পাত হয়। দস্তার কিংবা সীসার তেমন পাতলা পাত হয় না।

কাচ, কয়লা, হীরা হাতুড়ির ঘা সহে না; উহাদের পাত হয় না; উহারা ভাঙ্গিয়া যায়; উহারা ভঙ্গপ্রবণ, বা ভঙ্গুর।

আবার সোনা রূপা ছিদ্রের ভিতর দিয়া জোরে টানিয়া সরু মিহি তার হয়; সেই তার আমরা অলঙ্কারে, পোষাকে কাজে লাগাই। সীসার, দস্তার তত মিহি তার হয় না। কাঁচ গালাইয়া সরু তার টানা যায়; কিন্তু কঠিন থাকিতে টানা চলে না; কয়লা, হীরার ত কথাই নাই।

ঐ সকল তারে টান দিলে একটু লম্বা হয়; টান তুলিয়া লইলে সে লম্বত্বটুকু থাকে না; আগেকার দৈর্ঘ্য আবার ফিরিয়া আসে। টানে দৈর্ঘ্য বাড়ে, টানের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে; এইগুলির নাম স্থাস্নুতা, বা স্থিতিস্থাপকতা।

কিন্তু এই স্থিতিস্থাপকতায় একটা সীমা থাকে। এতটুকু টানিলে তার এতটুকু লম্বা হইল; আবার টান ছাড়িলে স্বভাবে ফিরিল। কিন্তু সীমা ছাড়াইয়া টানের মাত্রা চড়াইলে আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না; পূর্ব্বের তুলনায় একটু লম্বা থাকিয়া যায়। ইহার অর্থ,—স্থিতিস্থাপকতার

একটা সীমা আছে; সেই সীমার নিম্নে স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়িলে আর স্থিতিস্থাপক নহে।

টানের মাত্রা আরও বাড়াইলে তার ছিঁড়িয়া যায়; কোনও ধাতুর তার এক মণের ভারে ছিঁড়ে, কোনও ধাতুর তার তেমনই মিহি হইয়াও দুই মণ ভার সহ্য করে। যতক্ষণ না ছিঁড়ে, ততক্ষণ টান সহে; যখন টান না সহিয়া ছিঁড়িয়া যায়, তখন হয় ভঙ্গুর। ভাঙ্গা ছেঁড়ারই প্রকারভেদ।

তামার বা লোহার ছড়ির মাঝখানে একখানা ভারী পাথর ঝুলাইলে ছড়ি কুঞ্চিত হয়, বা বাঁকিয়া যায়; ভার তুলিয়া লইলে সেই বক্রতা থাকে না; ভারের অভাবে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে; ইহাও স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়। কিন্তু এখানেও স্থিতিস্থাপকতার সীমা আছে; সীমা ছাড়াইয়া ভারের মাত্রা বাড়াইলে এতটা নুইয়া যায়, বা বাঁকিয়া যায় যে, তখন আর স্বভাবে ফিরিয়া আসে না। অর্থাৎ, সীমার ভিতরে যাহা স্থিতিস্থাপক, সীমা ছাড়াইলে উহা স্থিতিস্থাপক নহে। আবার অতিমাত্রায় ভার দিলে ছড়ি এতটা বাঁকে যে, ভাঙ্গিয়া যায়। যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ জোয়াল ভার-সহ; যখন ভাঙ্গে, তখন ভঙ্গুর। ভার সহে বলিয়াই ছাদে আমরা লোহার কড়ি, কাঠের বরগা ব্যবহার করি; কিন্তু সাবধান, অতিরিক্ত ভার কেহই সহে না; সকলের জোর সমান নয়।

হীরা দিয়া কাঁচ কাটা যায়, কাঁচে হীরা কাটে না। ঢালাই লোহার আঁচড় পেটাই লোহাতে পড়াতে, পেটাই লোহার আঁচড়ে ঢালাই লোহাতে দাগ পড়ে না। ঢালাই লোহা কঠোর, দৃঢ়; পেটাই লোহা কোমল। হীরার মত কঠোর, দৃঢ় জিনিস আর নাই। তামার খাদ মিশাইলে সোনা রূপাতে দৃঢ়তা বাড়ে; গয়না গড়াইতে বা মুদ্রা ছাপিতে সেই জন্য সোনা রূপাতে তামা মিশায়। সীসা সোনা রূপার চেয়েও কোমল; উহাতে নখের আঁচড় পড়ে।

যাহা অতি বড় দৃঢ়, তাহাও অতি বড় ভঙ্গুর হইতে পারে। কাঁচ খুব দৃঢ়, উহাতে ইস্পাতের আঁচড় লাগে না; কিন্তু উহার ভঙ্গপ্রবণতা প্রসিদ্ধ। আর বাড়াইয়া দরকার নাই। কঠিন পদার্থে নানাগুণ অল্পবিস্তরপরিমাণে বর্ত্তমান দেখা গেল—কাহারও কোনটা অধিক, কাহারও অন্যটা অধিক। নানা গুণ যথা—ঘাতসহতা, টান-সহতা, ভার-সহতা, স্থিতিস্থাপকতা, ভঙ্গুরতা, কঠোরতা। ইহার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা কথাটার আর একটু সূক্ষ্ম বিচার আবশ্যক।

আয়তন ও আকৃতি।

বিচারের পূর্ব্বে আর একটা কথা বুঝিতে হইবে—উহা জড় পদার্থের দেশ-ব্যাপ্তি। জড়পদার্থমাত্রই, কি কঠিন, কি তরল, কি অনিল, সকলেই খানিকটা দেশ, বা স্থান, বা জায়গা ব্যাপিয়া অবস্থান করে; ইহাই জড়-পদার্থের দেশব্যাপ্তি।

কোন জিনিস অল্প জায়গা লইয়া থাকে, উহা ছোট; কোনটা অধিক জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, উহা বড়। একটা মটরের চেয়ে একটা ভাঁটা বড়, একটা ভাঁটার চেয়ে একটা ফুটবল বড়, ভেড়াটার চেয়ে ঘোড়াটা বড়, ঘোড়াটার চেয়ে হাতীটা বড়, দুর্গার চেয়ে চালটা বড়, আর ছেলেটার চেয়ে বুড়টা বড়। এই বৃহত্ত্ব-জ্ঞাপনের জন্য আমরা একটি বিশেষণ ব্যবহার করিব,—'আয়তন'। যাহা বড় বৃহৎ, তাহার আয়তন অধিক; যাহা ক্ষুদ্র, ছোট, তাহার আয়তন অল্প। কুলের চেয়ে তালের আয়তন বড়, ঘোড়ার চেয়ে হাতীর আয়তন বড়। বলা বাহুল্য, পদার্থের আয়তন এই দেশব্যাপ্তির ফল; কেহ অল্প দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন কম; কেহ অধিক দেশ জুড়িয়া আছে, উহার আয়তন অধিক। কেহ ছোট, কেহ বড়।

দেশব্যাপ্তির আর একটা ফল আছে। তাহার নাম আকৃতি। আকৃতি-ভেদে কোনটা গোল, কোনটা চেপ্টা, কোনটা ছুঁচলো, কোনটা দণ্ডাকার, কোনটা স্তম্ভাকার, সকলেই সাকার, নিরাকার কেহই নহে। ভাঁটার আকার ভাঁটার মত, তা ছোটই হউক, আর বড়ই হউক; থালার আকার থালার মত, ছোটই হউক, বড়ই হউক; হাতীর আকার হাতীর মত; ছানাই হউক, আর ধাড়িই হউক; ঘোড়ার মত, বা সাপের মত, বা মাছির মত নহে। এই আকৃতি যে দেশব্যাপ্তির ফল, তাহা বলা বাহুল্য। কতটা দেশ জুড়িয়া বা ব্যাপিয়া আছে, তাহা দেখিয়া আয়তন স্থির হয়; আর কি রকমে দেশ জুড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া আকৃতির নিরূপণ হয়। হাতী যেরূপে দেশ জুড়িয়া আছেন, তাঁহার বাচ্ছাও সেই রকমে সেই ধরণে দেশ জুড়িয়া থাকেন; কিন্তু ভেড়া বা ঘোড়ার দেশব্যাপ্তির ধরণটা অন্যরূপ।

পরিমাণ-সমস্যা।

কতটা দেশ জুড়িয়া আছে, এই বাক্যে আমরা একটা ঘোর সমস্যায় উপস্থিত হইলাম। কে কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে, ইহা স্থির করিয়াই কে ছোট কে বড় স্থির হয়; কে কত ছোট, কে কত বড়, স্থির হয়। দুইটা পদার্থের

দৈর্ঘ্যের বা আয়তনের তুলনা হয়। কে কত ছোট, কে কত বড়, এই তুলনার নাম পরিমাণ। এই পরিমাণ কর্ম্মটাই বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রাণ। বৈজ্ঞানিক বিচারের আরম্ভেই কত বড় ও কত ছোট এই তুলনাসূচক সমস্যার কথা উঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মোটামুটি বলিয়া দেয়, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট। কিন্তু কত বড়, কত ছোট, তাহা বলে না; বলিলেও তাহাতে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি থাকে; এই জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া পরিমাণ করি, মাপিয়া স্থির করি—কোন্‌টা কত ছোট, কোন্‌টা কত বড়। কোন কিছুর আয়তন কত-ঠিক্ করিবার পূর্ব্বে, এই পরিমাণ-সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক।

আমরা যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশ তিন দিকে বিস্তৃত; পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে, দক্ষিণ হইতে বামে ও নিম্ন হইতে উর্দ্ধে, এই তিন দিকে বিস্তৃত। যাহা কেবল এক দিকে বিস্তৃত,তাহা রেখা; যাহা দুই দিকে বিস্তৃত, তাহা তল, বা পৃষ্ঠ; এই রেখা ও তল উভয়ই কাল্পনিক সংজ্ঞামাত্র; উহা আমরা কল্পনায় অনুভব করি মাত্র; উহা বুদ্ধিবৃত্তির গোচর, উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইন্দ্রিয়গোচর জড় পদার্থ যে দেশে ব্যাপ্ত, সেই দেশ তিন দিকে বিস্তৃত। কাজেই একটা বাক্সের মত বা একখানা কেতাবের মত কোন দ্রব্য কতটা দেশ ব্যাপিয়া আছে—ঠিক্ করিতে হইলে, উহা তিন দিকের কোন্ দিকে কতটা বিস্তৃত আছে, ঠিক করিতে হয়। উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, এই তিনের নির্ণয় করিতে হয়। কোন দিকে কতটা বিস্তৃত, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা মাপকাঠী তৈয়ার করিতে হয়। মাপকাঠীটাও জড় পদার্থ; উহার বেধের দিক্ ও প্রস্থের দিক্ আমরা নজরে আনি না; কেবল দৈর্ঘ্যের দিক্‌টার হিসাব রাখি। তার পর উহার দৈর্ঘ্যের সহিত যে জিনিসের আয়তন মাপিতে হইবে, তাহার দৈর্ঘ্যের, প্রস্থের ও বেধের তুলনা করি। মাপকাঠীটার দৈর্ঘ্য যতই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না; তাহাকে বলি এক কাঠী। যে বাক্সটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ তিনিই এক কাঠীর দৈর্ঘ্যের সমান, সেই বাক্সটা যে জায়গা ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম দেওয়া যায় এক ঘন কাঠী। যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ প্রত্যেকেই দুই কাঠীর দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তাহা যে দেশ জুড়িয়া থাকে, তাহার হয় আট ঘন কাঠী; কেন না, ইহা অক্লেশে দেখান যাইতে পারে, এই বৃত্তের দেশটাকে আটটি ছোট ছোট টুক্‌রা দেশে বিভক্ত করা চলে ও সেই প্রত্যেক টুকরা ঠিক্ এক ঘন কাঠী দেশ জুড়িয়া থাকে।

যে মাপকাঠিটাকে আমরা এক কাঠি বলি, সে কাঠিটার দৈর্ঘ্য কত হইবে, তাহা আমার ইচ্ছাধীন। কাজের সুবিধা দেখিয়া তাহা স্থির করা চলে। হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত লোহার রেল পাতিতে হইবে; কত দীর্ঘ রেল চাই, তাহা মাপিবার জন্য লম্বা মাপ-কাঠি লইলেই সুবিধা; তাহার নাম ক্রোশ, অথবা মাইল। কিন্তু দোকানে কাপড় কিনিবার সময় অত বড় কাঠিতে সুবিধা হয় না, তখন ছোট কাঠী লইতে হয়। তাহার নাম—হাত, অথবা গজ। আরও ছোট মাপের জন্য আরও ছোট কাঠী হইলে সুবিধা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠী ব্যবহার করিয়া থাকে; তাহাতে উপস্থিত কাজে সুবিধা হয়; কিন্তু পরস্পর কারবারে অসুবিধা ঘটে। ইংরেজের মাপকাঠী গজ, আর বাঙ্গালীর মাপকাঠী হাত; এখানে দশ গজ আর তের হাত, ইহার মধ্যে কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, অকস্মাৎ বলা চলে না; একটা গজ একটা হাতের কয় হাতের সমান, তাহা না জানিলে বলা চলেই না।

আবার ইংরেজের বড় মাপকাঠী মাইল ছোট মাপকাঠী ইঞ্চির কয় ইঞ্চির সমান, না জানিলে, দশ মাইল বড়, না সতের ইঞ্চি বড়, তাহা অকস্মাৎ বলা চলে না। নানা মাপকাঠী চলিত থাকিলে কারবারের কত অসুবিধা, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই জানেন। এ দেশে জমী জরিপের সময় সাবেকের কাঠা ও হালের কাঠা লইয়া জমীদারে প্রজায় কত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাকি মাপ ও কাঠী মাপের অসুবিধা কাহারও অজানা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য, সভ্য দেশে যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার আছে, তাঁহারা আইন দ্বারা মাপকাঠী বাঁধিয়া দেন। প্রজাদিগকে সেই মাপকাঠী বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিলাতে পার্লেমেণ্ট সভা ঐরূপ মাপকাঠী বাঁধিয়া দিয়াছেন। একটা দৃঢ় ধাতুদণ্ড পার্লেমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠী; উহা রাজমন্ত্রীদের জিম্মায় রক্ষিত থাকে; উহার ছাপ দেওয়া নকল প্রজাদের নিকট বিলি করা হয়। উহার নাম ব্রিটিশ গজ। গরম পাইলে ধাতুদণ্ডের দৈর্ঘ্য একটু বাড়িয়া যায়; এই জন্য কতটা গরমে দৈর্ঘ্য এক গজ হইবে, তাহাও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। সূক্ষ্ম মাপে এই বৃদ্ধিটুকু অগ্রাহ্য করা চলে না।

এই গজের ১৭৬০ গজের নাম মাইল; ছোট মাপের জন্য গজের তৃতীয়াংশের নাম ফুট; আর ফুটের দ্বাদশাংশের নাম ইঞ্চি। ইঞ্চির ভগ্নাংশের

পৃথক নাম নাই। আমরা আজ কাল আমাদের হাত-কাঠীকে আঠার ইঞ্চির সমান ধরিয়া লই।

ছোট জিনিস মাপিতে ছোট কাঠীর দরকার হয়; ইঞ্চির চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিতে ইঞ্চির ভগ্নাংশের দরকার; ইঞ্চির দ্বাদশাংশ লওয়া যাইতে পারে; তার চেয়ে ছোট মাপে আরও ছোট ভগ্নাংশের দরকার হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য যে কত ছোট হইতে পারে, তাহার কোনও সীমা নাই; যত ছোট ভগ্নাংশকেই মাপকাঠী কর না কেন, তার চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় আরও ছোট কাঠীর দরকার হইবে; কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় মোটা; মানুষের ইন্দ্রিয়কে এক জায়গায় গিয়া থামিতে হয়; তার চেয়ে ছোট কাঠী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কাজেই বাধ্য হইয়া মানুষকে সেইখানে থামিতে হয়; তার চেয়ে সূক্ষ্ম মাপ চলে না। এইখানে পরিমাণ-সমস্যার আর মীমাংসা চলে না; যত সূক্ষ্ম পরিমাণ করি না কেন, সূক্ষ্মতার একটা সীমা আছে, সেখানে পরিমাণ মানুষের অসাধ্য।

বৈজ্ঞানিক বিচার এইখানে আসিয়া হারি মানে। ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার; ইন্দ্রিয় যেখানে পরাস্ত হয়, জ্ঞানও সেখানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার একটা সীমা আছে; তবে মানুষে বুদ্ধি খাটাইয়া সেই সীমাটাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে। কৌশলক্রমে সীমাটাকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া লওয়া চলে। চোখ আলোকের সাহায্যে দেখে; আলোক যেখানে পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে কৌশলক্রমে আলোক আনিয়া পুঞ্জীভূত করে, চোখ তখন দেখিতে পায়। এই সকল কৌশলের জন্য দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কৌশল-উদ্ভাবনে মানুষের শক্তির সীমা কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কাজেই মানুষ ইন্দ্রিয়কে ক্রমেই স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে; শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তি একটা সীমায় পৌঁছে বটে, কিন্তু সেই সীমা যে কোথায় গিয়া সীমা পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। কাজেই বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ; কিন্তু ইহার গতি সম্পূর্ণতার অভিমুখে; সম্পূর্ণ কখনও হইবে না; তবে সম্পূর্ণতার অভিমুখে ক্রমশঃ চলিতেছে, এবং আরও কিছুদিন সম্ভবতঃ চলিবে।

যে সকল কঠিন পদার্থের আকৃতি বাক্সের মত, বা কেতাবের মত, তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ মাপিলে আয়তন মাপা চলে, তাহা উপরে বলিয়াছি।

তরল বা অনিল পদার্থের আয়তন ঐরূপ ফাঁপা বাক্সে বাতাস পূরিয়া কয় বাক্স হইল, তাহাও সহজে মাপা চলে। কিন্তু কঠিন পদার্থের আকৃতি ভাঁটার মত, বা থালার মত, বা থামের মত হইলে, অত সহজে মাপা চলে না। এইরূপ হইলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে সাহায্য করে। জ্যামিতি শাস্ত্র আসিয়া বলিয়া দেয়, একটা ভাঁটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য জানিলে কিরূপে তাহার আয়তন স্থির হইবে; ব্যাসের দৈর্ঘ্য হয় যদি পাঁচকাঠী, ভাঁটার আয়তন হইবে কত ঘন কাঠী, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা জ্যামিতি শাস্ত্রের উপর। তবে জ্যামিতি শাস্ত্র যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। অষ্টাবক্র ঋষির মত আকৃতি হইলে, জ্যামিতি শাস্ত্রও হারি মানে। তখন মানুষের বুদ্ধিকে পরাস্ত হইতে হয়। তখন কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়। একটা ফাঁপা ঢাকনা-হীন বাক্স কাণায় কাণায় জলে পূরিয়া সেই জলে অষ্টাবক্রকে ডুবাইতে হয়। খানিকটা জল উথলিয়া পড়ে; সেই জলটা আবার অন্য বাক্সে পূরিয়া তাহার আয়তন কত, স্থির করা চলে। অষ্টাবক্রের যে আয়তন, এই উথলিত জলের আয়তন তাহার সমান।

৬

স্থিতিস্থাপকতা।

কঠিন পদার্থমাত্রেরই একটা আয়তন আছে, এবং একটা আকৃতি আছে। জোরে চাপ দিয়া আয়তন একটু কমান যায়; ইহার নাম সঙ্কোচন; চাপ তুলিয়া লইলে পূর্ব্ব আয়তন ফিরিয়া আসে, চাপের অভাবে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে। এই ধর্ম্ম স্থিতিস্থাপকতা; ইহা আয়নতনগত স্থিতিস্থাপকতা। আবার কঠিন পদার্থের আয়তন না কমাইয়া আকৃতি বদলান চলে; মোচড় দিলে বাঁকিয়া যায়; ইহার নাম আকুঞ্চন; মোচড় ছাড়িয়া দিলে বক্রতা দূর হয়; তখন স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাও স্থিতিস্থাপকতা, তবে আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা। কঠিন পদার্থের সাধারণতঃ দুই রকমেরই স্থিতিস্থাপকতা আছে;—আয়তনগত ও আকৃতিগত। চাপে সঙ্কোচন, আর মোচড়ে আকুঞ্চন, দুইটাই আয়াসসাধ্য। এই আয়াসের মাত্রা দেখিয়া স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নিরূপিত হয়। যেখানে আয়াস অধিক, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক। যেখানে আয়াস অল্প, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অল্প। ইস্পাত, কাচ, পাথর, কাঠ, এই কয় জিনিসেরই আয়তন বদলান বা আকৃতি বদলান আয়াসসাধ্য; ইহারা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক।

একটা গোল ভাঁটা বা বর্ত্তুলকে জোরে এক দিকে চাপিলে উহা চেপটা হইয়া যায়; উহার বর্ত্ত লত্ব থাকে না; উহার আকৃতির বদল হয়। একটা মার্বেলের বা কাচের ভাঁটাকে চেপটা করা বড়ই শক্ত; একটা রবারের বলকে চেপটা করা তার চেয়ে অনেক সহজ। অতএব মার্বেল বা কাচের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা রবারের চেয়ে অধিক। কেন না, যেখানে আয়াস বেশী, সেখানে স্থিতিস্থাপকতাও অধিক।

কথাটা নূতন বলিয়া মনে হয়। চলিত ভাষায় রবারের স্থিতিস্থাপকতা প্রসিদ্ধ। রবারেব চেয়ে কাচের স্থিতিস্থাপকতা অধিক, ইহা কেমন শুনায়। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিজ্ঞানের ভাষা ঠিক্ চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষায় যে শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, বিজ্ঞানের ভাষায় সে শব্দ ঠিক্ সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। বৈজ্ঞানিক বিচারে খুব সাবধান হইয়া ভাষা ব্যবহার না করিলে পদে পদে ঠকিতে হয়। চলিত কথাবার্ত্তায় অতটা বাঁধাবাঁধি চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি অর্থ দিয়া লইতে হয়; চলিত ভাষায় যেমন এলোমেলো নানা অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না; এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ। আইনের গোড়াতেই যেমন কতকগুলি শব্দের পারিভাষিক অর্থ দেওয়া হয়, সেইরূপ আরম্ভে পরিভাষা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রও ফাঁদিতে হয়।

কাচে আর রবারে তফাত কি? বিজ্ঞানের ভাষায় কাচের স্থিতিস্থাপকতা মাত্রায় অধিক; কিন্তু উহার পরিসর কম। আগে একবার বলিয়াছি, একটা তামার ছড়ির মাঝখানে একটা ওজন ঝুলাইলে উহা বাঁকিয়া যায়, মোচড়াইয়া যায়; ভার নামাইলে আবার বক্রতা নষ্ট হয়। অর্থাৎ, তামার আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। কিন্তু ভারের মাত্রা অধিক হইলে এতটা বাঁকিয়া যায় যে, তখন আর স্বভাবে ফেরে না; একটা স্থায়ী বক্রতা আসিয়া পড়ে; বুঝিতে হইবে যে, তখন স্থিতিস্থাপকতা আর নাই; উহা ছিল স্থিতিস্থাপক, এখন হইয়াছে নমনীয়। তামার স্থিতিস্থাপকতার যে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ পরিসর ছিল, সেই পরিসর ছাড়াইয়া গিয়াছে। পরিসরের সীমা ছাড়াইলে আর উহা স্থিতিস্থাপক থাকে না; নমনীয় হয়।

কাচের ছড়িতেও ভার ঝুলাইলে উহা বাঁকে; গুরুভার ঝুলাইলে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও বুঝিতে হইবে, স্থিতিস্থাপকতার পরিসর ছাড়াইয়া

ভার ঝুলান হইয়াছে। পরিসরের সীমার ভিতরে কাচ ছিল স্থিতিস্থাপক; সীমা ছাড়াইয়া হইয়াছে ভঙ্গুর।

রবারের স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা কম বটে, কিন্তু পরিসর খুব বেশী, চাপ দিয়া অনেকটা চেপটা করা চলে। রবারের সূতাকে টানিয়া অনেকটা লম্বা করা চলে। আবার টান ছাড়িলে পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পায়। অল্প আয়াসে আকৃতির অনেকটা বদল হয়। কাজেই স্থিতিস্থাপতকতার মাত্রা কম, কিন্তু পরিসর বেশী। কিন্তু এখানেও পরিসরের একটা সীমা আছে; অধিক টানে রবারের সূতাও ছিঁড়িয়া যায়। তখন যে রবার ছিল স্থিতিস্থাপক, তাহা হইল ভঙ্গুর। ক্রমশঃ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

মহারাষ্ট্র ভাষার ইতিহাস।

বিগত দুর্গোৎসবের অবকাশকালে দেশীয় রাজ্য বরোদার সুশিক্ষিত অধিপতি মহারাজ শ্রীসয়াজী রাও গায়কোয়াড় মহোদয়ের যত্নে বরোদা নগরীতে "মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলনে"র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। পুণা নগরীতে এই সাহিত্য-পরিষদের প্রথম তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য অধিবেশনে মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সেবকগণের রচিত যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত চিন্তামণি রাও বিনায়ক বৈদ্য এম্.. এ. এল্. এল, বি. মহাশয় "মহারাষ্ট্র ভাষার ইতিহাস" শীর্ষক যে সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বৈদ্য মহাশয়ই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এ স্থলে ভরসা করি, বৈদ্য মহাশয়কে কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করিবেন না—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করায় বৈদ্য-পদবী তাঁহার বংশোপাধিতে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি অম্বষ্ঠ নহেন। মহারাষ্ট্রে সদ্‌ব্রাহ্মণও চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান লেখক মহাশয় The Riddle of the Ramayan, Mahabharat—a criticism ও Epic India নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ-সমাজে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও তাঁহার গবেষণার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাঁহার পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন,—বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, এ কথা এখন এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে। আর্য্যেরা যখন পঞ্চনদ প্রদেশে প্রথমে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন, তখন তথায় আদিম অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল বলিয়া, বোধ হয়, আর্য্যেরা তাহাদিগকে

সহজেই পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। এই আদিম অধিবাসীরা ঋগ্বেদে দস্যু ও দাস প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। দস্যু ও দাসেরা দ্রাবিড়-জাতীয় ছিল, এবং অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে প্রথমে সিংহলে ও পরে দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এইরূপ অনুমান করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, সিংহল ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ এককালে স্থলময় ছিল—এক্ষণে উহা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা সমুদ্রের রক্ষার জন্ত রাক্ষস ও যক্ষদিগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ফল কথা, আর্য্যেরা উত্তর দিক্ হইতে ও দ্রাবিড়ীয়েরা (আর্য্যদিগের বহুপূর্ব্বে) দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়া ভারতে বসতি করিয়াছিলেন, এ সিদ্ধান্ত বহুপরিমাণে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

পঞ্জাবে আর্য্যদিগের সভ্যতা আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদাদি বেদচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-সমূহ পঞ্জাবেই রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ভাষাকে 'প্রাচীন সংস্কৃত' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যে সে ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্জাবে বাসকালে আর্য্যেরা যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত ভাষাই আমাদিগের মারাঠী ভাষার আদি জননী। যাস্ক ও পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদিগের মাতৃভাষার সম্বন্ধে যেরূপ গভীর বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়াছেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোনও দেশের পণ্ডিতই করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে শব্দসাধনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সন্দর্শন করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত ও পাণিনীয় সূত্রের সাহায্যেই তদ্বিষয়ে বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রী ভাষার মূলানুসন্ধান-কার্য্যেও আমরা পাণিনির নিকট সহায়তা লাভ করিয়া থাকি।

পাণিনির সূত্রে সংস্কৃত ও প্রাকৃত নামের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে সমাজে সংস্কৃত প্রাকৃতের বিভেদ সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সূত্রাবলীতে 'ছন্দসি' ও 'ভাষায়াম্', ইত্যাকার বিভেদ দৃষ্ট হয়। বেদসংহিতার ভাষাকে তিনি 'ছন্দস্' নামে ও লৌকিক গদ্য ভাষাকে শুদ্ধ 'ভাষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং বৈদিক যুগের অনধিক পরেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, বলিতে হইবে। খ্রীষ্ট-জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে তাঁহাদিগের আধিপত্য ও বসতি গঙ্গা-যমুনার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। দেশপূজ্য তিলক মহাশয়ের মতে, এই সময়ের মধ্যে বেদসংহিতা রচিত হইয়াছিল। আর্য্যেরা যখন পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তে দ্রাবিড়ীয় জাতির বাস ছিল—পঞ্জাব অপেক্ষা ঐ প্রদেশে (আর্য্যাবর্ত্তে) তাহাদিগের সংখ্যা ও শক্তি অধিক ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ প্রদেশে, গঙ্গোত্রীর পথে, আর এক দল আর্য্য মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়া বসতি করেন—ডাক্তার গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। সে অনুমান আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। এই নবাগত আর্য্যগণের দ্রাবিড়ীয়দিগের সহিত অনুলোম-বিবাহহেতু ক্রমশঃ সম্মিলন বা শোণিত-সম্বন্ধ ঘটে। বিগত

সেন্সসের সময় এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর মস্তকের পরিমাণ ও মুখভাবাদির বিশেষত্ব অবলম্বনে ভারতীয়গণের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতেও পঞ্জাবী ও রাজপুতদিগের বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ আর্য্য-দ্রাবিড়ীয় (Ario-Dravidian) জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ফলতঃ আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহাদিগের ভাষারও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তিন সহস্র বৎসর হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের অব্যবহিত-পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত মৃত-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল,—জনসাধারণের মধ্যে উহার বিন্দুমাত্র প্রচার ছিল না। এই কারণে বুদ্ধদেবকে পালী ভাষায় স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সংস্কৃতের প্রচার ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের রমণী-সমাজে প্রাকৃত ভাষাই প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত মৃতভাষায় পরিণত হইবার বা শাক্যসিংহের জন্মের বহু পূর্ব্বেই পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে অনেকে এ কথা স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পাণিনির গ্রন্থে যখন যবন-লিপির উল্লেখ দেখা যায়, তখন তিনি কিছুতেই সিকন্দর শাহের (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। কিন্তু যবনদিগের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসীর পরিচয় ছিল, এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। স্পার্টার প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাশাস্ত্র-প্রণেতা লাইকার্গস খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। মিশর দেশের ১৪১৫ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে যবনদিগের (ইয়নিয়নদিগের) উল্লেখ আছে। (ইভেলিন এবট প্রণীত গ্রীসদেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) সুতরাং যবন-জাতিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, পাণিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। লেখক মহাশয় তাঁহাকে তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় পাণিনিকে ও স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু পাণিনির কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দশম, এমন কি, একাদশ শতাব্দীতেও নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। শ্রীযুত বিনায়ক কাশীনাথ রাজওয়াড়ে বি. এ. মহাশয় পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আবার শ্রীযুত তিলকের মতে, শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্ব্বিংশ শতাব্দীতে স্বীকার করিলে, পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ ২৫শ শতাব্দীর লোক বলিয়া মানিতে হয়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য প্রস্তাবের লেখক বৈদ্য মহাশয়ের মতে, যখন পাণিনি বৈদিক যুগের অনধিক পরবর্ত্তী, এবং ছন্দস্ ভাষার উত্তরসীমা যখন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তিন সহস্র বৎসর, তখন পাণিনিকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৫শ শতাব্দীর লোক বলিলে, বৈদ্য মহোদয়ের মতের সহিত বিরোধ ঘটে না। পাণিনির সময়ে দক্ষিণাপথে আর্য্যদিগের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাঁহার সূত্রাবলীতে দক্ষিণ-ভারতের কোনও স্থানেরই উল্লেখ ঘুণাক্ষরেও পরিদৃষ্ট হয় না। লেখক মহাশয়ের মতে, শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আর্য্যেরা মহারাষ্ট্রে আপনাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮০০ হইতে ৫০০র্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর্য্যেরা দক্ষিণাপথে আপনাদিগের

আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, লেখকের এইরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, বৌদ্ধদিগের রচনা-পাঠে জানা যায় যে, শাক্যসিংহের জন্মকালে গোদাবরী প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে মহারাষ্ট্র দেশ বলি, তাহা সেকালে গোপরাষ্ট্র, পাণ্ডুরাষ্ট্র, মল্লরাষ্ট্র, কোঙ্কণ, বিদর্ভ ও অশ্মক প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

আর্য্যেরা যখন মহারাষ্ট্রে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদিগের মাতৃভাষা কি ছিল, এ প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হয়। লেখকের মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষা লোক-ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আর্য্যগণ তখন সংস্কৃতোৎপন্ন প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রাকৃত ভাষার মধ্যে প্রদেশভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যও জন্মিয়াছিল। তথাপি সেই সকল প্রাকৃত ভাষা তখনও পরবর্ত্তী কালের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয় নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার নাম উল্লিখিত হয় নাই দেখিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির সময়ে বা ১৫০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত ভারতে এক পালী ভিন্ন অন্য কোনও লোকব্যবহার্য্য ভাষারই উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই মত তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, পতঞ্জলির পূর্ব্বেই বৌদ্ধেরা মাগধী ও জৈনেরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখকের মতে, মহারাষ্ট্রী নাম্নী প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি খ্রীঃ পূর্ব্ব ৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে হইয়াছিল। সেই মহারাষ্ট্রী হইতে বর্ত্তমান মারাঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে, মহারাষ্ট্রীর জন্ম খ্রীঃ-পূঃ ১৫০ অব্দের পর হইয়াছে। [ঐতিহাসিক শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে মহাশয় মহারাষ্ট্রীর উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।]

সংস্কৃত হইতে, দেশভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতের উৎপত্তি হইল, ইহা জানিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হইয়া থাকে। কালক্রমে সকল দেশেই যেরূপ ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষার সেরূপ পরিবর্ত্তন হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। অর্দ্ধ-সভ্য লোক অতি সুসভ্য ভাষার ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে, সেই উন্নত ভাষায় যে বিকৃতি ঘটে, প্রাকৃত ভাষাসমূহ সংস্কৃত ভাষার সেইরূপ বিকারের ফল—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেশে প্রাকৃতভাষার বহুল প্রচার হইলে বিদ্বান্ আর্য্যগণ উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ঐ ভাষার ব্যাকরণও রচিত হইল। পাণিনির ব্যাকরণের আদর্শে বররুচি 'প্রাকৃত-প্রকাশ' নামক প্রাকৃত ভাষাসমূহের ব্যাকরণ রচনা করিলেন। বররুচিকে খ্রীঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তৎপূর্ব্বেও বররুচি নামধেয় অপর এক গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বররুচি ও পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়নকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। বৌদ্ধদিগের মতে, কাত্যায়ন মাগধী বা পালী ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন।

প্রাকৃত-প্রকাশ-কার বররুচির সময়ে এ দেশে চারিটি প্রধান প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। সেই প্রাকৃত-চতুষ্টয়ের নাম—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী। তন্মধ্যে সে সময়ে মহারাষ্ট্রী ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও সংস্কৃত হইয়াছিল; ঐ ভাষার সাহিত্যও বিপুলতা-লাভ করিয়াছিল। সেকালে মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় বর্ত্তমান গুজরাথ ও মালব প্রদেশেও

মহারাষ্ট্রী ভাষারই প্রচার ছিল। মথুরা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে শৌরসেনী ভাষা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে ও উত্তরে কাশ্মীরমণ্ডলের একাংশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যথাক্রমে মাগধী ও পৈশাচী নামে বররুচির গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীন মহারাষ্ট্রী হইতে আধুনিক মারাঠী, শৌরসেনী হইতে হিন্দী, মাগধী হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। পৈশাচী ভাষা বর্ত্তমান কাশ্মীরী. মুলতানী ও সিন্ধী ভাষার মাতৃস্থানীয়া। এই প্রাচীন প্রাকৃত-ভাষা-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে 'প্রাকৃত প্রকাশে' যে সকল সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে. তাহা অদ্যাপি পূর্ব্বোক্ত দেশী ভাষাসমূহে বহুপরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বররুচি যে ভাষার যে বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এখনও সেই ভাষায় সেই বিশেষত্ব বহুপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর লেখক কতিপয় উদাহরণ দিয়া এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন মাগধীতে শকারের উচ্চারণের প্রাধান্য ছিল ; মাগধী হইতে উৎপন্ন বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতেও শকারেরই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, বাঙ্গালীর কণ্ঠে 'ষ' 'স' 'শ'-এর মত উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীতে শ ও ষ সকারের ন্যায় উচ্চারিত হইত ; এখনও মারাঠীতে সেইরূপই হইয়া থাকে। যথা,—কেশ = কেস। পোষণ = পোসণে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শব্দরাশি সমুদাহৃত করিয়া বৈদ্যমহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী নাম্নী প্রাকৃত ভাষা এককালে মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত ছিল। এমন কি, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত জনসমাজে ঐ ভাষার ব্যবহার ছিল। মহারাষ্ট্র দেশের লোকেরা পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এই কারণে তাঁহাদের যত্নে মহারাষ্ট্রী ভাষা বহুল উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় কাব্য এখনও প্রচলিত আছে। দণ্ডীর—'মহারাষ্ট্রোদ্ভবাং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ। আকরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ং॥' এই উক্তি অনেকেরই সুবিদিত। শাতবাহনবংশীয় হাল (৪০ খ্রীঃ অঃ) নামক নরপতির চেষ্টায় সংগৃহীত গাথাসপ্তশতী মহারাষ্ট্রী ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ। মহারাষ্ট্রী ভাষায় প্রচলিত লক্ষাধিক কবিতার মধ্য হইতে ঐ গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন পুরুষ কবির ও ৬।৭ জন মহিলা-কবির সপ্তশতমাত্র উৎকৃষ্ট পদ্য সংগৃহীত হইয়াছে—এরূপ উল্লেখ ঐ গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। গুণাঢ্য কবি পৈশাচী ভাষায় 'বৃহৎ-কথা' নামক এক প্রকাণ্ড কথাগ্রন্থ রচনা করিয়া শাতবাহনবংশীয় জনৈক নরপতিকে উপহার দিয়াছিলেন। গুণাঢ্য বোধ হয়. কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঐ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ দক্ষিণাপথাধীশ শাতবাহনকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা মহারাষ্ট্রজাতির পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ-কার বররুচি স্বীয় গ্রন্থে মহারাষ্ট্রীকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। অপরাপর ভাষার বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি 'শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ' এই সাধারণ সূত্র রচনা দ্বারা মহারাষ্ট্রীর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রাকৃত-প্রকাশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৬টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে ৪২৪টি মহারাষ্ট্রী-বিষয়ক ; অবশিষ্ট ৬২টি সূত্রে শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচীর বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রী ভাষা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কত দূর সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, ইহা হইতে তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। আলঙ্কারিকেরা সংস্কৃত নাটকসমূহে গাথা-রচনায় মহারাষ্ট্রীর প্রয়োগ

করিতে উপদেশ দিয়াছেন।—'পাঠ্যস্তু মহারাষ্ট্রী, নায়িকানাং সখীনাঞ্চ শৌরসেনী, মাগধী রাজসাদীনাং চেটানাং শ্রেষ্ঠীনাং বার্দ্ধমাগধী"—ইত্যাদি সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মুখে ভিন্ন ভাষার সমাবেশ করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই নিয়মগুলিকে কাল্পনিক মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়েও আমরা যে কারণে নাটকের দ্বারবান্ পাত্রের মুখে হিন্দী, মহাজন বা শেঠজীর মুখে গুজরাথী বা মারওয়াড়ী ভাষা শুনিতে পাই, সেই কারণেই সেকালের নাটকে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। একালের স্থায় সেকালেও বিশেষ বিশেষ প্রদেশের, বা বিশেষ বিশেষ ভাষা-ভাষী লোকের বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে একাধিপত্য ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কবিতার ও সঙ্গীতজ্ঞতার জন্য সেকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া, অন্যান্য প্রদেশেও তাঁহাদিগের সমাদর ছিল; এবং সেই জন্য নাটকের সঙ্গীতাংশে মহারাষ্ট্রী ভাষা-ভাষীই প্রাধান্য লাভ করিতেন। ফল কথা, সুধী-সমাজে সেকালে মহারাষ্ট্রী ভাষার সবিশেষ সমাদর ছিল। চণ্ডীদেব-কৃত 'প্রাকৃত-দীপিকা'য় লিখিত আছে,—'এতদপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাকবিপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রদেশীয়ং প্রকৃষ্টভাষণম্।'

কোনও ভাষা পূর্ণাবয়ব না হইলে উহার উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে না। যে ভাষার অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, সে ভাষা পূর্ণাবয়ব হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষা উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া স্থিরতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে, এ কথা বলা যাইতে পারে। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষার উন্নতি যেরূপ স্থগিত হইয়া যায়, বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ রচিত হইবার পর প্রাকৃত-ভাষাসমূহেরও উন্নতি সেইরূপ স্থগিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বররুচির ব্যাকরণের জন্য প্রাকৃত ভাষাসমূহ স্থিরতা ও সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিলেও, প্রচলিত ভাষার সহিত ক্রমশঃ উহার পার্থক্য-ঘটিতে লাগিল। ব্যাকরণ-বদ্ধ সাহিত্য-ভাষার সহিত চলিত ভাষার এরূপ প্রভেদ-সংঘটন অনিবার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ভাষার কালক্রমে যে রূপান্তর ঘটিল, পরবর্ত্তী কালের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা তাহাকে অপভ্রংশ ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত অপভ্রংশের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অপভ্রংশ ভাষাসমূহ হইতে ভারতবর্ষে নানাপ্রদেশপ্রচলিত বর্ত্তমান ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।

অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ কাব্যাদর্শ-প্রণেতা দণ্ডীর পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে আমরা দেখিতে পাই। কাজেই অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় ৫ম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়াছে বলিলে দোষ হয় না। খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে আবার ঐ সকল অপভ্রংশ ভাষা হইতে বর্ত্তমান দেশীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কিন্তু মারাঠী ভাষায় রচিত একাদশ শতাব্দীর যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ঐ সময়েই ভারতের অন্যান্য দেশী ভাষারও উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাসমূহের অস্তিত্ব যদিও ইহার বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, তথাপি পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে উহারও চর্চ্চা করিতেন; এখনও কেহ কেহ করিয়া

থাকেন। প্রাকৃত ভাষা যদিও এখন মৃত ভাষার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি উহার আলোচনা— দেশীয় ভাষাসমূহের ইতিহাস-জিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে পরম হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণ মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃত ভাষায় আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করায়, জৈন পণ্ডিতদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ ভাষার চর্চা (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন) প্রচলিত ছিল। এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে। পরবর্ত্তী কালে প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে যে সকল ব্যাকরণ ও কোষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হেমচন্দ্রের গ্রন্থগুলিই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্র এক জন জৈন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গুজরাথের রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সভায় সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তাহার অষ্টম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষাসমূহের বিচার আছে। 'দেশী নামমালা' নামে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট কোষগ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বররুচি ও হেমচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কালে যে সকল বৈয়াকরণ প্রাকৃত ভাষার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি তখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের টীকাকার ভামহ হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ক্রমদীশ্বর, ত্রিবিক্রম ও কৃষ্ণ পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী ছিলেন। [মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র বিরচিত 'প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে শাকল্য, ভরত, কোহল, বররুচি, ভামহ, বসন্তরাজ প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা-শাস্ত্রের পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মলয়গিরি ও কেদার ভট্ট নামক দুই জন প্রাকৃত-ব্যাকরণ-কার পাণিনিকৃত 'প্রাকৃত-লক্ষণ' নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাণিনি কে ও কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জানা যায় না।] যে যাহা হউক বররুচির পর হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রাকৃত বৈয়াকরণ আর কেহ হন নাই। [হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের সর্ব্বশুদ্ধ ১১১৩টি সূত্রের মধ্যে প্রায় সাড়ে আট শত সূত্র মহারাষ্ট্রী ভাষার নিয়ম-নির্দ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়।] পাণিনি, বররুচি ও হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা হইতে মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃত ভাষার, মহারাষ্ট্রী হইতে মহারাষ্ট্র অপভ্রংশের ও তাহা হইতে বর্ত্তমান মারাঠী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

'মারাঠী'—শব্দটি মহারাষ্ট্র পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'মহারাষ্ট্র' পদ হইতে 'মরেহট' বা 'মারহট' শব্দ কিরূপে বিকল্পে সিদ্ধ হয়, তাহা হেমচন্দ্র স্বীয় ব্যাকরণে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র—মরেহটী বা মারহাঠী, কিছু দিন পরে হকারের বিলোপ ঘটিয়া বা রকারের সহিত হকার মিলিত হইয়া মরেঠী বা মারাঠী শব্দের উৎপত্তি হইল। মরেঠী শব্দ অন্যান্য প্রদেশে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যেও মরেঠী শব্দের প্রয়োগ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র কবি জ্ঞানেশ্বর (খ্রীঃ ১৩ শতাব্দী) 'মহ্রাটী' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যে 'মহ্রাঠী' পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অধুনা মারাঠী শব্দই বহুলরূপে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও প্রচলিত মারাঠী ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সংস্কৃতই প্রাকৃতের জননী, তাহা উক্ত উভয় ভাষার শব্দ, প্রত্যয়, রূপ, প্রয়োগ ও সমাসাদির ঐক্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ উভয় ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধানতঃ উচ্চারণগত। অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকের মুখে সাধুভাষার যেরূপ

উচ্চারণ-বৈষম্য ঘটে, এই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বৈষম্য তদপেক্ষা অধিক নহে। প্রায় ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'গাথাসপ্তশতী' হইতে একটি পদ্যাংশ এ কথার উদাহরণস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—'গহি অগ্ঘপঙ্কঅং বিঅ সঞ্ঝাসলিলঞ্জলিং ণমহ।' এই প্রাকৃতাংশ সংস্কৃতে পরিণত করিলে এইরূপ হইবে,—'গৃহীতার্ঘ্যপঙ্কজমিব সন্ধ্যাসলিলাঞ্জলিং নমত।' এতদুভয়ের তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, সংস্কৃতের কতকগুলি কঠোর বর্ণ ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ প্রাকৃত ভাষায় কোমল হইয়াছে। প্রায়ই কোমলতা ও স্বরবর্ণসমূহের একাদিক্রমসন্নিবেশ কিছু দিন পরে উন্নত জনসাধারণের নিকট লঘুতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বৌদ্ধ ও জৈনগণ দীর্ঘকাল এই লঘু ও কোমল ভাষাকে আশ্রয় দান করিয়া উহার অস্তিত্ব-রক্ষায় সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দুই ধর্ম্মের প্রাবল্য সমাজে যখন হ্রাস পাইতে লাগিল, এবং সনাতন ধর্ম্ম ও দেবভাষার প্রতি যখন লোকের পুনর্ব্বার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন সংস্কৃতের সাহায্যে প্রচলিত ভাষাকে সবল ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ন, শ, ষ, ক্ষ, জ্ঞ, এ, ঐ, র প্রভৃতি বর্ণের ও পদের মধ্যস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব প্রভৃতির যথাযথ উচ্চারণে অসামর্থ্য অনেকের নিকট লজ্জাকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।—সুতরাং উচ্চারণগত শৈথিল্য দূর করিবার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। ফলে প্রচলিত ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে গৃহীত হইল; অনেক অপভ্রষ্ট শব্দের উচ্চারণগত দৌর্ব্বল্যও যথাসম্ভব দূরীভূত হইল।

প্রাকৃত ও অপভ্রষ্ট ভাষার এই সংশোধন বা দৌর্ব্বল্য-নিবারণের চেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, সেরূপ বোধ হয় ভারতের আর কুত্রাপি করে নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তা চিরপ্রসিদ্ধ। সেই কারণে তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চারণ-দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এখনও এই দৌর্ব্বল্য হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ক্ষ, জ্ঞ, হ্য, স্ব প্রভৃতি যুক্তাক্ষরসমূহের উচ্চারণে তাঁহাদিগের অদ্যাপি নানাপ্রকারেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা 'স্বদেশী' পদটিকে বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে উহা 'শ্বদেশী'তে পরিণত হয়, দেখিয়াছি। তখন 'স্বজন: শ্বজনো মাভূৎ' ইত্যাদি কবিতাটি স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। সুরাতের প্রাদেশিক সম্মিলন (কন্‌ফারেন্স) কালে দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা 'স্বদেশী'কে 'শবদেশী' করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বদেশীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া 'গুজরস্যাস্য দোষেণ শিরোঽপি শবতাং ব্রজেৎ'—ইত্যাদি উদ্ভট শ্লোক আমার মনে পড়িল। এ সকল কথা পরনিন্দা বা আত্ম-প্রশংসার উদ্দেশে এখানে প্রকাশ করিতেছি না। এই সকল উচ্চারণ-দৌর্ব্বল্যের সংশোধনে যাহাতে সকলের মনোযোগ হয়, তদুদ্দেশ্যেই এ সকল কথা বলিতেছি। ফল কথা, প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া, মারাঠী ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় সুস্পষ্ট ও অশিথিল উচ্চারণ-পদ্ধতি স্বীকার করিয়াছে। প্রচলিত মারাঠীর ইহাই একটি প্রধান বিশেষত্ব।

প্রচলিত মারাঠীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব,—সমাস-বিষয়ক। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃতের অনুকরণে বড় বড় সমাসের প্রয়োগ দেখিতে পাই। প্রাচীন মহারাষ্ট্র হইতে যখন আধুনিক মারাঠীর উৎপত্তি হয়, তখন সমাসগুলিকে ভাষা হইতে একেবারেই বিদায় দান করা

হয়। কথা প্রাকৃতিক ভাষাতে হয় ত সেকালে সমাস ছিল না; কিন্তু তখন লিখিত মারাঠী বা গদ্য সাহিত্যের ভাষাতেও সমাসের বিরলতা দেখিতে পাওয়া যায়। সমাসের বাহুল্য অনেক স্থলেই ভাষার শক্তিহরণে সহায়তা করে। সমাস ত্যাগ করায় মারাঠীর শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। মারাঠী ভাষার তৃতীয় বিশেষত্ব,—প্রত্যয়-মূলক। যে সকল মারাঠী শব্দ প্রকৃত প্রাকৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে, সে সকল শব্দেও মহারাষ্ট্রীয়েরা অভিনব প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত শব্দেরও যে সকল অপভ্রংশ মহারাষ্ট্রে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন প্রাকৃতের ন্যায় কোমল ও শিথিল নহে। অপিচ, ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ স্বীকার করায় বর্ত্তমান মারাঠী ভাষার সৌষ্ঠব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে মনীষী বীম্‌সের নিম্নলিখিত মন্তব্যে সকলের মনোযোগ আবশ্যক।

It (Marathi) is a copious and beautiful language second only to Hindi. In fact, if we were to institute a parallel in this respect, we might appropriately describe Hindi as the English and Marathi as the German of Median group, Hindi having set aside whatever could be dispensed with, Marathi having retained whatever has been spared by the action of time. To an Englishman Hindi commends itself by the absence of form and the positional structure of sentences, resulting therefrom; to our High German cousins, the Marathi with its fuller array of genders, terminations and inflexions would probably seem the completer and finer language.

বর্ত্তমান মারাঠীতে যে সকল নূতন প্রত্যয়ের ও শব্দের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। মারাঠী প্রত্যয়ের সহিত দ্রাবিড় ভাষার কোনও সংস্রব নাই। ভাষাকে শক্তিদান করিবার জন্য সংস্কৃত হইতে অসংখ্য শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে 'তৎসম' শব্দ বলে। প্রাকৃত হইতে আগত শব্দসমূহকে 'তদ্ভব' বলা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'তদ্ভব' শব্দের পক্ষপাতী; 'তৎসম' শব্দের সমাবেশকে তাঁহারা কৃত্রিম ভাষা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের নিকট মারাঠী ভাষার সকল শব্দই সমান সমাদরের সামগ্রী। সে যাহা হউক, এইরূপে যে অভিনব মারাঠী ভাষার উৎপত্তি হইল, তাহা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে জ্ঞানেশ্বর এই মারাঠী ভাষায় গীতার ব্যাখ্যামূলক একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া মারাঠী ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন। জ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মারাঠী ভাষাকে দুর্গের ন্যায় আশ্রয় দান করিয়াছিল। সেই আশ্রয় লাভ করিয়া মুসলমান আমলে মারাঠী ভাষা আপনার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সে সময়ে কতিপয় বৈদেশিক শব্দ মারাঠীতে লব্ধপ্রবেশ হয় সত্য; কিন্তু তাহাতে উহার মূল ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। নামদেব নামক এক জন শূদ্র কবি জ্ঞানেশ্বরের সময়েই মহারাষ্ট্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল কবিতা অদ্যাপি শিখদিগের পূজনীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে গ্রথিত দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিস্তারের সহিত মারাঠী ভাষা গুজরাথ, আহম্মদাবাদ, বরোদা, ইন্দোর, সাগর, গোয়ালিয়র, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে প্রবেশলাভ করে। ইহার ফলে, মারাঠী ভাষার ভাব-প্রকাশ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুকারাম যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহাতে 'তৎসম' শব্দের অনুপাত শতকরা ৫০ অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় পরবর্ত্তী কবিগণ উত্তরোত্তর অধিক-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়া মারাঠী সাহিত্যের ভাষাকে সংস্কৃতবহুল করিয়া তুলেন। বলা বাহুল্য. মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্য-বিস্তারের সহিত দেশে যে সংস্কৃতচর্চ্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই ফলে এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন ইংরাজেরা রাজনীতিক প্রয়োজনে, স্বধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশে ও স্বাভাবিক জ্ঞানানুরাগবশে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশীর পক্ষে অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন কোনও ভাষা শিক্ষা করা সম্ভবপর নহে। অতএব ইংরাজদিগের চেষ্টায় প্রথমে মারাঠী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মোলস্‌ওয়ার্থ দেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে মারাঠী ইংরাজী অভিধানের সংকলন করেন। ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান অদ্যাপি ভারতীয় কোনও প্রাদেশিক ভাষাতেই রচিত হয় নাই। এই সময়ে যে মারাঠী ব্যাকরণ রচিত হয়, তাহা ইংরাজদিগের জন্য ইংরাজী ব্যাকরণের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি অনেকে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণ লিখিতেছেন। কিন্তু মারাঠী ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশীয় ভাবে একখানি মারাঠী ব্যাকরণ রচনা না করিলে, তাহা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। মহারাষ্ট্র দেশে এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয়। রাজাশ্রয় ভিন্ন এ সকল কার্য্য সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে বীম্‌স্, হর্ণলে, কুণো, গ্রীয়ারসন্ প্রভৃতি মহোদয়েরা ভারতীয় ভাষা-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বহু তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের রচনায় ভুল ভ্রান্তির সম্ভাব থাকিলেও, উহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আমরা শিক্ষা করিতে পারি।

নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বর্ত্তমান মারাঠী সাহিত্য বিস্তারবাহুল্যে, সারবত্তায় ও গাম্ভীর্য্যে এক বাঙ্গালা সাহিত্য ভিন্ন ভারতের আর কোনও প্রাদেশিক সাহিত্য অপেক্ষা হীন নহে। এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। মারাঠী ভাষা কোনও অংশে অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা অপেক্ষাই ভাবপ্রকাশসামর্থ্যে হীন নহে। এ কথা যাঁহারা এই ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় রাখেন, তাঁহাদিগকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং মহা-রাষ্ট্রবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনাদের মাতৃভাষার সেবায় অধিকতর মনোযোগী হইলে, মহা-রাষ্ট্রীয় সাহিত্য ভারতীয় কোনও সাহিত্য অপেক্ষা কোনও বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকিবে না। এ বিষয়ে শ্রীমান্ মহারাজ সয়াজীরাও গায়কোয়াড় মহোদয়ের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ভূপতি সাহিত্য-সেবীদিগকে উৎসাহ দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বঙ্গ-পরিচয়।

বঙ্গভূমি তাহার বিচিত্র পুরাতত্ত্বের অভ্রান্ত নিদর্শনগুলি বুকের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়া, সর্ব্বাঙ্গে এক আধুনিকতার আবরণ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। সেই আবরণ ভেদ করিয়া, সেকালের বঙ্গভূমির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে না পারিলে, তাহার ইতিহাস সংকলিত হইবার আশা নাই।

বঙ্গভূমির সঙ্গে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংস্রব যতই অধিক হউক না কেন, তাহার সহিত ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দিগ্দেশের সংস্রব নিতান্ত অল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বরং ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গভূমির সহিত প্রাচ্য ও উদীচ্য ভূখণ্ডের সংস্রব কোনও কোনও বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। সুতরাং একমাত্র বঙ্গভূমির সুপরিচিত চতুঃসীমার মধ্যে কোটরাবদ্ধ থাকিয়া, বঙ্গভূমির বিচিত্র ইতিহাসের উপকরণ-সংকলনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা যেন অনাদিকাল হইতে বঙ্গভূমির ইতিহাসের মূলসূত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিয়াছে! আর্য্যাবর্ত্তের স্থিতিশীল বিধিব্যবস্থা তজ্জন্যই বঙ্গভূমিতে আসিয়া, গতিশীল হইয়া, স্থান কাল পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। ভাবের ও কর্ম্মের সমন্বয়-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। এই সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইয়াছে, ততই জাতি, ধর্ম্ম ও লোকাচার তদুপযোগী প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাত্মক চাতুর্ব্বর্ণ্যের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সুপরিচিত "স্বধর্ম্ম" কোনও কালেই যে যথাশাস্ত্র প্রতিপালিত হইয়াছে, সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বঙ্গভূমির আর্য্য-সমাজ অনার্য্যসমাজকেও যথাসাধ্য আত্মসাৎ করিতে ক্রটী করে নাই।

এখানে মানুষ অপেক্ষা মাটীর প্রভাব কিছু অধিক। এখন ভারতবর্ষের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্নভাষাভাষী ঔপনিবেশিকগণ বিদেশে গিয়া যেমন ভাষা ও ধর্ম্মের পার্থক্য সত্ত্বেও, এক পরিবারের ন্যায় এক সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে, নানা বিষয়ে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর সমাজ-গঠনে ব্যাপৃত হইয়াছেন, সেকালে যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গভূমিতে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল

বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিবার সময়ে যাহা ছিলেন, আসিবার পরে তাহা থাকিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার মাটী ও বাঙ্গালার জল তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী করিয়া তুলিতে না তুলিতে, তাঁহারা আর্য্য-অনার্য্য-সংকুল এক নূতন দেশের নূতন সমাজ গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ইতিহাস তাহারই ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস সেই সমাজের কর্ম্মভূমির ইতিহাস।

এই স্বাতন্ত্র্যলোলুপ প্রাচ্য সমাজকে পুনঃপুনঃ আর্য্যাবর্ত্তের আদিসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিবার আয়োজনের ক্রটী হয় নাই; কিন্তু মাটীর গুণে সে আয়োজন পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যাহারা এ দেশের জনসাধারণ, তাহারা যেমন স্বতন্ত্র, সেইরূপ স্বতন্ত্রই রহিয়া গিয়াছে; বরং যাঁহারা তাহাদিগকে পরতন্ত্র করিয়া আর্য্যাচারী করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারও নানা বিষয়ে আদিসমাজের বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে বহুযুগের ভাবকর্ম্মের বিচিত্র সমন্বয়-সাধনের প্রবল প্রভাবে যে দেশের লোক প্রাচ্য ভারতে এক নবরাজ্য-সংস্থাপনে ব্যাপৃত ছিল, কেবল পুরাতন শাস্ত্রবচন ধরিয়া তাহাদের ইতিহাস-সংকলনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রবচন যখন সমুদ্র-যাত্রার প্রবল প্রতিবাদ-প্রচারে সম্পূর্ণ অবসরশূন্য, তখন বাঙ্গালী সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে দ্বীপোপদ্বীপে বাণিজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তীহস্তে প্রধাবিত। শাস্ত্রবচন যখন পুরাতন ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের অকৃত্রিম নিদানস্বরূপ যাগ-যজ্ঞাদির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বাঙ্গালী তখন আর্য্য অনার্য্যের সমন্বয়-সাধনোপযোগী বিবিধ মূর্ত্তিপূজার আড়ম্বরপ্রচারে ঢক্কানিনাদ করিতে ব্যতিব্যস্ত।

বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার ও শিক্ষা দীক্ষা লোকতন্ত্রের সকল স্তরেই স্বাতন্ত্র্যের ছায়ামূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালীকে জানিতে হইলে, গ্রন্থকীট হইলেই, সকল তত্ত্ব জানিয়া চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালীকে জানিতে হইলে, গ্রন্থ ছাড়িয়া, লোক-তন্ত্রের মূল তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের অকৃত্রিম উপকরণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সে উপকরণ দূরে নহে,—নিকটে। তাহা' সংকলিত করিবার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা এখনও ভাল করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

পরম্পরাগত চিরসংস্কার যেমন নানা তত্ত্বের সন্ধান প্রধান করিয়া থাকে, আবার সেইরূপ তাহা অনেক বিষয়ে সত্যানুসন্ধানের প্রবল অন্তরায়রূপেও দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বঙ্গভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত ও বঙ্গসমাজকে আর্য্য-সমাজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উপযোগী দুই চারিটি বচন সংগৃহীত করা কঠিন নহে; পরম্পরাগত চিরসংস্কারও তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ও বঙ্গসমাজ আর্য্যসমাজ হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র দেশ ও স্বতন্ত্র সমাজ রূপেই ইতিহাসে আত্মকাহিনী অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছে;—কোনও কালেই অন্ধবৎ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যাবর্ত্তের ও আ্যর্যসমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাই।

যাঁহারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অধিক ছিলেন না। এ দেশে আসিয়া "শনকৈস্ত ক্রিয়া-লোপাৎ" তাঁহারা "ব্রাত্য" হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ আর্য্যভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষায় কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কেহ কেহ আবার "ম্লেচ্ছবাচঃ" বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ হইবার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। আর্য্য অনার্য্যের প্রথম সংঘর্ষকালে প্রাচ্য ভারতে এইরূপে যে বিচিত্র সংমিশ্রণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা হইতেই কালক্রমে সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে। সেই প্রয়োজন হইতে পৃথক্ ভাষা—পৃথক্ আচার ব্যবহার। বহুসংখ্যক অনার্য্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক আর্য্যবীরের পক্ষে জ্ঞানবলে, কৌশলবলে যন্ত্রবলে, বা সুপরিচালিত বাহুবলে বিজয়-রাজ্য সংস্থাপিত করা সম্ভব হইলেও, বিজিত সমাজের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হইতে পারে না। বরং সেরূপ ক্ষেত্রে বিজেতার পক্ষে আপন ভাষা ও আচার ব্যবহারের পূর্ব্বতন বিশুদ্ধি রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে পরিমাণে নবরাজ্য সুগঠিত করিবার জন্য ভাষা ও লোক-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হয়। বাঙ্গালীর লোক-ব্যবহার এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আরম্ভ কোন্ পুরাতন যুগে, তাহার সীমানির্দ্দেশের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যসমাজের কেন্দ্রস্থলে তাহার মূল প্রস্রবণ নিহিত হইলেও, বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে তাহার সহিত নানা নদ নদীর সলিলসম্ভার মিলিত হইয়া তাহাকে কূলপ্লাবিনী প্রবল বন্যার ন্যায় শক্তিশালী

করিয়া তুলিয়াছে। ভাগীরথীকে বুঝিতে হইলে, কেবল গঙ্গোত্রীর ক্ষীণ ধারা ধরিয়া সকল তথ্য লাভ করিবার আশা নাই। বাঙ্গালীকে জানিতে হইলেও, কেবল আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যসমাজ ধরিয়া সকল কথা জানিয়া শেষ করিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পিয়াসী।

১

শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান মানস-সরোবর, পৌরাণিক যুগের গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। ইহার উত্তরে তিন শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সহস্র-সরোবরপূর্ণ সুরম্য গিরিপ্রদেশ। পশ্চিমে কাশ্মীর, উত্তরভাগে কুয়েনলাং, পূর্ব্ব দিকে তিব্বত, এবং দক্ষিণ বেষ্টন করিয়া অভ্রভেদী হিমালয়। মানস-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় বিংশতি ক্রোশ ব্যবধানে বদরিকাশ্রম ও নন্দাদেবী, হিমালয়ের অত্যুচ্চ যুগল শৃঙ্গ। তাহার দক্ষিণে আলমোড়া ও পশ্চিমভাগে গাড়ওয়াল।

এই রমণীয় প্রদেশ পূর্ব্বকালে লিচ্ছবি জাতির আবাসভূমি ছিল। এখনও তাঁহাদিগের চিহ্ন পাওয়া যায়।

লিচ্ছবিগণ গন্ধর্ব্ববংশ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে কখনও ম্লেচ্ছ ও কখনও ব্রাত্যক্ষত্রিয় অভিধানে অভিহিত করিতেন। লিচ্ছবিগণ শৈব ; এবং সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় কুশল।

শৈশব হইতেই লিচ্ছবি কুমার ও কুমারীগণ গিরি-উপত্যকায়, অরণ্যে ও সরসীতটে দলবদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় ছুটাছুটি করিত। বড় হইলে গান করিত, নাচিত, এবং প্রভাতে ও দিনাবসানে বৃক্ষবল্কলে চিত্র আঁকিত।

প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে লিচ্ছবি বীরগণ গাড়ওয়াল পার হইয়া মিথিলা ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া করস্থ করিয়াছিলেন। ৪৮৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মগধরাজ অজাতশত্রু তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া শিশুনাগ-বংশের জয়ধ্বজা বিস্তার করেন।

তাহার পর ক্রমান্বয়ে মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কণ্ব বংশের নরপতিগণ মগধে রাজত্ব করেন।

এই সকল বংশের অবসানে ও উত্তরপশ্চিমস্থ তুরস্ক কুশান রাজ্যের শেষ দশায়, পুনরায় লিচ্ছবিগণ উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া মগধ রাজ্যের উত্তর সীমা সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে লিচ্ছবি-রাজ বীরকর্ণ পাটলিপুত্র রাজধানী অধিকার পূর্ব্বক অপ্রতিহতভাবে উত্তরখণ্ড শাসন করিতেছিলেন। তখনও পুরাতন মগধ-বংশের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। বিহার ও তাহার পশ্চিমস্থ প্রদেশ সকল বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া 'সর্দ্দার'-গণের অধীন ছিল। ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়।

এই সর্দ্দারগণ কখনও লিচ্ছবি রাজকে কর দিতেন না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষণের সূত্রপাত হইতেছিল।

২

লুনা মানস সরোবরের তটে বসিয়া ছিল; আদিত্য তাহার চিত্র আঁকিতেছিল। সরোবরের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে কর্দ্দম নামক গ্রামে তাহাদিগের বাস।

বেলা যায়। চক্রবাকমিথুন উড়িয়া গেল। হংস মৃণাল-বন হইতে বাহিরে আসিল। আদিত্যের প্রকাণ্ড তিব্বতীয় কুক্কুর লাঙ্গুল আন্দোলন করিয়া লুনার হরিণশিশুকে স্নেহসম্ভাষণ করিল। আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র চঞ্চল মেঘ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ভাসিয়া যাইতেছিল।

লুনা বলিল, "আদিত্য, ঝড় বহিবে, চল, বাড়ী যাই।"

আদিত্য। ঝড় দু' দিকেই বহিবে, জীবনের অন্তরে ও জীবনের বাহিরে। তাহার কারণ জান লুনা?

লুনা। না।

আদিত্য। আমাদিগের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ দেশ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; সেই ভারতবর্ষের এক অংশ আর্য্যাবর্ত্ত, এবং সেই আর্য্যাবর্ত্তের এক অংশ মগধ। তোমার পিতা মগধের অধীশ্বর।

লুনা। আমরা সেখানে যাই না কেন?

আদিত্য। লিচ্ছবি-বংশের কুমারকুমারীগণ মানস-সরোবরেই দীক্ষালাভ করে। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হন না। বিবাহের পূর্ব্বে কোনও রাজকন্যা মগধে যায় নাই।

লুনা। আমরা যদি গিয়া আবার ফিরিয়া আসি?

আদিত্য। তাহা বিপদসঙ্কুল। অতি দুর্গম পথ দিয়া যাইতে হয়।

অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। তাহার সহিত মানসিক পরিবর্ত্তন খুব সম্ভব।

লুনা 'মানসিক' পরিবর্ত্তনের ভাবটা বুঝিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

"কিন্তু ঝড়ের কথা কি বলিতেছিলে আদিত্য ?"

আদিত্য। লুনা! বোধ হয় তোমাকে শীঘ্রই মগধে যাইতে হইবে। কর্ণরাজ ক্ষত্রিয় সর্দ্দারগণকে লইয়া বিব্রত হইয়াছেন। অতি শীঘ্রই যুদ্ধের সম্ভবানা।

লুনার মুখ গম্ভীর হইল।

"তুমি সঙ্গে যাইবে ত আদিত্য ?"

আদিত্য। আমি নিশ্চয় যাইব। কিন্তু আমাদিগের যাইতে বিলম্ব হইবে। আমাকে প্রথমতঃ সেনা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনা সংগ্রহ করিতে এক মাস কাটিবে। তাহার পর তোমাকে লইয়া যাইব। তাই আমি কিছু দিনের জন্য বিদায় লইতে আসিয়াছি। কিন্তু দেখ, লুনা! মানস-সরোবরে বৈশাখ মাসে কখনও কেহ মেঘের সঞ্চার সচরাচর দেখিতে পায় না। উহা জাতীয় জীবনের অবসানের লক্ষণ।

লুনা। তবে কি শীঘ্রই ঝড় বহিবে।

আদিত্য। শীঘ্র না হউক, অধিক দেরী নাই। তাই তোমার একখানি ছবি টানিয়া লইতেছি।

লুনা। আদিত্য! তোমার একখানা ছবি আমি টানিব। তুমি কাল আবার এখানে আসিয়া বসিও। আমি এখন বেশ আঁকিতে পারি।

আদিত্য। আমি বসিতে পারিব না। লুনা! যদি আমাকে মনে থাকে, তবে মন হইতেই ত আমার ছবি আঁকিতে পারিবে।

লুনা। যদি ঠিক না হয় ?

আদিত্য। অন্ততঃ বুঝিতে পারিব, তোমার কতখানি মনে আছে। আঁকিবে ত ?

কুমার আদিত্যসিংহ একবার সতৃষ্ণভাবে লুনার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। লুনা ভাবিয়াছিল, যাইবার সময় আদিত্যকে ভাল করিয়া দেখিবে। কিন্তু তাহা হইল না। আদিত্য উত্তর চাহিল না।

তাহার পর একখানি ক্ষুদ্র তরণী সরোবরের প্রান্তে আসিয়া লাগিল।

মানস-সরোবর হইতে কর্দ্দম গ্রাম পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়া অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছিল। সেই নির্ঝরিণীর নাম 'অলকা'। বহু খণ্ড-শৈল নির্ঝরিণীর মধ্যে বর্ষাকালে আসিয়া পড়াতে সে স্থানটা খালের মত হইয়াছিল। খাল বহিয়া অনুচরগণ লুনাকে রাজবাটীতে লইয়া গেল। রাজবাটী একটি প্রস্তরস্তূপমাত্র। খানিকটা দুর্গের ন্যায়, খানিকটা ভগ্ন প্রাসাদ।

কুমার আদিত্য লিচ্ছবিগণের অন্যতর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সপ্ত ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখে তাঁহার বাসস্থান।

আদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায় লুনা বিষম স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে আদিত্য লুনাকে বলিয়াছিল,—"তুমি আমাকে আর 'ভাই আদিত্য' বলিও না।"

কিন্তু লুনা যে তাহা সম্পূর্ণ বুঝে নাই, তাহা আদিত্য জানিত। নচেৎ ঝড়ের কথা বলিত না।

মেঘের উপর বহু মেঘ চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন ঝড় বহিল না।

৩

তাহার এক সপ্তাহ পরে ঝড় বহিল। সে প্রকার ঝড় সে অঞ্চলে অনেক দিন বহে নাই। ধবলগিরি পার হইয়া হিমালয়ের উত্তরে কখনও ঝড় বহে না। মধ্যে মধ্যে নিম্ন ভূমিতে ঘূর্ণিবায়ু বহে। এবার তাহা বিষমভাবে বহিল।

নিদাঘ। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহা ছোট ছোট খাল ভাসাইয়া নিম্নভূমির কুটীর সকল আক্রমণ করিল। মানস সরোবর উদ্বেলিত হইয়া উভয় তট জলাকীর্ণ করিল। খালের সহিত সরোবর মিশিয়া সমুদ্রের আকারে পরিণত হইল। বহুতর বিশাল বৃক্ষ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া বহু দূরে ভাসিয়া গেল।

নৃত্যগীত বন্ধ হইল।

সাত দিন ধরিয়া লুনা দরিদ্র প্রজার কুটীর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। রাজবাটীর অনুচর ও রাজপুত্রগণ লুনার উদ্যমে উৎসাহিত হইয়া যোগ দিল। আহতের শুশ্রূষা, গৃহহীনের জন্য নূতন কুটীর-নির্ম্মাণ, মৃতের সৎকার ও শোকার্ত্তের সান্ত্বনায় সকলে রত হইল।

মধ্যাহ্নের খরতর সূর্য্যে ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া লুনা শিবালয়ে

গিয়াছিল। গিরিশ্রেণীর কিঞ্চিৎ উন্নত প্রদেশে শিবালয় সংস্থাপিত। মন্দির জনশূন্য। শেষ সোপানের অনতিদূরে এক জন সন্ন্যাসীর মৃতপ্রায় দেহ পড়িয়া ছিল।

বিশল্যকরণীর দুইটি লতা হস্তে লইয়া লুনা সন্ন্যাসীর নাসিকায় ধরিল। সন্ন্যাসীর জীবন যায় নাই।

সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ। নিশ্চয়ই লিচ্ছবি নহে। অতিমসৃণ কেশগুচ্ছ ভূর্জপত্রের সহযোগে বদ্ধ;—তাহাই জটায় পরিণত হইয়াছে। উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, উজ্জ্বল ঈষৎ-শ্যাম বর্ণ, তেজঃপূর্ণ সুন্দর মুখের উপর মুদিত নয়ন। পরিধানে বল্কল।

কোমল করতলে বিশল্যকরণীর লতা মর্দ্দন করিয়া, লুনা তাহার রস সন্ন্যাসীর অধরে সেচন করিল।

অঙ্গুলির সংস্পর্শে সন্ন্যাসীর ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। দেবলোকপূজিত বিশল্যকরণীর অদ্ভুত প্রভাব লক্ষিত হইল। সন্ন্যাসীর চক্ষু উন্মীলিত হইল। জ্যোতিহীন নয়নে জ্যোতি আসিল। সেই জ্যোতি বাহিয়া জীবনের গভীর কৃতজ্ঞতা লুনার করুণার প্রতিদান করিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিল,—"জীবনের স্বামী! তুমি অপ্সরার বেশে কেন? আমি তোমাকে যে বেশে দেখিতে চাহি, সেই রূপ ধরিয়া সম্মুখে এস। তুমি দুইবার অপ্সরারবেশে স্বপ্নে দেখা দিয়াছ, ইহার অর্থ কি? আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার এত সাধ কেন?"

লুনা নিকটে আসিয়া কহিল, "আপনার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই।"

তবে কি সত্য সত্যই মানবী? সন্ন্যাসীর মুখ শুষ্ক হইল। সন্ন্যাসী অতিকষ্টে বলিল। "আমি পিয়াসী।"

লুনা জল লইয়া মুখে দিল। সন্ন্যাসী পান করিয়া কহিল, "আপনি আমার ব্রতভঙ্গ করিয়াছেন। আমি মানস সরোবরে তদ্‌লিঙ্গের উপাসনা করিতে বহু দূর হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু গুরুর উপদেশ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

লুনা। কি উপদেশ?

সন্ন্যাসী। আপনি প্রাণদাত্রী, সুতরাং বলিতে বাধা নাই। উপাসনাকালে নারী-দর্শন আমার নিষিদ্ধ। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া আমি উপাসনায় রত

ছিলাম। আপনি আমার উপাসনায় বাধা দিয়াছেন। সম্মুখে ঐ বিস্তীর্ণ সমুদ্র কিসের?

লুনা। উহা সমুদ্র নহে, জলপ্লাবনমাত্র।

সন্ন্যাসী। কোন্ প্রদেশের জল?

লুনা। লিচ্ছবি প্রদেশস্থ মানস সরোবরের।

সন্ন্যাসী তীব্রদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া বলিল, "মানস সরোবরের নিকট লিচ্ছবিভূমি?"

লুনা। ইহাই বীরকর্ণের ভূমি। আমি তাঁহার কন্যা। আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইয়া আমি ধর্ম্মপালন করিয়াছি মাত্র। আপনার ব্রতভঙ্গ করিতে আসি নাই। মার্জ্জনা করিবেন। আপনি এখনও সবল অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, আমি ভ্রাতাকে আপনার সেবায় পাঠাইয়া দিই।

লুনা গিরিশৈলে চরণদ্বয় ঈষৎ স্পর্শ করিয়া দ্রুতবেগে তরী আরোহণ করিল। সন্ন্যাসী দেখিল, তরী বাহিয়া লুনা চলিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর একটি প্রজাপতির ন্যায়, বহুদূরে মান সরোবরের প্রশান্ত বক্ষ ঈষৎ কাঁপাইয়া, একটি ইন্দ্রধনুর ন্যায় রেখা রাখিয়া গেল। সে রেখা বাহিরে বিলীন হইল, কিন্তু সন্ন্যাসীর অন্তরে তাহা বিলীন হইল কি?

৪

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। বিশাল জলরাশি অপসৃত হইয়াছে। মানস-সরোবরের পাষাণতট আবার সহস্র কমল বেষ্টন করিয়াছে।

ক্রোড়ে আবার হংস চক্রবাক আসিয়া বসিয়াছে। কুরঙ্গ-দলের সহিত আবার লিচ্ছবি-কুমারীগণ গিরিবত্মে ছুটিতেছে।

যেখানে আদিত্য বিদায় লইয়াছিল, লুনা সেখানে বসিয়া, আবার ছবি আঁকিতেছিল।

কিন্তু আদিত্যের মুখ মনে পড়িয়াও পড়িতেছিল না। লুনা কাঁদিল। কেন মনে পড়িল না, কুমারী তাহা জানে না। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বেশ মনে ছিল। এখন মনে নাই। বোধ হয়, মনে পড়িবে। আবার তুলিকা লইয়া লুনা বসিল। কিন্তু সে মুখ কাহারও নয়। বোধ হয় সেই সন্ন্যাসীর। বিরক্ত হইয়া লুনা মুছিয়া ফেলিল। এইরূপে দুই তিন বার মুছিয়া লুনা কাঁদিল। পরে ভয় হইল। মন যাহাকে ধরিবে, সে চিত্র নাই। লুনা জলপ্লাবন দেখিতেছিল। মৃতদেহ দেখিতেছিল।

সেই যে শৈশবের রঙ্গস্থল, তাহা সম্মুখে থাকিয়াও চিত্রে আসে না কেন? দর্পণে নবীন প্রতিবিম্ব কোথা হইতে পড়িল?

ধীরে ধীরে পথ হইতে সন্ন্যাসী লুনার নিকট আসিল। "আমি বিদায় লইতে আসিয়াছি।" লুনার হৃদয় পূর্ব্বেই কম্পিত হইয়াছিল। "আপনি কোন দেশে যাইবেন?"

সন্ন্যাসী। মগধে।

লুনা। আমার পিতা মগধের অধীশ্বর।

সন্ন্যাসী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমি সংসার-ত্যাগী। রাজ-সিংহাসনের কোন ও কথা জানি না। যাইবার সময়ে একটি কথা বলিব। আমি তোমার নিকট ঋণী, সে ঋণের প্রতিদান অসম্ভব। কিন্তু তুমি কোনও প্রতিদান না লইলে আমার সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হইবে। অতএব আমি কি দিয়া প্রতিশোধ করিব?"

লুনা প্রতিদানের কথা চিন্তা করিল। বালিকা-স্বভাব-সুলভ ভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। লুনা একটু হাসিয়া বলিল, "মগধে গিয়া প্রতিদান লইব। আপনার নাম কি?"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিল, "ইন্দ্রগুপ্ত।"

লুনা। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনার নাম 'পিয়াসী'।

সন্ন্যাসী। সমুদ্র না পাইলে সে পিয়াসা মিটিবার নহে। সেদিন মুমূর্ষু অবস্থায় বিশাল সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন সমুদ্রও আমার কল্পনায় অতি ক্ষুদ্র।

লুনা। আপনি কি জাতি?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর জাতি পরিচয় নাই।

লুনা। কিন্তু আপনার জটার নীচে শিরস্ত্রাণের চিহ্ন আছে। আপনি ক্ষত্রিয়। পিতার নিকট একটা কথা শুনিয়াছিলাম। মৌর্য্যবংশে পুরাকালে চন্দ্রগুপ্ত নামক এক জন রাজা ছিল। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী হইলেন কেন?

লুনা খুব হাসিল।

সন্ন্যাসী। এক স্থানে দুইটি রাজা কি করিয়া হয়? তোমার পিতা মগধের রাজা, অতএব—

লুনা। অতএব আপনি সন্ন্যাসী?

লুনা কথাটা ভাবিয়া দেখিল। করুণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। "সন্ন্যাসী!

রাজা হইলে যদি তুমি সুখী হও, তবে পিতাকে মগধের সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বলিব। তিনি কাহারও হৃদয়ে বেদনা দেন না। আমি প্রতিশ্রুত রহিলাম। শুনিয়াছি, তিনি বিপদাপন্ন। অনেক ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধ কেন? রক্তপাত কেন?"

লুনার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। সে আবার বলিল, "পিয়াসী! আমি তোমার নিকট কোনও প্রতিদান চাহি না; কেবল প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আমার পিতার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবে না?"

চন্দ্রগুপ্ত স্থিরনয়নে লুনার দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "কুমারী! আমি বড় ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি আমার নিকট অপূর্ব্ব। তুমি ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হইবার যোগ্যা। তুমি কিন্নরী। না, তুমি স্বর্গের দেবী। তুমি মানবী নও। তোমার সঙ্গীত শুনিয়াছি, চিত্র দেখিয়াছি, শেষে তোমার হৃদয় দেখিলাম। বোধ হয়, আত্মবিস্মৃত হইতে এখানে আসিয়াছিলাম। তোমার নাম কি?"

"লুনা।"

সন্ন্যাসী। লুনা! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ আমাকে মগধ ছাড়িতে হইবে।

লুনা। কেন?

সন্ন্যাসী। আমি মগধ-বংশের শেষ রাজপুত্র।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। গগন ধূসরবর্ণ হইল। সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া চক্রবাকমিথুন উড়িয়া গেল।

৫

লুনা ডাকিল, "পিয়াসী, আবার এস, অনেক কথা আছে, আমি বলি নাই।"

সেই মহাদুর্গম গিরিবক্ষে প্রতিধ্বনি হইল, "আমি বলি নাই।"

বালিকার সম্মুখে কি কঠিন সমস্যা! "মগধের রাজপুত্র আমার জন্য পিতৃ-সিংহাসনের আশা ছাড়িবে? কেন ছাড়িবে? কেন আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম? সে প্রতিজ্ঞা করিল কেন? আমি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই ত সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে? সে জীবনে ব্যথাই যদি থাকিল, তবে আমার তাহা রক্ষা করিয়া লাভ কি?"

সন্ধ্যাশিশিরের সহিত নয়নের অশ্রু মিশাইয়া, বালিকা অন্ধকার গিরিপথ ধরিয়া চলিল।

লুনার মাতা গৃহে বসিয়াছিলেন। লুনা কোনও কথা না কহিয়া মাতার বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

লুনার মাতা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "লুনা! তোর মনে কোনও কষ্ট হয়েছে?"

লুনা বলিল, "না। অনেক দিন বাবাকে দেখি নাই, তাই কাঁদিতেছি। মা! বাবা কি নিষ্ঠুর! আমাদের এত দিন না দেখিয়া সেখানে কি করিয়া রাজত্ব করিতেছেন?"

মাতা। লুনা, তুই আজ অমন হ'লি কেন?

লুনা। মা, মগধের সিংহাসন কি এই সিংহাসনের অপেক্ষা সুখের?

মাতা। লুনা! মানুষের জীবন কর্ম্মের চক্রে ঘুরিয়া থাকে। ঐ দেখ, আকাশের চন্দ্র কেমন হাসিতেছে, আর তুই আমার কোলে এই আঁধার ঘরে কাঁদিতেছিস।

লুনা। চাঁদ কি সত্যই হাসিতেছে?

মাতা। নয় ত সিংহাসন ছাড়িয়া তোর নিকট আসিয়া সান্ত্বনা করিত। জগতে সকলেই নির্ম্মম।

লুনা কি ভাবিয়া বলিল, "সকলে নয়।" বোধ হয় লুনা সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতেছিল।

এমন সময় দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। লুনার মাতা বলিলেন, "ছি, লুনা, কাঁদিও না; ঐ আদিত্য আসিয়াছে। আমরা কালই মগধে যাইব।"

আদিত্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গড়কর্দ্দমে আসিয়াছে। বহু সহস্র অসি চন্দ্রালোকে ঝলসিয়া শত সহস্র প্রতিবিম্বে বনস্থলী উজ্জ্বল করিতেছিল।

কিন্তু আদিত্য লুনাকে দেখিয়া উৎসাহহীন হইয়া গেল। সে লুনা কৈ? লুনা শীর্ণা, তাহার নয়নে কালিমার রেখা। স্বর্গের তারকা ম্লান। অপ্সরার রূপ আভাহীন।

লুনা আবার কাঁদিতে চাহিল, পারিল না। তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধ নিরাশা ও শোক উছলিয়া উঠিল। লুনা বলিল, "আদিত্য, বাহিরে এস।"

সেই চন্দ্রকরস্নাত ভগ্ন সৌধের এক দিকে শিলাতলে উভয়ে বসিল।

লুনা বলিল, "আদিত্য, তোমাকে একটা গল্প বলিব। তুমি রাগ করিও না। আমি অপরাধিনী।"

নতআঁখি লুনা ধীরে ধীরে হৃদয়ে হাত রাখিয়া সমগ্র কাহিনী আদিত্যকে শুনাইল। সেই জলপ্লাবন, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ, বিদায় ও প্রতিজ্ঞা, সকলই বলিল।

চন্দ্র মলিন হইয়া আসিল। গভীর নিশীথিনী। পার্ব্বতীয় বায়ুর সননে আদিত্যের গভীর নিশ্বাস লুনা শুনিতে পাইল না। বহু দিনের আশা, বহু নিশার স্বপ্ন, সমগ্র জীবনের সুখ-কল্পনা, এবং বহু উচ্চ সিংহাসন তীব্র কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন—চূর্ণ হইয়া গেল।

আদিত্য কোনও কথা কহিল না। "ইহাই কি জীব-হিংসার প্রতিফল? ইহাই কি শোণিতলালসার মূল্য?"

অনেকক্ষণ পরে আদিত্য বলিল, "লুনা, সব বলিয়াছ কি?"

লুনা। সব।

আদিত্য। হৃদয়ের কোনও কথা লুকাও নাই?

লুনা। না।

আদিত্য। আমার চিত্র কোথায়?

লুনা। তাই! চিত্র আঁকিতে পারি নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আদিত্যের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। আদিত্য হাসিল। সে হাসি নরলোকে কেহ কখনও দেখে নাই।

"লুনা! ঝড় বহিয়াছে। বহিয়া গিয়াছে। আর বহিবে না। তুমি দুঃখ করিও না। আমার উপর নির্ভর কর।"

তোরণে দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল।

৬

পাটলিপুত্র নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গার বিমল জলে বহু সৈন্যের শিবির জলচারী শ্বেতহংসের ন্যায় প্রতিবিম্বিত।

তুমুল সংগ্রামের আয়োজন হইতেছে। দক্ষিণ মগধের সপ্তবিংশতি সর্দ্দার সদলবলে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছে। কেবল সেনাপতি চন্দ্রগুপ্তের অপেক্ষা।

গঙ্গাতীরে উচ্চ প্রাসাদে লিচ্ছবিরাজ বীরকর্ণ শিবপূজা করিয়া মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইলেন। সিংহদ্বারে প্রহর বাজিয়া গেল।

মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, কুমার আদিত্য পঞ্চ সহস্র গোরক্ষ (গুরখা) ও লিচ্ছবি সৈন্য লইয়া কাশী পার হইয়াছেন। বোধ হয়,

অদ্য সন্ধ্যাকালেই উপস্থিত হইবেন। সঙ্গে মহারাণী ও রাজকুমারী লুনা দেবী আছেন।"

বীরকর্ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ মন্ত্রী, এ যুদ্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বোধ হয়, আর্য্যাবর্ত্তে লিচ্ছবি-বংশের এই শেষ আধিপত্য।"

মন্ত্রীর মুখ মলিন হইল।

"মহারাজ! আমাদিগের প্রতাপ কাহারও অবিদিত নহে। মগধ সর্দ্দারগণের সৈন্য অপেক্ষা আমাদিগের বল দ্বিগুণ; তাহার উপর সবল গোরক্ষ সৈন্য যোগদান করিবে। আপনি এত সন্দিহান হইলেন কেন?"

বীরকর্ণ হাসিলেন; বলিলেন, "মন্ত্রী! দুর্ব্বল সবলে যুদ্ধের কিছু আসে যায় না। সময় শেষ হইলে দুর্ব্বল সবলের উপর আধিপত্য করে। সকলই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমার বড় সাধ ছিল, লুনার সহিত আদিত্যের বিবাহ দিয়া মানস-সরোবরে তদ্‌লিঙ্গের উপাসনায় দিনপাত করিব। কিন্তু আজ ধ্যানে অন্য চিত্র দেখিলাম।"

মন্ত্রী। কি দেখিলেন মহারাজ?

বীরকর্ণ। তাহার অর্থ আমি বুঝি নাই। শীঘ্রই আমরা জানিতে পারিব। চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মন্ত্রী। চন্দ্রগুপ্ত নিরুদ্দেশ।

বীরকর্ণ। মগধ-রাজপুত্র নিরুদ্দেশ? ইহার কোনও অর্থ আছে। সেনাপূর্ণ শিবির হইতে কখনও সেনাপতি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকে?

মন্ত্রী। শুনিয়াছি, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে উত্তরে গিয়াছেন।

সে দিন সন্ধ্যাগগন আঁধার হইবার পূর্ব্বেই কুমার আদিত্য লুনার সহিত পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন।

বীরকর্ণ লুনাকে দেখিয়া স্মিতলোচনে বলিলেন, "লুনা, তুই কত বড় হয়েছিস্! মা, তোর চ'খে কালি পড়িয়াছে কেন?"

লুনা। বাবা, তুমি আমাদের একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ?

বীরকর্ণ লুনার ললাট চুম্বন করিয়া রাণীকে সম্ভাষণ করিলেন। কুমার আদিত্য রাজাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে গেল।

কথোপকথনে এক প্রহর কাটিয়া গেল। মন্দিরে মন্দিরে আরতিধ্বনি উত্থিত হইল।

বীরকর্ণ আদিত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "কুমার চন্দ্রগুপ্তের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইহার অর্থ জান?"

আদিত্য আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক জানি না। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এবং চম্পারণ্যে মৃগয়াকালে তাহার সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, সে মানস-সরোবরে সন্ন্যাসীর বেশে গিয়াছিল। সেখানে জলপ্লাবনে তাহার অচেতন দেহ তদ্‌লিঙ্গের মন্দির-পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হয়। রাজকুমারী তাহার জীবন রক্ষা করেন। তাহার পরে সে কোথায় গিয়াছে, তাহা শুনি নাই।"

বীরকর্ণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি তখন কোথায় ?"

আদিত্য। আমি তখন শত্রুবধার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলাম।

বীরকর্ণ কিছু না বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ছাদের উপর বিমল চন্দ্রালোক। লুনা স্থিরদৃষ্টিতে বহুদূরস্থিত সৈন্য-শিবির দেখিতেছিল।

পিতার পদশব্দ শুনিয়া লুনা চমকিয়া মুখ ফিরাইল। বীরকর্ণ ধীরে ধীরে কহিলেন, "লুনা, তোমার মনে আছে, আমি আদিত্যের নিকট প্রতিশ্রুত ?"

লুনার মুখ বিবর্ণ হইল। লুনা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "জানি।"

বীরকর্ণ। তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিবে ?

লুনা কোনও কথা কহিল না ; মুখ নত করিয়া রহিল।

বীরকর্ণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল। স্নেহময়ী কন্যাও তাহা বুঝিতে পারিল।

বীরকর্ণ। পিতৃসত্য-পালন ধর্ম্ম। আমার পুত্র সন্তান নাই। আমার সত্য কে পালন করিবে লুনা ? লুনা, আমি মগধের সিংহাসন ছাড়িয়া দিব। চল, আমরা মানস সরোবরে যাই। সেখানে তুমি আদিত্যের সহিত রাজরাণী হইয়া থাকিবে। বন্য হংস কুরঙ্গ তোমাদের নিকটে আসিবে। তোমাদের হাসি দেখিয়া আমি জীবন কাটাইব। লুনা, আমার প্রতিজ্ঞা রাখিবে ?

লুনা সদর্পে পিতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া বলিল, "তুমি দেবতা, ধর্ম্ম ও সত্য। বাবা ! তোমার কি সন্দেহ হইয়াছিল ? জীবন কোন ছার, কামনা কোন ছার ? এই মায়াময় সংসারে উভয়ই বিসর্জ্জন করিব। বাবা ! তোমার আজ্ঞা মস্তকে রাখিলাম।"

সেই নিশাকালেই রাজদূত মগধ-শিবিরে গিয়া রাজার ইচ্ছা নিবেদন করিল। বিনাযুদ্ধে বীরকর্ণ মগধের সিংহাসন কল্যই পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সৈন্যমণ্ডলী বিস্মিত ও নির্ব্বাক। ক্ষত্রিয় সর্দ্দারগণ শিরস্ত্রাণ মস্তক হইতে মুক্ত করিয়া নদীতটে জগতের বিচিত্র গতির কথা ভাবিতে লাগিল।

৭

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই এক জন সন্ন্যাসী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাররক্ষক জানাইল, "মগধ শিবির হইতে দূত আসিয়াছে।"

চন্দ্রগুপ্ত বীরকর্ণকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ভগ্নদূত।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, চন্দ্রগুপ্ত! সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ তোমাকে ঢাকিতে পারে নাই। আজ হইতে তুমি মগধের অধীশ্বর। কল্য তোমার রাজ্যাভিষেক!"

চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ, আপনার আজ্ঞাই যে শিরোধার্য্য, তাহা নহে; জগতের ঘটনা ঈশ্বর-প্রণোদিত। ক্ষত্রিয় সর্দ্দারগণের অভিমত যে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে কর দিবেন। যে রাজসিংহাসনের প্রার্থী ছিল, সে আপনার সম্মুখীন সন্ন্যাসী। আমি আজ আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়িয়া চলিলাম। অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।

চন্দ্রগুপ্ত দ্রুতপদে বাহিরে গেলেন। বোধ হয় মনে, কোনও সাধ ছিল। যে বাসনা জীবকে সৃষ্টি-সূত্রে জন্ম জন্ম গ্রথিত করে, সেই বাসনা আজ সন্ন্যাসীর হৃদয় আলোড়িত করিল।

প্রাসাদের উপর এক পার্শ্বে জীর্ণা শীর্ণা একটি বালিকা সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছিল। আলুলায়িত কেশে মলিন চন্দ্ররশ্মি প্রতিভাত। জগতের সুখ দুঃখ হইতে বহু দূরে। জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয়ের একমাত্র চিত্রের প্রতি বিনতা।

চন্দ্রগুপ্ত দাঁড়াইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কাহার শীতল হস্ত তাঁহার স্কন্ধস্পর্শ করিল।

"আমি তোমার পূর্ব্বসখা আদিত্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি মগধের সিংহাসন ছাড়িবে কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত। আদিত্য! ভাই, রাজা হইয়া যদি জীবনে সুখ না থাকে, তবে সিংহাসনে লাভ কি?

আদিত্য চন্দ্রগুপ্তকে হৃদয়ের নিকট টানিয়া আনিলেন। "চন্দ্র! ঐ দেখ,

জীবনের সুখ প্রাসাদের উপর উদিত। আদিত্যের রাজ্য গিয়াছে। চন্দ্র এখন রাজা। বীরকর্ণ আজ হইতে প্রতিজ্ঞামুক্ত। লিচ্ছবি-বংশের রাজকুমারী মগধ-বংশের রাজপুত্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইবেন, ইহাই আদিনাথের অভিপ্রেত।"

আদিত্যের চক্ষে জল আসিল। "ভাই চন্দ্রগুপ্ত, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ঔরসে লুনার যে পুত্র হইবে, সে ভারতবর্ষে একচ্ছত্রে রাজত্ব করিবে; সে সঙ্গীত, চিত্র ও কাব্যে নিপুণ হইবে। তুমি লুনা হইতে সমুদ্র পাইয়াছিলে, তাহার নাম সমুদ্রগুপ্ত রাখিও। এখন বিদায়।"

কুমার আদিত্য ধীরে ধীরে উত্তরীয় বন্ধন করিলেন। তখন অন্ধকার। সেই তারকাখচিত আকাশতলে ঈষৎ-কৃষ্ণ-শুভ্র মর্ত্ত্যবাহিনী গঙ্গা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নূতন অঙ্কে বহিয়া আনিল।

চন্দ্রগুপ্ত আদিত্যের পদযুগল চুম্বন করিতে গিয়াছিলেন। তখন সে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কবিতা।

সৌন্দর্য্য-নন্দনবনে কবি-হৃদি ফুল্ল কোকনদে,
সুন্দরের রূপবাসে সুরঞ্জিতা আনন্দ-প্রতিমা!
আজ তব কি লাবণ্য! শুভ্র ভালে কি দেবী-গরিমা!
পদে পদ্মরাগপ্রভা, নীলাঞ্চল সিক্ত মৃগমদে।
মন্দারের মধুবিন্দু সুধাধারা ইন্দ্রাণীর হাসি,
ঝঙ্কারব, বজ্রবিভা, সাগরের উদ্দাম উল্লাস,—
সত্যের অক্ষয়রূপ গীতি গাথা রসের উচ্ছ্বাস
উঠে ফুটে ও লাবণ্যে কি বিচিত্র মাধুরী প্রকাশি'!
দিব্য দৃষ্টি—হাসিমুখ, দুটি রাঙ্গা লীলা-পদ্ম করে,
কুন্দ করবীর হার মন্দ মন্দ আন্দোলিত গলে!
তরলিত মুক্তমালা ঝলমল বিমুক্ত কুন্তলে,
করেতে কঙ্কণ বাজে, রাঙ্গা পায় মঞ্জীর গুঞ্জরে!
ছন্দে ছন্দে সপ্তসুরে তুলি' নিত্য অমৃত-ঝঙ্কার,
বিলাইছ মুক্তহস্তে রত্নরাজি ভাব-কল্পনার!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

দুর্ভাগ্য।

মক্কেলটির উপর আমার মায়া পড়িয়াছিল। এত করিয়াও, আইনের চক্ষে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিলাম না!

আইন পাশ করিয়া আদালতে যাওয়া আসাই করিতাম। এই আমার প্রথম মক্কেল। আইনের নথিপত্র ঘাঁটিতে এতটুকু ক্রটি করি নাই! শুধু প্রথম মক্কেল বলিয়া নহে, লোকটির মুখে-চোখে কেমন একটা যেন করুণ বেদনা মাখানো ছিল, তাই আমার চিত্ত এতটা আর্দ্র হইয়াছিল।

চুরীর অপরাধে, বিচারে, তার সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে! হায়, হতভাগ্য!

সে দিন রবিবার। জেলার বন্ধুর অনুমতি লইয়া জেলে তার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়াছিল। তার মাথার চুলের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি ডাকিলাম, "গোষ্ঠ!"

আমাকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিয়া কহিল, "রক্ষা হলো না বাবু, আমারই অদৃষ্ট!"

আমিও বুঝাইলাম, তার অদৃষ্টই বটে! নহিলে সে যে নির্দোষ, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তবে, প্রমাণের অভাব।

গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, একটা চিঠি যদি লিখিয়া দেন,—আমার বন্ধু নন্দ আমার সংসার দেখিবে। আমি বলিয়া দিতেছি।"

পকেটেই কাগজ পেন্সিল ছিল। বাহির করিলাম। গোষ্ঠ বলিতে লাগিল, আমি লিখিলাম, "নন্দ, আমার কথা, বোধ হয়, সবই শুনিয়াছ। সাত বৎসর পরে কি আর বাঁচিয়া ফিরিব? খোকাকে দেখিও, আর রাধা—তাদের কেহ নাই।"

সে বলিল, "এই চিঠিখানা আমার বাড়ীতে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই নন্দর হাতে পড়িবে। নন্দ আমায় বড় ভালবাসে।" তার পর, গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, সব কথা আপনাকে খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সেই সব কথাই দিনরাত মনে পড়িতেছে।"

আমি কহিলাম, "বল।"

গোষ্ঠ বলিতে লাগিল, "চুরি করা কাজটা ভালো নয়। এ অভ্যাস

ছাড়িব বলিয়া অনেকবার দিব্য গালিয়াছি, কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তার কিছুও যদি সে করিতে পারিত ত পৃথিবীতে এত দুঃখ-দুর্দ্দশা তাকে ভোগ করিতে হইত না। কেমন করিয়া সব ঘটিল, তাই বলিতেছি।

"অল্প বয়সেই বাপ মা হারাইয়াছি। যত্ন করিবার কেহ ছিল না, কিন্তু শাসন করিবার জন্য পাড়ার লোকও কোমর বাঁধিত। এই সকল কারণে খুবই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলাম। লেখাপড়ায় মোটে মন লাগিত না। দল বাঁধিয়া ফলফুল চুরি করা, পাখীর ছানা পাড়া, নানা রকমে সকলকে বিব্রত করাই নৈমিত্তিক কার্য্য দাঁড়াইয়াছিল। এ সকল কাজে কেমন একটা আরামও পাইতাম। রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। পরের জিনিস নষ্ট করিবার জন্য, লইবার জন্য, প্রাণটা যেন আকুল হইয়া উঠিত। থানায় নাম লিখাইলাম, দু' একবার জেলখানাও দর্শন করিলাম। নাম ও সাহস বাড়িয়া গেল।

"এমন করিয়াই দিন যাইতেছিল। কি করিতেছি, পরে কি হইবে, এ সকল ভাবিবারও অবসর ছিল না! শেষে একদিন বিবাহ হইয়া গেল। এমন লোকেরও বিবাহ হয়! আশ্চর্য্য!

"রাধা রামায়ণ-মহাভারত পড়িত, আমি বসিয়া শুনিতাম। তার কণ্ঠের স্বরটুকু কি মিষ্ট! প্রদীপের আলো তার মুখে পড়িত; একমনে সুর করিয়া বহি পড়িত; আমি তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। বহির কথা কাণেই থাকিত, মনে পৌঁছিত না।

"রাধা কাঁদিয়া-কাটিয়া একদিন পায়ে ধরিল, "চুরি ছাড়িতেই হইবে। চুরি করা পাপ, ঈশ্বর রাগ করেন!"

"পাপ, ঈশ্বর,—এত কথা বুঝিতাম না। রাধা কাঁদিবে, তাই চুরি ছাড়িব। রাধার চোখে জল পড়িবে, আর আমি—না, তখনই রাধার হাত ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'আর কখনো চুরি করিব না।'

"কখনো না! নূতন মানুষ হইব। চুরি করায় সুখই বা কি? জেলখানায় পচিয়া মরা, পাথর ভাঙ্গা, পাহারা'লার লাঠির গুঁতা—এই ত!

"খুঁজিয়া-সাধিয়া, পাটের কলে একটা চাকরীর যোগাড় করিলাম। মন দিয়া কাজ করিতাম। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতাম—রাধার কত যত্ন, কত সেবা! আমার মনে হইত, আমিই রাজা! কি সে সুখ, কি সে আনন্দ! এত সুখ সহিল না। সাহেবের নজরে পড়িয়াছিলাম, ইহাই ছিল, দলের

লোকের হিংসার কারণ। লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া আমার চাকরীটি তারা ছিনাইয়া লইল। সাহেব একদিন গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। পথের ভিখারী আবার পথে দাঁড়াইলাম। যেন একটা সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল।

"বাড়ী ফিরিয়া রাধাকে সকল কথা বলিলাম। রাধা দুঃখে-অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল! চোখের জল মুছিয়া রাধা কহিল, "কি করবে বল, সবই অদৃষ্ট!"

অদৃষ্ট? না, কখনো নয়! এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এই তার পরিণাম? আর, এই সব পাষণ্ড, রাক্ষসগুলা—দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রাগ সামলাইলাম। রাগ করিয়া লাভ কি? আক্রোশে, রাগে, আমার বুকের হাড়গুলা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাদের তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? কিছু না!

"কিন্তু, চাকরী, চাকরী চাই। নহিলে, সংসার চলিবে কিসে? ছেলেটা কাঁদিয়া অস্থির, রাধার স্বস্তি নাই, বিশ্রাম নাই। উমেদারী করিয়া, মন যোগাইয়া, দিন-রাত ফিরিলাম, কিন্তু চাকরী মিলিল না।

"ক্রমে লোকের কাছে চাকরীর জন্য উমেদারী করিতেও বিরক্তি ধরিয়া গেল। এই লোকগুলা গান গাহিয়া, গল্প করিয়া, সখ করিয়া কত অর্থ নষ্ট করিতেছে; আর আমি একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারি না। এও অদৃষ্ট!

"শেষে মাঠে-ঘাটে শুইয়া, দিন কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া রাধাকে বলিতাম, "চাকরী মিলিল না।"

"রাধা একদিন গর্জ্জাইয়া উঠিল—তারই বা দোষ কি? কত সে সহ্য করিবে?—রাধা কহিল, 'রাজ্যের লোক চাকরী করছে, পয়সা আনছে—তোমারি বেলা যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার—চাকরী মেলে না!'

"আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। 'রাধা, রাধা, তোমারি জন্য, এত কষ্ট করিতেছি—লোকের খোসামোদ করিয়া, চাকরীর ভিক্ষায়, দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছি, তবু মিলিতেছে না। কি করিব? তার জন্য সহানুভূতি নাই, সান্ত্বনা নাই, তুমিও তিরস্কার করিলে? গৃহেও কি আজ আমার জন্য একটা মিষ্ট কথা নাই, এমনি আমি লক্ষ্মীছাড়া?'

"পরদিন বাড়ী ফিরিলাম না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর ধারে আসিলাম। চারিধার নির্জ্জন। ছোট ঢেউগুলি কিনারায় আসিয়া লাগিতেছে। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, এই শান্ত নদীর জল, ডুবিয়া মরি।

কিন্তু তখনই রাধার কথা মনে পড়িয়া গেল। অমনই মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠিলাম।

"বরাবর সহরের মধ্যে আসিলাম। দত্তদের বড় বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। চারিধার তখন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, পথ রহিল না ত! ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া অস্থির, রাধার এত কষ্ট, রাগ, ভৎর্সনা, বাজারে চাকরী মিলে না। উপায় কি? যেমন করিয়া হোক, অর্থ চাই, অন্ন চাই; আবার আমি চুরী করিব।

"তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্নার আলোকে চারিধার ভরিয়া গিয়াছিল। চুরীর পক্ষে রাত্রি তত সুবিধার নহে। বড় বাড়ীর পিছন দিকে ঝোপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাঃ, দ্বার খোলা রহিয়াছে! ভগবান মুখ তুলিয়াছেন।

কি করিব? আমার দোষ কি? ভিক্ষা করিয়া অন্ন মিলে নাই, সন্ধান করিয়া চাকরী মিলে নাই, তাই ত চুরী করিতে আসিয়াছি। ছেলেটাকে বাঁচানো চাই, আর রাধা—তাদের কষ্ট। না, কে বলে চুরি করা পাপ?

"বরাবর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। দ্বার বন্ধ ছিল না। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সন্দেহ নাই। এমন সুযোগও ত মিলে না। ঘরে বাতি জ্বলিতেছে—বায়ুস্পর্শে তার আলোকরশ্মি কাঁপিতেছিল।

"নিঃশব্দে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"খাটে একটি মেয়ে ঘুমাইতেছিল—ছোট মেয়েটি। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া তার মুখের উপর পড়িয়াছিল। আমি দাঁড়াইলাম। তার মুখের পানে চাহিলাম, কি সুন্দর! কণ্ঠে একছড়া সোনার হার ছিল—লইব বলিয়া যেমন হাত বাড়াইব, অমনই আমার মনে পড়িয়া গেল, আমার ছেলের কথা—এ যেন তারি মত মুখখানি! না, না, এ হার আমি চুরি করিব না। সরিয়া আসিলাম। ঘুমাও, ঘুমাও বাছা আমার, কোনও ভয় নাই।

"বাহিরে আসিতেই একটা লোকের সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল! সে ছুটিতেছিল; আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। আমি স্থির করিলাম, নিশ্চয়, এ চোর। এ-ই দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বে কে আসিয়া সবলে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। আর, পৃষ্ঠে, কি সে বজ্রমুষ্টি! আমি ধরা পড়িলাম। লোকটি কহিল, 'বেটা চোর, চুরী করিয়া পলাইবি? দে জিনিস।'

"এতদিন চুরি করী নাই, আজও না, তবু এ কি গ্রহ? আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, 'দোহাই মহাশয়, আমি কিছু জানি না।'

'না, তুমি সাধু। ভদ্রলোকের বাড়ী, এই রাত্রে, আসিয়াছ, তুমি চোর নও। দরোয়ান!'

"রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। লাথি চড় ঘুসি—সব নীরবে সহ্য করিলাম। আমি নির্দোষ, নির্দোষ—কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করিবে?

"সকলের মুখে একই কথা,—'জিনিস বাহির কর!' কোথায় জিনিস? কি জিনিস? আমি চোর ছিলাম বটে, কিন্তু আজ আমি চুরী করি নাই! আজ আমি নিষ্কলঙ্ক।

"কেহ বিশ্বাস করিল না। খানাতল্লাসি হইল; জিনিস মিলিল না। সকলে বলিল, 'বেটা লোক দিয়ে জিনিস সরিয়েছে। দাও, পুলিসে দাও। জেলে পচিয়া মরুক্।'

পুরাণো নামের খাতিরে সহজেই আবার আমি চোর খাড়া হইলাম। দাগী চোর ঠিক করিয়া জজ সাহেব জেলের হুকুম দিল। সাত বৎসর! ও! ছেলেটি কি বাঁচিয়া থাকিবে, রাধা কি ইহা শুনিয়া একদণ্ড বাঁচিবে?"

গোষ্ঠ স্থির হইল। আমি কহিলাম, "তোমার চিঠি আমি পৌঁছাইয়া দিব। আর তোমার স্ত্রী পুত্রকে আমি দেখিব।"

"ভগবান আপনার ভাল কর্‌বেন, বাবু!" বলিয়া গোষ্ঠ আমার পায়ের ধূলা লইতে চাহিল।

আমি চিঠিখানি পকেট রাখিলাম। তখন জানালার ধার হইতে সূর্য্যের আলো সরিয়া গিয়াছিল; চারি দিক ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, ঐ ফুলটি আমাকে দিবেন?" আমার হাতে একটি গোলাপ ফুল ছিল। জেলার বন্ধু উপহার দিয়াছিলেন। আমি সেটি গোষ্ঠর হাতে দিলাম। সে তার ঘ্রাণ লইয়া কহিল, "বাঃ, বেশ গন্ধ ত!" পরে আমার হাতে দিয়া কহিল, "এটি রাধাকে দিবেন, বলিবেন,—সে ফুল ভালবাসে, তাই আমি দিয়াছি; এটি যেন সে রাখিয়া দেয়—যতদিন না আমি খালাস পাই। আর তাহাকে দেখিবেন, অন্নাভাবে যেন সে মারা না যায়।" গোষ্ঠের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

পরদিন আমি স্বয়ং গোষ্ঠের বাড়ীর উদ্দেশে চলিলাম। দ্বারে তালাবন্ধ।

পাশে মুদীর দোকানে গোষ্ঠের স্ত্রী পুত্রের সন্ধান লইলাম। মুদী কহিল, "সে কি আর আছে বাবু?"

আমি কহিলাম, "কবে মারা গেল?"

মুদী কহিল, "মরে গেলে ত ভাল ছিল বাবু! সে নন্দর সঙ্গে পরশু রাত্রে কোথা চলে গেছে। একটি ছেলে ত—সেটাকে অবধি ফেলিয়া গিয়াছে,—এমনি রাক্ষসী!"

আমি আশ্চর্য্যভাবে কহিলাম, "নন্দ?"

মুদী কহিল, "হাঁ, ঐ যে গোষ্ঠর কাছে প্রায়ই আসত।"

আমি কহিলাম, "আর ছেলেটি কোথায়?"

"ঐটুকু ছেলে, কে তাকে দেখে? মাঝেরগাঁর সনাতন বাবু অনাথ-আশ্রম খুলেছেন, সেইখানে আমি কাল তাকে রেখে এসেছি; তবু খেয়ে বাঁচবে।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ফুলটি হাতে ছিল, ফেলিয়া দিলাম না। পকেটে রাখিয়া সনাতন বাবুর অনাথ-আশ্রমের দিকে চলিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন মিশর-বাসী।

গত মার্চ্চ মাসের "মডারণ রিভিউ" পত্রে "প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন মিশরবাসী" ইতি-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক ঠিকই অনুমান করিয়াছেন যে, এককালে ভারতের হিন্দুজাতি নাইল তীরে পরিভ্রমণ করিয়া মিশরের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মিশরের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা অস্বীকার করিতেছেন বটে—অমন অনেকেই করিয়া থাকে—কিন্তু তুমি আমি রাম শ্যাম যাহা মানিব, তাহাই যে শুধু সত্য ইতিহাস, এমন কথা বলা যায় না। মিশরের ঐতিহাসিকগণ আপনাদের কাল্পনিক সত্যকে প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া এমনও বলিয়াছেন যে,—"ভারতের হিন্দু! তাহারা ত সে দিনের জাতি—তাহাদের শিক্ষাই বা কত দিনের, আর সভ্যতাই বা কত দিনের!" এরূপ উক্তি বিচার-সহ নহে। ইহার প্রত্যুত্তর দিবার কোনও আবশ্যকতাও দেখা যায় না। স্বজাতিপ্রিয়তা প্রশংসার্হ, তাহাতে সন্দেহ নাই; স্বদেশবাৎসল্য আরও প্রশংসার যোগ্য। মিশরই পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষক, ইহা বলিয়া মিশরবাসীর হৃদয়ে গৌরব জাগাইয়া তুলিতে চাও, ক্ষতি নাই;—কিন্তু এরূপ উক্তিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচার করিও না।

ডাক্তার অ্যাডল্‌ফ এরম্যান (Adolf Erman) এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা, অর্থাৎ মিশর দেশের ঐতিহাসিক তথ্যের সর্ব্বজ্ঞ মহাপণ্ডিত! ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইজিপ্ত সম্বন্ধে

উপদেশ দিয়া থাকেন। ইনি কল্পনার মানস নয়নে অবলোকন করিয়াছেন,—"পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন শীতের দীর্ঘনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন, তখন মিশরবাসিগণ বসন্তের প্রস্ফুটিত কুসুমতুল্য শোভমান ছিল।" ঐতিহাসিক থরনটনের নাম পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তিনি কিন্তু ঠিক উল্টা বলিয়াছেন। তিনি কহেন,—"যখন ইজিপ্তের পিরামিড নাইল নদতীরে নির্ম্মিত হয়, যখন ইউরোপীয় সভ্যতার লীলানিকেতন গ্রীস ও ইতালী বন্য মানবের আবাসস্থল ছিল, ভারতবর্ষ তখন সম্পদে ও সমৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল।" ডাক্তার এরম্যানের জয়জয়কার হউক। আমরা ইহাতেই সুখী যে, তিনি কহিয়াছেন যে, তাঁহার অনুমানকে সত্য বলিয়া সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে, এবং চিরকালই থাকিবে! তা থাকুক, তবুও ত কল্পনা আছে— এবং "ঐতিহাসিকদিগের পৃথিবীর ইতিহাস" (Historians' History of the World) নামক মহাগ্রন্থও বিরচিত হইয়া বহুমূল্যে সোনার দরে বাজারে বিক্রীত হইয়া আমাদেরই ঘরে ঘরে এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করিতেছে! আর তাহার ভাষায় কহিতেছে, —পুত্র যেমন পিতৃপুরুষের গৌরব ও সমৃদ্ধি স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, মিশরের প্রাচীনত্বের দিকে চাহিলেও সকলেরই হৃদয়ে সেই ভাবের উদয় হইয়া থাকে! আর আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতেছি, আমাদের প্রত্যেক শিল্পকলা, প্রত্যেক বাণিজ্য ব্যবসায়— ইহাদের অঙ্গে অঙ্গে মিশরের মোহর ছেপ্ত করা। ডাক্তারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা অন্যত্র সত্যের অনুসন্ধান করিব।

যদিও মিশরীয় প্রবাদপ্রসঙ্গ কহিতেছে যে, মিশরের প্রাচীন অধিবাসিগণ দেবতা ছিলেন— কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে এই সত্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক যুগের মিশরীয়দিগের হৃদয়ে আফ্রিকার ও এসিয়ার জাতিবিশেষের শোণিত প্রবাহিত ছিল। আবার হিরেনের (Heeren) ন্যায় সুদক্ষ লেখক দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, বিচার করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, মিশরীয়দিগের মস্তকাস্থি অনেকাংশে ভারতীয় জাতিসমূহের মস্তকাস্থির তুল্য। তিনি মনে করেন, মিশরীয়গণ ভারতবর্ষীয়ের সন্তান।

ইজিপ্তের ইতিহাস কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। তাহার অন্তরালে যে সত্য বিরাজ করিতেছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতিতে মিশরে ও প্রাচীন হিন্দু ভারতবর্ষে অনেক সাদৃশ্য ছিল। এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে "প্রাচীন মিশর" ইতিশীর্ষক কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মিশরের ইতিহাস-রচনায় কল্পনার সাহায্য না লইলে চলিবার উপায় নাই। অবিনাশ বাবু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ পঞ্চনদ-বিধৌত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রাচীন মিশর জয় করিয়াছিলেন, এবং তথায় উপনিবেশসংস্থাপনপূর্ব্বক তদ্দেশবাসীদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই সংস্কৃতের "মিশ্র জাতি"; তাঁহাদের দেশই "মিশ্র দেশ"; এবং তাহা হইতে "মিশর" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ "মিশ্র দেশে" রাজত্ব করিতেন। ঐদেশের প্রথম নরপতি মেনেস্ সম্ভবতঃ আমাদের বৃদ্ধ মনু।

ভারতবর্ষীয়গণ চিরদিনই এরূপ ছিল না। টাসিটাস্, প্লিনি, ফাহিয়ান, হোয়েনছ্-সঙ্গ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের গুণপণার প্রশংসা করিয়াছেন। খ্রীষ্ট চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত এক জন মিশরীয় কবি কহিয়া গিয়াছেন.—ভারতবর্ষীয়গণ স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা জলযুদ্ধেই সমধিক কুশলী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যে মলয়, শ্যাম, কাম্বোদিয়া ও ভারত-দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা কবি-কল্পনা নহে। তাঁহারা যে সুমাত্রা, যাবা, বোর্ণিও ও বালি প্রদেশে উপ-নিবেশ-স্থাপন, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাও উপকথা নহে। তাঁহারা যে সুদূর ভল্গা-তীরে, অষ্ট্রাখানে, টার্কিস্থানে, মির্দিয়া, সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, এমন কি, আফ্রিকার পূর্ব্ব সীমান্তে স্থিত সকোত্রায় পর্য্যন্ত উপনিবেশি-রূপে বাস করিয়াছিলেন, ইহাও আরব্য উপন্যাসের কাহিনী নহে। এ সকলই সত্য। এই সত্য রামায়ণে, রাজস্থানের ইতিহাসে, পেরিপ্লাস্ নামক গ্রন্থে ও আরও বহু পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ যে বাণিজ্যব্যপদেশে সর্ব্বদা আরব, মিশর, কার্থেজ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিতেন, ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহারা যে মিশরে যাইয়া আত্ম-প্রভাব বিস্তার করেন নাই, এরূপ বিশ্বাস হয় না। পরন্তু মিশরীয় দেব দেবীর নাম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি দেখিলে উহাই বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিশরের ইতিহাস কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার, বোধ হয়, চিরস্থায়ী। কিন্তু সেই অন্ধকার পথে যাঁহারা বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য অতি কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল। পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। শুধু দুই চারিটা শব্দের সামঞ্জস্য, টানিয়া বুনিয়া দুই চারিটা ঘটনার সামঞ্জস্য-প্রদর্শনই যথেষ্ট নহে। আমরাই যে সেই মিশর-বিজয়ী বীর, অধুনা গৃহপ্রান্তে বসিয়া একান্ত ভীতিবিহ্বলচিত্তে কম্পিতহস্তে লেখনী চালনা করিতেছি, ইহা যিনি সপ্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহার চরণে সহস্র প্রণাম! সম্ভবতঃ সে প্রমাণ আর্ শিলাখণ্ডে নাই, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষেও নাই। তাহাকে এখন কল্পনার সাহায্যে যুক্তির বলে অতীতের গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিচারসহ করিতে হইবে।

শ্রীহেমস্বামী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—চৈত্র। সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত "শাহজাহানের তাজনির্ম্মাণ-স্বপ্ন" নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি। অবনীন্দ্রনাথের শাহজাহান ঘোড়ায় চড়িয়া তাজ-নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। সামান্য মানব শয্যায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া, অন্ততঃ চেয়ারে, বা দেয়ালে, বা বানীগাছে 'ঠেস্' দিয়া স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র শাহজাহান ত তাহা করিতে পারেন না! তিনি তাজ-নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখিবার জন্য উদ্ভট কল্পনা-লোকের একটি পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়াছেন! শাহজাহানের বাহনটি অত্যন্ত চমৎকার। মুখটি চমৎকার ছুঁচলো, ঘোড়া বলিয়া চেনা যায় না। কতকটা ইঁদুর ও কতকটা শূকরের মুখ মিলাইয়া এই ঘোড়ার মুখ কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে। কালীঘাটের কাঠের ঘোড়া ইহার আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু সে আদর্শেও স্বাভাবিকতার যে ক্ষীণ আভাস দেখা যায়,

অবনীন্দ্রনাথ ততটুকু স্বাভাবিকতাও সহিতে পারে নাই। সযত্নে তাহাকে ঘোড়ার সান্নিধ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন! অশ্ববরের পুচ্ছও অত্যন্ত চমৎকার—কোনও মতে পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন! আকাশেও উদ্ভট বর্ণের বিকার! মোটের উপর এই চিত্রখানিকে 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অকাল-কুষ্মাণ্ড বলা যাইতে পারে। সার যোশুয়া রেনল্ড জীব-চিত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ঘোড়া দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনিও যদি জানোয়ার আঁকিতে আরম্ভ করেন ত ভবিষ্যতে রেণল্ড হইতে পারিবেন। যদি সে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পীরের আস্তানা হইতে মাটীর ঘোড়ার 'মডেল' আনিয়া আঁকিতে আরম্ভ করুন।—সেই মৃৎপিণ্ডই তাঁহার যোগ্য মডেল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য এই যে, অবনীন্দ্র বাবু অসঙ্কোচে এই ছবিখানি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন! আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ চিত্রের স্তুতিগান যাঁহাদের পেশা, শ্রী-বিরাগী চারুচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম; অতএব তাঁহার স্তুতিগানে আমরা বিস্মিত হই নাই। "ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা"য় নানা তত্ত্বের সমাবেশ আছে, তবে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু রচনায় কিরূপে শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা দেখাইতে হয়, আলোচ্য বক্তৃতায় তাহার আদর্শ আছে। স্থানাভাবে আমরা নমুনা দিতে পারিলাম না। শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গবেষণার নিমন্ত্রণ" ও "বর্ণমালার অভিযোগ" উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে ললিতবাবু যখন "বর্ণমালার অভিযোগ" পেশ করেন, তখন হাসির তরঙ্গে সাহিত্যিক-মজলিস প্লাবিত হইয়াছিল. "সংকলন ও সমালোচনে" প্রবাসীর কলেবর প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামীর "জাহাঙ্গীরের রাজসভা" সুখপাঠ্য সংগ্রহ। আর লেখকের ভাষাও উপভোগ্য! নূতন ব্যাকরণ ও অভিধান না রচিলে ভবিষ্যতে 'বীরেশ্বরী' ভাষা বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে না। নমুনা দেখুন,—"তাঁহার তিন পুত্রেরা রাজধানী ও রাজসভা হইতে বহু দূরে—দূর দেশের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইলেন।" বাঙ্গালী বলে,—তিন পুত্র। তাহাই 'বীরেশ্বরী' ভাষায় 'তিন পুত্রেরা।' সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 'শাসনকর্ত্তারূপে' গঠন করিয়াছেন, কিন্তু বিশারদের ভাষায়—"শুনে ব্যাকরণ কাঁদে।" গোস্বামী পরে 'শাসনকর্ত্তৃপদ'ও লিখিয়াছেন। গোস্বামীর রচনায় এরূপ নমুনা বিস্তর। চৈত্রের "প্রবাসী"তে আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

সুপ্রভাত।—চৈত্রে শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্রের "নানক-চরিত্র" চলিতেছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "একটি ঐতিহাসিক অনুমান" ও শ্রীমতী সরলা দেবীর "রমণীর কার্য্য" উল্লেখযোগ্য। মেন্মুখী হইতে সঙ্কলিত "পদ্মিনী উপাখ্যান" সুখপাঠ্য। "ইংরেজ রমণীর ভারতের অভিজ্ঞতা"য় অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্ত আছে। ইংরেজ-রমণীর মতে, ভারতনারীর দুর্দ্দশার সীমা নাই! ভারত-নারী অবরোধবাসিনী ও শিক্ষায় বঞ্চিতা বটে, কিন্তু সাধারণ ইউরোপীয়-নারীর ন্যায় তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় নহে। ভারত-নারী শিক্ষায় উন্নত হইলে পৃথিবীর নারী-সমাজের বরেণ্য হইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিদেশিনীকে তাহা অবশ্য বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "গৈবীনাথ" সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী। একটু পল্লবিত। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মোপাসাঁর রচিত গল্প অবলম্বনে "লক্ষ্মীলাভ" নামক যে গল্পটি লিখিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে। এই সংখ্যায় অনেকগুলি 'কবিতা' আছে; অধিকাংশই—

"যা, পদ্য! যা, মিলে যা,
লেবুর পাতায় করমচা"

শ্রেণীর রচনা। না ছাপিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। "সুপ্রভাতে"র চিত্রে বৈচিত্র্য আছে। অন্ততঃ এ সংখ্যায় 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র প্রেত-নৃত্য দেখিলাম না।

কালিদাস ও ভবভূতি।

২

প্রাচ্য কবিগণ একটা ধর্ম্মের মহিমায় মহীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতার মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে অধিক প্রীতিপ্রদ ছিল। চরিত্রকে তাঁহারা ক্ষমতার নিম্নে স্থান দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। তাঁহারা তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল রাজা হইবে, তাহা নহে। নাটকের নায়কগণকে মহৎ করিতে হইলে, সেই রাজার সর্ব্বগুণান্বিত হইবার প্রয়োজন আছে। ভারতের মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য কেন্দ্রীয় চিত্রটিকে সর্ব্বগুণান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিদ্বয় উক্তরূপে তাঁহাদের নাটকের নায়ককে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়েন নাই। রচনার স্থানে স্থানে নায়কের প্রতি কবিদ্বয়ের উদ্রিক্ত ক্রোধ গৈরিকস্রাবের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এবং প্রপীড়িতা নায়িকার প্রতি কারুণ্য ও অনুকম্পা ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্ব্বেও (যখন ক্রোধ হইবার কারণ হয় নাই) গৌতমী বলিতেছেন,

> ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ তুএবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধূ।
> এক্কক্কস্সঅ চরিএ কিং ভণদু এক্ক এক্কস্সিং॥

ইহা জ্বালাময় ব্যঙ্গ। প্রত্যাখ্যানের পরে শার্ঙ্গরব বলিতেছেন,—"মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তানাম্।" তাহার পর,—

> কৃতাভিমর্ষামনুমন্যমানঃ সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
> মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন॥

তাহার পরে যখন প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা মুখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন শার্ঙ্গরব তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছেন,—"ইত্থমপ্রতিহতং চাপল্যং দহতি।"—চাপল্যের ফল; না জানিয়া শুনিয়া গোপনে প্রণয়

করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। দুষ্মন্ত তাহাতে আপত্তি করিলে শার্ঙ্গরব কহিলেন,—

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো য-
স্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈ-
র্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ॥

যাঁহারা প্রতারণাকে বিদ্যার ন্যায় অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য বটে। সর্ব্বশেষে যে ভাবে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে একটা রোষ প্রকাশ পায়,—সে রোষ কামুক রাজার প্রতি ও কামুকী শকুন্তলার প্রতি। ঋষিশিষ্য ও ঋষিকন্যার মুখে ও আচরণে এই তীব্রতা দেখিয়া মনে হয় যে, উহাই কালিদাসের মনোগত ভাব।

ভবভূতিও রামকে অনেক বাঁচাইয়া চলিলেও, তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তীর মুখে, মনে হয়, তাঁহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছায়াসীতা বিষ্কম্ভকে বাসন্তী ব্যঙ্গের মর্ম্মভেদী বাণে রামকে বিদ্ধ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন,—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

তাহার পরে যখন রাম বলিতেছেন, "লোকে শুনে না—কেন, তাহারাই জানে", তখন বাসন্তী বলিতেছেন,—

অয়ি কঠোর যশঃ কল তে প্রিয়ং
কিমযশো নন্ু ঘোরমতঃপরম্।

পরে বার বার সেই চিরপরিচিত স্থান দেখাইয়া রামকে ভূত-সুখস্মৃতিতে জর্জ্জরিত করিতেছেন।

এরূপ হইবারই কথা। পৃথিবীতে এমন এক জন মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রপীড়িতের দুর্ভাগ্যে যাঁহার হৃদয় কাঁদে নাই। যে পাপী, তাহার দুর্ভাগ্যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। সেই জন্য মাইকেল রাবণের জন্য কাঁদিয়াছেন, মিল্টন শয়তানের দুঃখে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু যে নিরপরাধা প্রপীড়িতা নারী, তাহার দুঃখে ত কাঁদিতেই হইবে। Desdemonaর মৃত্যুর পরে তাঁহার

সহচরীর মুখে তীব্র ভর্ৎসনা দৈববাণীর মত শুনায়। শকুন্তলা স্বয়ং কাম-পরবশা হইলেও, তিনি মুগ্ধা তাপসী, নারী—প্রলুব্ধা, পরিত্যক্তা। তাঁহার দুঃখে কবিকে কাঁদিতেই হইবে। আর সীতা—আকাশ-পবিত্র-চরিতা, নক্ষত্রের মত ভাস্বর, শেফালিকার মত সুন্দর, যূথিকার মত নম্র, জগতে অতুলনীয়া সীতা, তাঁহার জন্য পশু-পক্ষী কাঁদে, কবি কাদিবেন না? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপরে কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে। ভবভূতিরও আসিয়াছে। সেই রোষ বাসন্তীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভবভূতি যে অন্তিমে প্রণয়িযুগলের চিরবিচ্ছেদস্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম যে,—নাটক সুখ-দৃশ্যে শেষ করিতে হইবে। Tragedy সংস্কৃতে হইবার যো নাই। এই নিয়ম সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। যদি নায়ক পুণ্যবান্ হইল ত পুণ্যের ফল দুঃখ হইতে পারে না। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখাইতেই হইবে; নহিলে অধর্ম্মের জয় দেখিলে লোকের অধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা।

আমি এই নিয়মটির অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, বাস্তব-জীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া যাইত না। ধর্ম্মের যদি অন্তিমে জয় হইতই, তাহা হইলে সেই সব উদাহরণ দেখিয়া অধিকাংশ মানুষই ধার্ম্মিক হইত। তাহা হইলে ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য কেহ প্রশংসা পাইত না।

একদিন ইংলণ্ডেও Poetic Justice নামে একটি সাহিত্যিক নীতি ছিল। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের সমুচিত বিকাশ হয় না দেখিয়া ইংরাজ নাট্যকারগণ তাহা এক রকম পরিত্যাগ করিলেন! কারণ, তাহাতে মনুষ্য-জীবনের এক দিক্ সাহিত্যে উহ্যই থাকিয়া যায়। মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম অনেক সময়ে আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত শির উচ্চ করিয়া চলিয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জীবন ও martyrদের জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাহিত্যে যদি অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় দেখানো যায়, তাহা হইলে কি দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়?—কখনই নহে। ধর্ম্ম তখনই ধর্ম্ম, যখন সে আর্থিক লাভালাভের দিকে লক্ষ্য করে না; যখন সে তাহার দুঃখে দারিদ্র্যে একটা গরিমা অনুভব করে; যখন ধর্ম্মপালনের সুখই

ধর্ম্মপালনের পুরস্কারস্বরূপ গণ্য হয়। Latimer Cranmer যে তেজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, রাণা প্রতাপ যে বলে আমৃত্যু দুঃখ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার গরিমা কেবল যে দর্শক বা পাঠককেই মুগ্ধ করে, তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্য্য স্বয়ং ত্যাগীও উপভোগ করেন।

স্বর্গে যাইব বলিয়া ধার্ম্মিক হওয়া, ভবিষ্যতে সম্পৎশালী হইব বলিয়া সৎ হওয়া, আর প্রত্যুপকার পাইব বলিয়া উপকার করার নাম ধর্ম্ম নহে,—স্বার্থসেবা। মোণ্ডা দেখাইয়া সত্যবাদী হইতে বলা নীতি শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। যে শিক্ষা সত্যকে ক্ষুণ্ন করে, তাহা সত্যের সহিত সংঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাই উচ্চ নীতিশিক্ষা, যাহা সত্যকে ভয় করে না, আলিঙ্গন করে। নীতি শিক্ষা দিতে হয় ত বলিতে হইবে, "দেখ, ধর্ম্মের পুরস্কার সম্পদ্ নহে, ধর্ম্মের পুরস্কার দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখের যে সুখ, তাহার কাছে সম্পদ্ মাথা হেঁট করে।" যে প্রকৃত ধার্ম্মিক, সে ধর্ম্মের কোনও পুরস্কারই চায় না; সে ধার্ম্মিক হইয়াই সুখী। সে যে ধর্ম্মকে ভালবাসে, তাহা ধর্ম্মের পদবী দেখিয়া নহে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।

সত্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম্ম বলবান্ হয় না। ধর্ম্মের পার্থিব অধোগতি সাহিত্যে দেখিয়া, যে ব্যক্তি ধর্ম্মে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, সে পিছাইবে না; পিছাইবে সে, যে ধর্ম্মকে পণ্য করিয়াছে, যে ধর্ম্মের বিনিময়ে কিছু চায়।

এই নীতির অনুসরণ করিয়া কালিদাস শেষে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন; ভবভূতি রামের সহিত সীতার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কালিদাস মহাভারতের আখ্যায়িকা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন; ভবভূতি বিপদে পড়িয়াছেন।

সপ্তম অঙ্কে, রাম, লক্ষ্মণ ও পৌরজন বাল্মীকি-কৃত সীতার নির্ব্বাসন নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। সেই অভিনয়ে লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, সীতার ভাগীরথী-সলিলে ঝম্প-প্রদান হইতে তাঁহার রসাতলে প্রবেশ অবধি ইঙ্গিতে অভিনীত হইল। রাম "ক্ষুভিত-বাষ্পোৎপীড়নির্ভরপ্রমুগ্ধ" হইয়া সেই অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। সীতা রসাতলে প্রবেশ করিলে, রাম "হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি চারিত্র-দেবতে লোকান্তরং গতাসি" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্ বাল্মীকে, পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব, এষঃ কিং তে কাব্যার্থঃ।" নেপথ্যে দৈববাণী হইল,—

ভো ভো সজঙ্গমস্থাবরাঃ প্রাণভৃতো মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাঃ, পশ্যত ভগবতা বাল্মীকিনানুজ্ঞাতং পবিত্রমাশ্চর্য্যম্।

লক্ষ্মণ দেখিলেন,—

মন্থাদিব ক্ষুভ্যতি গাঙ্গমম্ভো
ব্যাপ্তঞ্চ দেবর্ষিভিরন্তরীক্ষম্।
আশ্চর্য্যমার্য্যা সহ দেবতাভ্যাং
গঙ্গামহীভ্যাং সলিলাদুদেতি॥

আবার নেপথ্যে ধ্বনি হইল,—

অরুন্ধতি জগদ্বন্দ্যে গঙ্গাপৃথ্ব্যৌ জুষস্ব নৌ।
অর্পিতেয়ং তবাভ্যাসে সীতা পুণ্যব্রতা বধূঃ॥

লক্ষ্মণ কহিলেন, "আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্।" রামকে কহিলেন, "আর্য্য পশ্য পশ্য।" কিন্তু দেখিলেন যে, রাম তখনও মূর্চ্ছিত।

তাহার পরে প্রকৃত সীতা অরুন্ধতী সহ রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। রাম উঠিয়া গুরুজনকে দেখিলেন। গঙ্গার ও বসুন্ধরার সহিত অরুন্ধতী রামের পরিচয় করাইয়া দিলেন। "কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনুকম্পিতঃ" বলিয়া রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। অরুন্ধতী পরে সমবেত প্রজাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

ভো ভোঃ পৌরজানপদা, ইয়মধুনা ভগবতীভ্যাং জাহ্নবী, বসুন্ধরাভ্যামেবং প্রশস্য মমারুন্ধত্যাঃ সমর্পিতা পূর্ব্বং চ ভগবতা বৈশ্বানরেণ নির্ণীতপুণ্যচরিত্রা সব্রহ্মকৈশ্চ দেবৈঃ সংস্তুতা সবিতৃকুলবধূর্দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবী পরিগৃহ্যত ইতি কথং ভবন্তো মন্যন্তে।

লক্ষ্মণ কহিলেন—

এবমার্য্যয়ারুন্ধত্যা নির্ভৎসতাঃ প্রজাঃ কৃৎস্নশ্চ ভূতগ্রাম আর্য্যাং নমস্করোতি লোকপালাশ্চ সপ্তর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে।

অরুন্ধতীর আদেশে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। লব-কুশ প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের উপর যবনিকা পড়িল।

ভবভূতি এক অঙ্কেই করিলেন—অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল—বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন। কারণ, সীতার রসাতলে প্রবেশের পরে এ চাতুরী একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে। অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ-দৃশ্যের পরে কল্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যঙ্গের মত প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্য-কলাকে বধ করিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।

কালিদাস বুদ্ধির সহিত এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহাতে কাব্যকলা বা অলঙ্কার শাস্ত্র কাহাকেও বধ করিতে হয় না। ভবভূতি এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহা লইয়া অলঙ্কার শাস্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাটক হয় না।

এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া ভবভূতি আর এক মহা ভ্রম করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, poetic justiceকেও হত্যা করিয়াছেন। এক জন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটকে সেইরূপ করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি দেখাইয়াছেন যে, তাহা দুষ্মন্তের দোষজনিত নহে, ভ্রান্তিজনিত। সে ভ্রান্তিও দৈব, তাহাতে দুষ্মন্তের কোনও দোষ ছিল না। কিন্তু রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন প্রমাদবশতঃ নহে, স্বেচ্ছায়। প্রজাদের বাক্যে, বিচার না করিয়া, বিশ্রব্ধা, পতিগতপ্রাণা, আজন্মদুঃখিনী সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের কষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কষ্ট তাঁহার নিজের দোষেই হইয়াছিল। রামের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সীতা-নির্ব্বাসন ন্যায়-বিচার নহে। রাম নিশ্চিত ভাবিতেছিলেন যে, সীতাকে বনবাস দিয়া তিনি রাজকর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা করেন নাই। রাজার কর্ত্তব্য নহে—প্রজারা যাহা বলে, তাহাই শোনা। রাজার কর্ত্তব্য,—ন্যায়-বিচার। সীতা পত্নী বলিয়া কি প্রজা নহেন? মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রকে—প্রজারা চাহিলেই বনবাস দিতে হইবে, কি শূলে দিতে হইবে? Brutus পুত্রের বধের আজ্ঞা দিয়াছিলেন—পুত্র দোষী বলিয়া, প্রজা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত বলিয়াই নহে। সীতা অভিযুক্তা। রাম জানেন, সীতা একান্ত নিরপরাধিনী। পূর্ব্বে প্রজার নিকটও যদি সীতাকে নিরপরাধিনী সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে একটা অগ্নিপরীক্ষারও প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু কথাবার্ত্তা নাই, যেই অভিযোগ, অমনই বনবাস। সীতারও ত একটা অস্তিত্ব আছে। তাঁহার হৃদয়ও অনুভব করে। তাঁহাকে দুঃখ দিবার রামের অধিকার কি?—এরূপ রাম নিশ্চয়ই সীতাকে আবার পাইবার যোগ্য নহেন। পাইলেন না,—ইহাই poetic justice। ভবভূতির রাম প্রজারঞ্জন করিতে গিয়া মহত্তর কর্ত্তব্য হইতে

স্খলিত হইয়াছেন। সে কর্ত্তব্য ন্যায়বিচার। তাহা তিনি করেন নাই। তিনি জাগ্রত দিবসে নিরপরাধিনী বিশ্রব্ধাকে বনবাস দিয়া আবার তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহেন। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি গড়াইয়াছেন সত্য, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বেড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু সীতার প্রতি ন্যায়বিচার—তিনি করেন নাই। তিনি সীতাকে পাইবার যোগ্য নহেন। বাল্মীকি ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি এই মিলনে একত্র কাব্যকলা ও Poetic justice উভয়েরই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, সীতা নিজের পাতিব্রত্যে রামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ উক্তি সীতার প্রতি ঘোরতর অপবাদ। রাম যেন মহাদুর্ল্লভ রত্ন। সীতা তাঁহাকে হারাইয়াছিলেন, (কি দোষে জানি না) আবার পাইলেন (বিশেষ কি গুণে, তাহাও জানি না।) দোষী এ স্থলে সীতা নহেন, দোষী রাম। রাম নিজ দোষে স্বপত্নী হারাইয়াছিলেন। এরূপ অপবাদ কেবল সীতার প্রতি নয়, এ দুর্নাম সমস্ত নারীজাতির প্রতি। ইহা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে adding insult to injury.

যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের গৃহের আসবাব-স্বরূপ দেখেন, যাঁহারা নারীকে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা নারীজাতিকে কামচক্ষে দেখেন, তাঁহারা আমার কথা বুঝিবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ যে, স্বামী চরিত্রহীন হইলে স্ত্রী তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও স্ত্রী একবার ভ্রষ্টা হইলে স্বামী তাহার স্কন্ধে কুঠারাঘাত করিবে, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার এ প্রয়াস নহে। আমি স্বীকার করি যে, নারী দুর্ব্বল, অসহায়, কোমল-প্রকৃতি ; পুরুষের অধীনে তাহাকে থাকিতেই হইবে। আমরা জানি যে, পুরুষের চরিত্রশুদ্ধির অপেক্ষা নারীর সতীত্ব দশ গুণ অধিক দরকার। কিন্তু তথাপি নারীর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে—অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্যশাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। নারীজাতিকে তৈজসের মধ্যে ফেলিতে পারি না, তাহাকে উপভোগ্যমাত্র বিবেচনা করিতে পারি না। বরং অনেক বিষয়ে আমরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। নারী শারীরিক বলে বা মানসিক উদ্যমে পুরুষ অপেক্ষা হীন বটে, কিন্তু সেবায় ও সহিষ্ণুতায়, স্নেহে ও স্বার্থত্যাগে, ধর্ম্মানুরাগে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে

পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; নারী দুর্ব্বল বলিয়াই পুরুষ তাহার উপর নিয়ত এই অত্যাচার অবিচার করে।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত নারীর প্রতি পুরুষের সম্মান বাড়িতেছে। কেন না, সভ্যতার সহিত ক্রমে ক্রমে পুরুষের মহৎপ্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হইতেছে। করায়ত্ত শত্রুর প্রতিও সভ্যজাতি সদয় ব্যবহার করে। আর যে জীবনের সঙ্গী, গৃহের জ্যোতি, বিপদে সহায়—সে করায়ত্ত বলিয়া সভ্য পুরুষ কি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে? অনেক মনীষীর মতে নারী-জাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন দ্বারা জাতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব পরিমিত হইতে পারে। যখন এই আর্য্যজাতি জাতীয় উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের পুরুষ-জাতি নারী-জাতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিত। আমরা তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই ভবভূতির নাটকেই পাই। রাম সীতাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এবং সীতা যখন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, রাম কহিতেছেন,—"আজ্ঞাপয়।" ইহার উপর সভ্য ইংরাজও যাইতে পারেন নাই। সেই জাতির যদি কাহারও আজ এইরূপ ধারণা হয় যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিলেও চলে, না করিলেও চলে, তাহা হইলে বলিব,—আজ এ জাতির বড়ই দুর্দ্দিন!

রাম-সৈন্যের সহিত লবের যুদ্ধ ভবভূতি পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ড হইতে লইয়াছেন। যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে দেখানো যায় না, সেই জন্য ভবভূতি বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহার নাটকে এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে। নাটকত্ব হিসাবে এ নাটকে যুদ্ধের অবতারণার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে এই যুদ্ধবর্ণনা—অমূল্য! পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইব।

আমরা এই দুইখানি নাটকের গল্পাংশে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখি। প্রথমতঃ দুইখানি নাটকই রাজার প্রণয়-কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ, দুই নাটকেই প্রণয়িনী অমানুষী-সম্ভবা। তাহার পরে উভয় নাটকেই নায়ক-নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুইখানিতেই প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা দৈবশক্তিবলে মাত্রালয়ে নীত হইয়া রক্ষিত হইলেন—শকুন্তলা হেমকূট পর্ব্বতে, সীতা রসাতলে। দুইটিতেই বিচ্ছেদের পরে নায়িকার পুত্র হইল, সেই পুত্রই মিলনের উপায়স্বরূপ হইল, এবং শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হইল।

কিন্তু নাটক দুইখানিতে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্য অধিক। শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি যে, এক কামুক রাজা শকুন্তলার রূপ দেখিয়া উন্মত্তবৎ; উত্তর-চরিতে এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা সীতার গুণমুগ্ধ! একখানি নাটকের বিষয়—প্রণয়ের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস; আর একখানির বিষয়—দীর্ঘ সহবাস-জনিত প্রণয়ের গভীর নির্ভর; একটিতে রাজা কিয়দ্দিনেই নায়িকাকে ভুলিলেন; আর একটিতে নায়ক বিয়োগে কেবল সীতার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এক জনের বহু মহিষী, আর এক জন পত্নীকে বনবাস দিয়াও অনন্যপত্নীক।

নায়িকা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বৈষম্য আছে। প্রথমতঃ, শকুন্তলা যুবতী, সীতা প্রৌঢ়া। শকুন্তলা তাপসী, সীতা রাজ্ঞী। শকুন্তলা উদ্দাম-প্রবৃত্তি, রাজাকে দেখিয়াই মুগ্ধ, বিবাহে কণ্ব মুনির অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে তর সহিল না; সীতা ধীরা, বিশ্রব্ধা, রামের বাহু আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থা। শকুন্তলা গর্ব্বিণী, সীতা ভয়বিহ্বলা। বস্তুতঃ, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী, সীতা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিনী।

সংক্ষেপে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়ক ও নায়িকা প্রকৃতপ্রস্তাবে কামুক ও কামুকী; উত্তর-চরিতের নায়ক ও নায়িকা দেব ও দেবী। ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বিদেশী গল্প।

[জ্যাকারিয়াস্ টোপেলিয়স্ সুইডেনের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। শিশুরঞ্জন গল্প লিখিয়া ইনি অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত গল্পগুলি পড়িয়া শিশুদিগের জনক-জননীরাও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। ইউরোপের উত্তরাংশে তাঁহার গল্পের অত্যন্ত সমাদর। ইংরাজ পাঠকও টোপেলিয়সের গল্প পড়িতে ভালবাসেন। মূল গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে "শিক্কু" অনূদিত হইল।]

শিক্কু।

দ্বাদশ চার্লসের রাজত্বকালে ফিন্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশে কোনও পল্লীতে শিক্কু নামে একটি রাখাল বালক ছিল। সে অত্যন্ত দরিদ্র। তাহার মাথায় টুপি, গায়ে জামা, কিংবা পায়ে জুতা পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু সে জন্য তাহাকে কেহ কখনও অপ্রফুল্ল অথবা অসুখী হইতে দেখে নাই। শিক্কু সদাপ্রফুল্ল, চিরহাস্যময়। সিপুরী পর্ব্বতের পাদদেশে গোচারণকালে সে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূর্ণকণ্ঠে গান গাহিত, কখনও বা বাঁশী বাজাইত। পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে সঙ্গীত, বা বাঁশীর মধুর শব্দ যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিধ্বনিত হইত, তখন বালকের আনন্দের সীমা

শিক্‌কুর কাছে একখানি অতি পুরাতন ছোরা ছিল। উহাই তাহার একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি। ইহা ছাড়া "কেট্‌" নামে তাহার এক সহচর ছিল। কেট্‌ তাহার পরম বিশ্বাসী ও অনুরক্ত। সকলে তাহাকে কুকুর জাতির মধ্যে অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া জানিত।

সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে এই বন্ধুযুগল সর্ব্বদা একত্র থাকিত। কেহ কাহারও সঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিত না। গোচারণকালে কেট্‌ বিপথগামী গাভীদিগকে তাড়াইয়া এক স্থলে জড় করিত। মধ্যাহ্নে শিক্‌কু পশুরক্ষার ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং ঘুমাইত। তখন বন্ধুবৎসল কেট্‌ তাহাদের খবরদারী করিত।

প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজনের নিমিত্ত শিক্‌কু প্রত্যহ শক্ত শুষ্ক রুটী পাইত। উভয়ে তাহাই ভাগ করিয়া আহার করিত। নির্ঝরের সুশীতল সলিলে তাহারা সূপের কাজ সারিয়া লইত। গ্রীষ্ম ঋতুতে বন্য ফল পাড়িয়া আহার সমাপ্ত করিত। কিন্তু ফল মূলে কেট্‌র ততটা স্পৃহা ছিল না।

সেই বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে শিক্‌কু ভাবিত, সে যেন সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌। কিন্তু যেদিন অপরাহ্নে বৃষ্টিপাতের পর আর্দ্র শীতল বাতাস বহিত, তখন উষ্ণ পানীয় ও আহার্য্যের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

শিক্‌কুর উপর 'আল্টিলা ফারমে'র অধ্যক্ষের গো-পাল-রক্ষার ভার ছিল। তিনি অত্যন্ত কৃপণ। তাঁহার পত্নীর প্রকৃতি আরও নীচ। কিন্তু শিক্‌কুর তাহাতে কি আসে যায়? তাহার স্বাধীনতাটুকু ত কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

পনেরটি গরু সে প্রত্যহ চরাইতে লইয়া যাইত। অপরাহ্নে দুগ্ধদোহনকাল উপস্থিত হইলে সে তাহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া আনিত। এই ত তাহার কাজ!

কিছুকাল বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। শিক্‌কুর মনে অন্য কোনও চিন্তাই ছিল না।

একদিন সে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিল। কেট্‌ উপত্যকাভূমিতে গাভীগুলি রক্ষা করিতে লাগিল। অরণ্যের দৃশ্য কি সুন্দর, কি রমণীয়! তড়াগ ও হ্রদের কি বিচিত্র শোভা! একটি কুটীরের চিহ্নও দেখা যায় না!

পৃথিবী যে এত বৃহৎ, শিক্‌কু পূর্ব্বে কখনও তাহা অনুভব করে নাই। সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত হ্রদের নীল হৃদয়ে শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধ ছায়া কেমন নাচিতেছিল; আকাশে মেঘমালা কেমন ছুটাছুটি করিতেছিল,—সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া কখনও বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছিল, আবার নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়া অন্যত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল! শিক্‌কুর কোমল স্বপ্নময় হৃদয় এই বিচিত্র দৃশ্যে, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিল! সে মনের আনন্দে কখনও গাহিতেছিল, কখনও বাঁশী লইয়া বাজাইতেছিল। বংশীধ্বনি শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে ধ্বনিত হইতেছিল।

গাহিতে গাহিতে সহসা সে সবিস্ময়ে দেখিল, এক খর্ব্বকায়, কুব্জা, বৃদ্ধা রমণী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। বৃদ্ধা বলিল,—"শিক্‌কু, যদি তুমি আমার কথামত কাজ কর, তাহা হইলে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সব তোমারই হইবে।"

শিক্‌কু তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। বৃদ্ধা এলিস্‌ গ্রামের মায়াবিনী ডাইনী। শিক্‌কু বলিল,—"ও।"

কুব্জা তখন বলিল,—"শাদা গাইটা আমায় দাও, বাড়ী গিয়ে বলো যে, তাকে নেকড়ে বাঘে খাইয়াছে।"

বিস্ফারিতনেত্রে শিক্কু বলিল, "ইঃ, আমি এত বোকা নই!"

বৃদ্ধা বলিল, "আচ্ছা, আমার কথা শুন্‌লে না, এর পরে কিন্তু দোষ তোমার ঘাড়েই পড়িবে।"

এই বলিয়া বায়সবৎ লাফাইতে লাফাইতে বৃদ্ধা পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া গেল।

উপত্যকাভূমি হইতে কেট্টুর ডাক শুনিতে পাওয়া গেল। শিক্কু দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিল। নীচে নামিয়া শিক্কু দেখিল, কিমো নাম্নী গাভী জলাভূমির গভীর পঙ্কে পড়িয়া ডুবিয়া যাইতেছে। উপরে কেবল তাহার শৃঙ্গদ্বয়মাত্র দেখা যাইতেছিল। শিক্কু প্রাণপণ যত্নে তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার শক্তি কতটুকু! টানিতে টানিতে অবশেষে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন সে হাল ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যাকালে বিষণ্ণমনে সে চৌদ্দটি গরু সহ গৃহে ফিরিয়া গেল। সমস্ত ঘটনা সে প্রভুকে বিজ্ঞাপিত করিল। অধ্যক্ষ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি শিক্কুকে রীতিমত প্রহার করিলেন। পর দিবস অভুক্ত অবস্থায় শিক্কু গরু চরাইতে গেল।

আজ আর সে গান গাহিতে পারিল না। পর্ব্বতের পাদদেশে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষুধার জ্বালায় তাহার উদর দগ্ধ হইতেছিল, হৃদয় দুঃখভারে অবসন্ন।

সহসা সে দেখিল, এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল দেখিয়া শিক্কু তাহাকে ঐন্দ্রিজালিক বলিয়া চিনিতে পারিল। আগন্তুক বলিল, "কালো গাই মুসিকাকে আমায় দিবি? বাড়ী গিয়া বলিস্, বাঘে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে আমি এই সমগ্র দেশটা তোকে দান করিব।"

শিক্কু সক্রোধে বলিল, "যাও, তোমার কথায় আমি ভুলিব না। এমন বোকা আমি নই।"

ঐন্দ্রজালিক বলিল, "তা বেশ, কিন্তু শেষে দেখিস্, দোষ তোর ঘাড়েই পড়িবে।"

কথা শেষ হইতে না হইতে সে ডিগবাজি দিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল।

কেট্টু ডাকিতে লাগিল। নূতন বিপদের আশঙ্কা করিয়া বালক দৌড়িয়া গিয়া দেখিল, মুসিকার প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইতেছে। কোনও বিষাক্ত বন্য লতা খাইয়া সে জীবন হারাইয়াছে। সে আর উঠিবে না। নির্ঝর হইতে আঁচলা ভরিয়া জল আনিয়া সে গাভীর মুখে চক্ষে সেচন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। মৃতদেহে কি প্রাণ ফিরিয়া আইসে? তখন ত্রয়োদশটি গাভী সহ শিক্কু বাড়ী ফিরিয়া গেল; প্রভুকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল।

এবার মনিব শিক্কুকে তিন দিন একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শিক্কু অনশনে তিন দিন অতিবাহিত করিল।

চতুর্থ দিবসে তেরটি গরু লইয়া সে মাঠে চলিয়া গেল। আহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ একটি ব্যাগ মনিব তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন. ক্ষুধার্ত্ত শিক্কু মাঠে পঁহুছিয়াই ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিল;—খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে কয়েকখণ্ড শ্বেতপ্রস্তর দেখিতে পাইল।

বুভুক্ষু শিক্কু অগত্যা গোগণ সহ পর্ব্বতাভিমুখে চলিয়া গেল। কয়েকটি বন্য ফলমূল

খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। আজ তাহার মনে বিন্দুমাত্র স্ফূর্ত্তি ছিল না। পাছে কোনও নূতন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় সে গরুগুলির কাছে বসিয়া রহিল।

সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, এক অপ্সরা তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার হস্তে একখানি সুন্দর রুটী। বালকের চিবুক স্পর্শ করিয়া, তাহার সম্মুখে রুটীখানি ধরিয়া তিনি বলিলেন, "শিক্কু, লাল গাইটি আমায় দাও। যদি বাড়ীর লোকে জিজ্ঞাসা করে, বলিও, ভালুকে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা হইলে আমি এই রুটীখানি এবং সেই সঙ্গে এই দেশটা তোমায় দিব।"

ক্ষুধার জ্বালায় শিক্কু অত্যন্ত কাতর। আজ চারি দিবস সে উপবাসী। লুব্ধনেত্রে একবার সে রুটীর দিকে চাহিল, তার পর অপ্সরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। পাছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে হাঁ বলিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় দন্ত দ্বারা শিক্কু জিহ্বা চাপিয়া ধরিল।

অপ্সরা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। শিক্কু তাহাতে হাড়ে চটিয়া গেল। ক্রুদ্ধ বালক তখন দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, তাহা হইবে না, আমি নির্ব্বোধ নই।"

"দেখো, শেষে কিন্তু আমার দোষ দিও না। তুমিই কিন্তু শেষে বিপদে পড়িবে।" এই বলিয়া অপ্সরা বিহঙ্গের ন্যায় পাখায় ভর দিয়া অরণ্যের দিকে উড়িয়া গেলেন।

শিক্কু আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া ম্যান্‌সিকা নাম্নী গাভীর কাছে ছুটিয়া গেল। গরুটি এতক্ষণ নিকটেই চরিয়া বেড়াইতেছিল। শিক্কু দেখিল, ম্যান্‌সিকা তৃণশ্যামল পর্ব্বত-সানুদেশে শুইয়া রহিয়াছে। একটা সর্প তাহার নাসিকা দংশন করিয়া তদবস্থায় ঝুলিতেছে। গাভী অল্পক্ষণের মধ্যেই মরিয়া গেল।

শিক্কু সাপটাকে মারিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু তাহাতে গাভী বাঁচিল না। অপরাহ্ণকালে চিন্তিত-মনে বালক দ্বাদশটি গরু লইয়া প্রভুসকাশে উপনীত হইল। নূতন বিপদের কথা মনিব জানিতে পারিলেন।

তখন মনিব সক্রোধে বলিলেন, "তোর পক্ষে কোন্ শাস্তি উপযুক্ত? তোকে ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে চাপিয়া ধরিব, না গভীর কূপে ফেলিয়া দিব?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বালক বলিল, "আমি কি করিব, বলুন। তিন তিন বার সিপুরী পর্ব্বতরাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত জমীদারী আমাকে দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তথাপি আমি প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মিথ্যা কথা বলি নাই,—প্রবঞ্চনায় সাহায্য করিতে চাহি নাই। তাহাদের কথায় আমি আদৌ সম্মত হই নাই।"

মনিব বলিলেন, "সিপুরী পর্ব্বতে উঠিলে যত দূর দেখা যায়, সবই ত আমার তালুক। আগামী পূর্ণিমার পূর্ব্বে যদি তুই নিরাপদে আমার নয়টি গরু ফিরাইয়া আনিতে পারিস, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সমস্ত জমী আমি তোকে দান করিব। কিন্তু এখন তোকে কি শাস্তি দিব, তাই বল।"

শিক্কুর প্রভুপত্নী বলিলেন, "ছোঁড়াটাকে হাত পা বাঁধিয়া পাহাড়ের উপরে রেখে এস। কিছু খেতে দিও না। গাছপালা দেখিয়া উদর পূর্ত্তি করুক।" কৃষকপত্নী বালকের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারই দোষে যে তাঁহার ভাল ভাল গাভীগুলি মরিয়া গেল, এ অপরাধ তিনি কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারেন না।

স্বামী পত্নীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। রজ্জু দ্বারা শিকুর হস্তপদ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সিপুরী পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে রাখিয়া আসিলেন। পাছে কেহ বালককে খাদ্যদ্রব্য দেয়, এ জন্য তিনি পরিজনবর্গের প্রত্যেককেই বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। অপর একটি রাখাল-বালক সন্নিহিত মাঠে গরু চরাইতে গেল।

হস্তপদবদ্ধ ক্ষুধাতুর শিকুর অৰ্দ্ধমৃতাবস্থায় পর্ব্বতোপরি পড়িয়া রহিল। অরণ্যমধ্য হইতে পুষ্পের ঘন সুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। 'ফার' বৃক্ষের শাখান্তরাল দিয়া সূর্য্যালোক-প্রদীপ্ত হ্রদের তরঙ্গহিল্লোল দেখা যাইতেছিল।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বৃক্ষে, পত্রে শিশিরপাত হইতে লাগিল। তখন বনমধ্য হইতে মর্ম্মরধ্বনি উত্থিত হইল। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ হাসিয়া উঠিল। চন্দ্র হতভাগ্য বালকের দেহে কিরণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। জগতের কেহই সেই বুভুক্ষু বালকের জন্য কাতর নহে।

কিন্তু হ্রদ, তড়াগ, অরণ্য, নক্ষত্রপুঞ্জ ও চন্দ্র প্রভৃতির উপরেও এক জন আছেন, তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা ও আর্ত্তের বন্ধু। সেই সর্ব্বদর্শী করুণাময় ভগবান্‌ শিকুর দুর্দ্দশায় বিগলিত হইয়া তাহার সান্ত্বনার নিমিত্ত এক জন বন্ধুকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে কে?—কেটু!

গৃহে থাকিলে কেটু নিশ্চয়ই তাহার প্রাপ্য আহার পাইত। অথবা পুষি বিড়ালের অংশের দুগ্ধ প্রভৃতি অপহরণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা করিল না। সে অভুক্ত অবস্থায় পর্ব্বতাভিমুখে দৌড়িয়া গেল। শিকুর যেখানে বন্ধনদশায় পড়িয়াছিল, তথায় পঁহুছিয়া তাহার পদতলে বসিয়া তাহার হস্ততালু লেহন করিতে লাগিল। বিপদের দিনে তাহার এই ব্যবহারে শিকুর হৃদয়ের দুঃখের অংশ কিছু কমিয়া গেল। তখন অপেক্ষাকৃত প্রসন্নচিত্তে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কেটুও তাহার পদতলে নিদ্রিত হইল। চন্দ্রালোক তাহাদের সুপ্ত দেহের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বাদশ চার্লসের রাজত্বকালে দেশের দক্ষিণাংশে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরাংশের অধিবাসীরা তাহার কোনও সংবাদই রাখিত না। বিশাল অরণ্যানীর অপর-পার্শ্বস্থ জনপদে শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সমুদ্র-উপকূলে একখানি শত্রুপক্ষীয় রণতরী দেখা গেল। এক দল সৈন্য সমুদ্রতীরে অবতীর্ণ হইয়া গ্রামলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

সেনাদলের একাংশ, শিকুর যে গ্রামে বাস করিত, তদভিমুখে যাত্রা করিল। নগর-লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। আণ্টিসা ফারম্‌ প্রথমেই সেনাদলের হস্তে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। শিকুর মনিবের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। অবশেষে সেনাগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

অধিক লুণ্ঠনের আশায় সেনাদল গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। কেবল লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার ও বন্দীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতিপয় কণক সৈনিক তথায় অবস্থিতি করিল।

অতি প্রত্যূষে শিকুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে দেখিল, কেটু এক ব্যক্তির পাদদেশে দংশন করিতে উদ্যত। দুই জন অতি বর্ব্বরাকৃতীর সৈনিক দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য পর্ব্বতে আরোহণ

করিয়াছিল। তাহারা তথায় বালকটিকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইল। শত্রু হইলেও তাহাদের হৃদয় করুণাবর্জ্জিত ছিল না। অবিলম্বে তাহারা শিক্‌কুর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। তাহাদের সহিত খাদ্যদ্রব্য ছিল; বালকটিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তাহাকে কিছু খাইতে দিল। আহারান্তে শিক্‌কুকে সঙ্গে করিয়া তাহারা নীচে নামিয়া গেল।

পর্ব্বতপাদদেশে বৃক্ষকাণ্ডে তাহাদের অশ্ব বাঁধা ছিল। এক জন শিক্‌কুকে তাহার ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। কেট্‌ তাহাদের সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু সৈনিকেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

শত্রুসৈন্য সমুদ্রকূলে বহু বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তৎসমুদয় রক্ষার জন্য কেবলমাত্র ছয় জন কশাক সৈনিক ছিল।

রাত্রি সমাগত দেখিয়া সৈনিকগণ ভাবিল, সমুদ্রতীরে থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, গ্রামবাসীরা সংখ্যায় অধিক; রাত্রির অন্ধকারে যদি গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাধিক্যবশতঃ গ্রামবাসীদিগেরই জয়লাভের সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং তাহারা নৌকাযোগে অদূরবর্ত্তী দ্বীপে উপনীত হইয়া তথায় রাত্রিবাসের পরামর্শ স্থির করিল। তাহারা গমনকালে গো-মেষাদি লুণ্ঠিত পশুপাল তটভূমিতে ছাড়িয়া দিয়া, বন্দী ও অশ্বদিগকে দৃঢ়ভাবে বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়া, শিক্‌কুকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিল। দ্বীপে পঁহুছিয়া শিক্‌কু কশাক সৈনিকদিগের পার্শ্বে শয়ন করিল।

রাত্রি তমোময়ী। উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ শৈলগাত্রে, শ্বেত উপলরাশির উপর আপতিত হইতেছিল। তীরাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল।

শিক্‌কুর নয়নে নিদ্রা ছিল না। ক্লান্ত সৈনিকগণ তাহার পার্শ্বে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সে তাহাদের গভীরনিদ্রাজনিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনিতেছিল। পাঁচ জন তাহার পার্শ্বে ঘুমাই-তেছে। এক জন সৈনিক নৌকার উপর প্রহরায় নিযুক্ত। শিক্‌কু ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া বসিল;—কান পাতিয়া প্রত্যেক শব্দ শুনিতে লাগিল। নিদ্রাঘোরে এক ব্যক্তি কি বলিয়া উঠিল,—একখানি হাত সরাইয়া লইল। শিক্‌কু আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে আবার উঠিয়া বসিল। তখন চারি দিকে গাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। সৈনিকেরা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সুপ্ত সৈনিকগণকে অতিক্রম করিয়া সে সন্তর্পণে নৌকার অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে যে সৈনিক প্রহরা দিতেছিল, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শিক্‌কু নৌকায় উঠিয়া তরী ভাসাইয়া দিল। প্রহরী কিছুই জানিতে পারিল না। অনুকূল পবনে তরী তীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কশাক তখনও মৃতের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছিল। সে সমস্ত দিন অশ্বারোহণে বহু পথ অতি-বাহন করিয়া আসিয়াছে, তাহার আর অপরাধ কি?

তরী তীরসংলগ্ন হইবামাত্র শিক্‌কু নিঃশব্দচরণে নৌকা ত্যাগ করিল। যে বৃক্ষতলে বন্দীরা বন্ধনাবস্থায় পতিত ছিল, তথায় পঁহুছিয়া সে পরিচ্ছদের ভিতর হইতে তাহার পুরাতন ছোরাখানি বাহির করিল তার পর একে একে সকলের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। এই অতর্কিত

মুক্তিলাভে বন্দিগণ প্রথমে বিস্মিত হইল ! এত সহজে যে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে, সে সম্ভাবনা পূর্ব্বে আদৌ তাহাদের মনে উদিত হয় নাই ! শিক্‌কুর ইঙ্গিতে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল। নিদ্রিত কশাক সৈনিককে তাহাদেরই বন্ধনরজ্জু দ্বারা গ্রামবাসীরা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। তখন হতভাগ্য সৈনিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল ; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। বন্দীদিগের হস্তে সে নিজেই বন্দী !

মুক্ত বন্দিগণের মধ্যে এক জন বলিল, "উহাকে এখনই মারিয়া ফেল। আর যে কয় জন দ্বীপে ঘুমাইতেছে, চল, তাহাদিগকেও সাবাড় করিয়া দিয়া আসি।"

শিক্‌কু কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল, বক্তা তাহারই মনিব ! সে বলিল, "না, তাহা হইবে না। বরং লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ আমরা কোনও নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাই।"

শিক্‌কুর মনিব বলিলেন, "উহারা আমার গৃহ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে, আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়াছে।"

"আর উহারা আমায় মুক্তি দিয়াছে ; আহার-দানে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে।" শিক্‌কু তখন আপনাকে আর যেন বালক বলিয়া ভাবিতেছিল না। সে যেন অকস্মাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অনেকেই শিক্‌কুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। তখন কয়েক জন সৈনিকদিগের অশ্বে আরোহণ করিল। অন্যান্য সকলে পশুপাল সহ অরণ্যের নিভৃত স্থানে আত্মগোপন করিবার জন্য চলিল। গমনকালে সকলেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিল। শিক্‌কুও নিজের অংশ লইল।

কিছু কাল পরে শত্রুসৈন্য দেশ হইতে চলিয়া গেল।

বিপদের সময় গ্রামবাসীরা গভীর অরণ্যে, পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। এখন দেশ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে জানিয়া সকলেই অরণ্য ও পর্ব্বত হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। শত্রুহস্তে প্রায় সকলেরই গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। গ্রামের ধর্ম্মমন্দিরে সকলে সমবেত হইয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইল। দ্বীপ হইতে অপর পাঁচ জন সৈনিককেও তাহারা পরে ধরিয়া আনিয়াছিল। সেই সৈনিকগণ সম্বন্ধেও কি করা কর্ত্তব্য, তাহারও আলোচনা হইতেছিল।

কেহ কেহ বলিল, "উহাদিগকে মারিয়া ফেলা যাক।" কেহ বলিল, "না,—শিক্‌কু উহাদিগকে ধরিয়াছে, সুতরাং শিক্‌কুর হাতেই উহাদিগকে সমর্পণ করা যাউক, সে যাহা বুঝে, করিবে।" তখন সকলে একমত হইয়া কশাক ছয় জনকে শিক্‌কুর হাতে সঁপিয়া দিল।

শিক্‌কু তাহাদিগকে শপথ করাইয়া লইল যে, ভবিষ্যতে তাহার দেশের বিরুদ্ধে তাহারা কখনও অস্ত্রধারণ করিবে না। তার পর তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া বলিল, "যাও, এখন স্বদেশে ফিরিয়া যাও।"

শিক্‌কুর প্রভু পত্নী সহ এক গোলা-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শত্রুসৈন্য তাড়াতাড়িতে উহা দগ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

বিপদের আর সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাহারা গুপ্ত আশ্রয়স্থল হইতে বাহিরে আসিলেন,

চারি দিকে চাহিয়া শিক্কুর প্রভু পত্নীকে বলিলেন,—"হায়! এখন যদি আমার গরু কয়টিকে ফিরিয়া পাইতাম।"

এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন, একটি নগ্নদেহ, নগ্নপদ, অনাবৃতমস্তক, ক্ষুদ্র বালক নয়টি গাভী লইয়া তাঁহাদেরই অভিমুখে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একটি পীতবর্ণ কুকুর।

বিস্ময়মুগ্ধ স্বামী বলিলেন,—"ওরা কারা? শিক্কু ও কেট্টু নয়?" প্রভুপত্নী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমাদের গরু যে গো!"

সত্যই শিক্কু ও কেট্টু প্রভুর গাভীগুলি লইয়া আসিতেছিল। শত্রুসৈন্য উহাদিগকে লইয়া গিয়াছিল, তিনটি গাভী তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছিল; বাকী নয়টি শিক্কু নিজের ভাগে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

"এই দেখুন, আপনার নয়টা গরু আনিয়াছি।" আনন্দে শিক্কু মাথার টুপি ঘুরাইতে গেল। কিন্তু হায়! তাহার মস্তক যে অনাবৃত!

কৃষকদম্পতি আনন্দে অভিভূত হইয়া বালককে কোলে তুলিয়া লইলেন। তার পর সস্নেহে গাভীগুলির দেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"শিক্কু, আজ তোমার কৃপায় আমরা হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম।"

কেট্টু তখন পুষি বিড়ালের খাদ্যে ভাগ বসাইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল।

প্রভুপত্নীর হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল। কুণ্ঠিতভাবে তিনি বলিলেন,—"শিক্কু তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?"

শিক্কু বলিল,—"না মা, এখনও আমার খাবার সময় হয় নাই। পূর্ণিমার এখনও কিছু বিলম্ব আছে।"

শিক্কুর প্রভু কি যেন ভাবিতেছিলেন। বালক সম্বন্ধে এখন তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মনের আবেগে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভৃত্যের কাছে যে শপথ করিয়াছিলেন, বোধ হয় এখন তাহা মনে পড়িয়াছিল।

তিনি বলিলেন,—"শিক্কু, এস, তোমার সঙ্গে একটা রফা করি। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, এত সম্পত্তি লইয়া তুমি এখন কি করিবে? সাত বৎসর তুমি বিশ্বস্তভাবে আমার কাজ কর, তার পর আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিব। সিপুরী পর্ব্বতের চারি পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত জমী আমার—তখন সমস্তই তোমার হইবে।

শিক্কু বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

শিক্কু তার পর সাত বৎসর ধরিয়া বিশ্বাসের সহিত মনিবের কাজ করিয়াছিল। ক্রমে সে বড় হইল; অনেক কাজকর্ম্ম শিখিল। প্রভুতনয়া সুন্দরী গ্রেটার পাণিগ্রহণান্তে সে বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক হইল। "আটিলা ফারম" সে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

কেট্টু ও পুষি এ জগতে আর নাই। শিক্কু তাহাদের দেহ সিপুরী পর্ব্বতের পাদদেশে সমাহিত করিয়াছে। বৃদ্ধ ঐন্দ্রজালিকের কোনও কথাই আর জানা যায় নাই! লোকে বলে, যেখানে তাহার গৃহ ছিল, এখন সেখানে বায়সের বাসা হইয়াছে!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শরশয্যা।

আমার অহিফেন-দীক্ষার পূর্ব্বেই চক্রবর্ত্তী সিদ্ধি ধরিয়াছিল। আমার বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ। প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। ইতিমধ্যে বন্ধুবিরহে তাহার চুল শ্বেতাকার এবং একাকার ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের ন্যায় হইয়াছিল।

কিন্তু আমার বয়ঃক্রম মাত্র ত্রিশ। অতএব তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবীকে আমি পূর্ব্বে নমস্কার করিতাম। এখন দেখিলে মিষ্টভাবে ও বিনীতভাবে হাসি। হাসির অর্থ,—"যদিও আপনি বয়সে ছোট, কিন্তু সম্পর্কে বড়", এবং "এখন আমি বিলাত হইতে আসিয়া আপনাকে নমস্কার করিতে বাধ্য নহি।"

বিমলা দেবী প্রত্যুত্তরে হাসিতেন। তাহার অর্থ এই,—"আমি আপনাকে বরাবর ভীষ্মদেবের ন্যায় আফিংখোর বলিয়া জানি।"

আপনারা জানেন বোধ হয় যে, মহাভারতের দিগ্‌গজ পিতামহ মহাবীর ভীষ্ম আফিং খাইতেন। দার্শনিকমাত্রই আফিংখোর।

আমি দর্শন শাস্ত্রে "এম্. এ.", এবং বিজ্ঞানে 'অনার্স্‌'। বিলাত গিয়া "এম্. ডি." হইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভীষ্মদেবের ন্যায় আমিও বিবাহ করি নাই।

সুতরাং আমার সর্ব্বদাই একটা শরশয্যার আতঙ্ক হইত। এই অনার্য্য-ভাব প্রথমে বিলাতের "কারলটন্ ক্লবে" অন্তরে উদিত হইয়াছিল। পরে স্বদেশী "বোমা"র মোকদ্দমাসমূহ খবরের কাগজে পড়িয়া সেটা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। আলিপুরের পশুশালা দেখিতে গিয়া এক বিলাতী সুন্দরী আমাকে বলিয়াছিলেন,—'আপনি বড় সুন্দর!' ইহাতে ত্রিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সম্প্রতি চতুর্গুণের আশঙ্কা করিয়া চক্রবর্ত্তীর রমণীয় পুষ্পোদ্যানে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। মাত্রা ৪টার সময় চড়াইয়াছিলাম।

কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল বলিয়াছিলেন,—"যোগেশ, বিবাহ কর! আফিংএর মাত্রা কমাও, নচেৎ অজ্‌ স্বপ্নাবিষ্ট গাধার মত হইয়া পড়িবে।"

অথচ আমার ন্যায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিরল, তাহাও তিনি স্বীকার করেন!

২

চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধি ঘুঁটিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। নেশা ধরিতে রাত্রি ৯টা বাজে। যখন তাহার নেশা জমে, তখন আমার ঘুম পায়।

চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে গঙ্গাতীরে গিয়াছেন, আমি তাঁহার চুঁচুড়ার বসতবাটীর পুষ্পবাটিকায় লম্বমান হইয়া পড়িয়াছি।

গঙ্গানদী অধিক দূর নয়। গঙ্গা ও আমার মধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল। আমার মনে পড়িল, আমি ভীষ্ম। গঙ্গাকে বন্দনা করিলাম।

আকাশে চাঁদ নাই। মনে হইল, কৃষ্ণপক্ষ; কিন্তু খানিক পরে চাঁদ উঠিল, তখন বুঝিলাম, শুক্লপক্ষ। তিথি জানিতাম না, অতএব সভয়ে চন্দ্রকে বন্দনা করিয়া বলিলাম,—"চাঁদ, আজ একটু বেশী ক্ষণ থেকো; নেশা জমিয়াছে।"

কথাটা কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলাম; কারণ, মাধবীলতা ঈষৎ কম্পিত হইল।

বোধ হইল, আমার সম্মুখীন মালতী, বেলা, যূথী, সকলেই আহ্লাদে শুভ্র পুষ্পদন্ত বাহির করিয়া আনন্দে সন্ধ্যাগন্ধ বিকাশ করিল!

বোধ হইল, সকলেই স্বপ্নময়!

আরও বোধ হইল, একটা কি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। শুভ্রবসনা, শীর্ষে মসীবরণা সন্ধ্যার ন্যায় কৃষ্ণকেশ। মলিনা, শান্তিময়ী, অতি ধীরপাদ-বিক্ষেপে কামিনী বৃক্ষকুঞ্জে বিলীনা হইল।

বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সেটা পূরবী রাগিণী। সন্ধ্যার অবসানে চলিয়া যাইতেছে।

আমি করযোড়ে কহিলাম,—"পূরবী, তুমিও একটু থাকিয়া যাও। আমার উঠিবার শক্তি নাই, নচেৎ তোমাকে ধরিয়া রাখিতাম। আমার আত্মা বোধ হয়, অতি বৃদ্ধ। শরীরে বল থাকিলেও উদ্যম নাই। পূর্ব্বে তোমাদিগের ন্যায় অনেক রাগিণী ভাঁজিয়াছি। এখন গলা নাই। অর্থাৎ, গলা আছে, কিন্তু চড়ে না। চড়িলে নামে না, নামিলে উঠে না। অতএব হে পূরবী, তুমি একবার আমার অন্তরে উদিত হও। নেশা জমিয়াছে।"

পূরবী আসিল না। দীর্ঘনিশ্বাসের মত, বঙ্গের পূর্ব্বগৌরবের মত, বৃন্দাবনের মানিনী রাধার মত, চলিয়া গেল।

পশ্চাতে কে হাসিল।

৩

চাহিয়া দেখিলাম, বিমলা দেবী।

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলাম।

আমি বলিলাম, "দেবী, কুঞ্জে কোকিল নাই, কিন্তু পঞ্চম স্বর আছে।"

বিমলা দেবী ঈষৎ হাস্ত করিয়া বসিলেন। আমি নিমেষের মধ্যে নূতন সিগারেট্ ধরাইয়া নির্জীব নেশাকে সজীব করিয়া নিজে নির্জীব হইয়া পড়িলাম।

বিমলা। তোমার পূরবীর কড়ি মধ্যম কোথায় গেল?

আমি বলিলাম "দরকার নাই, স্বয়ং ইমনকল্যাণ উপস্থিত। একটু আলাপ করুন।"

অতিশয় সহিষ্ণুতাসহকারে নয়ন মুদ্রিত করিয়া আলাপ শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

বিমলা। যোগেশ! রঙ্গ রাখিয়া দাও। একটা কথা অনেক দিন হইতে বলিবার ইচ্ছা। কমলের এখন বিবাহ দেওয়া উচিত।

কমল? কমল বিমলা দেবীর কনিষ্ঠা। সেই মলিনা কমলিনী? কমল কিছু কালো। কিন্তু কমল গাহিতে পারিত। বোধ হয়, কমল অতি সুশ্রী। কারণ, এখনও মনে আছে। বিলাতে গিয়াও মনে ছিল। কিন্তু কমল বড় মানিনী। মনে পড়ে; কমল একদিন রাগ করিয়াছিল। সে পড়িয়া গিয়াছিল, আমি হাসিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, "সেই কমল?"

বিমলা। কোন্ কমল?

আমি। যে পড়িয়া গিয়াছিল।

বিমলা। তুমি তুলিয়াছিলে।

বোধ হয়; কিন্তু সেটা মনে নাই। "তার এখনও বিবাহ হয় নাই? তখন কমলের বয়স দশ বৎসর।"

বিমলা। কিন্তু পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বয়স পনের। গৃহস্থের ঘরে—

আমি বলিলাম, "আপনি বলিয়া যান, আলাপটা অনেকটা বসন্ত রাগিণীর মত দাঁড়াইতেছে। ক্ষতি নাই, বলিয়া যান।"

বিমলা। সে এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়াছে।

আমি। সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বোধ হয়, সিগারেট্ ধরিয়াছে!

বিমলা। চুপ! বেয়াড়া কথা বলিও না।

আমি। তবে পাত্র জুটে নাই কেন?

বোধ হয় বিমলা দেবী রাগ করিলেন। বলিলেন, "অনেক পাত্র আছে। আমাদের পাড়াতেই চণ্ডীচরণ আছে।"

বোধ হয়, হাম্বিরী রাগিণীর মত ধৈবতে জোর দিয়া বিমলা দেবী সরোষে চলিয়া গেলেন।

৪

বিমলা দেবী চলিয়া গেলে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। মনে পড়িল, এই সকল অনাথ লতা-পুষ্প সেকালে কমলের শিশুসন্তানের ন্যায় ছিল, এখন তাহারা বড় হইয়াছে। কমল কতবার জল দিয়াছিল; কত প্রভাতে, কত সন্ধ্যায় উহাদিগকে লালন করিয়াছিল।

মনে পড়িল, একটা রজনীগন্ধ মরিয়া যাওয়াতে কমল দুই দিন অনাহারে ছিল। সে কমল কখনও সিগারেট খাইতে পারে না। আমার সমালোচনা গর্হিত হইয়াছে।

মনে পড়িল, আমি আসা অবধি কমল আমার সম্মুখে আসে নাই। পাশ করা মেয়ের এত লজ্জা গৌরবের বিষয়! সিগারেট টানিলাম।

ওঃ! আসল কথাই মনে ছিল না! কমলের একগুচ্ছ কেশ কাটিয়া লইয়াছিলাম। সেই বিলাত যাইবার পূর্ব্ব দিন। তখন কমল ঘুমাইয়াছিল। কেন কাটিয়াছিলাম? তাহা মনে নাই।

তাই ত! সে লকেটটা গেল কোথায়? কি সর্ব্বনাশ! আমার চেন হইতে কে খুলিয়া লইয়াছে? সেই অপূর্ব্ব কেশগুচ্ছ? মিস্ ডেভিসের মতে স্বর্গীয়!

আমি তিন দিন চেনের দিকে দৃষ্টিপাতই করি নাই। বোধ হয় বাটীতেই চুরি গিয়াছে। আমার বাসাবাটী অনতিদূরে। মনে হইল, দৌড়িয়া যাই।

কিন্তু যাওয়া বৃথা। রাত্রি প্রায় নয়টা। চক্রবর্ত্তীর সহিত আহার করিতে হইবে।

চক্রবর্ত্তী সুন্দর বদন হাস্যপূর্ণ করিয়া, এবং পদ্মহেন যুগ্মনেত্র অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় নিমীলিত করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মুর্গী না খাইয়াও অতিশয় কান্তিপূর্ণ দেহ। তাঁহার ন্যায় অনেক জমীদার-সন্তানের এরূপ অবস্থাপন্ন শরীর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর চক্ষু ও হাসি অতিশয় সুন্দর। হাসিলে চক্ষু থাকে না, এবং আড়নয়নে চাহিলে, হাসি চক্ষুর মধ্যে যায়। সিদ্ধিখোরের মধ্যে এক জন মহাতপা ঋষির মত চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হারমোনিয়ম আনি।"

আমি বলিলাম, "অবশ্য! ইহা 'সর্ব্ব প্রশ্নের বহির্ভূত।' এখনই আন।"

হার্ম্মোনিয়ম আসিল; আমি লইয়া বলিলাম। চক্রবর্ত্তী তবলা ধরিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাহিবে কে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "চণ্ডী আসিতেছে।"

৫

আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। "চণ্ডী? চণ্ডীকে কি আর জানি না? চণ্ডী ভট্টাচার্য্য সেকালে একটু মদ খাইত।"

চক্রবর্ত্তী। এখনও খায়।

আমার মনে হইল, চণ্ডী যেন শিখণ্ডী। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়াই কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের পতন। ক্রোধসংবরণ পূর্ব্বক বলিলাম, "মাতালকে বাটীতে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।"

চক্রবর্ত্তী খুব হাসিলেন। "সে শীঘ্রই আমার শ্যালিকার সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইবে। এখন বড় একটা খায় না।"

ক্রমে চণ্ডী আসিয়া উপস্থিত। আমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সে একটা অপদার্থ মানবসন্তান।

আমি বলিলাম, "বোসো। গাহিতে জান?"

সে বলিল, "হাঁ।"

বোধ হয় মদের গন্ধ পাইলাম। কিংবা আমার কল্পনা।

চণ্ডী গাহিল, "যমুনা-পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী।"

কি গর্দ্দভের ন্যায় সুর, এবং কি ওঁছা সঙ্গীত!

আমি একটা চড়ের আয়োজন করিতেছিলাম, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর পহররমের লহরী দেখিয়া নিবৃত্ত হইলাম। কিন্তু যখন গাহিল,

"শুখাল 'কমল'-মালা, বাড়িল বিরহজ্বালা"—

তখন আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। এই মর্কটের মুখে কমলের নাম অসহ্য বোধ হইল। আমি 'ব্রেভো' বলিয়া তাহার কর ধরিয়া ভীষ্মদেবের ন্যায় পীড়ন করিলাম।

চণ্ডী চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রতিদানের সাহস ছিল না। আমার অসামান্য বাহুশক্তির পরিচয় বিলাতে ও ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ অনেকেরই বিদিত ছিল।

চক্রবর্ত্তী আড়নয়নে সেটা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। "হাত ভাঙ্গে নাই ত?"

চণ্ডী। না, গলা ভাঙ্গিয়াছে।

আমি। শিখণ্ডী! 'আমরা তিন্‌টি ইয়ার' গাও।

আমি সুর দিলাম, কিন্তু শিখণ্ডী গাহিল না। কি শোচনীয় কথা! ইহার সহিত কমলের সম্বন্ধ?

৬

শিখণ্ডীর চেহারাখানা অনেকটা ডারউইনের মত। এবং ডারউইনের মর্কটবাদের প্রতিপোষক।

আহারের সময় চণ্ডী বাবুর অগ্নির তেজ দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "উঁহাকে শশার চাট্‌নী দাও।"

শিখণ্ডী একতরফ হইতে খাইতে লাগিল।

এমন সময় বিমলা দেবী আসিয়া অতি হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন,—কমল কত খুসী হবে, ও সব তাহার তৈরি।—কি, যোগেশ! তোমার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?"

আমি জ্বলন্ত-নয়নে বলিলাম, "না।"

কিন্তু সম্মুখে বিমলা দেবী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রথচক্র লইয়া দণ্ডায়মানা!

আমি সভয়ে বলিলাম, "হাতের থালাখানা রাখুন।"

বিমলা। উহাতে কমলের তৈরি সন্দেশ আছে, চণ্ডীবাবুর আরও দরকার হবে।

[illegible] অত্যন্ত বিপদ! আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

বিমলা। যোগেশবাবু! আপনি ত অনেক রাগিণী ভাঁজিয়াছেন। বোধ হয় বিলাতে?

আমি। বোধ হয়।

বিমলা। আমরা দু' একটার বৃত্তান্ত শুনিতে পাইব নাকি? বোধ হয়, রাগিণীর মাধুরী এখনও মরমে লাগিয়া আছে? বিলাতী সুন্দরীগণ নাকি অতি সুন্দর 'পুডিং' প্রস্তুত করিতে পারেন?

চক্রবর্ত্তী ও শিখণ্ডী বেমালুম সন্দেশ খাইতে আরম্ভ করিল। আমার গলায় বাধিয়া গেল।

বিমলা। বোধ হয় বিলাত হইতে আসিয়া গলার জোর গিয়াছে।

বুঝিলাম, শরশয্যা আরম্ভ হইল। বিমলা দেবীর বাক্যবাণ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে ছাইয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, "আমার অসুখ বোধ হচ্ছে।"

বিমলা দেবী তালবৃন্ত লইয়া ব্যজনে বসিয়া গেলেন।

"আমরা কালো মূর্খ মানুষ, আমাদের হাত কড়া। বোধ হয়, মিস্ ডেভিস্ থাকিলে সুবিধা হইত।"

আমি চমৎকৃত হইলাম। "আপনি মিস্ ডেভিস্‌কে জানিলেন কিরূপে?"

বিমলা। কেন? তার মাথার একগোছা চুল এখনও লকেটে বিরাজমান!

৭

আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল।

চণ্ডী খাইয়া দাইয়া চম্পট দিল। চক্রবর্ত্তী তাম্বূলাদি সেবন করিতে লাগিলেন। আমি বাহিরে আসিয়া রোয়াকে শয়ন করিলাম।

রাত্রি দশটা বাজিল।

যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। ভীষ্মদেবের ন্যায় ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, মহাবীরকে যেমন ভ্রমক্রমে কুরুক্ষেত্রে সকলে বধ করিয়াছিল, আমারও সেই দুর্দ্দশা।

সম্মুখে ও চতুর্দ্দিকে চন্দ্রালোক। পার্শ্বে হাস্‌না-হানার লতা হইতে মধুরগন্ধ দক্ষিণ-বায়ু-সহকারে অনতিদূরে ভাগীরথীসলিলাভিমুখে বহিতেছিল।

আমি ভাবিতেছিলাম, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কি ভ্রমসঙ্কুল! মানবমাত্রই ভ্রমের দাস, এবং নির্ব্বাচনও প্রকাণ্ড ভ্রম।

হাসিতে চাহিলাম, পারিলাম না।

এই যে ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র সাধ, ইহাতেও সংসার বিবাদী।

কি ভ্রম! মিস্ ডেভিস্? উহারা কি জানে না যে, মিস্ ডেভিস্ কত সাধে কমলার কেশগুচ্ছ লকেটে বিন্যাস করিয়াছিলেন।—"your sweetheart."

সে কি মিস্ ডেভিস, না কমল?

ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা কি মূর্খ! যাহার জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়া মিস্ ডেভিসের সঙ্গে একবার হাসিয়া কথা কহি নাই, যে মিস্ ডেভিসের আত্মোৎসর্গ আর কিছুদিন ভাবিলে আমি পাগল হইয়া যাইতাম, অদ্য তাহারই অবমাননা?

আমি ডাকিলাম,—"বিমলা দেবী, একবার আসুন।"

বিমলা দেবী পান হস্তে আসিলেন। আমি বলিলাম, "আমার শরশয্যা,

বোধ হয় মৃত্যুশয্যা। কিন্তু একটা মহাভ্রমে আপনি পতিতা। সে ভ্রম লকেট সম্বন্ধে।"

বিমলা দেবী তুচ্ছভাবে বলিলেন, "আমি সব জানি।"

আমি বলিলাম, "না, জানেন না। আপনাদের বড় আলমারীর মধ্যে 'সাবিত্রী' নামক একখানা বই আছে। সেটার মলাটের মধ্যে একখানা চিঠি থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে কেশগুচ্ছের ইতিহাস পাইবেন। এবং, (আমার বলিতে লজ্জা করে) আমার sweetheart কে, তাহাও জানিতে পারিবেন।

৮

বোধ হয় চিঠিখানা পাওয়া গিয়াছিল। পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বের চিঠি।—"কমল, তোমার একগুচ্ছ কেশ লইয়া চলিলাম। তোমাকে বলি নাই, মার্জ্জনা করিও। উহাই আমার প্রবাসের স্মৃতিস্বরূপ থাকিবে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে লইয়া আসিব।"

বোধ হয়, সাক্ষীও জুটিয়াছিল। কারণ, ঝি কমলের চুল বাঁধিতে গিয়া একটা গুচ্ছ সেকালে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহা এখন সকলের মনে পড়িয়াছিল।

বোধ হয়, ভ্রম আবিষ্কার করিয়া সকলে দুঃখিত হইয়াছিল। কারণ, প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমি যখন বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত, তখন দেখিলাম, খিড়কীর গেটের পার্শ্বে একটী অর্দ্ধশীর্ণা, আলুলায়িতকেশা বালিকা দণ্ডায়মানা!

চতুর্দ্দিকে জনমনুষ্য নাই।

আমি কমলকে নদীর তীরের দিকে লইয়া গেলাম।

"কমল, আমাকে অপমান করা কি তোমাদের উচিত হয়েছে?"

কমল কাঁদিতেছিল। "এ সব দিদির পরামর্শ, আমি কিছু জানি না।"

আমি কমলের মুখখানি আবার পাঁচ বৎসর পরে ভাল করিয়া দেখিলাম। ভবিষ্যতে আরও ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

"কমল! আমার লকেট্ ফিরিয়া দাও। আর মনে থাকে যেন, মিস্ ডেভিসের হৃদয় কত দূর উন্নত। ঐ লকেট্‌টি তৈরি করিতে তার সাত দিন লাগিয়াছিল। তোমার মত সন্দেহ তাহার ছিল না।"

বোধ হইল, কমল আবার মান করিবে। তাহার নিবৃত্তির জন্য আমি বলিলাম,—"দেখ, আমি কত আফিং খাই।"

কৌটা বাহির করিলাম। কমল কাড়িয়া লইল। "তোমাকে আর আফিং খাইতে দিব না।"

আমি অনেক চিন্তার পরে বলিলাম,—"বেশ। উহার বদলে লকেট দাও।"

কমল কম্পিতহস্তে লকেট ফিরাইয়া দিল, আমি কম্পিত ওষ্ঠে কমলের চম্পককলির ন্যায় কোমল অঙ্গুলিতে প্রতিদান করিলাম। সেই চন্দ্রালোকে শরশয্যা হইতে উঠিয়া, সংসার-সমুদ্রে উভয়ে ঝাঁপ দিলাম।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

জগৎ-কথা।

৭

তরল পদার্থের হাতের কাছে উদাহরণ জল। কঠিনের সঙ্গে ইহার প্রভেদ কি?

প্রভেদ অনেক। জল গড়াইয়া যায়, জলে স্রোত হয়; জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ে; জলে অক্লেশে হাত ডুবাও, জল সেখান হইতে সরিয়া যাইবে, আবার হাত তোল, জল দ্বিধা না করিয়া স্বস্থানে আসিয়া স্থানপূরণ করিবে। মাটীতে বা পাথরে এমন করিয়া হাত ডোবান চলে কি? পাথরে ছুরির আঁচড় দাও; স্থায়ী চিহ্ন থাকিবে; জলে ছুরির আঁচড় স্থায়ী হয় কি? জল যে এইরূপ অবাধে সরিয়া নড়িয়া বহিয়া যায়, ইহাই জলের তারল্য।

আবার ঘটীর জল দেখ, কেমন ঘটীর গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। ঘটীর ভিতরটার যে আকার, জল ঠিক্ সেই আকার গ্রহণ করিয়াছে। ঘটীর জল থালায় ঢাল, জল বিনা আপত্তিতে থালায় ছড়াইয়া বিছাইয়া পড়িল; কোনও বাক্যব্যয় নাই, থালার আকার গ্রহণ করিল। জল যেন সুশীল সুবোধ গোপালের মত ছেলে; যা পায়, তাই খায়; যা পায়, তাই পরে।

জলের আকৃতির কোন বাঁধাবাঁধি নাই। কাচ বা কাঠ যেমন গড়স্ত আকৃতি লইয়া জমাট হইয়া বসিয়া থাকে, জলের সে অহমিকা নাই। কাচের পুঁতুল হয়, জলের পুঁতুল গড়া চলে না। কাঠের আকৃতি বদলান, কাঠকে নোয়ান, মচকান, মোচড়ান কত আয়াস-সাধ্য; জল নুইয়াই আছে, কোনও আয়াসের অপেক্ষা করে না। জল ভাঙ্গেও না,

মচকায়ও না; কেন না, উহা ভাঙ্গিয়াই আছে, মচকাইয়াই আছে। মাটীর ঢিপি থাকে, পাতরের পাহাড় থাকে, বালির স্তূপ থাকে, জলকে স্তূপাকৃতি করিয়া ঢিপি বাঁধা চলে কি? জলের আকৃতি বদলাইতে কোনও আয়াস আবশ্যক হয় না। উপরে বলিয়াছি, যাহার আকৃতি বদলাইতে যত আয়াস দরকার হয়, তাহার আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা তত অধিক। জলের আকার পরিবর্ত্তনে যখন কিছুই আয়াস লাগে না, তখন বলিতে হইবে, জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা একবারে নাই। এই হইল ইহার তারল্য; কঠিনের সঙ্গে তরলের প্রভেদ এইখানে।

জলের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই বটে, কিন্তু আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা বড় কম নহে। জলের আকুঞ্চনে কোন ক্লেশ নাই, কিন্তু সঙ্কোচন প্রচুর আয়াসসাধ্য। একটা চোঙ্গায় জল পূরিয়া তাহাতে প্রচুর চাপ দিলে তবে যৎকিঞ্চিৎ আয়তন কমে, আবার সেই চাপ তুলিয়া দিলে পূর্ব্বের আয়তন ফিরিয়া পায়। কাজেই জলের আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা প্রায়ই কঠিনের সহিত তুলনীয়।

জল অতি সুবোধ বালক; কিন্তু জলেরও একটা জেদ আছে। জল ঘটীতেই রাখ, আর চোঙ্গাতেই রাখ, আর থালাতেই রাখ, অথবা একটা পুষ্করিণীতেই রাখ, উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল ও সমোচ্চ হয়। কোথাও উচু নীচু, ঢিপি থাকে না। আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কত বন্ধুর; কোথাও পাহাড়, কোথাও বিল, কোথাও খাল। আর জলের পিঠ একটানা সমান। জলের এক ধার উঁচু, একধার নীচু হয় না। অতি নির্ব্বোধেও পুকুরের জল এধারে উচু, ওধারে নীচু, বলিতে চাহিব না; কোন ব্যক্তিকে জল-উঁচুর দলস্থ বলিলে গালি দেওয়া হয়। হাওয়া দিলে পুষ্করিণীর জলের পিঠে হিল্লোল দেয়, উহা তরঙ্গায়িত হয়, কিন্তু সে হাওয়ার জোরে; হাওয়া না থাকিলে সেই সমতল।

জলের এই বিষয়ে জেদ দেখা যায়; যেমন করিয়া হউক, পিঠটা সমতল রাখিবেই; উহাতে ঢিপি বাঁধাও চলিবে না, আঁচড় কাটাও চলিবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা জেদ নহে, জেদের অভাব। জলের অসীম নমনীয়তাই উহার ঐরূপ আচরণের হেতু। খাড়া হইয়া থাকিতে, বাঁকিয়া থাকিতে, মাথা তুলিয়া থাকিতেই জেদের দরকার; ঢলিয়া পড়িতে জেদের দরকার নাই।

জলের এই তারল্য, এই টলটলে চলচলে ভাব, এই ঢলিয়া পড়ার, এই প্রবাহ জন্মানর প্রবৃত্তি তেলে আছে, ঘিয়ে আছে, ঘোলে আছে, আবার গুড়েও আছে। এ সকলই তরল পদার্থ। গুড়ও তরল পদার্থ; তবে জলে আর গুড়ে একটু প্রভেদ স্পষ্ট দেখা যায়; গুড়ও ঢলেন, বহেন, কিন্তু একটু বিলম্বে। জলে যত তাড়াতাড়ি দ্রুত স্রোত জন্মে, গুড়ে তত দ্রুত স্রোত জন্মে না। গুড়ে হাত ডুবাইলে গুড় সরিয়া যায়, হাত সরাইলে আবার স্থানপূরণার্থ সরিয়া আসে, কিন্তু একটু বিলম্বে, যেন গুড়ের গায়ে গায়ে ঘষাঘষি আটকাআটকির ভাব আছে। সেই ঘর্ষণের ফলে একটু বিলম্ব ঘটে, একটু সময় লাগে। গুড় তরল; কিন্তু গাঢ়; উহার তারল্যে গাঢ়তা আছে। জলে সেই গাঢ়তা কম,—একবারে নাই, এমন নহে,—তবে গুড়ের চেয়ে অনেক কম। তরল পদার্থমাত্রেই এই গাঢ়তার তারতম্য আছে।

গালার বাতি আপাততঃ কঠিন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেখা যায়, উহাও কালক্রমে ঢলিয়া নুইয়া বাঁকিয়া যায়; আপনা হইতেই যায়, নিজের ভারে নিজে বাঁকিয়া যায়। ফলে উহাও তরল পদার্থ, কিন্তু উহার গাঢ়তা খুব বেশী; এত বেশী যে, অল্প সময়ে উহার নমনীয়তা উহার তরলতা আমরা বুঝিতেই পারি না। বহু বিলম্বে উহা প্রত্যক্ষ করি।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, এই কালসহকারে নোয়াইবার প্রবৃত্তিটাই তারল্যের লক্ষণ। জলের মত জিনিস খুব শীঘ্র নুইয়া পড়ে, গুড়ে একটু বিলম্ব হয়; গালায় বহু বিলম্ব ঘটে।

তামার মত, লোহার মত কঠিন ধাতুদ্রব্যের যে এই নমনীয়তা একবারে নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তামার বা লোহার ছড়িতে গুরুভার ঝুলাইলে উহা স্থায়িভাবে নুইয়া পড়ে, ভার তুলিলেও আর স্বভাবে ফিরে না। এমন কি, বড় বড় কড়িকাঠ, লোহার বীম, নিজের ভারে নিজে স্থায়ী বক্রতা প্রাপ্ত হয়, এবং যত দিন যায়, ততই বক্রতা বাড়ে। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার পরিসরের যে সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়াইলেই এই দশা ঘটে, তখন কাঠিন্য গিয়া তারল্য আসে। সেই সীমার ভিতরে উহা স্থিতিস্থাপক ও কঠিন, সীমার বাহিরে উহা নমনীয় ও তরল। সোনা রূপা, তামা লোহা, উহারা কিছু দূর পর্য্যন্ত কঠিন, তার পর তরল; খুব গাঢ় তরল। উহাদের গাঢ়তা এত বেশী যে, অল্প সময়ে তারল্য টের পাওয়া যায় না। তবে খুব জোরে যদি আঘাত করা যায়, জোরে হাতুড়ির ঘা দেওয়া

যায়, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন উহাদের নমনীয়তা বা তারল্য ধরা পড়ে। এই তারল্যটুকু আছে বলিয়াই জোরে আঘাতে সোনা রূপার পাত হয়, জোরে টান দিলে তার হয়। সম্পূর্ণভাবে তারল্যহীন হইলে পাত হইত না, বা তার হইত না।

দেখা গেল, কাঠিন্যের বা তারল্যের নিরূপণ খুব সহজ নহে। একই পদার্থে কাঠিন্যের সঙ্গে সঙ্গে তারল্য থাকিতে পারে। বলা যাইতে পারে, যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা আছে. যাহারা ভাঙ্গিবে, কিন্তু মচকাইবে না, তাহারাই মোটের উপর কঠিন। আর যাহাদের আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা নাই, যাহারা ক্রমশঃ মচকাইয়াই যায়. নোয়াইয়াই যায়, তাহারা তরল। যাহা কাঠিন্যের সীমার ভিতর কঠিন, তাহাও সীমার পারে তরল হইতে পারে, তবে গাঢ়তার জন্য তারল্য শীঘ্র প্রকাশ পায় না। তারল্যের প্রকাশ সময়-সাপেক্ষ।

৮

এইবার তরল পদার্থের আর একটা বিশেষ গুণের কথা পাড়িব। একটা চোঙ্গায় বালি পূরিয়া তার তলে ছিদ্র করিলে ছিদ্র দিয়া ঝুর্ ঝুর করিয়া বালি বাহির হইবে, কিন্তু চোঙ্গার গায়ে পাশে ছিদ্র করিলে সে পথে বালি বাহির হইবে না। কিন্তু চোঙ্গায় জল পূরিয়া তলায় বা পাশে যেখানে ছিদ্র কর না কেন, সেই পথে জলের প্রবাহ ছুটিবে। বালি কেবল চোঙ্গার তলের উপর চাপ দেয়, আর জল তলেও চাপ দেয়, পাশেও চাপ দেয়। শুধু পাশে কেন, জল ঊর্দ্ধমুখেও চাপ দিতে পারে। গাড়ুতে কাণায় কাণায় জল পূরিলে দেখা যায়—উহার নলের মুখ হইতে ঊর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নলের মুখটা গাড়ুর কাণার নীচে থাকিলে এরূপ ঘটে। কানায় কানায় জল ভরা কলসীর গলার নীচে—অর্থাৎ যেখানটাকে কাঁধ বলা চলিতে পারে সেই কাঁধে—একটা ফুটা করিলে নীচ হইতে জল ঊর্দ্ধমুখে বাহির হইবে। সে যাক্, ঊর্দ্ধমুখে চাপ পড়ে বলিয়াই ভিতরের জল বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া থাকে। বালির এরূপ ফোয়ারা হয় না। ফলে জল নিম্নমুখে, পার্শ্বমুখে, ঊর্দ্ধমুখে, সকল মুখেই চাপ দেয়; তরল পদার্থেরই এই স্বভাব, উহার চাপ সর্ব্বতোমুখ। কঠিন পদার্থের চাপ কেবল নিম্নমুখ। জলের চাপ সর্ব্বতোমুখ বটে, তবে সর্ব্বত্র পরিমাণে সমান নহে। জলের পিঠ সর্ব্বদা

সমতল থাকে, আগে বলিয়াছি; সেই পিঠের যত নীচে যাওয়া যায়, অর্থাৎ যত গভীর জলে নামা যায়, চাপের মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়। ইহাও ঐ চোঙ্গা হইতেই পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে। চোঙ্গার পাশে দুইটা ছিদ্র কর; একটা উচ্চে, একটা নিম্নে। দুই ছিদ্র দিয়াই জল বাহির হইবে। কিন্তু উপরের ছিদ্রপথে যে জল বাহির হইবে, তাহার বেগ অল্প, নীচের ছিদ্রের জলের বেগ অধিক। কেন না, যে জল নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতেছে, সে গভীর জল; উপরের ছিদ্রের জল তত গভীর জল নহে। জলের গভীরতা যেখানে এক হাত, সেখানে যে চাপ, গভীরতা যেখানে দশ হাত, সেখানে চাপ ঠিক্ তাহার দশ গুণ,—পোনের গুণও নহে, নয় গুণও নহে,—ঠিক্ দশগুণ।

ঠিক্ দশগুণ কিরূপে জানিলে? পাঠক হয় ত উত্তর দিবেন, কেন, এ ত সহজ হিসাব, ত্রৈরাশিকের আঁক। এক হাত নিম্নে চাপ যদি হয় একগুণ, দশ হাত নিম্নে চাপ হইবে দশগুণ। যেমন এক টাকায় এক মণ চাউল হইলে দশ টাকায় দশ মণ চাউল পাওয়া যাইবে, সেইরূপ। কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, চাপের হিসাবে উত্তরটা ঠিক হইল বটে, কিন্তু হিসাবের প্রণালীটা ঠিক হইল না।

কেন হিসাব ঠিক হইল না বলিবার পূর্ব্বে একটা পালটা প্রশ্ন করিব? এক হাত নিম্নে যে চাপ, দশ হাত নিম্নে চাপ তাহার দশগুণ না হইয়া যদি বিশগুণ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? যদি বিধির বিধান সেইরূপ হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? তুমি হাজার কান্নাকাটা করিলেও মাথা খুঁড়িলেও বিধির বিধান উলটাইত না। তখন ত্রৈরাশিকের হিসাব খাটিত না। বিধাতার ব্যবস্থার উপর তোমার কি হাত আছে? বিধাতার ব্যবস্থা বলিতে যদি আপত্তি থাকে, বল প্রকৃতির খেয়াল, বা প্রাকৃতিক নিয়ম। নামে কিছু যায় আসে না। খেয়ালই বল, আর নিয়মই বল, আর বিধানই বল, ঐরূপ হইলে তোমার ত্রৈরাশিকের আঁক কোথায় থাকিত? বাধ্য হইয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইত। যদি পরিমাণ করিয়া বস্তুতই দেখা যাইত, এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে চাপ তাহার বিশগুণ, তখন তাহাই মানিতে হইত। কাহার সহিত এখানে ঝগড়া করিবে?

যদি বল, বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এমন অসঙ্গত কেন হইবে?

তাহার উত্তরে আমি বলিব, কেন হইবে না? তাহার উপর তোমার কি জোর? অথবা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এইরূপই বিধান, চাপ বিশগুণই বটে, দশগুণ নহে, তখন আর কি কথা? যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। ঘাড় পাতিয়া মানিতে হইবে।

বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ত্রৈরাশিকের অঙ্ক খাটে না। এক বৎসরের গরুর দাম দশ টাকা হইলে, দুই বৎসরের গরুর দাম বিশ টাকা হয় না। এখানে ত্রৈরাশিক খাটে না। ওজনে চাউল কিনিবার সময় খাটে, কিন্তু বয়স ধরিয়া গরু কিনিবার সময় খাটে না। চাউল কিনিবার সময়ই কি সর্ব্বদাই খাটে? তাহাও নহে। এক টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যায়, কিন্তু দশ টাকার চাউল লইলে অনেক সময় একটু সস্তা দরে পাওয়া যায়, দশ মণের অধিক পাওয়া যায়। অল্প জিনিস যে দরে বিক্রয় হয়, অধিক জিনিস তার চেয়ে সস্তা দরে বিক্রয় হয়। দরটা জানিলে তবে হিসাব চলে। যেখানে সমান দর, সেইখানেই ত্রৈরাশিক চলে, নতুবা চলে না। দর সমান কি না, তাহা বাজারে গিয়া না জানিলে চলিবে না; ঘরে বসিয়া ত্রৈরাশিক কষার কর্ম্ম নহে। যেখানে ত্রৈরাশিক খাটে, সেইখানেই ত্রৈরাশিক খাটিবে। যদি বাজারে গিয়া বুঝ, ত্রৈরাশিক চলিবে না, তখন ত্রৈরাশিক খাটাইলে চলিবে না। ফলে বাজারের দরের উপর তোমার যেমন হাত নাই, সেখানে বিক্রেতার খেয়াল অথবা বাজারের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক হিসাবেও বিধাতার খেয়াল বা প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। বাজারে গিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, কোন্ ওজনে কত দর, এখানেও সেইরূপ প্রকৃতি ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাচাই করিয়া জানিতে হইবে, হিসাবের প্রণালীটা কিরূপ; ত্রৈরাশিক খাটিবে কি না? যদি যাচাই করিয়া জানিতে পার, ত্রৈরাশিক চলিবে, উত্তম, হিসাব সহজ হইল; যদি দেখ, না, হিসাব জটিল হইয়া পড়িল। যাহা দেখিবে, ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

জলের চাপের হিসাবে ত্রৈরাশিকের অঙ্কই খাটে; এক হাত নীচে যে চাপ, দশ হাত নীচে তাহার দশ গুণ দেখা যায়, এগার গুণও দেখা যায় না, নয় গুণও দেখা যায় না। উত্তম কথা, যখন বিধাতার বিধান বা প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ, তথাস্তু। যদি অত সহজ হিসাব না হইত, যদি বিধান বা খেয়াল অন্যরূপ হইত, তাহাই মানিতে হইত।

ফলে ঘরে বসিয়া কাগজে কলমে আঁক কষিলে কোন কালে কোন জিনিসের চলিবে না। বাজার যাচাই করা চাই। প্রকৃতির বাজারও যাচাই করা আবশ্যক। এই কর্ম্মের নাম পর্য্যবেক্ষণ, বা আরও ছোট কথায় অবেক্ষণ। যদ্দ্বারা অবেক্ষণ হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়—চোখ, কাণ, ইত্যাদি। এইগুলি বাহিরের ইন্দ্রিয় - ইহা ছাড়া একটা ভিতরের ইন্দ্রিয় আছে—তাহার নাম মন। দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিতে হইবে, কোথায় কিরূপ বিধান, বা কোথায় কিরূপ খেয়াল। বুদ্ধিবৃত্তির চেষ্টায় ইহার নিরূপণ হইবে না। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি এই সকল বিধান অনুসন্ধান করিয়া মনের দুয়ারে হাজির করিবে; মন বা অন্তরের ইন্দ্রিয় তাহা বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। বুদ্ধি তখন বাজারের বিধানের সংবাদ পাইয়া তদনুসারে আঁক কষিতে বসিবেন। আঁক যে সর্ব্বত্রই ত্রৈরাশিকের নিয়মে হইবে, তাহা নয়।

বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোথায় কি বিধান, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। পরিমাণ মাপিবার জন্য মাপকাঠি ব্যবহার করিতে হয়, করিবে। ইন্দ্রিয় যদি অপটু হয়, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কৌশল-উদ্ভাবন, যন্ত্রের উদ্ভাবন করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দৃষ্টির জন্য চোখে চশমা লাগাইতে হয় লাগাও, দূরবীণ লাগাইতে হয় লাগাও; এ সকল কৌশলময় যন্ত্র ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিবে। কিন্তু চোখটা চাই। চোখ না থাকিলে চশমায় চলিবে না, দূরবীণও কাণা হইবেন। ইহার নাম অবেক্ষণ।

জলের চাপ কত হাত নীচে কত, তাহা মাপিয়া দেখিতে হইবে; অবেক্ষণ দ্বারা ঠিক করিতে হইবে। জলে ডুবিয়া চাপের পরিমাণ মাপা সহজ নহে, তবে চোঙ্গাতে জল পূরিয়া, চোঙ্গার গায়ে উপরে নীচে নানা স্থানে ফুটা করিয়া, কোন্ ছিদ্র হইতে কত বেগে জল বাহির হইতেছে দেখিয়া, কত হাত নীচে কত চাপ, মাপা চলিতে পারে। প্রকৃতিতে সর্ব্বত্র চোঙ্গার বন্দোবস্ত নাই; থাকে ভালই; না থাকে, চোঙ্গা গড়িয়া, তাহাতে জল পূরিয়া, গায়ে ছিদ্র করিয়া, নীচে কত চাপ মাপিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত পূর্ব্বক যে অবেক্ষণ, তাহার নাম পরীক্ষণ। যেখানে অবেক্ষণের সুবিধা পাওয়া যায় না, সেখানে সুবিধা ঘটাইয়া অবেক্ষণের নাম পরীক্ষণ। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ এই দুই উপায়ে আমরা প্রকৃতির বিধান বা বিধাতার

খেয়াল কোথায় কিরূপ, জানিয়া লই। অন্য উপায় নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের সম্বল।

৯

প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের একমাত্র উপায় অবেক্ষণ, বা পরীক্ষণ-সহকৃত অবেক্ষণ। বহুস্থলে প্রকৃতির আচরণের উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমরা অবসর পাই না; সে ক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপায় থাকে না; অবেক্ষণেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি, মেঘ-বৃষ্টি, জল-ঝড়, ভূমিকম্প, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতির উপর আমাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই; আমরা কেবল বসিয়া বসিয়া ঐ সকল ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করি মাত্র; এবং যদি ঐ সকল ঘটনার পারম্পর্য্যে বা সাহচর্য্যে প্রকৃতির কোন বিশেষরূপ খেয়াল বা বিধান দেখিতে পাই, তাহা টুকিয়া যাই। তবে পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যার্থ যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া থাকি ও মাপের জন্য সূক্ষ্ম পরিমাণের জন্য নানা কৌশল উদ্ভাবন করি। কঠিন তরল অনিল বিবিধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানের সময়, উত্তাপের আলোকের তাড়িতের ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিতে ঐ সকল ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক যে সকল জটিলতা আছে, তাহা যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ঐ সকল আনুষঙ্গিক ফলাফলকে আয়ত্ত রাখিয়া, উহা আলোচনা করি, পর্য্যবেক্ষণ করি; এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের নাম পরীক্ষা। এই পরীক্ষা পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াই বিজ্ঞানশাস্ত্র এত অল্পদিনের মধ্যে এত অদ্ভুত ফললাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা বড়ই জটিল; একটা কারণে নানা কার্য্য ঘটে; নানা কারণ একত্র উপস্থিত হইয়া একটা কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে; কোন্ কারণের ফলে কোন্ কার্য্য, তাহা কেবল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন হয়। এই জন্য যতদিন মানুষ কেবল পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট ছিল, ততদিন জ্ঞানের উন্নতি মন্থরগতিতে ঘটিয়াছিল। যেদিন হইতে বুদ্ধিমানেরা প্রকৃতির জটিলতা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিহার করিয়া, নানা কারণের মধ্যে একটি কারণকে সম্মুখে রাখিয়া অন্য কারণগুলিকে কৌশলক্রমে ও চেষ্টাক্রমে বর্জ্জন করিয়া, সেই একটি কারণের ফলে কি কার্য্য হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই জ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইল। এই জন্যই কথায় কথায় বলা হয়, এ কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র মুখ্যতঃ পরীক্ষা প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ফলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অবলম্বিত এই পদ্ধতি কোন পণ্ডিত একদিন সহসা আবিষ্কার করিলেন, তার পর দিন হইতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হইল, এরূপ মনে করা ভুল। যে দিন হইতে কার্য্যসাধনার্থ মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক চেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে,—সে কোন্ দিনের কথা, তাহা ইতিহাসে লেখে না—সেই দিন হইতেই এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের এমন অবস্থা ছিল, যখন মানুষ নিজে অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত না; কিন্তু অগ্নির অস্তিত্ব জানিত না, এমন নহে। অগ্নিগিরি হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়, বজ্রপাতে গাছ জ্বলিয়া উঠে, ভূগর্ভ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনা আরণ্য মানুষের গোচর ছিল, কিন্তু যেদিন কাঠে কাঠ ঘষিয়া বা পাতরে পাতর ঠুকিয়া মানুষ অগ্নির উৎপাদনে সমর্থ হইল, যেদিন অগ্নির উৎপাদনে মানুষে পর্য্যবেক্ষণ ছাড়িয়া পরীক্ষা ধরিল, সেইদিন বুঝিল, এই কাজের এই ফল, এই কারণের এই কার্য্য। সেদিন মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা সহসা বিস্তার লাভ করিল, মানুষের মনুষ্যত্বের মাত্রা সেদিন বাড়িয়া গেল, প্রকৃতির একাংশের উপর তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই দিন একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া ঘটিল, বোধ হয় এত বড় আবিষ্ক্রিয়া মানুষের জ্ঞানের ইতিহাসে পরবর্ত্তী কালে আর ঘটে নাই। চাষা যখন ভাবী ফলের প্রত্যাশায় যথাসময়ে ভূমি চষিয়া বীজ বপন করে, তখন সে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; তাহার কোন বিস্মৃতনামা পূর্ব্বপুরুষ পরীক্ষা দ্বারা যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল, সে তাহাই এখন নিজের কাজে লাগায়; ফলে মানুষমাত্রই এক এক জন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক।

ফলে মনুষ্যে ও পশুতে এইখানে প্রভেদ; পশুও পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানে, কিন্তু চেষ্টা পূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে অসমর্থ; মানুষ পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মনুষ্যের অবলম্বিত উপায়ই এই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান উভয়ই সমার্থক; বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্ট জ্ঞান; সাবধানে বুদ্ধি-পরিচালিত চেষ্টায় উপার্জ্জিত সম্পূর্ণতর জ্ঞান। পশুরও জ্ঞান আছে; প্রাকৃতিক ক্রিয়ানিচয়ের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আছে; সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিতে না চাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু মনুষ্য বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিক; কবে হইতে বৈজ্ঞানিক, তাহা ইতিহাসে লেখে না। সে পর্য্যবেক্ষণও

করে, পরীক্ষাও করে, সেই জন্য তাহার জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। যেদিন হইতে মানুষ বৈজ্ঞানিক হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে পশুত্ব ছাড়িয়া মনুষ্যত্বে উঠিয়াছে।

একালে যিনি মুখ খুলিতে বা কলম ধরিতে জানেন, তিনিই বিজ্ঞানের অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুটা বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না,—যেন বিজ্ঞানের পদ্ধতি দুষ্ট; যেন উহার বিচারে আস্থাস্থাপন অযুক্ত; যেন বৈজ্ঞানিকের কথায় নির্ভর করা অনুচিত। ফলে এই সকল বিদ্রূপোক্তি উপেক্ষণীয়; কেন না, বিজ্ঞানের পদ্ধতিই মনুষ্যমাত্রের অবলম্বিত ও অবলম্বনীয় একমাত্র পদ্ধতি। যিনি উপহাস করিতেছেন, তিনিও অন্য কোন পদ্ধতি জানেন না, তিনিও নিজের জীবনে ঐ একমাত্র পদ্ধতি অজ্ঞাতসারে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহারও ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহাকে প্রকৃতির ক্রিয়ানিচয়ের পারম্পর্য্য ও সাহচর্য্যের অবেক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়াছে; তিনি তাঁহার সাধ্যমত কৌশল উদ্ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অবেক্ষণ ব্যাপারে সমর্থ করিতে সঙ্কোচ করেন না! তিনিও তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্ব-গামীদিগের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে নিজ জীবনযাত্রার পরিচালনায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিনিও যাহা করেন, যাঁহাদিগকে বিশিষ্ট ভাবে বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেওয়া হয়, সেই বৈজ্ঞানিকও তাহাই করেন; তবে তাঁহারও জ্ঞান যেমন অপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকেরও বিজ্ঞান তেমনি অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার কারণে তাঁহার সকল চেষ্টা যেমন ফলপ্রদ হয় না, বৈজ্ঞানিকেরও সকল চেষ্টা তেমনি ফলপ্রসূ হয় না। তাঁহাকেও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যেমন মাঝে মাঝে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয়, বৈজ্ঞানিককেও অপূর্ণ বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তেমনি মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়। অপূর্ণতার দোষ উভয়েরই আছে,—উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তিনি বৈজ্ঞানিককে উপহাস করেন, আর বৈজ্ঞানিক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজনকে মনুষ্যত্বের ধাপে ক্রমশঃ তুলিয়া দেন।

১০

তরল পদার্থের চাপে ফিরিয়া আসা যাক। তরল পদার্থের চাপ সর্ব্বতোমুখ; তবে তাহার পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। যেখানে গভীরতা যত, সেখানে চাপ তত অধিক। কত অধিক, তাহা ত্রৈরাশিকের আঁক কষিয়া বাহির করা চলে, কেন না, এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির তাহাই বিধান।

কতকগুলা চোঙ্গায় বা পাত্রে জল ঢালিয়া যদি পরস্পর কোনরূপ যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সবগুলিতেই জলের পিঠ ঠিক্ সমান উচুঁতে থাকে, একটায় উচ্চতা কম, অন্যটায় বেশী হয় না। একটা গড়গড়ার নল দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া তাহার এক মুখে জল ঢালিলে দেখা যাইবে, দুই ধারের নলে জলের পিঠ ঠিক্ সমান উচ্চে আছে। একটা প্রান্ত উচুতে, অন্য প্রান্ত নীচে ধরিয়া নলকে জলপূর্ণ করিলে দেখা যাইবে, নিম্নস্থ মুখ দিয়া ঊর্দ্ধমুখে জলের ফোয়ারা বাহির হইতেছে, ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া অন্যমুখের জলতলের সমোচ্চ হইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে যত ফোয়ারা আছে—নৈসর্গিক বা কৃত্রিম—সকলেরই মূল এইখানে। নিকটা-নিকটি কতকগুলি পুষ্করিণী বা ইঁদারা থাকিলে, সকল-গুলিরই জলের পিঠ সমান উচ্চে থাকে; গরমি কালে একটার জল যেমন নামে, অন্যগুলিতেও জল তেমনি নামিয়া যায়। এখানে বুঝিতে হইবে, সচ্ছিদ্র মৃত্তিকামধ্য দিয়া জলের সঞ্চরণ ঘটিতেছে; পুকুরে পুকুরে ও কূপে কূপে মাটীর নীচে যোগ রহিয়াছে। বড় সহরের নিকট পাহাড় থাকিলে, পাহাড়ের উপরে জল ধরিয়া সেই জল নলযোগে সহরের লোকের বাড়ী বাড়ী অক্লেশে সরবরাহ করা চলে।

কোন ভারী জিনিস জলে ডুবাইলে তাহা লঘু বলিয়া বোধ হয়;—যেন তাহার ওজন কমিয়া যায়। তাহার কারণ কি? সেই জিনিসের উপর চারিদিক্,—চারিদিক্ কেন দশদিক্—হইতে জলের চাপ পড়ে; আশ হইতে, পাশ হইতে, নীচে হইতে, উপর হইতে চাপ পড়ে। আশপাশের জলের গভীরতা সমান, চাপও সমান; চাপে চাপে কাটাকাটি হইয়া যায়। কিন্তু উপরের জল জিনিসটাকে নীচে ঠেলে, নীচের জল উহাকে উপরে ঠেলে। উপরের জলে গভীরতা কম, ঠেলাটাও কম, নীচে গভীরতা বেশী, ঠেলাটাও বেশী; মোটের উপর উপরের চাপ অপেক্ষা নীচের ঠেলা অধিক হওয়ায় নীচের ঠেলারই প্রাবল্য ঘটে, দশদিকের জল চক্রান্ত করিয়া জিনিসটাকে মোটের উপর উপর মুখেই একটা ঠেল দেয়। তার জন্য উহার ভার অর্থাৎ নিম্নে যাইবার প্রবৃত্তি যেন কমিয়া যায়। সকল জিনিসেরই নিজের একটা ভার বা ওজন আছে; ইহার কথা পরে হইবে। এই ভারের দরুণ সকল জিনিসই নীচে নামিতে চায়। জল কিন্তু চায় ঠেলিয়া তুলিতে। ভার বেশী, ঠেলা কম হইলে জিনিস ডুবে; ভার কম, ঠেলা বেশী হইলে জিনিস ভাসিয়া উঠে।

জলে ভাসিবার সময় জিনিসটার কিয়দংশ জলে ডুবিয়া থাকে, কিয়দংশ জলের উপরে থাকে। নিমগ্ন অংশের পৃষ্ঠে আশপাশের জলের ও নীচের জলের চাপ পড়িতেছে। আশপাশের চাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। নীচের জলের চাপ ঊর্দ্ধমুখে জিনিসটাকে ঠেলিয়া ধরিয়া আছে। জিনিসটার ভার উহাকে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে; জলের ঊর্দ্ধমুখ চাপ উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; এ ক্ষেত্রে যখন জিনিসটা স্থির আছে, নামিতেছে না, উঠিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, উহার ভারের পরিমাণ যত, জলের ঠেলের পরিমাণও ঠিক্ তত।

জিনিসটা ভাসিয়া আছে, উহার কিয়দংশ তখন জলে মগ্ন। খানিকটা জলকে স্বস্থান হইতে সরাইয়া জিনিসটার মগ্নাংশ সেই জলশূন্য জায়গাটুকু অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই মগ্ন অংশের আয়তন যত, যে জলটুকু অপসারিত হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও আয়তন তত। সেই জলটুকু যখন স্বস্থানে ছিল, তখন স্বস্থানে স্থির হইয়াই ছিল, উহার নিজের ভারে নিজে নিম্নগামী হইতে চাহিত, কিন্তু উহার আশপাশের ও নীচের জলের চাপ উহাকে নিম্নগামী হইতে দিত না, স্বস্থানেই স্থির থাকিত। এখন সেই জল স্বস্থান হইতে তাড়িত হইয়াছে। অন্য জিনিসের কিয়দংশ আসিয়া সেই জায়গাটুকু অধিকার করিয়াছে ও আশপাশের জলের ও নীচের জলের ঠেলা পাইয়া সেই স্থানে স্থির আছে। জলে আগে জলকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখন জলে সেই ভাসন্ত দ্রব্যটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। যে চাপে আগে খানিকটা জলকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই চাপে এখন ভাসন্ত দ্রব্যটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। উভয়ত্র একই চাপ, অতএব উভয়ত্র ভারও এক। যে জলটুকু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহারও যে ভার, যে ওজন, এখন যে ভারী জিনিস আসিয়া সেই জলের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারও সেই ভার, সেই ওজন। নতুবা একের স্থান অন্যে পূরণ করিয়া এমনি ভাবে স্থিরভাবে বসিতে পারিত না।

এটুকু বিচারে পাওয়া যায়। জলের চাপ যে সর্ব্বতোমুখ, এই তথ্যটুকু অবেক্ষণলব্ধ ও পরীক্ষণলব্ধ, ইহা তর্কে বা বিচারে পাওয়া যায় না। জলের বেলায় প্রকৃতি ঠাকুরাণীর খেয়াল কেন এরূপ হইল, কেন অন্যরূপ হইল না, এ প্রশ্ন নিষ্ফল। প্রকৃতির যে বিধান প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু মানিয়া

লইলেই ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন আর তৎকর্তৃক অপসারিত জলটুকুর ওজন যে ঠিক্ সমান হইবে, ইহা যুক্তি দ্বারা আসিয়া পড়ে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি জোরের সহিত বলিবে, চারি দিক হইতে ঐরূপে ঠেলিয়া ধরা যদি জলের স্বভাব হয়, তাহা হইলে ভাসন্ত দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হইবেই হইবে। ইহা হওয়া উচিত; ইহার অন্যথা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা অসম্ভব হইত। বিচারের ফলে যে এই নূতন তথ্যটুকু পাওয়া যায়, ইহার যাথার্থ্যে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আবার পরীক্ষা করিয়া, ভাসন্ত জিনিসটাকে নিক্তিতে ওজন করিয়া আর অপসারিত জলটুকুকে নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে পার, উভয় ঠিক্ সমান কি না। দেখিতে পাইবে, সমান হইবে। যদি দেখ, সমান নহে, তবে বুঝিতে হইবে, আমাদের বিচারপ্রণালীতে দোষ নাই, গোড়াতে যে পরীক্ষালব্ধ সত্যের উপর আমরা নির্ভর করিয়াছিলাম, জলের চাপ যে সর্ব্বতোমুখ ভাবিয়াছিলাম, গভীর জলে চাপ অধিক স্থির করিয়াছিলাম, সেই তথ্যনির্ণয়ে ভুল আছে। অবেক্ষণেই ভুল ছিল, তাহাতেই বিচারফলেও এমন গরমিল ঘটিল। গোড়ায় গলদ না থাকিলে এমন গরমিল হইত না।

পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর যুক্তি খাটাইয়া দেখা যায় যে, ভারী জিনিসকে জলে একবারে ডুবাইয়া দিলে তাহার দশ দিকের জলে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধমুখে ঠেলিয়া ধরে, এই ঠেলাটাও ঠিক্ স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান। জলমগ্ন দ্রব্যের ভারের যে লাঘব দেখা যায়, সেই লাঘবের পরিমাণও এইটুকু। অপসারিত জলের যে ওজন, মগ্ন দ্রব্যের ভার ঠিক্ ততটুকুই কমিয়া যায়। জলমগ্ন দ্রব্যের ওজন যদি হয় পাঁচ সেরের ওজন, আর স্থানচ্যুত জলের ওজন যদি হয় তিন সেরের ওজন, তাহা হইলে মনে হইবে দ্রব্যটার ওজন তিন সের পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; জলে ডুবিবার পূর্ব্বে ছিল পাঁচ সের; জলে ডুবিয়া হইয়াছে দুই সের মাত্র। জলে ডুবিলে জিনিস এইরূপে হাল্কা হয়। গ্রীক-পণ্ডিত আর্কিমিদীস এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গল্প আছে, আবিষ্কার করিয়া তিনি আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও বলে, বিজ্ঞানই আনন্দ। ক্রমশঃ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মা।

১

ভবসিন্ধু মায়ের একমাত্র পুত্র। মা একে একে ফুলের মত ছয়টি শিশুকে যমের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং ভবসিন্ধুই তাঁহার অন্ধের নয়ন, খঞ্জের যষ্টি। তাঁহার আদরিণী কন্যা মন্দাকিনীকে তিনি সুপাত্রেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পনের বৎসর বয়সে মন্দাকিনী বিধবা হইল। সেই শোকানল নির্ব্বাপিত না হইতেই তাঁহার স্বামী করুণাসিন্ধু বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে এই আলোকপূর্ণ বসুন্ধরা সহসা তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সংসারে বিধবা কন্যা ও অষ্টাদশ-বর্ষীয় পুত্র ভবসিন্ধু ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না।

ভবসিন্ধুর পিতা করুণাসিন্ধু জমীদারের নায়েব ছিলেন। এরূপ সদাশয় ব্যক্তি জমীদারের নায়েবী করিতে পারেন, ইহা সহসা বিশ্বাস হয় না। জমীদারের নায়েবী ও পুলিসের দারোগাগিরি অনেকটা একই রকম কাজ; ভালমানুষ দারোগার লাঞ্ছনার সীমা নাই। কিন্তু নায়েবী করিতে গিয়া করুণাসিন্ধুকে কখনও লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই; জমীদার তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, প্রজারাও তাঁহাকে ভালবাসিত, পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত; তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ দেখিতেন, তাহাদের কোনও সঙ্গত আবদার অগ্রাহ্য করিতেন না, তাহাদের অনেক সঙ্গীন মামলা আপোষে মিটাইয়া দিতেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। করুণাসিন্ধু যখন চোগাচাপকানে সজ্জিত হইয়া পাল্কী চড়িয়া মহকুমার কাছারীতে হাকিমী করিতে যাইতেন, তখন দর্শকগণ মনে করিত, 'হাঁ, হাকিম বটে!'—মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রিয়াজুদ্দীন হক্‌কে তাঁহার দেহের তুলনায় একটি মক্ষিকা বলিয়া মনে হইত।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করুণাসিন্ধুকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন; অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। করুণাসিন্ধুও তাঁহার কাজ অনেকটা লঘু করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে করুণাসিন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। করুণাসিন্ধু ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের অন্ততঃ বিশখানি গ্রামে 'নায়েব-হাকিম' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

জমীদারের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রজার মা বাপ, এমন নায়েব কখনও কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন না। করুণাসিন্ধুও করুণাময় নাম ভিন্ন পৃথিবীতে কোনও সম্বলই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু এই সম্বলে দুঃস্থ বংশধরগণের দুঃখমোচন হয় না। মৃত্যুকালে তিনি পরিবারবর্গের ভরণপোষণোপযোগী কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কেবল ভবানীগঞ্জের প্রধান উকীল নৃত্যকালী বাবুর কন্যা বিলাসিনীর সহিত পুত্র ভবসিন্ধুর বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। ভবসিন্ধু শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ভবানীগঞ্জের স্কুলে এণ্ট্রেন্স পড়িত।

ছুটীর সময় ভিন্ন ভবসিন্ধু বাড়ী আসিবার অবকাশ পাইত না। পিতার মৃত্যুর পর সে বাড়ীর সহিত সকল সম্বন্ধ এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল; স্নেহের আকর্ষণ জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। কিন্তু দীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থানের ফলে ভবসিন্ধুর হৃদয়ের উপর জননীর স্নেহের আকর্ষণ ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার অন্য কারণও ছিল; বাল্যকাল হইতেই ভবসিন্ধু জননীর সংস্রবে আসে নাই, পিসীমাই বাল্যে তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, সুতরাং পিসীমাকেই সে তাহার হৃদয়ে মায়ের আসনে বসাইয়াছিল। বিধবা পিসীমা ইহাতে হৃদয়ে কতকটা শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের উপেক্ষায় স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় এক এক সময় ক্ষোভে ও অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; তথাপি তিনি মনে করিতেন, "আমার ছেলে কি কখনও পর হবে?"—পিসীমার মৃত্যুতে ভবসিন্ধু মায়ের অভাব অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরালয়ের নূতন আকর্ষণে সে অল্পদিনেই সে অভাব বিস্মৃত হইয়াছিল। নূতনত্বের মোহ তাহার হৃদয়ের ক্ষতের উপর প্রলেপের কার্য্য করিয়াছিল।

কিছুদিন শ্বশুরালয়ের আদর যত্নে 'জামাই বাবু' ভবসিন্ধুর মেজাজ একটু বদলাইল; বিগড়াইল, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। ভবসিন্ধু হঠাৎ আলোকগ্রস্ত হইয়া উঠিল। সোনার চশমা না হইলে কিছুই দেখিতে পায় না, বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুগণকে দেখিয়া শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হয় না, বাল্যকালে সে যে সকল চাষার ছেলের সঙ্গে 'হাডুডুডু', 'চামচু', 'লুকোচুরী' খেলা করিয়াছে, তাহাদের দেখিয়া এখন বলে, 'কি নোংরা!—দেখলে আতঙ্ক হয়!'—এবং এই আতঙ্কনিবারণের জন্য সে স্বদেশী এসেন্সে সুবাসিত সিল্কের রুমাল মুখে দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইত; অথচ রবীন্দ্র বাবুর সেই স্বদেশী গানটি,—

"ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

সর্ব্বদা তাহাকে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে শুনা যাইত!

ভবানীগঞ্জের প্রধান উকীলের স্ত্রী যাহার শাশুড়ী—সে মায়ের কাঙ্গালিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মায়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা কিঞ্চিৎ অসঙ্গত। তথাপি প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইলে, সে বন্ধুগণের বিদ্রূপে বিব্রত হইয়া কয়েক দিনের জন্য কাঙ্গালিনী মায়ের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিল। যে কয়েক দিন সে বাড়ীতে ছিল, সময় নাই অসময় নাই,—সকল সময়ই মা তাহাকে 'এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভবসিন্ধু ভাবিল, "এখান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচি।"

ইহার উপর আরও এক বিপদ! তাহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী মন্দাকিনী প্রবাসী ভাইটিকে এত দিন পরে দেখিতে পাইয়া তাহাকে যে কোথায় রাখিবে, কি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। সুমধুর ভ্রাতৃস্নেহে সেই স্নেহশীল কোমলহৃদয়া বিধবার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রাতার স্নানের জলটুকু হইতে পানের চুনটুকু পর্য্যন্ত সকলই সে যথাস্থানে যথাসময়ে রাখিয়া দিত; এবং ভবসিন্ধু তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকিলে তাহার শূন্য হৃদয় স্নেহরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবসিন্ধু খাইতে বসিয়াছে, মা পাশে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ভব, বৌমাকে বাড়ী না আন্‌লে আর চলচে না; আমার পাঁচ নেই, সাত নেই; ঐ একটি বৌ; বার মাস সে বাপের বাড়ী থাকে, এ কি ভাল দেখায়? কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌লে তিনি কি এতদিন বৌমাকে বাপের বাড়ী রাখতেন? বেটা, বেটার বৌ নিয়ে ঘর করা আমার মনিষ্যি-জন্মের সাধ!"—পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল।

ভবসিন্ধু গুড় ও অম্বল দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুমি ত বৌ আনবার জন্য ধুম লাগিয়েছ, বৌ এখানে এসে খাবে কি?"

মা অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা কিছু রেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে দিন ত এক রকম করে কেটে যাচ্ছে। আমার যে হুতোলা সোনা রূপা ছিল, তা বেচে বেচে এতদিন কাটলো; তুমি

আমার সাত রাজার ধন মাণিক, এত লেখা পড়া শিখেছ, দু' পয়সা আন্‌তে পারলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে। ভগবান চিরকাল কারও দুঃখকষ্ট রাখেন না।"

ভবসিন্ধু বলিল, "সে বড়লোকের মেয়ে, এখানকার কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না, এখন তার আসা হবে না।"

মা অগত্যা নীরব রহিলেন। দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আজ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল।

২

আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ভবসিন্ধু এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া তিনবার এল. এ. পরীক্ষা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহার শ্বশুর নৃত্যকালী বাবু তাহাকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন; পড়াশুনায় তাহার তেমন মনোযোগ ছিল না। সে রিপণ কলেজে পড়িত; কলেজের সময়টুকু ভিন্ন দিবসের অন্য সময় সে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশবাসিগণের অন্নসংস্থানের জন্য চাঁদা তুলিয়া, ভলণ্টিয়ার দলের 'কাপ্তেনী' লইয়া, পাঠাভ্যাসের বড় অবসর পাইত না। মায়ের দুঃখ অপেক্ষা মাতৃ-ভূমির দুঃখেই তাহার প্রাণ অধিক করিয়া কাঁদিত; নিজের ক্ষুদ্র পল্লীর কথা তাহার উদার হৃদয়ে স্থান পাইত না, বিশাল ভারতভূমির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া সে দিন দিন কাহিল হইয়া উঠিল!—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!" গাহিতে গাহিতে যখন সে চাঁদার খাতা লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইত, তখন সে জননীর আত্মত্যাগ, ধাত্রীর স্নেহ হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে না পারিলেও, জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য শ্বশুরের কঠিন-পরিশ্রম-লব্ধ ঘর্ম্মসিক্ত অর্থরাশি নষ্ট করিতে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইত না। বক্তৃতায় করতালি ও দেশোদ্ধার ব্রতে অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদে তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিত। দুঃখিনী মাতা অনাহারে প্রাণত্যাগ করুন, রূপাহাটার পবিত্র পিতৃভবন শ্মশানে পরিণত হউক, দেশোদ্ধারের জন্য সে আত্মবিসর্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক মনে করিল; পরীক্ষায় পাশ ও বৈষয়িক জীবনের সাফল্য তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইল।

তথাপি নিরুদ্যম না হইয়া ভবসিন্ধু চতুর্থবার দুস্তর পরীক্ষা-সিন্ধু উত্তীর্ণ

হইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ভব-রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহার শ্বশুর নৃত্যকালী বাবুর ডাক পড়িল। তিনি উকীলের সামলা ফেলিয়া আর এক বিচারালয়ে সর্ব্বশক্তিমান বিচারপতির সম্মুখে জবাবদিহি করিতে চলিলেন; সেখানে আসামী, উকীল ও হাকিম, সকলেরই একত্র বিচার হয়; কিন্তু সে বিচারালয় কোথায়, ইহজীবনে এ পর্য্যন্ত তাহা কে নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না।

নৃত্যকালীর মৃত্যুর পর ভবসিন্ধু তাঁহার পরিবারে বড় অশান্তিভোগ করিতে লাগিল। তাহার আদর যত্ন অক্ষুণ্ণ রহিল না; তাহার আত্মমর্য্যাদা পদে পদে আহত হইতে লাগিল। নৃত্যকালী বাবুর স্ত্রী তাঁহার পৌত্রগণের অপেক্ষা দৌহিত্রের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নৃত্যকালী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহার কার্য্যে অসন্তোষ-প্রকাশে সাহসী হয় নাই; কিন্তু এতদিনে সংসারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পুত্রবধূগণের সহিত কন্যার দারুণ মনান্তর উপস্থিত হইল। ভবসিন্ধুও 'নিষ্কর্ম্মা', 'ভেতুড়ে' প্রভৃতি কঠোর মন্তব্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না। ভবসিন্ধু সহসা বুঝিতে পারিল, দেশোদ্ধার অপেক্ষা আত্মরক্ষা অধিক আবশ্যক। সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া যাহারা দেশোদ্ধারের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠে, সংসার তাহাদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের অভাবকে উপেক্ষা করে না।

ইতিমধ্যে মদনগঞ্জের মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। উমেদার ভবসিন্ধু দরখাস্ত-হস্তে স্কুলের সেক্রেটারী বামাপদ বাবুর দ্বারস্থ হইল। বামাপদ নৃত্যকালীর পুরাতন মক্কেল ও সুহৃৎ ছিলেন; বন্ধুর জামাতার দুরবস্থার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল; এল. এ. পাশ ও বি এ. ফল উমেদারগণের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ভবসিন্ধুকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। ভবসিন্ধুর স্বদেশ-প্রেমের নদীতে ভাঁটা পড়িল। দুষ্কর স্বদেশী ব্রত ও সরকারের সাহায্য-পুষ্ট বিদ্যালয়ের মাষ্টারী, শ্যাম ও কুল, উভয়ই রক্ষা করা একালে অনেকের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ভবসিন্ধু শ্যামের মধুর বংশীরবে কর্ণপাত না করিয়া কুল-রক্ষায় মনঃসংযোগ করিল।

মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরী করিয়া একালে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা বড় কঠিন ব্যাপার। ভবসিন্ধু স্কুল-বোর্ডিংএর অধ্যক্ষতা-ভার গ্রহণ করায় খোরাকটা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু বিলাসিনী বাপের বাড়ীতে আর

থাকিতে পারিল না। পদে পদে ভ্রাতৃবধূগণের গঞ্জনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। তখন শীতকালে দরিদ্রের একমাত্র সম্বল জীর্ণকাঁথার ন্যায় শ্বশুর-বাড়ীর কথা তাহার মনে পড়িল। পঁচিশ টাকার উপর নির্ভর বলিয়া ভবসিন্ধু স্ত্রী পুত্রকে বাড়ী রাখিয়া আসিল। সে সেই অল্প বেতনে তাহাদিগকে কর্ম্মস্থানে আনিতে সাহস করিল না।

এত কাল পরে পুত্রবধূ ও পৌত্রকে পাইয়া ভবসিন্ধুর মাতা যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মন্দাকিনীও এত দিন পরে সংসারযাত্রার একটা অবলম্বন পাইল; কিন্তু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বিলাসিনী বড়ই বিপদে পড়িল। বিবাহের পর সে কয়েক দিনের জন্য একবারমাত্র শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল। পল্লীজীবনের সুখ দুঃখের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। শ্বাশুড়ী ও ননদের সহিত কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া সংসার করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়,—বিলাসিনীর অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়া উঠিল। শ্বাশুড়ী ননদের স্নেহের বন্ধনে তাহার আত্মাভিমানস্ফীত আত্মসুখান্বেষী হৃদয় আবদ্ধ হইল না; সে তাঁহাদের আদর যত্নের মধ্যেও নিত্য সহস্র ত্রুটীর আবিষ্কার করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ী যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেন; মন্দাকিনী তাহার স্নানের জল তুলিয়া দিত; তাহার কাপড় কাচিত; তাহার শয়নকক্ষ পরিষ্কার করিত; তাহার এঁটো কাঁটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিত। ইহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক্—বিলাসিনী তাহাকে দাসীর ন্যায় উপেক্ষার চক্ষে দেখিত! সে ভবানীগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান উকীলের কন্যা; মলিনবস্ত্রপরিহিতা মূর্ত্তি-মতী সহিষ্ণুতা স্বরূপিণী ভাগ্যহীনা মন্দাকিনীকে সে কি করিয়া তাহার সমকক্ষ মনে করিবে? দরিদ্রা শ্বাশুড়ীকেই বা কি করিয়া সে তাহার মাতৃস্থানীয়া মনে করিবে? দীর্ঘকালেও তাঁহাদের সহিত তাহার মনের মিল হইল না। তাহার মনে হইত, ইহারা উভয়েই অনাবশ্যক উপসর্গমাত্র, বসিয়া বসিয়া তাহার স্বামীর কষ্টার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করিতেছে! এই বাজে খরচ না থাকিলে সংবৎসরের মধ্যে তাহার দু'খানি নূতন গহনা হইতে পারিত!

কিন্তু শিশু ও দেবতার নিকট পাত্রাপাত্র ভেদ-জ্ঞান নাই। তাঁহারা অসঙ্কোচে সকল ভক্তের পূজাই গ্রহণ করেন। ভবসিন্ধুর পুত্র গুণসিন্ধুর

বয়স সবে দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র, এখনও সে সকল কথা স্পষ্ট বলিতে পারে না। কিন্তু ঠাকুরমা তাহাকে কত ভালবাসেন, তাহা সে অতি অল্প দিনেই বুঝিতে পারিয়াছিল। যে সংস্কারবলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃস্তন্য আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, সেই ভগবদ্দত্ত-সংস্কার-বলেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পিতামহীর স্নেহে তাহার জন্মগত অধিকার আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে তাহার পিতামহীর একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা না হইলে তাহার চলিত না। ঠাকুরমা তাহাকে খাওয়াইয়া না দিলে তাহার ক্ষুধা দূর হইত না, এবং তিনি তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া না দিলে তাহার ঘুম আসিত না।

৩

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'গোবিন্দ সামন্ত' লিখিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই মেয়েদের স্নানের ঘাটে 'মেয়ে-পার্লিয়ামেণ্ট' বসিয়া আসিতেছে। রূপাঘাটায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনও কারণ ছিল না। একদিন রূপাঘাটায় সেই মেয়ে-পার্লিয়ামেণ্টে বিলাসিনীর কথা উঠিল। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী গ্রামের গেজেট; গ্রামের সকল সংবাদ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কর্ণগোচর হইত, এবং তিনিই তাহা শাখাপল্লবে, পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়া গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আবক্ষমগ্না হইয়া একখানি সুরঞ্জিত তারকেশ্বরের গামছায় গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে দত্তদের বিধুমুখীকে বলিলেন, "আর শুনেছিস্ বিধু, ও পাড়ার ভবোর বৌর আক্কেলখানা কি রকম? আমি ত বোন, অবাক্ হয়ে গিয়েছি! ঘোর কলি কি না, হলেই বা না হয় তুমি পয়সাওয়ালা উকীলের মেয়ে, তাই ব'লে কি বুড়ো শাশুড়ীকে 'দিবে রাত্তির' দাসী বাঁদীর মত খাটিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়? আর মন্দা ছুঁড়ীর বা কি কষ্ট! বৌ নাইবেন, জল তুলবে মন্দাকিনী; বৌ ভাত খাবেন, এঁটো ফেলবে মন্দাকিনী; বৌ 'আকাচা' কাপড় ছেড়ে রাখবেন, মন্দাকিনী তা কেচে শুকোতে দেবে; মন্দা যেন ওঁর কেনা দাসী!"

বিধুমুখী ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিল, "ওদের কথাই আলাদা; ছেড়ে দাও ওদের কথা; ঘোর কলি না' হ'লে কি এমন হয়! ওঁরা নাকি আবার 'লেখা পড়া' শিখেছেন, ঝাঁটা মারো অমন লেখাপড়ার মুখে! মাগী বড় আশা ক'রে বড় ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল; এখন নাকের জলে চোখের জলে এক হচ্ছে! বেটার বৌর জন্যে পাগল, কবে বৌ

আসবে, কবে সংসার ধর্ম্ম করবে,—ভেবে মাগী 'মালা ফিরোবার' সময় পেত না; তার পর এমন বৌ এসে ঘাড়ে পড়লো যে,—ঐ দেখ মন্দা নাইতে আসচে,—দরকার কি দিদি, পরের কথায়?"

মন্দাকিনী জলে নামিল। বিধুমুখী জিজ্ঞসা করিল, "কি লো মন্দা, বৌ ঘাটে আসে নি?"

মন্দাকিনী। "না, বৌর ঘাটে স্নান করা সয় না। জল গরম করে রেখে এসেছি, বাড়ীতে স্নান করবে।"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "বৌ একটু নড়ে বসে না? পাড়াগাঁয়ে এমন বিবিয়ানা শোভা পায় না; বাপের বাড়ী যা সাজে, শ্বশুরবাড়ীতে তা সাজে না; এখানে ত পাঁচটা বাঁদী দাসী নেই।"

মন্দাকিনী বলিল, "আমরা ত আছি; দেখ ঠাক্‌রুণ, বৌ যদি দু'দণ্ড হেসে কথা বলতো, তা হলেও বুঝতাম—আমাদের পরিশ্রম সার্থক; খাটুনি কিছু হাতে লেগে থাকে না। তা এত করেও, কোন দিন যদি বৌর মন পেলাম; দিবারাত্রি মুখ বিষ। মাকেও কি দুটি ভাল বাক্যি বলা আছে? মার খুব সহ্যগুণ, তা না হ'লে এতদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করতেন!"

বিধুমুখী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা বটে; তোর মার মত লক্ষ্মী এ কলিতে দেখা যায় না। কি অদেষ্ট নিয়েই যে সংসারে এসেছিল, দাসীগিরি করতেই জীবনটা গেল।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "এমন শ্বাশুড়ীকেও ভক্তি করে না?"

মন্দাকিনী বলিল, "হাঁ—ভক্তি করবে! বৌ ভবকেই বড় মানে, তা মাকে মানবে! ভব মাসে কুড়িটি ক'রে টাকা পাঠায়, বৌ হাতে ক'রে তা খরচপত্র করে, মা তার মধ্যে নেই। দ্বাদশীর দিন এক পয়সার গুড় আনাতে হ'লে মা নিজ থেকে পয়সাটি দেন। বৌ একবারও মনে করে না—এরা মায়ে ঝিয়ে একাদশী করে আছে, দ্বাদশীর দিন দুটো একটা পয়সার জলখাবার আনিয়ে দেওয়া দরকার, ওদিকে হাবার মাকে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ মিঠাই আনানোর বেলা খরচে টানাটানি পড়ে না! ভাগ্যে মার হাতে দু পয়সা ছিল, তাই কোন রকমে আমাদের জাত রক্ষা হচ্ছে।"

বিলাসিনীর চরিত্র-সমালোচনা শেষ হইলে পল্লীরমণীগণ স্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন।

মন্দাকিনী বলিল, "বৌ যেন এ সব কথা শুন্‌তে না পায়, তা হ'লে অনর্থ বাধাবে, বাক্যি যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাঁচবে না, মার কাছেও গাল খাব। মা পর্য্যন্ত বৌকে ভয় করে চলেন।"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "ভয় না করে' উপায় কি! চাকুরে ছেলের বৌ, ভয় করতেই হয়। আমাদের তেমন মুখ নয়, আমাদের মুখের কথা কাক-পক্ষীতেও শুন্‌তে পায় না।"

৪

কাক-পক্ষীতেও যে কথা শুনিতে না পায়, সে কথা অলকা নাপ্‌তিনীর কর্ণে প্রবেশ করে। পল্লীরমণীগণের মধ্যে যখন বিলাসিনীর চরিত্র-সমালোচনা চলিতেছিল, সেই সময় অলকা স্নানের ঘাটে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছিল। বলা বাহুল্য, সকল কথাই সে শুনিয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্নে বিলাসিনীকে আলতা পরাইতে আসিয়া সে সেই সকল কথা সালঙ্কারে বিলাসিনীর গোচর করিল। অলকার যে ইহাতে কোনও লাভ ছিল, এমন নহে; তবে এক জনের কথা আর এক জনকে 'লাগানো' তাহার স্বভাব; না বলিতে পারিলে তাহার পেট ফুলিত।

বিলাসিনী আল্‌তা পরিল বটে, কিন্তু তাহার ক্রোধ ও অভিমানের সীমা রহিল না। শাশুড়ী সন্ধ্যাকালে ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন; বিলাসিনী রাগে গর গর করিতে করিতে তাঁহার কাছে আসিল, এবং তাঁহার ক্রোড় হইতে ছেলেকে টানিয়া লইয়া তাহার দুই ডানা ধরিয়া হাত ঝুলাইতে ঝুলাইতে নিজের কক্ষে লইয়া গেল।

বধূর ভাব দেখিয়া শাশুড়ী দুধের বাটী সম্মুখে লইয়া কিছু কাল স্তম্ভিত-ভাবে বসিয়া রহিলেন। যদিও বিলাসিনীর মুখ অষ্ট প্রহর কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নের মত অপ্রসন্ন থাকিত, তবু তিনি সহসা এরূপ 'সাইক্লোনে'র কারণ কি, কল্পনা করিতে পারিলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দা, কি হয়েছে রে?"

মন্দাকিনী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে পরামর্শ করে' কিছু হয় নাকি?—কি হয়েছে, তা তোমার 'গুণধর' বৌকেই জিজ্ঞাসা কর।"

নিরভিমানিনী শাশুড়ী বৌর ঘরের দিকে চলিলেন। গুণি মেজেতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল; ঠাকুরমার ক্রোড় হইতে তাহাকে ছিনিয়া লইয়া যাওয়ায় তাহার বড় দুঃখ হইয়াছিল; সে সহজে দুধ খাইত না, ঠাকুরমা

তাহাকে ভুলাইয়া একটু দুধ খাওয়াইবার জন্য সবেমাত্র গল্প আরম্ভ করিয়াছিলেন,—'এক যে ছিল রাজা'—

নাতি ঠাকুরমাকে সম্মুখে দেখিয়া ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, তাঁহার ক্রোড়ে যাইবার জন্য দুটি হাত বাড়াইয়া বলিল, "ঠাকুমা, আমি আজার গপ্‌লো শুন্‌বো। আমাকে নিয়ে তল, মা আমাকে মেলেতে।"

বিলাসিনী সকোপে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা মেরে ত আর কিছু রাখে নি! মা শত্তুর কি না, লক্ষীছাড়া মিথ্যেবাদী ছেলে! আমার নামে তুই ঠকামো করছিস্, আমি কি কাকেও ভয় করি?"

শাশুড়ী বুঝিলেন, কথাটা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "তুমি আবার কাকে ভয় করবে বৌমা? ভয় করার কথা ত কিছু হয় নি। ভবকে আমি বিস্তর করে মানুষ করেছি, শুণি তারই ছেলে; আমি ওকে দুধ খাওয়াতে বসেছিলাম, তুমি রাগ করে আমার কোল থেকে ওকে টেনে নিয়ে এলে, হয়েছে কি?"

বিলাসিনী বলিল, "না, হয়েছে কি?. তোমরা মায়ে ঝিয়ে লেগেছ; যদি আমি তোমাদের এতই ভার হয়ে থাকি, তবে আমার গলায় ছুরি দিলেই পার, এমন ক'রে দগ্ধে মারা কেন? পথে ঘাটে পরের বৌঝিদের ধ'রে তাদের কাছে আমার এত কুচ্ছো করাই বা কেন? আমার জন্যে আর ভাত রেঁধেও কাজ নেই, আমার ছেলেকে ভালবেসে দুধ খাইয়েও দরকার নেই; খোঁটা খেতে খেতে আমার প্রাণটা ঝালাপালা হয়ে গেল; এত লোক মরচে, আমার মরণ হয় না?"

বিলাসিনীর এই আনুনাসিক বিলাপে গৃহিণী কিছু কাল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর সংযতস্বরে বলিলেন, "বৌমা, তুমি আমার ঘরের লক্ষী, তোমার মনে কষ্ট দেব, এ কথা তোমার মনে করাই অন্যায়। সংসারে কি আমার কোনও কাজ নেই যে, পথে ঘাটে তোমার নিন্দে কুচ্ছো করে বেড়াব? তোমার ছেলেকে যদি কোলে পিঠে করে মানুষ না করবো, ত কোন্ পরের ছেলেকে আদর যত্ন করতে যাব? ছি মা, তোমার অল্প বুদ্ধি।"

বিলাসিনীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। সে উত্তেজিতস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার বড় অল্প বুদ্ধি, আর তোমাদের বড় ভারিক্কে বুদ্ধি, তাই তোমার মেয়ে দুবেলা দুমুটো ভাত রেঁধে দিয়ে যায় না তার কাছে আমার

কুচ্ছো করে বেড়ায়। আমার ত দুটো কান আছে, সব কথা শুন্‌তে পাই। অমন ভাত না রাঁধলেই হয়!"

গৃহিণী দেখিলেন, কথাতেই কথা বাড়ে, সুতরাং চাপিয়া যাওয়াই ভাল; কিন্তু ব্যাপার কি, তখনও পরিষ্কার বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কন্যা মন্দাকিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে মন্দা, তুই ঘাটে পথে বৌমার কথা কাকে কি বলেছিস্‌?"

মন্দাকিনী উভয় হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার দুই চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিল, "চোখের মাথা খাই যদি মন্দ কিছু বলে থাকি; ও পাড়ার বিধু ঠাকুরঝি আজ ঘাটে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, বৌ ঘাটে আসেনি কেন? আমি বল্‌লাম, বৌর শরীর ভাল নয়, আমি গরম জল করে' রেখে এসেছি; বাড়ীতেই স্নান করবে। আমার কথা শুনে নিস্তারিণী দিদি বল্লে, সহুরে বড়লোকের মেয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে নানান্‌ অনিয়ম হচ্ছে—এতে অসুখ বিসুখ হওয়া আর আশ্চর্য্য কি! এই ত কথা, উল্‌কি (অলকা) নাপ্‌তিনী তখন নাইতে গিয়ে ঘড়া মাজ্‌ছিল, সে সেই কথা শুনে, আজ বৌকে আলতা পরাতে এসে বুঝি দশখান করে লাগিয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সেই হারামজাদীই যত নষ্টের গোড়া! এক জনের কথা মিথ্যে করে আর এক জনকে না লাগালে তার ভাত হজম হয় না।"

মন্দাকিনী বলিল, "সেই ছোট লোকের কথা শুনে এত 'গরগরাণি'! কথায় কথায় এত শাসানি গজ্‌রানীই বা কেন? ভবো এসে যেন আমাদের গলায় হাত দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। চুরীও করিনি, ডাকাতীও করিনি; দিবারাত্তির দাসীর মত খেটেও ওঁর মন পাবার যো নেই; লোকে বল্লে—কাকে কান নিয়ে গিয়েছে, নিজের কানে হাত না দিয়ে অমনি কাকের পিছনে ছুটলেন! হাঁ, দোষ করে থাকি, ঝাঁটা মারো, দোষ নেই, ঘাট নেই, শুধু শুধু এ কি বালাই?"

মন্দাকিনীর বীরদর্পে বিলাসিনী কিছু দমিয়া গেল, কিন্তু গোঁ ছাড়িল না; বলিল, "আমি তোমাদের বড় আপদ বালাই হয়েছি, তা আমার জন্যে আর তোমাদের ভাত রেঁধেও কাজ নেই, খোঁটা দিয়েও কাজ নেই, কাল থেকে আমি নিজের ভাত নিজে রেঁধে খেতে পারি খাব, না পারি শুকিয়ে মরবো।"

প্রবল ঝটিকায় মুক্তদ্বার যেমন সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়, বিলাসিনী সেইরূপ

শব্দ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার বন্ধ করিল। সে রাত্রে সে নিজে খাইল না, উঠিয়া ছেলেটাকেও দুধ খাওয়াইল না।—শিশু কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুমা, আমাকে নিয়ে দা, আমি দুদ কাবো, আমার খিদে পেয়েচে!"

মায়ের কর্ণে তাহার সে কাতর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল না; শিশুর ক্রন্দনে ঠাকুমা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য পুত্রবধূর বিস্তর স্তবস্তুতি করিলেন, কিন্তু দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল না, রাগ পড়িল না, বিলাসিনী সাড়াশব্দ দিল না। যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!

শিশু মায়ের মুখের কাছে মুখ আনিয়া উভয় হস্তে তাহার মাথা ধরিয়া বলিল, "মা, ওত, ঠাকুমা দাকৃতে, দুয়োল খুলে দে, আমি দুদ কাবো।"

পুত্রের কথার উত্তরে বিলাসিনী তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিজের পাশে শয়ন করাইল।

শিশু মুখব্যাদান পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—বিদীর্ণহৃদয়া বৃদ্ধা চক্ষুর জলে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন; হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হতাশভাবে দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন; অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিলেন, "হে মধুসূদন, হে হরি, আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, এ সব যাতনা আর আমার সহ্য হয় না।"

৫

বাপের একমাত্র আদরিণী কন্যা বিলাসিনী বাল্যকাল হইতেই একগুঁয়ে। সে যাহা ধরিত, তাহা ছাড়িত না; অবস্থা-পরিবর্ত্তনে যৌবনেও তাহার সে স্বভাব বদ্‌লাইল না।

ভবসিন্ধুকে সকল কথা লিখিয়া—অবশ্য সেই সঙ্গে দশটা মিথ্যা কথাও লিখিয়া—বিলাসিনী শ্বাশুড়ী ননদের সহিত 'পৃথক্' হইল; অর্থাৎ, তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিল। নিজে স্বতন্ত্র এক হাঁড়ি কাড়িল। হাবার মার সাহায্যে তাহার কোনও অসুবিধা রহিল না। ভবসিন্ধুর বড় দয়ার শরীর, সে মা ও ভগিনীকে কি করিয়া অনাহারে রাখে?—সে তাঁহাদের উভয়ের জন্য নগদ পাঁচ টাকা মাসহারার বরাদ্দ করিয়া দিয়া মাতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিল। বিলাসিনীর নিকট মণীঅর্ডারযোগে মাসে কুড়ি টাকা আসিতে লাগিল। এত দিন পরে 'স্বাধীন' হইয়া বিলাসিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র সাহায্য—এই অন্নকষ্টের দিনে দুই জনের ভরণ-পোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাতে "নুণ আন্‌তে পান্তো ফুরোয়, পান্তো

আনৃতে ঘুণ।"—কিন্তু সে জন্য গৃহিণীর মুখে এক দিনও কোনও রূপ আক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই; বরং কেহ তাঁহার সম্মুখে ভবসিন্ধুর ব্যবহারের নিন্দা করিলে তিনি বলিতেন, "ভব আমায় মাসে পাঁচিশটি টাকা উপায় করে, কোথা থেকে বেশী দেবে?"

পাঁচ টাকায় কুলায় না, হাতে যে দু' পাঁচ টাকা ছিল, তাহাতে একাহারী বিধবাদ্বয়ের কোন মতে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ-বয়সে পুত্র যে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দিল—এই কষ্টে তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন।

তাঁহার প্রধান কষ্ট গুণিকে তাহার মা তাঁহার নিকট যাইতে দিত না; পাছে ছেলে পিতামহীর বশীভূত হইয়া তাহার হাত-ছাড়া হইয়া যায়, পাছে নিজের ছেলে পর হয়!

কিন্তু গুণি মায়ের এই সতর্কতা সম্পূর্ণ বাহুল্য মনে করিত; মায়ের ভয়ে সে সর্ব্বদা ঠাকুমার কাছে যাইতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু এই বয়সেই সে মায়ের চক্ষুতে ধূলা দিতে শিখিয়াছিল, বোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক। আহারান্তে মধ্যাহ্নকালে বিলাসিনী যখন মুক্তকেশরাশি প্রসারিত করিয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইত, তখন গুণি অতি ধীরে ধীরে ঠাকুমার রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া কৌতুহল-প্রদীপ্ত-নয়নে ভিতরের দিকে চাহিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিত, "ঠাকুমা—টু-উ-উ-ক্।"

বৃকভানুনন্দিনী প্রেম-বিহ্বলা রাধারাণীর মন যেমন শয়নে স্বপনে শ্যামের বংশীরবের দিকেই পড়িয়া থাকিত, সেইরূপ শিশু নাতিটির ঐ সুমিষ্ট স্বর-টুকুর জন্য বৃদ্ধা ঠাকুমা সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, কিন্তু বধূর অসন্তোষ-ভয়ে তিনি তাহাকে ডাকিতে পারিতেন না। তাহাকে দিনান্তে একবার কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বনের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত; তাঁহার সে আশা সর্ব্বদা পূর্ণ হইত না।

"ঠাকুমা, টু-উ-উ-ক্" শুনিয়াই তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেন, এবং তাহাকে শীর্ণ বাহুপাশে বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ-চুম্বন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে গ্রাম্যবৃদ্ধা-গণের নিকট বিবিধ খাদ্যদ্রব্য উপহার পাইতেন, কেহ কোন দিন দুই চারিটা 'আনন্দের লাড়ু' দিয়া যাইত, কেহ কলাপাতায় জড়াইয়া একটু 'কাসুন্দী' দিয়া যাইত, নাতির জন্য তিনি তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিতেন। গ্রাম্য বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ দেবের সেবা উপলক্ষে মজুমদার-গৃহিণী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে

দেবতার প্রসাদ পাঠাইতেন, তাহা নাতিকে খাওয়াইতে না পারিলে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন না। সন্ধ্যাকালে তিনি ঠাকুর দর্শনে গিয়া রাধা-গোবিন্দের চরণে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর, আমার মাথায় যত চুল, গুণিকে তত বৎসর পরমায়ু দাও।"

বৈশাখ মাসের শেষ দিন গ্রাম্য জমীদার হরিহর বাবুর বাড়ী হইতে 'বৈকালী' আসিয়াছিল, সেই সঙ্গে একটি উৎকৃষ্ট আম্র ছিল। বৃদ্ধা নাতির জন্য তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে গুণি লুকাইয়া ঠাকুমার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে সেই আমটি খাইতে দিলেন। বলিলেন, "আমটা এখানে খেয়ে মুখ ধুয়ে তোমার মার কাছে যেয়ো, বুঝেছ?"

গুণি দাওয়ায় বসিয়া দুই হাতে আমটা ধরিয়া চুষিতে লাগিল। প্রথম জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন, চতুর্দ্দিক্ রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, অদূরবর্ত্তী ঘনপল্লবিত নিম্ববৃক্ষ হইতে নিম্ব-মঞ্জুরীর মৃদু সৌরভ উদ্দাম মধ্যাহ্নবায়ু-প্রবাহে এক একবার ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং একটা শিশু-গাছের নিভৃত পত্রান্তরাল হইতে একটা ঘুঘু কাতর-কণ্ঠে 'ঘুঘু—ঘু ঘুঘু—ঘু' করিয়া ডাকিতেছিল; বোধ হইতেছিল, যেন তাহা নিদাঘ-রৌদ্র-সন্তপ্তা ব্যথিতা পল্লী-প্রকৃতির তৃষিত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার!

গুণি দাওয়ায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই পাকা আমটি চুষিতেছিল, রস-ধারায় উভয় হস্ত ও বক্ষ প্লাবিত; সে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত বলিল, "ঠাকুমা, কুব বালো আম, আমি আল একতা নোব।"

ঠাকুমা বলিলেন, "আর ত নেই দাদা, কাল আনিয়ে দেব।"

ইতিমধ্যে বিলাসিনী নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিল, ছেলে ঘরে নাই। কি সর্ব্বনাশ! ডাইনী বুড়ী ছেলেটাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া আদর করিয়া আম খাইতে দিয়াছে!—রাগে বিলাসিনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, সে ছেলের কাছে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল; তাহার পর তাহার হাত হইতে আমটা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হাবাতে ছেলে, আমের রসে একেবারে গা ভাসিয়ে ফেলেছে! সমস্ত রাত খক্ খক্ ক'রে কেসে মরবে, আর লুকিয়ে লুকিয়ে টোকো আম গিলবে! ভাল বেসে রোগা ছেলের হাতে টোকো আম দেওয়া হয়েছে, অমন ভাল-বাসার মুখে আগুন!"

গুণি কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুমা, মা আমাল আম কেলে নিলতে, আমি

আম কাবো।" পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া বিলাসিনী তাহাকে ঘরে পুরিয়া দরজায় খিল দিল।

৬

বর্ষার সজল কৃষ্ণ মেঘে আষাঢ়ের আকাশ সমাচ্ছন্ন; নববর্ষার ধারাপাতে পরিপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে ভেকের দল আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়া পর্জ্জন্য-দেবের অভিনন্দন করিতেছে। দিবাকর মেঘান্তরালে অদৃশ্য। সমস্ত দিন টিপি টিপি বৃষ্টি পরিতেছে; সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পল্লীপথ জনশূন্য; রাত্রে দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামবাসিগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহিরের কাজ শেষ করিয়া রুদ্ধ গৃহে আশ্রয় লইয়াছে।

ভবসিন্ধুর মা ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাঁহার শয়নকক্ষে একটি মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সপ্তাহ কাল হইতে তিনি জ্বরে ভুগিতেছেন। জ্বর ইতিমধ্যেই বিকারে পরিণত হইয়াছে। অভাগিনী মন্দাকিনী জননীর শিয়র-প্রান্তে বসিয়া পাখা করিতেছে। বৃদ্ধার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়—চক্ষু দুটি নিমীলিত, অস্থিসার বিবর্ণ মুখে রোগের যন্ত্রণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ভবসিন্ধু গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। মায়ের জ্বর হইয়াছে শুনিয়া প্রথমে সে কথায় সে কর্ণপাত করে নাই; বৃদ্ধাও জ্বরকে প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। জ্বরের উপরেই তিনি স্নানাহার করিয়াছেন, বর্ষার জলে ভিজিয়াছেন। জীবনের প্রতি যাঁহার মমতা নাই, স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁহার দৃষ্টি থাকে না; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জ্বরের উপর এত অনিয়ম সহ্য হয় না। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাকে শয্যা লইতে হইল; জ্বর ক্রমে বিকারে পরিণত হইল।

ভবসিন্ধু ডাক্তার ডাকিতে চাহিল। মা বলিলেন, প্রাণ গেলেও তিনি ডাক্তারের ঔষধ খাইবেন না। তখন ভবসিন্ধু অগত্যা গ্রাম্য কবিরাজ তারাচাঁদ গুপ্তকে ডাকিল। কিন্তু তারাচাঁদের বটিকায় কোনও ফল হইল না; রোগের উপশম না হইয়া দিন দিন বিকারের প্রকোপ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বয়স হইয়াছে, চিকিৎসাটাও বড় বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছে; ঔষধে যে আর কোনও সুফল হইবে, তাহা বোধ হইতেছে না। আমার মতে সজ্ঞানে 'গঙ্গাতীরে' লইয়া যাওয়াই ব্যবস্থা।"

গৃহিণী সমস্ত দিন বিকার-ঘোরে প্রলাপ বকিয়াছেন; সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ

নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, রাত্রি নয়টায় সময় নিদ্রাভঙ্গে সহসা যেন তাঁহার বিকারের মোহ কাটিয়া গেল, তিনি স্বাভাবিক স্বরে ডাকিলেন, "ভব!"

ভবসিন্ধু খলে ঔষধ মাড়িতেছিল, মায়ের আহ্বানে তাঁহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এখন কেমন আছ মা?"

গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আর বাবা, আজ রাত্রিটা কাট্‌বে ব'লে বোধ হচ্ছে না, দেখো যেন আমার হাড়খানা গঙ্গায় পড়ে। আমি বাবা বড়ই অভাগী, এক দিনের জন্যেও তোমাদের সুখী কর্‌তে পারিনি। আহা, আমার গুণিকে ছেড়ে যেতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, বাছা আমার কাছে থাক্‌তে কত ভালবাসে! এক দিনও তাকে নিয়ে সাধ-আহ্লাদ কর্‌তে পার্‌লাম না, এ দুঃখ রাখ্‌বার জায়গা নেই। তোমরা বাপ-বেটায় এক শ' বছর বেঁচে থাক, কর্ত্তাদের ভিটেয় যেন প্রদীপটা জ্বলে।"

ভবসিন্ধুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি তোমার অধম সন্তান, আমার অপরাধের মার্জ্জনা নেই, তোমার কুপুত্র তোমার সেবা শুশ্রূষা কিছুই কর্‌তে পার্‌লে না।"—ভবসিন্ধু দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া শিশুর ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গৃহিণী বলিলেন, "কেঁদো না বাবা, তোমার কোনও দোষ নেই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত কষ্টেও যদি বৌমা এক দিন আমাকে মা ব'লে ডাক্‌তেন, হাসিমুখে যদি দুটো কথা বল্‌তেন, তা হ'লে আমি কোনও কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান কর্‌তাম না। একবার গুণিকে আমার কাছে আন, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। আমার আর বেশী সময় নেই।"

ভবসিন্ধু মাতাকে ঔষধ খাওয়াইয়া পুত্রকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিলাসিনী মাদুরে বসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িতেছে; গুণি মায়ের পাশে বসিয়া একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করিতেছে; এত রাত্রেও আজ সে ঘুমায় নাই।

ভবসিন্ধু বলিল, "মা বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষা পান না, তুমি একবার তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে এসো, এত দিন যা করেছ করেছ, এখন তাঁর অন্তিমকাল, আর মনের কোনও গোল রেখ না।"

বিলাসিনী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "সকল তাতেই তুমি আমার দোষ দেখ, এমন অদেষ্ট নিয়েও সংসারে এসেছিলাম! আমার অদেষ্ট যদি ভালই হবে, তা হ'লে বাবা কেন অসময়ে মারা যাবেন?"—

বিলাসিনীর পিতৃশোক সহসা প্রবল হইয়া উঠিল, তাহার চোখের পাতা আর্দ্র হইল।

ভবসিন্ধু একবার আরক্ত-নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিল, কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া সে পুত্রকে কোলে লইয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

গুণি তাহার ঠাকুমার কোলের কাছে বসিল, তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি দিয়া ঠাকুমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ঠাকুমা! তোর ব্যামো হয়েতে? তুই আম কাবি? আমি তোকে পাকা আম দেব।"

ঠাকুমা সস্নেহে বলিলেন, "না দাদা, আমি আম খাব না, তুমি খেয়ো, আমার বড় অসুখ। আজ আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি দাদা!"

গুণি তাহার ঠাকুমার বিবর্ণ রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই কুতা যাবি ঠাকুমা? গঙ্গা নাইতে যাবি? আমি তোল তঙ্গে দাবো। আমি তোকে দেতে দেব না ঠাকুমা, তোল দস্তে আমাল মন কেমন কল্‌বে।"

ঠাকুমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কি আমার ছেড়ে যেতে সাধ? ভগবান্ আমাকে কোলে টেনে নিচ্ছেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি দাদা!"

গুণি বলিল, "আমি দাবো।"

ঠাকুমা বলিলেন, "ষাঠ, ও কথা বলে না; তুমি এক শ' বছর হয়ে বেঁচে থাকো।"

"আবার কবে আস্‌বি ঠাকুমা?"—ম্লান দীপালোকে বালক মরণাহতা বৃদ্ধা পিতামহীর মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন করিল। তাহার চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইল।

ঠাকুমা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, "আর আস্‌বো না দাদা, আমার সময় শেষ হয়েছে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হোক।"—তাহার পর তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা ভব, মন্দা থাক্‌লো, সে জনম-দুঃখিনী, যত দিন বাঁচে, দু-মুঠো ভাতে তাকে বঞ্চিত করো না।"

ভবসিন্ধু বলিল, "মা, তোমাকে আর এ কথা বল্‌তে হবে না; আমি না বুঝে তোমাদের উপর বড় অন্যায় করেছি; এত দিনে আমার ভুল ভেঙেছে, আমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর।"

মা বলিলেন, "ও কথা বলো না বাছা, তুমিই তোমার বাপ পিতামহের জলপিণ্ডের ভরসা, তোমার মত ছেলে কয় জন পায় ? আমার আর কোনও কষ্ট নেই। হে হরি, হে মধুসূদন, আমার বাছাদের মঙ্গল ক'রো, আমার অপরাধে এরা যেন কষ্ট না পায়। মন্দা, মা, তুই ভবোর কি বৌ-মার অবাধ্য হস্‌নে, তাদের মনে কষ্ট দিস্‌নে, এ সংসারে আর তোর কে আছে মা ? বাবা ভব, আমার বুকের মধ্যে কেমন কর্‌চে, চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, বৌ-মাকে একবার ডাক্‌লে না ?"

ভবসিন্ধু ব্যস্তভাবে বিলাসিনীকে ডাকিতে চলিল ; শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল, পুস্তকখানি বুকের উপর রাখিয়া সে নিদ্রা যাইতেছে। সে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছে—এমন সময় মন্দাকিনী ঝড়ের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভব, শীগ্‌গির এসো, মা কেমন কর্‌চেন।"

ভবসিন্ধু আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া মায়ের নিকট চলিল ; দেখিল, হিক্কা আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষু বিস্ফারিত, সে চক্ষুতে অস্বাভাবিক দীপ্তি ; অতি কষ্টে নিশ্বাস বহিতেছে, ঘর্ম্মধারায় সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা !

ভবসিন্ধু উদ্বেলিতস্বরে ডাকিল, "মা !"

মা অতি কষ্টে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হরি হে, দীনবন্ধু, অন্তিমে চরণে স্থান দাও।"

গুণি ঠাকুমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল। তাঁহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া দুই হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "ঠাকুমা, তোল কি হয়েতে ? ঠাকুমা, আমাকে তোলে নে, আমাল ভয় লাগ্‌তে।"

মন্দাকিনী সরোদনে জননীর কর্ণমূলে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দুই চারি বার অস্ফুটস্বরে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" বলিলেন ; ক্রমে তাঁহার চক্ষুর উপর মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল ; সন্ সন্ করিয়া বেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল ; ঝম্ ঝম্ শব্দে মুষলধারায় বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল।—যেন প্রলয়কাল সমুপস্থিত ! মন্দাকিনী মাতার পদতলে নিপতিত হইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—"মা গো মা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমার দুঃখিনী মেয়েকে ফেলে যেও না মা, তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো ; আমার যে আর কেউ নেই মা !"

ভবসিন্ধু কোনও মতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। মায়ের প্রতি সে এত দিন যে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখে, কষ্টে, অনুতাপে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

এমন সময় বিলাসিনী সেই কক্ষে আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "দেখ দেখি আক্কেলখানা! ছেলেটাকে কোথায় ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিলাসিনী তাহার শিশু পুত্রকে ডাকিল, কিন্তু সে নড়িল না। সে তাহার ঠাকুমার মুখে হাত দিয়া বলিল, "ঠাকুমা, তুই ঘুমিয়েছিস্? ওট, আমাকে তোলে নে।"

বিলাসিনীর আর সহ্য হইল না। সে পুত্রের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। তখন শিশু উভয় হাতে তাহার পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুমা, আদ আমি তোল কাতে থুয়ে থাক্‌বো, আমি মাল কাতে দাবো না; আমাকে তোলে নে।"

বিলাসিনী পুত্রকে টানিয়া সেই কক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুমা, আমাকে তোলে নে, আমি তোল পাকা তুল তুলে দোব, ঠাকুমা, আমাকে তোলে নে।"

ঠাকুমা তখন সংসারের সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার চির-বধির কর্ণে শিশুর সেই কাতর ক্রন্দন প্রবেশ করিল না। বাহিরে উদ্দাম ঝটিকা সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সৌদামিনী-স্ফুরণে চতুর্দ্দিক মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইয়া ধরাতল গভীরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; কড় কড় বজ্রনাদে প্রকৃতি-দেবীর হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা পরিব্যক্ত হইল; দিগন্তব্যাপী মেঘ শোকাচ্ছন্ন প্রকৃতি-দেবীর অশ্রুবর্ষণের মত মুষলধারায় বারিবর্ষণে ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সুদীর্ঘ পরমায়ু।

মিঃ চার্লস ব্রাণ্ডেথ সে দিন 'লণ্ডন ম্যাগাজিন' নামক মাসিকপত্রে, কিরূপে মানব-জীবন ব্যাধি ও অকাল-বার্দ্ধক্যের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, সে বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেচনিককের জীবাণু সম্বন্ধীয় মতামতের সমর্থন করিয়া একটি সুললিত সন্দর্ভের অবতারণা করিয়া-

ছিলেন। সাধারণের মতে, মানব সচরাচর সত্তর পঁচাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। কিন্তু আজ কাল তিন কুড়ি দশ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যে কয় জন পঞ্চাশ অতিক্রম করিতে পারে? আর যাঁহারা অশীতি বা শতাবধি বৎসর কাল জীবনধারণ করিতে পারেন, তাঁহারা শত বা সহস্রের মধ্যে কয় জন? কিন্তু এরূপ স্বল্পায়ুঃ হইয়াও দীর্ঘ জীবনের আশা কেহ কখনও পরিত্যাগ করে নাই। সকল যুগে এবং সভ্য-জগতের সর্ব্বত্র সকল সময়ে পরমায়ু যাহাতে বৃদ্ধি পায়, এ জন্য কত শত মনীষী ব্যাকুল হইয়াছেন। পরজন্মে বা পরকালে যাহাই হউক না কেন, ইহকালে ইহধাম ত্যাগ করিতে সকলেরই নিতান্ত মায়া হইয়া থাকে; আর সেই অন্তিমকালের শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় আমরা সকলেই ত্রস্ত হইয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকি। সুনিপুণ চিকিৎসকগণ যখন জীবন-ধারণের কাল কথঞ্চিৎ দীর্ঘ করিবার প্রয়াস পান, তখন কয় জন তাহাতে বাধা দিয়া থাকি? সেই জন্যই 'সঞ্জীবনী সুধা' পান করিয়া কিরূপে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারি, তাহাতে সকলের এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই সুধার অংশ লইয়া সেই জন্য আমাদিগের দেবাসুরের মধ্যে এত বাদ-বিসংবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-অশান্তি সংঘটিত হইয়াছিল! আর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বোধ হয়, এই অমরতা-লাভের আশায় চীন-সম্রাট্ 'চীহংটী' 'সুখদ্বীপে'র অন্বেষণে মহাসমারোহে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন। যাজীকর 'হুচী' তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিল যে, তথাকার অধিবাসিবৃন্দ যে পানীয় পান করে, তাহার বলেই তাহারা অমরতা লাভ করিয়া থাকে। আর আজ অধ্যাপক মেচিনিকফ (Metchnikoff) সেই সঞ্জীবনী-সুধার আবিষ্কার করিয়া মানবসমাজ হইতে রোগ, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য নির্ব্বাসিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রীযুত ইলায়াস্ মেচনিকফ ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে রুসিয়ার অন্তর্গত চার্কোভো প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য কৃষক ছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার যথেষ্ট বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায়, এবং অচিরাৎ তিনি তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রীতিমত পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্র ও প্রাণিবৃত্তান্তের অনুশীলন ব্রতী হন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ওডেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে প্রায় ষোড়শ বর্ষ কাল যাপন করিবার পর ১৮৮৬ অব্দে যখন বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইল, তখন তিনি রুস গবর্মেণ্টের আদেশে জীবাণু-পরীক্ষা-মন্দিরের ডাইরেক্টর বা অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই সময়ে পাস্তুর (Pasteur) যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া করেন, তৎসমুদয়ে মেচনি-কফ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। পরবর্ত্তী গ্রীষ্মাবকাশে ফ্রান্স-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্যারিসে অব-স্থানকালে ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ পাস্তুরের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হয়। এই পরিচয়ের পর; তিনি ওডেসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফরাসীরাজ্যে তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত করিবার মানসে পাস্তুর-ইন্সিষ্টিউটে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত সেই মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছেন। তাঁহার অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া ফরাসী গবর্মেণ্ট তাঁহাকে গত ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে সেই বিখ্যাত ইন্সিষ্টিউটের সহকারী অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রারম্ভ হইতেই মেচনিকফের চিত্ত জীবাণুবাদতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত কতিপয় রোগের বীজাণু সম্বন্ধে বহু বাগবিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছিল। তবে ফ্যাগোসাইট

(phagocyte) সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত মতামত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহাকে চিরকাল বৈজ্ঞানিক জগতে অমর করিয়া রাখিবে।

মানবদেহে বহুবিধ জীবাণু বর্ত্তমান আছে। এই ফ্যাগোসাইট তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক মনুষ্য-শরীরে রক্তের সহিত এই ফ্যাগোসাইট শরীরের সর্ব্বত্র চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। পুলিস যেমন মানবসমাজের শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে, সমাজের অহিতকারী ব্যক্তিমাত্রকেই ধৃত করিয়া রীতিমত শাস্তিবিধান করিয়া থাকে, অন্যায় দেখিলেই তাহার প্রতিবিধান করা যেমন পুলিসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনই এই ফ্যাগোসাইট জীবাণু ব্যাধির বীজাণু শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অহিতসাধন করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে রীতিমত আক্রমণ করিয়া থাকে। এই ফ্যাগোসাইটদিগের গতিশক্তি এত ক্ষিপ্র যে, কোনও ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ করিবামাত্র ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফ্যাগোসাইটের প্রাণশক্তিও নিতান্ত প্রবল, এবং এই জন্য কোনও অহিতকর বীজাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে নিঃশেষিত করিবার প্রয়াস পায়।

আমাদিগের শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এই ফ্যাগোসাইট জীবাণুকুল অতিসহজেই কোনও রোগের বীজাণুকে এক প্রকার চিনির মত পদার্থ নিঃসৃত করিয়া নিঃশেষিত করিয়া ফেলে; কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলে, যদিও ফ্যাগোসাইটকুল অধিকমাত্রায় তাহাদের কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তথাপি কোনও কোনও অবস্থায় তাহারা ব্যাধির বীজাণু-দিগের নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে মানবদেহ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পূর্ব্বে এই ফ্যাগোসাইট-জীবাণুবাদে কোনও বৈজ্ঞানিক কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন নাই। তাহার পরে প্রায় পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় ও পরিশ্রমেরফলে মেচনিকফ তাঁহার এই মত বৈজ্ঞানিক-জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মেচকনিকফের মতে, এই ফ্যাগোসাইটের সংখ্যা যদি মানবদেহে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত করিতে পারা যায়, আর যদি এই ফ্যাগোসাইটকুলের শক্তি কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে হয় তো শরীরে কোনও প্রকার ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর ব্যাধির মন্দির না হইয়া শরীর যদি সর্ব্বসময়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে সাধারণের মত অকালে জরাক্রান্ত হইতে হয় না। আর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া যদি চিরকাল সবল থাকে, আর কখনও অকাল-বার্দ্ধক্যে কষ্ট পাইতে হয় না, আর সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরমায়ুর বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

মেচনিকফ তাঁহার পরীক্ষাগারে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মানবকুল কেহই তাহার পূর্ণ পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারে না। আমাদের শরীরের বার্দ্ধক্যের জন্য যে বিকলতা ও জড়তা আসিয়া থাকে, তাহা মেচনিকফের মতে, শরীরের পেশী ও স্নায়ুক্ষয়-কারী নানাবিধ জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। জরাসংঘটনপটু এই জীবাণুকুল প্রায়ই শরীরের উদরমধ্যস্থ বৃহৎনালীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। মেচনিকফ এই ক্ষয়কারী জীবাণুকুলের ধ্বংসকরী ক্ষমতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে

এই ধ্বংস নিবারণ করিতে পারা যায়, আর কি পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহা ফ্যাগোসাইটের সহিত একত্র এই সমুদয় বিষময় জীবাণুগণের বিনাশসাধন করিতে পারে, তিনি তাহারও একটি সুব্যবস্থার আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই ক্ষয়কারী জীবাণুকুলের বীজ প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ ও স্থবির ব্যক্তির পুরীষ হইতে এই পাচনশীল (putrefactive) বীজসার প্রস্তুত করিয়া অল্পবয়স্ক গরীলা ও মর্কটের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহার ফলে এই মর্কটকুল অচিরাৎ বার্দ্ধক্যে বিকলাঙ্গ হইয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হয়। গরীলা কিংবা মর্কট মানবজাতির নিতান্ত সদৃশ ও সন্নিহিত বলিয়াই যে মেচনিকফ কেবল তাহাদের দেহে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এমন নহে। তিনি কতিপয় বাদুড়, খরগোস ও ইন্দুরের দেহেও এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপে যখন মেচনিকফ বার্দ্ধক্যজননশীল জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, তখন তিনি কিরূপে তাহার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহার উপায়-উদ্ভাবনে অবহিত হইলেন। দুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তিনি তাহাতেই প্রথমে হস্তক্ষেপ করিলেন। দুগ্ধ, দধি, বা তক্র (ঘোল) দ্বারা পচন নিবারিত হয়, তাহা তিনি অনেক সময়ে স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছিলেন। অনেক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দধি বা তক্রে কৃষকেরা মাংস অনেক দিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখে, তাহাতে মাংস অবিকৃত থাকে, কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায় না। এইরূপ পচননিবারক দুগ্ধের দ্বারা হয় ত শরীরের মধ্যে যে পচন (Putrifaction) কার্য্য সর্ব্বদা সম্পন্ন হইতেছে, তাহারও দূরীকরণ হইতে পারে। অনেক স্থলে এমনও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, কতিপয় জাতীয় লোকে কেবলমাত্র দুগ্ধই প্রধান আহার্য্য রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই দুগ্ধ বা তজ্জাত আহার্য্যসেবী জাতির লোকদিগের মধ্যে যে সমস্ত বৃদ্ধ বা বয়স্থ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেশ সুস্থ ও সবল; এবং অবাধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় ব্যক্তির পরিত্যক্ত অসারাংশ পরীক্ষা করিয়া অণুবীক্ষণ-সাহায্যে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই সমস্ত দুগ্ধসেবীর শরীরমধ্যে যে পরিমাণ জরাজননশীল জীবাণুর সংখ্যা, দুগ্ধ যাহাদের প্রধান খাদ্য নহে, তাহাদের শরীরের জরাজননশীল জীবাণুর সংখ্যা অপেক্ষা অনেকপরিমাণে অল্প। এই সমস্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া মেচনিকফ দুগ্ধ ও তজ্জাত বস্তু হইতে অকাল-বার্দ্ধক্যের করাল কবল হইতে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ডাক্তার মাইকেল কোহাণ্ডি, নিউইয়র্কের ডাক্তার হেটার, ডাক্তার পোকন, অধ্যাপক হেবাম প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ, সুনিপুণ মনীষিগণ মেচনিকফের যাবতীয় পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মতের সম্যক্ সমর্থন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ দুগ্ধ হইতে মাখম তুলিয়া লইতে হয়। তাহার পর সেই দুধ 'জ্বাল' দিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা করিতে হয়। তাহার পর ইহাতে সামান্যপরিমাণ 'দম্বল' দিয়া দই পাতিতে হয়। দুগ্ধ বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে অনেক প্রকার উৎকট ও সাংঘাতিক ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে; সেই জন্য দুগ্ধের বিশুদ্ধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নানা প্রকার পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বুলগেরিয়া প্রদেশস্থ দুগ্ধজাত দধি বা তক্রে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী বীজাণু জন্মিয়া থাকে।

মেচনিকফ বুলগেরিয়া-দুগ্ধজাত দধিকেই দধলরূপে ব্যবহার করিয়া অতীব বিশুদ্ধ দুগ্ধে দই বসাইয়া তাঁহার জরা ও বার্দ্ধক্য-নাশক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথমতঃ কতিপয় শ্বেত মূষিক-শাবকের দেহে পরীক্ষা করেন। তাহাতে আশাতীত সুফল লাভ করেন। দুই দল মূষিক লইয়া তিনি আরম্ভ করেন। দুই দলের সকলকেই তিনি জরাজননশীল বীজাণু দ্বারা রোগান্বিত করেন। তাহার পর দ্বিতীয় দলের সকলকে এই দুগ্ধৌষধ প্রদান করিয়া সুস্থ রাখেন। প্রথমদলস্থ সকলে জরা ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া অচিরাৎ কালকবলে পতিত হয়। এইরূপে তিনি গিনিপিগ, সারমেয়, বানর প্রভৃতি অনেক প্রাণীর দেহে তাঁহার পরীক্ষা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। একটি বানরশিশুর শরীরে তিনি জরাজননশীল বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অচিরাৎ সে জরাজীর্ণ হইয়া অকাল-বার্দ্ধক্য লাভ করিল। তাহার পর সেই অবসন্নদেহ বানরশিশুকে বুলগেরিয়া-দুগ্ধ-জাত দধি আহার করিতে দিলে, প্রায় ছয় মাস কালের মধ্যে সে পুনরায় সুস্থ ও সবল হইল; তাহার নবযৌবন লাভ হইল, এবং তাহার পরিত্যক্ত পুরীষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সঙ্গে সঙ্গে জরা ও বার্দ্ধক্যের বীজাণুর সংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। দুগ্ধের মধ্যে যে জীবাণু আছে, তাহা হইতে এক প্রকার অ্যাসিড বহির্গত হইয়া শরীরমধ্যস্থ ফ্যাগোসাইটের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

মেচনিকফ নিজের শরীরে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬৫ বৎসর—সুতরাং সাধারণের মতে তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি আজ প্রায় আট বৎসর ধরিয়া তাঁহার আহার্য্যের সঙ্গে প্রচুরপরিমাণে তাঁহার আবিষ্কৃত বুলগেরিয়া-দুগ্ধজাত জরানাশক দধি খাইয়া থাকেন। তাহার ফলে, তিনি বিলক্ষণ উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদি জরানাশক এই ঔষধ পান করিলে দেহ রোগহীন ও সুস্থ থাকে, তাহা হইলে অশীতিপর বৃদ্ধ চল্লিশ বৎসরের বলিষ্ঠ মানবের মত কার্য্যক্ষম ও সুস্থদেহ থাকিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশে মুনি-ঋষিগণ ফলমূল ও ধেনুদুগ্ধ পান করিয়া সুস্থদেহে অনেক কাল জীবিত থাকিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। আর অধুনা মেচনিকফ প্রমুখ মনীষিগণ এই দুগ্ধ-জাত দধি ও তক্র প্রভৃতি প্রধান আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া যেরূপ আশাপ্রদ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

কোয়া জাতি।

গোদাবরী বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এজেন্সি প্রদেশে কোয়া নামক এক অসভ্য জাতির বাস। এজেন্সি প্রদেশ পূর্ব্ব ঘাটের কতক অংশবিশেষ, এবং ছোট ছোট পাহাড় ও শৈলবাহুতে পরিবেষ্টিত। এই সকল পাহাড়ের অধিকাংশ স্থানই ঘন জঙ্গলে পরিবৃত। এজেন্সিতে লোকের বসতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোদাবরী বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

লোকের বাস, কিন্তু এখানেও প্রতিবর্গ মাইলে উর্দ্ধসংখ্যক ৫১ ঘর লোকের বসতিও যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। কোয়া জাতির ভাষার নাম কোয়ি। ভদ্রচলমের প্রায় অর্দ্ধভাগ অধিবাসী ও পোলাভরম তালুকেরও প্রায় একচতুর্থাংশ অধিবাসী উক্ত ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। সমগ্র এজেন্সি প্রদেশের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ সহস্র। ইহাদের মধ্যে কেবল কোয়া জাতিই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। গোদাবরী এজেন্সি ব্যতীত ভিজাগাপেটম জিলার পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রায় ১১০০ শত কোয়া জাতির বাস।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে এজেন্সি প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা কৃষিপ্রধান স্থান। এই সকল পার্ব্বত্য জাতির কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। বৎসরের প্রথম চারি পাঁচ মাস প্রায়ই বৃষ্টি হয় না; উত্তাপের মাত্রাও অত্যধিক। পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ শস্যাদি রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া যায়। কাজেই এ সময়ে কৃষিকার্য্য একেবারে বন্ধই থাকে। এই সময়ে কোয়ারা জঙ্গলে কাজ করিয়া বেড়ায়। এজেন্সি প্রদেশে সমস্ত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ১৫৭ বর্গ মাইল। এ সময়ে ইহারা শাল, সেগুণ, বাঁশ প্রভৃতি পার্ব্বত্য বৃক্ষাদি কাটিয়া সংগ্রহ করে। এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ সমতলভূমিতে আনিয়া তাহারা বিক্রয় করে। মধু, মোম, তেঁতুল প্রভৃতিও প্রচুরপরিমাণে সংগৃহীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

কোয়া জাতি অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া থাকে। গিলিগু বৃক্ষ হইতে এই চারি মাস এক প্রকার রস নির্গত হয়। সেই রস হইতে এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার ফলে দিবসের সমগ্র কাল ইহারা নেশায় এমনই জ্ঞানহারা হইয়া থাকে যে, সে সময় ইহাদিগের নিকট হইতে কোনও কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই পানাসক্তির প্রাবল্যের প্রধান কারণ, আমাদের দেশের ন্যায়, কোয়াজাতির মধ্যে আবগারী আইন নাই। পুরুষদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এ দোষ নাই বলিলেও চলে। তাহারাই এ সময় সংসারের সমুদয় ভার বহন করিয়া থাকে।

জুন মাসের মধ্যভাগেই উত্তর-পূর্ব্ব বিভাগের কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে বৃষ্টিও যথেষ্ট হয়। ইহারা সাধারণতঃ চোলাম, রাগি, কম্ব ও জনারের চাষ করিয়া থাকে। পদুচাষই এখানকার বিশিষ্ট চাষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পাহাড়ের গাত্রে ঢালু জমী ও সমতল ভূমি ও ঘন জঙ্গলই পদুচাষের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। জঙ্গলের কিয়দংশ পরিষ্কার করা হইলে সেই সকল স্থানে বহু কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালান হয়, এবং তাহাদেরই ভস্মের মধ্যে পদুর বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। পর বৎসর ইহার জন্য অন্য একটি স্থান মনোনীত হয়। এই-রূপে ক্রমে ক্রমে জঙ্গলের অনেকাংশ এখন বেশ পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে। জঙ্গলগুলি একে-বারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া এখন পদুচাষের কেহ পক্ষপাতী নহে; এবং রামপা প্রদেশ ব্যতীত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলে ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রামপা প্রদেশে ফরেষ্ট আইন চপ্রলিত নাই।

অনেক বন্যজন্তুও এই সকল জঙ্গলে বাস করে। ব্যাঘ্র, চিতা, বন্যশূকর, বন্যমহিষ প্রভৃতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোয়া জাতি এই সকল হিংস্র-জন্তুপরিবৃত জঙ্গলেই বাস করে বলিয়া, কখনও বা ক্রীড়াচ্ছলে, কখনও বা আত্মরক্ষার জন্য, এবং কখনও বা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পারিতোষিক পাইবার আশায় বন্দুকের সাহায্যে এই সকল হিংস্র জন্তু বধ করিয়া থাকে।

এই কারণে শিকারকার্যে ইহারা সবিশেষ পটু। বন্দুক ও তীরধনু ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। সকলেরই নির্ম্মাণকৌশল কোয়া জাতির শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। এজেন্সিতে ময়ূর, উৎকৃষ্ট পারাবত, ময়না প্রভৃতি বহুবিধ সুন্দর পক্ষীও পাওয়া যায়। আমোদ উপভোগের জন্য কিংবা বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা এই সকল পক্ষী পুষিয়া থাকে। পক্ষীগুলির বর্ণসৌন্দর্য্য এমন রমণীয় যে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা এখানে আসিলেই সেই সকল পক্ষী ক্রয় করিয়া থাকেন। সহজেই নয়ন আকৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়াও কোয়া জাতি ইউরোপীয় জাতির সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

এজেন্সি প্রদেশে ম্যালেরিয়া ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। অধিবাসিবৃন্দ প্রায়ই এই সকল রোগে যন্ত্রণা ভোগ করে। শীতকালেই রোগের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ কম্প দিয়া প্রত্যহ কিংবা একদিন অন্তর জ্বর আসে। দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপী প্রবল জ্বর ভোগ করিয়া রোগী একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কুইনাইন ইহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। অধিকাংশ সময়েই শিকড়, পত্র, গাছ গাছড়া প্রভৃতির সাহায্যে জ্বর আরাম হয়। প্রতিষেধকরূপে আবার অনেকে আফিমও ব্যবহার করে। সমতল ভূমিতে অনেক সময়ে মৃগনাভি প্রভৃতি অতি মূল্যবান ঔষধ স্ত্রীলোকদিগের উত্তাপবৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস, গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধই বিশেষ উপকারী।

প্রকৃতির এমন বদান্যতা সত্ত্বেও কোয়াদিগের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সাধারণতঃ কৃশ, অস্থিচর্ম্মসার। এত সুবিধা সত্ত্বেও ইহারা এত কষ্টকর জীবন বহন করে কেন, ইহা সমস্যার বিষয়। বিশেষ কারণ এই যে, ইহারা সরলপ্রকৃতি, অল্পে সন্তুষ্ট, জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশক কয়েকটি দ্রব্য পাইলেই ইহারা নিশ্চিন্ত। আধুনিক সভ্যজগতের আলোকে এখনও ইহারা অন্ধ হয় নাই। সাহুকর-জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত ইহাদের বেশ সম্প্রীতি আছে। ইহারা তাহাদিগকে যথেষ্ট বিশ্বাসও করে। কোয়ারা বনজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে এই সকল ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে কাপড়, তামাক, দিয়াশালাই, আফিম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, আজকাল এই সকল ধূর্ত্ত সাহুকার ব্যবসায়ীগণ কোয়াদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া বেশ ধনশালী হইয়া উঠিতেছে।

কোয়াদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা একেবারেই নাই। কোয়ি তাহাদিগের কথিত ভাষা। গবর্মেণ্টের স্থাপিত দুই একটি বিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তেলিগু ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত গোদাবরী বিভাগের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা চারি জন মাত্র শিক্ষিত। আবার এজেন্সি প্রদেশের মধ্যে শতকরা দুই জনেরও অল্প লোক শিক্ষিত।

কোয়া জাতির মন্ত্রের যথেষ্ট অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক গুপ্ত ও অদ্ভুত ক্ষমতারও তাহারা পরিচয় দিয়া থাকে। যদি কেহ তাহাদের এই সকল মন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের ক্রোধের আর সীমা থাকে না; সর্ব্বতোভাবে তাহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে। এমন কি, সময়ে সময়ে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস, ইহারা সর্প ও বৃশ্চিকদংশনের ভাল ঔষধ জানে। কিন্তু যাঁহারা এই সরলপ্রকৃতি কোয়া জাতিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই এই সকল অমূলক গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতে

পারিবেন না। অনেকে কোয়াদিগের নৃত্যকুশলতার কথা শুনিয়া থাকিবেন। ইংরাজেরা ইহাদের নৃত্যকলার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। এই নৃত্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়ই আনন্দের সহিত যোগদান করে। পুরুষেরা এক প্রকার শিরোভূষণে সজ্জিত হইয়া একটি করিয়া ঢাক লইয়া আসে। এই সকল শিরোভূষণে একটি বৃষশৃঙ্গ ও রাশি রাশি ময়ূরপুচ্ছ আবদ্ধ থাকে। তাহারা এক স্থানে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া সেই সকল ঢাক বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিতে থাকে, এবং স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ আর একটি বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া সেই সকল বাদ্যের সহিত তালে তালে সুমধুর কোয়ি ভাষার গানে ও নৃত্যে শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়া থাকে।

কেয়ো জাতি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কৃষিকার্য্যের। প্রারম্ভে তাহারা ভূমির সন্তোষবিধানের জন্য তাহার পূজা করিয়া থাকে। এই পূজার নাম "ভূমি পন্দন্ত"। তাহাদের বিশ্বাস, এই পূজার ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বৃষমাংস তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। কোনও উৎসবাদির সময় তাহারা প্রচুরপরিমাণে মহিষ, বৃষ ও গাভী হত্যা করিয়া থাকে। এই সকল মাংস তাহারা ভোজের সময় ভক্ষণ করে। যদি উপযুক্ত মাংস সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে কোনও প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চুরী করিয়া আনিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

গবর্ণমেন্ট ইহাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। ইহাদের উপর কোনও কর নির্দ্ধারিত নাই। এমন কি, এজেন্সি প্রদেশের কিয়দংশে করেষ্ট আইন অবধি প্রচলিত নাই। কোনও আবগারী নিয়মের মধ্যেও ইহারা আবদ্ধ নহে। জমীর খাজানাও এখানে অতি অল্প। এজেন্সি প্রদেশের কয়েকটি গ্রামে ১৮৯৯ ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বসতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি তালুকের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গ্রামই ইজারায় বিলি করা হইয়াছে। ভদ্রচলম তালুকের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি গবর্মেণ্টের অধিকৃত গ্রামের অধিবাসিগণ পূর্ব্বে তিন একার জমীর খাজানা মোট চারি আনা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত, এক্ষণে সেই স্থলে প্রতি একারে চারি আনা ধার্য্য হইয়াছে।

ইহাদিগকে যে সর্ত্তে গবর্মেণ্ট জমি বিলি করিয়াছেন, তাহা নরম্যান অধিকারের পর ইংলণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থার অনুরূপ। জমীর জন্য গবর্মেণ্টকে প্রতি বৎসর ইহারা তরবারি, ধনু, বর্শা, তীর প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীগুরুদাস আদক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—বৈশাখ। এই সংখ্যায় 'প্রবাসী' দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'অহল্যা' নামক একখানি চিত্র। 'চিত্র-পরিচয়ে' প্রকাশ,—'অহল্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অমুতগুহৃদয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তপোনিরত অবস্থায় তিনি পাষাণমূর্ত্তিবৎ হইয়াছেন। চিত্রকরের এই কল্পনা সুন্দর হইয়াছে।' কিন্তু 'চিত্র-পরিচয়ে'র অন্তর্য্যামী নকীব ফুকারিয়া না বলিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম না। পাষাণ-প্রাচীরে চিত্রিত নারীমূর্ত্তি তপোমগ্না মানবী নহে, তাহা কোনও 'অশিক্ষিত-পটু' পটুয়ার 'হিজি-বিজি' বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বামিত্রের আদর্শ বোধ করি ফৌজদারী বালাখানার কোনও মোগল 'নানবাই'। মাথার মোহনচূড়া অবশ্য চিত্রকরের মৌলিক কল্পনা। রাম ও লক্ষ্মণ 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নূতন আবিষ্কার;—দেখিয়া গিরিশ বাবুর সেই গানটি মনে পড়িল,—"সখী! নাহি জানহু, সোহি পুরুষ কি নারী!" রামের একটি হস্তের বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাকে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দি, তিনি যদি অস্ত্রোপচারে এই বক্র পাণি-পল্লবকে সোজা করিতে পারেন! শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "নবীন সন্ন্যাসী" নামক একখানি উপন্যাস কাঁদিয়াছেন।—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অতএব আমরা প্রতীক্ষা করিব। এই উপন্যাসেও একখানি চিত্র আছে। শ্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'প্রবাসী'র জন্য শাদা কাগজে কালীর 'আঁচোড়' কাটিয়া এই অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। ইহা যদি চিত্র হয়,

তাহা হইলে 'চিত্রের অপমান' কাহাকে বলিব ? 'প্রবাসী' কি ক্রমে 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র 'পড়ুয়া'দিগের তালপাতায় পরিণত হইল ? কেহ 'অহল্যা আঁকো' বলিয়া রঙ্গ ছড়াইতেছেন ; কেহ বা 'মৃত্যুশয্যায়—ব্রজকিশোর লেখো' বলিয়া কালী ছিটাইতেছেন ! শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিরহ কাব্য' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কালিদাসের মেঘদূতের 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' করিয়াছেন। অথচ উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'ইহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাম দিতে চাই না।' বেশ। কিন্তু গোলাপকে যে নামেই ডাকুন, সে গোলাপই থাকিবে। তবে আপনি ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বহু আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন ; আপনার এ আবদারটি আমরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে শিরোধার্য্য করিলাম।—কিন্তু এখন কিছু দিন বিশ্রাম করিলে হয় না ? গেরোবাজ পায়রার মত "আমাদের মন কেন ডানা মেলিয়া অপরিচিতের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে চায়,"—তাহা যখন কবি—আপনিই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছেন না, তখন আমরা—অকবি—তাহার কি উত্তর দিব ? কিন্তু অনেকের মত এই যে,—অতিশ্রান্ত রচনাক্লান্ত মন, বোধ হয়, ডানা মেলিয়া বিশ্রামের আশায় দূরে—নির্জ্জনে—অপরিচিত খোপে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগীর 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' উল্লেখযোগ্য। 'সংকলন ও সমালোচনে' নানা সন্দর্ভের অনুবাদ আছে। ভাষা বাঙ্গালা বটে, তবে মিশ্র! শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'লোক-শিক্ষা'য় যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, অত অল্প পরিসরে সে প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নহে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মত পাকিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি কাঁচাই পাড়িয়াছেন ; জাগে রাখিয়া থাকিবেন, কিন্তু রঙ্গ ধরা দূরে থাকুক, এখনও ডাঁশে নাই। রামেন্দ্রবাবুর এরূপ অসাবধানতা ও ব্যস্তবাগীশতা এই প্রথম দেখিলাম। একটা নমুনা এই,— 'বর্ত্তমান কালের প্রাইমারি ইস্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া বামন কায়েতের ছেলে সঙ্গতি থাকিলে ইংরেজি পড়িতে যায় ও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকের একটা সদ্গতি হয়। কিন্তু চাষার ছেলে, তাঁতির ছেলে, মুদির ছেলে, যাহাদের জন্য মুখ্যতঃ এই লোকশিক্ষা, অহাদের পরিণামটা একবার চিন্তনীয়। প্রাইমারি স্কুল হইতে বাহির হইয়া অর্থাভাবে তাহারা ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে না ; এ দিকে চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরিতে, তাঁতির ছেলে তাঁতে বসিতে ও মুদির ছেলে তুলদাঁড়ী হাতে লইতে লজ্জা বোধ করে।'—ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু পাঠক! রামেন্দ্র বাবুর 'সঙ্গতি থাকিলে' কথাটির উপর লক্ষ্য করুন। সঙ্গতি না থাকিলে 'বামন কায়েতের ছেলে'ও যে গোল্লায় যায়, তাহার কি ? আর 'সঙ্গতি থাকিলে' 'চাষার ছেলে, তাঁতির ছেলে, মুদীর ছেলেও কৃষ্ণ-বিষ্ণুতে পরিণত হইতে পারে ;—হইয়া থাকে। অনেক চাষার ছেলে, তাঁতির ছেলে, মুদীর ছেলে 'বামন কায়েতে'র ছেলের মত জীবন-যুদ্ধে সফল হইয়াছে।—তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইতেছে, 'সঙ্গতি'ই মূল। সঙ্গতি থাকিলে, এই অসম্পূর্ণ প্রাইমারি বিদ্যাও ভাবী জীবনের ভিত্তি হইতে পারে। রামেন্দ্রবাবু বলেন,—'দৌড়াদৌড়ি' লাফালাফি, গাছের ডালে বসিয়া ঝুলনবাজিতে * * * জড়জগতের সহিত যেরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভ ঘটে, কোনও বোধোদয় বা বিজ্ঞান-পাঠের সাহায্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। ইহা নির্জ্জলা, খাঁটী কবিত্ব,— টাকায় /৪ সের দরে বিক্রীত হইতে পারে।—এ ভাবে প্রকৃতির সহিত 'অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভ' ঘটে কি ? বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া, নিপুণ তত্ত্বদর্শী চক্ষু লইয়া রামেন্দ্রবাবু মাঠে ঘুরিলে সে পরিচয় লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র মাঠে চরিয়া তাহা লাভ করিবার আশা সাধারণ মানব-শাবকের নাই। কেন না, সকলে নিউটনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় 'বাঙ্গালা অক্ষর' বদলাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক সহসা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। যখন চীনা অক্ষরে চলিতেছে, তখন বাঙ্গালা অক্ষরেও চলিবে। বাঙ্গালা হরপ, ত তাহার তুলনায় সোনারচাঁদ! আমরা আর নূতন করিয়া বর্ণ-পরিচয় করিতে পারিব না।

☞ বৈশাখের মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ৬৪ পৃষ্ঠার চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে যথাক্রমে 'সার যোশুয়া রেণল্ড' ও 'রেণল্ডে'র স্থলে 'ল্যাণ্ডসীয়ার' করিয়া লইবেন।

কালিদাস ও ভবভূতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চরিত্রাঙ্কন;—১। দুষ্মন্ত ও রাম।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, মহাভারতের দুষ্মন্ত এক জন ভীরু লম্পট মিথ্যাবাদী রাজা। তাঁহার রাজকীয় গুণরাশির মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই। তাঁহার যে গুণ ছিল, সকল রাজারই প্রায় সে গুণ থাকিত। তিনি মৃগয়াশীল, শ্রমসহিষ্ণু, রণশাস্ত্রবিশারদ বীর ছিলেন—কিন্তু তিনি রঘুর মত দিগ্বিজয় করেন নাই, অর্জ্জুনের ন্যায় সমবেত কৌরব সৈন্য পরাজিত করেন নাই। দুষ্মন্তে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা নাই, কর্ণের উদারতা নাই, ভীমের বল নাই, লক্ষ্মণের উৎসর্গ নাই, বিদুরের তেজ নাই। দুষ্মন্ত অতি সাধারণ ব্যাপার!

কালিদাস তাঁহার এই নাটকে দুষ্মন্তকে অনেক উঠাইয়াছেন, অনেক বাঁচাইয়া গিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা নির্দ্দোষ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর সুপেশী ও বিশাল বটে, এবং তিনি মৃগয়াশীলও বটে—

> অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
> রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
> অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
> গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয়!—ইহাতে এইমাত্র প্রমাণ, হয় যে, তিনি বিলাসে মগ্ন হইয়া দিবারাত্র অন্তঃপুরে বাস করেন না; তিনি শ্রমসহিষ্ণু। কিন্তু ইহা দোষহীনতা; গুণ নহে। এই শ্রমসহিষ্ণুতা দ্বারা তিনি কোনও মহৎ কার্য্য সাধন করেন নাই। মৃগয়া করিতেছেন,—ব্যাঘ্র কি ভল্লুক নহে, পলায়মান হরিণ। আর এই মৃগয়াকে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্যসন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—যাহার জন্য সেনাপতি ইহার সপক্ষে ওকালতী করিতেছেন—

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥

কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষীণ যুক্তি। প্রাণিগণের চিত্তবিকার সম্বন্ধে জ্ঞান মৃগয়ায় যেরূপ হয়, তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। Darwin কিংবা Lubbuck মৃগয়া দ্বারা ইতর প্রাণিগণের চিত্তবিকারাদি অবগত হয়েন নাই, অবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের এ সব জানিতে হইয়াছিল। মৃগয়ায় মানুষ মেদশ্ছেদ-কৃশোদর হয় বটে, কিন্তু প্রাণিহত্যা না করিয়াও বহুবিধ ব্যায়াম দ্বারা তাহা সংসাধিত হয়; এবং পৃথিবীতে চিত্তবিনোদনের উপায়েরও অভাব নাই। বস্তুতঃ সেনাপতি এ যুক্তিটুকু না দিলেও নাটকের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হইত না।

তাহার পরে কালিদাসের দুষ্মন্ত রাক্ষসের অত্যাচারনিবারণের জন্য কণ্ব মুনির আশ্রমে কতিপয় দিবস যাপন করিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তিনি সে আশ্রমে বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। বিদূষক উচিত কথাই বলিয়াছিল যে—'এটি আপনার অনুকূল গলহস্ত।'

তদুপরি, রাজা মধ্যে মধ্যে এক একবার হুঙ্কার দিতেছেন বটে। যেমন তৃতীয় অঙ্কের শেষে "ভো ভোস্তপস্বিনঃ মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট অয়মহমাগত এব" ইত্যাদি। কিন্তু সে শৌর্য্য শরতের মেঘের মত—গর্জ্জে, বর্ষে না। তাঁহার কোনও বীরত্ব পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল হুঙ্কারমাত্র! কেবল সপ্তম অঙ্কে একবার দেখি, তিনি দানব দমন করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিতেছেন। কিন্তু সে ব্যাপার মাতলি যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা দুষ্মন্তের পক্ষে বড় গৌরবের কথা নহে—

সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরবধ্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥

সে দানবগণকে দেবরাজ বধ করিতে পারেন না যে, এরূপ নহে—তাহারা দেবরাজের অবধ্য—যেরূপ গো-জাতি হিন্দুর অবধ্য। এবং দেবরাজের শৌর্য্য দিবাকরের ন্যায়, আর দুষ্মন্তের শৌর্য্য নিশাকরের ন্যায়

এরূপ স্তোকবাক্য মাতলি উহ্য রাখিলে দুষ্মন্ত বোধ হয় সমধিক তুষ্ট হইতেন। দেবরাজ তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সভায় বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে ইন্দ্রের সৌজন্য।

দুষ্মন্তের আর একটি গুণ এই যে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বিপ্রবাক্যে আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু সেরূপ আস্থাবান্,—ভারতের সকলেই ছিল। তাহাতে কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। বরং দেখি, তিনি মহর্ষির আশ্রমে অতিথি থাকিয়া শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করায়—ঋষিদিগের প্রতি একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, এবং এক মহর্ষির পুণ্যাশ্রম কলুষিত করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার উচিত ছিল শাপ দুষ্মন্তকে দেওয়া। প্রতারিতা শকুন্তলাকে তিনি ক্ষমাও করিতে পারিতেন।

তাহার পরে দুষ্মন্ত মাতৃ-আজ্ঞা রাখেন বটে—কিন্তু বয়স্যকে দিয়া। "সখে মাধব্য! ত্বমপ্যম্বাভিঃ পুত্র ইব গৃহীতঃ" বলিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে মাধব্যকে সরাইলেন, স্বয়ং চলিলেন—"তপোবনরক্ষার্থম্" নহে—সেটা মিথ্যা কথা। তিনি চলিলেন শকুন্তলার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে। এই দ্বিতীয় অঙ্কেই রাজার সত্যবাদিতার পরিচয় পাই। তিনি বয়স্যকে বুঝাইলেন,—

> ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সহ বর্দ্ধিতো জনঃ।
> পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ॥

মহিষীদিগের অসূয়ার ও ভর্ৎসনার ভয় রাজার এখন হইতেই হইয়াছে। কালিদাস হাজারই ঢাকুন, হাজারই রং মাখান, মনের পাপ যাইবে কোথায়! কালিদাস মহাকবি। এ ব্যাপারে যেরূপ মনের অবস্থা ঘটিবেই, তাহা তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া বাহির হইবেই।

প্রথম অঙ্কে দেখি, রাজা নিজের পরিচয় গোপন করিয়া শকুন্তলার সমক্ষে মিথ্যা কহিতেছেন। অথচ নিজে চোরের মত লুকাইয়া সমস্ত শুনিলেন, এবং যেটুকু বাকী রহিল, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। এ স্থলে রাজার লুকাইয়া শোনায় ও মিথ্যা পরিচয় দেওয়ায় কি সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারিত! প্রবঞ্চনা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে লোকে করে না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ শকুন্তলাকে একটু যাচাইয়া লওয়া। আমি মহারাজ, এ কথা হঠাৎ বলিলেই শকুন্তলা প্রাণ খুলিয়া আর কথা কহিতেন না

অতএব বিবাহের পূর্ব্বে একটু রসিকতা করা যাক্;—এইরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কালিদাসের দুষ্মন্তের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ দেখিতে পাই যে, তিনি ধর্ম্মভীরু। এমন কি, তাঁহার যাহা প্রধান কলঙ্কের কথা—শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান—কালিদাস ধর্ম্মভয়কেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন,—

"ভো স্তপস্বিনঃ! চিন্তয়ন্নপি ন খলুস্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ কথমিমামভিব্যক্তসত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।"

কিন্তু ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য বিশেষ বাড়ে না। প্রত্যেক ভদ্র-ব্যক্তিরই আচরণ এইরূপ। সুন্দরী রমণী দেখিলেই যাহার কামের উদ্রেক হয়, এবং হইলেও যে ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে না পারে, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে, সে পশু। কালিদাসেরই মতে, রঘুবংশীয় প্রত্যেক রাজারই "মনঃ পরস্ত্রী-বিমুখপ্রবৃত্তি।" ইহাতে অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। Byronএর Don Juan সংসারে বিরল। প্রায় প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তিই পরদারকে মাতা বলিয়া জানে। এরূপ না হওয়াই নিন্দার কথা, হওয়ায় প্রশংসার বিষয় বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস তাঁহার দুষ্মন্তকে গুটিকতক মনোহর সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, কালিদাস দুষ্মন্তকে এক জন উৎকৃষ্ট চিত্রকর-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা স্বচিত্রিত শকুন্তলাচিত্র দেখিয়া, উৎকৃষ্ট চিত্রের লক্ষণ কি, তাহা বিদূষককে কহিয়া দিতেছেন—

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥

সেই চিত্র দেখিয়া স্বয়ং চিত্রার্পিত শকুন্তলাকে প্রকৃত শকুন্তলা বলিয়া মিশ্রকেশীর ভ্রম হইতেছে। পরিশেষে সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে স্বয়ং চিত্রকরের ভ্রমোন্মাদ হইল। তিনি শকুন্তলা-বদন-কমলাভিলাষী চিত্রিত মধুকরকে দেখিয়া কহিতেছেন—

"অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে! কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি।"

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরীন খলু মধু ত্বাং বিনা পিবতি॥

তথাপি মধুকর উড়িয়া গেল না দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন —

ভো ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি হি—

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং দশসি চেদ্‌ভ্রমর প্রিয়ায়া ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥

বিদূষক দেখিলেন, রাজার চিত্তবিভ্রম হইয়াছে। তাই ভীত হইয়া রাজাকে বুঝাইলেন—"ভো, চিত্তং কৃখু এদং"।

তখন রাজার চমক ভাঙ্গিল—"কথং চিত্রম্!"

এরূপ চিত্রনৈপুণ্য যাঁহার, তিনি এক জন সাধারণ চিত্রকর নহেন।

পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব্ব মধুর শ্লোকে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখি। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া আসিয়া রাজা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজসভায় বসিয়া নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে রাজা বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতেছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

রাজার কি যেন মনে পড়িতেছে, অথচ পড়িতেছে না। তিনি অগাধ সুখে একটা অগাধ বিষাদ অনুভব করিতেছেন; কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই একটি শ্লোকে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার সমাচ্ছন্ন প্রেম ও তাঁহার সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞান আমরা একত্র সম্মিলিত দেখিতে পাই। এ প্রেম যেন দুর্ব্বাসার অভিশাপকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। এ সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞান যেন কবির কবিত্বকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। চিন্তা ও অনুভূতি, বিরহ ও মিলন, স্থৈর্য্য ও উচ্ছ্বাস এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যেন তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্রের উপর প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ললিত জ্যোৎস্নার উপর বনানীর ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। Shakespeare এক স্থানে বলিয়াছেন—

If music be the food of love, play on :
Give me excess of it, that surfeiting
The appetite may sicken and so die
That strain again ; it had a dying fall
O it came o'er my ear like the sweet south,
That breathes upon a bank of violets
Stealing and giving odour.

অতি সুন্দর ! কিন্তু তাহাও এই শ্লোকের কাছে লাগে না। এতখানি অর্থ তাহার মধ্যে নাই। এক সঙ্গে বিজ্ঞান ও কবিত্ব তাহাতে নাই। এক সঙ্গে পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্ম তাহাতে নাই। এক সঙ্গে অপ্সরার নৃত্য ও মর্ত্তের বেদনা, প্রভাতের আশা আর সন্ধ্যার বিষাদ, মাতার রোদন ও শিশুর হাস্য তাহাতে নাই।—এ শ্লোক অতুল।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার একটি প্রকৃত রাজকীয় সদ্‌গুণ দেখি। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রাজার রাজ্যশাসনপ্রথার একটি নমুনা পাই।

নগরপালকের শ্যালক ও রক্ষিদ্বয় এক ধীবরকে বাঁধিয়া আনিতেছে। ধীবর রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় কোথা হইতে পাইল ? ধীবর বুঝাইতেছে যে, সে এক রোহিত মৎস্যের উদরে সে অঙ্গুরীটি পাইয়াছে। নগরপালের শ্যালক অঙ্গুরীয়টি ঘ্রাণ করিয়া দেখিল ; 'হাঁ, ইহাতে মৎস্যের গন্ধ আছে বটে', বলিয়া সে অঙ্গুরীয়টি লইয়া রাজার কাছে গেল। ইত্যবসরে, ধীবরকে মারিবার জন্য রক্ষিদ্বয়ের হাত শুড় শুড় করিতেছে (এটা রক্ষীদের চিরকালই করে, দেখা যাইতেছে)। তাহার পর নগরপালের শ্যালক পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিল, "নিগতং এদং।" অমনই ধীবর মনে করিল, গিয়াছি—"হা হদোম্হি"। তাহার পর নগরপালের শ্যালক ধীবরকে মুক্ত করিয়া দিতে কহিল, এবং ধীবরকে রাজদত্ত পারিতোষিক দিল। রক্ষী কহিল যে, বেটা যমের বাড়ী থেকে ফিরে এলো।—বলিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ধীবরকে ছাড়িয়া দিল। ধীবর শূলদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল দেখিয়া রক্ষীদের যে বিশেষ ক্ষোভ হইয়াছিল, তাহা তাহার পরেই দেখিতে পাই। ধীবর সেই পারিতোষিকের অর্দ্ধেক রক্ষিদ্বয়কে মদ খাইবার জন্য দিলে, তবে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন হইল।

দেখা যাইতেছে যে, তখনও পুলিসের প্রভাব এখনকার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। কয়েদীকে মারিবার জন্য তখনও তাহাদের হাত শুড় শুড় করিত। মানুষের স্বভাব! ইতরলোকের হস্তে শক্তি, বালকের হস্তে তরবারি, ঘাতকের হস্তে বল, ইহাদের প্রায়ই একই অবস্থা ঘটে। তাহার পরে তখনকার পুলিসের যে শুদ্ধ মারিতে নয়, উৎকোচ গ্রহণ করিতেও হাত শুড় শুড় করিত—তাহাও এই দৃশ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই দুর্দান্ত পশুবৎ মনুষ্যও দুষ্মন্তের রাজত্বে দূর হইতেও অপ্রিয় রাজাজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করে না। রাজার এইরূপ দৃঢ় কঠোর শাসন।

এই নাটকে রাজার আর একটি কোমলত্ব দেখি। দেখি—তিনি রাজ্ঞী-দিগকে দস্যুর মত ভয় করেন। শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে রাজ্ঞী আসিয়া পড়িলে তিনি ভয়ে চিত্রখানি লুকান, রাজ্ঞীদের ভয়ে বয়স্যকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, তাঁহার কথিত শকুন্তলা-বৃত্তান্ত সমস্ত অমূলক পরিহাস; বিরহে রাজ্ঞীদের সমক্ষে সহসা অসতর্ক মুহূর্ত্তে শকুন্তলার নাম করিয়াই লজ্জায় অধোমুখ হয়েন।—ইহাকে গুণ বলিব, কি দোষ বলিব, তাহা জানি না। সময়বিশেষে ইহা গুণ, এবং সময়বিশেষে ইহা দোষ।

দুষ্মন্তের চিত্রনৈপুণ্য ও সঙ্গীতাভিজ্ঞতা, উভয়ই কলাবিদ্যায় পার-দর্শিতামাত্র, চরিত্রের গুণ নহে। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ এমন কোনও গুণরাশি নাই, যাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। মহাভারতের দুষ্মন্ত-চরিত্রের উপরে কালিদাস গিয়াছেন বটে। তথাপি তিনি দুষ্মন্ত-চরিত্রকে একটি আদর্শ-চরিত্র করিতে প্রয়াসী হন নাই—এবং যদি হইয়া থাকেন ত কৃতকার্য্য হ'ন নাই। তাঁহার ন্যায় অতিথি কোনও গৃহে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার ন্যায় পতি কোনও নারী শিবের কাছে বর চাহিবেন না। তাঁহার ন্যায় বীর কোনও দেশে বরণীয় হইবেন না। তাঁহার মত রাজা হউক বলিয়া কোনও প্রজা ঈশ্বরের কাছে মাথা খুঁড়িবে না।

এই ব্যক্তি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়ক। পাঠক কহিবেন, তবে কি হইল? এ দুষ্মন্ত-চরিত্রের যদি কোনও বিশেষত্ব নাই, তবে এ নাটক এত জগদ্বিখ্যাত নাটক হইল কি প্রকারে! তাহার উত্তর এই যে, দুষ্মন্ত এইরূপ

সামান্য-চরিত্র হইলেও কালিদাস তাঁহাকে লইয়া খেলাইয়াছেন চমৎকার। তাহাই এখন দেখাইব।

এই নাটকের বস্তুতঃ তিন ভাগ। প্রথম ভাগ প্রথম তিন অঙ্কে—প্রেম। দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে—বিচ্ছেদ। তৃতীয় ভাগ শেষ দুই অঙ্কে—মিলন। প্রথম ভাগে রাজার পতন, দ্বিতীয় ভাগে উঠিবার চেষ্টা, তৃতীয় ভাগে উত্থান।

দুষ্মন্তের চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহার এই পতনে ও উত্থানে। মৃগয়াসূত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার যত দূর সম্ভব পতন হইল। লুকাইয়া শোনা, মিথ্যা করিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া, শকুন্তলাকে দেখিয়াই আপনার উপভোগ্যা নারী বিবেচনা করা, মাতৃআজ্ঞায় উদাসীন হওয়া ও মাধব্যকে ছল করিয়া রাজধানীতে পাঠানো এবং মিথ্যা বলা, এবং বিবাহান্তে কণ্ব মুনির আগমনের পূর্ব্বেই চৌরের মত পলায়ন করা—যতরূপ গর্হিত কাজ করা সম্ভব, তিনি করিয়াছেন। পাপাচারে কেবল একটিমাত্র পুণ্যের রেখা—তাঁহার গান্ধর্ব্ব বিবাহ। একমাত্র ইহাই তাঁহাকে প্রথম তিন অঙ্কে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার উঠিবার পথ রাখিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়াছেন;—পতনের চরম সীমা। এই অঙ্কে দেখি, রাজা সেই বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন—একবার উপরে উঠিতেছেন, আবার ডুবিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সভায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেও রাজা সঙ্গীত শুনিয়া উন্মনা হইতেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বর্ত্তমানে অতীত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে! শকুন্তলা তাঁহার সভায় আসিলে সম্মুখে যখন ঋষিগণ শপথ করিতেছেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা—তাঁহার তখন সন্দেহ হইতেছে,—"কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।" কিন্তু স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলার "নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্য" দেখিতেছেন, তাঁহার লোভ হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিতেছেন, "ভবত্যনির্ব্বর্ণ্যং খলু পরকলত্রম্"। শকুন্তলার উন্মুক্ত বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
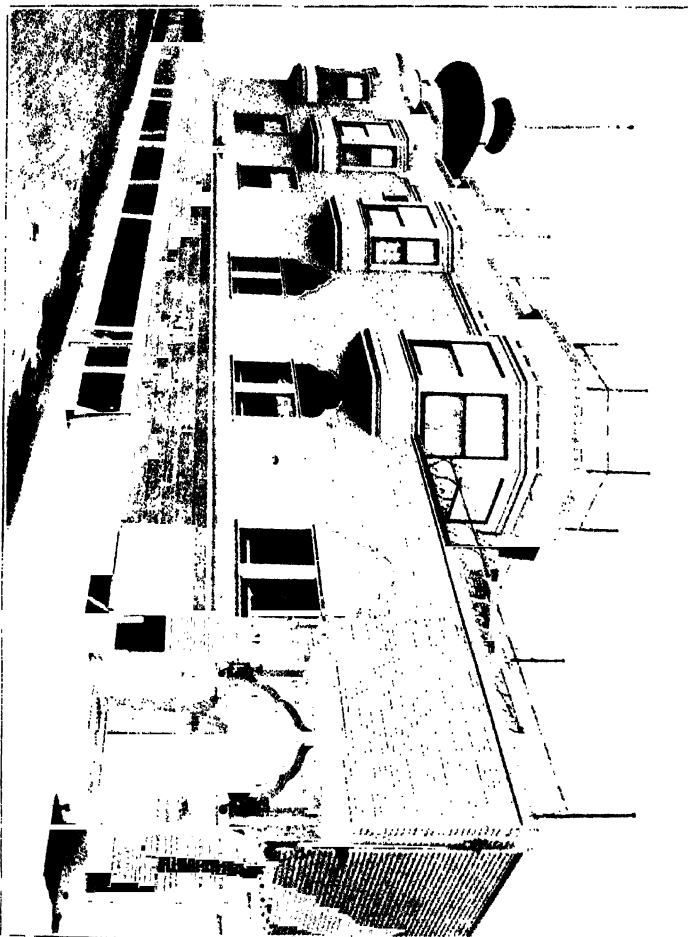
THE FIRST HINDU TEMPLE IN THE WHOLE WESTERN WORLD.

ERECTED IN SAN FRANCISCO, AUGUST 21, 1905.

ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্ ॥

তথাপি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে এক পদও বিচলিত হইতেছেন না। শকুন্তলা যখন তাঁহাকে বলিতেছেন—

"পোরব জুত্তং ণাম তুহ পুরা অস্সমপদে সব্ভাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং তধাসম অপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ঈদিসেহি অক্‌খেরেহিং পচ্চাক্‌খাদুং।

তখন রাজা কর্ণে হাত দিয়া কহিলেন,—"শান্তং শান্তম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাম পাতয়িতুং।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং তটতরুঞ্চ ॥

তৎপরে শকুন্তলা যখন অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান দেখাইতে চাহিলেন, রাজা উঠিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন—"প্রথমঃ কল্পঃ।" যখন শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে অসমর্থ হইলেন, রাজা কহিলেন—"ইথং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।" তাহার পর অবিশ্বাসের উপরে অবিশ্বাসের ঢেউ আসিয়া তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি এত দূর নিম্নে নামিয়া গেলেন যে, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে (তাহার মধ্যে তাপসী গৌতমী এক জন) তিনি তীব্র ব্যঙ্গে আক্রমণ করিলেন,—যাহা উদ্ধৃত করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। তাহার পরে শকুন্তলা তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিলে, তাঁহার বিভ্রমবিবর্জ্জিত রোষরক্তিম বদন দেখিয়া আবার রাজার সন্দেহ হইতেছে—

ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥

অপিচ সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতবমিবাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। তথাহ্যনয়া—
ময্যেবমস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্‌ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যাঃ ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥

তৎপরে দুষ্মন্ত আবার বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইলেন।

এই অঙ্কে দেখি, হাঁ, রাজা দুষ্মন্ত কামুক হউন, মিথ্যাবাদী হউন,—একটা মানুষ বটে। সম্মুখে অসামান্য রূপবতী যুবতী পত্নীত্ব ভিক্ষা করিতেছে। কখনও কাতর স্বরে, কখনও তর্জ্জন-গর্জ্জনে। সেই রূপ—যাহাতে "দূরীকৃতাঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ"; সেই রূপ—যাহা "মানুষেষু কথং বা স্যাদস্য

রূপস্য সম্ভবঃ" ; সেই রূপ—যাহা দেখিয়া তিনি কামুকের কাজ করিয়াছিলেন, আতিথ্যের অবমাননা করিয়াছিলেন, ঋষির অভিশাপভয় তুচ্ছ করিয়াছিলেন ; সেই রূপ এখনও ম্লান হয় নাই, এখনও শরীরলাবণ্য নাতিপরিস্ফুট। সে আসিয়া পত্নীত্ব ভিক্ষা চাহিতেছে। কিন্তু অপর দিকে ধর্ম্মভয়। ঋষি ও ঋষিকন্তা সম্মুখে কখনও মিনতি করিয়া রাজাকে শকুন্তলার জন্য কহিতেছেন, কখনও বা বিনিপাতের ভয় দেখাইতেছেন। কিন্তু রাজা কি করিবেন, অপর দিকে ধর্ম্মভয়। এক দিকে অমানুষীসম্ভব রূপ, ঋষির ক্রোধ, নারীর অনুনয় ; আর এক দিকে ধর্ম্মভয়।

তিনি ডুবিতেছেন, কিন্তু সন্তরণদক্ষ হস্তে উঠিবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, পারিতেছেন না। একটা দৈববল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই কুজ্ঝটিকা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন ; যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ প্রবলবিক্রমে লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাহার প্রভুর গর্জ্জন শুনিয়াই অস্ফুট করুণ শব্দে শির নত করিতেছে। দুষ্মন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত দীপ্তশ্বাসে ফণা বিস্তার করিয়াই ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। এরূপ দৃশ্যে একটা মোহ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, উল্লাস আছে। হাঁ, দুষ্মন্ত একটা মানুষ বটে।

এই পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব্ব জিনিস দেখি। দেখি, অলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ হইতেছে। এক দিকে ক্ষত্রিয়ের তেজ, আর এক দিকে ব্রাহ্মণের তেজ। ঋষিশিষ্যদ্বয় ও ঋষিকন্যা গৌতমী দুষ্মন্তকে কি ভৎর্সনাই না করিয়াছেন! দুষ্মন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে এক পদ স্খলিত হইতেছেন না। অথচ ব্রাহ্মণের অভিশাপও শিরে বহন করিতে হইতেছে, ফেলিতে পারিতেছেন না।—অপূর্ব্ব!

আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্যসাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি। গ্রীক নাটকে এইরূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জার্ম্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই, ইংরাজি নাটকে পড়ি নাই।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি যে, শকুন্তলার সহিত পরিণয়বৃত্তান্ত বিরহী রাজার স্মরণ হইয়াছে। বসন্তোৎসব আসিয়াছে। তথাপি রাজভবন নিরুৎসব। চেটীদ্বয় কামদেবের অর্চ্চনার জন্ত আম্রমুকুল পাড়িতেছে। কঞ্চুকী আসিয়া নিষেধ করিলেন। রাজা রাজ্যে বসন্তোৎসব রহিত করিয়া দিয়াছেন।

তাহার পরে কঞ্চুকী তাহাদের কাছে রাজার চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যোপান্তবিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেণ দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরম্॥

তাহার পরে তাপসবেশধারী রাজা বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত প্রবেশ করিলেন। কঞ্চুকী তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে॥

রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন—

বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্মাসনমধ্যাসিতুম্ যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা যথাযথ আদেশ দিলেন। কেবল কল্য রাত্রি-জাগরণের জন্য তিনি আজ ধর্ম্মাসনে বসিতে অক্ষম; তথাপি বিশেষ কোনও কাজ থাকিলে তিনি স্বয়ংই করিবেন।

তাহার পরে প্রিয় বয়স্যের সম্মুখে রাজা তাঁহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন। বিদূষক আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। রাজা অঙ্গুরীয়কে ভৎর্সনা করিলেন—"অয়ে ইদং তদসুলভস্থানভ্রংশে শোচনীয়ম্।

কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া॥

পরে রাজা শকুন্তলার উদ্দেশে কহিলেন, "প্রিয়ে অকারণ পরিত্যাগাদনুশয়-দগ্ধহৃদয়স্তাবদনুকম্পতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন।" তাহার পরে স্বাঙ্কিত শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে অভিভূত হইয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তৎপরেই রাজকার্য্য আসিল। মন্ত্রী পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—"বিদিতমস্তু দেবপাদানাং ধনবৃদ্ধির্নাম বণিক্ বারিপথোপজীবী নৌব্যসনে বিপন্নঃ, স চানপত্যঃ, তস্য চানেককোটীশম্যং বসু, তদিদানীং রাজস্ব-তামাপদ্যতে ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।"

রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাহার এক বিধবার গর্ভস্থ সন্তান আছে; সে সম্পত্তি পাইবে। তাহার পরে কহিলেন—"কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

এই স্থানে কবি তাঁহার নাটকের নায়ককে আর একবার খেলাইয়াছেন চরম। এত শোকেও রাজা রাজকার্য্য ভুলেন নাই। শাসন পূর্ব্বেরই মত যন্ত্রবৎ চলিতেছে। কিন্তু এই শাসনে রাজার শোকের ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। কঠোরে মধুর আসিয়া মিশিয়াছে। উপরে উদ্ধৃত রাজাজ্ঞায় আমরা দেখি যে, সে আজ্ঞায় তাঁহার শোক ও তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান, তাঁহার কর্ত্তব্য ও স্নেহ, তাঁহার বর্ত্তমান আর অতীত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছে। নিঃসন্তান বণিকের সম্পত্তি রাজা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীকে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পত্তি দিতে হইবে। আবার বণিকের পুত্রহীনতা ও তাঁহার বিধবাদিগের শোক—তাঁহার নিজের পুত্রহীনতা ও শোকের সহিত আসিয়া মিলিল। আর রাজা প্রজায় ভেদ নাই। সমান দুঃখ উভয়কে চষিয়া সমভূমি করিয়া দিল। তিনি অনুকম্পায় গলিয়া গেলেন। আর কে রাখে। "যার যার প্রিয় জন বিযুক্ত হইয়াছে (সে পাপী না হয় যদি) দুষ্মন্ত তাহার বন্ধু!"—চমৎকার!

সপ্তম অঙ্কে রাজা উঠিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হেমকূট পর্ব্বতে কশ্যপের আশ্রমপ্রান্তে আবার তিনি শকুন্তলাকে পাইলেন! দেখিলেন—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

শকুন্তলার প্রতি তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ অত্যন্ত নীরস। প্রথমে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে রাজার প্রতি বিরক্ত হইতে হয়।

প্রিয়ে ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাত মাত্মানমিচ্ছামি"।

তাহার পরেও তদ্রূপ।—

শকুন্তলা উত্তর দিলেন না। তাহার পরে রাজা আবার কহিলেন—

স্মৃতিভিন্নমোহতম সো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥

তাহার পরে যখন শকুন্তলা কহিলেন, 'আর্য্যপুত্রের জয় হউক।'

বাষ্পেণ প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্॥

তখনও রাজা নিজের ভাগ্য ভালো, তিনি জয়যুক্ত, এই কথাই বলিতেছেন! কিন্তু পরে যখন শকুন্তলা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন রাজা

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া॥

এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন। তখন বুঝি, রাজা এতক্ষণ আত্মগোপন করিতেছিলেন; অনুভূতিকে একবার প্রশ্রয় দিলে সে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, আর কথা কহিবার অবসর দিবে না, সেই জন্যই তিনি এতক্ষণ অনুভূতিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন।

তৎপরে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইলেন; তাঁহাদের মিলন হইল।

পাঠক হয় ত এত সংক্ষেপে মিলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজা ষষ্ঠ অঙ্কে যখন বিলাপ করিতেছিলেন, তখন মিশ্রকেশী (মেনকার সখী) সেখানে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়া গিয়াছিলেন, এবং তৎসমুদয় শকুন্তলাকে গিয়া বলিয়াছিলেন। কি হেতু রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কালিদাস রাজার বিলাপের সঙ্গে কৌশলে বিন্যস্ত করিয়া—এইরূপে শকুন্তলাকে শোনাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বিলাপটি কৌশলী কালিদাস এইরূপে কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাহার জন্য রাজার শেষাঙ্কে বিস্তৃত অনুতাপের প্রয়োজন হয় নাই। মিলন শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সপ্তম অঙ্কে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখিতে পাই। দেখি, তিনি শিশুবৎসল! তাঁহার পুত্রকে রাজা দেখিতেছিলেন (তখনও তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই) আর ভাবিতেছিলেন—

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পুরুষীভবন্তী॥

তৎপরে তাহাকে স্পর্শ করিয়া—

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাৎ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ॥

যে রাজা নাটকের প্রারম্ভে সামান্য কামুকমাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি। নাটক-পাঠান্তে বুঝি যে, দুষ্মন্ত শুদ্ধ কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক, পুত্রবৎসল, কবি, চিত্রকর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা। কালিদাসের কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হই যে, তিনি কি সামান্য চরিত্র পাইয়াছিলেন, আর তাহাকে কিরূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

দুষ্মন্ত-চরিত্র অতীব মিশ্র চরিত্র—দোষগুণের মনোহর সমবায়। কালিদাস হাজারই অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়া চলুন, তাঁহার প্রতিভা যাইবে কোথায়! তিনি যে মানবচরিত্রবিৎ মহাকবি। একটি মহৎ মানব-চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। তথাপি তিনি দুষ্মন্তকে সাধু ইন্দ্রিয়জিৎ বীরোত্তম মহাপুরুষ সাজাইতে পারেন না। হয় ত সাজাইতেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে মহাভারতে বর্ণিত সমস্ত প্রধান ঘটনাই উপেক্ষা করিতে হইত, এবং তাহা হইলে দুষ্মন্ত-চরিত্র হইত না। হয় ত কামজয়ী অর্জ্জুন বা ত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র হইত। কিন্তু মহাভারতকে তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। পাঠকের বোঝা দরকার যে, ব্যাপারটি দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী, হরগৌরীর বিবাহ নয়। সেই জন্য ঋষিগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শকুন্তলার প্রতি লাম্পট্য ইত্যাদি সমস্তই রাখিতে হইয়াছে। তাহা রাখিয়াও চরিত্র মহৎ করিতে হইবে। কালিদাস সে চরিত্রকে মহৎ করিলেন; সুন্দর করিলেন; কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্কটুকু মুছিলেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, দোষে গুণে দুষ্মন্ত একটি মনোহর অপূর্ব্ব মিশ্র-চরিত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্মরণে।

১

এখনও কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল—হেথা পিক!
এখনও কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

২

এখনও শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয় হয়,—
ছিল তরু লতাকুঞ্জ তৃণ গুল্ম ফুলময়!
এখনও ভাবিছে ধরা, নহে বহু-দিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা!

৩

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন জনা,
এখনও আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন!
শয়নে, তৈজসে, বাসে কাঁপে তার পরশন!

৪

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে পড়ে,—
পুরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে!
এসেছিল—কোথা গেল—কেন গেল নাহি জানি!
মরুর উপর দিয়া নবনীল মেঘখানি!

৫

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে!
আগে কেন বুঝি নাই, সেও ব্যথা দিতে জানে!
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
নিদাঘ-অরণ্য ভাবে কুসুম-সুষমা তার!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ভারতে মোসলমান।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ত্রিশ কোটী। ইহার ষষ্ঠাংশ মোসলমান। কিন্তু নয় শত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলে এক জন মোসলমানেরও বাস ছিল না। ভিন্নজাতীয় ভিন্নধর্ম্মী মোসলমান কিরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়া আধিপত্যস্থাপন করেন, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই মোসলমানগণ স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে আরবগণ পরস্বাপহরণমানসে বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। কোনও মোসলমান সেনাপতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্যকাহিনী তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের অভিমুখে ধাবিত হইতেন। মোসলমান সৈন্য সীমান্তবর্ত্তী কোনও প্রদেশে উপনীত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিত। তাহারা অনেক সময়েই শত্রুর বাহুবলে মস্তক অবনত করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। কোনও কোনও স্থলে তাহারা বিজয়মাল্যলাভান্তে যথেচ্ছ দেশলুণ্ঠন ও হিন্দুর দেবমন্দির বিধ্বস্ত করিয়া সগৌরবে স্বদেশে প্রতিগমন করিত। ইসলাম ধর্ম্মের প্রথম কালে এ দেশের বৈভব-কাহিনী যে সকল মোসলমান সেনাপতিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহারা এই ভাবেই আপন আপন ভারত-আক্রমণ সম্পন্ন করেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের আগমনে দেশে হাহাকার-ধ্বনি উঠিত, তাঁহাদের পদস্পর্শে ভারতভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইত; কিন্তু তাঁহারা রাজ্যস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

"আরবদেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাঁহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। * * * আরব্যেরা মিশর ও সিরীয়া দেশ মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসরের মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে ও তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।" (১) কিন্তু তাহাদিগকে ভারতবর্ষ জয়ের জন্য সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যত্ন করিতে হইয়াছিল।

---

(১) ভারত-কলঙ্ক।

ইহার কারণ কি? হিন্দুসৈন্য কখনও দুর্ব্বলহস্তে অস্ত্রধারণ করে নাই। তাহারা রণনৈপুণ্য ও যোধশক্তিতে গরীয়ান্ ছিল; তাহারা পদে পদে আততায়ী সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিল। তাহার পর, আরব ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী পথ অতি দুর্গম ছিল; তজ্জন্য মোসলমান-সেনাপতিগণ আবশ্যক-মত স্বদেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে পারিতেন না। এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মোসলমানগণ বিজয়মাল্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহারা স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আরব সেনাপতি এক রাজ্য জয় করিয়া দেখিতেন, তাহার পার্শ্বেই অপর রাজ্য অপরাজিত রহিয়াছে। তখন তিনি সেই রাজ্য বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় শক্তির নিয়োগ করিতেন। এই অবসরে পূর্ব্বপরাজিত রাজ্য বলসংগ্রহ করিয়া মোসলমানের আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া দিত।

যিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ওসমান। ওসমান খলিফা ওমরের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বোম্বাই উপকূল জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ হয় নাই। খলিফার অজ্ঞাতসারে ওসমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মোসলমান-সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাহাদের ভারত-অভিযানের বিষয় অবগত হন, এবং তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ওসমানকে লিখিয়া পাঠান, "হে সাকিম সহোদর, আমি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, যদি এই যুদ্ধে আমাদের লোক শত্রুহস্তে নিহত হইত, তবে নিহত ব্যক্তির সংখ্যার পরিমাণে তোমার বংশীয়দিগকে বধ করিতাম।"

ওমরের পরবর্ত্তী খলিফা ওসমানের আমলে ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য দ্বিতীয় আক্রমণের উদ্যোগ হইয়াছিল। তিনি খলিফা-পদে বৃত হইয়া ইরাকের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাকে হিন্দুস্থান-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আবদুল্লা জবালার পুত্র হাকিমকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেন; হাকিম তথা হইতে প্রতিগমন করিলে, তাহাকে মদিনায় খলিফার নিকট প্রেরণ করা হয়। খলিফা ওসমান তাঁহাকে হিন্দুস্থান-সংক্রান্ত নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর করেন, "হিন্দুস্থানে জলের বড় অভাব। সুমিষ্ট ফল দুর্ল্লভ। যদি অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হয়, তবে তাহারা শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে; আর যদি বহুসংখ্যক

সৈন্য প্রেরিত হয়, তবে তাহারা অনাহারে বিনষ্ট হইবে।" ওসমান জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি যথাযথ বর্ণনা করিতেছ, না কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ?" হাকিম উত্তর করেন, "আমি স্বীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিষয় বর্ণনা করিতেছি।" ওসমান তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিয়া হিন্দুস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হন।

ইহার পর খলিফা মাবিয়ার রাজত্বকালে মোসলমানদিগকে ভারতবর্ষে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতে পাই। এই সময় (৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) মুহালিব নামক এক জন সেনাপতি সসৈন্যে মূলতান প্রদেশে প্রবেশ করেন; কিন্তু নানা কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি প্রতিগমনসময়ে কতিপয় হিন্দুকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। মুহালিবের পরে মাবিয়া ক্রমান্বয়ে আবদুল্লা, সিনাম, রসিদ, আব্বাদ, আলমঞ্জার ও হারিকে সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাঁদের কেহই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সিনাম, আব্বাদ, আলমঞ্জার ও হারি বিশেষ কোনও ফললাভ করিতে না পারিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, এবং আবদুল্লা ও রসিদ শত্রুহস্তে নিহত হন।

মাবিয়ার মৃত্যুর পর দীর্ঘকালব্যাপী গৃহকলহে মোসলেম-সাম্রাজ্য ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। এই সময় পররাজ্য-হরণ-ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অবকাশ মোসলমানদের ছিল না। এই গৃহ-কলহের অবসানেই মোসলমানগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ জয় করিতে উদ্যত হয়। এই সময় হেজাজ নামক এক জন মহাবীর ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একদা বহুসংখ্যক মোসলমান সিংহল হইতে জলপথে ইরাকে গমন করিতেছিল। তাহারা সিন্ধুদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে তদ্দেশবাসী কতিপয় দস্যু তাহাদের তরী আক্রমণ করে। দস্যুরা কতিপয় স্ত্রীপুরুষকে ধনরত্ন সমভিব্যাহারে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই সময় এক জন স্ত্রীলোক 'হেজাজ হেজাজ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। হেজাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া বলেন,—"আমি এখানে আছি।" তার পর তিনি বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। হেজাজ প্রথমতঃ সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মোসলমানদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। দাহির প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, "দস্যুরা আমার শাসনাধীন নহে।" হেজাজ এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে জলিয়া উঠেন, এবং সিন্ধুদেশ ধ্বংস করিবার

জন্য খালিফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খালিফা অনুমতি প্রদান করেন।

হেজাজ সিন্ধু-বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়া সেনাপতি ওবেদুল্লাকে প্রেরণ করেন। ওবেদুল্লা রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তদীয় সৈন্যদল সেনাপতির মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। হেজাজ ওবেদুল্লার পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বুদেল নামক আর এক জন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। বুদেল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া নিহত হন। অতঃপর হেজাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সপ্তদশবর্ষবয়স্ক মোহাম্মদ বিন কাসেমকে প্রেরণ করেন। এই নবীন যুবক শৌর্য্যবীর্য্যের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তিনি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে সসৈন্যে সিন্ধুদেশের দ্বারদেশে উপনীত হয়েন। সিন্ধুদেশের দাহির দুইবার মোসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠেন, এবং তজ্জন্য সম্পূর্ণ অসতর্ক হইয়া পড়েন। এ কারণ মোহাম্মদের বাহুবলে দিবাল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে সহজেই মোসলমানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। অতঃপর মোহাম্মদ প্রবলপরাক্রমে সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর আক্রমণ করেন। আলোর আক্রান্ত হইলে দাহির পঞ্চাশ সহস্র যোদ্ধার সহিত শত্রুর গতিরোধের জন্য অগ্রসর হন। তিনি সমস্ত দিন প্রবল-পরাক্রমে ও বিপুলসাহসে যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শত্রুহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করেন। কিন্তু রাজার মৃত্যুতেই বিজয়শ্রী মোসলমানের অঙ্ক-শায়িনী হয়েন নাই। দাহির-মহিষী অসি-হস্তে মোসলমান সৈন্যের প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার উৎসাহে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা-কল্পে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু এই সময় সিন্ধুদেশের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা জীবনবিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। অচিরে দুর্গ-মধ্যে অন্নাভাব উপস্থিত হয় ; এবং তজ্জন্য রাজমহিষী একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু বীররমণী মোসলমানের হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প করিয়া দুর্গস্থিত সমস্ত রমণী সহ প্রজ্বলিত পাবকে আত্মাহুতি প্রদান করেন। ইহার পর আলোর দুর্গ মোহাম্মদের অধিকৃত হয়। তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বদেশপ্রাণ সৈনিকদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুবাসীদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট রাজকর ও জিজিয়া গ্রহণ করিয়া

তাহাদিগকে যথেচ্ছা ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার অনুমতি দেন। আলোর বিজিত হইবার অল্পকাল পরেই মোহাম্মদ মুলতান স্বাধিকারভুক্ত করেন। অতঃপর ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যেই সমগ্র সিন্ধুরাজ্য মোসলমানের অধিকৃত হয়।

সিন্ধুদেশ বিজিত হইবার পর মোহাম্মদ বিন কাসেম কনৌজ ও উদয়-পুর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু এই সময় তিনি হঠাৎ খলিফার বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। রাজ-রোষে তাঁহার ইহলীলার অবসান হয়। (১) মোহাম্মদের অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সূচিত বিজয়োদ্যম পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তামিম নামক এক জন সেনাপতি সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হন। তামিম কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদীয় বংশধরগণ উত্তরাধিকারক্রমে সিন্ধুদেশে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই সিন্ধুদেশ তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সুমের-বংশীয় রাজপুত্রগণ মোসলমানদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

(১) মোহাম্মদের পিতৃব্য হেজাজ ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিই মোহাম্মদকে সিন্ধু-বিজয়ের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সিন্ধু-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই হেজাজ কালগ্রাসে পতিত হন। অতঃপর সালেহ নামক এক জন সেনাপতি ইরাকের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। সালেহ কোনও কারণে হেজাজবংশের প্রতি অতিশয় বিরূপ ছিলেন। এজন্য তিনি ক্ষমতাশালী হইয়াই হেজাজের আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ-সাধনের সংকল্প করেন, এবং সর্ব্বপ্রথমেই হেজাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মোহাম্মদের প্রতি হস্তপ্রসারণ করেন। সালেহের চক্রান্তে খলিফা মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। কারাগারেই মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তা মোহাম্মদের শোচনীয় পরিণামের অন্যরূপ কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিন্ধু-বিজয়কালে তত্রত্য অধিপতির দুইটি কন্যা মোহাম্মদের হস্তে বন্দিনী হয়। মোহাম্মদ এই রত্নযুগলকে অন্যান্য ধনরত্ন সহ দামস্কাসে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। এই কন্যাদ্বয় দামস্কাসে উপনীত হইলে, খলিফা জ্যেষ্ঠা কন্যার অপরূপ রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন এই কন্যা বলেন, মোহাম্মদ আমাকে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, আমি জাঁহাপনার যোগ্য নহি। এই বাক্যে খলিফা ক্রোধে অভিভূত হয়েন, এবং মোহাম্মদকে নৃশংসভাবে বধ করিবার আদেশ দেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার পর প্রকাশ পায় যে, দাহির-দুহিতার অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্যই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। খলিফা মোহাম্মদকে নির্দ্দোষ জানিতে পারিয়া স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তদীয় আদেশে দাহির-দুহিতৃদ্বয় ঘাতক-হস্তে নিহত হন। অধিকাংশ ইতিহাসলেখকই এই রবাব কাহিনীতে আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই।

ইহার পর আরবেরা আর কখনও ভারতবর্ষে অসি-হস্তে উপনীত হয়েন নাই। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে মোসলমানের শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঐ অব্দ হইতে ২৬৬ বৎসর পরে তুর্কীজাতীয় মোসলমানগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ করিয়া ভারতাধিকারের চেষ্টা পায়। "ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী;" এ কারণ এই পথে স্মরণাতীত কাল হইতে দিগ্বিজয়ী শক, হূণ ও যবনেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। তুর্কীজাতীয় মোসলমানেরাও এই চিরন্তন পথে ভারতবর্ষে আগমন করে। ইহাদের আক্রমণে স্বর্ণভূমি ভারতভূমি বারংবার ছারখার হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ ব্যতীত আর কোন স্থানেই তাহাদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "আরব্যেরা যেরূপ বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুর্কীরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেন রাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর-ভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান ***। তুর্কীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করে; তাহারা আরব্য বা তুর্কীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বাগত আরব্য ও তুর্কীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুর্কী এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্নপারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।" (২)

ফলতঃ, হিন্দুরাজন্যগণ বহুকাল স্ব স্ব রাজ্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, হিন্দুস্থানে মোসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সকল কারণের সমবায়ে এইরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।— ভারতভূমি হিন্দুরাজত্বকালে বাহ্লীক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোল পর্য্যন্ত নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার ফলে মোসলমানদের প্রত্যেক রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র-ভাবে যুদ্ধ করা আবশ্যক হইত। হিন্দুসৈন্যের রণনৈপুণ্য ও শৌর্য্যবীর্য্য নিবন্ধন এই কার্য্য বহুজনসাধ্য ছিল। সুদূরবর্ত্তী স্বদেশ হইতে দুর্গম পথ; সৈন্য আনয়ন করিবার সময় আততায়ীদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইত। এই সকল কারণে তাঁহাদের তাদৃশ সৈন্যবল ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ভারত-আক্রমণকারীদের সৈন্যবল প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(২) ভারত-বিজয়।

কালক্রমে সমগ্র মধ্য-এসিয়ায় ইসলামধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তদ্দেশসমূহের লুণ্ঠনলোলুপ অধিবাসীরা স্বর্ণপ্রসূ ভারতের স্বর্ণ-লোভে দলে দলে ভারত-আক্রমণকারী পাঠানগণের পতাকামূলে সমবেত হয়। এই জনবল-বিশিষ্ট পাঠান-আক্রমণকারিগণের আক্রমণে ভারতবর্ষীয় খণ্ডরাজ্যসমূহ ক্রমে ক্রমে পরাজিত হয়। ইতঃপূর্ব্বেও এই সকল রাজ্য বৈদেশিক শত্রুর হস্তে বহুবার পরাজিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় রাজন্যবৃন্দ এইরূপ পরাজয়ের পর অচিরে বলসংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন করিতেন। কিন্তু অবশেষে জনবলবিশিষ্ট পাঠানশক্তির নিকট হিন্দুরাজন্যগণের যে পরাজয় ঘটে, তাহা এত দুর গুরুতর হইয়াছিল যে, তাঁহাদের আর বলসংগ্রহ করিয়া অভ্যুত্থিত হইবার ক্ষমতা রহিল না। ফলতঃ, এই সময় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ বলনাশ হেতু আততায়ী মোসলমানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের একাকী দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছিল। ঐক্য অবলম্বন করিয়া সম্মিলিতভাবে অস্ত্রধারণ করিবার পক্ষেও প্রবল অন্তরায় ছিল। তৎকালে "সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য" হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বক্ষণ ঈর্ষ্যা-দ্বেষ প্রজ্বলিত ছিল। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের ধ্বংসসাধনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। মোসলমান আততায়ীরা ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে রাজন্যগণ কদাচিৎ সম্মিলিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীর বিপুল সৈন্যবল ছিল। কিন্তু এই কারণে সে সৈন্যবল অবশেষে নিষ্ফল হইয়াছিল। তার পর ভারতের জনসাধারণ কখনও মোসলমানের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় নাই। কেবলমাত্র রাজন্যবর্গই ক্ষাত্রধর্ম্ম ও রাজনীতি-পালনের জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণে কখনও হিন্দু প্রজা বিচলিত হইত না; তাহারা কেবল আপন আপন ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই যত্ন করিত; এবং উহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। রাজার পরিবর্ত্তনে হিন্দু প্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজার বশ্যতা স্বীকার করিত। ইহাই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যলোপের মূল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বিদেশী গল্প।

শ্বেতাঙ্গী।

বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্ প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডমধ্যে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলেন। স্তিমিত আলোকে পার্শ্বস্থ সকলের মুখমণ্ডল ভাল দেখা যাইতেছিল না বলিয়া টেবিলের উপরিস্থিত আলোকটি তিনি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

"এইবার সকলের মুখ বেশ দেখা যাইবে। ভাজা হাঁসের মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ডাগ্নি, বৎসে, এইবার আহারের উদ্যোগ করিলে হয় না?"

পিতার বাক্যে ডাগ্নি লজ্জারক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ তাহারা প্রণয়পাত্র,—বাগ্‌দত্ত স্বামী লারস্ নাইল্‌সনের পার্শ্বে বসিয়াছিল। লারস্ ডাগ্নির করপল্লব নিজ হাতের মধ্যে রাখিয়া মৃদুস্বরে কত কি বলিতেছিল। আনন্দের আতিশয্যে, স্পর্শসুখের মোহে উভয়ে এত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল যে, সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই।

রন্ধনাগার হইতে ভাজা মাংসের ঘন সুগন্ধ ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। শ্রীমতী ক্রীষ্টোফারসন্ সেই সময় বোধ হয় মাংসের উপর ঘৃত অথবা মাখম ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ছোট ছোট বালকদিগের আয়ত নীলনয়ন আসন্নভোজের প্রত্যাশায় বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রসনায় বোধ হয় জলও আসিয়াছিল। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে হাঁসের মাংস সর্ব্বদা মিলিত না। তথাকার গ্রামবাসীরা বৎসরের অর্দ্ধেক সময় শুধু লবণজারিত মৎস্য ও রুটী দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত। অবশিষ্ট কাল আলু ও ভাজা মাছ খাইয়া প্রাণধারণ করিত। সময়ে সময়ে গ্রামে মৃগ-মাংসের আমদানী হইত বটে, কিন্তু তাহাও একান্ত দুর্লভ ও মহার্ঘ ছিল।

লারস্ ট্রম্‌সো নগরে কোনও রসদ-সরবরাহকারীর দোকানে সহকারীর কার্য্য করিত। দুষ্প্রাপ্য হংস-মাংস সেই লইয়া আসিয়াছিল। খুব সৌখীন লোক ও বাবু বলিয়া স্বগ্রামে তাহার প্রতিপত্তি ছিল। ডাগ্নিকে সে বড় ভালবাসিত। তাহার ঐকান্তিক প্রেম ও একনিষ্ঠ অনুরাগের জন্য ডাগ্নি আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত; সে জন্য তাহার মনে একটু গর্ব্বও ছিল। তাহাদের এত প্রেম, এত অনুরাগ পল্লীরমণীদিগের সহ্য হইত না।

আগামী গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে ডাগ্নিও ট্রম্‌সো নগরে গিয়া কোথাও চাকরীর চেষ্টা করিবে। উভয়ে মিলিয়া কিছুকাল চাকরী করিয়া যখন কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিবে, তখন দু' জনে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে, এবং একটা ছোট দোকান খুলিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

গোল টেবিলের উপর ডাগ্নি আহার্য্য সাজাইয়া দিয়া গেল। মাতা তখনও রন্ধনাগারে; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সে তথায় চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ঈপ্সিত হংসমাংস লইয়া উভয়ে গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল। অগ্নির উত্তাপে, গুরু পরিশ্রমে শ্রীমতী ক্রীষ্টোফারসনের ললাট ঘর্ম্মাপ্লুত ও আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ডাগ্নির সুন্দর মুখমণ্ডলে আনন্দ ও প্রীতির চিহ্ন। টেবিলের মধ্যস্থলে মাংসাধার রক্ষা করিয়া সে আলুর পাত্র পার্শ্বে স্থাপন করিল। তার পর ছোট ছোট ভ্রাতাদিগের আসন টেবিলের নিকট সরাইয়া দিল।

ভগবানের নাম উচ্চারণের পর বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্ ছুরী ও কাঁটা লইয়া মাংসবিতরণে উদ্যত হইলেন। সাগ্রহে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালক হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

সকলের পাত্রে মাংস-পরিবেশন হইলে পর, নিমন্ত্রিতগণ ভোজনার্থ প্রস্তুত হইলেন। সকলে কাঁটা চামচ মুখের কাছে তুলিয়াছেন, এমন সময় সহসা রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। তুষারশীতল বায়ু উন্মুক্ত দ্বারপথে কক্ষমধ্যে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক বৃদ্ধ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ছিন্ন, জীর্ণ টুপী উর্দ্ধে তুলিয়া আগন্তুক বলিল,—"নমস্কার পীটার ক্রীষ্টোফারসন্! নমস্কার মহোদয়গণ—শুভ খ্রীষ্টমাস!"

সকলেই সমস্বরে আগন্তুককে প্রত্যভিবাদন করিলেন। গৃহকর্ত্তা স্বয়ং তাহার আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। নবাগতের সম্মুখে এক পাত্র মাংস ও এক বোতল সুরা রক্ষিত হইল।

আগন্তুকের শ্মশ্রু ও কেশরাশি তুষারশুভ্র; দীর্ঘায়ত নীল নয়নের দৃষ্টি উদাস ও স্বপ্নময়। যেন পৃথিবীর কোনও পদার্থে তাহা আবদ্ধ নহে। বৃদ্ধের নাম ওলি।

ওলির ব্যবহার রহস্যময়। শীতকালে সে গ্রামে ভাগিনীর আলয়ে বাস করিত। সকলের সঙ্গে সমুদ্রে, নদীতে মাছ ধরিতেও যাইত। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই এক সপ্তাহ সে যে কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ তাহা জানিতে পারিত না। সে সময়ে ওলি কোথায় থাকিত, কি খাইয়া জীবনধারণ করিত, গ্রামবাসীরা তাহা আদৌ জানিত না। গ্রীষ্মকালে সে একেবারে অন্তর্হিত হইত। সে সময়ে সে পর্ব্বতরাজ্যে চলিয়া যাইত। সেখানে সে কিরূপে বাঁচিয়া থাকিত, তাহা স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে। সে যখন যেখানে যাইত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত; আদর-অভ্যর্থনাও করিত। তাহার ব্যবহার রহস্যময় বলিয়া আবার সকলে তাহাকে একটু ভয়ও করিত।

বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্ বলিলেন, "তোমার খবর কি, ওলি? অনেক দিন তোমায় দেখি নাই। এত দিন কোথায় ছিলে? এখন কোথা হইতে আসিতেছ?"

ছিন্ন, মলিন কোটের পকেট হইতে একটা পীতবর্ণের কৌটা বাহির করিয়া ওলি এক টিপ নস্য গ্রহণ করিল। বারকয়েক হাঁচিয়া লইয়া সে বলিল, "এবার অনেক দূর গিয়াছিলাম। তোমাদের মত ঘরের কোণে, অগ্নিকুণ্ডের পাশে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসি না। এবার অনেক অদ্ভুত স্থানে গিয়া অনেক বিচিত্র জিনিস দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার মধ্যে দুই একটার কাহিনী যদি তোমরা শোন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে। একটা কথা তোমাদের বলিতেছি, তাহাতে তোমাদের উপকার হইবে। 'শ্বেতাঙ্গী' আবার দেখা দিয়াছে। বেশী দূরে নয়, খুব নিকটেই সে আছে।"

সবিস্ময়ে সকলে বলিয়া উঠিল,—"শ্বেতাঙ্গী!"

বালক-বালিকারা সভয়ে জননীর কাছে সরিয়া বসিল।

"বল কি? আমরা ভাবিয়াছিলাম, সে বোধ হয়, আর আসিবে না।"

ওলি মৃদু হাস্য করিল; বলিল, "না না, বন্ধু, এত সহজে কি তাহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? সে এই গ্রামেই আসিয়াছে। কি হে যুবক, তুমি যে বড় হাসিতেছ?"

লারস্ সহরে থাকে; মিথ্যা কুসংস্কার তাহার নাই। তাই সে হাসিতেছিল। ওলি তাহাকে

সম্বোধন করিয়া বলিল,—"অত হাসিও না বাপু, ইহা হাসিয়া উড়াইবার কথা নয়। বিশেষতঃ, তোমার মত যুবকের পক্ষে আদৌ সঙ্গত নহে। কারণ, শ্বেতাঙ্গী তোমাদের ন্যায় যুবকেরই অনুসন্ধান করিতেছে। একবার তোমার অধরে সে মৃত্যুচুম্বন করিয়া যাক্, তখন বুঝিতে পারিবে, বড় হাসিবার ব্যাপার নহে।"

ক্রোধে বৃদ্ধের মস্তক আন্দোলিত হইতে লাগিল। ডাগ্নির মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে লারসের বাহু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল। লারস্ তখনও হাসিতেছে।

সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "ভাল, সে একবার চেষ্টা করিয়াই দেখুক না। যতক্ষণ ডাগ্নি আছে, ততক্ষণ কোনও শ্বেতাঙ্গীই আমাকে ভুলাইতে পারিবে না; তা সে চুম্বনই করুক, আর নাই করুক। এ সমস্ত বাজে গল্প। এ যুগে কেহই এই সব অসম্ভব ঘটনায় বিশ্বাস করে না। এখন ভূত, প্রেত, অপ্সর, অপ্সরা,—এ সব নাই।"

ওলি ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করিল। বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্‌ও যেন কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ট্রম্‌সো নগরে—যেখানে পথে ঘাটে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক, সর্ব্বত্রই জনতা, চারি পার্শ্বে সর্ব্বদা লোকজনের ভিড়,—সেখানে বসিয়া প্রেতযোনির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা এক, আর সুদূর নিভৃত পল্লী—যেখানে বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস সূর্য্যালোকের সহিত কোনও সম্বন্ধই থাকে না, যাহার চারি পার্শ্বে অভ্রভেদী, চিরতুষারাচ্ছন্ন অদ্রিমালা,—সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীর নির্জ্জনতার মধ্যে থাকিয়া উহাতে অপ্রত্যয় করা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।

ওলি গম্ভীরভাবে বলিল, "যুবক, তুমি কি সাহস করিয়া বলিতে পার যে, বিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীনগণ—যাঁহারা স্বচক্ষে ভূতপ্রেত দর্শন করিয়াছেন,—তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি বিজ্ঞ, তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি জ্ঞানী? এই নশ্বর জগতের সমস্ত বিষয়েই কি তোমার অভিজ্ঞতা আছে? তোমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর কি কিছুই নাই, বাপু? অনন্ত-তুষারাবৃত, চিরচ্ছায়াচ্ছন্ন, রহস্যময় এই অদ্রিমালা কি তোমাকে কোনও শিক্ষাই দিতে পারে না? ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্ব ও শয়তানের প্রেতলীলার সমস্ত গুহ্য ব্যাপারই কি তুমি অবগত হইয়াছ? যদি তুমি তাহা সম্পূর্ণ না জানিয়া থাক, তবে কখনও জোর করিয়া বলিও না যে, জগতে ভূত প্রেত প্রভৃতি কিছুই নাই। আমাদের দেশের এই পর্ব্বতমালার অন্তরালে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা নগরের লোক কখনও কল্পনাও করিতে পারে না। আমার মতে, এ বিষয়ে কথা বলা তোমাদের অনধিকারচর্চ্চা!"

আর এক টিপ্ নস্য লইয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমার ন্যায় অনেকেই ঐ কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি একা নহ—আজকাল যুবকেরা ঘোরতর নাস্তিক, অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা তোমার মত অলৌকিক ঘটনায় অবিশ্বাসী ছিল, শ্বেতাঙ্গী তাহাদের সকলেরই মুখে মৃত্যুচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফল কি হইয়াছে, জান? তাহাদের বন্ধুবর্গ, আত্মীয়-স্বজন এখনও তাহাদের জন্য শোক করিতেছে। তাহাদের অদৃষ্টে যে কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহই অবগত নহে,—এমন কি, আমিও জানি না।"

কিছুক্ষণ গৃহমধ্যস্থ সকলেই নীরবে বসিয়া রহিল। কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছেলেটি মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাছে বৃদ্ধ বেণী চটিয়া

যায়, এই আশঙ্কায় লারুস্ মুখে আর অধিক কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু সে মনে মনে খুব হাসিতেছিল। ডাগ্নিকে সাহস দিবার জন্য সে তাহার করপল্লব লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। শ্বেতাঙ্গীর অস্তিত্বে তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

আশঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে শ্রীমতী ক্রীষ্টোফারসন্ বলিলেন, "কিন্তু তাহাদের পরিণাম কি হইল? তাহারা কোথায় গেল, কেহই কি জানে না? তাহাদিগকে কি কেহ যাইতেও দেখে নাই? সত্যই কি তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না?"

বৃদ্ধ ওলি করুণার্দ্রনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, "অবশ্য, কেহ না কেহ তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়া থাকিবে; কিন্তু কোথায়? তাহারা ঐ পর্ব্বতরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু কয় জন ওখান হইতে জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? শীতকালে তুষারসিন্ধু অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব। কেহ কেহ অবশ্য ফিরিয়া আসিয়াছে; এই ধর, যেমন আমি; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে! না, তাহাদের ফিরিয়া আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহারা আর আসিতে পারিবে না।"

শ্রীমতী বলিলেন,—"কি ভয়ানক!"

ডাগ্নির নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। লারুস্ তখনও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে বলিল, "কত কাল হইতে শ্বেতাঙ্গীর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে?"

"কত দিন? হা ভগবান্!—আমি যখন বালকমাত্র, তখন হইতে আমি শ্বেতাঙ্গীর বিষয় শুনিয়া আসিতেছি। বহু সাহসী বলিষ্ঠ যুবককে সে তাহাদের গৃহ হইতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। মাঝে কিছু কাল এ দেশে তাহার কথা আর শোনা যায় নাই; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তখন সে লাপ-জাতির মধ্যে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিছু দিন পরে এই দেশে সে আবার আসিয়াছিল। এখন প্রতি বৎসর শীতকালেই সে আসে; কিন্তু কখনও একাকিনী ফিরিয়া যায় না। আমি আশৈশব দেখিতেছি যে, সে একবারও আসিতে বিস্মৃত হয় নাই! চিরকালই সে খ্রীষ্টমাস পর্ব্বের দিন আসিয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত কখনও সে তাড়াতাড়ি করিয়া কোনও যুবককে মনোনীত করে নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া তবে সে এক জনকে বাছিয়া লয়।"

লারুস্ আর হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "ভাল; কিন্তু সে শিকার লইয়া কি করে? সে তাহাদিগকে ভোজন করে? না, বিবাহ করে? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কেহ এই রমণীকে মারিয়া ফেলে না কেন? তাহা হইলেই ত সকল আপদের শান্তি হয়।"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই,—আমি কখনও এই রমণী অথবা তাহার শিকারের অনুসরণ করি নাই। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, শ্বেতাঙ্গী আমায় ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলেন যে, প্রতি বৎসর সে নূতন নূতন বর খুঁজিয়া লয়। গ্রামের মধ্যে যে যুবক সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও বলিষ্ঠ, পল্লীবালিকারা যাহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত, শ্বেতাঙ্গী সেই যুবককেই মনোনীত করে। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রেতযোনি অথবা দেবযোনিকে কে মারিতে পারে? অনেকে তাহাকে মারিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গী অক্ষতদেহে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছে। কেবল যাহারা তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদেরই ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্বেতাঙ্গী রাত্রিশেষে অথবা

সন্ধ্যায়—যখন চারি দিকে অন্ধকারচ্ছায়া প্রসারিত থাকে, তখন স্বীয় শিকার বাছিয়া লয়। অতর্কিত-ভাবে সহসা সে মনোনীত পাত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখচুম্বন করে। সে চুম্বন সাংঘাতিক। শ্বেতাঙ্গী যাহাকে একবার চুম্বন করে, তাহাকে তাহার মাতা, পত্নী প্রণয়িনী বা আর কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তাহার শিরায় শিরায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ভক্তি, প্রেম ও স্নেহের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সে শ্বেতাঙ্গীর অনুসরণ করে।"

ডাগ নি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিল,—"লারস্, তুমি যত দিন এখানে থাকিবে, কখনও অন্ধকারে বাহিরে যাইও না। শ্বেতাঙ্গী হয় ত তোমাকেই বরণ করিয়া লইতে পারে।"

লারস্ তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ? নির্বোধ বৃদ্ধ শেষে তোমাকেও কাঁদাইল! চোখ মুছিয়া ফেল। যদিই বা শ্বেতাঙ্গী আমায় চুম্বন করে, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমি কখনও তাহার অনুসরণ করিব না।"

তার পর লারস্ মৃদুস্বরে আপনাদের ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চিত হইলে তাহারা একখানি ছোট দোকান খুলিবে; তখন উভয়ে বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। সে কি সুখের দিন! এই সকল বিষয়ের আলোচনায় উভয়ে এত নিবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, বৃদ্ধ ও তাহার বিচিত্র কাহিনী তাহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

পরদিবস খ্রীষ্টমাস-উৎসব। রাত্রি থাকিতে সকলে শয্যাত্যাগ করিলেন। প্রাতরাশ শেষ করিয়া সকলে জলপথে অদূরবর্ত্তী ধর্ম্মমন্দিরে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শীতকালে সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু বড়-দিনের উৎসব উপলক্ষে তথায় না গেলেই নয়। বিশেষ কোনও নৈসর্গিক উৎপাত না ঘটিলে তাঁহারা অদ্য সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিবেন।

বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্ একটা লণ্ঠন হাতে লইলেন। লারস্‌কে সঙ্গে লইয়া তিনি ঘাটে নৌকা আনিবার জন্য গেলেন। শ্রীমতী ক্রীষ্টোফারসন্ ও ডাগ্নি তখনও বালক-বালিকাদিগের প্রসাধনে ব্যাপৃত। সুতরাং তখন তাঁহারা সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা বেশভূষা সারিয়া পরে ঘাটে গিয়া নৌকায় আরোহণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। তখনও চারি দিকে গাঢ় অন্ধকার। উষার আলোক গগনপ্রান্তে তখনও দেখা যায় নাই। দারুময় গৃহমধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকশিখা বাতায়নপথে বহির্গত হইয়া বাহিরের শুভ্র তুষারস্তূপের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

পশ্চাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা বিরাটদেহ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। অপরিচিত পথিক সে ভীমদৃশ্য দর্শনমাত্রই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়ে। তখনকার সে ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলে পল্লীর অধিবাসীরাও শিহরিয়া উঠিত।

বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারসন্ ধূমপানের নল আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার ধূমপানের প্রয়োজন হইবে। বৃদ্ধ নল আনিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। রমণীদিগকে তাড়া দিয়া শীঘ্র ঘরের বাহিরে আনাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। লারস্ তটদেশে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

"ডাগ্নি, অ্যানা, তোমরা এত দেরী করিতেছ কেন? তোমাদের জন্য দেখিতেছি, সব মাটী

হবে। শীঘ্র বেরিয়ে পড়, আর দেরী করিলে চলিবে না।" বৃদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

লারস্ কোটের দুই পকেটে হাত দিয়া একটা স্তম্ভের উপর ঝুঁকিয়া নীচে জলের দিকে চাহিল। নীচে কালো জল অন্ধকারে তক্ তক্ করিতেছিল। শীষ দিয়া একটি গ্রাম্য সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সে ভাবিতেছিল, ডাগ্নির সহিত বিবাহ হইয়া গেলে, ভবিষ্যতে সে আর কখনও এমন নিরানন্দময় স্থানে বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে আসিবে না। ট্রম্‌সো নগরে এ সময়ে কত আলোক, কত বিচিত্র আনন্দ! সেখানকার ধর্ম্মমন্দিরে উৎসবের কি অপূর্ব্ব আয়োজন! নগরের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত পানভোজনের কি বিচিত্র সমাবেশ!

কৃষ্ণ জলরাশি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া লারস্ বাড়ীর দিকে চাহিল। সহসা তাহার বোধ হইল, যেন সে একাকী নহে। তুষাররাশির উপর দিয়া কেহ যেন দ্রুত তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যে আসিতেছিল, তাহার লঘু পদস্পর্শে তুষারস্তূপ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

কাহার মূর্ত্তি অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। সে মূর্ত্তি অতি শুভ্র—তাহার গতি অতি দ্রুত। নিদারুণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও বৃদ্ধ ওলির কথাগুলি সহসা তাহার মনে পড়িল। 'শ্বেতাঙ্গী' তাহারই অভিমুখে আসিতেছে! রমণী অবশেষে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে!

এক পা সরিয়া যাইবারও তাহার ক্ষমতা রহিল না। উল্কার ন্যায় বেগে রমণী তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল! অন্ধকারের মধ্যেও তাহার রমণীয় হাস্যবিলসিত উজ্জ্বল আনন স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। অন্তরের আলোকপ্রভায় তাহার মুখমণ্ডল যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সুন্দর, এমন মধুর মুখ সে জীবনে কখনও দেখে নাই। সে মুখের কাছে ডাগ্নির সুন্দর মুখও অতি তুচ্ছ।

রমণীর আপাদমস্তক শুভ্র কোমল পশমী পরিচ্ছদে আবৃত। তাহার সুঠাম, সুগঠিত দেহ সেই সুদৃশ্য পরিচ্ছদে চমৎকার মানাইয়াছিল। তাহার মস্তক অনাবৃত, আগুল্ফলম্বিত স্বর্ণপ্রভ কেশভার অন্ধকারে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। সমুদ্রবৎ গভীর সুনীল নয়নযুগলের কি সমুজ্জ্বল দৃষ্টি! বিম্বাধরে কি স্নিগ্ধ মধুর হাস্য! ঈষৎ-বিস্ফারিত অধরযুগলের অন্তরাল হইতে কুন্দ-শুভ্র দন্তপাঁতি শোভা পাইতেছিল।

সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ লারস্ স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ ওলির নিষেধবাণী সে বিস্মৃত হইল। সে তখন একান্তমনে কামনা করিতেছিল, যদি রমণী একবার তাহার সহিত বাক্যালাপ করে; যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করে—আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে ধন্য হয়!

শ্বেতাঙ্গী তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল। আনন্দের আতিশয্যে লারস্ অনুমান করিল, যেন সেই স্পর্শ দীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার অস্থিমজ্জা দগ্ধ করিতেছে। রমণী তাহার পর সহসা তাহার অধরে অধর মিলিত করিল।

"লারস্, আমি ডাকিলেই তুমি আসিও। তুমিই আমার প্রাণাধিক, প্রিয়তম। আমার নিকট হইতে কেহ তোমাকে কাড়িয়া রাখিতে পারিবে না।"

"তুমি ডাকিলেই আমি নিশ্চয়ই যাইব।"—লারুস্ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকিয়া উঠিল। এ স্বর ত তাহার নহে!

মুহূর্ত্তমধ্যে মূর্ত্তি অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। লারুস্ স্তম্ভিতভাবে একাকী তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারুসনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সহ তিনি অবিলম্বে লারুসের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর যদিও লারুস্ বৃদ্ধ ক্রীষ্টোফারুসনের সহিত নৌকা বাহিয়া নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া পঁহুছিল; ডাগ্নির পার্শ্বে বসিয়া উপাসনায় যোগদান ও বন্ধুভবনে গিয়া নৃত্য-গীত পান-ভোজনেও প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সে সমুদয় কার্য্য করিয়া যাইতেছিল। তাহার মন তখন কোথায়?

যে দৃশ্য সে দেখিয়াছিল, যে জ্বালাময় চুম্বনস্পর্শ সে লাভ করিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার স্মৃতি তাহাকে ত্যাগ করে নাই। ডাগ্নি যখন তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধর চুম্বনাশায় উদ্যত করিল, তখন লারুস্ বিরক্তিসহকারে ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। লোকান্তরবাসিনীর যে প্রণয়ভাজন,— মনোনীত পতি, সে কি অন্য নারীর চুম্বন গ্রহণ করিতে পারে? তাহাতে ব্যভিচার-দোষ ঘটিবে যে!

ডাগ্নি উৎকণ্ঠিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার কি হয়েছে, লারুস্? আজ তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার দৃষ্টি উদাস, শূন্যে নিবদ্ধ, যেন এ জগতের কিছু তোমার চোখে পড়িতেছে না। অন্য দিনের মত হাসি, গান, কি গল্প, কিছুই তুমি করিতেছ না। আমার দিকেও আজ তোমার দৃষ্টি নাই; আমার উপর কি রাগ করেছ? তোমার কি হয়েছে, আমায় বল।"

লারুস্ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, সে এখন নির্জ্জনে—একাকী থাকিতে চাহে। শ্বেতাঙ্গী তাহাকে কি বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল, নির্জ্জনে বসিয়া সে যতই তাহা ভাবিতে যাইতেছে, কি আশ্চর্য্য! লোকে ততই তাহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে! যখনই সে আহ্বান করিবে, তখনই প্রণয়িনীর নিকট সে চলিয়া যাইবে! কিন্তু সে কখন্!

মুহূর্ত্তের বিলম্বও তাহার সহ্য হইতেছিল না। এই মুহূর্ত্তে যদি আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়! তাহার কমনীয় দেহলতা বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহার অধরে অধর মিশাইতে না পারিলে লারুস্ হৃদয়ে শান্তি পাইতেছে না। অন্য কোনও কথা সে শুনিবে না, কোনও চিন্তা তাহার নাই। তুষারস্তূপ লঙ্ঘন করিয়া ঘনান্ধকারে পর্ব্বতরাজ্যে গমন করিতে এখন তাহার মনে কোনও শঙ্কারই উদয় হইতেছে না। সেইখানেই ত জীবনের প্রকৃত সুখ বিরাজিত! মানুষ কি নির্ব্বোধ, কি অন্ধ! এমন সুখ ত্যাগ করিয়া কি না উপত্যকা ভূমিতে সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে!

ডাগ্নি যখন দেখিল, লারুস্ তাহার সহিত বাক্যালাপে অনিচ্ছুক, তখন সে গৃহকোণে বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কি জন্য আজ লারুসের এরূপ মনোভাব ঘটিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই বটে, কিন্তু নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন ডাগ্নি অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল। বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া তাহারা পুনরায় জলপথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। লারুসও আনন্দের আতিশয্যে প্রাণপণশক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল। সেও পৌঁছাইতে পারিলে বাঁচে!

সম্ভবতঃ শ্বেতাঙ্গী আজ রাত্রিকালেই তাহাকে আহ্বান করিবে। বাহিরের ঘরে তাহার শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরিচ্ছদ সহ সে শয্যায় শয়ন করিল। জুতাজোড়া হাতের কাছেই রাখিল। যদি আজ রাত্রেই তাহার ডাক পড়ে, তাহা হইলে সে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহির হইতে পারিবে। অন্যান্য পরিজন তাহাকে শ্রান্ত ভাবিয়া আর বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। যে যাহার শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু ডাগ্নি শয্যায় গেল না; একখানি মোটা শীতবস্ত্র গায়ে দিয়া বাতায়নের ধারে গিয়া বসিল। তখন পূর্ণচন্দ্র নীলগগনে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোকে তুষারমগ্ন পৃথিবী কি সুন্দরই দেখাইতেছিল!

* * * * *

ঐ না সে ডাকিতেছে! লারুস্ নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিয়া জুতা পায়ে দিল। সে কোনও শব্দ শুনে নাই, তথাপি সে বুঝিতে পারিয়াছিল, শ্বেতাঙ্গী তাহারই জন্য আসিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোনও বন্ধনই নাই যে, আজ লারুস্‌কে ধরিয়া রাখিতে পারে। ডাগ্নির কথা, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য; ট্রম্‌সো নগরের মনিবের কথা, আজ কিছুই তাহার মনে পড়িল না। সে যে ডাগ্নিকে আশা দিয়াছিল, উভয়ের সঞ্চিত অর্থ লইয়া ছোট একটি দোকান খুলিবে—উভয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবে—সে সমস্ত কথা লারুস্ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। রুদ্ধদ্বার ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সে দেখিল, বহুদূরে, পর্ব্বতের পাদদেশে দীপ্ত হেমশিখার ন্যায় কি যেন জ্বলিতেছে! সে বুঝিল, উহা শ্বেতাঙ্গীর স্বর্ণ-প্রভ কেশগুচ্ছ। তুষারাচ্ছন্ন পথে লারুস্ ছুটিয়া চলিল।

দরজা খোলার শব্দ পাইয়া ডাগ্নিও নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। সে দেখিল, দ্বার উন্মুক্ত। তাহার পায় চটিজুতা, পরিধানে রাত্রিবাস, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একখানা মোটা গাত্রাবরণ দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া সে লারুসের অনুসরণ করিল। সে যদিও শ্বেতাঙ্গীকে দেখে নাই, তথাপি সে বুঝিয়াছিল, লারুস কাহার সন্ধানে চলিয়াছে। যদি সম্ভব হয়, সে লারুস্‌কে রক্ষা করিবে। বৃদ্ধ ওলির কাছে সে শুনিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে যাহারা শ্বেতাঙ্গীর আহ্বানে পর্ব্বতরাজ্যে যাত্রা করিয়াছে, তাহাদের কেহই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে নাই। সেখানে মৃত্যু অনিবার্য্য। ডাগ্নি যে লারুস্‌কে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে—সে যে তাহার জীবনের ধ্রুবতারা!

লারুস্ শুনিতে পাইল, ডাগ্নি তাহাকে ডাকিতেছে।

"প্রিয়তম, প্রাণাধিক লারুস্, এস, ফিরে এস! তাহার কথা শুনিও না। সে রাক্ষসী, তোমায় মারিয়া ফেলিবে। এই ভীষণ শীতে ওখানে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রাণাধিক, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় ভালবাসি। এস, ফিরে এস, যেও না।"

লারুস্ তাহাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে দ্রুততরবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার শরীরে তখন অমানুষী শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। পিচ্ছিল পথে সে পাখীর ন্যায় যেন উড়িয়া যাইতেছিল। ডাগ্নি অধিকক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ লার্‌স্ শুনিতে পাইল, ডাগ্নি পুনঃ পুনঃ করুণ মর্ম্মভেদী স্বরে তাহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছে!—"লার্‌স্, প্রিয়তম, ফিরে এস।" তার পর আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। ক্ষুদ্র দোকান, গৃহদ্বার, বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী ডাগ্নি—সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া সে তখন চির-হিমানী-মণ্ডিত, অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজ্যে, তুষার-নদীর মহিমশ্রীর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে! কাল সকাল হইতে আর কেহ গ্রামে তাহাকে দেখিতে পাইবে না! লার্‌স্ মনে মনে হাসিয়া উঠিল। শরীরের প্রতি স্নায়ু—প্রতি পরমাণু দিয়া যাহাকে সে ভালবাসে, এখন হইতে তাহারই সহিত সে একত্র বাস করিবে! নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত কোনও জীব-চক্ষু তাহাদের এই মিলন দেখিতে পাইবে না!

"লার্‌স্!"

এবার পশ্চাতে নহে। সম্মুখে—বহু দূর, বহু উচ্চ পর্ব্বত-শিখর হইতে সে ধ্বনি ছুটিয়া আসিল। পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, গুহায় গুহায় সে মধুর সঙ্গীতবৎ আহ্বান-রব প্রতিধ্বনিত হইল। তাহার জীবনরূপিণী, তাহার দেবী ঐখানে, ঐ পর্ব্বতের তুঙ্গ-শিখরে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে! দেবীর মধুর চুম্বন সে এখনই লাভ করিবে। সে চুম্বনে মৃত্যু নাই—তাহাতে শুধু অনন্ত জীবন!

দ্রুততরবেগে সে অগ্রসর হইল। অন্য সময় হইলে যে বাধা, যে প্রতিবন্ধক এতক্ষণে তাহাকে ভূপাতিত করিত, যে সমুদয় বিঘ্ন তাহার গতিরোধ করিত, এখন সে সমুদয় বিঘ্ন তাহার গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইল না। ব্যাদিতমুখ গহ্বর, উত্তুঙ্গ দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। একবারও ভ্রমক্রমে সে পশ্চাতে চাহিল না। তাহার দৃষ্টি সম্মুখে, ঊর্দ্ধে, শুভ্র পর্ব্বত-চূড়ায় নিবদ্ধ। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছিল না।

কিন্তু তাহাকে গিরিশিরে পঁহুছিতেই হইবে। ঐখানে যাইতে পারিলেই সে তাহার ঈপ্সিত দেবীকে বাহুবন্ধনে ফিরিয়া পাইবে। সেইখানেই তাহার চিরশান্তি বিরাজিত। উপত্যকা-ভূমি তখন বহু নিম্নে। কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহগুলি বিন্দুবৎ দেখাইতেছিল—ঐখানেই তাহার আজন্মের গৃহ।

কিন্তু তথায় এত কাল সে কি করিয়া বাস করিয়াছে? পর্ব্বতরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যে নির্ব্বাচিত প্রণয়পাত্র, সে কি না এত দিন নির্ব্বোধ ডাগ্নির বাগ্‌দত্ত পতিরূপে পরিচিত ছিল! কি ভ্রম! লার্‌স্ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যধ্বনি শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল।

এতক্ষণে সে চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝপথে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। কিন্তু শিখরদেশ তখনও বহু দূরে।

আরোহণ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পিচ্ছিল তুষার-স্তূপের উপর সে কয়েকবার পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। পদতলে বিরাট গহ্বর মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাহাকে বহুবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। অত্যুচ্চ শৃঙ্গনিচয় প্রতিপদে তাহার গতিরোধ করিতেছিল। কিন্তু সে তখন মৃত্যুভয়শূন্য। প্রাণপণ চেষ্টায় সে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ

করিতে লাগিল। শ্বেতাঙ্গীর মধুর কোমল আহ্বান-ধ্বনি পুনঃ পুনঃ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার দীপ্ত কেশরাজি ঐ না দেখা যাইতেছে!

অবশেষে সে লক্ষ্যস্থলে, পর্ব্বত-চূড়ায় পঁহুছিল। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত শৃঙ্গ-নিচয় তখন বহু নিম্নে। ঊর্দ্ধদেশে মাথার উপর সুবৃহৎ পূর্ণচন্দ্র দুলিতেছে।

চারি দিকে কোথাও প্রাণ-স্পন্দনের চিহ্নমাত্র নাই। চতুর্দ্দিক্ নীরব, নিস্তব্ধ, প্রাণহীন। ঈগল পক্ষীও তত উর্দ্ধে কখনও পঁহুছিতে পারে না। না, কেহ কোথাও ছিল না। নীল-গগনের নিম্নে শুধু সে ও তাহার আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্যা দেবী ব্যতীত তৃতীয় প্রাণী তথায় ছিল না। আজ সুধাংশু ও তারকারাজি ব্যতীত আর কেহ তাহাদের প্রণয়-মিলন দেখিবে না।

শ্বেতাঙ্গী তাহার অভিমুখে সরিয়া আসিল। প্রণয়িনীর মধুর হাস্য-বিলসিত কমনীয় আনন, স্নেহার্দ্র আয়ত নয়ন-যুগল তাহার প্রতি স্থাপিত। সে প্রণয়-ভাজনের দিকে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া দিল। তার পর মৃদুস্বরে তাহার কানে কানে বলিল, আজ সে তাহার রাজ্যে আসিয়াছে। সে-ই তাহার মনোনীত পতি, হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর। নশ্বর মানবজাতির মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে, কারণ, সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, বীর ও মহত্তম।

জয়ধ্বনিসহকারে একলম্ফে লার্‌সন্ শ্বেতাঙ্গীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর বাহুবন্ধনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু যেমনই সে তাহার অধরে অধর মিলিত করিয়াছে, অমনই এক দীপ্ত অগ্নিশিখা শ্বেতাঙ্গীর অধর-প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাসনার তীব্র আবেগ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রাণহীন দেহ হিমানী-শীতল ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার বাহু তখনও শ্বেতাঙ্গীকে দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে!

বরনারীর রমণীয় আননের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, তাহার সঙ্গীত-মধুর হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে লার্‌সেনের নয়ন চিরতরে মুদ্রিত হইল; তাহার কর্ণে অন্য কোনও রব আর প্রবেশ করিল না। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দ্রবিড়।

১

এক পথে নিত্য ভ্রমণ মনোরম নহে। অপরিচিত স্থানে গমন করিয়া, তেমন কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও বিচিত্র বোধ হয়। বাহিরে না মিলিলে অন্তরে প্রবেশ করিয়া আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে হয়।

---

* নরওয়ের কোনও বিদুষী মহিলা 'জোহান্ লার্‌সেন' ছদ্ম-নামে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলি ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ। লার্‌সেনের রচিত গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে 'শ্বেতাঙ্গী' অনূদিত হইল।

কৃষ্ণ শব্দের এতদ্দেশীয় উচ্চারণ, "কিরুটিনন"। কৃষ্ণের আদ্যক্ষর কবর্ণ হইতে আমাদের খ, গ, ঘ, পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন উচ্চার্য্য। প্রত্যেক বর্গে এইরূপ। প্রথম একটি দ্বারা অস্মদীয় তাবৎগুলির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু স্বরবর্ণে এ এবং ও হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োজনীয়।

দেশের প্রকৃতিগুণে উচ্চারণ-ভেদ জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তের রাগিণী বিশুদ্ধ দ্রাবিড় স্বরে দ্রুত কম্পন উৎপাদন করে। অগস্ত্য ঋষি স শঙ্কর বর্ণ বলিয়া নবীনকে প্রাচীন করিয়া লইলেন। দ্রাবিড়ী আপন কায়ার গ্রহাংশ ত্যাগ করিল না। পৈশাচী ভাষা বিন্ধ্যগিরির মস্তক নত করিয়া রাখিল। অগস্ত্য আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাগমন করিলেন না। তামিল ভারতী দেবাসুরবৎ সম্পূর্ণ বিসদৃশ, তজ্জন্য চিত্তাকর্ষক। ইহাই বিশেষত্ব।

মদুরা দ্রাবিড় মহাদেশের প্রাচীন রাজধানী। নরসিংহ আইঅঙ্গর মহাশয় বেগবতী-তীরে আমাদের জন্য বেঙ্কটস্বামী নায়ডুর ছত্রে, দ্বিতল গৃহে, বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। আমাদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার অশ্বযান নিয়োজিত হইল। বিদেশে আসিয়া নানা স্থানে অনেকের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আমাদের সুবিধার জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান করিবার অবসর কখনও উপস্থিত হইবে না। কেহ আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে যদি এইরূপ ব্যবহার করি, তবে ঋণশোধ হইতে পারে।

তিরুমলের বাসভবন ইংরাজের বিচারগৃহে পরিণত। নির্ম্মাণপ্রণালী সারাসেনিক। অট্টস্তম্ভের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

মধুরাস্থল পুরাণে এখানকার নাম হালাস্য ক্ষেত্র। পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজের দুহিতা মীনাক্ষী ও সুন্দর পাণ্ড্য, পার্ব্বতী ও শিবের অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মলয়ধ্বজ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; পূর্ণাহুতিকালে ত্রিবর্ষবয়স্কা, স্তনত্রয়যুক্তা, এক কন্যা অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিতা হইয়া কহিলেন,—হে রাজন্! বর প্রার্থনা কর। ইহাতে তাঁহাকে পুত্রীরূপে অবস্থিতি করিতে হইল। নাম থাকিল, মীনাক্ষী। রাজা কন্যাকে ত্রিস্তনী দেখিয়া দুঃখিত ছিলেন। কৈলাসে যুদ্ধ করিতে গিয়া মহাদেবকে দেখিয়া, তটাতকার এক স্তন লোপ পাইল। মহাদেব পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলে, ভাবী শ্বশ্রূ কহিলেন,— তোমাকে তাহা হইলে মধুরাপুরীতে যাইয়া বাস করিতে হইবে। ইহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া সুন্দর পাণ্ড্য নামধারণ করিয়া বিরাজমান হইলেন।

"নিরন্তরনিবাসেন শিবসাযুজ্যতাং পরম্।
কাশ্যাদিপুণ্যক্ষেত্রেষু দেহান্তে মুক্তিরুচ্যতে।
শ্রীহালাস্তে শিবক্ষেত্রে জীবন্মুক্তিঃ সদা নৃণাম্।
তস্মাদ্ধালাস্তসদৃশং নাস্তি ক্ষেত্রং জগত্রয়ে॥"

এই দেশ শিবপূজার আদিস্থান। শিব এখান হইতে আর্য্যাবর্ত্তে নীত হন। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ শিবপূজার ব্যবসায় গ্রহণ করিলে নিন্দিত হইয়া থাকেন। শিবের প্রসাদ অগ্রাহ্য। এখানে বেল্লালদিগের শিবালয়ে শূদ্রবর্ণের পিণ্ডারং পূজকগণ কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা শিষ্যানুক্রমে কৌলিক সন্ন্যাসী ও গৈরিকধারী। অন্যের পীড়া উপশমের জন্য শক্তির নিকট কৃচ্ছ্রসাধনকার্য্যে ব্রতী হয়। সফলকাম হইলে দেবীকে মৃণ্ময় শিশু ও ঘোটক উপহার দেয়। জঙ্গম প্রভৃতি পাশুপতের ন্যায় পিণ্ডারং সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী নহে। সুন্দর পাণ্ড্যের দেবস্থান পিণ্ডারং কর্তৃত্বাধীন। স্মার্ত্তমতের পোষক শঙ্করাচার্য্য ইঁহাদিগকে আর্য্যত্বে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বারাণসীতে, বদরিকাশ্রমের কেদারনাথের পূজক, পিণ্ডারং। যোষিৎগণ 'শুব্রমন্য' (কুমার স্বামী) সম্মুখে, নাটমন্দিরে শয়ন করিয়া উদরোপরি পিষ্ট তণ্ডুলে নির্ম্মিত দীপ প্রজ্বলিত করিলে, ইহারা মন্ত্র পাঠ করে, এবং পিত্তলদণ্ডোপরি নির্ম্মিত ধুনচি ধারণ করিয়া থাকে। সেতুবন্ধের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়গণ পিণ্ডারং-দিগের বিরোধী। তাঁহারা একবার তত্রত্য মঠাধ্যক্ষের জটা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং চেষ্টা করিয়া মীনাক্ষী তথা রামেশ্বরের দেবস্ব ইংরাজের তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন।

বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক শিবারাধনাকারী দক্ষিণ-ভারত প্রথমতঃ আর্য্যত্বে দীক্ষিত হইয়াছিল। কুমারিল ভট্ট পঞ্চম শতাব্দীতে রাজবলে বৌদ্ধ জৈন হনন করিয়া স্বকীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে, ব্রাহ্মণ্যমত অবিসংবাদী করিয়া যান। দার্শনিক সাহিত্যে তাঁহার তর্কসংগ্রাম সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তদীয় প্রতিভার নিকট হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ ঋণী। কুমারিল প্রথমে বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। হত্যাজনিত মহাপাতকের অপনোদনার্থ তুষানলে প্রাণত্যাগ করিবার কালে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শঙ্করের নিকটেও সনাতনধর্ম্ম অশেষ সাহায্য পাইয়াছে। বৌদ্ধ এ দেশে নির্ম্মূল হইয়াছে। জৈনদিগকে দেখিয়া বৌদ্ধসমাজ কেমন ছিল, বুঝিয়া লইতে হয়। মুসলমানেরা আধিপত্য পাইয়া হিন্দুর উপরে

যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে হিন্দুগণ অন্যমতাবলম্বীদের সহিত অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল পাণ্ড্যবংশ শাসনক্ষমতা পরিচালন করিয়া, দ্রবিড় রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া যান। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয়ে পাণ্ড্যরাজ অনার্য্যত্ব হেতু দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্যে তাঁহার রাজদূত গিয়াছিল। সেই দূত বলিয়াছিল, আমার প্রভু ষট্‌সহস্র রাজার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন।

মুসলমান-বিজয়ের পরেও একবার সেই বংশ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে জ্বলিয়া ক্ষান্ত হয়।

ওড়েয়ার, পাণ্ড্য-প্রবাহের মধ্যে কিঞ্চিৎ কালের জন্য উদিত হইয়া, অস্তমিত হইল।

মধুরা পুরীতে বিজয়নগরের আধিপত্যের পূর্ব্বে ও পরে নায়কগণ ত্রিশত বর্ষ লীলা করিয়াছিলেন।

তাহার পর নাট্যশালায় যবনিকার অন্তরাল হইতে যবন ও মারাঠা বারংবার প্রবেশ করিয়া বিংশতি সংবৎসর অভিনয় করিল।

—১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বৃটন-রাজলক্ষ্মী কর্ণাটের মুসলমান-ভূপতির প্রতিনিধি-ভাবে দেখা দিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃকণা ইদানীং মঞ্চ উজ্জ্বল করিয়া নগরকে শোভাময় ও সুখ সম্পদের আকর করিয়া রাখিয়াছে। প্রভুত্বের জন্য যদি কোনও জাতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হন, পুরাবৃত্ত উক্ত রঙ্গ স্মরণ করাইয়া বিদ্রূপ করিতে পারিবে।

জগতে মদুরার দেবস্থানের মত বৃহৎ ভজনালয় কুত্রাপি নাই। কাশী-ধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় ইহা সদা জনপূর্ণ। পাণ্ড্য-নরেশ সুন্দর অবশ্য আপন নামানুসারে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তামিল নাম তটাতকা। এই বংশে যিনি শেষ, তিনিও সুন্দর, তবে কুব্জ, এইমাত্র প্রভেদ। যিনি আদি, তাঁহার নাম অবশ্য কুলশেখর হইবারই কথা।

আলাউদ্দীনের সেনানী মালিক কাফুর আসিয়াই সুন্দরেশের দেবায়তন ভগ্ন করিল। ভাবিয়াছিল, সে লোকশিক্ষা দিতেছে। গর্ভগৃহ কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। নায়কগণ পরে প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তন্মধ্যে অদ্যাপি মণ্ডপনির্ম্মাণ ক্ষান্ত হয় নাই। আমার সহচর মন্দিরের চতুর্দ্দিক-ভ্রমণান্তে অনুমান করেন, এক ক্রোশ হইবে। প্রকৃত পরিমাণ ৩৮২২

পাদ, বা ক্রোশ-তৃতীয়াংশ। ইহা একখানি গ্রামবিশেষ। উদ্যান, সরোবর, পণ্যবীথি, যান-বাহন, দেবস্ব, লেখশালা, রত্নভাণ্ডার ইত্যাদি তন্মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। সহস্রস্তম্ভশালাদ্বয় ব্যতীত অষ্টাধিক প্রকাণ্ড প্রস্তরমণ্ডপ ও কয়েকটি বিমান, বিস্তীর্ণ অঙ্গনে স্বর্ণধ্বজযষ্টি ও বিস্তর দীপস্তম্ভসহ প্রাকার-ত্রয়মধ্যে একাধিকদশ তোরণ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

রাজপথের পশ্চিমে পাণ্ড্যতনয়া মীনাক্ষীর মন্দির। আমরা [illegible]-পরিবেষ্টিত নারিকেল বৃক্ষ কয়েকটি পার হইয়া, কর্ণাটদ্বারে উপনীত হইলাম। নানা দেবদেবীর রঞ্জিত লীলা-খচিত স্তর ঊর্দ্ধ দিকে সঙ্কীর্ণ হইয়া চতুস্পার্শে তির্য্যকভাবে উত্থিত হইয়াছে। সমতল শিখরে দুই পার্শ্বে দন্তী সিংহমুখ, মধ্যে কলসশ্রেণী। অভ্যন্তরভাগে আরোহণের জন্য শতহস্ত উচ্চ সোপানাবলী গ্রথিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণে যে রথ রহিয়াছে, তাহারও আকার এই প্রকার। গোপুরে ক্ষোদিত বিগ্রহের শিরস্ত্রাণ তদ্বৎ। সকলই যেন পর্ব্বতের আদর্শে সূক্ষ্মাগ্র। গিরীশ ও পার্ব্বতীর জন্য ব্যবহৃত বিষয়ে ইহাই স্বাভাবিক। সাঁওতাল দ্রাবিড় কর্ত্তৃক "মেরং বুরু" নামে গিরি পূজিত হইয়া থাকে।

পণ্যবীথিতে মৃগমদ-পঙ্ককর্পূরপূর্ণ চন্দন, সুবাসিত "পিচ্চি" (নব-মল্লিকা), "তেঙ্গায়" (নারিকেল), "বাড়পড়ং" (কদলী) ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে।

অদূরে অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপ। তাহাতে শ্রীযন্ত্র ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি। পশ্চিম প্রান্তে বেঙ্কটাচল। শ্রেষ্ঠী যষ্টি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে আপন কামনা-সিদ্ধির জন্য সহস্রোপরি পঞ্চ শত স্থাণু যোজনা করিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রাকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত অন্নপিণ্ড দেখিয়া দীপাবলী-আবেষ্টিত পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া নৃত্যকারী বিগ্রহগুলির সান্নিধ্যে যাইতে হয়। এক্ষণে আমরা শিবতীর্থে অবতীর্ণ হইলাম। বসন্তে এখানে দেবতার জলবিহার সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে না বিবেচনা করিয়া, বহির্দ্দেশে ক্রোশান্তরে দ্বীপসমন্বিত "টেপ্পম্" খাত হইয়াছে। যাত্রিগণ স্নানান্তে ঘণ্টাবাদন করিল। পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষীর নিকট 'সুব্রমন্ন' (কার্ত্তিক) ও গণপতি-চত্বরে বেদপাঠ হইতেছে। তালপত্রে লিখিত পুঁথি ধরিয়া এক জন মহাভারত পাঠ করিতেছেন, অপরে মূলব্যাখ্যা শুনাইতেছেন।

জনাশ্রয়ের লীলাচিত্রে ঐতিহাসিক, লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত। ক্ষপণকদিগকে তৈলযন্ত্রে পেষণ করা হইতেছে। দ্রাবিড়-প্রথানুসারে বিবাহকালে সুন্দরেশ মীনাক্ষীর পাদধৌতকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ত্রিজ্ঞানসম্বন্ধ বা উগ্রপাণ্ড্যকে সর্পদংশন এবং নটরাজ কর্তৃক গুণোদর দানব-দলন দৃষ্ট হইল। আদিম সাহস্রক বিশ্রামাগারে নির্ম্মাতা আর্য্যনায়কম্ পিলের অবয়ব, অঘোর বীরভদ্র ও নর্ত্তনশীল বৃহৎ মূর্ত্তিনিচয় বিদ্যমান।

আমরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় লক্ষদীপদান উৎসবকালে উপস্থিত হইয়াছিলাম। হস্তিশিরে দেবতার স্নানের জন্য বারি আনীত হইল। প্রদোষে নিরতিশয় জনতা হইল। ইংরাজ ও মুসলমান পর্য্যন্ত উপস্থিত। শেষোক্তগণের এ দেশ মাতৃভূমি হইয়াছে; সেই মমতায় প্রবেশ-নিষেধের ভয়ে তাহারা উপানৎ হস্তে লইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কলানাথের কিরণাভাবে অঙ্গন অপেক্ষা সুদীর্ঘ অভ্যন্তরভাগে অগণ্য দীপের বিচ্ছিন্ন শিখা সমধিক জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক দীপকে সৌন্দর্য্যের আকর বোধ হইল।

তৃতীয় প্রাকার দুই ভাগে বিভক্ত। একের মধ্যে সুন্দরেশ। অপরটিতে মীনাক্ষীর দেবালয় স্থাপিত। দেখিলাম, প্রথম প্রকোষ্ঠের অঙ্গনে ধ্বজ-স্তম্ভ, পার্শ্বস্থ গৃহে স্বর্ণবাহন, রৌপ্যপাত্র, ছত্রদণ্ড প্রভৃতি উপকরণ রক্ষিত। কাশীর বিশ্বেশ্বর এখানেও স্থান পাইয়াছেন। প্রধান মন্দিরের গাত্রে তিরুমল ও তদীয় তাঞ্জোর-মহিষীর প্রতিকৃতি উপযুক্তক্ষেত্রে প্রদত্ত। ঈশানের চতুঃষষ্টিলীলাময় অবয়ব, প্রস্তরোপরি স্থূলচূর্ণ সংযত করিয়া গঠিত হইয়াছে। বিমান অষ্টগজ মূর্ত্তির উপর উত্থিত। তাহার উপরিভাগ কর্ণাট্টি-বিহীন। শিরঃ ও ভূষণ স্বর্ণবর্ণক-পত্রমণ্ডিত। প্রবেশপথে দ্বারপাল। অভ্যন্তরে এক দিকে চিদম্বরের নটেশ, অপর পার্শ্বে তাঁহার পুত্রদ্বয়,—'সুব্রমন্ন' ও গণপতি। তমসাচ্ছন্ন গর্ভস্থানে, যাঁহার জন্য এত সমৃদ্ধি, সেই সুন্দরেশ শিব পুংচিহ্নরূপে অনার্য্যভাবে গৌরীপট্টে উপবিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষীর মন্দিরদ্বারে ধান্যমঞ্জরীগুচ্ছ আলম্বিত। একটি মণ্ডপে সিংহ ও হস্তীকে মনুষ্যের অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দশভুজ মহাদেব বামপদ উত্তোলন করিয়া ভদ্রকালীর সহিত নৃত্য করিতেছেন। মহেশ উলঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া দেবী লজ্জায় ক্ষান্ত হইলেন। শফরীনয়না এক হস্তে অভয়, অন্য হস্তে বর দিতেছেন।

আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেবস্থানের অধ্যক্ষ শিঙার স্বামীরা দেববন্দন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার কটী পর্য্যন্ত কাষায় বহির্বাস। কক্ষ ও প্রকোষ্ঠ ভস্মলিপ্ত। তিনি শ্মশ্রুহীন ও কুন্তলবিহীন। জটামণ্ডিত মস্তকে পঞ্চমুখী-রুদ্রাক্ষমাল্য গোলাকার ধারণ করিয়াছে। অগ্রে মশালধারী ও পশ্চাতে রক্ষিগণ। শিব যেন কৈলাসে আসিতেছেন।

মহারাজ-মান্য রাজশ্রীতিরুমল শেবরি নায়নি আইআলুগারু, ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে, দেবস্থান-নির্ম্মাণান্তে উহার সম্মুখে, পথের পূর্ব্ব দিকে, এক বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা পশ্চাৎ-নির্ম্মিত, অতএব "পুদু" অর্থাৎ নব মণ্ডপ আখ্যা পাইল। এখানে নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার বিক্রীত হয়। সভামণ্ডপে দশ জন নায়কের পূর্ণপরিমিত মূর্ত্তি; তন্মধ্যে দুই জন মৃগয়া-নিরত। শাবকক্রোড়ে বরাহ অবতার। বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিবকে গৌরী-সম্প্রদান প্রভৃতি বৃহৎ পুত্তলী ক্ষোদিত। তিনটি করিয়া স্তম্ভ এক একখানি বৃহৎ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। রাবণ কৈলাস উত্তোলন করিতেছে। শিব হস্তীকে গুড়-তৃণ ভোজন করাইতেছেন; পার্শ্বে উমা উপবিষ্টা; তাঁহার বস্ত্রে শিল্পচাতুরীপ্রদর্শক লতিকা-পত্র অঙ্কিত। মহিষাসুরমর্দ্দিনী এক হস্তে সিংহ, অন্য হস্তে বরাহ ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাকেও কিঞ্চিৎ স্থান দিতে ক্রটী হয় নাই।

কয়েকটি প্রকারভেদ ব্যতীত অস্মদ্দেশীয় স্থাপত্য কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অধীন নহে। ইহার প্রধান উপকরণ,—স্তম্ভের নির্ম্মাণপ্রণালী কালভেদে বিভিন্ন। তদ্দ্বারা সময় নির্ণীত হইতে পারে। অগস্ত্যসংহিতার এক ভাগ—"সকলাধিকার" পুত্তলিকাদি-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধীয় উপদেশে পূর্ণ। হালাস্য-মাহাত্ম্য উহার অংশ। অগস্ত্য-গীতা নামে গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত ঋষিকে এখানকার প্রথম ব্রাহ্মণ্য-মতপ্রবক্তা বলিয়া বোধ হয়।

সুন্দর পাণ্ড্যের শিবালয় সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। এই হেতু সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত রথাকৃতি মহাবলিপুরের বিমান ও নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত দেবগিরিস্থ পর্ব্বতাভ্যন্তর-ক্ষোদিত কৈলাস নামক অদ্ভুত বিমান দ্রাবিড় স্থাপত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

তৈলঙ্গের বিজয়নগর-রাজকুমারী কাশীতে কেদারনাথের শাস্তিক বিমানের মধ্যে মথুরার অনুকরণে স্তম্ভ হইতে ছাদের দিকে বোধিকার উপর বহির্বর্ত্তন দিয়া, সম্প্রতি একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই স্থান

পরিষ্কার করিবার জন্য কুমারস্বামী মঠের অধ্যক্ষ একটি পুরাতন শিবমন্দির ভগ্ন ও বহু শিব উত্তোলন করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। স্তম্ভবপু একাধিকষোড়শ-পলযুক্ত হওয়ায়, শিবকাণ্ড নহে। কাশী-স্থাপত্যের প্রণালী অনুসারে ইহার অধিস্থান ও বোধিকা পট্টিকাবৎ অলঙ্কারবিহীন। পুষ্পবোধিকা বা তরঙ্গবোধিকা অঙ্কন করিবার ব্যয়ভার রেওয়ার রাণী গ্রহণ করেন নাই। অধিস্থানকে শ্রীবন্ধ বা মঞ্চবন্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট ও দর্শনসুখপ্রদ করা হয় নাই। অন্যত্র এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ ইহা যখন পুত্তলিকাদির আসনরূপে অবস্থান করিয়াছে, তাহার গঠন, পরিমাণ, পারিপাট্য ও শোভনীয় অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য, সকলগুলি একত্র মনকে আনন্দরসে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

বঙ্গে পূর্ব্বতম স্থাপত্য সম্বন্ধে গৌরবজনক কিছু নাই বলিয়া কেহ যেন আক্ষেপ না করেন। বঙ্গভাষা যেমন অনাদি নহে, বাঙ্গালী জাতিও তদ্রূপ হইতে পারে না। পূর্ব্বে মগধ ও বাঙ্গালায় এখনকার মত ভেদ ছিল না: রবি বাবু যদি লৌকিক বাঙ্গালার ব্যাকরণ গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন, অখণ্ড বঙ্গ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইবে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, মিথিলা ও উৎকলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার ধাতু-প্রকৃতি, গ্রাম্য ও রূঢ় শব্দের অনেকটা মিল দৃষ্ট হয়। ভাষা লিখিত হইবার প্রথা দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আদি বৈদিকভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন আরও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে চলিল, তৎকালে ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়া তাহাকে বন্ধনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তৎকালের প্রকৃতিসিদ্ধ বাণী কালক্রমে ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণ রচিত হইল। গিরিব্রজে রাজগৃহস্থ গুহাশিল্প, তথা বোধিগয়ার মন্দির আমাদের মনঃপ্রসাদের কারণ হইতে পারে। আর্য্যত্বের তালিকায় সকলই এক।

মীনাক্ষী দেবস্থানের নিয়মিত বার্ষিক আয় ষাট হাজার টাকা। মদুরাবাসী দণ্ডশক্তির ইঙ্গিত মত পাঁচ জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছে। তাঁহারা পিণ্ডারং অধ্যক্ষ দ্বারা বিষয় ও সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকেন। দেবতার অলঙ্কারের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা; উহা মন্দিরেই থাকে।

আমরা একদিন "পীপলস্ পার্কে" গিয়াছিলাম। সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া দৃশ্যটি কাব্যে বর্ণিত চিত্রের মত হইতেছে কি না, একবার অনুধাবন করিতে ইচ্ছা হইল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে শূদ্রপল্লীতে কুক্কুটের প্রাদুর্ভাব অবলোকন করি।

উপবীতধারী তক্ষা ও ভাস্করকে তাম্রচূড় বহন করিতে দেখিলাম। এই জন্যই এ দেশে ব্রাহ্মণেরা অপর জাতির জল গ্রহণ করেন না। পল্লীদেবী পালম্মা কেবল ইহাদের নিকট পূজা পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণপল্লীতে শূদ্র বাস করিতে পায় না। পান্থশালায় তাহাদের জন্য পৃথক্ কোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হয়। যদি এক স্থানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ পটাবরণ দিবেন। আমাদের বাসস্থানের নিম্নে সোমবতী অমাবস্যায় অশ্বত্থপূজা হইতেছিল; সেখানে শূদ্রের গমন নিষিদ্ধ। তাহাদের জন্য পৃথক্ তরু নির্দ্দিষ্ট আছে।

অনেক কারণে সহানুভূতির ব্যতিক্রম হইতে পারে। আচারভেদ, জিত সম্বন্ধ ও শ্বেত-কৃষ্ণ বর্ণ প্রভৃতি তাহার নিয়ামক। স্বাধীন আমেরিকায় শিক্ষিত, সমৃদ্ধ, নিগ্রোজাতীয় ব্যক্তির সহিত শ্বেতপুরুষ একত্র আহার বিহার করিতে সম্মত হন না। উপনিবেশেও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। ভারতে তাহার ব্যতিক্রম কেমন করিয়া সংঘটিত হইবে? যে কৃপাপাত্র, সে কি সমকক্ষ হইতে পারে?

রাত্রিকালে দেখিলাম, এক পুরুষ,—তাহার মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত, পশ্চাৎভাগে কেশগুচ্ছ লম্বমান, মস্তকের উপর রজতকলস পুষ্পভারে অলঙ্কৃত,—রৌশন্‌চৌকী বাদ্য সহ ছন্দোবন্ধে নর্ত্তনকলা প্রকাশ করিতেছেন।

এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। "রাগী", "কম্বু" ও তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য "চোলম্" হট্টে রাশীকৃত রহিয়াছে; এ সময় এক টাকায় তণ্ডুল আশী সিক্কার ওজনের পরিমাণে ।৪ কুড়ব; "চোলম্" ৸৹ কুড়ব, "রাগী" ৸৹ কুড়ব ও "কম্বু" ৷৷৮ কুড়ব পাওয়া যায়। "রাগী" ও "কম্বু" চূর্ণ দ্বারা রুটী ও পিষ্টক প্রস্তুত হয়। "চোলম্" সরিষার মত; উহার তৈলে "রাগী"র বড়া প্রস্তুত করে। "রাগী" দরিদ্রের খাদ্য; ইহা তণ্ডুল অপেক্ষা গুরুপাক। ক্ষুদ্র বাজরামঞ্জরীর শস্যকেই "কম্বু" কহে।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

বাবু ও শ্রীযুত।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হয়, তখন কি জানি কাহারা অন্তরাল হইতে বাবুর আসন টলাইবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েন। সহসা দেখি, চারি দিক হইতে শ্রীযুত অমুক, শ্রীযুক্ত অমুক ইত্যাদি

শিরোনামযুক্ত চিঠিপত্র বহির্গত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রেও ঐ একই শব্দ—শ্রীযুত—শ্রীযুত—শ্রীযুত! কিন্তু এতকালকার বাবু নামে আমাদের কেমন একটা মায়া জন্মিয়া গিয়াছে, তাই সহসা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, কি দোষে আজ 'বাবু' পদচ্যুত হইতেছে? সেই সময়েই 'বাবু'র উৎপত্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা লাভ করা গিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই বলিব।

'বাবু' নামটিতে যেমন গাম্ভীর্য্য, তেমনই মিষ্টতা; ইহাতে যেমন ভক্তির ও সম্মানের উচ্চতা, তেমনই স্নেহপ্রেমের মধুরী। এমন সার্ব্বজনীন ভাবের নাম ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি শিখ, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে বাবুর আদর। যদি এক নামে সমস্ত ভারতকে এক করিতে চাও ত সে এক বাবু নাম ভিন্ন অন্য কোনও নামে হইতে পারে কি না সন্দেহ। হিন্দুরা যেমন বাবু নামে গৌরবান্বিত, মুসলমানেরাও সেইরূপ। মুসলমান বাদশাহদিগের আমলে 'বাবু' নাম অতি-উচ্চ-পদবীব্যঞ্জক ছিল। দিল্লীর বাদশাহ মোহমদ শার প্রিয় সভাসদ প্রসিদ্ধ গায়ক সদারঙ্গ 'বাবুকো মঙ্গল বাজে' বলিয়া মোহমদ শার স্তুতিগান করিয়াছেন। শিখেরা, দেখিয়াছি, 'বাবু চুন্নি সিং' বলিতে কোনও আপত্তি করেন না, বরঞ্চ গৌরব বোধ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকমাত্রকেই বাবু বলিয়া থাকে, যেমন 'বাবু বদ্রীপ্রসাদ' ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে তেলেঙ্গীরা সকলেই পরস্পরকে বাবু নামে সম্বোধন করে। বাবুর সহিত সাহেবেরও শত্রুতা নাই, যথা—বাবু-সাহেব। এমন বিশ্বব্যাপী বাবু নামকে আমরা কি করিয়া ছাড়িতে পারি? কেবল বিশ্বব্যাপী বলিয়া এত কথা বলিতেছি না; ইহা এক অতি প্রাচীন বৈদিক শব্দও বটে। কত কালের ইতিহাস ইহার সহিত জড়িত। এতদিন ত শ্রীযুত 'বাবু'রই সখা ছিল। সকলেই চিঠিপত্রে 'শ্রীযুক্ত বাবু অমুক' ইহা বহুকাল হইতে লিখিয়া আসিতেছেন। এখন আবার শ্রীযুত ও বাবুর মধ্যে partition লাগাইতে চাহেন কেন? 'শ্রীযুক্ত বাবু'র পরিবর্ত্তে শুদ্ধ 'শ্রীযুত' লিখিতে চাহেন কেন?

বাবু নামের প্রসার চারি দিকে। বাহিরে যেমন বাবু নাম সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তেমনই গৃহের অন্তরেও ইহার মূল সুগভীর প্রোথিত। আমরা ইচ্ছা করিলে বাহিরের বাবুকে গাছের ডালের মত ছাঁটিয়া দিলেও দিতে পারি, কিন্তু গৃহের বা অন্তরের বাবুকে নির্ম্মূল করিবার আমাদের সাধ্য নাই।

গৃহের চতুর্দ্দিকে বাবু নাম ধ্বনিত। বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু, ন'বাবু, নতুন-বাবু, ছোটবাবু, খোকাবাবু, রাজাবাবু, এ সব ত্যাগ করিব কি করিয়া? ইহা ব্যতীত দাদাবাবু কাকাবাবু অনেক পরিবারে প্রচলিত। স্ত্রী স্বামীর কথা বলিবার কালে 'বাবু' বলিলে যেমন মধুর শুনায়, এমন আর কিছুতে নয়! ভৃত্য মনিবকে 'বাবু মহাশয়' বলে। এতদ্ব্যতীত 'জমীদার বাবু', 'কর্ত্তাবাবু'—এ সকল মহাসম্মানসূচক। আমরা কি এমন শ্রুতিমধুর বাবু নাম ছাড়িয়া গৃহে বড়শ্রীযুত, মেজশ্রীযুত, সেজশ্রীযুত, খোকাশ্রীযুত ইত্যাদি বলিতে পারিব? দাদাশ্রীযুত, কাকাশ্রীযুত বলিলে কি হাস্যজনক হইবে না? এক ত শুনিতে ভাল লাগে না; দ্বিতীয়তঃ উচ্চারণে কষ্ট;—বাবুর ন্যায় শ্রীযুত কোথাও সুন্দররূপে খাপ খায় না। তাই বলিতেছি, 'শ্রীযুত' যদিও শ্রী-যুক্ত, তথাপি অন্তঃপুরে গৃহলক্ষ্মীদিগের মধ্যে শ্রীযুতের আদর হইবে না। সেই জন্য শ্রীযুতের স্থায়িত্বের আশা করা যায় না। এত দিন শ্রীযুত কেবল লিখিত ভাষায় অল্প সময় প্রযুক্ত হইত বলিয়া আপাততঃ উহার নিজ রূপ অবিকৃত অবস্থায় আছে, কিন্তু উহার যেরূপ ভাবে এক্ষণে ব্যবহার হইতে চলিয়াছে, তাহাতে উহার সুষ্ঠু রূপ বেশী দিন থাকিবে কি না সন্দেহ। 'শ্রীযুত'এর 'যুত' বাদ দিয়া, দেখুন, 'শ্রী'র দশা কি হইয়াছে,—ছিরি, ছিরু, ছিঃ ইত্যাদি কুৎসিত আকার কতরূপে শ্রীকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে 'যুত'-যুক্তা নবীনা শ্রী যেরূপ খটমট করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে শীঘ্রই কুশ্রীতে পরিণত হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি?

বাবু ও শ্রীযুত এই দুইটি শব্দেরই প্রয়োগ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। যে ভাবে শ্রীযুত এক্ষণে ব্যবহৃত হয়, সেই ভাবে কবি বাল্মীকি ইহাকে প্রথম জগতে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকির প্রতিভা, বাল্মীকির কারিগরি ইহাতে অভিব্যক্ত। 'বাবু' শব্দ আরও প্রাচীন; ইহা বৈদিক ঋষির মুখোচ্চারিত। এই কারণে 'শ্রীযুত' ও 'বাবু'র প্রচলন এমন বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার 'বাবু' ও 'শ্রীযুত', ইহারা বাঙ্গালীর একলার সম্পত্তি নহে।

'শ্রীমান্', শ্রীমতী', 'শ্রীযুক্ত' রামায়ণে ছত্রে ছত্রে। যথা, 'রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্' (আদিকাণ্ড, ৬৯ সং, ৭ শ্লোক)। 'জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়াযুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়।' অর্থাৎ, 'তুমি শ্রীযুক্ত হইয়া আমার ও সুমিত্রার জ্ঞাতিগণকে আনন্দিত কর।' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৪ সর্গ, ৩৯ শ্লোক)। 'শ্রীমতীমতুল-

প্রভাম্' (আদিকাণ্ড, ৫ম সর্গ, ১১ শ্লোক)। 'কশ্চিন্নরো বা নারী বা না-শ্রীমান্নাপ্যরূপবান।' (আদিকাণ্ড, ৬ সর্গ, ১৬ শ্লোক)। 'শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভী-রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ'। অর্থাৎ, 'শ্রীমান রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন' (আদিকাণ্ড, ১৩ সর্গ, ৪২ শ্লোক)। 'অব্রবীৎ ভরতঃ শ্রীমান্' (অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৫ সঃ, ৩ শ্লো)। আর কত দেখাইব ? এইরূপ 'বাবু' যদিও বৈদিক শব্দ, তথাপি ইহার প্রচার রামায়ণের সময় হইতেই বিশেষ জাগিয়া উঠে। যদিচ কালক্রমে রামায়ণের 'বাবু' ও এখনকার 'বাবু'র রূপে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু ভাবে, অর্থে ও সাদৃশ্যে বড় একটা পার্থক্য লক্ষিত হয় না—বুঝা যায় যে, উহারা পরস্পর অভিন্ন। এক্ষণে বাবু শব্দটির ঠিক খাঁটী সংস্কৃত আকার নাই—কিঞ্চিৎ অপভ্রষ্ট হইয়া তবে বাবু দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে আমরা মনে করি, ইহা মুসলমানী শব্দ। মূল সংস্কৃত শব্দ ও বর্ত্তমান 'বাবু'র মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য, তাহাতে বাবু যে সংস্কৃতমূলক, তাহা স্পষ্টই ধরা যায়। বস্তুতঃ 'বাবু' সংস্কৃত 'ভব্য' শব্দের অপভ্রংশ। যেমন পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি, 'ভর্ব' শব্দের 'ভ' 'ব' হইয়া 'বারা' হইয়াছে, সেইরূপ 'ভব্য' শব্দেরও 'ভ' 'ব' হইয়া বাবু হইয়াছে। ভব্য শব্দের 'ব'য়ে যফলা থাকাতে সুখোচ্চারণে সহজেই বাবু হইতে পারে ; যেমন 'অদ্য' শব্দ হইতে ব্রজ ভাষায় 'আজু' আসিয়াছে। হিন্দী ভাষায় 'বাবু' অনেক স্থলে 'ববুয়া' উচ্চারিত হয়। 'ভব্য' একটু স্খলিত উচ্চারণে 'ভবুয়া' আকার ধারণ করে। কেবল 'ভ' 'ব' হইয়া গেলেই 'ববুয়া' হয়।

এক্ষণে 'বাবু' যেমন সম্মানসূচক শব্দ, রামায়ণের কালে 'ভব্য' শব্দও সেইরূপ মহা সম্মানবাচক ছিল। 'বাবু'র মধ্যে যে সম্মান, দয়া, সাধুতা, কর্ত্তৃত্ব, ভব্যতা প্রভৃতি অনেক অর্থ অন্তঃসলিলভাবে বহিতেছে, 'বাবু' ভব্য শব্দের আত্মজরূপে ঐ সকল অর্থের অধিকারী হইয়াছে। দুই চারিটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য বিশদ করিতেছি। বালি যখন রামকে বলিতেছেন,—

ত্বং রাঘবকুলে জাতো ধর্ম্মবানিতি বিশ্রুতঃ।
অভব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থং পরিধাবসে ॥ *

'তুমি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত। তুমি যথার্থ দুষ্ট প্রকৃতির লোক হইয়া কেন সাধু ধার্ম্মিক সাজিয়া বিচরণ

* কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৭ সঃ, ২৮ শ্লোক।

করিতেছ?' এ স্থলে ভব্য শব্দে বিশেষভাবে সাধুতা এবং 'অভব্য' শব্দে তাহার বিপরীত দুষ্টপ্রকৃতি অর্থ সূচিত হইতেছে। আবার আরণ্যকাণ্ডে রাবণের সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—'অভব্যো ভব্যরূপেণ'; অর্থাৎ, 'দুষ্ট রাবণ সাধুরূপে সীতার নিকট উপস্থিত হইল।' এখানেও 'অভব্য' ও 'ভব্য' শব্দের অর্থ পূর্ব্বেরই অনুরূপ।

শুনঃশেফ-ঋষি যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন,—

স মে নাথোহ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা।

'তুমি আমার নাথ, তুমি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাকে ত্রাণ কর।' এ স্থলে ভব্য শব্দে যেন দয়াই বিশেষরূপে ব্যক্ত হইতেছে। আর এক স্থলে অন্যান্য রাজারা রামের গুণবর্ণনাকালে যখন বলিতেছেন,—

মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ। †

সে স্থলে ভব্যশব্দের সহিত মৃদু ও স্থিরচিত্ত প্রভৃতি বিশেষণ শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট থাকায়, এবং অব্যবহিত পরে 'অনসূয়ক' শব্দের যোগ থাকাতে, উহার দয়া, গাম্ভীর্য্য, সারল্য, সততা ও মহত্ত্ব প্রভৃতির মিলিত অর্থ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। অমরকোষ 'ভব্য' শব্দর 'ভদ্র', 'কল্যাণ' প্রভৃতি অর্থ লিখিয়াছেন,

শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং কল্যাণং মঙ্গলং শুভম্।

ভাবুকং ভবিকং ভব্যং কুশলং ক্ষেমমস্ত্রিয়াম্॥

বস্তুতঃ, সর্ব্বত্র দেখা যায়, নানা অর্থের সম্মিলনে ভব্যশব্দে এক অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া থাকে।

এই প্রাচীন 'ভব্য' শব্দের বর্ত্তমানকালে উত্তরাধিকারী কে? একমাত্র বাবু। 'ভব্য' শব্দের সেই দয়া, ভদ্রতা, মহত্ত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত অর্থই বাবুতে বিরাজমান। এমন মহত্ত্বব্যঞ্জক শব্দ আর্য্য ভাষায় অল্পই দেখা যায়। তাই, এমন কি, কুলনন্দন খোকারও ভাবী মহত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আশ্রিতেরা তাহাকে খোকাবাবু নামে ডাকিতে চাহে। কি শব্দ-সাদৃশ্যে, কি অর্থে, কি ব্যবহারে, বাবুই এখন যথার্থ আত্মজের ন্যায় 'ভব্য' শব্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'বাবু' বৈদিক শব্দ। রামায়ণের বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদে 'বাবু'র পিতৃ-শব্দ 'ভব্য' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা, ঋগ্বেদে আছে,—

---

† অযোধ্যা কাণ্ড, ২ সঃ, ২১ শ্লোঃ।

"প্রব্রবামি ভব্যায় ইন্দবে"।*

এ স্থলে 'ভব্যায়' অর্থে সায়ন লিখিতেছেন,—'[illegible] প্রতিদিনং কলাভির্ব্বৃদ্ধ্যা বর্দ্ধনশীলায়।' পুনশ্চ নিরুক্তকার ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"ভবনার্হঃ, আত্মবান্, অভিপ্রেতানাং পাত্রভূতঃ ভব্যো ভাবনার্হ যো হবিষা ভাবনমর্হতি।" ভব্য শব্দের সায়ন যে অর্থ করিয়াছেন, 'ভব্য'-প্রসূত বাবুর মধ্যেও সেই অর্থ অন্তর্নিহিত। বাবুর অন্যতম অর্থ,—বর্দ্ধনশীল বলিয়াই বাঙ্গলার বর্দ্ধিষ্ণু জমীদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাবু নামকে এতকাল একরূপ একচেটিয়া সম্পত্তি করিয়া লইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বঙ্গের বর্দ্ধিষ্ণু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই বাবু নামের প্রসার সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আফিসের সামান্য দশ পনের টাকার বেতনভোগী কেরাণী, তিনিও বাবু; অর্থাৎ কলায় কলায় বর্দ্ধনশীল। তিনিও আশা রাখেন, ক্রমে হয় ত কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া পাঁচ শত টাকার বেতনভোগী প্রধান কর্ম্মচারী বড় বাবুর পদ অধিকার করিবেন। নিরুক্তকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও 'ভব্য' নামের মহত্ত্ব সবিশেষ পরিস্ফুট। নিরুক্তকারের মতে, 'ভব্য' অর্থে 'ভাবনার্হ', 'আত্মবান্' ও অভিপ্রেতের পাত্র, অর্থাৎ অভীষ্টের আধার, বা অভীষ্টপূরক। ভব্যাত্মজ 'বাবু' চিরকাল ভাবনার্হ—সকলে বাবুর মুখাপেক্ষী। বাবু আত্মবান, অর্থাৎ আত্মম[illegible], বহুসম্মান-ভাজন। বাবু আত্মমর্য্যাদা রাখিতে জানেন বলিয়া সামান্য আফিসের কেরাণীও বাবু নামে সাহেবের নিকট সম্মানভাজন। বাঙ্গালী চিরকাল আত্মবান্, ভাবনার্হ ও দয়াবান অভীষ্টপূরক, তাই বাবু নামে বাঙ্গালী গৌরবান্বিত।

বস্তুতঃ, 'ভব্য', 'ভাবনার্হ' ও 'ভাবন', ইহারা একই কথা—সমভাবাপন্ন। রামায়ণ এই শব্দগুলিকে বেদ হইতে লাভ করিয়াছেন। 'ভাবন', 'ভাবনার্হ' শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। নিরুক্তকার ভব্য শব্দের ব্যাখ্যানে 'ভাবনার্হ' লিখিয়াছেন; রামায়ণ তাহারই সংক্ষেপ করিয়া 'ভাবন' লিখিলেন। রামায়ণে যেখানে শুনঃশেফ ঋষি প্রাণরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইতেছেন, সে স্থলে বিশ্বামিত্রকে 'ভাবনঃ' বলিয়া তাঁহার মহানুভবতা জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

---

* ঋগ্বেদ, ২ অষ্টক, ১ম অধ্যায়।

ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ।*

অব্যবহিত পরেই 'ভাবন' শব্দটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই— আবার 'ভব্য' শব্দের উল্লেখ না করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই শুনঃশেফ আবার বলিলেন,—

'স মে নাথোহনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা।' *

তুমি অনাথের নাথ, তুমি দয়ার্দ্রচিত্ত (বাবুর চিত্ত) যুক্ত হও। 'ভব', 'ভাবনার্হ' ও 'ভাবন', এই তিনটি শব্দই প্রায় সমানার্থজ্ঞাপক—পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক।

বেদে 'ভব্য' শব্দ যে ইন্দু বা চন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে। 'ভব্য' বা বাবুতে সূর্য্যের প্রখরতা নাই, উহাতে চন্দ্রের সৌম্য-ভাব বিরাজমান। সাহেব সূর্য্যের ন্যায় ভব্য বা বাবু অত কঠোর খরতর প্রকৃতির নহে। বাবুতে কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু তাহা সৌম্য—দয়ায় স্নিগ্ধ।

এতক্ষণ আমরা দেখাইলাম, বেদ হইতে ধারাবাহিকরূপে বাবু চলিয়া আসিয়াছে। এখনও উহার প্রাচীন মহত্ব, প্রাচীন অর্থ সমস্তই বজায় আছে। শ্রী বাবুরই অনুগামিনী। বাবু-বিহীন শ্রী বিধবার ন্যায় শ্রীহীনা।

বাবু ও শ্রী যে কেবল স্বদেশরূপ অন্তঃপুরেই আবদ্ধ, তাহা নয়। এক-কালে দেশ বিদেশে উহাদের চলাচল ছিল—দেশ বিদেশের ভাষায় উহারা সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইংরাজী Sir ও জর্ম্মণ Herr, ইহারা বিদেশী পরিচ্ছদে 'শ্রী' ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর বাবুর পিতৃশব্দ 'ভব্য' বা 'ভাবন' জর্ম্মণ ভাষায় 'Von' রূপ ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা অত্যন্ত সম্মানার্হ, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে জর্ম্মণ ভাষায় Von শব্দ প্রযুক্ত হয়। যথা, Count Von Zeppelin, Herr Von Buelow ইত্যাদি। এ স্থলে মান্যসূচক Von শব্দ 'ভব্য', 'ভবন', বা 'ভাবন'-এরই সংক্ষেপমাত্র।

সংস্কৃত ভাষায় 'ভব্য' শব্দ যদিও বরাবর মহত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত বাবুকে সময়ে সময়ে কোনও কোনও শব্দের সঙ্গদোষে পড়িয়া

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৬২ সঃ, ৫ শ্লোক।

* ইংরাজী Beau ও Fop শব্দদ্বয়, যাহার অর্থের সহিত ফুলবাবুর মিল আছে, উহারাও 'ভব্য' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'বো' যে ভব্য-শব্দমূলক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আবার 'ভব্য'র 'ভ' 'ফ' হইয়া গেলেই Fop সিদ্ধ হয়। ভাষাতত্ত্বের নিয়মে 'ভ' 'ফ' হইতে বেশী দেরী লাগে না। যেমন সংস্কৃত 'ভাণ্ড' শব্দের 'ভ' 'ফ' হইয়া ইংরাজীতে Fund হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত হীনার্থ জ্ঞাপন করিতে দেখা যায়। যথা, ফুল বাবু, ফতো বাবু ইত্যাদি। কিন্তু এ দোষ চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় অতি সামান্য; উহার মহত্ত্বের প্রভায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

উপসংহারে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। বঙ্গ ভাষায় ভব্যাত্মজ বাবু যেমন প্রচলিত, সেইরূপ 'ভব্য' শব্দও ত সাক্ষাৎ জীবিত; যেমন, 'সভ্য ভব্য', 'ভবিয়ুক্ত' ইত্যাদি। পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সাক্ষাৎ পিতৃশব্দ জীবিত থাকিতে উহার প্রাকৃত শব্দ স্থান পায় কি প্রকারে? যদিও বঙ্গভাষায় এরূপ উদাহরণ বিরল নহে; সংস্কৃত মিষ্ট ও প্রাকৃত মিঠে, সংস্কৃত পিষ্টক ও প্রাকৃত পিঠে যদিও একত্রই বঙ্গ-ভাষায় চলিতেছে, তথাপি 'ভব্য' শব্দের বেলায় বলিতে হয় যে, সেই প্রাচীন ভব্য শব্দ নামে মাত্র বিদ্যমান—বস্তুতঃ বৈদিক ভব্য শব্দ এক্ষণে জীবিত নাই। কার্য্যতঃ 'বাবু'ই 'ভব্য' শব্দের উত্তরাধিকারিরূপে উহার বৈদিক অর্থ ও মর্য্যদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

সচরাচর সকলের ধারণা যে, বাবু মুসলমানী শব্দ; তাই হিন্দুরা উহার প্রতি যেন কতকটা বীতরাগ। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ইহা একটি প্রাচীন বৈদিক শব্দ; বহুকাল হইতে ইহার প্রচলন বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

এমন শব্দটিকে আমরা এক কথায় কেমন করিয়া সহসা ত্যাগ করিতে পারি? এইরূপ সুপ্রাচীন শব্দকে সহসা খেয়ালের বশে ত্যাগ করিতে যাওয়া ক্ষিপ্ততার পরিচায়ক। একটি বহুকালের পুরাতন বৃক্ষ, যাহার ছায়ায় ও ফলে দেশদেশান্তরের পথিকেরা তৃপ্ত, তাহাকে সহসা ছিন্ন করায় যে পাপ, যে অনর্থ, একটি সুপ্রাচীন অতিপ্রচলিত শব্দ, যাহার সহিত কতকালের স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস বিজড়িত, যাহার ফলে কত নব নব শব্দের উৎপত্তি হইয়া কত আরাম দিয়াছে, তাহাকে সহসা নির্ম্মূল করিতে যাওয়া সেই পাপ—সেই অনর্থের কারণ হয়।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি।

সৌন্দর্য্যের উপাসক, হে দুর্লভ অমৃত-পিপাসী !
সত্য সুন্দরের ধ্যানে চিরমগ্ন, আত্ম-সমাহিত,
রস-সায়রের হংস, কমনীয়-কল্পনা-মোহিত—
শেফালি-কোমল-প্রাণ, সৌম্য, শান্ত, স্বপন-বিলাসী !
তব হৃদি-তন্ত্রী বাঁধা এ বিশ্বের হৃদিতন্ত্রীজালে,
বাজিতেছে চিত্তে তব নিখিলের বেদনা, চেতনা !
তাই তব গানে ফুটে—নবরস,—নব উদ্দীপনা—
করুণ কোমল কান্ত—কভু দৃপ্ত মত্ত রুদ্র তালে।
অন্যের নয়ন যথা হেরে শূন্য—মৃত মরুভূমি,
তব নেত্র হেরে সেথা মাধুরীর প্রসন্ন পূর্ণিমা !
যুগের অমৃত বার্ত্তা— ভক্তি প্রীতি মুক্তির মহিমা
শুনাও এ বিশ্বজনে, নিজে কিছু নাহি চাহ তুমি !
ভালে সুধাধার ইন্দু—শিরে যাঁর পুণ্য গঙ্গা-বারি,
ধূলিময়ী ধরণীতে সে কাহার প্রসাদ-ভিখারী ?

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

আমাদের নৌবিদ্যা।

জুন মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের জলযান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিলাম। কবি গাহিয়াছেন,—

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগর ময় !'

শুনিতে বেশ লাগে—ভাবিলে শরীর শিহরে—নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করিতে পারিলে বাঙ্গালীর হৃদয়ও গর্ব্বে ভরিয়া উঠে। কিন্তু সত্যই শুনিয়াছি, কেহ এ কথা বিশ্বাস করে—আবার কেহ করে না ! বলে, তোমার কবির কল্পনা বড় তা-বকে লাগে ভালো, কিন্তু উহাতে এক কণাও সত্য নাই ! হায় দুরদৃষ্ট ! আমরা অনেকেই নেত্রহীন। যে দুই এক জনের চক্ষু আছে, তাঁহারা পরের অস্ত্র দেখিতে চাহেন না। সুতরাং "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে !'

গত জুন মাসের 'মডারণ-রিভিউ' পত্রে দেখিলাম, অনেক প্রস্তর কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহা শুভ লক্ষণ।

খ্রীষ্টাব্দের ৭৫ বর্ষে কি ঘটিয়াছিল, সে কাহিনী এখন আর কে কহিবে? পুস্তক অতি বিরল; যাহা আছে, তাহা দুষ্প্রাপ্য—সে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও আবার নির্ব্বাসিত! সুতরাং প্রাণহীন প্রস্তর-ফলক বিধাতার অনুগ্রহে জীবনলাভ করিয়া প্রাচীন গাথা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিলা-সঙ্গীত শুনিবার কি লোকের অভাব হইবে?

ওই শুন, কবি কহিতেছেন,—

'ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধ? কে কবে মোরে? জানিব কিমতে?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?'

কিন্তু আক্ষেপ করিয়া কালহরণের প্রয়োজন নাই—এখন জ্ঞানসঞ্চয়ের কাল বহিয়া যাইতেছে;—পূর্ব্বগৌরব-কাহিনীর সত্যাসত্যতা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে সমুন্নত করিবার কাল নদীর ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে।

যবদ্বীপের অতি প্রাচীন শিলাখণ্ড কি কহিতেছে, শুনিবে? তবে শুন। সুনীল-সমুদ্র-তীরে একদা ভারতের এক বিপুল জনপদ সুখে সৌভাগ্যে সম্পদে অতুল হইয়াছিল; সে জনপদ কলিঙ্গ নামে সুপরিচিত। কলিঙ্গের হিন্দু নাবিকগণ একদিন বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষা করিয়া অর্ণবপোত লইয়া যবদ্বীপে উপনীত হইল।

অর্ণবপোত? হাঁ, অর্ণবপোত! সেগুলি কেমন ছিল, শুনিবে? ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়মে তাহার নিদর্শন আছে—দীর্ঘে ৬০ ফিট (৪০ হস্ত), প্রস্থে ১৫ ফিট (১০ হস্ত)। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও নিকোলো কন্‌টি তদ্রূপ অর্ণবপোত দেখিয়া কহিয়াছিলেন,—ভারতবাসীরা আমাদের দেশের জাহাজ অপেক্ষা বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহার পাল পাঁচটি, এবং গুণবৃক্ষও পাঁচটি। জাহাজের তলদেশ তিন থাক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া তুফান সহিতে পারে। কোনও কোনও জাহাজে আবার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন খোপ (Compartment) আছে। পথিমধ্যে তাহার দুই একটি চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও, জাহাজ অনায়াসে গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়।

পরিব্রাজক ফাহিয়ান কহিয়াছেন যে, লঙ্কা হইতে তিনি তিন মাসে যবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার জাহাজে আরও দুই শত আরোহী ছিল। ট্যাভারনিয়র বলিতেছেন, (খ্রীঃ ১৬৬৬) বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মসলিপত্তন হইতে বহু অর্ণবযান পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া বঙ্গ, আরাকান, পেগু, শ্যাম, সুমাত্রা, কোচীন চায়না ও ম্যানিলা দ্বীপপুঞ্জে, এবং পশ্চিমমুখে হরমুজ, মোখা ও মাদাগাস্কারে গমন করিত।

ঔপনিবেশিক হিন্দুর সাহস, শিক্ষা, কর্ম্ম—এতকাল পরেও যাহা বাঙ্গালীর, শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়ে গৌরবের সঞ্চার করে, তাহা যবদ্বীপেই বিশেষরূপে এবং সর্ব্ব-প্রথমে বিকশিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন তাই বলিতেছেন,—কলিঙ্গ হইতে অনেক

হিন্দু যবদ্বীপে আসিয়া দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা খ্রীঃ জন্মের ৭৫ বর্ষে যবদ্বীপে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের অসংখ্য সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দিরাদি আজিও সে কাহিনী প্রমাণিত করিতেছে। যবদ্বীপের ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষা সংস্কৃত। ইহাও হিন্দু অভিযানের অন্যতম প্রমাণ। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল চৈনিক পরিব্রাজক যবদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বলিতেছেন যে, সেকালে ঐ দ্বীপ হিন্দু ঔপনিবেশিকে পূর্ণ ছিল। তাহারা গঙ্গাতরঙ্গে পোত ভাসাইয়া সিংহলে, সিংহল হইতে যবদ্বীপে এবং তথ হইতে চীনে গমন করিত। সে সকল অর্ণবযানের নাবিক ব্রাহ্মণ ছিল।*

কেবল ঐতিহাসিক্ এল ফিন্‌ষ্টোন নহেন, অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্রফোর্ড, ফার্গুসন, ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। শকদিগের প্রতীচ্যাভিযান' ইতিশীর্ষক একটি প্রবন্ধে ডাক্তার ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে, কোনও কোনও শিলালিপিতে 'মাগধী' দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা সুমাত্রা হইতে যবদ্বীপে, এবং বঙ্গ বা উড়িষ্যাতীর হইতে সুমাত্রায় আনীত হইয়াছিল। সুতরাং যবদ্বীপ ও কাম্বোদিয়ার হিন্দু উপনিবেশ-স্থাপনের মূলে বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মস্‌লিপত্তনের শক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, এবং পূর্ব্ব-ভারতের হিন্দুগণই সুমাত্রায় উপনিবেশ-সংস্থাপন করিয়াছিল।

বরেন্দ্রের প্রস্তর।

বরেন্দ্রের এক নিভৃত প্রদেশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিসংবাদ বিস্মৃত হইয়া মিলিত হইয়াছেন! এ মিলন জয়যুক্ত হউক। এ মিলনের উদ্দেশ্য,—বরেন্দ্রের ইতিহাস-সঙ্কলন। বরেন্দ্রের শিলা যতদিন ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত না হইবে—তাহার ইতিহাস যত দিন অলিখিত থাকিবে, বাঙ্গালার ইতিহাস তত দিন সম্পূর্ণ হইবে না। গঙ্গা যাহার উত্তর কূল ধৌত করিতেছে, যাহার পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে করতোয়া—টঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, যমুনা প্রভৃতি দক্ষিণবাহিনী হইয়া যে জনপদমধ্যে ধাবিতা, তাহাই বরেন্দ্র নামে খ্যাত। প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অংশবিশেষ বলিয়া বরেন্দ্র বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে বিজড়িত, এবং গৌড়ের কাহিনীর সহিত গৌড়ের সুবিখ্যাত পঞ্চ জনপদের অন্যতম বলিয়া—পাঠানের ইতিহাসে বিশেষরূপে সুপরিচিত। বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের অধিকাংশই বরেন্দ্র। ইহার নানা স্থানে প্রস্তররাশি, ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপ—বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভের অংশ—বিস্তৃত রাজপুরীর চিতাভস্ম দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পাহাড়পুর নামক স্থানে অশোকস্তূপ,† মঙ্গলবাড়ীতে গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ, পাথরঘাটায় মহীপুর, আমৈরে রামাবতী জয়স্কন্ধাবারের চিহ্ন আজিও এ প্রদেশের প্রাচীন গৌরব সূচিত করিতেছে।

হাভেল যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাহারই এক স্থানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব এসিয়ায় যে শিল্পকলা পৃথিবীমধ্যে পূজা পাইয়াছে, তাহার জন্মস্থান বরেন্দ্রে; তাহার সহিত নৃপতি ধীমানের নাম অভিন্নরূপে সংযুক্ত। ধীমান দেবপাল নৃপতির সমসাময়িক ছিলেন। ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান আছে।

* **History of India, Cowell's Edn. p. 185.**

† এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

বরেন্দ্রের শিলা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সমুদায় শিলালিপি অপেক্ষা প্রাচীন। আরও অনুসন্ধান করিলে যে আরও প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? দিঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায় এম্. এ., প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া কিছু দিন হইল. অশেষ শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় বরেন্দ্রের নানা গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। ইঁহাদের সাধু চেষ্টা ফলবতী হউক। ইঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই নানাবিধ শিলামূর্ত্তি—নানাবিধ প্রস্তর ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন;—বহু আলোকচিত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে সে সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন জনসাধারণের অবগতির জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

অজন্তার প্রাচীন গুহা।

'অজন্তার প্রাচীন গুহা' ইতিশীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীমতী নিবেদিতা 'মডারণ রিভিউ' পত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের শিল্পকলা ভারতেরই নিজস্ব, এবং উহা 'অনুকরণ' বা 'অনুসরণ' নহে। ইহা একটি অতি প্রাচীন অপবাদ যে, ভারতবর্ষ শিল্পকলা শিক্ষা করিবার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইয়াছিল! শ্রীযুত হাভেল এই অপবাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন! ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রীমতী নিবেদিতা বলিতেছেন—গ্রীসের শিল্পকলা মানুষ লইয়াই ব্যস্ত ছিল। অশ্ব, মৃগ, বা ঈগল পক্ষী কখনও কখনও চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে স্থান যে না পাইত, তাহা নহে। তালবৃক্ষ যে গ্রীক শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, তাহাও নহে! কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এই সকল অলঙ্কারের দিকে তাহারা তেমন ভাবে কখনই আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু গান্ধার প্রদেশে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, গুল্ম প্রভৃতিরই বাহুল্য পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই। কোথায় কিরূপে কোন্ অবস্থায় পুষ্পটি বা লতাটি বা বৃক্ষটি বসাইলে অধিক শোভন হয়, ইহা গান্ধার-শিল্পী চিরদিনই ভালো জানে। সুতরাং গ্রীসের শিল্পী আসিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দেয় নাই!

মার্ক টোয়েন ও ভারতবর্ষ।

মার্ক টোয়েন চিরনিদ্রিত হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্য-জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ সুরসিক চির-দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও এক জন এমন লোক হারাইয়াছি, যাঁহার সত্য সত্যই আমাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। নিম্নে তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।—

ভারতের বিশেষত্ব।

পৃথিবীতে একটিমাত্রই ভারতবর্ষ আছে। যাহা কিছু বিস্ময়কর, যাহা কিছু বিরাট, শুধু এই দেশেই তাহা আছে।...ভারতে প্লেগ আছে, কালাজ্বর আছে, উহা ভারতেরই নিজস্ব...দুর্ভিক্ষ ভারতেরই বিশেষত্ব। অন্যত্র দুর্ভিক্ষ নামমাত্র; উহা ক্ষুদ্র ও নগণ্য—ভারতবর্ষে উহা রাক্ষস-তুল্য। অন্যত্র দুর্ভিক্ষে শত শত জন মরিলে ভারতে শত সহস্র জন মরে...যাহা দেখিবে, ভারতে তাহাই অতি বৃহৎ...এমন কি, দারিদ্র্য পর্য্যন্ত। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কি এমন আছে?

ভারতবাসী।

ভারতবাসীরা দয়ালু। তাহাদের মধ্যে কুটিলবদন ও ক্রূরহৃদয় অতি অল্পই আছে। তাই ভারতের ঠগীকাহিনী স্মরণ হইলে ইহাই মনে হয় যে, উহা বুঝি একটা মিথ্যা স্বপ্নমাত্র—সত্য নহে।

ভারতের সতী বা সহমরণ।

কি সুন্দর!—কি মনোরম। সতীকে পূজা না করিয়া উপায় নাই। এই প্রথা একবার প্রবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুন্নভাবে চলিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে ইহাই মনে হয় যে, সহমরণের মূলে সেই বিপুল বিশ্বাসের অটল ভিত্তি প্রোথিত রহিয়াছে। সেই বিশ্বাস যুগ-যুগান্তরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইত, এবং বিশ্বাসিনীকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিত।

প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন মিশরবাসী।

'সাহিত্যে' এ বিষয় বহুবার আলোচিত হইয়াছে। বিষয়টি বিরাট, অথচ কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন; সত্য যে কোন্ স্থানে নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থির করা দুরূহ। যাহা হউক, 'মডারণ রিভিউ' পত্রে বিষয়টি যে পুনরালোচিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সমাজের প্রতি স্তরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবচ্ছেদ করিয়া 'সাহিত্য' পত্রের জনৈক লেখক দেখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুর সমাজে ও মিশরের সমাজে কত নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণের ন্যায় মিশরের ব্রাহ্মণ—হিন্দুর ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মিশরের ক্ষত্রিয়—হিন্দুর বৈশ্যের ন্যায় মিশরের বৈশ্য, একদিন মিশর-সমাজে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। 'অনুমান হয়'—এ কথা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। সে অনুমান দুর্ব্বল নহে, ইহাও বলা যাইতে পারে। হিন্দুর শিব মিশরের অসিরিস্, হিন্দুর শক্তি মিশরের আইসিস্। ভারতবর্ষেও যেমন, মিশরেও তদ্রূপ লিঙ্গপূজার প্রাধান্য আজিও বর্ত্তমান। ভারতে সে পূজা সুপ্রচলিত, মিশরে প্রাচীন পূজার চিহ্ন দেদীপ্যমান।

অনেকে এখন অনুমান করেন যে, ভারতের লিঙ্গপূজা এক সময়ের ভারতবাসীর নৈতিক অবনতির চিহ্ন—উহা কুপ্রকৃতিমূলক—কামজ ও কুৎসিত! এরূপ উক্তি যে শুধু বৈদেশিক ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া থাকেন, তাহা নহে। আধুনিক উচ্চশিক্ষিত অনেক বাঙ্গালীর মুখেও এরূপ কথা শুনিয়াছি। কিন্তু ভল্‌টেয়ারের ন্যায় সমুন্নত সামাজিক দার্শনিক পণ্ডিত কি বলিতেছেন, শুনুন,—'It is impossible to believe that depravity of manners would ever have led among any people to the establishment of religious ceremonies, though our ideas of propriety may lead us to suppose that ceremonies which appear to us so infamous could only be invented by licentiousness. It is probable that the first thought was to honour the deity in the symbol of life, and that the custom was introduced in times of simplicity.'

ভল্‌টেয়ার ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাহা বুঝিয়াছিলেন, আমরা ভারতবাসী হইয়াও আপনদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেরূপ উদার মত পোষণ করিতে পারি না! ইহা বিস্ময়ের বিষয়, কি লজ্জার বিষয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

শ্রীহেমস্বামী।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ভট্টাচার্য্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

[১৮৫৭ সালের বিপ্লবের হিন্দুপক্ষীয় বিবরণ।]

বিগত পঞ্চম বর্ষের 'সাহিত্যে' মহারাষ্ট্র রাজমন্ত্রী নানা ফড়নবীসের 'আত্মচরিতের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বহুদিন পরে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের 'আত্মচরিত' লইয়া বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। বোম্বায়ের নিকটবর্ত্তী বসইর (বেসীনের) অন্তঃপাতী 'বরসঙ্গ' গ্রামের এক জন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ বিগত ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে অর্থোপার্জ্জনের আশায় উত্তর-ভারতে আসিয়া সিপাহী-বিপ্লবের আবর্ত্তে পতিত হন। বহু কষ্টভোগের পর ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া বিপ্লবের আংশিক-বিবরণ-সংবলিত আত্মচরিত লিখিয়া রাখেন। সেই বিবরণ এত দিন পরে তাঁহার বংশধরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি রাও বাহাদুর চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য এম. এ., এল্. এল্. বি. মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন। এই 'আত্মচরিত' বা ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রচারিত হওয়ায় সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিপ্লবের হিন্দুপক্ষীয় বিবরণের একাংশ জনসাধারণের গোচর হইয়াছে। সিপাহীবিপ্লব-সংক্রান্ত অসংখ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার অধিকাংশই ইংরাজ লেখকদিগের কল্পনা-প্রসূত। সে সময়ের প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ও অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরাজও পুস্তক, প্রবন্ধ ও পত্রাকারে ঐ বিপ্লবের সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যেও অনেকে সরকারী ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগৃহীত করিয়া বিবিধ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। দুই এক জন ইংরাজ লেখক প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণের জন্য যথাসম্ভব ক্লেশ স্বীকার করিয়া হিন্দু ও মুসলমানসমাজে প্রচলিত বিপ্লববিষয়ক আখ্যায়িকা, জনশ্রুতি প্রভৃতির সংকলনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক সাহিত্যের পরিপুষ্টিবিধানে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তথাপি হিন্দুপক্ষীয় বা ভারতবাসীর পক্ষীয় সমস্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সিপাহী-বিপ্লবের অধিকাংশ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন কোনও ভারতবাসী ১৮৫৭।৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ব্যাপারের বিশদ বর্ণনা করিয়া কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ না করায়, আমাদিগকে বৈদেশিকদিগের লিখিত একদেশীয় রচনা পাঠ করিয়াই এত দিন সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে রাও বাহাদুর বৈদ্য মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদিগের একটি সবিশেষ অভাব দূর হইয়াছে। এই গ্রন্থের সাহায্যে সিপাহী-বিপ্লবের হিন্দুপক্ষীয় বিবরণ জনসাধারণের গোচর হইয়াছে।

আলোচ্য 'আত্মচরিতের' লেখক পণ্ডিত বিষ্ণু ভট্ট ইংরাজী ভাষা জানিতেন না। তিনি হিন্দু পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা লাভ করিয়া বেদ-বেদাঙ্গ ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই তিনি স্বনেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার বিশেষ কারণ নাই। বিঠুর ও গোয়ালিয়রের বিবরণ সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক প্রাচীন

পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা লাভ করিয়াও যেরূপ সরল ভাষায় এই 'আত্মচরিতে'র রচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ সরস প্রাঞ্জল রচনা বর্ত্তমান সময়েও অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যে' লেখকের সমগ্র 'আত্মচরিতে'র সার-সঙ্কলন করিবার স্থানাভাব। আমরা আপাততঃ তাঁহার উত্তর-ভারতীয় অভিজ্ঞতার বিবরণই অতি সংক্ষেপে পাঠকদিগের গোচর করিতেছি।

যাত্রার সংকল্প।

১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে মাঘ মাসে লেখক বিষ্ণু ভট্ট বরসঈ হইতে পুণায় তাঁহার কোনও যজমানের বাটীতে গিয়া শুনিলেন যে, মহারাজ শিন্দের (সিন্ধিয়ার) জননী 'বায়জা বাঈ' মথুরায় 'সর্ব্বতোমুখ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইবার সংকল্প করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে; দেশ বিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। পুণার অনেকেও নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছেন। বিষ্ণু ভট্ট অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া, তিনি দানসংগ্রহের আশায় মথুরার যজ্ঞে গমন করিবার সংকল্প করিলেন। মথুরা ও গোয়ালিয়ারে তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়ও ছিলেন; বায়জা বাঈয়ের দানাধ্যক্ষ বালকৃষ্ণ ভট্ট বৈশম্পায়ন তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার যাত্রা নিষ্ফল না হইবারই সম্ভাবনা মনে করিয়া বিষ্ণু ভট্ট পুলকিত হইলেন। কিন্তু বাটী গিয়া তিনি যখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে তাঁহার এই সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তখন বৃদ্ধ তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—এত দূরদেশে একাকী যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে; বিশেষতঃ, উত্তর-ভারতের রমণীগণ সম্মোহন-বিদ্যায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তাঁহার ন্যায় যুবককে পাইলে তাহারা কখনই ছাড়িয়া দিবে না!" যুবক কোনও রমণীর মোহজালে জড়িত হইবেন না বলিয়া অনেক শপথ করিলেন; কিন্তু পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও বাধা দিতে লাগিলেন। বিষ্ণু ভট্ট বড় মুস্কিলে পড়িলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার এক খুল্লতাতকে তাঁহার সহিত গমনে সম্মত করিতে সমর্থ হওয়ায় অতিকষ্টে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মথুরায় যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। শোকাকুলা পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ ও জনকজননীর পাদবন্দনা করিয়া বিষ্ণু ভট্ট শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

যাত্রারম্ভ।

প্রথমে পুণায় আসিয়া সেখান হইতে কয়েক জন মথুরাযাত্রী পণ্ডিতের সঙ্গে বিষ্ণু ভট্ট ও তাঁহার খুল্লতাত উত্তর-ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সকলে মিলিয়া কয়েকটি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন; তাহাতে জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া প্রায় সকলেই পদব্রজে গমন করিতেন। পথের উভয়পার্শ্বস্থ বনশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে একপ্রকার বিনা ক্লেশেই তাঁহারা প্রত্যহ ৮।১০ ক্রোশ করিয়া পথ চলিতেন। আহম্মদনগরে উপস্থিত হইবার পর কয়েক দিন তথায় বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা 'মালে গাঁও' নামক স্থানে গমন করিলেন। তথা হইতে আবার নূতন গাড়ী ভাড়া করিতে হইল। মালে গাঁওয়ে এক জন ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি মথুরাগামী ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় আবাসে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বেদপাঠ শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করিলেন। তথা হইতে বিদায় হইয়া যাত্রিগণ প্রথমে 'ধুলে' (ধুলিয়া) ও তৎপরে 'করবন্দ বারী' নামক স্থানে পঁহুছিলেন।

সাতপুড়া গিরিশ্রেণী।

এইখান হইতেই সাতপুড়া গিরিশ্রেণীর আরম্ভ। সাতপুড়ার বিস্তার ৬০।৭০ ক্রোশ হইবে। ইহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে; অবশিষ্ট সর্ব্বত্র বন্ধুর শৈলস্তূপ। পুড়া অর্থে শৈলস্তূপ। সাতটি শৈলস্তূপ লইয়া সাতপুড়া। সাত দিনে সাতটি শৈলস্তূপ অতিক্রম করা যায়। গ্রন্থকার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শৈলারোহণ করিতে আরম্ভ করেন। তখন জ্যোৎস্নালোকে বনপ্রদেশ সংসারসুখাশার ন্যায় অস্পষ্ট রমণীয় প্রতিভাত হইতেছিল। অহংভাবরূপ কুসুমগন্ধে বনভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শৈলস্তূপ হইতে অবতরণ করিয়া ছয় ক্রোশ দূরে আসিয়া গ্রন্থকার দেখিলেন, তখনও তাঁহাদের চতুর্দ্দিক্ সুগন্ধে পূর্ণ ছিল। অরুণোদয়কালে দৃষ্ট হইল, অসংখ্য বিল্ববৃক্ষে গিরিশ্রেণী আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তখন বসন্তের প্রারম্ভ। তরুপুঞ্জের আরক্ত কোমল পল্লবনিচয় অরুণ-কিরণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। রক্তচন্দন, মধুপ (মহুয়া) ও শালবৃক্ষের বনও অসংখ্য। গিরিশিখরে ভীলগণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণী। উপত্যকায় ভীলপল্লী—প্রাতঃকালে ভীল যুবতীগণ জলানয়ন ও গৃহসংস্কার কার্য্যে নিরতা। গ্রন্থকার ও তাঁহার সহচরগণ একটি ডাকবাংলোর আশ্রয় লইলেন।

বিপ্লব-সংবাদ।

সাতপুরার অপর পারে 'মহু'তে (Mohu) একটি সেনানিবাস আছে। তথা হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি ডাকবাংলোয় গ্রন্থকার আশ্রয় লইয়া যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তথায় রাত্রি ৪।৫ ঘটিকার সময় দুই দল সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রবাসে পরস্পরের সহিত পরিচয়ে বিলম্ব ঘটিল না। বিশেষতঃ তাহাদের বাড়ী গোয়া অঞ্চলে ছিল বলিয়া তাহারা মহারাষ্ট্রী ভাষায় কথা কহিতে পারিত। প্রথম পরিচয়ের পর নানা কথাপ্রসঙ্গে তাহাদের মুখে গ্রন্থকার প্রথম বিপ্লবের বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। সিপাহীরা বলিল, 'অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে পৃথিবীতে রাষ্ট্র-বিপ্লব, লুটপাট. মারামারি, কাটাকাটি আরম্ভ হইবে। ইংরাজ সরকার এতদিন সুবুদ্ধির ন্যায় রাজ্য-পালন করিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের মতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। গত বৎসর বিলাত হইতে তাঁহারা নূতন ধরণের 'কাড়াবীন' (Carbine) বন্দুক আনাইয়াছেন; তাহার জন্য টোটা প্রস্তুত হইতেছে। দমদমের ছাউনীতে এক জন ব্রাহ্মণসিপাহীর সহিত এক চামারের কলহ হওয়ায় চামার বলিল,—'তোমরা উচ্চজাতি বলিয়া কেন বৃথা অহঙ্কার করিতেছ? তোমাদিগের নূতন বন্দুকের জন্য যে টোটা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে গো-শূকরের চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়। সেই চর্ব্বি আমরাই প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। সেই চর্ব্বিমাখান টোটা তোমাদিগকে দাঁতে ছিঁড়িতে হইবে—তখন তোমাদের জাতিগর্ব্ব কোথায় থাকিবে?' এই কথা অল্প সময়ের মধ্যে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ায় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। তাহাদের মনে হইল, সরকার বাহাদুর আমাদিগকে কৌশলে খ্রীষ্টান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাহারা টোটার ব্যবহারে আপনাদিগের অসম্মতি কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিল। সিপাহীদিগের মধ্যে অনেকে, ইংরাজের মঙ্গলকামনায়, এই আশঙ্কার পরিণামে যে অকারণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে পারে, এ কথা পত্রযোগে উপরিতন কর্ম্মচারীদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা হইতে যে এরূপ সার্ব্বভৌম বিপ্লবের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা তাঁহারাও পূর্ব্বে

বুঝিতে পারেন নাই।' টোটার কথা এরূপ বিদ্যুৎগতিতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িতে পারে, ইহাও পূর্ব্বে কাহারও কল্পনায় স্থানলাভ করে নাই।

অন্যান্য গুজব।

সিপাহীরা তাহার পর বলিল,—'এই টোটাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য বিলাত হইতে এক জন সাহেব আসিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত গবর্ণর সাহেবের পরামর্শে স্থির হইল যে. সিপাহীদিগকে টোটা ব্যবহার করিতেই হইবে। যাহারা টোটা-ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ নিরস্ত্র করিতে হইবে। পরে তাহাদিগের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা ভবিষ্যতে স্থির করা যাইবে। এইরূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সব একাকার করিবার আদেশ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্মান প্রকাশ না করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সরকার বাহাদুর যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই জন্য যে কেবল এই টোটা-ব্যবহারের আদেশ হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী আরও বিবিধ কার্য্যের প্রবর্ত্তন করিবার সংকল্পও তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহারা ঐরূপ ৮৪টি বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেশীয় রাজা ও মহারাজদিগের সভায় দাখিল করেন। কলিকাতায় এই রাজাদিগের সভা হইয়াছিল। তাহাতে শিন্দে, হোলকর, গায়কোয়াড় ও ধুলপুকার, বিলশিয়া, দতিয়া, ওরছা প্রভৃতি প্রদেশের রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ঐ সভায় নানা সাহেব পেশওয়ে, লক্ষ্ণৌয়ের বেগম, ঝাঁশীর রাণী ও দিল্লীর বাদশাহ ফেরোজ শাহ নিমন্ত্রিত হন নাই। আর সব ছোট বড় রাজা মহারাজই আহূত হইয়া কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিলেন। রাজাদিগের সেই সভায় পূর্ব্বোক্ত তালিকা পঠিত হয়। উহার প্রধান কথাটি এই ছিল যে, আইন অনুসারে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মবিষয়ক কোনও অধিকারই আর থাকিবে না। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি কথা বলিতেছি। চারি ভ্রাতার মধ্যে যদি এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তথাপি তাহার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার বিলুপ্ত হইবে না! সেইরূপ, বিধবা যদি পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ করিয়া সন্তানলাভ করে, তাহা হইলে, তাহার গর্ভজাত সেই সন্তানও পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। এইরূপ আরও অনেক হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা সেই তালিকায় লিখিত ছিল। সিপাহীরা বলিল,—'রাজপুরুষদিগের এই প্রস্তাব শুনিয়া বাণপুরের রাজা সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—'এই ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাকে কর্ম্মভূমি বলে। সিংহলাদি বহু দ্বীপ এই জম্বুদ্বীপে সংলগ্ন রহিয়াছে। হিন্দুদিগের ভারতবর্ষই একমাত্র আশ্রয়স্থল। হিন্দুদেবতারা যদি হিন্দুদিগের উপর নিতান্তই বিরূপ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাহেব বাহাদুর যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ হইবে। নচেৎ যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। সার্ব্বভৌম রাজা প্রজাকে অধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিলেও, প্রজারা তাহা কদাপি শ্রবণ করিবে না। সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইবে।' তাহার পর এক জন নবাব, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'এই ভারতবর্ষে মুসলমান ও হিন্দু একত্র বাস করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মে আঘাত করে না। যে রাজা এই উভয় জাতির ধর্ম্মে আঘাত করিবার চেষ্টা করে, সে কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। দেখুন, দিল্লীর বাদশাহ হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ইস্লাম-প্রচারের সংকল্প করিবামাত্র তাঁহার সার্ব্ব-

ভৌমত্ব বিনষ্ট হইল। এই কারণে ইংরাজ সরকারের এই অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।' শুনিতে পাই, আরও অনেকে সভায় এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। সুতরাং রাজারা অসন্তুষ্ট হইয়া সভাত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় হিন্দুমুসলমান সকলেই উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ মরিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। রাজপুরুষেরা সিপাহীদিগকে টোটাগ্রহণে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে সিপাহীরা রক্তে ধরণী প্লাবিত করিবে।

প্রকৃত কথা।

জনশ্রুতি 'তিল'কে কিরূপে 'তালে' পরিণত করিতে পারে, সিপাহীদিগের এই উক্তিই তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্থল। প্রকৃতপক্ষে বিধবাবিবাহের আইন দেশীয় সংস্কারকদিগের অনুরোধে ও চেষ্টার ফলেই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য, খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণকারীদিগের উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে স্থানীয় রাজপুরুষদিগের অপেক্ষা বিলাতের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী অদূরদর্শী ব্যক্তির উৎসাহই অধিকতর ছিল। হিন্দু সিপাহীদিগের জন্য এখানকার রাজপুরুষেরা টোটায় মেষের চর্ব্বি ব্যবহার করাইবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন, কেবল গোরা সৈন্যের জন্য বিলাত হইতে নিষিদ্ধ চর্ব্বিসংযুক্ত টোটার আমদানী হইয়াছিল। এ কথা রাজপুরুষেরা সিপাহীদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে সিপাহীদিগের মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর হইল না। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে রাজা মহারাজদিগের বিরাট সভার ও বক্তৃতাদির কথা কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, সে সময়ে দেশীয় সংবাদপত্রের সমধিক প্রচার থাকিলে এই সকল অনিষ্টকর জনরবের অমূলকতা সহজেই জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিত;—সত্য কথার প্রচারে লোকের মোহ অনায়াসেই দূর হইতে পারিত!

মহুতে বিপ্লব।

সিপাহীদিগের কথা শুনিয়া গ্রন্থকার ও তাঁহার সহচরদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তাঁহারা প্রথমে দেশে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন; কিন্তু পরে ভাবিলেন,—'আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিপ্লবের সহিত আমাদিগের সম্পর্ক কি? বিশেষতঃ, দেশের লোকে যখন স্বধর্ম্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ-পীড়নে তাহাদের আগ্রহ হইবে কেন?' এই ভাবিয়া তাঁহারা গন্তব্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আরও কয়েক দল সিপাহীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। তাহারাও সেই কথা বলিল। যাত্রিগণ যখন মহুর সেনানিবাসের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন কামানের গর্জ্জনধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। চারি দিক্ ধূমের অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। সে দিন ১০ই জুন। (কে সাহেবের ইতিহাস মতে সে দিন ১লা জুলাই ছিল।) যাত্রিগণ ভয়ে জড়বৎ হইলেন। সেনানিবাস প্রায় তিন ক্রোশ ব্যাপী ছিল। সিপাহীরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। গ্রীষ্মকাল—বেলা বারটা, বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ায় একেবারে চারি দিক জ্বলিয়া উঠিল। প্রচণ্ড অগ্নিশিখাসমূহ আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। সিপাহীদিগের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে এক দল সিপাহী আসিয়া আমাদের পরিচিত যাত্রিগণকে ঘিরিয়া ফেলিল! তাঁহারা ভয়ে বাতাসে কদলীর স্থায় কাঁপিতে লাগিলেন। তখন গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করিয়া সিপাহীদিগকে আপনাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগবর্দ্ধক নানা কথায় তাহাদিগকে তুষ্ট করায় সিপাহীরা তাঁহাদিগকে অভয়দান করিল। কেবল তাহাই নহে, এই ব্রাহ্মণদিগের সেবায় তাহারা যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিন সিপাহীদিগের সহবাসে কাটিয়া গেল। সিপহীরা মধ্যে মধ্যে ডাক-লুণ্ঠন, টেলিগ্রাফের তার-কর্ত্তন ও স্তম্ভ উৎপাটন করিত। ক্রমশঃ।

অন্তরঙ্গ।

ঐ রে!—সেই শুনছি পায়ের শব্দ,
দ্বারে শিকল বজ্‌ছে ঠনক্‌-ঠন্‌;
শুনে আমার নাড়ী হচ্চে স্তব্ধ,
আস্‌চেন বন্ধু কর্‌তে জ্বালাতন।
কাঁপেনাক হৃদয় আমার কভু
ভীষণ শত্রু দেখ্‌লে সম্মুখেতে;
এই বন্ধু হ'তে রক্ষা কর প্রভু,
এসে যে জন চান্‌ না চ'লে যেতে।

২

শুয়ে পড়েন আমার চেয়ার টানি';
কতই স্নেহে সুধান সমাচার;
উল্টে পাল্টে ফটোর খাতাখানি
জাহির করেন বিচিত্র মত তাঁর।
অবাক হয়ে দেখেন কোনো চিত্র,
গুণ্‌গুণিয়ে ছাড়েন প্র্‌ত্যুত্তর;
তিনি আমার অশেষ গুণের মিত্র,
ছাড়েন না তাই ভুলে আমার ঘর।

৩

দৈনিক সংবাদ পড়েন আদ্যোপান্ত
কাগজখানি আমি দেখ্‌বার আগে;
কবিতা তাঁর আওড়ান অবিশ্রান্ত—
প্রভাবে যার ভূত অবধি ভাগে।

ভিবে হ'তে শেষ পানটি চর্ব্বণ
কর্ত্তে কর্ত্তে চেয়ে বসেন আবার ;
গোপন চিঠি খোলেন যখন তখন ;
খোলেন না হায় বাহিরে যাবার দুয়ার !

৪

দেখান যত নিন্দা তাঁহার কাব্যের,—
লিখেছে যা' কুটিল সমালোচক ;
ব্যাখ্যা ক'রে সৌন্দর্য্য ও ভাবের
বেছে বেছে ছন্দে শুনান শ্লোক।
বলেন,—"কাব্য বোঝে না সে মূলে,
খুসী হই তার দিতে পারলে ফাঁসি।"
নানা কথা বলেন, কিন্তু ভুলে—
বলেন নাক,—"বন্ধু এখন আসি।"

৫

কি পুণ্যে হায় পেলেম বন্ধুটিরে,
কখনো যে হন না সঙ্গ-ছাড়া !
শ্রাবণধারার মতন আমার শিরে
ঝরুচে সদাই তাঁহার কৃপা-ধারা।
কার্য্যে যখন ব্যস্ত থাকি আমি,
নির্ব্বাণ-তত্ত্ব বুঝান বন্ধু হেসে ;
এই সুহৃৎ হ'তে বাঁচাও দয়াল স্বামী !—
এসে যে জন চান না যেতে শেষে।

আত্মহত্যা।

দাম্পত্য জীবনের সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিয়া শ্রীযুত বিনয়চন্দ্র বসু পঞ্চাননতলা লেনে একটি সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকায় বাস করিতেছিলেন। জীবনের বিস্তারের সহিত সহধর্ম্মিণী সুন্দরী কুমুদিনীর সহিত তাঁহার প্রণয়ও বিস্তৃত লাভ করিতেছিল। এমন কি, উভয়ে উভয়কে এক দণ্ড না দেখিলে সংসারের ঘোর অসারতা উপলব্ধি করিতেন। বিনয়চন্দ্র প্রত্যহ [illegible]

বাইতেন। তাঁহার ওকালতীতে মন্দ পসার হয় নাই। তথাপি দৈনিক বিরহ ও নৈশ মিলন উভয়ের নিকট তরঙ্গায়িত কাল-সমুদ্রের ক্ষুদ্র উত্থান ও পতনের স্থায় বোধ হইত। তাহার মধ্যে বহু দীর্ঘবিশ্বাস ও বিরহজনিত শূন্যতা প্রত্যহ উভয়ের হৃদয় আলোড়িত করিত।

বাটীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবলমাত্র প্রজ্ঞাসম্পন্না পিসী ও ভগ্নী মালতী। বিনয়ের মাতাপিতা কাশীবাসী। কনিষ্ঠ সহোদর অবিনাশ হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাহার বাসগৃহ নিম্নতলে। অবিনাশের গৃহের উপকরণের মধ্যে একটি স্যাণ্ডোর ডম্‌বেল, খানকতক পাঠ্য বহি, চা'র পেয়ালা, একখানা ভাঙ্গা আরসী ও নূতন চিরুণী, কেশরঞ্জন তৈলের পুরাতন শিশি, একটি বাইসাইকল্, আর্য্যমিশনের ভগবদ্গীতা ও সর্ব্বশেষে স্বদেশী দন্তমঞ্জনের অনেকগুলি কৌটা।

মোটের মাথায় অট্টালিকাটি দিব্য পরিচ্ছন্ন। সুরঞ্জিত ক্রোটনে, পুষ্পবৃক্ষে ও লতাপাতায় সুশোভিত, এবং ইলেক্‌ট্রিক লাইট দ্বারা আলোকিত। দ্বিতলে সর্ব্বশেষের গৃহে পিসীমাতার বাস। তাঁহার সহিত মালতী থাকিত। মালতী বিনয়ের কনিষ্ঠা সহোদরা। বালবিধবা। ছয় বৎসর পূর্ব্বে সোহাগিনী মালতীর স্বামী দূরদেশে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পিসীমা ছাড়া জগতে মালতীর স্নেহাধার বড় একটা ছিল না। কলিকাতার উদ্দেশ্যহীন কোলাহল, নিরানন্দ ধূম্রময় আকাশ ও হৃদয়শূন্য সমাজের মধ্যে দুঃখিনী বিধবা পিসীমার কোলে মস্তক লুকাইয়া জীবনের প্রথম ও শেষ অঙ্কের কথা ভাবিত।

মালতীর শ্বশুর বিনয়চন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, 'তোমার ভগ্নীর আবার বিবাহ দিতে পার।' কুমুদিনীর ইহাতে অতিশয় আহ্লাদ হইয়াছিল। 'আমি ঠাকুরঝির ঘটকালী করিব।' বিনয়চন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'বেশ।' কিন্তু পিসীমার ইহাতে দুর্জ্জয় আপত্তি ছিল। মালতী পিসীমার দিকে। বিবাহের কথা কর্ণে শুনিতে পারিত না।

পার্শ্বের বাটীতে ব্যারিষ্টার প্রফুল্ল দত্তের বাস। দত্তজা [illegible], এবং বিনয়চন্দ্রের পরম বন্ধু। কখনও কখনও কুমুদিনীর মনে হইত যে, প্রফুল্লের সহিত মালতীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু মালতী তাহা শুনিয়া ভয়ানক রাগ করিয়াছিল, এবং পিসীমাতাকে বলিয়া দিয়াছিল। পিসীমা মালতীর ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া বৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিয়া-

ছিলেন। "মা! তুই কিছু মনে করিস্‌নে; বিনয় ও কুমুদিনীর জাত্ বিচার নাই। বিলাতফেরতের সহিত বিবাহ! কি ধর্ম্মনাশ! ওর মুখে যে সর্ব্বদা মুর্গীর গন্ধ!"

মালতী। আমি রোজ দেখি যে, ওরা মিস্ ডেভিসের সঙ্গে সকালে একত্র বসিয়া ডিম্ খায়।

পিসীমা। ছি, ছি! ওদের নরকেও স্থান্ হবে না। তুই ওদের বাড়ীর দিকের জানালা খুলিস্‌নে। ও সব দেখলেও পাপ হয়।

মালতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে আর দেখিবে না।

মালতী কুমুদিনীর ময়না পাখী লইয়া থাকিত। নেপাল পর্য্যটন করিয়া প্রফুল্ল দত্ত সেই ময়নাটি লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং বন্ধুবরের স্ত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন। বৃহৎলৌহপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম, মালতীর দ্বারা লালিত ও কুমুদিনীর দ্বারা অহরহঃ আদৃত হইয়া, পক্ষপুট-মণ্ডিত কৃষ্ণ কলেবর স্ফীত করিয়া, এবং সুবর্ণ-হরিৎ চঞ্চু পিঞ্জরদ্বারে স্থাপন করিয়া, জগতের রীতিনীতি সুগোল চঞ্চল চক্ষু দ্বারা প্রগাঢ় আগ্রহসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিত। মালতী তাহার পায়ে ক্ষুদ্র নূপুর বাঁধিয়া নাচাইত, এবং ময়না ক্ষুধিত হইলে ছাতু খাওয়াইত।

২

মালতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে বাতায়নপার্শ্বে যাইবে না। কারণ, প্রফুল্লর ঘর সেখান হইতে দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করা সুকঠিন। অতএব, দ্বিতীয়বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং তৃতীবার প্রতিজ্ঞা করিতে গিয়া মনে হইল যে, যদি সন্ধ্যার সময় বাতায়ন উন্মুক্ত থাকে, এবং ঘরে আলোকাদি না থাকে, তবে অন্ততঃ তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না।

মালতী সন্ধ্যার পর বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া বুদ্ধদেব-চরিত পড়িতে বসিল। তাহার চারি পাতা পড়িয়া ছাতে আসিল। সেখানে প্রফুল্লর সুকণ্ঠনিঃসৃত ধর্ম্মসঙ্গীত শুনা যাইতেছিল। প্রফুল্ল দত্ত একাকী গান করিতেছিলেন।

মালতী তাহা শুনিতে চাহিল না। অন্যদিন শুনিত, কিন্তু হঠাৎ বোধ হইল যে, সেটা ক্রমাগত শুনা অন্যায়। আবার বোধ হইল যে, যত দিন শুনা যায়, তত দিন শুনিতে দোষ কি? কানের ভিতর সুমধুর কণ্ঠসঙ্গীতের একটা প্রতিধ্বনি হয় মাত্র! তাহার সহিত জীবনের পাপ পুণ্যের সম্বন্ধ কি?

কিন্তু 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে' যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহা অনেক দিন হইতে মালতীর হইয়াছিল। আজ মালতী তাহা বুঝিতে পারিল।

মালতী ধীরে ধীরে কুমুদিনীর ঘরে গেল। কুমুদিনী ইংরাজী লিখিতেছিল। কুমুদিনী মালতীকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

'ঠাকুরঝি, দেখ ত, আমার বানানটা ঠিক হয়েছে কি না।'

মালতী পূর্ব্বে রেঙ্গুন স্কুলে ইংরাজী শিখিয়াছিল। সে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, তখন তাহার বিবাহ হয়। আট বৎসরের কথা।

মালতী। কাকে চিঠি লিখ্‌ছ?

কুমুদিনী। প্রফুল্লকে।

মালতীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, 'অন্ত কিছু নহে। আমি একটা কার্পেট বুনিয়াছি। ইহা তাহার উপহারের বিনিময়। ঐ ময়নাটি লইয়া অবধি আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তাহার প্রতিদান না করা অন্তায়। অতএব এই চিঠি। কিন্তু স্তাখ' ভাই,—"মাই ডিয়ার প্রফুল্ল বাবু" বোধ হয় ঠিক হয় নি।'

মালতী। আমি দেখতেম না, কিন্তু তুমি অপমান হবে, সেই ভয়ে বল্‌ছি যে, 'ডিয়ার' বানান ভুল হয়েছে। তুমি যে 'ডিয়ার' লিখেছ, তাহার অর্থ 'হরিণ।'

কুমুদিনী লজ্জিতা হইল না, বরং আরও আহ্লাদিতা হইল। 'তাতে দোষ নাই, প্রফুল্ল বাবু অনেকটা হরিণের মত। শিং নাই—বটে, কিন্তু চক্ষু আছে।'

মালতী কোনও কথা কহিল না।

কুমুদিনী। তাহার কারণ কি জান? সেই তুমি যে দিন ময়নাকে নাচাচ্ছিলে, মিষ্টার দত্ত হরিণের মত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়াছিল। খানিকটা সভয়ে, খানিকটা সতৃষ্ণভাবে।

মালতী কঠোর স্বরে বলিল, 'তিনি চরিত্রহীন।' স্বভাবতঃ স্থিরচিত্তা কুমুদিনী বন্ধুবরের নিন্দা শুনিয়া অস্থিরা হইয়া পড়িল। কুমুদিনী কখনও রাগিত না, কিন্তু সে তখন মনে করিলে রাগিতে পারিত, এত দূর উতলা হইয়াছিল!

'তোমার মুখে নূতন কথা শুনিলাম।'

মালতী। নূতন কথা? তিনি মিস্ ডেভিসের—সহিত একত্র বসিয়া খাবার খান।

কুমুদিনী। মুর্গী খাইলে চরিত্র বিগড়াইয়া থাকে, তাহা নূতন শুনিলাম। বিলাতে যত বড় বড় ধার্ম্মিক আছে, তাহারা কি মুর্গি খায় না?

মালতী। আমাদের সমাজে যুবতীর সহিত টেবিলে বসিয়া হাসি খুসি ও একত্র খাওয়া নিতান্ত গর্হিত।

কুমুদিনী বলিল। 'আচ্ছা, এ কথা আমি প্রফুল্লকে বলিয়া দিব।'

মালতী বলিল, 'কখনও না।'

এবং যাহা কখনও ঘটে নাই, আজ তাহা ঘটিল। মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। বোধ হয়, বহু দিনের রুদ্ধ হৃদয়ের ক্লেশ ও শোক আজ উথলিয়া উঠিল। বোধ হয়, তাহার মধ্যে অনেক কথা ছিল, এবং সে কথা কুমুদিনী জানিত না। কুমুদিনী মালতীকে বক্ষে লইল। কুমুদিনীর সুন্দর শুভ্র করুণাকোমল হৃদয়ের উপর মালতী মস্তক রাখিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল।

কুমুদিনী নারীস্বভাবসুলভ সহৃদয়তা কাঁদিয়া দেখাইতে পারিত, কিন্তু সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িল। কুমুদিনী বুঝিল, মালতী প্রফুল্লকে সম্পূর্ণভাবে হৃদয় দিয়াছে, এবং তাহা অতি ভয়ানক।

অনেকক্ষণ পরে কুমুদিনী বলিল; 'ঠাকুরঝি, রাগ করিও না; আমি এ কথা কিছুই বলিব না।'

মালতী তাহাতে বুঝিতে পারিল যে, তাহার জীবনের অতি প্রচ্ছন্ন কথা প্রকাশ পাইয়াছে। মালতী বাহিরে আসিল।

নির্ম্মল আকাশে ঘোর মেঘ করিয়া আসিতেছিল। বোধ হইল, রাত্রিকালে বড় বৃষ্টি হইবে।

৩

প্রফুল্ল দত্তের ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও তিনি যে সংসারের কূটনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ লোক, তাহা বলা বাহুল্য; কারণ, তাঁহার যত গোপনীয় কথার ভাণ্ডার বন্ধু বিনয়চন্দ্র বসুর কর্ণ। কিন্তু বিনয়চন্দ্রের কর্ণ হইতে মুখ পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ উদার প্রশস্ত পথ ছিল; তাহা দত্তজা কখনও ভাবেন নাই। বিনয়চন্দ্র যাহা শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ কুমুদিনীকে বলিয়া ফেলিতেন।

ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে, বিনয়চন্দ্র কুমুদিনীকে নির্জ্জনে লইয়া পরামর্শ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আহারের পর বিনয়চন্দ্র বলিলেন, 'কুমু, আজ একটা গোপনীয় কথা আছে।'

কুমুদিনী। কত জনকে বলিয়াছ? বোধ হয় হাইকোর্টে সকলেই এতক্ষণ জানিতে পারিয়াছে।

বিনয়চন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহা খুব সম্ভব; কারণ, তিনি প্রায় তের জন বন্ধুকে সে কথা জানাইয়াও হৃদয়ের ভার লঘু করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিনয়চন্দ্র বলিলেন, 'কখনও না, কেবল তোমাকে বল্‌ছি।'

কথাটা বড় সঙ্গীন। মিস ডেভিস্ প্রফুল্ল দত্তকে ভালবাসে। এবং যদি প্রফুল্ল খ্রীষ্টান হয়, তবে সে তাহাকে বিবাহ করিবে। সে ব্যারিষ্টার ডেভিসের একমাত্র কন্যা, এবং ডেভিস্ মহাসম্পত্তিশালী, ইত্যাদি। বিনয়চন্দ্র বলিলেন, 'আমার বোধ হয়, প্রফুল্লর এখনই খৃষ্টান হওয়া উচিত।'

কুমুদিনী অবাক হইয়া তাহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। ভাবটা এই,—'বোধ হয় তোমা অপেক্ষা জগতে অধিকতর মূর্খের অস্তিত্ব অসম্ভব।' রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমুদিনী বলিল, 'বোধ হয় এমন সুবিধা পাইলে তুমিও খৃষ্টান হইতে।'

বিনয়চন্দ্র জেরাতে কিঞ্চিৎ হটিয়া নতনয়নে স্বীয় বুদ্ধিহীনতা কবুল করিলেন। কিন্তু বলিলেন, 'দেখ কুমু, এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে।'

কুমুদিনী। থাকে থাকুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ শোন। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী মালতীর কথা।

বিনয়। কোনও অসুখ হয় নাই ত?

কুমুদিনী। সংসারে যখন সুখ নাই, তখন অসুখ আপনিই হইবার কথা। কিন্তু ইহা তদপেক্ষা ভয়ানক। 'প্রণয়' নামক বিশেষ অসুখ।

বিনয়চন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। স্নেহময়ী সরলা মালতীর 'প্রণয়' হওয়া—আশ্চর্য্য কথা!

কুমুদিনী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ইহাই খুব সম্ভব। জীবন, যৌবন ও মালতীর ন্যায় অসামান্য ও অপূর্ব্ব রূপের ভার সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই জগতে একটা বৃহৎ জঞ্জাল, এবং সেই সকল এক জন পুরুষের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিলে, এবং নির্ব্বিবাদে সধবা অবস্থায় মরিতে পারিলে জন্মের উদ্দেশ্য সফল হইল। 'বিনয়, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাকে রাখিয়া মরিবে না।' কুমুদিনী কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শোকের উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিনয়চন্দ্র আপাততঃ তাহাই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। আবার বলিলেন, 'মালতীর কি হইয়াছে?'

কুমুদিনী যত দূর সম্ভব, তাহার মুখ বিনয়ের কর্ণের নিকট লইয়া গিয়া, বলিল, 'মালতী প্রফুল্লকে ভালবাসে।'

বিনয়চন্দ্র মহাদুর্ভাবনা হইতে মুক্তি পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 'এ ত কোনও আশ্চর্য্য কথা নয়। আমিও ত প্রফুল্লকে ভালবাসি।'

কুমুদিনী পুনশ্চ অবাক হইল। 'ওহে মূর্খ! সে ভালবাসা নয়। আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেই ভালবাসা।'

কুমুদিনী যে তাঁহাকে কিছু বেশী রকমের, কিংবা অন্য রকমের ভালবাসা দিয়াছিল, তাহা বিনয়চন্দ্র এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানিতেন না। আজ পত্নীর অনবধানতাবশতঃ তাহা জানিতে পারিলেন। মুক্ত হৃদয়ের সলজ্জ কথা তাঁহার বড় ভাল লাগিল। প্রতিদানস্বরূপ বিনয়চন্দ্র কুমুদিনীর গলদেশ বেষ্টন চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সে তাহা বুঝিয়া দূরে পলাইল। বিনয়চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি বড় দুষ্ট।'

মালতী দূর হইতে বলিল, 'এখন মালতীর উপায় কি?'

বিনয়। তাহার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর দিলাম। আমি প্রফুল্লকে বলিতে পারিব না। তুমি যাহা হয়—করিও।

৪

পরদিন প্রফুল্ল দত্ত বিনয়ের বাটীতে আসিয়া কুমুদিনীকে ডাকিলেন। প্রফুল্লের সহিত কুমুদিনীর একটা সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ, প্রফুল্লের কোনও দূর-সম্পর্কীয়া পিসী কুমুদিনীর মাসী হইতেন। অতএব বাল্যকাল হইতে উভয়ের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় একটি স্নেহ আজীবন থাকিয়া গিয়াছিল, এবং শেষে তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

আজ কেন তলব হইয়াছে, তাহা প্রফুল্ল জানেন না। কুমুদিনী প্রথমতঃ লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিল। পরে বলিতে চাহিল, কিন্তু কি বলিয়া আরম্ভ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

প্রফুল্ল দত্ত বুঝিলেন, কোনও একটা বিশেষ নূতন রকমের কথা আছে। একটি সিগারেট টানিতে লাগিলেন। তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেলেও কুমুদিনী কোনও কথা কহিলেন না!

প্রফুল্ল। বিনয়ের সহিত ঝগড়া হয়েছে?

কুমুদিনী। না।

প্রফুল্ল। ময়নার কথা?

কুমুদিনী মস্তক নাড়িয়া বলিলেন, 'না। তোমরা কি বোকা! একটা কথা বুঝিতে পার না।'

প্রফুল্ল। আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে?

কুমুদিনী। তোমার মাথা। আমি আজ তোমারই কথা বলিব। মিস্ ডেভিসের কথা।

প্রফুল্ল রুমাল লইয়া মুখ মুছিলেন। বোধ হয়, ঘর্ম্মের প্রাচুর্য্য হইতেছিল। নেক্‌টাই সোজা করিয়া দিলেন। এবং আর একটি সিগারেট লইলেন।

কুমুদিনীর জেরা আরম্ভ হইল।

'মিস্ ডেভিসের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি?'

প্রফুল্ল। বন্ধুমাত্র।

কুমুদিনী। সে তোমাকে ভালবাসে।

প্রফুল্ল পুনরায় রুমাল দ্বারা মুখ মুছিয়া বলিলেন, 'আমি তাহার জন্য দায়ী নহি।'

কুমুদিনী। তবে তুমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কও কেন? বাটীতে আসিতে দাও কেন? একত্র খাও কেন?

প্রফুল্ল। সে নিরিকে শেলাই শেখায়।

নিরি প্রফুল্লর ছোট ভগ্নী।

কুমুদিনী হাসিল। 'যাহার পিতা কলিকাতার এক জন প্রধান ধনী, তাহার কন্যা কি বেতন লইয়া শেলাই শিক্ষা দেয়! ইহা কত দিন হইতে?

প্রফুল্ল। মিস ডেভিসের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা। কে বলিল? কে দেখিয়াছে।

কুমুদিনী। মালতী দেখিয়াছে।

প্রফুল্ল চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'মালতী—মালতী—!'

কুমুদিনী। হাঁ, মালতী। তাহার জানালা দিয়া সব দেখা যায়।

প্রফুল্লর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। কুমদিনী অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখ্‌লেই বা, ভয় কি?'

প্রফুল্ল কিছু গলা পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কুমুদিনী! তোমার নিকট কোনও কথা লুকাই নাই; তবে একটি কথা বলি নাই। আমি মালতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসি।'

কথাটি বলিয়াই প্রফুল্ল অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

কুমুদিনী। ভয়ানক অন্যায় করিয়াছ। মালতী হিন্দু বিধবা। অনাথা, দুঃখিনী ও উপায়হীনা। তোমার সম্মুখে তাহাকে বাহির হইতে দিয়া বড় ভুল করিয়াছিলাম।

প্রফুল্লর চ'খে জল আসিল। প্রফুল্ল দত্ত কুমুদিনীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন। 'আমার অপরাধ হইয়াছে।'

কুমুদিনী তড়িদ্বেগে সরিয়া গেল। 'ছি! তোমার কি একটু বুদ্ধি নাই?'

আজ কুমুদিনীর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রফুল্ল তাহার পদতলে! কুমুদিনী প্রেমের মহিমা দেখিয়া বিস্মিতা হইল। কুমুদিনী বলিল, 'প্রফুল্ল! তোমার মিস্ ডেভিস্‌কে সমস্ত মুক্তকণ্ঠে বলা উচিত।'

প্রফুল্ল দত্ত ধীরে ধীরে উঠিলেন।

'হাঁ। তাহা নিশ্চয়। আর একটা কথা।

কুমুদিনী। কি?

প্রফুল্ল। মালতী কি ইহা জানে?

কুমুদিনী। কি জানে?

প্রফুল্ল। যাহা বলিয়াছি।

কুমুদিনী। তুমি ত অনেক কথা বলিলে।

প্রফুল্ল। না, সেই কথা।

কুমুদিনী চতুরদৃষ্টিতে চাহিয়া কেবলমাত্র বলিল, 'বোধ হয় জানে। স্ত্রীলোক পুরুষের পূর্ব্বে জানিয়া থাকে।'

যতক্ষণ কুমুদিনী মালতী ও প্রফুল্লর মিলন সম্বন্ধে অপূর্ব্ব কল্পনা লইয়া ব্যস্ত ছিল, তাহার পূর্ব্বেই বিনয়চন্দ্রের বন্ধু সম্বন্ধে 'গোপনীয় কথা' কলিকাতা সহরে রাষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অমরেন্দ্র বাবু শুনিলেন যে, প্রফুল্ল খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে; এবং বীরেন্দ্র বাবু দেখিয়াছিলেন যে, তিনি মিস্ ডেভিসের সহিত ধর্ম্মতলার গির্জ্জা হইতে বাহির হইতেছিলেন! অটল বলিল, 'ঠিক তাই, কারণ আমি পেলিটীর দোকানে গিয়া শুনিলাম যে, তিন শত টাকার পিষ্টক ও মদের জন্য অর্ডার হইয়া গিয়াছে।'

অটলের মাসী সেকালের বিধবা, এবং তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাঁহার বন্ধু দিগম্বরীকে (মালতীর পিসী) এ কথা না বলা নিতান্ত গর্হিত। অতএব প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিবার পরে সেই দিকে উপস্থিত হইলেন, এবং পবিত্রমনে ও শুদ্ধ-শরীরে সম্পূর্ণ সত্যভাব দিগম্বরীকে বর্ণনা করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

'কি ভয়ানক! মনোহর দত্তের ছেলে আজ একটা ট্যাঁস ফিরিঙ্গীর মেয়ের জন্য খ্রীষ্টান হইল! কেন? কলকেতা সহরে কি সুন্দরী নাই? কেন, ব্রাহ্মও ত আছে, এবং প্রায়শ্চিত্ত করিলে কি হিন্দুর ঘরে জুটিত না?'

দিগম্বরী। 'মুর্গী যাহারা খায় দিদি, তাহাদের জ্ঞানগোচর থাকে না। বিশেষতঃ, যাহারা ডিম খায়, তাহাদের কথা শুনা মহাপাপ! দাঁড়া, মালতীকে এ কথা বলি।'

এ সব কথা মালতী দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। জগৎ অন্ধকার দেখিয়াছিল, এবং মহানগরী কলিকাতার শ্মশানই তাহার জীবনের শেষ রঙ্গস্থল, তাহা স্থির বুঝিয়াছিল।

প্রথমে তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, মালতী তাহা সাম্‌লাইয়া অবিনাশের ঘরে গেল। বেলা তখন নয়টা।

অবিনাশ লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্ত'র চুয়াল্লিশ পাতা শেষ করিয়া কেশরঞ্জন তৈলের সন্ধানে ছিল। এমন সময় মালতী আসিল।

'অবি, তোর সেই ইঁদুর মারার আর্সেনিক কতখানি আছে?'

অবিনাশ আপ্যায়িত করিতে অদ্বিতীয়। 'দিদি, প্রায় এক সের আছে।'

মালতী। আমাকে এক ছটাক দে' ত?

অবিনাশ। কেন, ইঁদুর বেড়েছে?

মালতী। হাঁ, ও পাশের বাড়ীতে প্লেগ হয়েছে।

অবিনাশ। কি—প্রফুল্ল দাদার বাড়ী?

মালতী অনেক কষ্টে শুষ্ককণ্ঠনিঃসৃত একটা 'হাঁ, চাকরের হয়েছে বোধ হয়' বলিয়া মুখ ফিরাইল।

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পাশের ঘরে গেল, এবং একটা কাগজে করিয়া খানিকটা চূর্ণ দিল। 'এক ছটাক হবে না; তবে ইহাতেই দশটা ইঁদুর নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু দিদি, সাবধান, খাবারের সঙ্গে যেন না মিশিয়া যায়।'

মালতী তাহা লইয়া ঘরে গেল। পিসীমার প্রদত্ত দুইটি সন্দেশের সহিত তাহা মিশাইল, এবং অতি সাবধানে বাটার মধ্যে রাখিয়া দিল।

'নিশাই আত্মহত্যার সময়'। যে নিশা জগতের আনন্দ, রূপের উৎস ও প্রফুল্ল আলোক,—সকলই গ্রাস করে, সেই রাক্ষসী নিশাই আজ অভাগিনীকে

গ্রহণ করিবে। যাহারা দুঃখী, হতাশ-হৃদয়, এবং জগতের পরিত্যক্ত, তাহাদিগের রাত্রি ভিন্ন শান্তির স্থান নাই।

স্থিরচিত্তে সংসার হইতে সকল বন্ধন টানিয়া মালতী একমাত্র কেন্দ্রে তাহা ন্যস্ত করিল। মালতী প্রফুল্লকে একখানা পত্র লিখিল। সেখানা বাতায়ন দিয়া প্রফুল্লর ঘরের টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রফুল্ল ৯টা রাত্রিতে ফিরিবে। 'সস্ত্রীক ফিরিবে।' তখন মালতী থাকিবে না। যেখানে ইন্দ্রিয় ও মন বিচরণ করে, সেখানে থাকিবে না। তবে যদি তাহা হইতেও অন্য কোনও জগৎ থাকে, তবে 'হে ঈশ্বর, সেখানে যেন প্রফুল্লর সহিত একবার দেখা হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব'—

'কি জিজ্ঞাসা করিব? ইহাই জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি' অন্যকে ভালবাসিয়াছিলে, সেই ভালবাসা আমিও তোমাকে বাসিয়াছিলাম। তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে?'

মালতীর জগতে আর কেহ ভালবাসিবার ছিল না। ময়নাটি পিঞ্জরে বসিয়াছিল। তাহাকে লইয়া আসিল। গৃহের অর্গল বন্ধ করিল, এবং ময়নাটি লইয়া অনেক আদর করিল; কোমল করতলে তাহার মসৃণ পক্ষপুট বুলাইয়া দিল, এবং তাহার পর বোধ হয় নিদ্রিতা হইয়া পড়িল।

৬

রাত্রি নয়টার সময় প্রফুল্ল দত্ত বাড়ীতে ফিরিলেন। হঠাৎ একখানি পত্র টেবিলে দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, এবং পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া একলম্ফে বিনয়দের ছাতে উঠিলেন, এবং কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে পুনরায় পত্র পাঠ করিলেন।

'কুমু! তুমি ভয় পাইও না। সাহস করিয়া চল, দুই জনে মালতীর ঘরে যাই।'

কক্ষ অর্গলবদ্ধ, কিন্তু অর্গলটা পূর্ব্বাবধি দুর্ব্বল। এক পদাঘাতেই ভাঙ্গিয়া গেল।

মালতী স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় উভয়ের দিকে চাহিল, এবং মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গৃহ প্রায় অন্ধকার। বাতায়নপথে ক্ষীণ চন্দ্রালোক আসিতেছিল।

প্রফুল্ল বলিলেন 'মালতী, তোমার কি মহাভ্রম! আমার বিবাহ সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথা তোমার বিশ্বাস হইয়াছে?'

মালতী একবারমাত্র কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'মিথ্যা?'

প্রফুল্ল। তুমি আমার। আজি হইতে সম্পূর্ণ আমার। তুমি বিষ খাও নাই, বল।

মালতী। না। আমি খাই নাই, কিন্তু আমাদের ময়না খাইয়াছে। কি করিয়া খাইল, তাহা জানি না। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা সন্দেশও নাই।

প্রফুল্ল ময়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিহঙ্গমবর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল।

প্রফুল্ল ময়না লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং যত দূর বুঝিয়াছিলেন, কুমুদিনীকে বুঝাইলেন।

এমন সময় অবিনাশচন্দ্র সহাস্যে উপস্থিত।

'বোধ হয় আত্মহত্যা শেষ হইয়া গিয়াছে?'

কুমুদিনী। ছোট ঠাকুর, আমার ময়নাটি—মারা গিয়াছে। (ক্রন্দন)

অবিনাশ। কখনও যাইবে না। ও কেবল আমার স্বদেশী দন্তমঞ্জন খাইয়াছে।

প্রফুল্ল ও কুমুদিনী অবাক হইয়া অবিনাশের দিকে চাহিলেন!

অবিনাশ কথাটা বুঝাইয়া দিল। 'যখন দিদি আর্সেনিক চাহেন, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়িল, স্ত্রীলোকের হস্তে বিষ দেওয়া নিষিদ্ধ। তাই চালাকী করিয়া দন্তমঞ্জন দিয়াছিলাম। ওটাতে একটু কার্ব্বলিক অ্যাসিড আছে, কিন্তু তাহাতে ময়না মারিবে না।'

অবিনাশ টব হইতে জল লইয়া ময়নার মুখে দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিহঙ্গমবর স্বাভাবিক ধ্বনিপূর্ব্বক নৈমিষারণ্যের ঋষিগণের ন্যায় পুনর্জীবন লাভ করিল। অবিনাশ বলিল, 'আসল কথা কি জান বৌদিদি?'

কুমুদিনী। না।

অবিনাশ। একটা সন্দেশের আধখানা ময়নার গলায় বাধিয়াছিল। এখন গিলিয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন।—বৈশাখ। নব পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' দশম বৎসরে পদার্পণ করিল। যিনি 'বঙ্গদর্শন'কে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষার সেবা যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, মাধুর্য্য যাঁহার চরিত্রের ও রচনার মূল উপাদান ছিল, আজ সেই শ্রীশচন্দ্রকে মনে পড়িতেছে।—ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন; আর তিনি স্বর্গ হইতে 'বঙ্গদর্শন'কে আশীর্ব্বাদ করুন।—গত বর্ষে 'বঙ্গদর্শনে' যে অবসাদ দেখিয়াছিলাম, নব বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' তাহার পরিবর্ত্তে অভিনব উদ্যমের পরিচয় দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।—সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের 'জাতিতত্ত্ব-আলোচনা'র প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবু জটিল 'জাতি-তত্ত্বে'র আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার সত্যানুরাগ, তাঁহার মৌলিক গবেষণার শক্তি বাঙ্গালীর আদর্শ হইতে পারে। এই নিবন্ধে তিনি বহু নূতন তথ্য ও নূতন তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ রমাপ্রসাদ বাবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, বহু অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার অধিকার অনধিকারীর নাই। আমরা ছাত্রের ন্যায় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, এবং উপকৃত হইয়াছি। তিনি 'প্রত্নতত্ত্ব, লোকাচরতত্ত্ব, আকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সমাজের ইতিহাসের যে সূত্র পাওয়া যায়, সেই সূত্র অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণের' সারোদ্ধার করিয়া জাতি-বিজ্ঞানের সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছেন। এ ব্রত যেমন পবিত্র, তেমনই দুরূহ। আশা করি, মার প্রসাদে রমাপ্রসাদ বাবু এই কঠোর সাধনায় সফল হইবেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের 'সূর্য্যপূজা' উল্লেখযোগ্য। লেখক এই প্রবন্ধে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার 'তীর্থযাত্রী' নাম দিয়া কাউণ্ট টলষ্টয়ের 'Two Pilgrims' নামক গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। বহু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যে' 'Two Pilgrims' অবলম্বন করিয়া একটি গল্প লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রেম যদি' নামক কবিতা তাঁহার 'ভুলে'র সুরে ঝঙ্কৃত। আমরা একটু নমুনা দিতেছি,—

'প্রেম যদি হইত বনানী, হৃদি যদি হ'ত দাবানল!—
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে, রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল!'

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিশীথে' নামক কবিতায় যে বিনিদ্র রজনীর বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!—তখন বিশ্ব নিদ্রামগ্ন; অকস্মাৎ কে কবির বীণায় ঝঙ্কার দিল, এবং 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে!' নয়নে ঘুম=অর্থাৎ নয়নের ঘুম? 'ঘুম পরে থাকিলে নয়নের 'র' লুপ্ত হয়।—ইতি ইস্পাতরামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ।—তার পর কবি 'শয়ন ছেড়ে' উঠিয়া বসিলেন। 'আঁখি মেলে চেয়ে থাকি' তার দেখা পাইলেন না!—কবি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। এ রোগে আঁখি মেলিয়া সারা রাত্রি চাহিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ঘুমের দেখা পাওয়া যায় না! ইহা Insomnia অর্থাৎ অনিদ্রারোগের কথা! আমরা পড়িয়াছি, আর কাঁদিয়াছি। সাধারণ মানবের অনিদ্রারোগে অবসাদ ও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কোনও লাভ নাই। কিন্তু কবির 'ইনসম্নিয়া' বন্ধ্যা হইতে পারে না। তাই তাঁর 'গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে',—অথচ 'কোন বিপুল বাণী ব্যাকুল সুরে বাজিতে' লাগিল, তাহা কবি বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্যাপারটি গুরুতর 'কবিতা' হইয়া উঠিল! অনিদ্রার যন্ত্রণার উপর অনির্ব্বচনীয় বেদনা। অগত্যা কবি বলিলেন,—'কোন বেদনায় বুঝি না রে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে!' আমরা অনিদ্রার বেদনা বুঝি, কিন্তু 'হৃদয়ভরা অশ্রুভারে'র অন্বয় বা অর্থ, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'অশ্রুভারে' হৃদয় ভরে না। 'হৃদয়ভরা অশ্রুভার' কি, তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। অথচ অশ্রু, হৃদয় ও ভরা, এই তিনের সংযোগে দিব্য করুণ রস উথলিয়া উঠিল। যথা,—'অলাবু-বেণু-তন্ত্রাণাং সংযোগে মধুরধ্বনিঃ।' তখন কবি বেহাগ একতালায় গাহিয়া উঠিলেন,—'পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আমার কণ্ঠহার!'

ভাবটা একটু পুরাতন বটে, কিন্তু 'সেবকারে পুরাতনে।' ভাব কবিদের সেবকও বটে, অন্নও বটে। অতএব রবীন্দ্রের 'নিশীথে' বেহাগ একতালায় গীত হইতে থাকুক। শ্রীযুত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ' উল্লেখযোগ্য। এবার বঙ্গদর্শনে 'তত্ত্বে'র বড় ঘটা,—'জাতিতত্ত্ব', 'সূর্য্যপূজা' ও 'ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ'—এক সংখ্যায় ত্রয়ী। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সামাজিক প্রসঙ্গে' শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'খুড়ি, খুড়ি, মা কালী' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'বিলাতের কথা'য় বিশেষ নূতনত্ব নাই। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শোক-সঙ্গীত' তাঁহার যোগ্য হয় নাই।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। 'মানিনী রাধা' মোলারাম কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। মানিনী রাধা তাকিয়া ও গালবালিশ লইয়া মাচে বসিয়াছেন। দূরে 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্র-পদ্ধতি'র ধনিকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। রাধার গালে হাত। কৃষ্ণ স্বীয় চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার আর এক হস্ত প্রসারিত। ইহা কি মান-ভিক্ষা ব্যক্ত করিতেছে? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-বিন্যাসের উদ্দেশ্য একালে কদলী-প্রদর্শন; মোলারামের মনে কি ছিল, বলিতে পারি না। রাধার মাথার উপর চন্দ্রাতপ, না পরচালা, তাহাও ঠিক বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এ চালের উপর 'চালচিত্তির' আছে! ইহাও চিত্র? 'সৌর জগতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' উপাদেয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। 'বটেশ্বর ও বনখণ্ডেশ্বর' মন্দ নহে। 'সংকলন ও সমালোচন' বিপুল। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রাজকাহিনী' সুখপাঠ্য। 'প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা' পাঠযোগ্য।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ। 'পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড', 'নূতন রাজা' ও 'রাণী মেরী' সময়োপযোগী হইয়াছে। সম্রাটের চিত্রখানি সুন্দর। 'ডিটেক্‌টিভ কুকুর' শিশুদিগের চিত্তরঞ্জন করিবে। আমরাও পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'কুস্তি খেলা' নামক কবিতাটি ব্যর্থ রচনা। কুস্তি ও কবিতায় প্রভেদ বিস্তর, শিশুরাও সম্ভবতঃ তাহা ধরিতে পারিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, কবি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ভারত-মহিলা।—চৈত্র। প্রথমেই কুমারী মেরী করেলীর একখানি চিত্র আছে। কুমারী করেলী,—'ভারত-মহিলা'র মতে,—'ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা।' ইহা কি সত্য? ওয়ার্ড, ইলিয়ট প্রভৃতি কি ভাসিয়া গেলেন? শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী বাঙ্গলা উপন্যাস' উল্লেখযোগ্য। লেখকের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত নহি। কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধে আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের যে নক্সা দিয়াছেন, তাহা আমরা উপভোগ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, লেখক স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীযুত চন্দ্রশেখর করও বোধ করি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী 'প্রাচীন ভারতে নারীজাতির উপানদ্-ব্যবহার' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—প্রাচীন ভারতের নারীরা উপানৎ ব্যবহার করিতেন। 'কন্‌কনে শীতের ভিতরে বাস করিয়া ইউরোপীয় সুন্দরীগণ যে কারণে বক্ষঃস্থলের অধিকাংশ অনাবৃত রাখেন, সেই কারণেই ভারতীয় মহিলাগণ উপানদ্ ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন!' আপনারা উপানৎ ব্যবহার করুন; কিন্তু এরূপ উদ্ভট সিদ্ধান্ত করিবেন না। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। ভারতের অনেক দেশে মহিলারা এখনও উপানৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আল্‌তা, মল ও গুজরীপঞ্চম বঙ্গসুন্দরীর উপানৎ হরণ করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু রাজপুতানায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্চনদে ও যুক্ত-প্রদেশে নারীর চরণকমলে এখনও পাদুকা বিরাজ করিতেছে। ভারতের সর্ব্বত্র মুসলমান-মহিলারা উপানৎ ব্যবহার করেন। ইঁহারা কি সৌন্দর্য্য-বোধে—ও রসে বঞ্চিত? পরে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সমালোচনা করিব।

জগৎ-কথা।

এখন অনিলে আসা যাক। অনিলের সর্ব্বজন-পরিচিত উদাহরণ বায়ু—যে বায়ুর সাগরে আমরা ডুবিয়া আছি। তরলে যে নমনীয়তা দেখিয়াছি, তাহা অনিলেও বর্ত্তমান; নমনীয়তার সীমা নাই বলিলেও চলে। বায়ুর কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। বায়ুতেও ছুরীর দাগ লাগে না, বায়ুতেও অক্লেশে ডুবা যায়, বায়ুতেও পুতুল গড়া চলে না। জলে যে তারল্য আছে, বায়ুতেও সেই তারল্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বায়ু যে পাত্রে রাখ, বায়ু সেই পাত্রের মধ্যে সেই আকারই গ্রহণ করিবে। কাজেই বায়ুরও আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার একবারে অভাব। পরন্তু জলকে মুখখোলা পাত্রে রাখা চলে; বায়ুকে সেরূপেও রাখা চলে না। খোলা মুখ দিয়া বায়ু বাহির হইয়া আসে। জল তেমন বাহির হয় না। বোতলের অর্দ্ধেকটা জলে পূরিয়া বাকি অর্দ্ধেক জলহীন রাখিতে পারি; কিন্তু বোতলের অর্দ্ধেকে বায়ু পূরিয়া বাকি অর্দ্ধেক বায়ুহীন রাখা চলে না। বায়ু আপনাকে প্রসারিত করিয়া সমস্ত বোতলটাই অধিকার করিবে। এমন কি, উহাকে ছিপি দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে; নতুবা মুখ খোলা থাকিলে বাহির হইয়া আসিবে। সোডাওয়াটারের বোতলে ছিপি আঁটিয়া বায়বীয় পদার্থ আটকান থাকে; জলও আটকান থাকে। ছিপি খুলিবামাত্র সেই বায়বীয় পদার্থ বেগে বাহির হয়। কিন্তু জল বাহির হয় না।

দেখা গেল, তরলে আর অনিলে মিল আছে; আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার অভাবে। আবার ভেদও আছে, কেন না, অনিল স্বতঃ প্রসারণশীল; তরল তাহা নহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা তরলের আছে, প্রচুর মাত্রায় আছে, অনিলের আছে কি না? ফাঁপা রবারের গদীতে বায়ু পূরিয়া তাহাকে চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা চলে; অল্প চাপেই অনেকটা সঙ্কোচ ঘটে; আবার চাপ তুলিয়া লইলে পূর্ব্ব-আয়তন ফিরিয়া পায়। গাড়ীর চাকার বেড়ে বায়ুর গদী আঁটিবার তাৎপর্য্য ইহাই। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে বৈ কি। তবে জলের মত অধিক নাই। কেন না, জলের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কোচনে প্রচুর আয়াস লাগে; বায়ুর অল্প আয়াসেই প্রচুর

সঙ্কোচ ঘটে। অতএব আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনিলের আছে বৈ কি; তবে কঠিনের তুলনায় বা তরলের তুলনায় অনেক কম।

দেখা গেল, তরলে অনিলে কতকটা ভেদ, অনেকটা মিল। আরও একটা মিল আছে। বায়ুরও চাপ আছে। যে জিনিস বায়ুতে নিমগ্ন থাকে, তাহার আশে পাশে, উপরে নীচে বায়ুর চাপ পড়ে। একটা বাক্সে বা বোতলে বায়ু পূরিলে সেই বাক্সের বা বোতলের গায়ে চাপ পড়ে; যেখানেই ফুটা কর না, বায়ু বাহির হইয়া আসিবে। বায়ুর চাপও জলের চাপের মত সর্ব্বতোমুখ। কাজেই জলে কোনও জিনিস মগ্ন করিলে তাহা যেমন লঘু বা হাল্‌কা ঠেকে, বায়ুতে নিমগ্ন দ্রব্যও তেমনি কতকটা হালকা ঠেকা উচিত। বাস্তবিকও তাই; বায়ুশূন্য প্রদেশে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, জিনিসের ওজন একটু বেশী হয়। যে বায়ুটুকু অপসৃত হয়, বা স্থানচ্যুত হয়, তাহার ওজন যতটুকু, বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন ঠিক্ ততটুকুই কমিয়া যায়। হঠাৎ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কেন না, বায়ু নিজেই হালকা। তবে তদ্রূপ হালকা জিনিস বায়ুমধ্যে উপস্থিত হইলে তখন বায়ুর চাপের ফল ধরা পড়ে। বায়ুমগ্ন দ্রব্যের ওজন স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়ে কম হইলে বায়ুর ঠেলে সে ঊর্দ্ধগামী হয়। যেমন বেলুন বা ব্যোমযান। উহাতে একটা বৃহৎ ব্যাগের ভিতর এক রকম অতি হালকা অনিল পোরা থাকে; উহার ওজন এত কম যে, ব্যাগের ওজন সমেত উহার ওজন, স্থানচ্যুত বায়ুর ওজনের চেয়েও কম হয়। কাজেই উহা বায়ু ঠেলিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে।

জলের চাপ জলের গভীরতাসাপেক্ষ। সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে ৪।৫ মাইল গভীর। সমুদ্রের তলের উপর সেই ৪।৫ মাইল জলের চাপ পড়ে। ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুর সাগর আছে; কত দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত আছে, বলা কঠিন। অন্ততঃ ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত ত আছেই। বায়ু খুব লঘু হইলেও, এতটা গভীর বায়ুসাগরে যখন আমরা ডুবিয়া আছি, তখন সেই ভার টের পাই না কেন? টের পাই না বলিয়া চাপ যে নাই, এমন হইতে পারে না। আশে-পাশে, উপরে নীচে, ভিতরে বাহিরে চাপ পড়ায় চাপের অধিকাংশ কাটাকাটিতেই যায়। তবে এক পাশ হইতে বা এক দিক হইতে বায়ু সরাইতে পারিলে, তখন অন্য দিকের বায়ুর চাপ বেশ বোঝা যায়। একটা গেলাসের বা বাটীর মুখ নিজের মুখের উপর লাগাইয়া উহার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলেই চাপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাহিরের

বায়ুর চাপে গেলাসটা বা বাটীটা গালে আঁকড়াইয়া ধরিবে। তখন ছাড়াইতে জোর লাগিবে। চামড়ার বা রবারের ফাঁপা গোলার ভিতরে বায়ু এরূপে বাহির করিয়া লইলে বাহিরের বায়ুর চাপে ঐ গোলা চুপষিয়া যায়। একটা পিচকারির মুখ জলে ডুবাইয়া উহার কাঠিটা যখন টানিয়া তোলা যায়, তখন ভিতরে জল উঠে। পিচকারি এইরূপ জল টানিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। জল ঐরূপে আপনার সীমা ছাড়াইয়া উপরে উঠে কেন? বাহিরের জলের পিঠের উপর বায়ুসাগরের চাপ পড়িতেছে। পিচকারির ভিতরে বায়ু থাকিলে, সেই বায়ুরও চাপ থাকিবে; জল উঠিবে না। ভিতরে যদি বায়ু না থাকে, কাঠিটা—পিচকারির অর্গলটা টানিলে ভিতরটা একবারে খালি পড়িয়া যায়—সেখানে বায়ু থাকে না;—তখন বাহিরের বায়ুর চাপে জল পিচকারির ভিতর উঠিতে থাকে। ফোয়ারাতে যে কারণে জল উঠে, কতকটা সেইরূপ। সেখানে জলের চাপে জল উঠে; এখানে বায়ুর চাপে জল উঠে। জল কত দূর উঠে, সাধারণ বাঁশের বা টিনের পিচকারি,—যাহা লইয়া ছেলেরা হোলির উৎসবে খেলা করে—তাহা এক হাত দেড় হাত লম্বা হয়; উহার সমস্তটাই জল তুলিয়া জলপূর্ণ করিতে পারা যায়। যদি পিচকারি বিশ হাত কি ত্রিশ হাত লম্বা করা যায়, তাহা হইলেও কি সমস্তটা জলপূর্ণ হইবে? এইরূপ বৃহৎ পিচকারি তৈয়ার করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। কূপের ভিতর হইতে, খনির ভিতর হইতে জল তুলিবার জন্য ঐরূপ বৃহৎ পিচকারির—খেলার জন্য নয়,—কাজের জন্য—ব্যবহার আছে। এইরূপ বড় পিচকারির নাম বোমাযন্ত্র—ইংরেজিতে পম্প। দেখা গিয়াছে, ঐরূপ বৃহৎ পিচকারিতে ২২ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত জল তুলিতে পারা যায়, তাহার উর্দ্ধে কিছুতেই উঠে না। পিচকারিতে জল উঠে, বাহিরের বায়ুর চাপে; সেই চাপে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক ততটুকু উঠিবে, তাহার অধিক উঠিবে না। পিচকারির ভিতরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর যতটুকু চাপ, পিচকারীর ভিতরে প্রত্যেক বর্গইঞ্চির উপর ঠিক্ ততটুকু ওজনের জল ঠেলিয়া তুলে। ২২ হাত পর্য্যন্ত জল উঠিলে ঐ জলের চাপ ঠিক্ বায়ুর চাপের সমান হয়। তাই জল ২২ হাত পর্য্যন্ত উঠে, আর উঠে না। ২২ হাত উঁচু জলের ওজন কত? এক বর্গ ইঞ্চি জমীর উপর বাইশ হাত উঁচু জলের একটা থাম তুলিতে পারিলে উহার ওজন প্রায় ৭৪ সের হয়। অতএব প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি জমীর উপর পোনের সের ওজনের বায়ু চাপ দিতেছে।

মিথ্যা নহে। প্রতি বর্গ ইঞ্চি জমীর উপর, এমন কি, আমাদের দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর বায়ুর চাপ পোনের সের। পিচকারি দিয়া জলের বদলে পারা টানিয়া দেখা যায়, জল উঠে বাইশ হাত, কিন্তু পারা উঠে ত্রিশ ইঞ্চি মাত্র; অর্থাৎ দেড় হাতের কিছু বেশী। পারা জলের চেয়ে সাড়ে তের গুণ ভারী; কাজেই যে চাপে বাইশ হাত জলকে ঠেলিয়া তুলে, তাহাতে পারাকে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক ঠেলিয়া তুলিতে পারে না।

উঁচু পাহাড়ের উপর চড়িয়া দেখা গিয়াছে, সেখানে পারা ত্রিশ ইঞ্চিও উঠে না। তাহার তাৎপর্য্য এই, সেখানে বায়ুর চাপ কিছু কম। তা হবেই ত! চাপ গভীরতাসাপেক্ষ। ভূপৃষ্ঠে বায়ুসাগরের যে গভীরতা, উঁচু পর্ব্বতে গভীরতা তার চেয়ে কম।

একটা কাচের একমুখ খোলা নল,—ধর চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা নল—পারায় পুরিয়া তার মুখ পারার পাত্রে ডুবাইয়া নলটাকে খাড়া করিয়া ধরিলে নলের খানিকটা পারা বাহিরে আসে, সবটা ভিতরে থাকে না। যেটুকু নলের ভিতর থাকে, তাহার খাড়াই হয় ত্রিশ ইঞ্চি, তার উপরের দশ ইঞ্চি ফাঁক থাকে; উহা প্রায় শূন্য; সেখানে বায়ুও নাই; পারাও নাই, অন্ততঃ তরল পারা নাই। ঐ নলকে পাহাড়ের উপর বা ব্যোমযানে লইয়া গেলে দেখিবে যে, পারা ত্রিশ ইঞ্চিও দাঁড়াইল না; আর একটু নামিয়া আসিল। ঐরূপ নলে পারা কতটা উচ্চে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া বায়ুর চাপ কোথায় কত, তাহার নির্ণয় হয়। উহাকে বায়ুমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে, ইংরেজি নাম বারোমিটার। ঘরের ভিতরে বায়ু আছে, খোলা উঠানেও বায়ু আছে। উঠানের বায়ুর যে চাপ, ঘরের ভিতরের বায়ুরও সেই চাপ। ছাদের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে করিও না যে, ঘরের মেজের উপর যখন বায়ুসাগর নাই, তখন ততটা চাপ থাকিবে কিরূপে। তরল আর অনিলের ধর্ম্মই এই যে, যেখানে চাপ বেশী, সেখান হইতে, যেখানে চাপ কম, সেখানে সঞ্চরণ করে; ইহাতেই স্রোত বহে, প্রবাহ বহে। অবশ্য যাইবার পথ থাকা চাই। পথ থাকিলে চাপের একটু ন্যূনাধিক্যই যথেষ্ট; তরল আর অনিল উভয়ই প্রবাহিত হইয়া, যেখানে অধিক চাপ, সেখা হইতে, যেখানে অল্প চাপ, সেখানে প্রবাহিত হইয়া, দুই জায়গার চাপ সমান করিয়া লয়। উহাদের নমনীয়তা, উহাদের তারল্যই ইহার কারণ। উঠানের বায়ুর সঙ্গে যখন ঘরের বায়ুর যোগ

আছে, তখন উভয়ত্রই বায়ুর চাপ সমান। উঠানে চাপ অধিক হইলে উঠানের বায়ু ঘরে ঢুকিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। ঘরে অধিক হইলে ঘরের বায়ু উঠানে চলিয়া চাপ সমান করিয়া লইত।

চাপের এইরূপ ইতরবিশেষেই বায়ু বহে। কখনও কোনও কারণে কোনও দেশের বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে অন্য দেশের বায়ু তৎক্ষণাৎ সেই দেশে বেগে চলিয়া আসে। তখন হাওয়া বহে। চাপের মাত্রাভেদ অধিক হইলে হাওয়ার বেগও অধিক হয়,—হাওয়া গিয়া ঝড়ে দাঁড়ায়। বায়ুর চাপ নানা কারণে কমে; কখন কমে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বায়ুমান যন্ত্রে জানা যায়। উহা হাওয়ার বা ঝড়ের লক্ষণ।

দেখা গেল, ঘরের বায়ুরও চাপ আছে; বাহিরেও যত, ভিতরেও তত। ঘরের জানালা দরজা নিফাঁক করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও, যে বায়ু ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিল, তার সেই চাপই বজায় থাকে। পথ রুদ্ধ হইবামাত্র চাপ বাড়ে না, বা কমে না।

একটা বোতল যেন একটা ছোট ঘর। উহার ভিতরেও যে বায়ু আছে, তাহারও চাপ বাহিরের চাপের সমান। এবং বোতল যদি ছিপি দিয়া বন্ধ করি, তাহা হইলেও ভিতরে যে বায়ু আটকান থাকিল, তাহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান থাকে। নতুবা বোতল খুলিলেই হুস্ করিয়া খানিকটা হাওয়া চলাচল করিত। তাহা ত হয় না। বাক্সের ভিতরে, দোয়াতের ভিতরে, সকল রন্ধ্রে বায়ু আছে; যেখানেই থাক, উহার চাপ সেই বাহিরের বায়ুর সমান; প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর পোনের সেরের ওজন।

পিচকারির কাঠি অর্থাৎ অর্গল টানিলে ছিদ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করিবে। যে বায়ু প্রবেশ করিল, তাহার চাপও সেই বাহিরের চাপের সমান। ছিদ্র আঙ্গুল দিয়া বন্ধ কর, তখনও ভিতরে সেই চাপ আছে।

তখনও সেই চাপ আছে বটে, কিন্তু ছিদ্র বন্ধ করিয়া যদি অর্গলটি নাড়া যায়, তখন আর সে চাপ থাকে না। এখন অর্গলটি ঠেলিলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে। সঙ্কোচনে প্রয়াস লাগিবে; কেন না, বায়ুর আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা আছে। যতই ঠেল, ততই সঙ্কোচন ঘটিবে; অর্থাৎ, বদ্ধ বায়ুর আয়তন কমিয়া যাইবে। আয়তন যত কমিবে, উহার চাপও তত বাড়িবে। পিচকারিকে ধরিয়া টানিতে যে জোর দিতে হইতেছে, তাহাতেই কতকটা বুঝিবে যে, ভিতরে বায়ুর সঙ্কোচনের সহিত চাপের মাত্রা বাড়িতেছে।

এখন যদি ছিদ্র হইতে আঙুল সরাইয়া লই, অমনি ভিতরের বদ্ধ বায়ু,—যার চাপ বাহিরের চেয়ে বেশী হইয়াছে, খানিকটা হুস্ করিয়া বাহিরে আসিবে। ক্ষণেকের জন্য একটা হাওয়ার সৃষ্টি হইবে, একটু পরেই ভিতরে বাহিরে চাপ আবার সমান হইবে।

ছিদ্র বদ্ধ করিয়া অর্গল ঠেলিলে বদ্ধ বায়ুর সঙ্কোচ ঘটে, এবং চাপ বাড়ে, আর অর্গল টানিলে আয়তন বাড়িয়া প্রসারণ ঘটে, তখন চাপ কমে। চাপ যখন কমিয়াছে, তখন ছিদ্র খুলিয়া দিলে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাপ সমান করিয়া লইবে।

আয়তন-বৃদ্ধিতে চাপের হ্রাস, আয়তন-হ্রাসে চাপের বৃদ্ধি। কতটা বৃদ্ধিতে কতটা হ্রাস? বিনা পরীক্ষায় বলা চলিবে না। তর্কে চলিবে না। প্রকৃতির বাজার যাচাই করা চাই! মাপিয়া দেখিতে হইবে, কতটা সঙ্কোচে চাপের কতটা হ্রাস ঘটে। রবার্ট বয়েল মাপিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতির খেয়াল অদ্ভুত; হিসাব খুব সহজ। আয়তন অর্দ্ধেক কমিলে চাপ হয় দ্বিগুণ; আয়তন তিন ভাগ হইলে চাপ হয় তিন গুণ। আয়তন যে হারে কমিবে, চাপও ঠিক্ সেই হারে বাড়িবে। রবার্ট বয়েল ইংরেজ; তিনি আড়াই শত বৎসর আগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বায়ুর এই ধর্ম্ম অনিলমাত্রেই বর্ত্তমান। কিন্তু ইহা তরলে নাই। চাপের বৃদ্ধিতে জলের সঙ্কোচ ঘটে, কিন্তু যৎসামান্য। জলের আয়তন কমাইয়া অর্দ্ধেক করিতে, এক বোতল জলকে চাপিয়া আধ বোতল করিতে যে ভীষণ চাপ দিতে হইবে, তাহা মানুষের সাধ্য নহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা অনিলেরও আছে; তবে জলের তুলনায় নিতান্ত কম। জলের সঙ্কোচে যে প্রয়াস আবশ্যক, বায়ুর সঙ্কোচে তাহার তুলনায় যৎসামান্য প্রয়াস লাগে।

১২

জড়পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল, অনিল। তিন অবস্থার কি কি লক্ষণ, দেখান গেল। একবার আওড়ান ভাল।

কঠিনের নির্দ্দিষ্ট আয়তন ও নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকে। চাপিলে আয়তন কমে, আর [illegible] আকৃতি বদলায়। কিন্তু উভয়ই আয়াসসাধ্য। স্বভাবের বিকার ঘটে, তবে বিকারের হেতু অপসৃত হইলে স্বভাবে ফিরিয়া আইসে। ইহা স্থিতিস্থাপকতা। কঠিনের আয়তনগত ও আকৃতিগত উভয়বিধ স্থিতিস্থাপকতা প্রচুর। আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতার দৌড় সকল

জিনিসের সমান নহে। রবারের খুব বেশী; কাঠ পাতরের কম। দৌড় বেশী, কিন্তু মাত্রা কম; কেন না, রবার সহজেই চেপ্টা হয়, টানা যায়। কাঠ পাতরের ধাতুর দৌড় কম; সীমার মধ্যে, আকৃতি বদলাইলে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে। সীমা ছাড়াইলে ফিরে না। কাচ বা পাথর ভাঙ্গিয়া যায়, উহারা ভঙ্গপ্রবণ; ধাতু নোয়াইয়া যায়, মচকাইয়া যায়, এটুকু ইহাদের তরলতা। যত দিন যায়, ততই মচকায় বেশী। হঠাৎ জোরে নোয়াইলে পাত হয়, তার হয়। অধিক জোরে ভাঙ্গিতেও পারে।

তরলের ও অনিলের আয়তন একটা আছে বটে; কিন্তু আকৃতির বাঁধাবাঁধি নাই। আকৃতি বদলাইয়াই আছে। বিনা আয়াসেই বদলায়। কাজেই আকৃতিগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই নাই। এই জন্যই এত সহজে জলে আর বায়ুতে স্রোত বহে, প্রবাহ বহে। আয়তনগত স্থিতিস্থাপকতা দুয়েরই আছে, তরলের অনেক বেশী, কঠিনের সহিত তুলনীয়; অনিলের অনেক কম। বোতলের ভিতর খানিকটা অংশ জলে পূর্ণ করা চলে; কিন্তু খানিকটা অংশ বায়ুতে পোরা চলে না। অনিল প্রসারিত হইয়া সমস্ত বোতলে বিস্তৃত হইবে।

তরল ও অনিল উভয়েই চাপ দেয়; সেই চাপ আবার সর্ব্বতোমুখ। চাপের পরিমাণ গভীরতাসাপেক্ষ; দুই স্থানে চাপের সামান্য ইতরবিশেষ হইলেই প্রবাহ ছুটিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। কোনও দ্রব্য তরলে বা অনিলে ডুবাইলে চারি পাশের চাপে উহাকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করে; উহার ওজন একটু কমাইয়া দেয়। মগ্ন দ্রব্যের নিজের ওজন স্থানচ্যুত তরলের বা অনিলের ওজনের কম হইলে, চারি দিক হইতে ঠেলা পাইয়া সেই মগ্ন দ্রব্য উপরে ভাসিয়া উঠিতে চায়। তরলের চাপ বাড়াইলে সঙ্কোচন ঘটে, অল্প সঙ্কোচনে প্রচুর চাপ লাগে। কিন্তু অনিলের চাপ দ্বিগুণ করিলেই আয়তন অর্দ্ধেক হইয়া যায়; চাপ দশগুণ করিলে আয়তন কমিয়া দশভাগের একভাগ হয়। চাপ যে হারে বাড়ে, আয়তনও সেই হারে কমিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

১৩

ভার বা ওজন শব্দটা পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছি। উহার অর্থ-বিচার আবশ্যক। কঠিন, তরল, অনিল, ত্রিবিধ জড়েরই ভার আছে। অনিলের ওজনও বায়ুশূন্য স্থানে নিক্তিতে ধরা পড়ে। এই ভার ব্যাপারটা কি?

পাঁচসের ওজনের বাটখারা হাতে ধরিয়া রাখিতে ক্লেশ হয়; আমরা বলি, উহা খুব ভারী; ছাড়িয়া দিলেই উহা ভূপতিত হয়; পতন-নিবারণের জন্য ধরিয়া রাখিতে হয়; মাংসপেশী পিষ্ট ও পীড়িত হয়, রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, স্নায়ুযন্ত্র আহত হইয়া ক্লেশের অনুভূতি হয়। ঐ ক্লেশের মাত্রা দেখিয়া আমরা মোটামুটি ভারের পরিমাণ করি। কিন্তু ঐ ক্লেশের অনুভূতির উপর নির্ভর করা চলে না; ক্লেশের মাত্রা-পরিমাণের কোনও উপায় নাই, কাজেই কেবল হাতে ধরিয়া কোন্ জিনিসের ভার কত, আন্দাজ ঠিক হয় না। ভার মাপিবার অন্য উপায় বাহির করিতে হইবে।

ভারী জিনিসমাত্রই ছাড়িয়া দিলে ভূপতিত হয়; ভূপতন-নিবারণের জন্যই পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ। সকল জিনিসই মাটীতে পড়ে। বায়ুর উপস্থিতি তুলার মত, কাগজের মত, ধূলার মত দ্রব্যের ভূপতনে বাধা দেয় বটে, অথবা বায়ুর ঠেলে বেলুনের মত জিনিস নিম্নগামী না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় বটে; কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, এমন জিনিস নাই, যাহা ভূপতিত হয় না।

উঁচু ছাদ হইতে পাতর ফেলিলে দেখা যায়, পাতরখানা ভূমিতে পড়ে; কত সময়ে কতটা পড়ে, মাপিয়া না দেখিলে বিজ্ঞান সন্তুষ্ট হয় না। মাটীতে পড়ে, এই জ্ঞান ত সকলেরই আছে, ইহা সাধারণ জ্ঞান; কত সময়ে কতটা পড়ে, এই বিশিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞান। ঘড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিবলে বাহির হইবে না। এখানে প্রকৃতির খেয়াল কিরূপ, তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে হইবে। দেখা হইয়াছে, প্রথম সেকেণ্ডে পড়ে প্রায় ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকণ্ডে ৪৮ ফুট, তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট; চতুর্থ সেকেণ্ডে ১১২ ফুট। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল! বরাবর সমান বেগে নামে না, প্রথমটা ধীরে নামে, ক্রমশঃ দ্রুত নামে, বেগ ক্রমে বাড়িয়া যায়। কত সময়ে কতটা পথ চলে, তাহা দেখিয়া আমরা বেগের নিরূপণ করি। যে ঘণ্টায় এক মাইল হাঁটে, তাহার বেগ কম, যে ঘণ্টায় দুই মাইল হাঁটে, তাহার বেগ দ্বিগুণ। এখানেও দেখিতেছি, বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। প্রথম সেকেণ্ডে চলে ১৬ ফুট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ৪৮ ফুট, অর্থাৎ, তাহার তিন গুণ; তৃতীয় সেকেণ্ডে ৮০ ফুট, অর্থাৎ পাঁচগুণ, বেগ বাড়িল কি হিসাবে? ১৬+৩২=৪৮; ৪৮+৩২=৮০, ৮০+৩২=১১২। কি অদ্ভুত খেয়াল, বেগের বৃদ্ধি প্রতি সেকেণ্ডেই সমান; সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করিয়া।

প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ; কেন এইরূপ? ইহার কোনও উত্তর নাই। বেগ কেন বাড়ে? উত্তর নাই। কেন সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে, ৪০ ফুট বা ২৫ ফুট হিসাবে বাড়ে না? উত্তর নাই। প্রকৃতির খেয়ালই ঐরূপ। দেখিতেছি, বাড়ে, এবং ঐ হিসাবে বাড়ে। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির যাহা খেয়াল, যাহা বিধির বিধান, তাই মানিতে হইবে। যদি না বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। যদি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে না বাড়িয়া সেকেণ্ডে ৩২০০ ফুট হিসাবে বাড়িত, তাহাই মানিতে হইত। প্রকৃতির খেয়ালের উপর আমাদের কোনও হাত নাই।

১৪

প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, উহার উপর আমাদের কোনও হাত নাই। কেন এমন হইল, এই প্রশ্ন নিরর্থক। এই বিধান উচিত হইয়াছে, বা উচিত হয় নাই, এইরূপ তর্কেরও কোন অবসর নাই। যাহা বিধান, তাহা প্রত্যক্ষ-গোচর; অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা তাহা সাবধানে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ঘড়ি ধরিয়া সাবধানে মাপিয়া অবেক্ষণ দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রে এই বিধান; যতদিন লোক ঘড়ি ধরিয়া মাপিবার চেষ্টা করে নাই, ততদিন লোকে জানিত না যে, এইরূপ অদ্ভুত একটা বিধান আছে। আম জাম নারিকেল সকলই বোঁটা ছাড়িয়া ভূপতিত হয়, সকলেই চিরকাল দেখিতেছে; কিন্তু উহার পতনের বেগ যে ঐ হিসাবে বাড়িয়া যায়, তাহা কেহ জানিত না। এখনও অনেকে জানে না। বায়ুশূন্য স্থানে সকল জিনিসই, গাছের পাতা হইতে হালকা তুলা পর্য্যন্ত, ঠিক ঐরূপে ঐ হিসাবে বেগ বাড়াইতে বাড়াইতে ভূপতিত হয়, তাহাও এককালে কেহ জানিত না।

এখন আমরা জানিতেছি, সকল জিনিসই ঠিক ঐরূপ বর্দ্ধমান বেগে নিম্নগামী হয়, অথবা ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে নামে। যে পথে যে রেখা ধরিয়া নামে, ঐ রেখাকে বাড়াইলে পৃথিবীর কেন্দ্র স্পর্শ করিবে; বর্ত্তুলাকার পৃথিবীর মাঝে যে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্র স্পর্শ করিবে। অতএব বলা যাইতে পারে, আম জাম নারিকেল গাছ হইতে পড়িবার সময় পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে পতিত হয়। উহাদের গতি ভূকেন্দ্রের অভিমুখী। উহারা—উহারা কেন,—যাবতীয় জড়পদার্থ ভূকেন্দ্রের অভিমুখে পতিত হয়, এবং পড়িবার সময় বেগ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়িয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞান। এইরূপ

অবেক্ষণলব্ধ খেয়াল বা বিধানকে বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। যেন প্রকৃতি ঠাকুরাণী একটা নিয়ম বাঁধিয়া আইন গড়িয়া দিয়াছেন, সকল জিনিসকেই ঐরূপে নামিতে হইবে। কাজেই উহারা ঐরূপ বিধানমতে বা নিয়মমতে নামিতে বাধ্য। অবশ্য তিনি ঐরূপ আইন কেন করিলেন, অন্যরূপ করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর নাই; অথবা এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর— তাঁহার খেয়াল।

ইহা বেশ কাব্য। এক জন প্রকৃতি ঠাকুরাণী বা বিশ্ববিধাতা কল্পনা করিয়া, তিনি নিজের খেয়ালমতে আইন গড়িতেছেন ও নিয়ম পাকাইতেছেন, ও আমকে জামকে নারিকেলকে সেই নিয়মে বাধ্য করিতেছেন, ইহা বেশ কবিকল্পনা। এইরূপ কাব্যে অনেকের মানসিক তৃপ্তি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে, কিন্তু ইহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কেন না, ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার কিছুই নাই। আম জাম নারিকেল আপনারাই ষড়যন্ত্র করিয়া ঐরূপ নিয়মে পড়িতেছে, বা অন্য কাহারও প্ররোচনায় অন্যের স্থাপিত নিয়মে বাধ্য হইয়া ঐ হিসাবে ভূকেন্দ্রমুখে পড়িতেছে, তাহা আমরা জানি না। অতএব এই প্রত্যক্ষগোচর অবেক্ষণলব্ধ বা পরীক্ষণলব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে প্রকৃতির খেয়ালই বল, আর বিধির বিধানই বল, তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহারই বিধান হউক, ঘাড় পাতিয়া তাহাই মানিব। যদি অন্যরূপ দেখিতাম, তাহাই মানিতাম।

বিজ্ঞান এইরূপ বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছে; তরল ও অনিলের চাপ সর্ব্বতোমুখ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম; তরল ও অনিল পদার্থমাত্রের পক্ষে ইহা দেখা যায়। অনিলের চাপ যে হারে বাড়ান যায়, অনিলের আয়তন সেই হারে কমে, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম; অনিলমাত্রই এই নিয়মে সঙ্কুচিত হয়। সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়ম, সমস্তই অবেক্ষণলব্ধ সত্য। যদি অবেক্ষণে অন্য নিয়ম দেখা যাইত, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। যদি কোনও একটা অনিল ঐরূপ নিয়মে সঙ্কুচিত না হইয়া অন্যরূপে সঙ্কুচিত হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম হইত।

দেখা যায়, অনিলমাত্রের সঙ্কোচনে এক নিয়ম; কিন্তু তরল পদার্থের বা কঠিন পদার্থের সঙ্কোচনে এক নিয়ম নহে। জলের যে হারে সঙ্কোচ ঘটে, তেলের সে হারে ঘটে না। কয়লার যে হারে ঘটে, গন্ধকের সে হারে

ঘটে না। সমুদয় অনিল এক নিয়ম মানে; কিন্তু তরল বা কঠিন প্রত্যেকের পক্ষে নিয়ম আলাহিদা। কি করা যাইবে! যাহা দেখা যায়, তাহাই মানিতে হইবে।

একশ্রেণীর কবি আছেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া আত্মহারা হন, এবং কেহ বা বিশ্বজগতের, কেহ বা বিশ্ববিধাতার মাহাত্ম্য গান করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ইহাঁদের কাব্য এইরূপ—আহা প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! প্রকৃতিতে সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজ্য! কোথাও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম নাই! নিয়মের রাজ্যে কোথাও অনিয়ম নাই। সকলকেই বাঁধা নিয়মে চলিতে হইতেছে। কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব যত অদ্ভুত না হউক, এই বিস্ময় তদপেক্ষা অদ্ভুত। যে, যে ভাবে চলিতেছে, তাহার পক্ষে তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? কোনও বস্তু যদি কোনও নিয়ম না মানে, তাহার পক্ষে সেই না মানাটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সমস্ত অনিলে একই সঙ্কোচন-নিয়ম মানে, ভাল কথা। যদি কোন অনিল নিয়ম না মানিত, একবারে এলোথেলো উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিত, সেই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইত। এইরূপ যখন ব্যবস্থা, তখন প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র নিয়মের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবার অবসর কোথায়?

কবে স্কুলের ছুটী হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে দিন হবে, সেই দিন হবে। তার পর যখন দেখা গেল, ঠিক্ যে দিন ছুটী হইল, সেই দিনই হইল, অন্য দিন হইল না, তখন ছাত্র ভক্তিগদগদ হইয়া বলিল,—পণ্ডিত মহাশয়ের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এত দিন আগে ভবিষ্যতের কথাটা ঠিক বলিয়া ফেলিলেন! একটু ব্যতিক্রম হইল না!

প্রাকৃতিক-নিয়ম-ঘটিত কাব্যটাও কতকটা সেইরূপ।

১৫

কাব্য ছাড়িয়া আগে বিজ্ঞানের আসরে নামিব। প্রাকৃতিক নিয়ম আমরা অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা আবিষ্কার করি। এমন দিন ছিল, তখন মানুষে জানিত না যে, ভূপতন বিষয়ে এমন একটা সুন্দর সহজ নিয়ম আছে, সকল বস্তুই তাহা মানিয়া চলে। অবেক্ষণ দ্বারা ও পরীক্ষণ দ্বারা আমরা এখন উহা জানিয়াছি। সেইরূপ অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা দিন দিন প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব নূতন নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রত্যেক জিনিসই

যেখানে আপন ধারায় চলে, কাহারও সহিত কাহারও মিল থাকে না, তখন উহাই তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও, আমরা উহাকে নিয়ম বলিতে চাই না; উহাকে অনিয়ম বলাই ভাল। যেখানে অনেকগুলি জিনিসের একটা বিষয়ে মিল আছে, অনেকগুলিতে একজোট হইয়া একধারায় চলে, সেইখানেই আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া থাকি। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব সাবধানে অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারাই ধরা পড়িয়া যায়। যেখানে আপাততঃ রামে শ্যামে মিল দেখা যায় না, সাবধান হইয়া ঘড়ি ধরিয়া মাপকাঠী লইয়া পর্য্যবেক্ষণে সেখানে মিল ধরা পড়ে। তখন আমরা বলি, এই একটা নূতন প্রাকৃতিক নিয়ম বাহির হইল; রাম শ্যাম উভয়েই তাহার অধীন।

বস্তুতঃ এখানেও বিজ্ঞানে ও সাধারণ জ্ঞানে কোনও তফাৎ নাই। যদি প্রত্যেক জিনিসই আপন আপন ধারায় চলিত, কোনও জিনিসের সহিত কোনও জিনিসের মিল দেখা না যাইত, তাহা হইলে মনুষ্যের জীবনযাত্রাই অসাধ্য হইত। মনুষ্যের কেন, পশুরও জীবনযাত্রা চলিত না। পশুরাও জানে,—কেবল যে সংস্কারবশে জানে, তাহা নয়,—অবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানবলে জানে, কোথায় গেলে কিরূপ আহার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুকুর মনিবকে ভালবাসে, অন্য লোককে তাড়াইয়া যায়; বিড়াল যথাসময়ে গৃহস্বামীর ভোজনের ভাগ লইতে আসে। এ সকল তাহাদের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। তাহারা পর্য্যবেক্ষণে নিয়মের আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে।

আমরাও যে কালি যথাসময়ে সূর্য্যোদয় হইবে জানিয়া কালিকার আহারের ব্যবস্থা আজ করি, শীতকালে ফল ধরিবে জানিয়া বর্ষায় ধান বুনি, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা বহুদিনের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছি। ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম জানা আছে বলিয়াই জীবনযাত্রা চালান সম্ভব হয়। নতুবা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বা চেষ্টাপূর্ব্বক জীবনযাত্রা চালাইতে পারিতাম না। কেবল সহজাত-সংস্কারের বশে, অন্ধভাবে যতটুকু চলা সম্ভব হইত, ততটুকুই চলিত। কালসহকারে আমাদের ভূয়োদর্শন ঘটে, নূতন নূতন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সাবধানে মাপজোক ও পরীক্ষা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা যতই মিল আবিষ্কার করি, ততই বিষয়জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা সেই জ্ঞানকে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করি, ততই প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্য বাড়ে।

১৬

ধারুক, ভূমিতে পড়িবার সময় সকল জিনিসের বেগ বাড়ে; প্রতি সেকেণ্ডে কত বাড়ে? সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে বাড়ে। এইরূপে বেগ বাড়ে কেন? তাহা আমরা জানি না, তবে এরূপ স্থলে আমরা বলিয়া থাকি যে, যেখানে বেগ বাড়ে, সেখানে 'বল' আছে; পতন্ত দ্রব্যের উপর 'বল' প্রযুক্ত হয়, পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে বল প্রযুক্ত হয়। সেই জন্য উহার বেগ বাড়ে। পৃথিবীর আকর্ষণবলে পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে। এই 'বল' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আছে। প্রচলিত ভাষায় উহার অর্থ যাহাই হউক, বিজ্ঞানের ভাষায় উহার কাটাছাঁটা অর্থ আছে। যেখানে দেখা যায়, বেগ বাড়িতেছে, সেইখানে বলা যায় গতি যে মুখে, সেই মুখে বল আছে; যেখানে বেগ কমিতেছে, সেইখানে বলা যায়, গতির বিপরীত মুখে বল আছে। যেখানে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেখানে বলা যায়, বলও নাই।

পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, পৃথিবীর অভিমুখে উহার যখন গতি, তখন পৃথিবীর অভিমুখে একটা বল প্রযুক্ত হইতেছে। বেগ বাড়িতেছে বলিলেও যে ফল, বল আছে বলিলেও সেই ফল; কেবল ভাষাটা একটু সংক্ষিপ্ত করা হয়, এইমাত্র; কেন বেগ বাড়িতেছে, উহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না।

অনেকের ধারণা যে, ভাষাটা একটু ঘুরাইয়া বলিলেই যেন জ্ঞানের সীমা বৰ্দ্ধিত হইল। বলের ইংরেজি ফোর্স (force)। এই force শব্দ লইয়া কত লোকে কত কাব্য রচনা করেন। বেগ-বৃদ্ধির কারণ ঐ force; force আছে বলিয়াই বেগের বৃদ্ধি ঘটে। উহা যেন একটা কি অদ্ভুত নিরাকার দেবতা বিশেষ, উহার কাজই হইতেছে বেগ বাড়ান। বিধাতা যেন কতগুলা force সৃষ্টি করিয়া বিশ্বজগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহারা পতন্ত দ্রব্যের বেগবর্দ্ধনে বা বেগ-ধ্বংস কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। উহার মধ্যে একটা force, আম জাম নারিকেলকে ভূকেন্দ্রমুখে বর্দ্ধমান বেগে প্রেরণ করে। এই সকল force আছে বলিয়া জগতের মধ্যে এই কাণ্ড-কারখানা, হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি ব্যাপার চলিতেছে। অতএব গাও forceএর জয়গান। দুঃখের বিষয়, অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক এইরূপ কল্পনায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষে এইরূপ কবিকল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না। ইহার দোষ এই যে, যেখানে আমরা কিছুই

জানি না, সেখানেও একটা জ্ঞানের ভাণ আসে। বস্তুতঃ force বা 'বল' বলিয়া কোন অস্তিত্বযুক্ত ভাবপদার্থ কোথাও কিছু নাই। ইহা একটা নাম মাত্র। এই নাম লইয়া একটা দেবতা গড়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। পতন্ত দ্রব্যের বেগের বৃদ্ধি হয়, ইহাই একটা তথ্য,—অবেক্ষণলব্ধ তথ্য; ইহা একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা—উহাই সত্য। বলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ঘটনাও নহে, উহা কল্পনাও নহে; উহা একটা ভাষার কায়দা মাত্র। "পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ" পরিবর্ত্তে "দুর্গাশিবৌ" বলিলে যেমন নূতন কিছুই বলা হয় না, "পতন্ত দ্রব্যের বেগ বাড়ে" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "পতন্ত দ্রব্যের উপর একটা বল (force) আছে" বলিলেও তাহার অধিক কিছু বলা হয় না। সর্ব্বজনবোধ্য চলিত ভাষার পরিবর্ত্তে পণ্ডিতজনবোধ্য পারিভাষিকের ব্যবহার করা হয় মাত্র।

বেগ যেখানেই বাড়ে, বা যেখানেই কমে, সেইখানে আমরা বলিয়া থাকি, গতির অভিমুখে বা বিমুখে একটা বল আছে; এবং সেই বলের এক একটা বিশেষ নাম দিয়া থাকি। আম জাম নারিকেলের পতনকালে বেগ বাড়ে দেখিয়া আমরা বলি, নিম্নমুখে বা পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে একটা বল আছে, এবং সেই বলের নাম দিই 'মাধ্যাকর্ষণ'। একটা মানুষকে দড়ি দিয়া টানিলে বা আকর্ষণ করিলে সে যেমন কাছে আসে, পতন্ত দ্রব্যও সেইরূপ ভূকেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। মাধ্যাকর্ষণ নামের এই সার্থকতা। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না ভাবে যে, পৃথিবী ইচ্ছাপূর্ব্বক আম জামকে টানিতেছেন। পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবলে সকল দ্রব্যকেই নিজের দিকে টানেন, ইহা বিজ্ঞানের ভাষা নহে; ইহা কাব্যের ভাষা।

পৃথিবী ও আমের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোনরূপ দড়াদড়ির সংযোগ আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা ও বিচার্য্য কথা। থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। এখনও [illegible] সেরূপ সংযোগ-রজ্জুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, অথচ একটা কিছু সংযোগ না থাকিলে একটা অপরটার দিকে চলে কিরূপে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। হয় ত কোনরূপ বন্ধন আছে, তাহা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বলের অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই কাল্পনিক পদার্থকে মাপিতে ছাড়েন না। বেগের বৃদ্ধিতেই বল; বেগের যেখানে খুব বৃদ্ধি, সেখানে খুব বল; যেখানে অল্প বৃদ্ধি, সেখানে অল্প বল। সেকেণ্ডে ৩২ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি, সেখানে যে বল, সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট হিসাবে যেখানে বৃদ্ধি,

সেখানে বল তাহার দ্বিগুণ, এইরূপ হিসাব করিয়া বল মাপা যায়। পতন্ত জিনিসের বেগের বৃদ্ধি ঘড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঠিক্ সমান নয়। প্রায় সমান, কিন্তু ঠিক সমান নয়। কলিকাতায় যাহা, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক। নিরক্ষবৃত্তের নিকটে যত যাই, ততই একটু কমে। মেরুপ্রদেশের নিকটে যত যাই, ততই একটু বাড়ে। আবার যত উচ্চে যাওয়া যায়, ততই একটু কমে। সমুদ্রপৃষ্ঠে যতটুকু, হিমালয়ের পৃষ্ঠে তার চেয়ে একটু কম।

ভূগোল বিদ্যায় বলে, পৃথিবী ঠিক্ বর্ত্তুল নহে; নিরক্ষবৃত্তের নিকট একটু ফাঁপা, আর মেরুপ্রদেশে একটু চাপা। লণ্ডন সহর ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, কলিকাতা তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে, হিমালয়ের পৃষ্ঠ তার চেয়ে একটু অধিক দূরে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভূকেন্দ্র হইতে দূরে গেলে পতন্ত দ্রব্যের বেগবৃদ্ধির মাত্রাটা একটু কমই হয়।

বেগবৃদ্ধির মাত্রা ধরিয়া বলের মাত্রা পরিমিত হয়; অতএব পতন্ত দ্রব্যের উপর বল—যাহার নাম মাধ্যাকর্ষণ—সেই বলও সর্ব্বত্র সমান নহে। ভূকেন্দ্র হইতে যত দূরে যাইবে, মাধ্যাকর্ষণের মাত্রা ততই একটু করিয়া কমিবে।

১৭

কলিকাতার চেয়ে লণ্ডনে একটা টাকার ওজন একটু অধিক; এক ভরি রূপার ওজন একটু অধিক; এক সের চাউলের ওজন একটু অধিক। এ আবার কি কথা? ইহা সত্য কথা—ইহা পরীক্ষিত সত্য। এক সের চাউল কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে ওজনে বাড়িবে। ওজনে বাড়িবে বটে, কিন্তু তুলদাঁড়িতে সেই বৃদ্ধি ধরা পড়িবে না। তুলদাঁড়িতে আমরা ওজন করি কিরূপে। দাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল রাখি, অন্য পাল্লায় বাটখারা রাখি; দাঁড়ি যখন ঠিক্ দাঁড়ায়, তখন বলি, চাউলের ওজন বাটখারার ওজনের সমান। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে গেলে চাউলের ওজন যতটুকু বাড়ে, বাটখারার ওজনও ঠিক্ ততটুকু বাড়ে। কলিকাতাতেও এক সের চাউলের ওজন যে বাটখারার ওজনের সমান, লণ্ডনেও এক সের চাউলের ওজন ঠিক্ সেই বাটখারার ওজনের সমান হয়। দুয়েরই ওজন সমানভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় ওজনের বৃদ্ধি ধরা পড়ে না। কিন্তু অন্য উপায়ে এই বৃদ্ধি ধরিতে পারি। রবারের সূতাতে কোন জিনিস ঝুলাইলে উহা

একটু লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে; উহার দৈর্ঘ্য একটু বাড়ে। দ্বিগুণ ওজনের জিনিস ঝুলাইলে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ বাড়ে। অর্থাৎ, ওজন যে হারে বাড়িতেছে, সুতার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিও ঠিক্ সেই হারে বাড়ে। এক সের জিনিস কলিকাতায় রবারের দড়িতে ঝুলাইলে দড়ি যেটুকু বাড়িতে দেখা যায়, লণ্ডনে তার চেয়ে একটু অধিক বাড়িতে দেখা যায়। ওজনের বৃদ্ধি ধরিবার ইহা স্থূল উপায়। কিন্তু আর একটা সূক্ষ্ম উপায়ে ওজন-বৃদ্ধি ধরা পড়ে। একগাছা দড়ির এক প্রান্তে একটা ভারী জিনিস বাঁধিয়া অন্য প্রান্ত ধরিয়া দুলাইয়া দিলে জিনিটস্না দুলিতে থাকে; ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলিতে থাকে—পেণ্ডুলমের মত কেন, উহাই পেণ্ডুলম। এই পেণ্ডুলম ঘণ্টায় কতবার দোলে, দেখিয়া ওজনের হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপণ করা চলে। দেখা যায়, কলিকাতায় যে পেণ্ডুলম ঘণ্টায় যতবার দোলে, লণ্ডনে সেই পেণ্ডুলম ঘণ্টায় তার চেয়ে কয়েকবার অধিক দোলে। ওজনের সঙ্গে এই দোলন-সংখ্যার সম্পর্ক আছে। লণ্ডনে ওজন একটু অধিক হয়; অধিকবার দোলনেই তাহার পরিচয়।

উচু পর্ব্বতে উঠিলে ওজন কমে, উহাও পেণ্ডুলম দোলাইলে দেখা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র ছাড়িয়া যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ওজন কমে; পৃথিবী ছাড়িয়া দশ বিশ হাজার মাইল যাওয়া সম্ভব হইলে ওজন আরও কমিত, ইহা সহজেই মনে হয়। দশ বিশ লক্ষ মাইল দূরে যাইলে ওজন অত্যন্ত হালকা হওয়ার সম্ভব, ইহাও অনুমানসিদ্ধ। অবশ্য অত দূরে যাইবার উপায় নাই, কাজেই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা চলে না।

চাউলের ওজন সর্ব্বত্র সমান থাকে না, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই, কিন্তু ওজন কমিলেও চাউল ত কমে না। ভারী জিনিস জলে ডুবাইলে উহা হালকা হয়, জলের ঠেলে উহার ওজন যেন কমিয়া যায়; কিন্তু সেই জিনিসটাই ত থাকে; এও কতকটা সেইরূপ। এক সের চাউলের ওজন যতই কমুক বা বাড়ুক, উহাতে পেট ভরিবে সমানই। ওজন বাড়ে কমে, কিন্তু চাউল বাড়ে কমে না। তবে চাউলটা কি?

এক মণ চাউল মাথায় করিয়া দোকান হইতে বহিয়া আনিতে কি কষ্ট! যে বোঝা বহে, সে প্রার্থনা করে, যদি ইহার ওজন আরও কম হইত! ওজন একেবারে না থাকিলে মুটে-ভাড়া আদৌ লাগিত না। মুটে-ভাড়া লাগিত না, অথচ উদর পূরণের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না।

চাউলের যাহা ওজন, উহা চাউলের চাউলত্ব নহে। উহা কোথাও বেশী, কোথাও কম, ভূমণ্ডলে যাহা, চন্দ্রমণ্ডলে তাহার চেয়ে অনেক কম; কিন্তু তাই বলিয়া উহার ক্ষুধানিবৃত্তির শক্তি বেশী-কম হয় না। তেমনি সোনার ওজন না থাকিলেও উহার সুবর্ণত্ব যাইত না; উহাতে ঠিক সেই পরিমাণ গহনা গড়ান চলিত, পরন্তু অলঙ্কারধারিণীকে অলঙ্কার-বহনের ক্লেশটা পাইতে হইত না।

অতএব চাউলের যাহা চাউলত্ব ও সোনার যাহা সুবর্ণত্ব, তাহা ওজন নহে; তাহার একটা নাম দেওয়ার প্রয়োজন। ইংরেজিতে একটা নাম আছে—mass; বাঙ্গলায় নাম নাই। বিজ্ঞানের বহিতে যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনিই সেই নাম দেন। কোন নামটাই এখনও চলে নাই, বা সর্ব্বজনসম্মত হয় নাই। একটা নূতন নাম দিবার এখনও অবকাশ আছে। আমার বিবেচনায় উহাই যখন চাউলের চাউলত্ব ও সোণার সুবর্ণত্ব ও জড়-দ্রব্যমাত্রের জড়ত্ব, তখন উহার জড়ত্ব নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইংরাজিতে আর একটি আছে inertia; ইংরাজি বিজ্ঞানের পুস্তকে এই inertia শব্দটি লইয়া নানা বাগ্‌জালের অবতারণা আছে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে mass ও inertia ঠিক্ সমানার্থক। Inertia বলিতে যে ভাব আসে, জড়ত্ব বলিতেও ঠিক সেই ভাব আসে। Inertia জড়ের জড়ত্ব, ইহাই mass। কাজেই mass অর্থে 'জড়ত্ব' শব্দের প্রয়োগে আমি আপত্তি দেখি না। তবে ইংরেজিতে যেমন দুটি শব্দ আছে, সেইরূপ বাঙ্গালাতে যদি অকারণে দুটা পারিভাষিক শব্দ দেখিতে চান, তাঁহাদের জন্য জড়ত্ব বুঝাইতে আর একটি শব্দ উপহার দিব। পূর্ব্বে আমি জিনিস শব্দ ব্যবহার করিতাম; কেহ কেহ উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, শব্দটা কর্কশ। জিনিস না বলিয়া 'বস্তু' বলিব। এই দ্রব্যটায় বস্তু কত, অর্থ—ইহার mass কত? এটায় অনেকটা 'বস্তু' আছে; ইহা অত্যন্ত massive। 'বস্তু' শব্দ massএর বদলে চলিতে পারে। তাহাই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিব।

এখন বলা যাইবে, এক সের চাউলকে কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ওজন বাড়ে, কিন্তু উহার বস্তু বাড়ে না—সেই এক সেরই থাকে। এক ভরি সোনা বিলাতে গেলে উহার ওজন বাড়ে, কিন্তু বস্তু সমান থাকে; অতএব গৃহিণীদিগের বিলাত যাওয়ায় লাভ নাই। পুরুষেরা বিলাত যান—গৃহিণীরা যাইবেন না।

আমরা সেরে মণে ছটাকে যাহা নির্দ্দেশ করি, তাহা ওজন নহে, তাহা বস্তু। দৈর্ঘ্য মাপিতে মাপকাঠি দরকার; একটা একের কাঠি ঠিক্ করিয়া লইয়া তাহার সহিত তুলনায় দুই তিন দশ কাঠি স্থির করি। সেইরূপ বস্তু মাপিতেও খানিকটা বস্তুকে 'এক' ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরেজদের বস্তু মাপের জন্য পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। এ দেশে উহা চলিত নাই। এ দেশে প্রচলিত এক সের। উহা এক পাউণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। এক সের চল্লিশ গুণে এক মণ; ষোল ভাগে এক ছটাক, আশী ভাগে এক তোলা, বা এক ভরি। চলিত কথায়—আমরা বলি এটার ওজন এক সের, ওটার ওজন পাঁচ সের; বলা উচিত, এটার বস্তু এক সের; ওটার বস্তু পাঁচ সের। অথবা এটার ওজন এক সের বস্তুর ওজন, ওটার ওজন পাঁচ সের বস্তুর ওজন।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ভট্টাচার্য্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

[১৮৫৭ সালের বিপ্লবের হিন্দুপক্ষীয় বিবরণ।]

২

অব্যাহতি।

সিপাহীরা এই ব্রাহ্মণদিগকে সহজে ছাড়িতে চাহিল না; মহুর ছাউনি ত্যাগ করিয়া তাহারা গোয়ালিয়রের অভিমুখে যাত্রাকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। আট দশ দিন তাহাদের সঙ্গে কুচ করিয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সিপাহীরা উজ্জয়িনীর নিকট দিয়া যাইতেছিল। তখন একদিন গ্রন্থকার তাহাদের প্রধান ব্যক্তির নিকট গিয়া উজ্জয়িনীর পবিত্রতা ও তত্রত্য মহাকালেশ্বর দেবের ও সিপ্রা নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনাপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, আমাদিগের ঐ তীর্থ-দর্শনের বাসনা আপনাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। আপনারা সহায়তা না করিলে এই বিপ্লকালে আমরা কিছুতেই নির্ব্বিঘ্নে উজ্জয়িনীতে পঁহুছিতে পারিব না। সিপাহীদিগের চিত্তে ধর্ম্মভাবের অভাব ছিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে ২৫ জন ব্রাহ্মণ-দিগের দেহরক্ষকরূপে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত গমন করিতে প্রস্তুত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদের সুভেদার ব্রাহ্মণদিগের পাদবন্দনাপূর্ব্বক দুই দুই টাকা দক্ষিণা দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।

উজ্জয়িনী ও ধারা নগরী।

সিপাহীদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরা উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনী বহুজনপূর্ণা নগরী। রাজপথসমূহ সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরমণ্ডিত। প্রাচীন সমৃদ্ধির শেষ নিদর্শনস্বরূপ প্রায় দুই তাল প্রমাণ উচ্চ, ৮।১০ গজ প্রস্থ বিশিষ্ট বড় বড় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ নানা স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। এখানকার লোকদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রায়ই ইষ্টক প্রস্তুত করাইতে হয় না। মৃত্তিকার নিয়ে অনেক স্থলেই প্রাচীন প্রাসাদাবলীর ভগ্নাংশ প্রোথিত থাকায় লোকে মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক প্রয়োজনমত পুরাতন ইষ্টক সংগ্রহ করে। ভৈরবগড়ের উপর ভর্ত্তৃহরির গুহা। স্থানটি পরম রমণীয়, শান্তিরসের অনুকূল। গ্রন্থকার ৫।৬ দিন উজ্জয়িনীতে থাকিয়া সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিলেন। সেই সময়ে ধারা নগরীর রাজার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তথায় দশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধব্যাপারে প্রায় আট লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইবার কথা শুনিয়া গ্রন্থকার এই বিরাট সমারোহ-দর্শনের বাসনায় ধারা নগরীতে গমন করিলেন। তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নগরে স্থানাভাব ঘটায় অসংখ্য ব্রাহ্মণ চর্ম্মণ্বতীতীরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দানসামগ্রীর ঘট দেখিয়া গ্রন্থকারের বিস্ময়োদ্রেক হইয়াছিল। আট সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা সহ উৎকৃষ্ট গজমণ্ডপ-(হাওদা)-শোভিত, নানালঙ্কারভূষিত একটি হস্তী, পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা সহ তিনটি নিরলঙ্কার হস্তী, চারিটি অশ্ব, তিনটি উষ্ট্র, দশটি বৃষ, নয়টি মহিষ, তেরটি সালঙ্কারা দাসী ও একটি বহুমূল্য শয্যা দান করা হইয়াছিল। যাঁহারা এই সকল মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন রাজপথে জনসাধারণে তাঁহাদিগের কিরূপ লাঞ্ছনা করিয়াছিল, লেখক তাহার বিশদ মনোরম বর্ণনা করিয়াছেন। ধারা নগরীর ন্যায় সুদৃশ্য উদ্যানের বাহুল্য লেখক আর কোথাও দর্শন করেন নাই। নগরীর দুই ক্রোশ দূরে শৈলের উপর একটি মহাকালীর মন্দির আছে। লোকে বলে,— মহাকবি কালিদাস ঐ দেবী-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

গোয়ালিয়র।

সে যাহা হউক, লেখক তথা হইতে যাত্রা করিয়া কিছু দিনের মধ্যে গোয়ালিয়রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লবের গোলযোগ চারি দিকে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজমাতা বায়জা বাঈয়ের 'চতুর্ম্মুখ যজ্ঞ' স্থগিত হইয়াছিল। তথাপি তিনি ব্রাহ্মণদিগের আদরাতিথ্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটিতে দেন নাই। বর্ষাগমহেতু তিনি ব্রাহ্মণদিগকে চারি মাস আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিনি বিদায় করেন। গ্রন্থকার নগদ দেড় শত টাকা ও একখানি উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র লাভ করিয়া গোয়ালিয়র ত্যাগ করেন। গোয়ালিয়রের সুপ্রসর প্রস্তরমণ্ডিত রাজপথসমূহ, মহারাজের নানাদেশীয়-কুসুমলতা-সুশোভিত সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান, জলমন্দির প্রভৃতি লেখকের অতীব প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

গোয়ালিয়রে অবস্থানকালে গ্রন্থকার প্রায় প্রত্যহই সিপাহী-বিপ্লবের নানা ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিতেন। গোয়ালিয়রবাসী এই সংবাদে বিচলিত হইয়া কেহ স্বরাজ্যে সুখভোগের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কেহ আপনাদের ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অপরে

আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণাপথে গমন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। দুষ্ট লোকে বিপ্লবের সুযোগে দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আশা করিতেছিল। শিন্দে, হোলকর প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই উৎকণ্ঠ ছিল। গ্রন্থকারের এক খুল্লতাত শেষ পেশওয়ে বাজী রাওয়ের তোষাখানার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে (বিঠুরে) ছিলেন। তাঁহার পরিচিত অনেক লোক একে একে আত্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মুখে সেখানকার যে সংবাদ পাওয়া যাইত, গ্রন্থকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ,—

ইংরাজেরা শ্রীমন্ত নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করায় তিনি কোম্পানী সরকারের প্রতি মনে মনে ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ধৈর্য্যশালী ও শূর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বালাসাহেব, ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ও বন্ধু তাত্যা টোপী প্রভৃতি সকলেই সাহসী ছিলেন। ইঁহাদিগের মনে রাষ্ট্রবিপ্লববিষয়ক কল্পনা প্রায়শঃ উদিত হইত। লক্ষ্ণৌয়ের বেগম ও দিল্লীর বাদশাহও ইংরাজদিগের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে শ্রীমন্তের পত্রব্যবহার চলিত। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মনাশভয়ে ভীত সিপাহীদিগের নেতারা আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কিন্তু স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বলাবল চিন্তা করিয়া কুলক্ষয়ের ভয়ে কেহই অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় বিপ্লবানলে ঝম্প প্রদান করিতে সাহসী হন নাই। কথিত আছে, এইরূপ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্ত কতিপয় পণ্ডিত ও আত্মীয়মণ্ডলী সহ গঙ্গাতীরে আহ্নিক সম্পন্ন করিতেছিলেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন। এমন সময় শুভ্রফেনপুঞ্জপরিপ্লুত একটি শ্রান্ত অশ্বে আরূঢ় এক জন সিপাহী-সর্দ্দার সবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্ব হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সেলাম করিয়া সে শ্রীমন্তকে জ্ঞাপন করিল যে,—'মীরাট সেনানিবাসের লোকেরা ধর্ম্মনাশের ভয়ে বিদ্রোহী হইয়া তত্রত্য শ্বেতাঙ্গদিগকে হত্যা করিয়াছে, এবং দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক বাদশাহকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মেরও বিপন্নদশাগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সিপাহীরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত—তথাপি পরধর্ম্ম স্বীকার করিবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে। আপনি ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক আর কেহ এক্ষণে নাই। যদি হিন্দুদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চান, তাহা হইলে এই তরবারি ও এই অশ্ব গ্রহণ করিয়া এই মুহূর্ত্তে কাণপুরে চলুন।'

সিপাহী-সর্দ্দারের কথা শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয়দিগের মুখ শুষ্ক ও দৃষ্টি শূন্যময় হইল। নানা সাহেব কিঞ্চিৎ আরক্তনেত্র হইয়া সেই সর্দ্দারের মুখের দিকে কিয়ৎকাল নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—'ভাল কথা, যদি সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মরক্ষার জন্য মরিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে আমিও স্ত্রী-পুত্রের আশা ত্যাগ করিতেছি। জননী শ্রীগঙ্গাদেবীর সমক্ষে এই শপথ করিলাম।' এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে সবেগে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, এবং বালা সাহেব প্রভৃতিকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া সহচরগণ সহ কাণপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিপ্লবকারী সিপাহী সেনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সিপাহী সর্দ্দারেরা তাঁহাকেই প্রধান নায়ক বলিয়া স্বীকার করিল, এবং তাহারা কখনই রণে ভঙ্গ দিবে না, যা

ইংরাজের শরণাপন্ন হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। সকলে কাণপুরে ফিরিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের বুদ্ধিমান্ লোকেরা আত্মরক্ষার জন্ত দেশত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিল—প্রভুভক্তেরা শ্রীমন্ত নানা সাহেবের পক্ষ হইতে সকলকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল।

ভাদ্র মাসে একদিন গোয়ালিয়রে হঠাৎ চারি দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দোকানীরা দোকান পাট বন্ধ করিতে লাগিল—চারি দিকে কেবল ছুটাছুটি ও কানাকানি। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকাশ পাইল যে, সিপাহীদিগের পক্ষ হইতে তাত্যা টোপী (তাত্যিয়া টোপী) শিন্দে সরকারের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার জন্ত আসিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহাকে গোয়ালিয়রের বাজারে দেখিতে পান। শিন্দের পল্টনসমূহের মধ্যে চারিটি পল্টন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে ও তাঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও তাত্যা টোপীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা বিপ্লবে যোগদান করা সঙ্গত মনে করেন নাই। এই কারণে তাত্যা টোপীকে তাঁহার প্রার্থনামত গাড়ী, ঘোড়া, উট, হাতী, বলদ, খচ্চর প্রভৃতি সমরসম্ভারবাহনোপযোগী উপকরণাদি প্রদানপূর্ব্বক মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তাত্যা টোপী সহরের কোনও প্রকার অনিষ্টসাধন না করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপকরণসম্ভার লইয়া প্রস্থিত হইলেন। শিন্দের পল্টনের নিকট এগারটি বিষময় গোলা ছিল। ঐ গোলা ফাটিবামাত্র উহা হইতে যে ধূমোদ্গার হইত, তাহার স্পর্শে ও গন্ধে নিকটবর্ত্তী লোকের প্রথমে দৃষ্টিশক্তির বিনাশ ও পরে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিত। তাত্যা টোপী ঐ এগারটি গোলাই হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক একটি গোলা প্রস্তুত করিতে দুই হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল।

কাণপুর তখন শ্বেতাঙ্গদিগের হস্তে ছিল। সিপাহী সেনা তাহা অধিকার করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও সহজে সফলকাম হয় নাই। শিন্দের পল্টনেরাও এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। পরিশেষে এক জন নেপালী ব্রাহ্মণকে ঘুষ দিয়া নানা সাহেব দুর্গ-প্রবেশের পথ জানিয়া লইলেন। অতঃপর যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে বহু শ্বেতাঙ্গ নিহত হইল—কাণপুর বিপ্লবকারীদিগের হস্তগত হইল—পলাতক শ্বেতাঙ্গেরা ধৃত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত সমরোপকরণ, ধনসম্পত্তি ও তাঁবু প্রভৃতি শ্রীমন্ত হস্তগত করিলেন, এবং অধিবাসীদিগকে অভয়দান করিয়া দোকান বাজার খুলিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর দিন কয়েক তথায় থাকিয়া তিনি সসমারোহে ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথাকার লোকে ধান্ত, দূর্ব্বা ও পুষ্পবর্ষণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। নানা সাহেবও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে দক্ষিণা ও বস্ত্রাদি দানে সন্তুষ্ট করিলেন। রাজ্যলাভের জন্ত বহুসংখ্যক পূতচরিত্র ব্রাহ্মণের উপর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবার ভার অর্পিত হইল। নগরের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্তও সমরনীতি-সঙ্গত কোনও প্রকার চেষ্টার ত্রুটী হইল না।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে গঙ্গাগর্ভে কতিপয় শ্বেতাঙ্গপূর্ণ একখানি ষ্টীমার দৃষ্টিগোচর হইল। ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রধঘাটে এক জন গোলন্দাজ দূরবীক্ষণযোগে দেখিল, তাহাতে ৬০।৭০ জন মেম, জন কুড়ি বালক ও ১৫।১৬ জন শ্বেতাঙ্গ ছিল। ইহারা প্রয়াগের দিকে যাইতেছিল। গোলন্দাজ সে কথা জ্ঞাপন করিয়া নানা সাহেবের নিকট তাহাদের উপর গোলা চালাইবার আদেশ প্রার্থনা করিল। শ্রীমন্ত, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের উপর গোলা চালান নিষিদ্ধ বলিয়া

মত প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বেতাঙ্গদিগের দুর্দ্দৈবক্রমে ষ্টীমার চড়ায় লাগিয়া গেল। গোলন্দাজ সে সংবাদ নানা সাহেবকে দিয়া বলিল যে, স্বয়ং গঙ্গাদেবী যখন তাহাদের উপর বিরূপ হইয়াছেন, তখন আর আমাদের গোলাবর্ষণে কোনও দোষ নাই। এই বলিয়া সে ঘাটে আসিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ষ্টীমারে গোলা পতিত হইবামাত্র তন্মধ্যস্থিত বারুদে আগুন লাগিল। তাহাতে দশ জন মেম, তিনটি বালক ও চারি জন পুরুষ ভিন্ন আর সকলেই পুড়িয়া মরিল। হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বন্দী হইল। ষ্টীমারে দশ হাজার মুদ্রা ছিল, তাহা শ্রীমন্ত গ্রহণ করিলেন।

কাণপুরের শ্বেতাঙ্গ বন্দীরা ব্রহ্মাবর্ত্তে আনীত হইয়াছিল। তাহাদিগের সহিত নূতন বন্দীদিগকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। বন্দিগণের মধ্যে ষাট জন মেম ও কতিপয় বালক ছিল। তন্মধ্যে এক জন শ্বেতাঙ্গ-মহিলা এক মেথরাণীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আপনাদের মুক্তির জন্য একখানি পত্র প্রয়াগের ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গেল। মেথরাণীর নিকট যে পত্র পাওয়া গেল, তাহাতে লিখিত ছিল যে, —'এখানে হিন্দুরা আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া অসাবধান অবস্থায় রহিয়াছে—ইহাদিগকে আক্রমণ করিবার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবসর আর পাওয়া যাইবে না।' সিপাহীরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং শ্বেতাঙ্গ বন্দীদিগের সকলের প্রাণনাশের আদেশ চাহিল। কিন্তু নানা সাহেব সে আদেশ না দিয়া কেবল পত্রপ্রেরণকারিণীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বলিলেন। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহীরা তাহা না শুনিয়া কারাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সকল শ্বেতাঙ্গ বন্দীকেই অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলিল। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর ও প্রথম বাজীরাও পেশওয়ের ভ্রাতা চিমাজী আপ্পার অবলম্বিত নীতির উল্লেখপূর্ব্বক নানা সাহেবের দুর্ব্বলতার নিন্দা করিয়াছেন।

এই ঘটনার পনের দিন পরে চারি দিক হইতে গোরা সৈন্য কাণপুরের দুর্গ অধিকারের জন্য অভিযান করিল। কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মান্দ্রাজের সিপাহীরাও আসিয়া ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নানা সাহেব কতিপয় প্রসিদ্ধ সেনানীর অধীনতায় বহুসংখ্যক সৈন্য কাণপুর-রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। দিন দুই পরে স্বয়ং বালা সাহেব রাওসাহেবকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল—তথাপি শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না বলিয়া তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। কাণপুরে দশ দিন যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্তের সৈন্যেরা যুদ্ধে শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু দৈবদোষে ও ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যের সুশিক্ষাগুণে সিপাহী পক্ষের পরাজয় ঘটিতে লাগিল। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে বিপরীত দিক হইতে সহসা বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ধূম ও ধূলিপটলে সিপাহীদিগের দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়া গেল। তখন তাহারা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। বালাসাহেব এই যুদ্ধে যথেষ্ট শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে বালাসাহেবকে স্বজনগণ সহ ব্রহ্মাবর্ত্তের অভিমুখে প্রস্থান করিতে হইল।

পেশওয়ের দল অপরাহ্নে ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের পরাজয়বার্ত্তা প্রথম

করিয়া অধিকাংশ নাগরিক ভাবী বিপদের আশঙ্কায় চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নানা সাহেবও ব্রহ্মাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌয়ের বেগমের সহিত গিয়া মিলিত হইবার সংকল্প করিলেন। প্রাসাদে গিয়া তিনি আত্মীয়, স্বজন ও মহিলাদিগকে স্বীয় সংকল্প জ্ঞাপন করিলে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল। শ্রীমন্ত তাঁহাদিগকে সঙ্গে আসবাবপত্র লইতে নিষেধ করিলেন। তিনি একটি বহুমূল্য চাদরে পেশওয়েদিগের বহুকালের সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি ও ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি বাঁধিয়া লইলেন। সমর্থ রামদাস স্বামী ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীকে যে গৈরিক কৌপীন প্রসাদস্বরূপ দান করিয়াছিলেন, তাহা চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত হইয়া পূজিত হইত; নানা সাহেব তাহাও সঙ্গে লইলেন। তাহার পর অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই অসংখ্য ধন-সম্পত্তিসমন্বিত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সকলে (পাঁচ জন রমণী ও তিন জন পুরুষ) গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে একখানি নৌকা প্রস্তুত ছিল। তাঁহারা সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। তাঁহাদিগের বিদায়কালে সহস্র সহস্র নাগরিক গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাদিগের সহচর হইবার বাসনা প্রকাশ করিল। শ্রীমন্ত নৌকার মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তীরবর্ত্তী সমস্ত ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সমবেত নাগরিক-দিগকে বলিলেন,—'হিন্দুধর্ম্মের জন্য ও হিন্দুরাজ্যের জন্য আমরা আর একবার চেষ্টা করিব, সংকল্প করিয়াছি। আমাদের জন্য আপনাদের বর্ত্তমান বিপদ ঘটিয়াছে, সে জন্য ও আমাদের অন্যান্য অপরাধের জন্য আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।' সে কথা শুনিয়া উপস্থিত নাগরিকদিগের মধ্যে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। শ্রীমন্ত আর কালবিলম্ব না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। রাঘোবা নামক এক জন অতি বিশ্বস্ত শিষ্য (ব্রাহ্মণ ভৃত্য) শ্রীমন্তের পুনঃ পুনঃ নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিল। বালা সাহেব ও রাঘোবা নৌকার দাঁড় টানিতে লাগিলেন। রাও সাহেব কয়েকটি মোমবাতি সঙ্গে লইয়া-ছিলেন। তাহা জ্বালিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িবামাত্র তীরস্থিত নাগরিকেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল, এবং যতক্ষণ নৌকার আলোক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, ততক্ষণ সকলেই নৌকার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। নৌকা গঙ্গার মধ্যধারায় উপনীত হইলে রাও সাহেব বাতিগুলি নিবাইয়া দিলেন। তখন শ্রীমন্ত নানা সাহেব চাদর খুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তন্মধ্যস্থ অমূল্য রত্নগুলি একে একে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তীরস্থ লোকেরা নৌকার আলোক নির্ব্বাপিত হইল দেখিয়া মনে করিল, শ্রীমন্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নৌকা নিমজ্জিত করিয়া সপরিবারে বিনষ্ট হইলেন। এই ভাবিয়া সকলেই অতীব শোকাকুল হইল। প্রায় এক প্রহরকাল সকলে গগনবিদারী রোদনের পর শোকভারাক্রান্তহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

এ দিকে অন্ধকারে পথভ্রান্ত হওয়ায় নৌকা গঙ্গার পরপারে যে স্থানে ভিড়িল, সেখানে ঘাট ছিল না;—প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী জন্মাপরিমিত গভীর কর্দ্দম। অন্ধকারে সেই কর্দ্দমরাশি ভেদ করিয়া নানা সাহেব অতিকষ্টে সপরিবারে একটি প্রান্তরে উপনীত হইলেন। রমণীগণের ক্লেশের কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর গঙ্গাদেবীকে ভক্তি ও নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া

সকলে পাদব্রজে প্রান্তর বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমনের পর তাঁহারা একটি গ্রামে মারুতির মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। পথশ্রমে পেশওয়ে-মহিলাগণের কণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষ্ক হইতেছিল। নিকটে কূপ ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে রজ্জু বা কোনও প্রকার পাত্র না থাকায় গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। পরিশেষে কয়েকখানি বস্ত্র গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক জলসিক্ত করা হইল। সেই জল পান করিয়া মহিলাগণ কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা দূর করিলেন। তাহার পর শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং অবস্থায় সকলকেই মন্দিরে সেই শীত-রজনী যাপন করিতে হইল। পরদিন আহারের ব্যবস্থা করিতে গিয়া আবার পূর্ব্বরাত্রির মত অবস্থা হইল। কিন্তু ভৃত্য রাঘোবার সঙ্গে একটি টাকা ছিল বলিয়া কোনরূপে সকলে অনশন হইতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর সেই গ্রামের রামজেদার সংবাদ পাইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার বাটীতে লইয়া গেল, এবং যানবাহনসভ্রোপকরণাদি দিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ পঁহুছাইয়া দিল। তত্রত্য বেগমসাহেবের যত্নে তাঁহাদিগের সমস্ত ক্লেশ নিবারিত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বিদেশী গল্প।

বিশ্বাসঘাতক।

কর্সিকা দ্বীপের কৃষকেরা ক্ষেত্রে সার দিবার পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণলাভের নিমিত্ত অরণ্যের কিয়দংশে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। দাবাগ্নিতে বৃক্ষলতা ভস্মীভূত হইয়া গেলে, সেই ক্ষেত্রে শস্য বপন করে। তাহাতে অপর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হয়।

পক্বশস্য সংগৃহীত হইলে কৃষক শুষ্কতৃণগুচ্ছ আর কর্ত্তন করে না। প্রয়োজন হয় না বলিয়াই তৃণাংশ ক্ষেত্রে শুকাইতে থাকে। দাবাগ্নির প্রবল আক্রমণে যে সকল বৃক্ষমূল ভস্মীভূত হয় নাই, বসন্তসমাগমে তাহাতে পুনরায় পত্রপল্লব বিকশিত হয়। কালক্রমে—কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহারা সাত আট ফুট উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। এই নিবিড় শ্যামল তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষাকীর্ণ ক্ষেত্র 'ম্যাকুই' নামে পরিচিত।

কোনও নরহত্যাকারী পোর্টো ভেচিওর সন্নিহিত এই অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একটি বন্দুক, কিছু বারুদ ও গুলি সঙ্গে থাকিলেই হইল। রাখালগণ তাহাকে দুগ্ধ সরবরাহ করে, পনীর ও বাদাম তাহারাই যোগায়। দেশের আইন, কিংবা হত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গের আক্রোশ তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

ম্যাটিও ফ্যাল্কন্ এই 'ম্যাকুই' হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে বাস করিত। তাহার অবস্থা সচ্ছল, সে আমীরের ন্যায় বিনাপরিশ্রমে জীবনযাপন করিত। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইত না। তাহার বহু গো, মেষ ও ছাগ ছিল। তাহারাই উপস্বত্বে তাহার

সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। রাখালেরা পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে তাহার পশুপাল চরাইত।

তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ অতিক্রম করে নাই। তাহার বন্দুক-চালনার কৌশল বিচিত্র, লক্ষ্যভেদ-শক্তি অননুকরণীয়। কর্সিকা দ্বীপের অধিবাসিমাত্রই বন্দুক-চালনায় দক্ষ, কিন্তু মেটিও ফ্যাল্কনের ন্যায় অব্যর্থ লক্ষ্য কাহারও ছিল না। দেশের সর্ব্বত্র লক্ষ্যভেদ-শক্তির জন্য সে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার মিত্রতা যেমন প্রগাঢ় ও আন্তরিকতাপূর্ণ, তাহার শত্রুতাও তেমনই ভয়ানক। দাতা বলিয়া ম্যাটিওর সুনাম ছিল। পরোপকারেও তাহার প্রবৃত্তি ছিল। প্রতিবেশী সকলেরই সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল।

তাহার সহধর্ম্মিণীর নাম জিউসেপা। উপর্য্যুপরি তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করায় ম্যাটিও অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে যেদিন একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল, সেদিন তাহার আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না। সে শিশুর নাম রাখিয়াছিল, ফরচুনেটো। এই পুত্রই তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী, তাহার বংশের প্রদীপ। ফরচুনেটো পিতামাতার নয়নের আনন্দ-পুত্তলী। কন্যা তিনটি সুপাত্রেই অর্পিত হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে ম্যাটিও জামাতৃবর্গের অস্ত্র ও বন্দুকের উপর নির্ভর করিতে পারিত। দশ বৎসর মাত্র বয়স হইলেও ফরচুনেটোর বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল, পিতামাতার সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র ছিল না।

একদা হেমন্তের মধুর প্রভাতে পত্নী সমভিব্যাহারে ম্যাটিও পশুপালের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাত্রা করিল। বালক ফরচুনেটো তাহাদের সহিত যাইবে বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহাদের গন্তব্য স্থান একে বহুদূরবর্ত্তী, পক্ষান্তরে গৃহ সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া, ম্যাটিও পুত্রকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না। ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বালক গৃহে রহিল। দম্পতী চলিয়া গেল।

ফরচুনেটো প্রভাত-রৌদ্রের মধুর আলোকে সম্মুখস্থ তৃণক্ষেত্রে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। অদূরে নীল অদ্রিমালা। বালক নিমগ্নদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা চলিয়া গেল। বালক ভাবিতেছিল, আগামী রবিবারে নগরের শান্তিরক্ষক তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবে।—সহসা বন্দুকের শব্দে বালকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যে দিক হইতে শব্দ হইতেছিল, বালক সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল।

উপর্য্যুপরি আরও কয়েকবার বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। শব্দ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতেছে না? বালক চকিতভাবে সেই দিকে চাহিতে লাগিল। সে দেখিল, অদূরবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যে পথটি তাহাদের গৃহ পর্য্যন্ত বিসর্পিত, সেই পথে একটি লোক ব্যস্তভাবে আসিতেছে; তাহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, দেহে শীর্ণ ছিন্ন পরিচ্ছদ। বন্দুকের উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে সে কোনও রূপে পথ অতিক্রম করিতেছিল। বন্দুকের গুলিতে তাহার উরুদেশ আহত হইয়াছিল।

লোকটা পলাতক দস্যু। রাত্রিযোগে বারুদ-সংগ্রহের চেষ্টায় সে গ্রামে আসিয়াছিল। এক দল সৈন্য তাহাকে দেখিতে পাইয়া বন্দী করিবার চেষ্টা করে, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। দস্যু বিপুলবিক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিতে থাকে। সেনাদল তাহার

অনুসরণ করিতে করিতে গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেও পাহাড়ের অন্তরালে থাকিয়া আত্মরক্ষার জন্ত গুলি ছুড়িতেছিল। অবশেষে একটা গুলি তাহার উরুদেশ ভেদ করিল। আহত দস্যু তখন প্রাণপণশক্তিতে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু "ম্যাকুইয়ে" পঁহুছিবার পূর্ব্বেই যে সেনাদল তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে! আর বুঝি রক্ষা নাই!

করচুনেটোর সম্মুখে পঁহুছিয়া সে বলিল, "ম্যাটিও ক্যাল্‌কনের ছেলে তুমি?"

"হাঁ।"

"আমার নাম জিয়ানেটো [illegible]। শত্রুসৈন্ত আমাকে ধরিতে আসিতেছে! আমাকে লুকাইয়া রাখ। আমি আর চলিতে পারিতেছি না।"

"বাবার অনুমতি ব্যতীত যদি আমি তোমায় আশ্রয় দি, তাহা হইলে বাবা আমায় কি বলিবেন?"

"তিনি বলিবেন,—তুমি ভাল কাজই করিয়াছ।"

"কে জানে!"

"শীঘ্র আমায় লুকাইয়া রাখ। তারা এল বলে'।"

"আমার বাবা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"কি? অপেক্ষা? তাহারা এখনই আসিয়া পড়িবে। শীঘ্র আমায় লুকাইয়া রাখ, বল্‌ছি, নহিলে তোকে মারিয়া ফেলিব।"

করচুনেটো পরম নিশ্চিন্তভাবে প্রশান্তস্বরে বলিল, "তোমার বন্দুক খালি, তোমার কোমর-বন্ধেও একটাও গুলি নাই।"

"আমার ছোরা আছে।"

"তুমি আমায় দৌড়িয়া ধরিতে পারিবে?" এক লম্ফে বালক দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি কখনও ম্যাটিও ক্যাল্‌কনের পুত্র নও। তোমার বাড়ীর সম্মুখ হইতে আমায় বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, আর তুমি তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবে?"

এই কথা বালকের হৃদয় স্পর্শ করিল। সে একটু বিচলিত হইল। সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, "তোমাকে লুকাইয়া রাখিলে আমায় কি দিবে, বল?"

দস্যু তাহার কটি-বিলম্বিত চামড়ার ব্যাগ অনুসন্ধান করিয়া একটা রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিল। এই শেষ মুদ্রা দ্বারা সে বারুদ কিনিবার সংকল্প করিয়াছিল।

রৌপ্যমুদ্রা দেখিয়া বালকের নয়ন হর্ষোৎফুল্ল হইল। টাকাটি হাতে লইয়া সে বলিল, "তোমার কোনও ভয় নাই।"

বাড়ীর সম্মুখে শুষ্ক তৃণস্তূপ ছিল। ক্ষিপ্রহস্তে বালক কিছু খড় সরাইয়া একটা লোকের বসিবার মত স্থান করিল। জিয়ানেটো তন্মধ্যে উপবেশন করিলে, করচুনেটো পুনর্ব্বার তাহার উপর খড়গুলি সাজাইয়া রাখিল। শুধু দস্যুর নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগের নিমিত্ত সামান্ত ফাঁক রহিল। বহির্ভাগ হইতে দেখিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে, সেই স্তূপের মধ্যে কোনও মানুষ লুকাইয়া আছে। বালক তখন দ্রুতবেগে বাটীর মধ্যে ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে কতিপয় মার্জ্জারশাবক লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। তৃণস্তূপের উপর তাহাদিগকে সন্তর্পণে

স্থাপন করিল। স্তূপের উপর মার্জ্জারশাবক দেখিলে কাহারও মনে সন্দেহ হইবে না যে, শীঘ্র কেহ উহা নাড়িয়াছে। সম্মুখের পথের উপর দস্যুর ক্ষতস্থান-প্রবাহিত রক্তধারার দাগ পড়িয়াছিল। বালক সুকৌশলে ধূলি দ্বারা রক্তরেখা ঢাকিয়া দিল। তার পর ধীর প্রশান্তভাবে ঘাসের উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

কয়েক মিনিট পরে জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী খাকী-পোষাক-ধারী ছয় জন সৈনিক সহ ম্যাটিওর গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। সৈনিকপুরুষ ম্যাটিওর দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়।

দস্যু-তস্করেরা টীয়াডোরো গ্যাম্বার নামে কাঁপিত। ইতিমধ্যে তিনি অনেক বদমাস ও ডাকাত ধরিয়াছেন।

ফরচুনেটোকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কেমন আছিস্, খোকা? বাঃ! তুই ত বেশ বড় সড় হয়েছিস্! ওরে! এখান দিয়ে একটা লোককে এইমাত্র যেতে দেখেছিস্?"

বালক সরলভাবে বলিল, "আমি এখনও আপনার মত অত বড় হই নাই।"

"সময়ে হ'বি। এখান দিয়ে একটা লোককে যাইতে দেখিয়াছিস্ ?"

"একটা লোক—এখান দিয়া গিয়াছে কি না?"

"হাঁ রে হাঁ, একটা মানুষ, তার মাথায় ছাগলের চামড়ার টুপী, গায়ে রক্ত ও পীতবর্ণের কাজ করা কোর্ত্তা। দেখেছিস্ কি না, বল।"

"একটা মানুষ! তার গায় একটা কোর্ত্তা, তার চারি পাশে রক্ত ও পীতবর্ণের কাজ করা?"

"হাঁ, হাঁ। ভাল বিপদ্! দেখেছিস্ কি না, তাই বল। আমারই কথাটা এক শ' বার ঘুরিয়ে বলবার দরকার নাই।"

"আজ সকালে এম্. পি কিউরি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া গিয়াছিলেন বটে। তিনি বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলিলাম—"

"আঃ—তুই ভারী দুষ্ট ত! আমাকে বোকা বোঝাতে চাস্ নাকি? শীঘ্র বল, জিয়ানেট্টো কোন্ পথে গিয়েছে। তাহাকেই আমরা খুঁজিতেছি। সে নিশ্চয়ই এই পথে গিয়াছে।"

"তা কে জানে?"

"তুই ঠিক্ জানিস। তুই নিশ্চয়ই তা'কে যেতে দেখেছিস্।"

"কে কখন কোথায় যায়, তা' কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখা যায়?"

সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "তুই কখনই ঘুমাস্ নাই। বন্দুকের শব্দে নিশ্চয় তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

"সত্য না কি? তোমার বন্দুকে কি বেশী শব্দ হয়? আমার বাবার বন্দুকের শব্দ কিন্তু তোমার চেয়ে ঢের বেশী!"

"জাহান্নমে যা! ছোঁড়া ভারী বদমাস্ দেখিতেছি। তুই নিশ্চয় জিয়ানেট্টোকে দেখেছিস্; হয় ত কোথাও তাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিস্। ভাই সব, বাড়ীর ভিতর গিয়ে খোঁজ কর। আমার বিশ্বাস, সে এখানেই কোথাও লুকাইয়া আছে। তার একটা পা ভেঙ্গে গেছে, সুতরাং সে এমন নির্ব্বোধ নয় যে, এই অবস্থায় সে 'ম্যাকুইয়ে' আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ রক্তের দাগ এই পর্য্যন্ত আসিয়াই শেষ হইয়াছে।"

বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে করচুনেটো বলিল,—"বাবা শুন্‌লে কি বলবেন! যখন তিনি জানতে পারবেন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জোর করিয়া আপনারা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁকে কি উত্তর দিবেন?"

গ্যাম্বা বালকের কর্ণমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "বদ্ ছেলে! তুই জানিস্, আমি এখনই তোকে সোজা করিয়া দিতে পারি? এই তরবারীর উল্টা দিক্ দিয়া ঘা কয়েক দিলেই সত্য কথা তোকে বল্‌তে হবে।"

বালক উপহাসের স্বরে বলিল, "মনে রাখবেন, আমার পিতা ম্যাটিও ফ্যালকন্।"

ক্রুদ্ধস্বরে সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "তোকে কষিয়া নগরে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কারাগারে পায়ে বেড়ী দিয়ে রাখতে পারি, তা জানিস্? জিয়ানেটো কোথায় লুকিয়ে আছে, যদি তুই এখনও না বলিস্, তাহা হ'লে তোকে ফাঁসী দিব।"

বালক উচ্চহাস্যে বলিল, "আমার পিতা ম্যাটিও ক্যালকন্।"

এক জন সৈনিক সর্দ্দারের কাণে কাণে বলিল, "মহাশয়, ম্যাটিওর সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া কাজ নাই।"

গ্যাম্বা বড়ই গোলে পড়িলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে সৈনিকেরা ম্যাটিওর গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিয়াছিল।"

বালক মার্জ্জারশাবকটি লইয়া নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতে লাগিল। সৈনিকদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাহার অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি বোধ হইল।

এক জন বন্দুকের পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা তৃণস্তূপে তাচ্ছীল্যভরে আঘাত করিল। কোথাও কিছু নড়িবার চিহ্ন দেখা গেল না। বালকের মুখমণ্ডলের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না।

গ্যাম্বা ও তাঁহার অনুচরবর্গ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যে পথে তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। সৈনিকপুরুষ মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ভয়-প্রদর্শনে কিছু ফল হইবে না, প্রলোভন দেখাইয়া যদি কিছু উপায় হয়। অন্ততঃ চেষ্টা করায় দোষ কি?

স্বর বদলাইয়া মিষ্টভাবে তিনি বলিলেন, "বালক, তোমার বেশ বুদ্ধি আছে, দেখিতেছি। কালে তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ তুমি বড় মন্দ ব্যবহার করিলে। পাছে ম্যাটিওর সঙ্গে মনান্তর হয়, তাই তোমায় কিছু বলিতেছি না। তাহা না হইলে আমি তোমায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম।"

বালক বলিল,—"বাঃ!"

"তোমার বাবা ফিরে এলে আমি তাঁকে সব বলে দেব। মিথ্যা কথা বলার জন্ত তখন তোমার পিঠে চাবুক পড়িবে।"

"তাই না কি?"

"তখন দেখতে পাবে। যাক্, এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় কিছু পুরস্কার দিব।"

"দেখুন খুড়ামহাশয়, আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি যদি এখনও শুধু মজর

নষ্ট করেন, তা হ'লে জিয়ানেটো সাচ্ছন্দে 'ম্যাকুইয়ে' পলাইয়া যাইবে। তখন তাকে গ্রেপ্তার করা আপনার মত মূর্খের পক্ষে সহজ হইবে না।"

সৈনিকপুরুষ পকেট হইতে একটি সুদৃশ্য ঘড়ি বাহির করিলেন। তাহার মূল্য যথেষ্ট। ঘড়িটি দেখিবামাত্র ফরচুনেটোর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া গ্যাম্বা বলিলেন,—"বালক, এইরূপ একটা ঘড়ি তোমার দরকার, কেমন নয়? ঘড়িটা বুক পকেটে রাখিয়া যখন তুমি নগরের রাজপথে বেড়াইতে যাইবে, তখন লোকে তোমার নিকট সময় জানিতে চাহিবে, তুমি উহা বাহির করিয়া বলিতে পারিবে—'আমার ঘড়ি দেখুন'।"

"আমি বড় হইলে জ্যেঠামহাশয় আমায় একটা ঘড়ি দিবেন।"

"হাঁ, তা পাবে সত্য। কিন্তু তাঁর ছেলে তোমার চেয়ে কত ছোট,—এখনই একটা ঘড়ি পাইয়াছে। কিন্তু সেটা আমার ঘড়ির মত এত দামী, এত ভাল নয়।"

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"এই ঘড়িটা তুমি চাও?"

ফরচুনেটো একবার অপাঙ্গে ঘড়ির দিকে চাহিল। ক্রীড়াচ্ছলে একটা আস্ত মুর্গী মার্জ্জারের সম্মুখে ধরিয়া মনিব যখন তাহাকে প্রলুব্ধ ও উত্যক্ত করিতে থাকে, তখন মার্জ্জারের যে দুর্দ্দশা হয়, বালকের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইল।

কিন্তু গ্যাম্বা ফরচুনেটোকে সত্যই ঘড়িটা দান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরচুনেটো উহা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারিত করিল না। ম্লানহাস্যে সে বলিল, "আপনি কেন আমায় বিদ্রূপ করিতেছেন?"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমায় বিদ্রূপ করিতেছি না। জিয়ানেটো কোথায় আছে—বলিলেই ঘড়িটা আমি তোমায় উপহার দিব। আমার সঙ্গীরা সাক্ষী রহিল, গ্যাম্বার কথার কখনও খেলাপ হয় না।"

এই বলিয়া তিনি ঘড়িটা তাহার মুখের এত নিকটে ধরিলেন যে, উহা বালকের পাণ্ডুর কপোল-দেশ স্পর্শ করিল। আশ্রিত জনের প্রতি কর্ত্তব্য ও লোভ,—উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বালকের মুখমণ্ডলে অন্তরমধ্যস্থ দ্বন্দ্বের ছায়া প্রতিফলিত হইল। তাহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে ঘড়ির দিকে প্রসারিত হইল। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা মুগ্ধ বালক উহা স্পর্শ করিল। ক্রমে ক্রমে সে ঘড়িটা হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। চেনটা তখনও সৈনিক-পুরুষের হস্তে সংলগ্ন ছিল। অল্প দিন হইল, রৌপ্য-ঘড়ির বহির্ভাগ সুমার্জ্জিত হইয়াছিল; সূর্য্যালোকে উহা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

প্রলোভনের আকর্ষণ বড় তীব্র। ফরচুনেটো বাম হস্ত দ্বারা পশ্চাৎস্থিত তৃণস্তূপ দেখাইয়া দিল। গ্যাম্বা সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিলেন। চেনটা তখনই তিনি ছাড়িয়া দিলেন। বালক চঞ্চল হরিণশিশুর ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; তৃণস্তূপ হইতে দূরে সরিয়া গেল। সৈনিকগণ তখন তৃণরাশি অপসৃত করিতেছিল।

অল্প চেষ্টায় দস্যুর আশ্রয়স্থান আবিষ্কৃত হইল। জিয়ানেটো রক্তরঞ্জিত হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ছোরা বাগাইয়া ধরিয়াছিল। শত্রুদিগকে দেখিবামাত্র সে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চরণ

অবশ হইয়াছিল। ব্যর্থ চেষ্টায় সে পড়িয়া গেল। সৈনিকপুরুষ ব্যাঘ্রবৎ তাহার উপর আপতিত হইয়া তাহার হস্ত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইলেন। অবশেষে সকলে মিলিয়া তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল।

আবদ্ধ অবস্থায় জিয়ানেটো ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। করচুনেটোকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে কি বলিতে গেল। তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ অপেক্ষা ঘৃণার ভাবই অধিক পরিস্ফুট হইল।

দস্যুর নিকট হইতে বালক যে মুদ্রা লাভ করিয়াছিল, এখন উহা তাহার প্রাপ্য নহে স্থির করিয়া, করচুনেটো টাকাটা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। দস্যু সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। প্রশান্তস্বরে সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া বলিল, "প্রিয় গ্যাম্বা, আমি চলিতে পারিতেছি না, নগরে আমায় বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায় পরুষকণ্ঠে গ্যাম্বা বলিলেন, "একটু পূর্ব্বে ত তুমি শশকের ন্যায় দ্রুত-বেগে ছুটিতেছিলে? যাক্, তোমার কোনও চিন্তা নাই। তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছে, তাহাতে আধ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমি স্বয়ং তোমায় ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে সম্মত আছি। তোমার আঙ্গরাখা ও গাছের ডালের দ্বারা একটা ডুলি প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। কিছু দূর যাইতে পারিলে ঘোড়াও পাওয়া যাইবে।"

বন্দী বলিল, "ডুলিতে কিছু খড় বিছাইয়া দিও।"

সৈনিকেরা যখন ডুলি প্রস্তুত ও বন্দীর ক্ষতস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে ম্যাটিও পত্নী সহ পথের অপর প্রান্তে উপনীত হইল। জিউসেপার পৃষ্ঠে বাদাম-পরিপূর্ণ একটা প্রকাণ্ড বোঝা। উহার ভারে তাহার দেহ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাটিওর হস্তে একটি বন্দুক। তাহার পৃষ্ঠদেশে আর একটি বন্দুক ঝুলিতেছিল। পুরুষের পক্ষে-মোট বহন লজ্জার কথা। অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য কি পুরুষের বহন করা কর্ত্তব্য?

বাড়ীর সম্মুখে সেনাদল-দর্শনে ম্যাটিওর মনে হইল, হয় ত তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আসিয়াছে। কিন্তু সে ত আইন লঙ্ঘন করে নাই! সকল বিষয়েই তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। দেশের সকলের সে শ্রদ্ধাভাজন ছিল। অন্ততঃ গত দশ বৎসরের মধ্যে কোনও মানবের বিরুদ্ধে সে একবারও অস্ত্র উত্তোলন করে নাই। কিন্তু সাবধানের বিনাশ নাই। সতর্ক হইলে ক্ষতি কি? প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে।

পত্নীকে সম্বোধন করিয়া ম্যাটিও বলিল, "দেখ, তোমার বোঝাটা ঐখানে রাখিয়া দাও। প্রস্তুত হও।"

পত্নী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইল। পৃষ্ঠবিলম্বিত বন্দুকটি ম্যাটিও স্ত্রীর হস্তে দিয়া নিজের বন্দুকে গুলি ভরিয়া লইল। তাহার পর বৃক্ষের অন্তরালে সন্তর্পণে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিল। যুদ্ধকালে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিবে—ইহাই ত তাহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

উদ্যতবন্দুক ম্যাটিওকে সতর্কপদে অবস্থায় আসিতে দেখিয়া গ্যাম্বার বিষম আতঙ্ক হইল। তিনি ভাবিলেন, "জিয়ানেটোর সহিত ম্যাটিওর যদি কোনও আত্মীয়তা থাকে, এবং উহাকে রক্ষা

করা তাহার অভিপ্রেত হয়, তবে ত বড়ই বিপদ! মুহূর্ত্তমধ্যে আমার দুইটি সঙ্গী উহার গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিবে। আমার সঙ্গে উহার আত্মীয়তা সত্ত্বেও যদি সে আমায় লক্ষ্য করিয়া—

কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তিনি সাহসপূর্ব্বক ম্যাটিওর দিকে বন্ধুভাবে অগ্রসর হইলেন। ঘটনাটা তাহাকে জানান আবশ্যক। কিন্তু উভয়ের মধ্যস্থ ব্যবধান যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

"এস দাদা, কেমন আছ? আমি গ্যাম্বা—তোমার ভাই।"

কোনও উত্তর না দিয়া ম্যাটিও বন্দুকের মুখ ঊর্দ্ধ দিকে তুলিল। হাত বাড়াইয়া দিয়া গ্যাম্বা বলিলেন,—"নমস্কার দাদা, অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল।"

ম্যাটিও প্রত্যভিবাদন করিল।

"পেপা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিলাম। আজ অনেক পথ হাঁটিতে হইয়াছে। কিন্তু পথের ক্লান্তি আর অনুভব করিতেছি না। আজ বড় দরের একটা আসামী গ্রেপ্তার করা গিয়াছে। জিয়ানেটো স্যান্‌পায়রোকে এইমাত্র বাঁধিয়া ফেলিয়াছি।"

জিউসেপা বলিল,—"ধন্য ভগবান্! গত সপ্তাহে সে আমাদের একটি দুগ্ধবতী ছাগী চুরী করিয়াছিল।"

এতক্ষণে গ্যাম্বার আশঙ্কা দূর হইল।

ম্যাটিও বলিল, "লোকটা বড়ই হতভাগ্য,—বেচারা না খাইয়া মরিতেছিল।"

গ্যাম্বা ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "বদ্‌মাস্‌টা সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। আমার এক জন লোককে সে মেরে ফেলেছে। আর এক জনের হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তার পর এমন বেমালুম লুকিয়েছিল যে, স্বয়ং শয়তানও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। ফরচুনেটো সাহায্য না করিলে আজ তাহাকে ধরিতেই পারিতাম না।

ম্যাটিও সবিস্ময়ে বলিল,—"ফরচুনেটো!"

জিউসেপাও স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "কি, ফরচুনেটো!"

"হাঁ, জিয়ানেটো ঐ খড়ের গাদায় লুকাইয়াছিল। প্রথমে ফরচুনেটো আমায় বেশ ঠকাইয়াছিল। আমি নগরে গিয়া তাহার জ্যাঠামহাশয়কে বলিব, এই কাজের জন্য তিনি তাহাকে যেন উপযুক্ত পুরস্কার দান করেন। এবারের রিপোর্টে তোমার ও তোমার ছেলের নাম থাকিবে।"

দস্যুকে তখন ডুলিতে তোলা হইয়াছিল। যাত্রার জন্য সকলে প্রস্তুত হইল। গ্যাম্বার সহিত ম্যাটিওকে আসিতে দেখিয়া জিয়ানেটো বিচিত্র ভঙ্গিসহকারে হাস্য করিল। তার পর গৃহের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বিশ্বাসঘাতকের গৃহ।"

মরণাহত ব্যক্তি ব্যতীত এমন কথা ম্যাটিওর মুখের উপর আর কাহারও বলিবার সাহস হইত না। ছোরার একটিমাত্র আঘাতে এই তীব্র অপমান-স্মৃতি বিলুপ্ত হইত। কিন্তু ম্যাটিও শুধু ললাটে একবার করস্পর্শ করিল। সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

পিতাকে আসিতে দেখিয়া বালক বাটীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সে এক পাত্র দুগ্ধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। বন্দীর নিকট দুগ্ধপাত্র সহ সে দাঁড়াইল।

গর্জ্জন করিয়া দস্যু বলিল, "যা, চলে যা।" জনৈক সৈনিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, —"ভাই, আমায় একটু জল দিতে পার ?"

সৈনিক পানীয়পূর্ণ স্বীয় পানপাত্র জিয়ানেটোর সম্মুখে ধরিল। ইতিপূর্ব্বে এই লোকটার সঙ্গে তাহার রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল।

জলপান করিয়া দস্যু বলিল, "এখন আমি একটু আরামে শুইয়া যাইতে চাই, আমার হাত দুইটি পিছন দিকে না বাঁধিয়া সামনের দিকে বাঁধিয়া দাও।"

সামরিক কর্ম্মচারী ডুলি উঠাইবার আদেশ দিলেন। ম্যাটিওর নিকট বিদায় লইয়া তিনি সদলবলে প্রস্থান করিলেন। ম্যাটিও নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দশ মিনিট পর্য্যন্ত সে বাক্যব্যয় করিল না। বালক চকিতনয়নে পিতা মাতার মুখপানে চাহিতেছিল। ম্যাটিও বন্দুকের উপর ঝুঁকিয়া তীব্রদৃষ্টিতে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। পুঞ্জীভূত ক্রোধে তাহার নয়ন ধক্‌-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

"আরম্ভ করিয়াছ ভাল দেখিতেছি।" ম্যাটিওর কণ্ঠস্বর অবিলচিত। যাহারা তাহাকে বিশেষরূপে চিনিত, সে কণ্ঠস্বর শুনিলে তাহাদের হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত।

"বাবা।"—বালক পিতার নিকটে ছুটিয়া গেল। তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

"আমার কাছ হইতে দূর হও।"

বালক থমকিয়া দাঁড়াইয়া কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী পুত্রের কাছে সরিয়া গেল। ফরচুনেটোর বুকপকেটে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছিল, সে তাহা দেখিতে পাইল।

কঠোরস্বরে মাতা বলিল, "কে তোকে এই ঘড়ি দিল ?"

"সর্দ্দার আমায় দিয়াছেন।"

ম্যাটিও ঘড়িটি কাড়িয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী প্রস্তরখণ্ডের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল। সহস্র খণ্ডে উহা চূর্ণ হইয়া গেল।

পত্নীকে সম্বোধন করিয়া ম্যাটিও বলিল, "এই শিশুই বংশের—প্রথম বিশ্বাসঘাতক !"

বালক পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে কোঁপাইতে লাগিল। ক্যালকন্ তখনও পুত্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বন্দুকটা ভূমিতলে একবার ঠুকিয়া লইয়া অংশোপরি রক্ষা করিল। ফরচুনেটোকে সঙ্গে আসিতে আদেশ করিয়া ম্যাটিও অকম্পিতচরণে 'ম্যাকুই' অভিমুখে অগ্রসর হইল।

জিউসেপা স্বামীর কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।

"সে তোমার পুত্র !" স্বামীর নয়নে নয়ন স্থাপিত করিয়া পত্নী তাহার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল।

ম্যাটিও বলিল, "তুমি যাও। আমি উহার পিতা।"

জিউসেপা পুত্রকে আলিঙ্গন করিল। তার পর অশ্রুসিক্তনেত্রে গৃহে ফিরিয়া গিয়া কুমারী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। গভীর আগ্রহে, নিম্নস্বরে পুত্রের মঙ্গলকামনার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এ দিকে ম্যাটিও রাজপথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। পর্ব্বতের পাদদেশে একটা খাত দেখিতে পাইয়া সে তত্রত্য মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, স্থানটি কোমল ও খননোপযোগী।

"ফরচুনেটো! ঐ পাহাড়ের পার্শ্বে দাঁড়াও।"

বালক পিতার আদেশে জানু পাতিয়া বসিল।

"এইবার ভগবানকে ডাকো।"

"বাবা, বাবা, আমায় বধ করিও না।"

নীরস, নির্দ্দয় স্বরে ম্যাটিও বলিল, "ভগবানের নাম লও।"

জড়িতকণ্ঠে, অশ্রুনিরুদ্ধস্বরে বালক প্রার্থনার আবৃত্তি করিয়া গেল। প্রার্থনার শেষে ম্যাটিও দৃঢ়স্বরে বলিল, "তথাস্তু।"

"আর কোনও স্তোত্র জান?"

"কুমারী জননীর স্তোত্র ও জ্যাঠাইমা যে শ্লোক শিখাইয়াছিলেন, তাহা জানি বাবা!"

"সেটা খুব বড়। আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

বাষ্পরুদ্ধস্বরে বালক ঈশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত করিল।

"হয়েছে?"

"বাবা, বাবা, রক্ষা কর, ক্ষমা কর। আর আমি এমন কাজ করিব না। জেঠামহাশয়কে বলিয়া জিয়ানেটোর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিব।"

ম্যাটিও বন্দুক উদ্যত করিল। "ভগবান তোমায় ক্ষমা করিবেন।"

বালক পিতার চরণ আলিঙ্গন করিবার আশায় আর একবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—ম্যাটিওর বন্দুক-নিক্ষিপ্ত গুলি তখন কার্য্য শেষ করিয়াছে;—ফরচুনেটোর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

শবদেহের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়াই ম্যাটিও খনিত্র আনিবার জন্য গৃহাভিমুখে চলিল। কিছু দূরে গিয়া দেখিতে পাইল, তাহার পত্নী রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। সে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল।

"তুমি কি করিলে!"

"সুবিচার।"

"সে কোথায়?"

"খাতের মধ্যে পড়িয়া আছে। আমি তাহার গোর দিব। আমার জামাই ট. ইডেরো বিয়াঙ্কিকে বলিও, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সে যেন বাস করে।"*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* প্রস্‌পার মেরিমির রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

দ্বিতীয় ভাগ।

অষ্টম অধ্যায়।

জীবমাত্রই স্বদেশপ্রিয়। স্বর্গে গমন করিলেও স্বদেশ দেখিবার ইচ্ছা তিরোহিত হয় না। আমি এখন ভূস্বর্গ হিমালয়ে আছি, কোন প্রকার অভাব নাই, মন বেশ শান্ত আছে; কিন্তু আর এ প্রদেশ ভাল লাগিতেছে না। স্বদেশীয় ভাষা শুনিবার জন্য কর্ণ উৎসুক, স্বদেশীয় মনুষ্যদিগকে দেখিবার জন্য নেত্রের আগ্রহ, স্বদেশীয়দিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হৃদয় আকুল, কিছুতেই মন মানিতেছে না। আমার দেশ কোথায়? আমি সন্ন্যাসী, আশ্রয়হীন, স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ রাখি না, বৃক্ষতল আমার বাসস্থান, ভিক্ষান্ন আমার উপজীবিকা, রাস্তা, ঘাট, নদী, পর্ব্বত, গুহা, কন্দর আমার আরামের উদ্যান; সুতরাং আমার দেশ কোথায়? এইটি কিন্তু আমার পক্ষে সুখের কথা। আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালা দেশের দিকে আমার মন টানিতেছে; তাই আজ তাড়াতাড়ি তিব্বতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে বঙ্গদেশের দিকে চলিলাম।

প্রাতঃকালেই খুজরুনাথ দর্শন করিয়া "তকলাখার" যাত্রা করিলাম। বেলা দুইটার সময় "তকলাখার" পঁহুছিলাম। এই দিবস রাত্রি "তকলাখারে"র নদীতীরেই যাপন করিতে হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে "তকলাখার" পরিত্যাগ করিয়া "তকলাখারে"র নদীর তীরে তীরে পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলাম। অদ্য মনে বিশেষ আনন্দ। ত্রেতাপুরী, কৈলাস, মানসসরোবর ও খুজরুনাথ দর্শন হইয়াছে, এই দুর্গম প্রদেশে কোন প্রকার বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, শরীরও বেশ সুস্থ আছে, রাজা কোন রকম উপদ্রব করেন নাই। আর আমরা যে পথে চলিতেছি, সেই পথের উভয় পার্শ্বেই শস্যক্ষেত্র। গম ও কলাই যথেষ্টপরিমাণে হইয়াছে। এই সব দেখিতে দেখিতে চলিতেছি, আর শস্যক্ষেত্রের মধ্য হইতে বেথো শাক সংগ্রহ করিতেছি। অনেক দিনের পর শাক খাইবার

এই লোভটাও মনে উদয় হইতেছে। শাক সংগ্রহ হইল, শস্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আবার বরফময় প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম।

অদ্য মধ্যাহ্নকালে লোকালয় বা গিরিগুহা পাইলাম না। একটি নদীতীরে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আকাশে মেঘের চিহ্ন দেখা গেল। অদ্য বৃষ্টি হইলেই প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। এখানে 'বৃষ্টি' এই কথাটার অর্থ বরফপাত। মেঘ হইলেই বরফপাত হয়, তাহার সঙ্গে দুই চার বিন্দু জলও থাকে। সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অদ্য আমরা কোথায় যাইয়া রাত্রিযাপন করিব?" সঙ্গীরা উত্তর করিল,—"তিন চার মাইল চলিয়াই আমরা একটি গ্রাম পাইব। সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইবে, নতুবা অন্য উপায় নাই। এখানে জলও নাই, কাষ্ঠও নাই, আর বরফপাত আরম্ভ হইলে মাথা গুঁজিবার স্থানটুকুও নাই; চলুন, শীঘ্র চলুন।" এই বলিয়া ভৃত্যদ্বয় অগ্রে ছুটিল, আমরা তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম।

অনুমান বেলা চারিটার সময় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামে পাঁচ ছয় জন গৃহস্থের বাস। বড় বড় গৃহস্থেরা কেহই আমাদিগকে স্থান দিল না। আমরা হতাশ হইয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় একটি দয়াবতী রমণী আসিয়া বলিল,—"তোমরা আমার বাড়ীতে চল; এই মাঠে থাকিলে তোমরা বরফপাত হইতে রক্ষা পাইবে না, জীবন নষ্ট হইবারই খুব সম্ভাবনা। আমার ঘরে জল পড়ে, তবে থাকিবার ঘরখানি ভাল; সেই ঘরেই আজ রাত্রিযাপন কর।" আমি তাহার কথা শুনিয়া হাতে আকাশ পাইলাম। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই রমণীর সন্তানাদি কিছুই নাই, স্বামী আছে, সেও আজ বাণিজ্য উপলক্ষে তকলাখার গিয়াছে। এই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আরও দুইটি আগন্তুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। ইহারা উভয়েই উল খরিদ করিবার জন্য আসিয়া বিপন্ন হইয়াছে। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা খুব আনন্দিত হইয়া বলিল,—"অদ্যকার জন্য আমরা রক্ষা পাইলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপারটা কি?" তাহারা উত্তর করিল,—"আমাদের সঙ্গে উল খরিদ করিবার জন্য প্রায় ১০০০৲ টাকা আছে; ডাকাতের দল আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, আমরা দৌড়িয়া আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। হয় অদ্য রাত্রে আমাদের

আশ্রয়দাত্রীর গৃহ লুণ্ঠন করিত, নতুবা কাল প্রাতঃকালে আমাদিগকে আক্রমণ করিত। এখন আমরা অনেকগুলি লোক হইলাম; তাহারা চার পাঁচ জন, আমাদের আক্রমণ করিবার আর সুবিধা পাইবে না। কল্য আমরা তোমাদের সঙ্গেই যাইব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাদের টাকা কোথায় রাখিয়াছ?" তাহারা উত্তর করিল,—"বাড়ীর বাহিরে মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিয়াছি।" আমি বলিলাম,—"তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া ভালই হইয়াছে; ডাকাতের জন্য আমরাও ভীত হইতেছিলাম। তোমরা কত দূর যাইবে?" তাহারা বলিল,—"সেকরা মণ্ডি পর্য্যন্ত যাইব।" আমি বলিলাম,—"তা বেশ, সেকরা মণ্ডি পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই যাইব।" ইহাদের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গৃহের গৃহিণী ছাতু ও চা দিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আহারের জন্য আটা, চাউল, মাখন, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দিলেন। অনেক দিনের পর ভাত খাইতে পাইব, ইহাতে মনে বড় আনন্দ হইল। গৃহস্থকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণ করিলাম। রাত্রি বেশই গেল। খুব বৃষ্টি ও বরফপাত হইতেছিল; ছিটা ফোঁটা বৃষ্টি আমাদের গায়ে পড়িতেছিল; কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ্টি ও বরফের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

এই গ্রামের ঠিক পূর্ব্ব দিকে "মান্ধাতা" গ্রাম। "মান্ধাতা" গ্রামের পূর্ব্ব দিকেই "মান্ধাতা" পর্ব্বত। এই গ্রামের নিম্নে "তকলাখারে"র নদী। এখন আমাদিগকে এই নদীর তীরে তীরে "সেকরা মণ্ডি" পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রা করিলাম। রাস্তায় যাইয়া দেখি, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন "তকলাখার"-বাসী "সেকরা মণ্ডি" যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই সুঁড়ি। ইহারা মণ্ডিতে যাইয়া মদ প্রস্তুত করিবে ও তাহা বিক্রয় করিবে। ইহাদের সঙ্গে ভারবাহী চামর, ঝব্বু ও ঘোড়া যথেষ্ট আছে। পাঁচ ছয়টি তাম্বু আছে; খুব ধুমধামের সহিত চলিতেছে। আমরা যাইয়া ইহাদের দলে মিশিলাম। ইহারাও ভয়ে ভয়ে যাইতেছিল। কখন আসিয়া ডাকাতে যথাসর্ব্বস্ব লুট করে, কিছুই ঠিক ছিল না। ইহারা আমাদের পাইয়া আশ্বস্ত হইল, আমরাও ইহাদের পাইয়া নির্ভয় হইলাম, উভয় দলে খুব ভাব হইল। ইহাদের মধ্যে দুই এক জন হিন্দীও জানিত। আমি তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে অপরাহ্নে একটি স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে অদ্যকার আড্ডা। কোন

প্রকার আশ্রয় নাই, প্রচুরপরিমাণ জল ও কাষ্ঠ আছে। আড্ডায় যাইয়াই "তকলাখার"-বাসীরা তাম্বু খাটাইল। ইহাদের অনুগ্রহে অদ্যকার রাত্রিও নিরাপদে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে আহারের উদ্যোগ ও আহার করিতে করিতে নয়টা বাজিয়া গেল। "তকলাখার"-বাসীদের তাম্বু উঠাইতে বিলম্ব হইল। অদ্য আমরা তাহাদের পূর্ব্বেই যাত্রা করিলাম। কারণ, অদ্য আর ডাকাতের ভয় নাই, আর বেলা থাকিতে থাকিতেই "সেকরা মণ্ডি"তে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু রাস্তাতে একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে। আকাশে খুব মেঘ, বরফ ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা; কিন্তু ইহা ভাবিলে আর চলিবে না; পথিমধ্যে বিশ্রামের স্থান নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে না করিতে বরফ ও বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; ইহার সঙ্গে খুব বাতাস উঠিল। নিরুপায়,—বস্ত্র সকল ভিজিয়া গেল। মেঘ ঘোর গর্জ্জনে রাশি রাশি করকাভিষেক করিতে লাগিল; বায়ুবেগে সেই করকা ছররা গুলির ন্যায় বস্ত্র ভেদ করিয়া শরীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমার দুই জন সঙ্গী বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া পর্ব্বতশিখরে শুইয়া পড়িলেন। আমি আমার ভৃত্যদ্বয়ের সাহায্যে জল, বাতাস ও বরফপাত ভেদ করিয়া পর্ব্বত-শিখর অতিক্রম পূর্ব্বক নিম্নে চলিতে লাগিলাম। অনবরত দুই তিন মাইল চলিয়া পর্ব্বতের নিম্নে আসিলাম। এখানে ঝড় নাই, আকাশ পরিষ্কার, বরফপাতের নাম-গন্ধ নাই। সূর্য্যের উত্তাপ উঠিয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আমি সঙ্গিদ্বয়ের জন্য ভাবিতেছিলাম যে, তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না, বরফপাতেই আজ তাহারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। অথবা বাতাসে তাহাদিগকে উড়াইয়া লইবে। এই সব ভাবিতেছি, শরীরও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় বিষ্ণু সিংহকে বলিলাম,—"তুমি সঙ্গীদের অন্বেষণে যাও, আমি এখানেই বিশ্রাম করি।" সে তাহাদের অন্বেষণে চলিয়া গেল। আমি আমার আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টার পর বিষ্ণু সিং সঙ্গিদ্বয়ের সহিত ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাদিগকে পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম, এবং তাহাদের শরীর দেখিয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদের বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, বরফপাতে শরীর রক্তাক্ত, মুখ বিবর্ণ, পদবিক্ষেপ যন্ত্রণাদায়ক; কি করি, এখানে কাষ্ঠ নাই যে,

আমার খুব উৎসাহ হইয়াছে। ক্রয়, বিক্রয়, ক্ষতি ও লাভের গণনায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। লোকগুলি এক তাম্বু হইতে অপর তাম্বুতে ছুটাছুটি করিতেছে। যাহারা ঘোড়া, চামর, মেষ ও ছাগ ক্রয় করিয়াছে, তাহারা সেই সব পশু লইয়া মাঠের দিকে ছুটিতেছে; আর যাহারা অপরাপর বস্তু ক্রয় করিয়াছে, তাহারা সেই সব বস্তুর ভার শিরে বহন করিয়া আপন আপন তাম্বুর দিকে ছুটিতেছে; আর যাহারা এখনও কিছু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে নাই, তাহারা দল বান্ধিয়া এক তাম্বু হইতে অপর তাম্বুতে যাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আজ আমার একটু উৎসাহ হইল; আমি দ্রুতবেগে "জ্ঞানিমা" মণ্ডির দিকে ছুটিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে একটি পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিতে হইবে। আমরা অক্লেশে পর্ব্বত আরোহণ ও অবরোহণ করিলাম। সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের কূল-কিনারা নাই, নিছক সমভূমি। তবে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি উচ্চ পর্ব্বত পার্ব্বত্য ভূমির পরিচয় দিতেছে মাত্র। এই মাঠ দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, দেশ মনে পড়িল। মনে হইল, বুঝি দেশে আসিলাম। কিন্তু মনের এই ভাব আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, বৃষ্টি ও বরফপাত আরম্ভ হইয়াছে, খুব হাওয়া চলিতেছে; দুই চার মিনিটের মধ্যে সমস্ত বস্ত্র ভিজিয়া গেল। কিছু দূর যাইয়া দেখিলাম, মাঠ জলে জলময় হইয়াছে, আর চলিতে পারি না। দেশের বন্যার মত জল ছুটাছুটি করিতেছে; সুতরাং দ্রুতগতি বন্ধ হইয়া গেল, আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। পদদ্বয় অসাড় হইয়াছে, হস্তদ্বয়ও সেইরূপ, জীবনের আশা ভরসা একেবারেই নাই; পদে পদে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছি, কেহ ধরিয়া না তুলিলে আর উঠিতে পারিতেছি না। দুই তিন বার জলের ভিতর পড়িয়া গেলাম, এক জন ছুটিয়া আমাকে তুলিয়া দিল। আমি চলিতেছি কি না, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না; তবে দেখিতেছি, আমার শরীর চলিয়া যাইতেছে। একমাত্র নিয়তিই আমাকে টানিয়া "জ্ঞানিমা মণ্ডি"র নিকটে উপস্থিত করিল। আমার সঙ্গীদের দশাও আমার ন্যায়; ভৃত্যেরাও আমার সাহায্য করিতে পারিতেছে না। যখন মণ্ডিতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমি সংজ্ঞাশূন্য। যখন সংজ্ঞা পাইলাম, তখন দেখি, এক জন "জোহারী" হিন্দু অগ্নির উত্তাপে আমাকে গরম করিতেছে, সিক্ত বস্ত্র ছাড়াইয়া গরম বস্ত্র পরাইয়াছে, আর গরম চা পান করাইতেছে। এখন বুঝিলাম,

অদ্যকার জন্য জীবন পাইলাম। সকলেই জানিতে ইচ্ছা করেন, এই দয়াবান্ "জোহারী" কে? ইনি আমার ভৃত্য বিষ্ণু সিংহের পিতা, উল খরিদ করিবার জন্য এই মণ্ডিতে আসিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি "জোহারী" হিন্দু আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই আমার সেবাতে ব্যতিব্যস্ত। দুই চারি জন লোক আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"এখনই আপনার জন্য স্বতন্ত্র তাম্বু খাটাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দুই ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল, এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"তাম্বু প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি তথায় চলুন।" আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, তাহাদের সঙ্গে চলিয়া দেখি, একটি সুন্দর তাম্বু খাটান হইয়াছে, তাহার মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। আমি অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে আসন করিয়া বসিলাম। "জোহারী"রা আসিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল ও নানাপ্রকার আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিল। আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর বসিতে পারিলাম না, অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে শুইয়া পড়িলাম। "জোহারী"রাও আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল।

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মণ্ডি দেখিতে বাহির হইলাম। মণ্ডিটি প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর, চারি দিকে পর্ব্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত। প্রায় সহস্রাধিক তাম্বু পড়িয়াছে; ইহার মধ্যে "জোহারী"দের তাম্বুই অধিক; দুই চারিটি ভুটিয়াদের তাম্বু আছে। ও "লাসা" হইতে দুই চারিখানি দোকান আসিয়াছে। সেই সকল দোকানও তাম্বুতে সংস্থাপিত। এই সব তাম্বু নানাপ্রকার বস্ত্র ও কম্বল দ্বারা সুসজ্জিত। এখানেও বাণিজ্যবস্তুর বিনিময় হইতেছে; লবণ ও সোহাগার অধিকপরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। উলের আমদানীও কম নয়। এই মণ্ডিতে তিব্বতের সোনাও বিক্রয় হয়। এই দেশীয় লোকেরা নিম্নদেশের বনাত ও অন্যান্য রঙ্গিন বস্ত্র খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিতেছে, আর গম, গুড় ও চাউল বিনিময় করিয়া লইতেছে, এবং এই সব দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সোহাগা ও লবণ দিতেছে। এই মণ্ডিতে ছাগল, মেষ, ঘোড়া, চামর ও ঝব্বু বিক্রয় হইতেছে। এক এক দলে পঞ্চাশ ষাট চামর আসিতেছে, আর মহাজনেরা আগ্রহের সহিত সেই সব কিনিয়া লইতেছে। এই সব পশুক্রেতা প্রান্তবাসী "জোহারী"রা। এখান হইতে "জোহার" সাত আট দিনের রাস্তা। "জোহারী"রা "নিলং" পাস অতিক্রম করিয়া "জানিমা" মণ্ডিতে আসে। শুনিলাম, এই "নিলং" পাস দিয়া তিব্বতের

এই মণ্ডিতে আসিতে হইলে এক দিনে তিনটি সুবৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। এই পর্ব্বতশৃঙ্গ এত দুরারোহ যে, আসিবার সময়ে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। রাস্তাতে সুপেয় জল নাই, বিশ্রামের স্থান নাই। রাত্রি চারিটার সময়ে যাত্রীরা "নিলং" প্যাস অতিক্রম করিতে আরম্ভ করে। রাত্রি আট নয়টার মধ্যে পাস অতিক্রম করিতে পারা যায়; কিন্তু পথিমধ্যে মেঘ হইলে, বরফপাত হইলে, এবং বাতাস হইলে যাত্রীদিগকে উড়াইয়া লইবে। কোন কোন বৎসর বহুসংখ্যক পশু ও মানব এই পর্ব্বতে নিহত হয়। "জোহারী"রা এই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া "জ্ঞানিমা" মণ্ডিতে আসে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এত মালপত্র লইয়া কি উপায়ে এই দুরারোহ পর্ব্বত ভেদ পূর্ব্বক "জোহারী"রা "জ্ঞানিমা" মণ্ডিতে আসে? আষাঢ় মাসের প্রথমে এই দেশীয় লোকেরা চামর, ঝব্বু, ছাগ ও মেষেতে বোঝাই করিয়া লবণ, উল ও সোহাগা লইয়া জোহারে যায়, এবং ঐ সব পশুতে বোঝাই করিয়া জোহার হইতে "জোহারী"রা আপন আপন মালপত্র "জ্ঞানিমা" মণ্ডিতে লইয়া আইসে।

আমি ধীরে ধীরে সমস্ত মণ্ডি ভ্রমণ করিলাম। এখানে চাউল, বা দাল, অথবা অপরাপর আহারীয় বস্তুর দোকান নাই। যাঁহারা ব্যবসায়ী, তাঁহারা দেশ হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসেন। বড় বড় কয়েকটি তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহা নিম্নদেশীয় বস্ত্রে সুসজ্জিত; ক্রেতা তিব্বতীয় ভুটিয়া; বিক্রেতা "জোহারী"। এতদ্ভিন্ন এখানে উল খরিদের বড় ধুম; লক্ষ লক্ষ টাকার উল খরিদ হইতেছে, আর তাহা তাম্বুর চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতেছে। কেহ কেহ উল বস্তা বান্ধিয়া ঝব্বু ও চামরের পৃষ্ঠে জোহারের দিকে চালান দিতেছে। এই মণ্ডির লোকেরা এত ব্যস্ত যে, কথাটি বলিবার অবকাশ নাই। আমি যে কয়েকটি তাম্বুতে গিয়াছিলাম, সকল তাম্বুর লোকেরাই আমাকে ছাতু, চাউল, চা, চিনি, মাখম প্রভৃতি উপহার দিয়াছিল। আমি বেলা নয়টার পর আমার তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে একটি বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করেন, কিন্তু রাস্তার বিভীষিকা ও বরফের উৎপাতে তাঁহার আর মানস সরোবরে যাওয়া হইল না; তিনি এই স্থান হইতেই ফিরিয়া "জোহার" অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমি

কল্যকার বরফপাতে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; অধিক পথ চলিবার সামর্থ্য নাই; সুতরাং অদ্য এইখানে বিশ্রাম করিতে হইল। এখানেও অধিক শীত; একটু মেঘ হইলে আর তাম্বুর বাহির হওয়া যায় না। অনবরত বরফপাত হইয়া থাকে।

কল্য সমস্ত রাত্রি বরফপাত হইয়াছে; এখনও সমস্ত বরফ গলে নাই। সূর্য্য উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বেলা দশটা হইতে চলিল, এখনও সূর্য্যের সেরূপ উত্তাপ হয় নাই; সুতরাং আমি শীতে জড়সড় হইয়া তাম্বুর মধ্যে আসিয়া বসিলাম। আমার নিকট অনেকগুলি "জোহারী" আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহাদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ইহারা হিন্দু, এবং হিন্দুধর্ম্মেতে আস্থাবান; তবে ভুটিয়াদের অন্নগ্রহণে আপত্তি নাই। ইহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রায় দুই প্রহর হইল; এ দিকে আমার আহার প্রস্তুত হইয়াছে। আমি আহারে বসিলাম। পার্শ্বস্থ লোকেরা আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল।

আহারান্তে তাম্বুর বাহিরে আসিয়া দেখি, খুব রৌদ্র উঠিয়াছে; মণ্ডির লোকেরা এ দিক ও দিক ছুটাছুটি করিতেছে। এতক্ষণ সহস্র সহস্র লোক আপন আপন তাম্বুতে মৃতবৎ পড়িয়াছিল, এক্ষণে সূর্য্যের উত্তাপে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে বাহিরে আসিল, এবং উৎসাহের সহিত ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিল। সূর্য্যরশ্মি আসিয়া যেন মণ্ডিকে সজীব করিয়া তুলিল। মণ্ডিবাসীরা উৎসাহের সহিত আনন্দ-কলরবে মণ্ডি পূর্ণ করিল। আমিও তাম্বু হইতে বাহির হইলাম।

পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সম্মুখস্থ পর্ব্বতে এক ভুটিয়া যোগিনী বাস করেন; আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। তথায় যাইয়া দেখি, তিনি অনাবৃত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছেন; কেবল দুইখানি কম্বল গাত্রের আচ্ছাদন-মাত্র আছে। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া জানিলাম, তাঁহার বয়স ২০০ বৎসরের অধিক; তিনি জপ-যোগী এবং দেব-উপাসক। তাঁহার ইষ্টদেবী দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। ইনি কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; ইচ্ছা-পূর্ব্বক যে যাহা দেয়, তাহাই গ্রহণ করেন। প্রতিবৎসর মণ্ডি বসিবার পূর্ব্বে এখানে আসেন, এবং মণ্ডি উঠিয়া যাইবার পরে রাবণহ্রদে চলিয়া যান।

এই মণ্ডি আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকে, তার পর বরফপাত হইবামাত্র মণ্ডি ভাঙ্গিয়া যায়; মণ্ডিস্থান বরফময় প্রান্তর-রূপে পরিণত

হয়। এখানে এত বরফ পড়ে যে, আশ্বিনের পর পশু পক্ষীরও সমাগম হয় না। এই মণ্ডিতে জল সুলভ, কিন্তু কাষ্ঠ দুর্লভ; দূরবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। এক বোঝা কাষ্ঠের মূল্য ।০ হইতে ।৵০। অগ্নি ভিন্ন এখানে থাকা যায় না, সুতরাং কাষ্ঠের একান্ত প্রয়োজন। আমাকে আর এখানে কাষ্ঠ ক্রয় করিতে হইল না; আমি জোহারীদিগের তাম্বু হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আমার তাম্বুতে আসিলাম।

তাম্বুতে আসিয়া বুঝিলাম, আর হাঁটিয়া চলা অসম্ভব; সুতরাং চামর ভাড়া করিতে হইবে। এ দিকে পূর্ব্বদিনের বরফপাতে আমার ভৃত্য বিষ্ণু সিং ও খড়্গ সিং একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের বোঝা উঠাইবার শক্তি নাই; সুতরাং বোঝা লইবার জন্যও আর একটি চামর চাহি। বিষ্ণু সিংহকে বলিলাম,"দুইটি চামর কেরায়া কর, কল্য প্রত্যুষে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।" সে দুইটি চামর ভাড়া করিয়া আসিল। চামরের সঙ্গে এক জন লোক যাইবে। একটি চামরের ভাড়া দৈনিক ১৲ টাকা।

আমাদের চামরওয়ালার নাম ইয়াঙ্গবেল। খুব ভাল মানুষ; লম্বা চুল, বর্ণ কটাশে, দেখিতে খুব লম্বা, গায়ে একটি মেষরোমের কোট; কোটটি আপাদমস্তক লম্বমান; মাথায় ভূটিয়া টুপি, পায়ে ভূটিয়া জুতা। তাহার সঙ্গে কথা হইল,—সে আমাকে আপাততঃ "শিবচুলুন" মণ্ডিতে পঁহুছাইয়া দিবে, পরে সেখান হইতে "থুলিং মঠ" পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। সে আরও বলিল, "কল্যকার রাস্তাতে ডাকাতের ভয় আছে; দশ বার জন লোক না জুটিলে নিরাপদে যাওয়া অসম্ভব। তবে কল্য আরও পঞ্চাশ জন লোক যাইবে; তাহাদের সঙ্গে বন্দুক ও বহুসংখ্যক মেষ ও ছাগল থাকিবে; আমরা তাহাদের সঙ্গে যাইব।" ইয়াঙ্গবেল এই বলিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। আমি তাম্বুর মধ্যে আসিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিলাম।

ক্রমশঃ।

পর পারে।

১

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা,
তুমি আমার এসো;
যখন ধীরে পড়ে আসবে বেলা,
তুমি আমার এসো;
যখন যাবে কলরব থামি',
যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব নাক আমি,—
তুমি দিও দেখা।

২

আমার নাইক এমন কোন দাবী,
—তোমায় আমি পাব;
আমি শুধু পূর্ব্বকথা ভাবি,
তুমিও কি ভাব?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে,
তুমি আস না কি?

৩

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন,
তোমার কণ্ঠরব;
তোমার স্পর্শ, তোমার হাস্য—হেন
করি অনুভব।
সবই ভ্রান্তি এ কি! সবই মায়া?
তোমার এই প্রীতি?
শুধু স্বপ্ন? শুধুই কি ছায়া?
শুধুই কি স্মৃতি?

৪

যখন হেথায় ছেড়ে যাব শেষে
যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগরতীরে এসে
সঙ্গে নিয়ে যেও !
তুমি গেছ আগে, তোমার আছে
জানা সমুদয় ;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে
পাব নাক ভয়।

৫

সে দিন তুমি এসো হ'য়ে প্রিয়,
এসো আমার কাছে ;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও—
কোথায় কি আছে।
আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো,
আঁধার হবে আলো ;
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো,
তুমিই বেসো ভালো।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ডিটে-টিভ্।

১

কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়াই মার কাছে শুনিলাম, ননীদার কন্যা ডালিকে পাত্রপক্ষ আজ রাত্রে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন—আমার নিমন্ত্রণ। ননীদা ডাক্তার, এবং ডালি তাঁর একমাত্র সন্তান।

একটা দুর্দ্দান্ত সাক্ষীকে জেরায় করায়ত্ত করিতে সেদিন রীতিমত বেগ পাইয়াছিলাম—শরীর ও মন কাজেই তেমন প্রকৃতিস্থ ছিল না। আমি কহিলাম, "আমার শরীরটা ভালো নেই, আজ—"

মা বলিলেন, "না গেলে নয়, সে বেচারা তা হ'লে ভারী দুঃখিত হবে !

অনেক করে বলে গেছে, আমাদের নিয়ে যাবার জন্তও কত জেদ করছিল—আমরা যেতে পারলাম না, আবার তুমিও যাবে না ?"

অগত্যা, একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ বাহির হইলাম।

মেটের পরদা ও এসেটীলিনের দুর্গন্ধ লইয়া বাড়ীটি উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। বাহিরের ঘর হইতে চেয়ার টেবিল সরাইয়া লওয়া হইয়াছে—তাহার স্থানে ঢালা বিছানা পড়িয়াছে। গোটাকত তাকিয়া ও চারি পাঁচ জন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতে মিলিয়া কলিকাতার সঙ্কীর্ণ ঘরের সমস্ত স্থানটাই প্রায় জুড়িয়া ফেলিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া ননীদার আনন্দ ধরে না, সকলের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, "ইনি আমার মামাতো ভাই, হাইকোর্টের উকীল, মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় !"

ঘরের কোণে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন—স্থূল আকৃতি, বর্ণ কৃষ্ণ, তবে ঘোর নহে। সসম্ভ্রমে তিনি দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আসুন মশায়, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল। এতাবৎকাল ঘটে' ওঠেনি।"

পরিচয়ে জানিলাম, তিনি সম্পর্কে ননীদার কি-রকম সম্বন্ধী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস-কর্ম্মচারী—ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কর্ম্ম করিতেন—সম্প্রতি তাঁহার পল্লীভবন বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন, নাম করালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত দুই এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। ননীদা বলিলেন,—"নাম শোননি, মথুর, উনি আবার দু-চারখানা বাঙ্গলা বইও লিখেছেন যে—কি নাম, আহা, মনে পড়ছে না !"

"বটে !" বলিয়া আমি কোনমতে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

সাহিত্যিকের উপর অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপর কোনও কালেই আমার এতটুকু সম্ভ্রম নাই। আমি তাহাদিগকে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা নিরীহের দল বলিয়াই মনে করি। প্রকাশ্যে আমার অভিমত ব্যক্ত করিবার সময়, আমি স্বভাবতঃ একটু গর্ব্ব অনুভব করি। ইহার বিরুদ্ধে বন্ধুগণের কোনও যুক্তিই আমি গ্রাহ্য করি না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে চুপ করিয়া গেলাম। করালী বাবু পুলিস-কর্ম্মচারী হইয়া সাহিত্যের দিকে ঝুঁকি-লেন কিরূপে, ইহা আমার এক বিরাট সমস্যা বলিয়া মনে হইল।

পাশের ঘরে ছেলেগুলা গ্রামোফোন লইয়া কাণ ঝালাপালা করিয়া

তুলিতেছিল। আমি কহিলাম, "এঁরা আসবেন কখন?" করালীবাবু কহিলেন, "রাত আটটার পর কালরাত্রি কাটিবে, সেই সময় তাঁরা যাত্রা করবেন। নিকটেই বাড়ী, এই বহুবাজারে। আসিয়া পৌঁছিতে বড় জোর পনেরো-ষোল মিনিট লাগিবে।"

তখন ঘড়ীতে সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। এতক্ষণ সময় কিসে কাটে! পলিটিক্সের আলোচনা সমীচীন নহে, সমাজতত্ত্বও নেহাৎ পুরানো হইয়া গিয়াছে। কাজেই করালী বাবুকে বলিলাম, "আপনার দু' একটা গল্প বলুন না, মশায়।"

করালী বাবু বলিলেন, "আমার গল্প!"

এক জন অভ্যাগত সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ মশায়, ডিটেক্‌টিভের গল্প! বইয়ে যত গাঁজাখুরী গল্প পড়া যায় বৈ ত নয়। অসহ্য! তবু আপনার মুখে সত্য ঘটনা দু একটা শোনা যাক্।"

আর এক জন বলিলেন—"হাঁ, মানে আপনাদের কৌশলের কথা।" করালী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে শুনুন, একটা ঘটনার কথা বলি, ভারী আমোদ পাবেন আপনারা।"

ছেলেগুলা তখনও গ্রামোফোন চালাইতেছিল—যত বাজে গান! বিশ্রী গলা!

করালীবাবু হুঁকা রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অনেক দিনের কথা। প্রা. ষোল-সতেরো বৎসরের ঘটনা। বরাবর আমি পশ্চিমেই কাটাইয়াছি। তখন আমি গয়ার সদরে।

অফিসে বসিয়া আছি—সাহেব আসিয়া বলিলেন—'গাঙ্গুলী, একটা সুখবর আছে।'

আমি কহিলাম, 'কি?'

সাহেব বলিলেন, 'ছোট্টুর সন্ধান পাওয়া গেছে।' ছোট্টু দুর্দ্দান্ত ডাকাত। তাহার জ্বালায় দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, 'কোথায়?'

সাহেব বলিলেন,—'তার ভাই বুদ্ধুর বাড়ীতে সে আসিয়াছে। বুদ্ধুর সঙ্গে তার বনিবনাও নাই, কিন্তু ছোট্টু নিরাপদ ভাবিয়াই সেখানে বাসা লইয়াছে। বুদ্ধুর বাড়ী মরচুনায়। বুদ্ধু খবর লইয়া আসিয়াছে যে, যদি কোনও চালাক লোক সঙ্গে যায়, তবে অনায়াসেই তাকে ধরা যায়। তবে

বেশী লোক নয়, এক জন হলেই ভালো—না হলে সে সন্দেহ করিবে।" আমি বলিলাম,—'বুদ্ধুর কথায় বিশ্বাস কি? সে যদি তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিয়া থাকে—আর মরচুনাও ত কাছে নয়, গয়া হইতে চৌদ্দ মাইল।'

সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'সেই জন্যই ত তোমার উপর ভার দেওয়া হচ্ছে।'

বুদ্ধুকে ডাকাইলাম। সে কহিল,—'ছোট্টুর যখন সময় ভালো—সেই সময় বুদ্ধুর ছেলেটির বড় অসুখ হয়। একটা হাকিম ডাকিয়া ঔষধ দেয়, তার এমন সামর্থ্য ছিল না! মা-হারা ছেলে! ছোট্টুর কাছে সে সাহায্য চাহিয়া পায় নাই। ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সে কথা বুদ্ধু কখনো ভুলিবে না। এখন ছোট্টুর আর তেমন সামর্থ্য নাই। তার দলের লোক-জন অনেক মরিয়া গিয়াছে, তারো শরীর খারাপ, তাই সে ভাব করিয়া ভায়ের কাছে আসিয়াছে। বুদ্ধু তাহাকে ধরাইয়া দিয়া আজ পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে। কথাগুলা বলিবার সময় বুদ্ধুর চোখ দুটা বাঘের মত জ্বলিতেছিল।

আমি কহিলাম, 'তোমাকে বিশ্বাস কি?'

বুদ্ধু কহিল, 'বিশ্বাস না হয় ত এখনি জান নিন, বাবুসাহেব। আমি হারামি করিতে আসি নাই।'

সাহেব চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, 'দেখো গাঙ্গুলী, ছোট্টুকে ধরিলে গবমেণ্ট রীতিমত পুরস্কার দিবেন।'

বুদ্ধুকে দেখিলে তার কথায় অবিশ্বাস হয় না! শীর্ণ দেহ, মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, দারিদ্র্য ও শোকের যেন মূর্ত্তিমান ছবি! বুদ্ধু বলিল, 'বাবু-সাহেব! আপনি যেন শিকার করিতে যাইতেছেন, এমন বেশ নিন। বন্দুক নিন—শিকারীদের মত পোষাক পরুন।' অনেক 'সাহেব লোক' শিকার করিতে যাইবার সময় তাহার সাহায্য গ্রহণ করে। তাহাতেই তার দিন চলে; ছোট্টু এ কথা জানে, কাজেই তার কোন সন্দেহ হইবে না। এ কথাও বুদ্ধু আমাকে বলিয়া রাখিল।

২

সেই দিনই শেষ রাত্রে 'ক্যাম্পনি' লইয়া বুদ্ধুর সহিত মরচুনা যাত্রা করিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি! সহর ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম। দুই ধারে

অড়হরের ক্ষেত। দূরে মাঝে-মাঝে ছোট পাহাড়ের মাথা জাগিয়াছে—অগ্রহায়ণ মাস; শীতও মন্দ ছিল না!

বেলা দশটার সময় পীরগাঁওয়ের পুলিস আউটপোষ্টের পাশ দিয়া গেলাম, কিন্তু সেখানে নামিলাম না। সেখানে পথের ধারে স্নানাহার সারিয়া লইলাম। পথে ডেপুটী মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রাণটা যেন বাঁচিল!

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'ব্যাপার কি, মশায়?'

আমি তাঁহাকে চুপি চুপি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম। কথাটা ভাঙ্গিতাম না, তবে পাছে ডাকাতের হাতে 'গুম-খুন' হই, তবু ইহাঁরা সংবাদাদি লইয়া তাড়াতাড়ি একটা তদ্বির করিতে পারিবেন। এই জন্যই দ্বিধা বোধ করিলাম না। তাঁহাকে আরও বলিলাম, 'দেখিবেন, কথাটা কারো কাছে প্রকাশ করিবেন না, একটু বেফাঁস হইলেই বেটা পলাইবে। সে ভারী হুঁসিয়ার। এই পাঁচ-সাত বৎসরেও তার কোন 'পাত্তা' পাওয়া যায় নাই!' জিভ কাটিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, 'আরে, রামচন্দ্র!'

পীরগাঁও হইতে মরচুনা তিন ক্রোশ। কিয়দ্দূর যাইয়া আমাদিগকে গাড়ী ছাড়িতে হইল। ক্রমেই পথ সরু হইয়া জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। আমার গাটা ছম-ছম করিয়া উঠিল! বুদ্ধুর দিকে চাহিলাম,—বুদ্ধু কি বুঝিল, জানি না, সে কহিল, 'পথ আছে বরাবর, বাবু সাহেব, তবে আর গাড়ী যাবে না। সাহেবেরা এখানেই নামেন, বনে হরিণ বাঘ সবই পাওয়া যায়!'

শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া আমি ত বুদ্ধুর পশ্চাতে চলিলাম। বন্দুকে টোটা ভরিয়া রাখিলাম, পকেটে রিভলভারও ভরা ছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পথ চলিয়া বুদ্ধুর বাড়ী পঁহুছিলাম। চারিধারে আতা, খেজুর ও অন্যান্য গাছে জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাহারি মাঝে একটা জীর্ণ পাতার ঘর, পিছনে ছোট ডোবা, দ্বারের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কুকুর শুইয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সে ভীষণ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি দুই পা হঠিয়া আসিলাম। বুদ্ধু কহিল, 'চলে আসুন বাবু সাহেব, কোন ভয় নাই।' পরে কুকুরটির মাথা চাপড়াইয়া কহিল, 'চুপ রও শেরশাহ!' কুকুরটির নাম শের শাহ; দেখিলে 'শের' বলিয়াই মনে হয় বটে।

ঘরে আসিয়া বুদ্ধু একটা কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া কহিল, 'আসুন, বার

সাহেব, ছোট্টু বাড়ীতে নাই, নিকটেই কোথায় গিয়াছে। বোধ হয় এখনি আসিবে। রান্না তৈয়ারী, এখনো খায় নাই, দেখিতেছি। সে জানে, আমি হুরান সাহেবের কাছে গিয়াছি, বড় শিকারী সাহেব।' আমি বসিলাম।

আমার ভয় হইতেছিল, এই বিজন বন, একেলা আমি, ইহারা কত লোক আছে, তার ঠিক কি? আর ঐ ত প্রকাণ্ড কুকুর, একটা ইঙ্গিতে আমাকে এখনি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,—শাস্ত্রের বচন পড়িয়া রহিয়াছে! লোভে পড়িয়া আজ প্রাণ দিতে আসিয়াছি। আতঙ্কে শিহরিয়া ভাবিলাম, কোনমতে যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই ত, পুলিসের চাকুরী ছাড়িয়া দিবই।

বুদ্ধু কহিল, 'ঐ যে কুকুর দেখলেন, বাবু সাহেব, ওটা ছোট্টুর। পুলিসের লোক দেখিলেই ও চীৎকার করিয়া সাবধান করিয়া দেয়, তাই আপনাকে কোন লোক আনিতে বারণ করেছিলাম। পাছে সে সন্দেহ করিয়া পলায়।'

আমি একটা সিগার ধরাইয়া ঘরের চারি দিক দেখিতে লাগিলাম। ঘরের ভিতরকার চাল ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে—কোণে একটা চুল্লী—একটা হাঁড়ী ও দুই-তিনখানা বড় শালপাতা পড়িয়া রহিয়াছে! বাহিরে দুই-একটা পাখী ডাকিতেছিল। আমি কেবল ভাবিতেছিলাম, আর কি বাড়ী ফিরিয়া পরিবার, ছেলে-পিলেদের সঙ্গে ইহজন্মে দেখা হইবে?

বুদ্ধু আসিয়া চুপি চুপি কহিল, 'ছোট্টু আস্‌ছে, বাবু সাহেব, দেখবেন, হুঁসিয়ার।'

একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, রোগে ও বার্দ্ধক্যেও মাংসপেশীগুলা একেবারে ঝরিয়া যায় নাই। কপালে দাগ পড়িয়াছে। চোখ দুইটা কোটরগত হইলেও এখনো তাহাতে বেশ যেন তেজ আছে। ঘাড়ে এক প্রকাণ্ড লাঠী।

আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি যে যুবা বয়সে অসাধারণ জোয়ান ছিল, এখনো তাহাকে দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

বুদ্ধু কহিল, 'ছোট্টু, বাবুসাহেব বড় শিকারী। হুরান সাহেবের দোস্ত। বাঘ শিকারে আসিয়াছেন!'

ছোট্টু কহিল, 'আপনি একলা আসিয়াছেন?'

কথাগুলায় তেজ কি! বুদ্ধুর কথাগুলা শুনিলে মনে হয়, যেন সে

বেচারা জীবনে বড় দাগা পাইয়াছে—সর্ব্বদাই একটি আশ্রয় চাহে—দরিদ্রের চিরাভ্যস্ত বিনয়নম্র স্বর! আর এ যেন আত্মনির্ভরসম্পন্ন বলবান্ কণ্ঠস্বর! কথাগুলা সজোরে কানে আসিয়া লাগে। আমার ধারণা যথার্থ কি না, তাহা জানি না; তবে তখন আমার এইরূপই মনে হইয়াছিল।

আমি কহিলাম, 'একলাই আসিয়াছি—তার পর তোমাদের লোক-জন নাই কি?'

ছোট্টু হাসিয়া কহিল, 'আমাদের লোকজন! আর বাবুসাহেব, অজন্মার জ্বালায় দেশ উজাড় হইয়া গেল, আমাদের লোকজন! তবে বুদ্ধু বড় চালাক।'

ছোট্টু আমার দিকে চাহিতেছিল;—যে চাহনিতে অন্তরের সকল গুপ্ত রহস্য ধরা পড়িয়া যায়, এমনই চাহনি,— তেমনি তীক্ষ্ণ ও তীব্র!

আমার গা-টা ছমছম্ করিতেছিল!

তার পর ছোট্টু লাঠী রাখিয়া খাইতে বসিল। বুদ্ধু বলিল, 'আমি কিছু খাব না।'

ছোট্টু শালপাতায় ভাত ঢালিল। ভাতের রাশি! আমাদের মত তিনটা লোকের আহার! আমি কেমন-এক ভাবে তাহার দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছিলাম—লাল রঙ্গের মোটা ভাত—তাহাতে হড় হড় করিয়া অড়হরের ডাল ঢালিয়া সে খাইতে আরম্ভ করিল!

বেচারার ক্ষুধা বোধ হয় খুবই প্রবল ছিল—খাইবার সময় কোনও দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

বুদ্ধু আমার প্রতি ইঙ্গিত করিল। আমি ঘাড় নাড়িলাম। আহা, অন্নের গ্রাস ছিনাইয়া ধরিব? না, না, প্রাণ ভরিয়া খাইয়া লউক! আর ত এমন খাইতে পাইবে না! খাওয়া শেষ হইলে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না।

আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এই সেই প্রবল দস্যু—যাহার দৌরাত্ম্যে সমস্ত দেশ 'থরহরি-কম্পমান'—আজ আমার সম্মুখে। যাহাকে ধরিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—আজ রোগশীর্ণ, বলহীন, সেই বৃদ্ধ দস্যু আমার কবলের মধ্যে—মনে করিলেই ধরিব—তার পর রাজসরকারে কি নাম—বখশিস্ প্রোমোশনের কি সে ঘটা! দারুণ আগ্রহে আমার হাত অবধি কাঁপিতেছিল,—এখনি উহাকে সবলে চাপিয়া ধরিব, তারপর বুদ্ধুর সাহায্যে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব—বন্দুকের একটি গুলিতে কুকুরটির ভব-

লীলা সাঙ্গ হইবে—বুদ্ধু পীরগাঁওয়ের আউট পোষ্টে খবর দিবে, এবং তার পর আমি রাজসম্মানে গয়ায় ফিরিব!

হঠাৎ বাহিরে কুকুরটা ডাকিয়া উঠিল। অন্ন ফেলিয়া ছোট্টু নিমেষে বাহির হইয়া গেল—তখনি ঘরে ঢুকিয়া লাঠিখানা ঘাড়ে লইয়া আবার সে বাহিরে চলিয়া গেল। চক্ষের পলক পড়িবার অবকাশ ছিল না—এত শীঘ্র কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল। বুদ্ধু কহিল, 'বাবু, করলেন কি? ও যে পলাল!'

'সে কি?' বলিয়া লাফাইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। দেখি, অদূরে একদল চৌকিদার সঙ্গে জমাদার,—সকলে এই দিকেই আসিতেছে।

চকিতে তাহারা আসিয়া পড়িল! আসিয়াই আমাকে ও বুদ্ধুকে বাঁধিয়া ফেলিল! আমরা কহিলাম, 'ব্যাপার কি?'

তাহারা কহিল, 'পীরগাঁওয়ের দারোগা সাহেব খবর পাইয়াছেন, ছোট্টু ডাকাত বনের মধ্যে বুদ্ধুর ঘরে আসিয়াছে। তিনি কোনও কাজে এখনি সদরে চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় আমাদিগকে হুকুম দিয়া গিয়াছেন।'

আমি কহিলাম, 'সে পলাইয়াছে! আমি যে তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছিলাম!'

কিন্তু সে কথা কে শোনে? নূতন বেহারী জমাদার—নাম কিনিবার তাঁর বিরাট আগ্রহ,—আমাকে অকথ্য গালি দিয়া হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া চালান দিল! আমি ভয় দেখাইলাম, সহজভাবে ব্যাপার বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই জমাদার সাহেবের মনে বিশ্বাস হইল না। তিনি আমাকে 'পাকা বদমায়েস, শয়তান' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করিয়া দুইটা রুলের গুঁতা দিতেও ছাড়িলেন না! বুদ্ধুর দুর্দ্দশার মাত্রা আরও অধিক! কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! আবার এমনি দুর্ভাগ্য মশায়, যে পীরগাঁওয়ের দারোগা বাবুও অন্তর্হিত। সে তবু আমাকে চিনিতে পারিত! গায়ের ঝাল গায়ে রাখিতে হইল! হা ভগবান্! ভাবিলাম, ক্ষুধিতের অন্নের গ্রাস কাড়িবার সঙ্কল্প করিতেছিলাম, তাই কি এই দুর্দ্দশা? যখন পীরগাঁওয়ে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা। সেই শীতের সন্ধ্যাতেই গয়াতে চালান হইলাম! সারা পথ, পদব্রজে। অপমানে, ক্রোধে, ক্ষুধার জ্বালায়, জ্ঞান ছিল না—কোন্ পথ ধরিয়া কতক্ষণ যে চলিলাম, কিছুই হুঁস ছিল না!"

৩

আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম। কয়ালী বাবু বলিতে লাগিলেন,—

"বেলা সাড়ে নয়টায় জমাদার-চৌকিদারের দল আমাকে ও বুদ্ধুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিল। তিনি আমাকে চিনিতেন,—এতদবস্থায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! মুক্তি পাইয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম! গর্দ্দভ জমাদার ও তাঁর উপযুক্ত চৌকিদারগুলাকে তিনি অজস্র গালি দিলেন।

সংবাদ পাইয়া আমার সাহেবও আসিলেন! সমস্ত শুনিয়া তিনি ত হাসিয়াই খুন!

পীরগাঁওয়ের দারোগা সাহেব কহিলেন, গয়ার ডেপুটী মহেন্দ্র বাবু মফঃস্বল-তদারকে আসিয়া তাহাকে সংবাদ দেন, ছোট্টু ডাকাত এবার ধরা পড়িবে। কথায়-কথায়, তিনি বলেন, মরচুনায় তার ভাইয়ের বাড়ীতে সে আছে—ডিটেকটিভ সাহেব ধরিতে গিয়াছেন—তাই এখানে চলিয়া আসিবার সময় আমি দারোগাকে তাঁর সাহায্যের জন্য চৌকিদার লইয়া যাইতে বলি! শেষে এই গোল বাধিয়াছে, ইত্যাদি! অর্থাৎ, কাহারও কোন দোষ নাই, আমি 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি!

আমি মুক্তি পাইলাম। কিন্তু ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বেচারা বুদ্ধু পিনাল কোডের ২১৬ এ ধারানুযায়ী বিচারের জন্য প্রেরিত হইল। সাহেব ও আমি তার স্বপক্ষে অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই 'চার্জ্জ ফ্রেম' করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে না দিয়া ছাড়িলেন না! বিচারে সে কবে মুক্তি পাইল, তাহা জানি না। কারণ, আমাকে দুই তিন দিন পরেই জাল নোট ধরিবার কাজে একেবারে বক্সারে চলিয়া আসিতে হইল! তবে ছোট্টু ডাকাতের যে সেই অবধি কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তাহা বেশ জানি।"

আমি কহিলাম, "ওহো, বক্সারের জাল নোট—সে ত একটা রোমান্সের ব্যাপার! শুনি, শুনি—"

এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামিল! ননীদা কহিলেন, "ঐ তাঁরা এসেছেন।" তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমরা শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলাম। জাল নোটের গল্প শুনিবার আর অবসর ঘটিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমার।

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' পত্র লিখিয়াছিলেন,—"গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক বিহারীলালকে বাঙ্গালার পাঠক চিনিল না। * * * বাঙ্গালা কাব্যের যদি কখন ইতিহাস লিখিত হয়, বিহারীলালের নাম সে ইতিহাসের শীর্ষস্থানে থাকিবে।" বাস্তবিকই বিহারীলাল নবযুগের গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক। তাঁহার 'সারদা-মঙ্গল' একালের গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠ উচ্ছ্বাস। সেই মধুময় কাব্যের হৃদয়গ্রাহী কবিত্বে আকৃষ্ট হইয়া অনেকানেক অন্তগত ও উদীয়মান কবি কবিতা-রচনায় উদ্দীপিত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-লাভও করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে বর্ত্তমান কালটি গীতিকবিতারই যুগ। এখন যে সকল পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বীররস অপেক্ষা করুণ রসের প্রাধান্য; মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, বা পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা সারদা-মঙ্গলেরই প্রভাব দেদীপ্যমান। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র গীতি-কাব্যের একটি সংজ্ঞা দিয়াছিলেন,—'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য।' পাশ্চাত্য মনীষী (Carlyle) বলেন,—প্রকৃত কবিতামাত্রই গান। যাহা গীত হইতে পারে না, যাহাতে সঙ্গীত নাই, তাহা ছন্দোবদ্ধ বাক্যে গ্রথিত হইলেও কবিতা নহে।

বিহারীলাল 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যকে 'সঙ্গীত' বলিতেন। বস্তুতঃই 'সারদা-মঙ্গল' একটি সুধাময়, মোহময়, স্বপ্নসুষমাময় সঙ্গীত। মানব-মনকে সঙ্গীত যেরূপ আলোড়িত ও মোহিত করে, সারদা-মঙ্গল কাব্যও মনকে সেইরূপ উদ্বেলিত ও বিমুগ্ধ করে। কার্লাইল বলিয়াছিলেন,—"দান্তের ডিভাইনা কমিডিয়া একটি প্রকৃত সঙ্গীত, এবং ইহা অপেক্ষা দান্তের উচ্চতর প্রশংসা হইতে পারে না। বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে। গান যত কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহান অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই অর্থে সারদা-মঙ্গল একটি গান। আজীবন ঐকান্তিক সাধনা করিলে তবে বা সেরূপ গান ধ্যানে আসে। বিহারীলাল 'ভক্তিভাবে একতানে' 'কমলার ধনে মানে' উপেক্ষা করিয়া সারদার ধ্যানে মজিয়াছিলেন; তাই সারদা ভক্তের কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কাব্য-মন্দিরে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে উপবিষ্ট বাগ্দেবীর এই উপাসককে

কোনও ভক্ত 'যোগেন্দ্র', কেহ বা 'ধ্যানমগ্ন কবি' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিহারীলালের সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, তাঁহারাই জানেন, বিহারীলালের সেই ধ্যান কত কঠোর ও মহান্ এবং ধ্যানের সহিত তুলনায় তাঁহার গান কত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সঙ্কীর্ণ হইলেও সে গানের তুলনা নাই। সে গান যে কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছিল, সেরূপ কবিতার জন্ম রাশি রাশি হয় না। সুধীপ্রবর ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্তরঞ্জিনী ভাষায় "সে অতি কোমল কবিতা, কোমলাদপি কোমল, মিষ্ট, মসৃণ, মোলায়েম, আবেশময়ী, ইথরবৎ আকাশবিহারিণী, * * * কঠিন মাটীর কর্কশ স্পর্শ সহে না, অতি সাবধানে ছুঁইতে হয়, নহিলে নবনীতবৎ এলাইয়া যায়—নক্ষত্রবৎ ছুটিয়া যায়।"

বিহারীলালের প্রিয়বন্ধু কবিবর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন,—"বিহারী বাবু সদাই কবিত্বে মসগুল্ থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল, তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।" প্রকৃতই বিহারীলালের মত ক্ষণজন্মা কবি জগতের সাহিত্য-সংসারে বিরল। কবির যে উচ্চাদর্শ মনশ্চক্ষে রাখিয়া মার্কিণ সমালোচক এমার্সন মহাকবি মিল্টন ও হোমারকেও প্রকৃত কবি বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন "Milton is too literary and Homer too literal and historical", বিহারীলাল সেই উচ্চাদর্শের কবি। দুর্ভাগ্য কবির নহে, কলঙ্ক বাঙ্গালার পাঠকের যে, এমন কবিকে তাঁহারা জীবিতকালে যোগ্য সম্মান ও সমাদর হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর বর্ষত্রয় পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন বটে,—"বিহারী বাবুর 'সারদা-মঙ্গল' ও 'বঙ্গসুন্দরী' বাঙ্গালা সাহিত্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।" কিন্তু তিনিও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—"সে প্রতিষ্ঠাও আশানুরূপ নহে।" তাহার পর অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। এখনও বোধ হয় সেই ভাব,—বিহারীলাল যে 'কবির কবি', সেই 'কবির কবি'ই আছেন। কিন্তু "এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত সহস্র রচনা যখন বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদা-মঙ্গল তখন লোক-স্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং, কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত

একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।" রবীন্দ্র বাবুর এই ভবিষ্যবাণী সফল হইবে, ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

বিহারীলালের মৃত্যুর পর যে কয় জন বয়ঃকনিষ্ঠ কবি প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে কাব্যগুরু বলিয়া অভিনন্দন করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম উল্লেখযোগ্য। এক জন স্বনামধন্য শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; অপর খ্যাতনামা কবি শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়াল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী; অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-সেবা গীতিকবিতাতেই সীমাবদ্ধ। এ স্থলে আমরা অক্ষয়কুমারের রচনা অবলম্বন করিয়া বিহারীলালের কবিতার কয়েকটি বিশেষত্বের, এবং সেই সঙ্গে অক্ষয়কুমারের কবিত্ব-প্রতিভারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বিহারীলালের মৃত্যুতে অক্ষয়কুমার যে শোকগীতির রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সেরূপ মধুর, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগোচ্ছ্বাস, সেরূপ সুললিত কবিতায় কাব্য-সমালোচনা বঙ্গভাষায় আর পাঠ করি নাই। যাঁহারা বিহারীলালের রচনা ও জীবনকাহিনীর সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অক্ষয়কুমার বিহারীলালের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা কিরূপ সুন্দর ও নিখুঁত, এবং বিরল রেখাপাতে কত নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত। বিহারীলালের যে মহান্ আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া অক্ষয়কুমার কবিতা-রচনা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহারই আভাস দিবার জন্য অক্ষয়কুমারের "কনকাঞ্জলি" কাব্যের "উৎসর্গ" শীর্ষক কবিতাটির চারিটিমাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"যাও গুরো, যাও, বুঝিয়াছি স্থির—
মানব-হৃদয় কতই গভীর,
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেম-পথ!
কে বা বাণী-পায় রাখে নিজ শির,
নিজ পায়ে পর-মত।

"বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ
কিরূপা কবিতা কত সুধারস,
প্রেম কত ত্যাগী কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী।
পুত মত্ততায় মুগ্ধ দিক্ দশ,
ভাবা কিবা গরীয়সী।

"বুঝিয়াছি, গুরো, কোথা সুখ মিলে—
আপনার হৃদে আপনি মরিলে।
অমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্মপর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পায়ে লোটে চরাচর।

"বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা প্রেম ভবে—
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে!
সুখদুখাতীত কি বাঁশরী রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি'!
ধন জন মান যার হয় হবে
তুমি চির-ধ্যমে জাগি!"

বাগ্দেবীর সেবাই বিহারীলালের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কবিতাকে তিনি কখনও আমোদের সামগ্রী বা সখের জিনিস ভাবিতেন না। কবিতা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। অক্ষয়কুমারও তাঁহার সাধনার ধন গীতিকবিতার ক্ষুদ্র কায়ার মধ্যে অনন্ত সত্যের মহত্তম ভাবের বীজ নিহিত দেখেন। তিনি বলেন,—

"ক্ষুদ্র বন-ফুল বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-বুকে বুকে প্রলয়-প্লাবন ;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে,
চির-ঊষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

গীতকবিতার মহত্বে ভক্তিমান বলিয়াই অক্ষয়কুমারের কবিতায় আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিহারীলাল সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাঁহার "সাধুরী" নামক কবিতা সীমাহীন সৌন্দর্য্যের একটি অপূর্ব্ব স্তোত্র। সত্য-শুভ-সুন্দরের সেই আবেগময়, তন্ময়তাময় উচ্ছ্বাস যে কোনও সাহিত্যে প্রকাশিত হইত, সেই সাহিত্যেরই গৌরববর্দ্ধন করিত। তাঁহার নয়নে "বিশ্বের সৌন্দর্য্য-রাশি কি এক পিরীতিময়" বলিয়া বোধ হইত। তিনি সেই বিশ্ব সৌন্দর্য্য-রাশিকে একাধারে পুঞ্জীভূত করিয়া প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বরূপের সহিত বিশ্বপ্রেম একাকার হইয়া যায়। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি হইতে প্রেমের কবিতে পরিণত হয়েন। তিনি বিশ্বপ্রেমকে নারীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া অনুরাগ-বিহ্বল প্রেমিকের অনন্ত ভালবাসা সেই প্রেমময়ীর চরণে সমর্পণ করেন। বিহারীলালের প্রেমের কল্পনা যেমন বিচিত্র, তাঁহার প্রেমের গানও তেমনই পবিত্র ও উদার। সে প্রেমে অধীরতা আছে, উন্মাদনা আছে, বিরহে উৎকণ্ঠা ও মিলনে অপার আনন্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়সুখলালসার কোনও সম্পর্কই নাই। সে প্রেমের নায়িকা কবির চির-আরাধ্যা মূর্ত্তিমতী শিব-সুন্দরী স্বয়ং সারদা। কবি সেই জগতের সারাৎসারা প্রেম-রূপিণী ও সৌন্দর্য্য-রূপিণীকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত অনুভব করিয়া, নিজের ক্ষুদ্রত্ব—মানবত্ব ভুলিয়া যাইতেন।

অক্ষয় কুমারও সৌন্দর্য্যদর্শী। সুন্দরের প্রতি তাঁহারও অনন্ত অনুরাগ। তিনিও এক জন

"সরলহৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।"

স্বভাব-শোভার ক্ষুদ্র বৃন্তপর্চ হইতে, মানব-মনের নিগূঢ় সুষমা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও অলক্ষ্য সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত তিনি কত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও অনুরাগভরে নিরীক্ষণ করেন, তাহা অক্ষয়কুমারের কবিতায় ছত্রে ছত্রে,—তাঁহার বাক্য-চিত্রের প্রত্যক রেখাপাতে সুপ্রকাশ। তিনিও সুন্দরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন। তিনিও প্রেমের কবি, এবং তাঁহার প্রেমের গান নির্ম্মল ও উদার। সে গানে কামগন্ধ নাই। সে গান দুর্নীতির পোষক বা নীচতার উৎস নহে। তাহা পবিত্রতার সৃষ্টি করে, মনকে উন্নত করে, মহান পরার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে। অক্ষয়কুমার নিষ্কাম প্রেমের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গাহিয়াছেন,—

"চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গ গিরি,
শির 'পরে অনন্ত আকাশ—
দাঁড়াও, শুভদে দেবি, মুক্তকেশে হাসিমুখে,
কামনার হোক সর্ব্বনাশ।
দেহ সে অজর প্রেম, অমরের চিরপূজ্য,
চির-শুভ সুন্দর মহান।
লহ, এ জীবন লহ, জীবনসর্ব্বস্ব লহ,
পদে তব চির বলিদান।"

বিহারীলালের প্রেমের গানে কেবলই উচ্ছ্বাস ;—আবেগময়, জ্বালাময়, অমৃতময় উচ্ছ্বাস। কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রেম-বিষয়িণী কবিতার বিশেষত্ব উচ্ছ্বাস নহে, ভাবুকতা। অক্ষয়কুমার প্রেমিকের সুখ দুঃখ ও মিলন বিরহের কথা মানব-মনের অন্তস্তল আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সে প্রেমের গানে অন্ধ প্রেমিকের উন্মাদ কল্পনা অপেক্ষা মানব-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতারই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের "প্রদীপ" কাব্যের "প্রেমগীতি" ও "কনকাঞ্জলি" কাব্যের "কাঁদিতে পার গো যদি" শীর্ষক কবিতা দুইটি পাঠ করিলে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। শেষোক্ত কবিতার ভাবমাধুরী বর্ণনাতীত।

বিহারীলাল, "দুঃখের কবি" বলিয়া কাব্যরসজ্ঞগণের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের অনেকেই দুঃখবর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ও বিহারীলালের দুঃখ-অভিব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈষ্ণব-কবিগণ কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ ও কবিকঙ্কণ সাংসারিক ক্লেশের বর্ণনা করিয়াছেন ; সে দুঃখের গানে কবির আত্মপ্রকাশ নাই। বিহারীলালের দুঃখের কারণ অন্যরূপ ;—তাহা সংসারে অতৃপ্তি, জীবনে বিতৃষ্ণা, ভবিষ্যতে নিরাশা। আর সেই দুঃখ কোনও কল্পিত ব্যক্তির মুখে ব্যক্ত হয় নাই, কবি আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজের মনোদুঃখই প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য কাব্য-

সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে এই দুঃখবাদের উৎপত্তি। ইউরোপে দুঃখবাদের উৎপত্তি হইবার প্রবল কারণ ঘটিয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর ধর্ম্মে অভক্তি, দেশে অরাজকতা, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আবির্ভূত হইয়া ইউরোপীয় জনসাধারণকে অতৃপ্তির দোলায় প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। জর্ম্মণ কবি গেটে (Goethe) প্রথমে সেই অতৃপ্তি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন; তাঁহার "ওয়ার্ত্তারের দুঃখ" দেশব্যাপিনী অতৃপ্তির অভিব্যক্তি। গেটের করুণ ক্রন্দনের ফলে ইংলণ্ডে একদল দুঃখবাদী কবির উদয় হয়। বায়রণ তাঁহাদের মুখপাত্র; শেলী আর এক জন নেতা। উভয় কবিরই অতৃপ্তিবাদের ব্যক্তিগত কারণও বিদ্যমান ছিল। তুল্যরূপ ব্যক্তিগত বা সমাজগত কারণ না থাকিলেও, বঙ্গদেশে নিরাশাবাদী কবির,—অবসাদ-সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহার মুখ্য কারণ,—পাশ্চাত্য কবি-গণের অনুকরণ; কেহ বা বলেন,—ভাবাতিসার; কেহ বা বলেন, বিষাদ-সঙ্গীতের মধুময়ী স্বরলহরীর অন্ধ আকর্ষণ। আমাদের বোধ হয়, পরাধীনতাই ইহার প্রধান কারণ। আয়র্লণ্ডও পরাধীন। সেই জন্যই বোধ হয় সেখানেও বিষাদগীতির এত আদর ও প্রাচুর্ভাব। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক ইংরাজ জাতির সাহচর্য্যে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালী আপনার হীনতা অনুভব করিতে শিখিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর জাতীয় অবসাদ হৃদয়বান কবি-গণের রচনায় স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্ততঃ, বিহারীলালের কাব্যে বিষাদের সুর, নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাস আসিবার অপর কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কোনরূপ অশান্তি বা রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শোকতাপ, প্রণয়-নৈরাশ্য, দারিদ্র্য-দুঃখ, ব্যাধিক্লেশ প্রভৃতি ব্যক্তিগত শোকের বা সাংসারিক দুঃখের কারণের অস্তিত্ব বিহারীলালের জীবনে দেখা যায় না। আর বিহারীলালের অবসাদ-সঙ্গীতে শোকের সুর নাই; তাহা অতৃপ্তির রাগিণী। বিহারীলাল এক জন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বজাতির হীনতায় ও দুর্দশায় তিনি যে অবসাদগ্রস্ত হইবেন, এবং সেই জাতিগত অবসাদ যে তাঁহার রচনায় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিফলিত হইবে, তাহাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। শেষ জীবনে বিহারীলাল তত্ত্বজ্ঞানে বা দার্শনিকতায় তাঁহার দুঃখবাদ বা নিরাশাবাদের খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, গাহিয়াছিলেন,—"ভবে কেউ দোষী নয়, আমিই দুষী," এবং বিধাতা যে বাম নহেন ও এই ধরাধাম

দুঃখে ভরা, এ সত্যও তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছিল। বিহারীলাল সুন্দরের উপাসক। নিরাশা অসুন্দর; সুতরাং নিরাশার অন্ধকারে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই জীবন-সায়াহ্নে তিনি যৌবনের ভ্রমাত্মক সংস্কারের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

অপরাপর নবীন কবিগণের ন্যায় অক্ষয়কুমারও দুঃখের গান গাহিয়াছেন। সে গান অক্ষম লেখকের বাক্যসর্ব্বস্ব পদ্যমাত্র নহে। সে গানে কবির আন্তরিকতা ও প্রাণের আবেগ সুপরিস্ফুট। কবি জীবন-সংগ্রামে অভিভূত হইয়া গাহিয়াছেন,—

"কি দুর্ব্বহ আমার জীবন!
কোথায় আসিতে যেন কোথায় এসেছি হেন!
কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
আসিতে আপন দেশে পড়েছি বিদেশে এসে
মরুভূমে বৃষ্টির মতন।
বৃন্তচ্যুত-ফুল প্রায় ভূমে পড়ে আছি হায়,
কতক্ষণে আসিবে মরণ।
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।"

অক্ষয়কুমারের বিষাদের সুর কিরূপ পীযূষবর্ষী ও প্রাণস্পর্শী, করুণ-রসের উন্মেষে তিনি কিরূপে সিদ্ধহস্ত, "কনকাঞ্জলি" কাব্যের "আয়, ঘুম আয়" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলে রসজ্ঞ পাঠক তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। বিহারীলালের মত জ্ঞানের পথে না যাইয়া, অক্ষয়কুমার ভক্তির পথে হৃদয়ের দুঃখপ্রবণতা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দুর্ব্বল মানবের আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া "ভবজনমের হাহা" নিবারণের জন্য ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন।—

"কোথা তুমি কোথা তুমি হে দেব মহান্,
চাও একবার
কার্য্য হ'তে কত দূরে কারণের কোন পুরে
বিরাজ হে মহাযোগী যোগে আপনার।
পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা
সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়ে মরণে বিশ্বাস দিয়ে
যেমন গড়িয়াছিলে পুন গড়ে লও।"

* * *

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র আশার সঙ্গীতে ও উদ্দীপনার নিনাদে বাঙ্গালীর এই নিরাশানীতির প্রস্রবণ নিরুদ্ধ করিবার, উক্ত মজ্জাগত অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল নারীপূজক কবিদিগের অগ্রণী। তিনি "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যে যে ভাবে নারীর পূজা করিয়াছেন, কোনও কবির কাব্যে সেরূপ নারীবন্দনা নাই। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় "নব্যভারত"

পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"পাশ্চাত্য ভূমে প্লেতো রমণী-পূজার প্রবর্ত্তক। পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা অগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা। মহামনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিলেও আমরা এই আনুরক্তির আভাস পাই। ইঁহারা সকলেই দার্শনিক। * * * বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগের কেহ কেহ বটে, রমণী-মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা স্বরলোকের আদর্শ বা অবতাররূপিণী দেবীমাহাত্ম্যের বিবৃতিমাত্র, কচিৎ আন্তরিক অনুভূতিই বটে। * * * পক্ষান্তরে কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্য্যন্ত সকলেই কেবল রমণীর রূপবর্ণনা ও রমণীকে লইয়া কষ্টি নষ্টি মাত্র করিয়াছেন। * * * পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব! রমণীসমাজের মাহাত্ম্যানুকল্পে শেলীর সুনাম আছে বটে, কিন্তু সুনামের সহিত দুর্নামও জড়িত। অতএব কিঞ্চিৎ আত্মগর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দুইটি কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণীমাহাত্ম্যমূলক এবং সে উচ্ছ্বাস করুণ, অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী ও সার্ব্বভৌমিক।"

বিহারীলাল "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যে নারীকে "প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের আধার, করুণা-নিঝর, দয়ার নদী" মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নারী-পূজাত্মক কবিতার প্রবর্ত্তন করেন। "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষে স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইঙ্গিতে বিহারীলালের বন্ধু স্বর্গীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তদীয় "মহিলা" নামক উৎকৃষ্ট কাব্যে মাতা, জায়া ও ভগ্নী মূর্ত্তিতে নারীর আরাধনা করেন।

অক্ষয়কুমারও না[illegible] অনুপ্রাণিত। তিনিও নারী-ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভিন্ন পথে—আধ্যাত্মিক ভাবে—স্ত্রীজাতির বন্দনা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার গাহিয়াছেন,—রমণীর সৌন্দর্য্যে সকল সৌন্দর্য্য—সৃষ্টির শৃঙ্খলা আবদ্ধ, রমণীর মঙ্গলধারায় কালের মঙ্গল প্রকাশমান, এবং রমণীই এই অসম্পূর্ণ সংসারে পূর্ণতার দীপ্তি, জীবন-সংগ্রামে বিধাতার আশীর্ব্বাদ। কবি রমণীকে সম্ভাষণ করিয়াছেন,—

স্বর্গচ্যুত নরক-উত্থিত
নিয়তি-তাড়িত নরমতি
ভুলে গেছে জগত সে অতৃপ্তি, উন্মাদতা
পেয়ে তব প্রেমের আরতি।

"দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা,
হেন ত্রিভুবন ঘেরা সুধা-সিন্ধু নাহি বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা !

"নিজ করে গড়ি' এ প্রতিমা
নিজে বিধি মুগ্ধনেত্রে চাহি।
স্বর্গের স্খলিত ধারা আবার উঠিছে স্বর্গে
ও দেহে হৃদয়ে অবগাহি "

অক্ষয়কুমারের "রমণী" ও "অভেদে প্রভেদ" নামক "প্রদীপ" কাব্যের কবিতা দুইটি অতি উচ্চ অঙ্গের নারীস্তোত্রের মধ্যে স্থান পাইবে, এবং যতদিন বাঙ্গালায় কবিতার আদর ও নারী-ভক্তি থাকিবে, ততদিন সেগুলি কাব্যামোদী পাঠকের আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

অক্ষয়কুমারের গীতিকবিতার সুর তাঁহার নিজের। সে সুরও আবার এত কোমল ও মধুর, তাঁহার মূর্চ্ছনাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালগুলি এত বৈচিত্র্যময় ও মনোরম যে, গান থামিয়া যাইলেও সুরের রেশ্ টুকু প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। অক্ষয়কুমার ভাবপ্রধান কবি। তিনি তাঁহার কবিতায় যাহা বলেন, ইঙ্গিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নির্দ্দেশ করেন। নিপুণ অভিনেতা যেমন একটি কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে শত কথার ভাব ব্যক্ত করেন, তেমনই অক্ষয়কুমারেরও কয়েকটিমাত্র বা একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিলে, কত শত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত গভীর ভাব-সমুদ্র মন্থন করিয়া সেগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মত কথার সদ্ব্যবহার আর কোনও কবিকে করিতে দেখি নাই। "প্রদীপ" কাব্যের "উপহার", "ভাবুকতা", "কবিতা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি এক একটি অমূল্য হীরক। যেমন বিমল, তেমনই উজ্জ্বল। এ স্থলে "উপহার" কবিতাটি পাঠককে উপহার দিলাম,—

"গীত-অবশেষে নিশ্বসিল কবি
বল কি গাহিব আর—
মরমের গান ফুটিল না তাহে,
বাজিল না হৃদি-তার।
"চিত্র-অবশেষে সজলনয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—

হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে
জীবন বৃথায় যায়।
"প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল কত বুঝেছিল
কিছুই হ'লো না বলা।"

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নিরর্থক বাক্চাতুরী নাই। তাঁহার কবিতা দুর্ব্বোধ নহে। শব্দকুহেলিকা ও কষ্টকল্পনা তাঁহার অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কবিতার আর একটি গুণ এই যে, তাহাতে [illegible] নাই। "কনকাঞ্জলি"ও "প্রদীপ" কাব্যের প্রত্যেক কবিতাই সুনির্ব্বাচিত,

এবং মণিমাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল। বিহারীলালের অপেক্ষা মিষ্ট কবিতা বঙ্গের অপর কোনও কবি লেখেন নাই। অক্ষয়কুমার তাঁহার কাব্যগুরুর সেই গুণ পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়াছেন। তিনি কিরূপ অসাধারণ শব্দকুশলী, এবং তাঁহার বাক্য-চিত্রের রেখাগুলি কত কোমল, সূক্ষ্ম ও নিপুণ, তাহা যিনি কনকাঞ্জলি কাব্যের "স্বপ্নরাণী" এবং প্রদীপের "নিশীথ-গীত" নামক কবিতা দুইটি পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। ঐ কাব্যদ্বয়ের "আরাহণ", "পুনর্মিলন", "শেষ" ও "রজনীর মৃত্যু" শীর্ষক কবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ কবিত্বের অমৃতময় উচ্ছ্বাস। সেরূপ ভাবাবেশময়ী, কবি-স্বপ্নময়ী প্রাণারাম কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল। "শ্রাবণে" ও "উষা" নামক কবিতা দুইটি পাঠ করিলে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে মনে পড়ে। সেরূপ ভাবুকতার সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বর্ণনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যেই পড়িয়াছি। যিনি অক্ষয়কুমারের কাব্যগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের প্রশংসায় অত্যুক্তি নাই।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

অশনিবর্ষণ ও ভূমিকম্পন।

ইংলণ্ডের সন্নিকটস্থ ওয়াইট-দ্বীপের সাইড প্রদেশ হইতে Daily mail নামক সংবাদপত্রে অধ্যাপক মিল্‌নে বজ্রপাত ও প্রবল ঝটিকাভিঘাতের সঙ্গে ভূমিকম্পনের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, সেই বিষয়ে একটি সুললিত সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন।

ঐ প্রদেশে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাবে অধ্যাপক মিলনের কয়েক জন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ধূমকেতুর আবির্ভাবের সহিত ভূমিকম্পের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না। উত্তরে মিল্‌নে বলেন যে, ভূতলমধ্যস্থ কোনও প্রকার দ্রব্যনিচয়ের ঘাত-সঙ্ঘাতে বা অপর কোনও প্রকার অবস্থান্তর ভেদে ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের আলোচনায় ভূমি-তলনিহিত অনেকানেক গূঢ় ব্যাপার লোকসমক্ষে সমানীত হইয়া থাকে। শূন্যমার্গস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র বা অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের বিকাশ বা তিরোধানে যাহা কিছু নূতন নৈসর্গিক ঘটনাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্ত বিষয় জ্যোতির্ব্বিদ্ মনীষিগণেরই আলোচ্য। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের মতই একান্ত গ্রাহ্য; সুতরাং ধূমকেতুর আবির্ভাবে ভূমিকম্পের সম্ভবতা কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তবে প্রবল ঝটিকা ও বজ্রপাতের সহিত ভূমিকম্পের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে কথঞ্চিৎ গবেষণা করা যাইতে পারে।

প্রবল ঝঞ্ঝাভিঘাতই বলুন বা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আস্ফালনই বলুন, উভয় ক্ষেত্রে মানব-

অন্তঃকরণে যে বিভীষিকা ও বিস্ময়ের চিত্র উদিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত ও প্রলয়কারী ভূমিকম্পের সংঘটনের সময় কেবল মনে হয়, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি ?' আবার কি অনৈসর্গিক বিভীষিকায় লোকে ও দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য ও কর্ত্তব্যজ্ঞান-রহিত হইয়া পড়ে! ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া জীবগণ প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হয় যে, তখন আর পরস্পরের হিংসা, দ্বেষ ও শক্রতা কিছুই মনে থাকে না; তখন ব্যাঘ্র ও ছাগ, সিংহ ও শৃগাল, ভুজঙ্গ ও মানব একত্র প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে! প্রবল ঝটিকায় দুর্ব্বল ও সবল, সকল জীবকুল কেবল নিরাপদ হইবার জন্য লালায়িত।

এইরূপ অবস্থায় মানবের অন্তঃকরণে স্বতঃই ঐশ্বরিক চিন্তা আসিয়া পড়ে। তখন লোকে বিপত্ত্রাতা ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়া মানসিক পূজা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া থাকে। সেই প্রলয়নিদান ভগবানকে একমনে ডাকিতে থাকে, আর কিসে তাঁহার সন্তুষ্টি সাধিত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে। এই কারণে আমাদিগের পুরাণ-কথিত ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বাসুকী প্রভৃতি দেবগণের ষোড়শোপচারে পূজা দিবার বিধান আছে। বিজাতীয় ভলকান (Vulcan), প্লুটো (Pluto), পোসিডন (Poseidon) প্রভৃতি দেবগণের পূজার ব্যবস্থা আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

জীবগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ জীব হইলেও, জগদীশ্বরের অনুকম্পায়—অনেক বিষয়ে অন্যান্য ইতর প্রাণীর বুদ্ধিপ্রাচুর্য্যের বা শক্তিবিকাশের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মিল্‌নে বলেন, ভূমিকম্পের অনতিপূর্ব্বে অনেক জন্তু মানবের অগ্রে সে বিষয় জানিতে পারে। এমন দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি পশুপক্ষী ভূমিকম্পের পূর্ব্বেই কলরব ও চীৎকার ধ্বনি দ্বারা তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেয়। মেক্‌সিকো দেশে 'ময়না' পক্ষী এইরূপে মানবজ্ঞানাগোচর ভূমিকম্পবার্ত্তা সূচিত করে। মধ্য আফ্রিকা প্রদেশে বন্য হস্তী ভূমিকম্প্র-সূচনা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া ভীষণভাবে অরণ্যমধ্যে পরিক্রমণ করিতে থাকে। আর সারমেয়কুল ভীষণ অশনি-পাতের গভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই নিরাপদ্‌ স্থানে আশ্রয়গ্রহণে তৎপর হয়, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

কালিফর্ণিয়া অঞ্চলে এক সময়ে লোকের এই ধারণা ছিল, জগতে রেলওয়ে-লাইন পাতা হই-বার পূর্ব্বে যত অধিক ভূমিকম্প হইত, এখন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত দেশের অধিকাংশ লৌহবর্ত্মাবিদ্ধ হওয়ায় আর ভূমিকম্পের তাদৃশ প্রকোপ নাই। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যে কারণ নির্দ্দেশ করিত, তাহা আরও অদ্ভুত! লৌহবর্ত্ম-প্রচলনের পূর্ব্বে ভূমিতলস্থ আভ্যন্তরিক বৈদ্যুতিক শক্তি এক স্থানে অধিকপরিমাণে সঞ্চিত হইবার অবকাশ পাইত; এখন লৌহবর্ত্মের সাহায্যে ঐরূপ সঞ্চয় অসম্ভব হইয়াছে; এখন এক স্থানে তাড়িতপ্রবাহ অধিক-মাত্রায় সঞ্চিত না হইয়া রীতিমত চলাচল হইতেছে। ফলে পূর্ব্বের মত তড়িৎ-চলাচলে আর সেরূপ বাধা নাই। সেই জন্য ভূমির মধ্যে তাদৃশ প্রকম্পন বা ভীষণ আলোড়ন সজ্বটিত হয় না। মোট কথা, ভূমিকম্প আভ্যন্তরিক তড়িৎপ্রবাহের অবাধ গতিবিধানের ফলে অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আভ্যন্তরিক তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই; বরং এই ঔপপত্তিক ধারণার উপর নির্ভর না করিয়া আমরা এই বলিতে পারি যে, এই পৃথ্বীতল সমগ্র তড়িৎ-শক্তির একটি সুবৃহৎ আধার। তড়িৎ-শক্তিকে ধরিয়া রাখিবার কোনও প্রকার বন্দোবস্ত না করিলে, অর্থাৎ তড়িৎ-চলাচলে বিশেষ বাধা প্রদান না করিলে, তড়িৎ-শক্তি স্বতঃই ক্ষিতিমধ্যে বিলুপ্ত হইবে। যে স্থানে তড়িৎশক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহার সহিত পৃথ্বীর সম্বন্ধ বা সংযোগ থাকিলে, উহা মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হইবে।

দুইটি পদার্থের ঘর্ষণে যেমন উষ্ণতার উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ দুইখানি মেঘের ঘর্ষণে তড়িৎশক্তি জন্মিয়া বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথ্বীতলে বিলীন হইয়া থাকে। এই ঘোর-নিনাদ-কারী কর্ণপটহভেদী গম্ভীরনির্ঘোষ অশনি পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যুৎ হইয়া অনেক সময়

চক্ষু ঝলসিয়া দিয়া থাকে। দুইখানি মেঘের ঘর্ষণে যেমন বজ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তেমনই একখানি ঘনকৃষ্ণবর্ণ নীরদজাল পৃথিবীর সন্নিকটে আসিলে তন্মধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক শক্তিভার ক্ষিতি-তলে ন্যস্ত করিবার কালে বজ্রপাত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এই বিদ্যুৎ-বিকীরণ ও তজ্জনিত আলোকের গতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া থাকে, এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের বা বৈদ্যুতিক শক্তির আদান-প্রদানকালে সমতা-লাভের সময় যে পরিমাণ উষ্ণতার উৎপত্তি হয়, তাহাতে সন্নিহিত বায়ুরাশির পরিসর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সহসা বিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া বজ্রের ন্যায় ঐরূপ মর্ম্মভেদী গম্ভীর নিনাদের সৃষ্টি করে। এখন কথা হইতেছে যে, বজ্রের উৎপত্তির কারণ যখন মেঘমধ্যস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি, তখন ঐ তড়িৎশক্তি মেঘমধ্যে সঞ্চিত হইল কিরূপে?

যখন বারিধিবক্ষ হইতে বারিদজাল সমুদ্ভূত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক জলকণা বিশাল বারিধিবক্ষ পরিহারকালে বিন্দুমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির আধার হইয়া উপরে উত্থিত হয়। পরে অন্য জলকণার সমষ্টির সহিত মিলিত হইয়া বৃহৎ বারিদরাশিতে পরিণত হয়, এবং প্রত্যেক জলকণাধৃত বৈদ্যুতিক শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বৈদ্যুতিক শক্তির স্বাভাবিক নিয়মবশতঃ—(এক স্থানে অধিকপরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকিবে না—সমতালাভের চেষ্টা করিবে)—এক স্থানের অধিক সঞ্চিত শক্তি স্বল্পশক্তিসম্পন্ন স্থানে প্রসারিত হইবার কালে ঘর্ষণে ঘর্ষণে বজ্রের সৃষ্টি করিবে। কখনও মেঘে মেঘে, আর কখনও বা মেঘে ও পৃথিবীতে এই শক্তির বিনিময় হয়। বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন দুইটি বস্তুরই আকর্ষণ লোকসমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত করিতে হইলে সাধারণতঃ গালার বাতিকে ঘর্ষণ করিয়া কাগজের টুকুরার সন্নিধানে ধরিতে হয়। কাগজকুচি গালার বাতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মিল্‌নে বলেন যে, সেইরূপ যদি একখণ্ড মেঘে বৈদ্যুতিক শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, ইংলণ্ডস্থিত সমুদয় কাগজখণ্ড তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকর্ষণশক্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহা সামান্যমাত্র হইলেও, সময়ে সময়ে তাহা দ্বারা অঘটন-ঘটন ঘটিতে পারে। যখন পৃথিবীর অবস্থা এমন ভাব ধারণ করে যে, অতি অল্প মাত্রায় বাহিরের শক্তির আকর্ষণফলে পৃথিবী নিজের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ঘনকৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ মেঘখণ্ড পৃথিবীর সন্নিকটে আগমন করিয়া তাহার পুঞ্জীভূত বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব পৃথিবীর উপর বিস্তার করিল। এ দিকে পৃথিবীর অবস্থা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শেষ বোঝা চাপাইলে যে অবস্থা হয়, সেই প্রকার হইয়া আছে। স্বাভাবিক অবস্থার ঈষৎ আন্দোলনে সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এই limting position বা অন্তিম অবস্থায় পৃথিবীর যে Strain হয়, তাহাতে বাহিরের অতি অল্প শক্তি ভূমির আন্দোলন বা প্রকম্পন উপস্থিত করিতে পারে। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে, ভগ্নোন্মুখ সাঁকোর উপর দিয়া কত ভারবাহী শকট চলিয়া গিয়াছে, তবু তাহা পড়িয়া যায় নাই। কিন্তু সারমেয়ের লঘু পাদবিক্ষেপে সমস্ত সাঁকো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেইরূপ পৃথিবী যখন ভূমিকম্পের 'নিদানে' উপস্থিত হইয়া কেবল অতি অল্পমাত্র বহিঃশক্তির অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় বারিদবক্ষো-নিহিত বৈদ্যুতিক আকর্ষণে ভূমিকম্পের আবির্ভাব হইবে, তাহা বিশেষ বিস্ময়প্রদ নহে।

ভূমিমধ্যে যে সমস্ত স্তর বিদ্যমান আছে, তাহার ধস্ ভাঙ্গিলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। Faulting ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন রসাতল-নিহিত দ্রব্যনিচয়ের অবস্থান্তরভেদে ভূমিকম্পের সূচনা হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপরে ভূমির এক স্থান যদি অধিক উচ্চ হয়, আর তাহার অব্যবহিত পরেই যদি গভীর খাদ থাকে, তাহা হইলে, উচ্চ ভূমি নিম্নের স্তরের উপর সমধিক চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে, আর পরবর্ত্তী খাদের দিকে তত চাপ দেয় না—সুতরাং এই চাপ-বিভিন্নতার নিম্নস্তরের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাইয়া এমন অন্তিম অবস্থা ধারণ করে যে, এই নিদানের (Strain) সময় বাহিরের স্বাভাবিক শক্তির সামান্য ব্যতিক্রমে সমস্ত উলট পালট ও চূর্ণ হইয়া যায়। ফলে ভূমিকম্পের ঈষৎ আন্দোলন হইতে ভীষণ আলোড়ন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয়।

মোট কথা, অশনিপাত ও প্রবল ঝটিকা ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও, পরোক্ষভাবে

তাহার উদ্ভাবনে অনেক সহায়তা করিতে পারে। এইরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাতের সহিত ভূমিকম্পের সূচনা অতি অল্পই সংঘটিত হইয়াছে। ইংলণ্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঝঞ্ঝাপাত বা অশনি-সম্পাতের মাত্রা অধিক হইলেও, ভূমিকম্পের সূচনা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কিন্তু জাপানে ভূমিকম্পের মাত্রা অনেক অধিক ; কিন্তু প্রবল ঝাটকা বা বজ্রপাত তত অধিক পরিমাণে ঘটে না। জাপানে এরূপ অধিকমাত্রায় ভূমিকম্প হইবার কারণ, ভূমিকম্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক যে মত, তাহার দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। জাপানের পূর্ব্বস্থিত প্রশান্তমহাসাগরের দিকের তীরভূমি হঠাৎ খুব নামিয়া গিয়াছে ; সুতরাং ঐ স্থানের ভূমি 'চরম' অবস্থায় রহিয়াছে। সামান্য নৈসর্গিক শক্তির বিকাশে ভূমিকম্প সংঘটনের অবকাশ সেই জন্য তথায় অধিক।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। প্রথমেই শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত 'তোমরা এবং আমরা' নামক একখানি রঞ্জিত চিত্র। পুরুষ-মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই ইউরোপের আমদানী। নারীমূর্ত্তিগুলি বাঙ্গালিনী। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 'ভারতী'র মন্দিরে 'দুর্ল্লভ' নিবেদন করিয়াছেন। কবি যখন আধ্যাত্মিক হন, তখন ভাষায় কিরূপ প্যাঁচ লাগে, 'দুর্ল্লভে' তাহার নমুনা আছে। রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—'অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব।' 'অনন্তের মধ্যে' মাথা তুলবেন, না, 'সঞ্চরণ' করবেন ? যদি অনন্তের মধ্যে মাথা তোলেন, তাহা হইলে কোথায় সঞ্চরণ করবেন ? রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। ঈথরে ? রবীন্দ্রনাথ তপস্যা, গায়ত্রী প্রভৃতির যে মৌলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব ও কবিত্বের বর্ণসঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও শেষে—ব্রহ্ম-লাভ করিল ! শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'জাগাও' কবিতায় 'হৃদয় মন্থন' আছে, 'নিবিড় ক্রন্দন' আছে,—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন প্যাটেন্ট—সেই 'গোপন মরম' ও 'গভীর মরম' পর্য্যন্ত বিদ্যমান। সব আছে, কেবল ভাব নাই। আর, অর্থ হয় না। শব্দের অর্থ হয়, শব্দ-সমষ্টির বক্তব্য কি, তাহাই বোধগম্য হয় না। কবির 'ক্রন্দন' যখন 'নিবিড়' হইতে থাকে, তখন কি অশ্রুজল 'কুল্পী' হইয়া যায় ? শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রামতনু লাহিড়ী' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'বর্ষাগমে' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি মনোরম। 'আদেশ-পালন' গল্পের লেখক শ্রীযুত 'পাঁচুলাল ঘোষে'র ছদ্মবেশ ধারণ করিবার কারণ কি ?—আখ্যানবস্তু অত্যন্ত সাধারণ, ছোট গল্পের উপযোগী নহে। গল্পের নায়ক কালো কনে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের ব্যয়ে বিলাতে গিয়াছিলেন, এবং শ্বেতদ্বীপে শ্বেতাঙ্গী ফ্লোরাকে ভালবাসিয়াছিলেন,—বিবাহিতা স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন,—'অন্ধকার' ওরফে 'অমাবস্যা' ! শেষে নায়ক ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে 'কালো বৌ' বেচারা মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। 'অন্ধকার' তাহার স্বামীকে একখানি ফটো পাঠাইয়া লিখিয়াছিল,—'তুমি আসিয়া আবার বিবাহ করো, আর এখানা পুড়াইয়া ফেলো।' নায়ক অন্ধকারের দুইটি আদেশই পালন করিলেন,—ফটোখানিকে বিবাহ করিলেন, এবং 'যে দিন পুড়িয়া ছাই হইবেন' সেই দিন ফটো খানি পুড়াইয়া সে আদেশ পালন করবেন, এই Heroic সঙ্কল্প করিয়া গল্প-লেখকের সুবিধা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এই 'থিয়েটারী' অনুতাপে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রাবণ সংখ্যায় এ নায়ককে যদি বিবাহিত দেখি, তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। 'অন্ধকারে'র দুঃখে চোখে জল আসে। হায় অন্ধকার ! 'তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।' শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত দেখা' চলনসই গল্প। লেখকের রচনায় মুদ্রাদোষ প্রবেশ করিতেছে—

'শীতটিও প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিল।' শীতকে 'টি' বখশিস্ করিবার কারণ কি? সৌরীন্দ্র বাবুও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে 'ঙ'-কে বিদায় দিয়া 'ঙ'-কে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছেন!

সুপ্রভাত। আষাঢ়। 'নানক-চরিত' চলিতেছে। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকারের 'ধর্ম্মের প্রকৃতি—অসীমের উপলব্ধি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পিতা' গল্পটির আখ্যানবস্তু অত্যন্ত পুরাতন—মান্ধাতার আমোল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাপকে 'বাপ' বলিতে যাহার লজ্জা করে, এমনতর জানোয়ার বাঙ্গলা দেশের এই বিরাট চিড়িয়াখানাতেও বিরল হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের প্রতি' চতুর্দ্দশপদী কবিতা-রূপ শব্দভেদী-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নমুনা এই,—

'ভক্ত তব কি আঁকিবে চিত্র আর কবি
চিত্ত মাঝে বিরাজিত বিচিত্র সে ছবি!'

কবি বুক চিরিয়া সেই ছবি দেখাইয়াছেন। সাধু! ভক্তির আতিশয্যে বঙ্গসাহিত্য টল টলায়মান। ভক্তি মন্দ নহে, অতিভক্তিও সহনীয়;—কিন্তু নির্ল্লজ্জ স্তব ত বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারত-মহিলা। আষাঢ়। শ্রীযুত গণনাথ সেনের 'শিশুর স্বাস্থ্য' মহিলাদিগের উপযোগী। শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্তের 'পূর্ব্ববঙ্গের উপাধিধারিণী মহিলাগণ' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুত গণপতি রায়ের 'জাপানের স্ত্রীজাতির রীতিনীতি' প্রবন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য নাই। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'জ্যোৎস্নায়' একটি কবিতা!

'কোথায় উড়ে গগন জুড়ে শত শত নীরবে!
স্বপন-হাঁস কত রে!'

কি উদ্ভট কল্পনা! সে কবিত্ব-ডিম্ব কি অদ্ভুত,—যাহা ফুটিয়া 'শত শত স্বপন-হাঁস' গগন জুড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়! কোন মানসী রাজহংসী এই ডিমে তা দিয়াছিল? কোন পাগলা-গারোদ-রূপ 'ইঙ্কুইবেটারে' এই বিরাট কবিত্ব-অণ্ড ফুটিয়াছিল? আর, এই কয় চরণে এত 'রে!' সবগুলা এক সঙ্গে জুড়িলে 'রে—রে—রে' ইত্যাকার বিকট ডাকাতে রহুঙ্কারে পরিণত হইতে পারে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় এত 'রে—রে—রে!' কবিবর! আপনি ঘৃতকুমারী ব্যবহার করুন।

সাহিত্য-সংহিতা। আষাঢ়। শ্রীযুত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের 'ভারতে গো-জাতির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায়চিন্তা' বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। 'জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী' উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী। আষাঢ়। প্রথমেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তদীয় মহিষীর সুরঞ্জিত চিত্র,—সুন্দর। ইহা 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র উদ্ভট উদগার নহে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুহাহিত' আধ্যাত্মিক প্রহেলিকা। সূচনায় দেখিতেছি,—"উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন,—"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি "গভীর"।' প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আরও 'গুপ্ত'—আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য দুঃখিত হইবার কারণ নাই। ঋষিরাই ত বলিয়া গিয়াছেন,—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' যে সকল তত্ত্ব গুহার অন্ধকারেই চিরকাল বিরাজ করিতেছে, তাহারা অনায়াসে ভাষার অন্ধকারেও বস-বাস করিতে পারিবে। শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গদেশীয় কতিপয় উদ্ভিদের বিচরণকাহিনী' মৌলিক অনুসন্ধানের ফল। নিবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ, সুখপাঠ্য। শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যালের 'মোগল রাজত্বে চিত্রকলা' চন্দনসই সঙ্কলন। শ্রীযুত হরগোপাল দাস কুণ্ডুর "বগুড়ায় বৌদ্ধযোগী" উল্লেখযোগ্য।—শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতীয় চিত্রকলা' প্রবন্ধে সাহিত্য-সম্পাদককে অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়া যে অগাধ বিদ্যা ও বিপুল সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন, এবার স্থানাভাবে তাহার আলোচনা করিতে পারিলাম না।

ধীমানের ভাস্কর্য্য।

মনের ভাব প্রকাশিত করিবার জন্য মানুষ অনেক রকমের কৌশল বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাকে স্থায়িত্ব-প্রদানের আশায় পুরাকালে যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র তন্মধ্যে একশ্রেণীর কৌশল বলিয়া কথিত হইতে পারে। তাহাও ভাষা; কেন না, তাহাও "ভাষতে অনয়া লোকঃ"—এই নিরুক্তির অন্তর্গত। সুতরাং পাষাণে যে সকল কারুকার্য্য ও মূর্ত্তিচিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাকেও ভাষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহারও ব্যাকরণ আছে, রচনারীতি আছে, অলঙ্কার আছে;—পদ্য গদ্যেরও অসদ্ভাব নাই। যাঁহারা অক্ষরযোজনা করিয়া কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সে কালের একমাত্র কবি ছিলেন না;—যাঁহারা বাটালি চালাইয়া পাষাণফলকে চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কবিপদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহাদের নাম গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—অনেক স্থলে তাঁহাদের কাব্য-কাহিনীও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহাদের ও তাঁহাদের এই শ্রেণীর কাব্যসৌন্দর্য্যের কিছু কিছু নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

আমাদের চতুষ্পাঠীতে "অভিজ্ঞানশকুন্তলে"র বড় আদর ছিল না;—বরং "অনর্ঘরাঘবে"র ও "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র কিছু কিছু আদর থাকিবার পরিচয় টীকা-টিপ্‌পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে একটি প্রবচন প্রচলিত ছিল,—

"রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্?"

রঘুবংশ আবার কাব্য, তাহাও আবার পাঠ্য নাকি?—এই প্রবচন-বাক্যেই আমাদের দেশের এক সময়ের সমালোচকবর্গের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিলেন,—গেটে তাহার প্রশংসাবাদে পাশ্চাত্য আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া দিলেন;—আমাদের কালিদাস এইরূপে যখন জগতের কালিদাস হইলেন, তখন আমাদেরও নাসিকা-কুঞ্চনের নিবৃত্তি হইয়া গেল। ভাস্কর্য্য এখনও

সম্পূর্ণরূপে এই নাসিকা-কুঞ্চনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের ভাস্কর্য্য আবার ভাস্কর্য্য,—তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান করিয়া কি হইবে? এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হইতে আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। এ সময়ে আমাদের ধীমান্‌কে আমাদের পক্ষে চিনিয়া লইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুত হাভেল্ তাঁহাকে চিনাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই;—কেবল প্রসঙ্গক্রমে সেই মহাকবির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এক শ্রেণীর প্রাচ্য ললিতকলা পাশ্চাত্য প্রদেশেও প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তাহার মূলপ্রকৃতির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া, সুযোগ্য সমালোচকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন,—তাহা যতই সুন্দর হউক, এক ছাঁচে ঢালা। সেই ছাঁচটি কত পুরাতন,—কোথা হইতে সংগৃহীত, তাহারও অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তাহার ভাব—তাহার ছন্দঃ—তাহার রচনাকৌশল—এক স্থান হইতে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

সে স্থান কোথায়? তাহা আমাদিগেরই গৃহের কোণে,—বরেন্দ্রের এক নিভৃত নিকেতনে,—পাল নরপালগণের বিজয়রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে! তাহা মহাকবি ধীমানের জন্মভূমি,—বাঙ্গালীর গৌরব-ক্ষেত্র। সাহিত্যে "বরেন্দ্র প্রস্তর" সম্বন্ধে হেমস্বামীর মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইবার সময়ে ধীমান্ "নৃপতি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। যাঁহাদের রাজ্য কতকগুলি পরগণার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু ছিল বলিয়া গৌরব লাভ করিতে পারে না, তাঁহারা যদি রাজা বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে পারেন, তবে ধীমান্‌কে রাজাধিরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। ধীমান্ কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কোনও ভূমিখণ্ডের করসংগ্রহকার্য্যেও ব্যাপৃত ছিলেন না। তিনি মানব-মনের উপর ভাস্কর্য্যের রচনাকৌশলের যে মোহজাল বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। নেপাল, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে তাঁহারই রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছিল;—তাঁহারই কলালালিত্যবিকাশকৌশলে প্রাচ্য শিল্পের প্রবল গৌরব পাশ্চাত্য [illegible] প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধীমান্ কে ছিলেন, সে কথা কেবল একখানি [illegible] উল্লিখিত

আছে। তাহা এক জন বাঙ্গালী বৌদ্ধ শ্রমণের লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সন্ধানলাভের উপায় নাই। ধর্ম্মপ্রচারে উত্তরাখণ্ডে গমন করিয়া শ্রমণরাজ তদ্দেশের ভাষাতেই সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাহার একাংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। * তাহাতেই প্রসঙ্গক্রমে শিল্পের কথা,—তাহার সঙ্গে ধীমানের কথা, লিখিত হইয়া রহিয়াছে। এই বাঙ্গালী শ্রমণের নাম তারানাথ। তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যেও সুপরিচিত।

শ্রীযুত হাভেল্ লিখিয়াছেন—"বেহার ও ওড়িসার নানা স্থানে যে সকল ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা ধরিয়া আরও তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিলে, ধীমানের ও তাঁহার পুত্রের রচনা-রীতির পরিচয় আবিষ্কৃত হইতে পারে।" † বরেন্দ্র প্রদেশে এখনও যে অসংখ্য ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কথা এ পর্য্যন্ত সম্যক্ আলোচিত হয় নাই বলিয়াই, এরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইবার অবসর লাভ করিয়াছে। ধীমানের জন্মভূমি এখনও তাঁহার রচনাকৌশলের নানা নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে কালযাপন করিতেছে। বরেন্দ্রতত্ত্বানুসন্ধান-সমিতি তাহারও অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। যথাকালে তাহার ফল প্রকাশিত হইবে।

এই সকল ভাস্কর্য্যকীর্ত্তিও যে ইতিহাসের উপাদান,—তাহা এখন সকল দেশেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু এই শ্রেণীর উপাদানের আলোচনা-কার্য্যেও যে স্বাধীন তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে, সে কথা অস্মদ্দেশে এখনও ভাল করিয়া স্বীকৃত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। এখনও পুস্তকালয়ে বসিয়া সুধীগণের কল্পনা জল্পনা পাঠ করিয়া, তাহারই একাংশের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি প্রবল রহিয়াছে। অনেকেই ভাস্কর্য্যকীর্ত্তির সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ হইলেও, অল্প লোকেই স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধানের ক্লেশস্বীকারে সম্মত। তজ্জন্য

---

* Last Chapter of Taranath's History of Budhism—translated by W. T. Heeley c. s., published in the Indian Antiquary Vol. IV. p. 101.

† Further research among the sculptures scattered about Behar and Orissa might lead to the identification of Dhiman's and Bitpalo's work.—Havell's Indian Sculpture and Painting, p. 79.

কেহ আমাদের ভাস্কর্য্যের মধ্যে মাগধ-শিল্পের, কেহ বা চীন শিল্পাদর্শের চিহ্ন আবিষ্কৃত করিতেছেন! আমাদের যাহা কিছু ছিল, বা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার কোনও কিছুর মধ্যেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না,—এই ধারণাই বাঙ্গালীর ইতিহাস-সংকলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। বহু বিষয়ে বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃত সমালোচনা আরব্ধ হয় নাই। এই সকল বিষয়ের মধ্যে বরেন্দ্র-ভাস্কর্য্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বরেন্দ্র-দেশ বড় পুরাতন দেশ,—পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত,—অতি পুরাকাল হইতে বিবিধ শিল্পকৌশলের জন্য ভারতবিখ্যাত ছিল। এই প্রদেশে নানা যুগের, নানা শ্রেণীর ভাস্কর্য্যকৌশলের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ধীমানের রচনাকৌশলের বিশেষত্ব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারিলেই, এই সকল ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির মধ্যে ধীমানের কীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা অনায়াস-সাধ্য হইতে পারে। সে বিশেষত্ব আমরা কিরূপে জানিতে পারিব,—তাহাই এখনকার প্রধান জিজ্ঞাসার কথা। যাঁহারা প্রস্তর-শিল্পের বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশিত করিলে, তথ্যানুসন্ধানের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। তাঁহারা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? আর কিছু না হউক, অনেক রচনাজঞ্জাল হইতে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

স্বায়ত্তশাসনের সুখ।

১

শ্রীযুক্ত ধিনিকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী রাজীবলোচনপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ৺মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কারের পৌত্র ও ৺বিশ্বরূপ বিদ্যাবাগীশের পুত্র। বিদ্যা-বাগীশ তাঁহার এক মাতুলের প্রায় দুই শত ঘর যজমান পাইয়াছিলেন; কিন্তু টোলে ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিয়া তিনি এমন অবসর পাইতেন না যে, পূজা পার্ব্বণে যজমানগুলির বাড়ীতে দুটি ফুল ফেলিয়া আসিয়া তাহাদের মন রক্ষা করেন। তিনি তাঁহার ছাত্রগণের দ্বারা এই সকল বেগার শেষ করিতেন। সিধাপত্র নৈবেদ্যাদি যাহা পাওয়া যাইত, ছাত্রেরা তাহা উদরে নিক্ষেপ

করিত; শাঁখা, শাড়ী, বা থালা বাটী যাহা লভ্য হইত, তাহা গুরুপত্নীর 'ঝাঁপা'য় উঠিত। সেই ঝাঁপায় বিশ্বরূপ-পত্নী সংসার-খরচের তেল হইতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি পর্য্যন্ত—সংসারের সকল সামগ্রীই পুরিয়া রাখিতেন। একবার যজমানবাড়ী হইতে আগত আধ সের নূতন গুড়ের মণ্ডা এক মাস কাল তিনি এই ঝাঁপায় পুরিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা পাঠাইয়া পূজার সময় তিনি জামাইবাড়ীর তত্ত্ব সারিবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক,—হয় আর এক; দুই সপ্তাহ পরে ব্রাহ্মণী এক দিন চর্ম্মাবৃত বেতের ঝাঁপা খুলিয়া দেখেন, মূষিকবৃন্দ ঝাঁপার নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া গুড়ের মণ্ডাগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; এবং উদারতাবশতঃ তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ গুটী রাখিয়া গিয়াছে!—জীবনে সেই প্রথম দিন পত্নীর সহিত বিশ্বরূপের কলহ হইয়াছিল। ঝাঁপাটি বিশ্বরূপের প্রপিতামহ ৺লোকনাথ তর্কপঞ্চানন সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের জননীর শ্রাদ্ধের সময় বস্ত্রাদি সহ দক্ষিণা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহা যাদুঘরে আসনলাভের যোগ্য হইয়াছিল।

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর ধিনিকৃষ্ণ সংসার অন্ধকার দেখিলেন। পিতা গলায় একখানি দুর্ব্বহ পাষাণ বাঁধিয়া তাঁহাকে ভবের মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ধিনিকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। ধিনিকৃষ্ণ বাল্যকালে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেন বলিয়া পিতামহী আদর করিয়া তাঁহাকে এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। নামটির জন্য তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করিতেন।—আমাদের দেশের অনেক রাজা বা রায়বাহাদুর উপাধিলোলুপ জমীদার যেমন গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতাদান করিতেছেন, ধিনিকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে ধনকৃষ্ণ নাম-গ্রহণের জন্য তাঁহার সেরূপ কোনও আয়োজনের সুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু যদি কেহ বলিত, "ধনকৃষ্ণ ভাই, আমার গরুটা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি করি বল ত?" তাহা হইলেই মাঘের শীতেও ধিনিকৃষ্ণ গলিয়া জল হইতেন, বলিতেন, "কৈ, দড়ী দাও।" ধিনিকৃষ্ণ দড়ী লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গরু ধরিয়া আনিতেন।—এই একটি নহে, এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইয়া ধিনিকৃষ্ণের ব্রাহ্মণী শ্যামমোহিনী তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্যামমোহিনী মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিয়া বলিত, "দু' পয়সা রোজগারের 'খ্যামতা' নেই, অলপ্পেয়ে মিন্‌সে—বিয়ে করেছিলি কেন?" ধিনিকৃষ্ণ মহাপণ্ডিতের পুত্র হইলেও কখনও কাব্যামৃতের আস্বাদন

লাভ করেন নাই ; গৃহিণীর অনুগ্রহে তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ বাক্যামৃতেই পরম পরিতৃপ্ত হইতেন।

ধিনিকৃষ্ণের পিসী পদ্মঠাকুরাণী তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন নাই। ধিনিকৃষ্ণের দাদা মথুরানাথ মুগ্ধবোধের প্রথম সূত্র মুখস্থ করিয়াই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল। তাই পিসীমা বলিতেন, ওর লেখাপড়া সহিবে না।—বিদ্যাবাগীশ রাগ করিয়া কোনও কোনও দিন বলিতেন, "পণ্ডিতের ঘরে গণ্ড-মূর্খ হলো, হতভাগাটা খাবে কি করে?" ধিনিকৃষ্ণ এক গাল হাসিয়া বলিতেন, "বাবার কি বুদ্ধি! টোলে পড়িয়ে পড়িয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে! আমার যেন হাত নেই, আমি যেন ঠুঁটো জগন্নাথ! তাই খাব কি করে' ভেবেই বাবা অস্থির! বুদ্ধি থাকলে আর মানুষে টোল করে না।"—যাত্রার দলে বক্তৃতার পর জুড়ীরা যেমন গান মুখে করিয়া উঠে—

"হরি হে গতি এই কি তার?
যে জন বিপদ্-তারণ মধুসূদন ডাকে বার বার!"

পিসীমাও সেই ভাবে ধিনিকৃষ্ণের বক্তৃতা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন, "হুশো ঘর যার যজমান, তার খাবার ভাবনা! ধিনিকেষ্ট সত্যই বলেছে, টোলে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে!"

বিদ্যাবাগীশ নিরুপায়ভাবে তাঁহার দীর্ঘ টিকিটি ধরিয়া দুই হস্তে তন্মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতেন।

২

পিসীমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল। ধিনিকৃষ্ণ বারবার ব্রাহ্মণীর গঞ্জনায় এবং সংসারে খাদ্যসামগ্রীর অভাব দেখিয়া একদিন এক দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া বসিলেন। ঝাঁপা হইতে 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'খানা বাহির করিয়া দিন কয়েক নাড়া চাড়া করিলেন। পরে স্বয়ং পৌরোহিত্য আরম্ভ করিলেন।—স্ত্রীসমাজে জনরব উঠিল, "না হবে কেন? বিদ্যাবাগীশের ছেলে, সরস্বতী সহায় আছেন, পণ্ডিতের বংশ! সমস্ত পাঁজীখানাই ওর মুখস্থ।"

কিন্তু পৌরোহিত্যে বড় ক্যাসাদ!—পরের জন্য সারাদিন উপবাস করিতে হয়, মেজাজ ভাল থাক না থাক, শরীর উঠুক আর না উঠুক—ষষ্ঠী সুবচনীতে যজমান-বাড়ী গিয়া একবার আসনে বসিতে হইবেই। চট্ করিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহা অপেক্ষা 'কন্‌ট্রাক্‌টারি' কাজ অনেক ভাল। সেবার রাজীব-লোচনপুরের মধ্য দিয়া রেল যাইতেছিল ; রাজাঃ-লোচন-্রের কণ্ট্রাক্টর

সর্ব্বেশ্বর বাবু কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে বেশ দু' পয়সা পাইয়াছিলেন। পুরোহিত ধিনিকৃষ্ণ (বিস্তর চেষ্টাতেও ধনকৃষ্ণ নামে পরিগণিত হইতে পারেন নাই) সংকল্প করিলেন, তিনিও কণ্ট্রাক্টর হইবেন।

গ্রামের লোকের কাণে যখন এ কথা উঠিল, তখন সকলে বলিল, "ধিনিকেষ্টাটা ক্ষেপেছে! দাও, ওকে পাগ্‌লা-গারদে!" ভজহরি দত্ত গোকুল দত্তের দোকানে ডাবা হুঁকায় অম্বুরী তামাক পরিপাক করিতে করিতে বলিলেন, "এত বড় পণ্ডিতের ছেলে পাগল হোল, ঘোর কলি!"

ধিনিকৃষ্ণ একদিন অনেক মতলব ভাঁজিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রধান যজমানের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। এই যজমানটির নাম বাবু নন্দলাল মিত্র, তিনি মহকুমার উকীল;—বি. এল্. উপাধিধারী হইলেও তিনি তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বান্ মুন্সেফের আদালতে ওকালতী করিতেছেন। তিনি রাজীবলোচনপুরের মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্। গ্রামের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। তিনি স্বদেশীটাকে 'ছেলেমানুষী' মনে করেন।—তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "এক তাড়ায় যাহারা স্বদেশী ছাড়ে, তাহাদের স্বদেশীর বিড়ম্বনা কেন?" লোকটি ধীর, শান্ত, বিনয়ী, সুপণ্ডিত; কর্ত্তৃপক্ষকে খুসী করিতে অদ্বিতীয়। যে সকল গুণ থাকিলে একালে লোক 'রাইজ্' করিতে পারে, ভগবান্ তাঁহাকে সেই সকল গুণ প্রদান করিয়াছিলেন। 'মুন্সেফী' লইলে এত দিন তিনি সদরালা হইতে পারিতেন। কিন্তু "কুকুরের মাথা হওয়া ভাল, সিংহের ল্যাজ হওয়ায় ভাল নয়," এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া তিনি বিদেশে হাকিমী করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে ওকালতী করিতেছেন। গ্রামে নন্দলাল বাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তি, ঢিশক-নাম!

কাছারীর কাজ শেষ করিয়া নন্দলাল বাবু সট্‌কায় মুখ দিয়া কিঞ্চিৎ আরাম উপভোগের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় ধিনিকৃষ্ণ একখানি কাল চাদর গলায় জড়াইয়া খালি পায়ে ফরাসের এক পাশে উপবেশন করিলেন।

একটা বড় জিদের মামলা জিতিয়া নন্দলালের মনটা কিঞ্চিৎ সরস ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ধিনিকৃষ্ণ, তুমি নাকি কণ্ট্রাক্টরের কাজ করবে?"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "সেই কথা মনে করেই ত আপনার কাছে এসেছি।

আপনারই খাচ্ছি, আর কার কাছে যাব ?—পুরুতগিরি করা বড় ফ্যাসাদ ! মন্তর টন্তর মুখস্থ নেই, বড় গোলযোগ ঠেকে।"

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম গোলযোগ ?"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "সে দিন মজুমদার-বাড়ী কার্ত্তিকপূজা কর্ত্তে বসে সত্যনারায়ণের পূজোর মন্ত্র বলে ফেলেছিলাম।"

নন্দলাল বলিলেন, "ও কেবল মনের ভুল, সবই এক।"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু আপনাদের বাড়ী লক্ষ্মীপূজো কর্ত্তে এসে যদি সুবচনীর মন্ত্র বলি, তা হ'লে মা ঠাকুরাণী আর আমাকে পূজো কর্ত্তে দেবেন না।"

নন্দলাল বলিলেন, "কণ্ট্রাক্টরী কাজ করবে, টাকা ?"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "টাকা আপনার, খাটুনী আমার।"

নন্দলাল, "টাকা কড়ি যদি ভাঙ্গো ?"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "রাধা মাধব ! উকীলের টাকা আমার গো-রক্ত। এমন অধর্ম্মের পয়সা খেলে আমি যে নির্ব্বংশ হ'ব।"

অনেক আন্দোলনের পর স্থির হইল—কণ্ট্রাক্টরের কাজে ইট চাই। ইট কিনিয়া কাজ করিলে বিশেষ লাভ হইবে না। নন্দলাল ধিনিকৃষ্ণকে ইট করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর তহবিল হইতে দুই শত টাকা কর্জ্জ দিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের টাকা বিনা বন্ধকে দেওয়া উচিত নহে, সেই জন্য ধিনিকৃষ্ণ তাঁহার পৈতৃক ভিটা মায় দালান নন্দলালের স্ত্রীর নিকট বন্ধক রাখিলেন।

৩

দুই শত টাকায় ধিনিকৃষ্ণের পঞ্চাশ হাজার ইট পুড়িল। পূর্ব্বে যাহারা ধিনিকৃষ্ণকে পাগল মনে করিয়াছিল, তাহারা তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া দুশ্চিন্তায় পাগল হইল।

ধিনিকৃষ্ণের প্রতিবেশী হরবল্লভ ঘোষ এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়া গ্রাম্য মাইনর স্কুলের মাষ্টারী করিত। কিন্তু মাইনর স্কুলের বারো টাকা বেতনে তাহার সংসার চলিত না। সে তাহার মামাতো ভাইয়ের খুড়শ্বশুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ নন্দ বাবুর বাড়ী দুই বেলা ধরণা দিতে আরম্ভ করিলে, নন্দবাবু তাহাকে মিউনিসিপালিটীতে ট্যাক্স-দারোগার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পনের টাকা বেতন হইলে কি হইবে, উপরিলাভ বিলক্ষণ দশ টাকা ছিল। মিউনিসিপালিটী হইতে যেবার রাজীবলোচনপুরে একটি

পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল, সেইবার উপরি আয়ে হরবল্লভ "দারোগা"র মেটে বাড়ীখানি অট্টালিকায় পরিণত হয়। রাজীবলোচনপুরে প্রতি বৎসর দুই একটি ইঁদারা হইত; পল্লীবাসিগণের জলকষ্টনিবারণের জন্যই এই অনুষ্ঠান। প্রত্যেক ইঁদারায় তিন শত টাকা ব্যয় হইত। হরবল্লভ তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা বাঁচাইত। মিউনিসিপালিটীর চাকরী করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই হরবল্লভের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল।

ইটগুলি পুড়িলে ধিনিকৃষ্ণ একদিন সন্ধ্যার পর হরবল্লভের বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; কথায় কথায় বলিল, "দাদা ম'শায়, আপনার ভরসাতেই খানকত ইঁট পোড়াইয়াছি। চেয়ারম্যান্ বাবুর কাছে শুনিলাম, আপনারা মিউনিসিপালিটীর রাস্তা মেরামতের জন্য কিছু ইট কিনিবেন; আমার কাছে কতক ইট লইলে ক্ষতি কি?"

হরবল্লভ নাকের উপর হইতে চশমা যোড়াটা খুলিয়া কাপড় দিয়া তাহা পরিষ্কার করিল। কোনও গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় এরূপ করা হরবল্লভের অভ্যাস।

চশমা পুনর্ব্বার চোখে আঁটিয়া হরবল্লভ বলিল, "ক্ষতি কি বলিতেছ? ক্ষতি কিছুই নাই, কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি, তাই বল।"

ধিনিকৃষ্ণ বলিল, "লাভ আর আপনাকে কি দিতে পারি? আমার সে সাধ্যই বা কি? আমি পুরোহিত, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব, আমার ইটগুলির একটা গতি করিয়া দিতেই হইবে।"

হরবল্লভ বলিল, "ঠাকুর! তুমি বড় সরল লোক, কিন্তু এ কলিকালে ব্রাহ্মণের ফাঁকা আশীর্ব্বাদের কোনও মূল্য নাই। তা আমি তোমার ইট লইতে রাজি আছি, কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। বাজারে আজকাল ভাল ইটের দর দশ টাকা হাজার, কিন্তু আমা (অল্প পোড়া) ইট ও 'ছাল্‌টে'র দর সাত টাকার বেশী নয়। রাস্তার জন্য চল্লিশ হাজার ইট চাই; তুমি ভাল ইট পনের হাজার ও আমা ইট দশ হাজার দিবে।"

ধিনিকৃষ্ণ বলিলেন, "এ ত পঁচিশ হাজার হইল, আর পনের হাজার?"

হরবল্লভ বলিল, "সেই কথাই বলিতেছি। তুমি পনের হাজার পাকা ইটের দর দশ টাকা হিসাবে দেড় শত টাকা পাইবে, আমা ইটের দর সাত টাকা হিসাবে দশ হাজারে ৭০৲ টাকা পাইবে; সর্ব্বসমেত এই দুই শত

কুড়ি টাকা পাইবে। কিন্তু তুমি বিল করিবে চল্লিশ হাজার পাকা ইটের বাবদ চারি শত টাকার। দুই শত কুড়ি টাকা বাদ এক শত আশী টাকা আমাকে ফেরত দিবে, বুঝিয়াছ?"

ধিনিকৃষ্ণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হরবল্লভের বুদ্ধির পরিচয়ে তাঁহার তাক্ লাগিয়া গেল! তিনি বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা, কিন্তু গুণ্‌তিতে ইট কম পড়িলে আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে যে।"

হরবল্লভ বলিল, "কোনও ভয় নাই। আমার সরকার নিধিরাম ইট গণিয়া লইবে, পঁচিশ হাজারেই সে চল্লিশ হাজার গণিয়া লইতে পারিবে।"

ধিনিকৃষ্ণের সহিত বন্দোবস্ত শেষ লইয়া গেল। রাজীবলোচনপুরে অনেক গরুর গাড়ী। হরবল্লভ বঙ্কু ঘোষকে ডাকাইল। বঙ্কু গাড়োয়ানের সর্দ্দার, তাহার হাতে অনেক গাড়ী।

বঙ্কু আসিলে হরবল্লভ বলিল, "বঙ্কু! রাস্তা মেরামতের জন্য ধিনিকৃষ্ণ ঠাকুরের পাঁজা হইতে কতকগুলি ইট বহিতে হইবে; হাজারকরা কত ভাড়া নিবি?"

বঙ্কু বলিল, "ঠাকুরের পাঁজা একটু টানা পাল্লায়, হাজারকরা এক টাকার কমে পারিব না। কত হাজার ইট?"

হরবল্লভ বলিল, "হাজারকরা বার আনার বেশী হবে না। বিল করিলেই টাকা, টাকার ভাবনা নাই। পঁচিশ হাজার ইট আনিতে হইবে, এক টাকা হিসাবে বিল করিবি, আর চল্লিশ হাজারের বিল হইবে। গাড়ীতে দু' শো আনিয়া তিন শো বিশখানা লিখাইয়া দিবি। ইট গণিয়া লইবার ভার নিধিরামের উপর, সে খুব পাকা সরকার, গুণ্‌তিতে ভুল করিবে না। চল্লিশ হাজারে চল্লিশ টাকা বিল করিস্। তোর পাওনা হইবে হাজারকরা বার আনা হিসাবে পঁচিশ হাজারে ১৮৸৽ পৌনে উনিশ টাকা। তুই কিছু মজুরী পাইবার আশা রাখিস্, কুড়ি টাকা পুরাপুরি তোকে দিব। বাকী কুড়ি টাকা আমার।"

ইটে কুড়ি টাকা কম ছিল, গাড়ীভাড়ায় তাহা উঠিয়া গেল। রাস্তা মেরামতের জন্য ইট খরিদ বাবদ হরবল্লভের দুই শত টাকা থাকিল। রাস্তা মেরামত করিতে কুলী খাটাইতে হরবল্লভের কি পরিমাণ উপরি পাওনা হইল, আমরা এখন পর্য্যন্ত তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতে পারি নাই।—হরবল্লভ একদিন জ্ঞানবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "এবার ঠাকুরের কাছে যে

ইট জওয়া গিয়াছে, এমন ইট বহুকাল পাওয়া যায় নাই। ইট যেন হিঙ্গুলের বর্ণ!"

চেয়ারম্যান্ বাবু পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, পুরুত ঠাকুরের ইট ভাল পুড়িয়াছে জানি, তাই ত উহার ইট লইতে বলিয়াছিলাম। অনুগত ব্রাহ্মণ, উপকার করাই কর্ত্তব্য। আমাদের ত কোনও ক্ষতি নাই; ইটগুলি বেশ ভাল করিয়া গণিয়া লইতেছ ত?"

হরবল্লভ বলিল, "আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গণিয়া লই, মিউনিসিপালিটীর একটা পয়সা—আমার কাছে যেন—রাম রাম!"

৪

ধিনিকৃষ্ণের পাঁজা হইতে মিউনিসিপালিটীর জন্য চল্লিশ হাজার ইট গেল। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে পাঁজায় তখনও পঁচিশ হাজার রহিল!

ধিনিকৃষ্ণ ইট প্রস্তুত করিবার জন্য জমীদারের নিকট পঁচিশ বিঘা জমী মৌরসী করিয়া লইয়াছিলেন। ইট প্রস্তুতের জন্য মাটী কাটায় যে গর্ত্ত হইল, তাহা তিনি এমন কৌশলে কাটাইতে লাগিলেন যে, কিছুকালের মধ্যেই একটি পুষ্করিণী হইবে, এরূপ সম্ভাবনা ঘটিল। ইট গণিয়া দিবার জন্য 'পাঁজা খোলায়' লোক রাখিতে হইত; কূপও কাটাইতে হইয়াছিল। ধিনিকৃষ্ণ পাঁচ বিঘা জমীতে একটি বাগানের সূত্রপাত করিলেন! নানা স্থান হইতে আম লিচু কুল প্রভৃতির কলম সংগৃহীত হইতে লাগিল। বাগানের ধারে ধারে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল; তাহাদের ছায়ায় আনারসের চারা দেওয়া হইল। ডালিম, পেয়ারা, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষেরও অভাব হইল না। গ্রামবাসিগণ ধিনিকৃষ্ণ ঠাকুরের বুদ্ধির পরিচয়ে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; সকলেই বুঝিল, তাঁহার কপাল খুলিয়া গিয়াছে। কাজের ঝঞ্ঝাটে ধিনিকৃষ্ণকে পুরোহিতের পেশা ত্যাগ করিতে হইল। কয়েক বৎসরেই ধিনিকৃষ্ণ ফাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার উদরটি বর্ত্তুলাকার হইল, মাথায় টাক পড়িল। পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর খোড়ো ঘর ছিল। ধিনিকৃষ্ণ যেবার দুই লক্ষ ইট পোড়াইল, সেইবার মিউনিসিপালিটীর অট্টালিকা হইল।

চল্লিশ হাজার ইটে যে পথ মেরামত হইল, বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই সে পথে বর্ষার জল জমিতে লাগিল। এক দিন দুর্য্যোগের রাত্রে স্থানীয় সবডেপুটী ঘনশ্যাম বাবু কোনও বন্ধুগৃহ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেছিলেন; তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল; চোখে আঙ্গুল দিলে দেখা যায় না, এমন

অন্ধকার! রাজপথে স্থানে স্থানে জল জমিয়াছে, পথের উপর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। চলিতে চলিতে সেইরূপ একটা গর্ত্তে ঘনশ্যামের পা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি "পপাত ধরণীতলে!"—টুকিনের ভিতর হইতে আরম্ভ করিয়া দাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত মিউনিসিপালিটীর মূলবান্ কর্দ্দম প্রবেশলাভ করিল। একটি বন্ধু সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি ঘনশ্যামকে টানিয়া তুলিলেন। ঘনশ্যাম কাতরস্বরে বলিলেন, "যত চোর মিউনিসিপালিটীতে এসে জুটেছে, ছ' শো টাকা দিয়ে সে দিন রাস্তা মেরামত হ'লো—রাস্তার অবস্থা দেখ,—পাখানা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে!"

বন্ধু বলিলেন, "মিউনিসিপালিটী চোরের আড্ডা, তা জান, কিন্তু প্রকাশ্যে এ কথা কখনও বল্‌তে সাহস করেছ কি? ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসেন, কমিশনর আসেন, তাঁদের কাণে কথাটা তুলেছ কি? আজ আছাড় খেয়েছ, তাই রাত দুপুরে সত্যি কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে!"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "প্রমাণ কর্ত্তে পারুলে বল্‌তাম কি না দেখ্‌তে পেতে। মিউনিসিপালিটীর কথা নিয়ে আন্দোলন কর্ত্তে গেলেই চেয়ারম্যান্ নন্দ বাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ফকিরুদ্দীন মিঞা চটে লাল হন! আমরা তিন দিনের জন্য চাকরী কর্ত্তে এসেছি, এ সব হাঙ্গামায় আমাদের দরকার কি ভাই? গ্রামের দশ জনের টাকা দারোগা হরবল্লভ কতক খাক, চেয়ারম্যানের পুরোহিত ধিনিকৃষ্ণ ঠাকুর কতক খাক, গ্রামের লোক যদি এ সব দেখেও না দেখে, তবে আমাদের কথা কহিবার দরকার?"

বাবু বলিলেন, "তোমরা হাকিম মানুষ, তিন দিনের জন্যে এখানে এসে উচিত কথা বল্‌তে ভয় পাও, আর আমরা বাসিন্দে, বিপদে আপদে নন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে দাঁড়াতে হয়, মিউনিসিপালিটীর ন্যাজে হাত দিয়ে কি তাঁর কোপদৃষ্টিতে পড়তে পারি?"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "ইহাই স্বায়ত্তশাসনের সুখ! এমন স্বায়ত্তশাসনের মুখে আগুন!"

বাবুদ্বয় রাজনীতির চর্চ্চায় কর্দমাক্ত রাজপথে সিক্তদেহ গরম করিয়া তুলিলেন

৫

গ্রামে মহা আন্দোলন উপস্থিত।

মিউনিসিপালিটীর নূতন এসেসমেণ্ট আরম্ভ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর

খরচ অনেক, একটি চেরিটেবল ডিস্পেন্সারীকে পুষিতে হয়; বৎসরের মধ্যে দুই তিনটি কাঁচা রাস্তায় মাটী ফেলিতে হয়, পাকা রাস্তাটিও মেরামত করা দরকার; পুষ্করিণীর ধারে একটা ঘাট সান-বাঁধানো না হইলে চলিতেছে না। ইঁদারা-খনন প্রতি বৎসরই আছে, রাজপথে গোটা কত লোহার আলোকস্তম্ভ না পুঁতিলে নয়, আর একখানি ময়লা-ফেলা গাড়ীরও আমদানী করিতে হইবে; পথের ময়লা গাড়ীতে তুলিয়া দূরে না ফেলিলে মিনিসিপ্যালিটীর গৌরব-বৃদ্ধি হইবে কিরূপে? সুতরাং এবার ট্যাক্স বাড়াইতে হইবে।

ট্যাক্স বাড়াইবার ভার তিন জনের উপর পড়িল। তন্মধ্যে মোক্তার হেজাজতুল্লা মুন্সী ও প্রাণবল্লভ বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। যে সকল কাজে ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া যায়, প্রাণবল্লভ বাবু সেই সকল কার্য্যে বড় তৎপর। তিনি জমীদারের সন্তান, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মাসে পনেরটি দেওয়ানী মামলা লাগিয়া থাকে; বাদী নহেন,তিনি প্রতিবাদী! তিনি মিউনিসিপালিটীর এক জন কমিশনর।

উকীল রামদুর্ল্ভ বক্সী একটা দেওয়ানী মামলায় প্রাণবল্লভের বিরুদ্ধে ওকালতী করিয়াছিলেন; বার্ষিক দুই টাকা স্থলে তাঁহার দশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল! এবার মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তারা আয়ের উপর ট্যাক্স ধরিলেন। যাঁহার মাসিক এক শত টাকা আয়, তাঁহাকে বার্ষিক দশ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। এই অনুপাতে অনেকেরই ট্যাক্স বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে যাহাদের ঘরবাড়ী ভাল, অথচ আয় অল্প, তাহারা এবার বাঁচিল বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদেরও বাঁচিবার আশা অল্প। পুনর্ব্বার এসেসমেণ্টের সময় 'বিল্ডিং' দেখিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে, তখন যে সকল চুনোপুঁটী এবার বাঁচিয়াছে, তাহারা জালে পড়িবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন মূর্ত্তি পরামর্শ করিয়া ট্যাক্স-বৃদ্ধির রায় বাহির করিলেন;—গ্রামের দরিদ্র লোকের মধ্যে কাঁদাকাটি আরম্ভ হইল। সকলেই চেয়ারম্যান বাবুর দরজায় গিয়া ধরনা দিল। তখন মিউনিসিপালিটীর তরফ হইতে 'ঢেঁড়ি' বাহির হইল। মিউনিসিপালিটীর ঢেঁড়িদার ডঙ্কা-নিনাদে ঘোষণা করিল, "ভাই রে, ট্যাক্স 'বিদ্ধি'তে যার যার আপত্তি আছে, তারা আপত্তির কারণ দেখিয়ে সাত দিন মধ্যে মিউনিসিবিল আফিসে দরখাস্ত দাখিল করো—ড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাং।"

সাত দিনের মধ্যে প্রায় এক শত দরখাস্ত পড়িল। উকীল রামদুর্ল্ভ বক্সী

কোনও দরখাস্ত দিলেন না। তাঁহার ওকালতীর আয় মাসিক এক শত টাকা নহে, এ কথা হাতে কলমে স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে তেমন গৌরবের কথা নহে, অথচ দুই টাকার স্থলে দশ টাকা ট্যাক্স দেওয়াও সহজ নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্রাদিতে গ্রামের সংবাদ প্রেরণ করিতেন। বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিলেন, "এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিব, মিউনিসিপালিটীর সকল গলদের কথা খুলিয়া ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিব। ইংলিশম্যানে লিখিব. স্বরাজ দূরে থাক, আমরা মিউনিসিপালিটীর মত সামান্ত স্বায়ত্বশাসনেরও যোগ্য হই নাই, একটু ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহার অপব্যবহার করি।" কথাটা ক্রমে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তাদের কাণে উঠিল। তাঁহারা কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন।

হরিচরণ দাসের গরু মিউনিসিপালিটীর কমিশনর রামধন বাবুর কলাবাগানে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন কদলী বৃক্ষের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হরিচরণের রাতচোরা গরু। ধরিয়া 'পাউণ্ডে' দেওয়া কঠিন। মানুষের সাড়া পাইলে চারি পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া 'বেড়া পগার' ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়!—হরিচরণের বার্ষিক বার আনা স্থলে দেড় টাকা ট্যাক্স হইয়াছে।

নটবর বিশ্বাসের একখানি গরুর গাড়ী আছে, ভাড়া খাটে। দশহরার দিন খাগড়ায় পরিবারবর্গকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবার জন্য প্রাণবল্লভ বাবু তাহার গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গাড়ীর বলদের 'খুরে' হইয়াছে বলিয়া নটবর তাঁহাকে গাড়ী দেয় নাই। তাহার বার্ষিক পাঁচ সিকার স্থলে সাত সিকা ট্যাক্স হইয়াছে।

নবদ্বীপ করের নিকট মিউনিসিপালিটীর কমিশনর তারণ বাবু পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছু থোড়, মোচা, কলাপাতা ও কাঁচকলা চাহিয়াছিলেন। নবদ্বীপ সম্মত হয় নাই। নবদ্বীপ মোক্তারের মুহুরী; কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বার্ষিক দুই টাকার স্থলে তাহার তিন টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে।

সকলেই যথাসময়ে চেয়ারম্যান বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দিল। সকলেরই দরখাস্ত একরূপ,—"হুজুর আমাদের এক পয়সাও আয়বৃদ্ধি হয় নাই, অথচ ট্যাক্স বাড়িয়াছে; আমরা 'বৃদ্ধি হার' ট্যাক্স দিতে পারিব না।"

দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ হইতে পনের দিন পরে আবার ঢেঁড়ি পড়িল, "ভাই রে, যে যে ট্যাক্স 'বিদ্ধি'র আপত্তির দরখাস্ত দিয়াছ, তারা কাল

বেলা পাঁচটার সময় মিউনিসিবিল আফিসে হাজির থাকবে, আপত্তি শুনা যাবে, ড্যা-ড্যাং, ড্যাং-ড্যাং।"

৬

পরদিন বেলা পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্বেই রাজীবলোচনপুরের মিউনিসিপাল আফিসের সম্মুখে আমতলায় শতাধিক রেটপেয়ারের সমাগম হইল। কিন্তু কর্ত্তাদের তখনও শুভাগমন হয় নাই; কেবল ট্যাক্সদারোগা বাক্স সম্মুখে লইয়া বসিয়া বসিয়া ঠিক গুণিতেছিল, এবং তাহার সরকার তামাক সাজিয়া কলকের ফুঁ দিতেছিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কয়েক জন কমিশনর মিউনিসিপাল আফিসের বারান্দায় পদার্পণ করিলেন। সকলে সভা করিয়া বসিলে আপত্তিকারকগণের একে একে নাম ডাক হইতে লাগিল।

হরিচরণ দাস বলিল, "বাবু! আমার টেক্স বার আনা ছিল, দেড় টাকা হইল কেন?" জমিদার প্রাণবল্লভ নূতন এসেসমেণ্ট লিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার আয় অনেক বাড়িয়াছে, তুমি দুধের ব্যবসা কর, বাগানের তরিতরকারী বিক্রয় কর, তোমার মাসিক আয় কুড়ি টাকার অধিক, তোমার আরও বেশী টেক্স হওয়া উচিত ছিল।"

হরিচরণ বলিল, "আপনাদের বড় দয়ার শরীর, তাই কম করিয়া ধরিয়াছেন! আমি নন্দীদের দোকানে আট টাকা মাহিনায় চাকরী করি। দুধের ব্যবসা, তরিতরকারী-বিক্রী ও সব মিথ্যা কথা, কে ঠকামো করিয়াছে।"

চেয়ারম্যান বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার চার আনা মাপ করা হইল।"

হরিচরণ বলিল, "এ রাজ্যে বিচার নাই, ঘর বাড়ী বেচিয়া আমরা শ্যামনগরে গিয়া বাস করিব।"

নটবর বিশ্বাসের ডাক পড়িল। নটবর রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমার পাঁচ সিকা ট্যাক্স ছিল, কি অপরাধে সাত সিকা হইল বাবু?"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "তোমার অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে, তুমি গরুর গাড়ী করিয়াছ, মাসে অনেক টাকা ভাড়া পাও, তোমার সাত সিকা ট্যাক্স অন্যায় হয় নাই।"

নটবর বিশ্বাস বলিল, "গাড়ী গরু করিয়াছি, গাড়ীর ট্যাক্স দিই। দশ

পনের টাকা উশায় করি, গাড়োয়ানকে মাহিনা দিই, খোরাক পোষাক দিই, বলদের খৈল ভুষি কিনিতে হয়। গরীবকে মারিবেন না বাবু।"

চেয়ারম্যান বলিলেন, "আর তর্কে কাজ নাই, দেড় টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল।"

নটবর অসন্তুষ্ট হইয়া বলি, "আপনাদের খুব বিবেচনা—যা হোক।"

নবদ্বীপ কর মোক্তারের মুহুরী, তাহার বক্তৃতা-শক্তি প্রবল, সে ভণিতা করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এবার আমার ট্যাক্স বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হওয়া কর্ত্তব্য ছিল; আমার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, সংসারনির্ব্বাহই আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "মিথ্যা কথা! তোমার অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে, তুমি মহাজনী কর।"

নবদ্বীপ বলিল, "আমার অবস্থা কেমন, আমি জানি না, আপনি জানেন! কাজ কর্ম্মের অভাবে মোক্তারদের দিন চলা ভার হইয়াছে, আমাদের মত মুহুরীদের দু' সন্ধ্যা কি করিয়া হাঁড়ি চড়ে, তা আমরাই বুঝি; আপনারা তফাৎ থেকে অবস্থা ভাল দেখিতেছেন! আমি মহাজনী করি সত্য, কিন্তু সে কিরূপ মহাজনী জানেন কি? দিন চলে না দেখিয়া আমি আমার পরিবারের যে দু' তোলা সোনাদানা ছিল, বন্ধক দিয়া এক শ' টাকা নীলমণি দাঁর বাড়ী হইতে শতকরা বারো আনা সুদে কর্জ্জ করিয়া তাহাই খুচরা তিন টাকা দুই আনা সুদে গরীব দুঃখীদের কর্জ্জ দিয়া থাকি,—ইহাই আমার মহাজনী।"

চেয়ারম্যান বলিলেন, "ও সব কাজের কথা নয়। তুমি যখন মহাজনী করিতেছ, তখন তোমার তিন টাকা ট্যাক্স অন্যায় হয় নাই, তোমাকে দিতে হইবে।"

নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নানা-প্রকার অপরূপ খাদ্যসামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

উকীল রামদুর্ল্লভ বক্সী ট্যাক্স মাপের দরখাস্ত না করিলেও, দশ টাকা হইতে তাঁহার ট্যাক্স পাঁচ টাকায় নামিল। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার আর কোনও আশঙ্কা রহিল না।

নূতন এসেসমেণ্টের পর হইতে রাজীবলোচনপুরে চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যানের বাড়ীর পথে গোটা কতক আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইল। অন্যান্য পথেও যে দুই একটা না বসিল,তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে রাজপথের অন্ধকার

আরও বর্দ্ধিত হইল। লৌহদণ্ড-শিরে সংস্থাপিত লণ্ঠন হইতে আলোক অপেক্ষা ধূমই অধিক নির্গত হয়! কিন্তু ইহাতে ট্যাক্স-দারোগা হরবল্লভের বাড়ীর কেরোসিনের খরচটা বাঁচিয়া গেল।

মিউনিসিপালিটীতে কলিকাতা হইতে ময়লা-ফেলা গাড়ী আসিয়াছে; এক জন মেথর নিযুক্ত হইয়াছে; একটি বেকার ধর্ম্মের ষাঁড়ও প্রতিপালিত হইতেছে। কিন্তু কলিকাতার মত মফস্বলে পথে আর আবর্জ্জনা জমে না। মেথর বেচারা গ্রামের পথে পথে গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া যে দুই এক ঝুড়ি শুষ্ক পাতা, মাটী, গোময় সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা ভাইস চেয়ারম্যানের একটি গর্ত্তে প্রত্যহ ফেলিয়া আসে। গর্ত্তটি ভরাট করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা, কিন্তু দীর্ঘকালেও সে গর্ত্তের এক কোণ ভরাট হইল না। আর কি উপায়ে মেথরচায় গর্ত্ত ভরাট করা যাইতে পারে—ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় এখন তাহাই চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু কোনও ফন্দী মাথায় আসিতেছে না। গরুর গাড়ীর ট্যাক্স আট আনা হইতে বার্ষিক আড়াই টাকা ধার্য্য হওয়ায় গাড়োয়ানেরা ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ী ভাড়া দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

'রেটপেয়ারে'রা বলাবলি করিতেছে, ইহাই স্বায়ত্বশাসনের সর্ব্বপ্রধান সুখ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কালিদাস ও ভবভূতি।

দুষ্মন্তের সহিত রাম-চরিত্রের তুলনা করা রাম-চরিত্রের অবমাননা। যিনি শৈশবে হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছিলেন; যিনি বাল্যে পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন; যিনি চরিত্রবলে বনের বানর বশ করিয়াছিলেন; যিনি বাহুবলে লঙ্কার ঈশ্বরকে বধ করিয়াছিলেন; যিনি রাজধর্ম্মরক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; যাঁহাকে এখনও ভারতবর্ষের দশ কোটী লোক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করে; পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের যিনি নায়ক; তাঁহার সহিত দুষ্মন্তের তুলনা! ভবভূতি নায়ক বাছিয়া লইয়াছেন চরম।

কিন্তু এমন চরিত্র পাইয়াও তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, রামায়ণের রাম আর উত্তরচরিতের রাম পৃথক্। [illegible] রাম যেন সে ব্যক্তিই ন'ন। শৌর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, ঔদার্য্যে উত্তরচরিতের রাম

রামায়ণের রামের অনেক নীচে। উত্তরচরিতের রামকে ভবভূতি বর্ণন করিয়াছেন—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" কিন্তু "বজ্রাদপি কঠোরাণি" ফুটে নাই। "মৃদূনি কুসুমাদপি"ই ফুটিয়াছে। উত্তরচরিতের রাম পুস্তকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বালকের মত কাঁদিয়াছেন, আর মূর্চ্ছা গিয়াছেন—এত বেশী পরিমাণে যে, তাঁহার প্রতি পাঠকের একটা অবজ্ঞা আসিয়া পড়ে।

তথাপি ভবভূতি রামকে কয়েকটি সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছেন। তাহা মূল রামায়ণে নাই। উত্তরচরিতের 'প্রথম অঙ্কে সমস্ত রামচরিত্র এক সঙ্গে দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, ভৃত্যের সহিত রামের ব্যবহার দেখিতে পাই—যেন বন্ধুর সহিত বন্ধুর ব্যবহার! কঞ্চুকী যখন প্রবেশ করিয়া 'রামভদ্র' বলিয়াই শুধরাইয়া বলিলেন,—'মহারাজ!' রাম হাসিয়া বলিলেন,—

আর্য্য ননু রামভদ্র ইত্যেব মাং প্রতি উপচারঃ শোভতে তাতপরিজনানাং তৎ যথাভ্যাসমুচ্যতাম্।

কি সৌজন্য!

যখন অষ্টাবক্র ঋষি আসিলেন, রাম কি সসম্মানে সংযতভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন,—

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

অষ্টাবক্র ঋষি যখন প্রজারঞ্জনের কথা বলিলেন, তখন রাম কহিলেন,—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি। আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

কি রাজধর্ম্মে অনুরাগ!

অষ্টাবক্র চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ আসিয়া কহিলেন,—চিত্রকর চিত্র লইয়া আসিয়াছে। রাম সীতার চিত্তবিনোদনার্থ তাঁহার ভূত জীবনের একখানি ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—চিত্রে তাঁহার ভূত জীবনের কত দূর পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ কহিলেন,—

যাবদার্য্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ।

রাম কহিলেন,—

শান্তম্—

উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ। তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥

আলেখ্য আনীত হইলে, সেই আলেখ্যে যখন লক্ষ্মণ জৃম্ভকাস্ত্র দেখাই-

কাছেও কৃতজ্ঞতা। যখন লক্ষ্মণ মিথিলাবৃত্তান্ত দেখাইতেছেন, রাম তাঁহার শ্বশুরকুলের বিষয়ে অতিশয় সম্মানের সহিত কথা কহিতেছেন,—

জনকানাং রঘূণাঞ্চ সম্বন্ধঃ কস্য ন প্রিয়ঃ। যত্র দাতা গ্রহীতা চ স্বয়ং কুশিকনন্দনঃ॥

যখন লক্ষ্মণ ভার্গবকে দেখাইতেছেন, রাম ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন,—"ঋষে, নমস্তে।" তৎপরে যখন লক্ষ্মণ রাম কর্ত্তৃক ভার্গব-পরাজয়ের বৃত্তান্ত দেখাইতে যাইতেছেন, তখন রাম সাক্ষেপে কহিলেন,—

অয়ে বহুতরং দ্রষ্টব্যমস্তি অন্যতো দর্শয়।

কি বিনয়! এ বিনয় অন্তঃপুরেও। তাহার পর অযোধ্যা-প্রবেশ-সময়ে রাম নবোঢ়া জানকীর রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈঃ দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈরকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥

কি মাতৃভক্তি! লক্ষ্মণ মন্থরার ছবি রামকে দেখাইলে রাম অনুত্তর হইয়া কৈকেয়ীকে উল্লেখ করিবার অপ্রীতিকর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কি চমৎকার শীলতা! পরে যখন সীতা একটি অনুরোধ করিতে চাহিলেন, রাম কহিলেন,—"আজ্ঞাপয়।" স্ত্রীর প্রতি এতখানি সম্মান কোনও কবি দেখাইয়াছেন কি? জানি না। লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে রাম নিভৃতে সীতার কাছে বলিতেছেন,—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

সীতা নিদ্রাতুরা হইয়া উপাধান খুঁজিতেছিলেন। রাম কহিলেন,—

আবিবাহসময়াদ্‌গৃহে বনে শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যয়া রামবাহুরুপধানমেষতে॥

সীতা নিদ্রিত হইলেন। রাম সীতাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥

এ পবিত্র প্রণয়ের চিত্র আর কোনও কবি চিত্রিত করিয়াছেন কি?

পরে রাম দুর্ম্মুখের মুখে যখন নিদারুণ বার্ত্তা শুনিলেন, তখন রামের শোকের উচ্ছ্বাস সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হয়। কিন্তু সেই শোকের মধ্যে যখন শুনিলেন, লবণ দৈত্য রাজ্যে উপদ্রব করিতেছে, অমনই তাঁহার শৌর্য্য জাগিয়া উঠিল। সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বলিলেন,—"আঃ, কথমদ্যাপি রাক্ষসত্রাসঃ?"

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই এক অঙ্কে রামের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হইয়া গেল। অন্যান্য অঙ্কে ইহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় অঙ্কে জানিতে পারি, রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। কিন্তু পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। এ যজ্ঞে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

এই অঙ্কেই দেখি যে, রাম শম্বুক রাজাকে বধ করিবার জন্য আবার জন-স্থানে আসিয়াছেন। শম্বুকের শিরশ্ছেদের পর শূদ্রক দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামকে সেই স্থান দেখাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বপরিচিত সীতার স্মৃতিরাত সেই দণ্ডকারণ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। কখনও বা কাঁদিতেছেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইতেছেন। দেখা যাইতেছে, সীতা-বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কেবল সীতার স্মৃতিতে পূর্ণ।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাম সেই চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্য দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

স্নিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

তাহার পর আর এক স্থানে,—

পশ্যামি চ জনস্থানং ভূতপূর্ব্বখরালয়ম্। প্রত্যক্ষানিব বৃত্তান্তান্ পূর্ব্বাননুভবামি চ॥

দেখিতে দেখিতে সীতাকে মনে পড়িতেছে,—

ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু। ইতি চারমতে বাসৌ স্নেহস্তস্যাঃ স তাদৃশঃ॥

অন্যত্র,—

এতত্তদেব হি পুনর্বনমদ্য দৃষ্টং যস্মিন্নভূম চিরমেব পুরা বসন্তঃ।

অন্যত্র,—

অস্যৈবাসীন্মহতি শিখরে গৃধ্ররাজস্য বাসঃ।

সীতার কথা মনে পড়িতেছে, আর,—

চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুনর্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি সংমূর্চ্ছয়তি চ॥

সেই পূর্ব্বপরিচিত স্থান কি সেইরূপই আছে? না, স্থানে স্থানে পরি-বর্ত্তনও হইয়াছে,—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥

সে স্থান আর রামের ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

যস্যাং তে দিবসাস্তয়া সহ ময়া নীতা যথা যে গৃহে যৎসম্বন্ধিকথাভিরেব সততং দীর্ঘাভিরস্থীয়ত।
একঃ সম্প্রতি নাশিতপ্রিয়তমস্তামদ্য রামঃ কথং পাপঃ পঞ্চবটীং বিলোকয়তু বা গচ্ছত্বসম্ভাব্য বা॥

তৃতীয় অঙ্কে রাম ছায়ারূপিণী সীতার সমক্ষে আবার সেই পঞ্চবটী বনে। এবার তিনি শুদ্ধ স্থাবর প্রকৃতি দেখিতেছেন না। সীতার পালিত করিকরভক, ময়ুর, সব বড় হইয়াছে। সেই সীতার যত্নে বৰ্দ্ধিত কদম্ব বৃক্ষটি বড় হইয়াছে। তাহাদের রাম দেখিতেছেন—আবার তাঁহার শোকসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, সে সীতা আজ কোথায়? বুঝি বা সে আজ—

জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুমুক্তমৃণালকল্পা ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা।

তিনি উন্মত্তবৎ ডাকিতেছেন, "হা প্রিয়ে জানকি ক্বাসি।" তাহার পর রাম কাঁদিতে লাগিলেন।

বাসন্তী বলিতেছেন,—

ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্॥

রামবিলাপ এই স্থানে বড় মধুর, মর্ম্মস্পর্শী,—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

যাহাদের মনোরঞ্জনার্থ রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে রাম কহিতেছেন—

ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যা গৃহেঽভিমতং তত স্তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন চাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিদ্রবয়ন্তি মাং ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে॥

বাসন্তী বলিতেছেন, "অতিক্রান্তে ধৈর্য্যমবলম্ব্যতাং দেবেন।" রাম উত্তর দিলেন,—ধৈর্য্যের কথা কি কহিতেছ?

দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ। লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রামো ন জীবতি॥
হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা বিষঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

পরে শোকোদ্বেগে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাকরস্পর্শে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল। রাম সেই হস্ত ধরিলেন, এবং বাসন্তীকে স্পর্শ করিতে কহিলেন। সীতা ইত্যবসরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন।

রাম উন্মত্তবৎ কহিলেন,—হা ধিক্ প্রমাদঃ হা ধিক্ প্রমাদঃ

করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়ো জড়াৎ পরিভ্রষ্টঃ।
পরিকম্পিনঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্বিদ্যন্॥

রাম সে স্থান হইতে যাইবার পূর্ব্বে জানাইয়া গেলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী—হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি। এ বিষয়ের অবতারণা এ স্থলে অত্যন্ত আকস্মিক হইয়াছে, এবং যথাযথ হয় নাই বলিয়াই আমার বোধ হয়।

তাহার পরে একবারে ষষ্ঠ অঙ্কে গিয়া আবার রামের দর্শন পাই। লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন; রাম সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শব্দং মহাপুরুষসংবিহিতং নিশম্য তদ্গৌরবাৎ সমুপসংহৃতসম্প্রসারঃ।
শান্তো লবঃ প্রণত এব চ চন্দ্রকেতুঃ কল্যাণমস্তু সুতসঙ্গমনেন রাজ্ঞঃ॥"

এই বলিয়া বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর বিদ্যাধরী সহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাম লবকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—দিষ্ট্যা অতিগম্ভীরাকৃতিরয়ং বয়স্যো বৎসস্য,

ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানামাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥

লবও রামের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।—

অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোঽয়ং মহাপুরুষঃ।
আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমালম্বনং মহৎ। প্রকৃষ্টস্যেব ধর্ম্মস্য প্রসাদো মূর্ত্তিসঞ্চরঃ॥
আশ্চর্য্যম্,
বিরোধো বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নির্বৃতিঘনঃ তদৌদ্ধত্যং কাপি ব্রজতি বিনয়ঃ প্রহ্বয়তি মাম্।
ঝটিত্যস্মিন্ দৃষ্টে কিমপি পরবানস্মি যদি বা মহার্ঘস্তীর্থানামিব হি মহতাং কোঽপ্যতিশয়ঃ॥

পরে চন্দ্রকেতু উভয়ের পরিচয় করিয়া দিলে লব সোল্লাসে কহিয়া উঠিলেন,—"কথং রঘুনাথঃ দিষ্ট্যা সুপ্রভাতমদ্য যদয়ং দৃষ্টো দেবঃ।" পরে রামকে অভিবাদন করিলেন,—"তাত, প্রাচেতসান্তেবাসী লবোঽভিবাদয়তে।"

রাম তাহাকে তখনও সীতার তনয় বলিয়া জানিতে পারেন নাই। সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

পরিণতকঠোরপুষ্করগর্ভচ্ছদপীনমসৃণসুকুমারঃ। নন্দয়তি চন্দ্রচন্দননিস্যন্দজড়স্তব স্পর্শঃ॥

লব অশ্ব ধরার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন—

ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে স তস্য স্বো ভাবঃ প্রকৃতিনিয়তত্বাদকৃতকঃ।
ময়ূখৈরশ্রান্তং তপতি যদি দেবো দিনকরঃ কিমাগ্নেয়ো গ্রাবা নিকৃত ইব তেজাংসি বমতি॥

রাম লবপ্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্র সংহরণ করিতে বলিলেন; চন্দ্রকেতুকে তাঁহার সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে কহিলেন। উভয়ে রামের আজ্ঞা পালন করিলেন। তাহার পরে লবকে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জৃম্ভকাস্ত্র লব কোথা হইতে পাইলেন। লব বলিলেন যে, সে অস্ত্র তাঁহাদের কাছে

স্বপ্রকাশ। রাম ও তাঁহার বংশেই সে অস্ত্র স্বতঃপ্রকাশ থাকিবার কথা। রাম ভাবিলেন, "হইবে, কোনও গুণে লব ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এমন সময়ে কুশও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপথ্যে কুশের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া রাম কহিতেছেন,—

অথ কোঽয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবির্ধ্বনিনৈব দত্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীলনীরধরধীরগর্জ্জিত-ক্ষণবদ্ধকুট্মলকদম্বডম্বরম্॥

কুশ আসিলে তিনি কহিলেন,—

অমৃতাধ্মাতজীমূতস্নিগ্ধসংহননস্য তে। পরিষ্বঙ্গায় বাৎসল্যাদয়মুৎকণ্ঠতে জনঃ॥

কুশকে আলিঙ্গন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সৃত ইব নিজো দেহজঃ স্নেহসারঃ প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনাধাতুরেব।
সান্দ্রানন্দক্ষুভিতহৃদয়প্রস্রবেণেব সৃষ্টো গাত্রং স্নেহে যদমৃতরসস্রোতসা সিঞ্চতীব॥

তাহার পরে উভয় বালককে দেখিয়া,—

অহো প্রশ্রয়যোগেঽপি গতিস্থিত্যাসনাদয়ঃ। সাম্রাজ্যশংসিনো ভাবাঃ কুশস্য চ লবস্য চ॥
বপুর্বহিহিতসিদ্ধা এব লক্ষ্মীবিলাসাঃ প্রতিজনকমনীয়ং কান্তিমৎ কেতয়ন্তি।
অমলিনমিব রত্নং রশ্ময়স্তে মনোজ্ঞা বিকসিতমিব পদ্মং বিন্দবো মাকরন্দাঃ॥
ভূয়িষ্ঠাঞ্চ রঘুকুলকুমারচ্ছায়ামেতয়োঃ পশ্যামি।
কঠোরপারাবতকণ্ঠমেচকং বপুর্বৃষস্কন্ধসবন্ধুরাংশকম্।
প্রসন্নসিংহস্তিমিতঞ্চ বীক্ষিতং ধ্বনিশ্চ মাঙ্গল্যমৃদঙ্গমাংসলঃ॥
(সূক্ষ্মং নিরূপ্য) অয়ে ন কেবলমস্মৎসংবাদিন্যাকৃতিঃ।
অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
ননু পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষ্ণোরভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ॥
মুক্তাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরীয়ং সৈবোষ্ঠমুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব॥

রাম কাঁদিয়া ফেলিলেন। লব কহিলেন,—"তাত, কিমেতৎ?"

বাষ্পবর্ষেণ নীতং বো জগন্মঙ্গলমাননম্। অবশ্যায়াবসিক্তস্য পুণ্ডরীকস্য চারুতাম্॥

কুশ লবকে বুঝাইতেছেন,—

অয়ি বৎস!

বিনা সীতাদেব্যাঃ কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ, প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং জগদিদমরণ্যং হি ভবতি।
স চ স্নেহস্তাবানয়মপি বিয়োগো নিরবধিঃ কিমিত্যেবং পৃচ্ছস্যনধিগতরামায়ণ ইব॥

রাম রোদন সংবরণ করিয়া রামায়ণগাথা শুনিতে চাহিলেন। কুশ কহিলেন,—

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্মহাত্মনঃ। প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ॥
তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ। হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্॥

শুনিয়া রাম অধীর হইয়া উঠিলেন,—

ক্ব তাবানানন্দো নিরতিশয়বিস্রম্ভবহুলঃ ক্ব তেঽন্যোন্যং যত্নাঃ ক্ব চ নু গহনাঃ কৌতুকরসাঃ।
সুখে বা দুঃখে বা ক্ব নু খলু তদৈক্যং হৃদয়য়োঃ তথাপ্যেষ প্রাণঃ স্ফুরতি ন তু পাপো বিরমতি॥

ভোঃ কষ্টম্

প্রিয়াগুণসহস্রাণামেকোন্মীলনপেশলঃ। য এব দুঃস্মরঃ কালঃ তমেব স্মারিতা বয়ম্॥
তদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কৃতপদমহোভিঃ কতিপয়ৈঃ তদীষদ্বিস্তারি স্তনযুগলমাসীদ্দৃগদৃশঃ।
বয়ঃস্নেহাকূতব্যতিকরঘনো যত্র মদনঃ প্রগল্‌ভব্যাপারঃ স্ফুরতি হৃদি মুগ্ধশ্চ বপুষি॥

কুশ রামায়ণের অন্য স্থান হইতে একটি শ্লোক শুনাইলে রাম "সলজ্জাস্মিত-স্নেহ-করুণ"ভাবে পুনশ্চ বলিলেন,—

প্রমাষ্টুশিশিরীভবৎপ্রসৃতমন্দমন্দাকিনীমরুত্তরলিতালকাকুললাটচন্দ্রদ্যুতি।
অকুঙ্কুমকলঙ্কিতোজ্জ্বলকপোলমুৎপ্রেক্ষ্যতে নিরাভরণসুন্দরশ্রবণপাশসৌম্যং মুখম্॥

স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল থাকিয়া আবার,—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।
জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে কুকূলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যত ইব॥

তৎপরে জনকাদির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া রাম নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই অঙ্কে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ কবিত্ব হিসাবে অতুল। ইহাতে সিংহ ও সিংহশাবকের পরস্পরের প্রতি নীরব দৃষ্টিপাত আছে; গুণী ও গুণজ্ঞ ব্যক্তির পরস্পর দর্শন জন্য একটা স্তম্ভিত মোহমুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ পাইতেছে। আবার পিতা-পুত্রের গূঢ় স্নেহের অমৃতসঞ্চার সেই সাক্ষাৎকে কি করুণ গম্ভীর মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে!

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত সীতানির্ব্বাসন নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অভিনয় প্রকৃত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে সীতার সহিত মিলন হইল। রাম গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন, "কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনুকম্পিতঃ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। পরে কুশীলবের সঙ্গে পরিচয় হইল। রাম বলিলেন,—

পাপ্মভ্যশ্চ পুনাতু বর্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি সেয়ং কথা মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।
বাল্মীকেঃ পরিভাবয়ন্ত্বভিনয়ৈর্বিন্যস্তরূপাং বুধাঃ শব্দব্রহ্মবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥

এই সপ্তম অঙ্কে 'অঙ্কের মধ্যে অঙ্ক' ভবভূতির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ইংরাজিতে Hamlet ভিন্ন কুত্রাপি এমন কৌশলবিন্যস্ত অঙ্কের অন্তর্গত অঙ্ক দেখি নাই। Hamletএর সহিত সাদৃশ্য এত অধিক, যেন বোধ হয়, Shakespear ভবভূতি হইতেই এ কৌশলটি শিখিয়াছিলেন—যদিও তাহা সম্ভবপর নহে।

সীতানির্ব্বাসনের পরে বাৎসল্য ভিন্ন রামের চরিত্রের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব অন্য কোনও ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ নাটকখানিতে রাম কেবল কাঁদিতেছেন—প্রথম অঙ্কে সীতাকে বনবাস দিবার সময় দুর্ম্মুখের কাছে; দ্বিতীয় অঙ্কে জড়প্রকৃতি দেখিয়া শম্বুকের কাছে; তৃতীয় অঙ্কে জঙ্গম প্রকৃতি দেখিয়া তমসা, বাসন্তী ও অদৃশ্যা সীতার কাছে; ষষ্ঠ অঙ্কে লবকুশকে দেখিয়া তাহাদের কাছে; এবং সপ্তম অঙ্কে অভিনয় দেখিয়া পৌরজনের কাছে। রোদন—রোদন—রোদন। এত অধিক রোদন যে, পড়িতে পড়িতে বিরক্তি জন্মে। এক জন নারী ক্রমাগতঃ এরূপ কাঁদিলে পাড়া ছাড়িয়া পলাইতে হয়। কিন্তু এ স্ত্রীলোক নহে, পুরুষ;—অন্য কোনও পুরুষ নহে, রাম। এরূপ স্থলে কালিদাস হইলে কি করিতেন!—দুষ্মন্তও রামের মতই পাপী (তুল্যাংশে না হউন)। তিনিও বিবাহিতা পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরে যখন তাঁহার অনুতাপ আসিল, তখন এক অঙ্কে, এমন কি, প্রায় এক শ্লোকেই সে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন,—

> ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্ব্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
> পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্॥

অতুল! আমরা এই শ্লোকে যেন প্রত্যাদিষ্টা শকুন্তলাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই। পিতৃকুল পতিকুল উভয় কুল কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, শূন্যে অবস্থিতা শকুন্তলার এই অবস্থা কি ভয়ানক! আর সেই সময় যাঁহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবার তাঁহার অধিকার আছে, তাহার প্রতি সেই বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ কি গভীর! কালিদাস "ভোঃ কষ্টম্—হা হা দেবি" বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন নাই। অথচ এই শ্লোক শুনিয়াই মিশ্রকেশী পর্য্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছেন—তাঁহার ত রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার কথা।

আমি রোদনের বিরোধী নহি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, পুরুষের রোদন দৌর্ব্বল্য। আমার সেরূপ বিশ্বাস নহে। যখন হৃদয় অত্যন্ত কাতর বা অভিভূত হয়, তখন ক্রন্দন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। হাস্য ও ক্রন্দন পশুরা করে না, মানুষেই করে। হাস্য ও ক্রন্দনে মানুষ দেখায় যে, পশুসুলভ আহার ও

নিদ্রা ও কামসেবা ভিন্ন আরও প্রবৃত্তি মানুষের আছে। হাস্য ও ক্রন্দন যে করাইতে পারে, সে কবি। হাস্য ও ক্রন্দনের সঙ্গে শৌর্য্যের কোনও নিত্য বিরোধ নাই। যে সমরক্ষেত্রে নির্ভীক যোদ্ধা, সে গৃহে যে স্নেহবান্ পিতা কি পতি হইতে পারে না, তাহার কোনও কারণ দেখি না। স্নেহ দৌর্ব্বল্য নহে। স্নেহ থাকিলে প্রিয়জনবিয়োগে শোক হওয়া স্বাভাবিক। শোকে অধীর হইলে স্নেহবান মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রন্দন করা। বীর হইলে যে সেই প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হইবে, এ কাহার বিধান! আর এরূপ কেহ বিধান করিলে মানিব কেন? যাঁহারা ক্রন্দন করাকে দৌর্ব্বল্য বলেন, তাঁহারা বোধ হয়, নিজেই জানেন না যে, দৌর্ব্বল্যটা কোথায়? স্নেহে, না স্নেহজনিত শোকে, না শোকজনিত ক্রন্দনে? এই উত্তরচরিতেই ভবভূতি বলিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

রাম বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর, কুসুমের অপেক্ষাও কোমল—অর্থাৎ, সময়-বিশেষে। ইহাতে আমরা দেখি যে, তাঁহার প্রকৃতির বিস্তার কতখানি। যে শুদ্ধ কঠোর, সে ত স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হইবে। মানুষের বীরত্ব প্রধানতঃ বিপদে ধৈর্য্য, সাহস ও ধীরতায়—অর্থাৎ মানসিক গুণে। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যপালনে মৃত্যুকে ভয় করে না, সে কি গৃহে আসিয়া ভালবাসিতে পারে না? যে ভালবাসে, সে যদি প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাতর না হয়, তাহা হইলে সে ভালবাসার প্রাণ নাই, সে মন একটা নিষ্কম্প মৃত্যুবৎ অবস্থা। আর যে কাতর হয়, তাহার ক্রন্দন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর মনুষ্যকেই দিয়াছেন, পশুকে দেন নাই। কারণ, ইহাই তাহার দুঃখে safety valve. "পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।" মানুষ এই ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রবৃত্তি চাপিয়া রাখিতে যাইবে কেন? কাহার আজ্ঞায়? বড় কবিগণ কেহই ত এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। রামায়ণের রাম কাঁদিয়াছেন। Iliad বীরগণ শুধু এরূপ কাঁদেন নাই, আর্ত্তনাদ করিয়াছেন।

তবে এই ধারণা আসিল কোথা হইতে যে, বীরের ক্রন্দন করা উচিত নহে? Lessing বলেন যে, এ নিয়মটি সামাজিক শীলতা হিসাবে গঠিত হইয়াছিল। কাহারও কাছে কাঁদিলে সে দুঃখিত হয়। অন্য কাহাকেও দুঃখিত করা অসৌজন্য। অতএব কাহারও কাছে কাঁদাও অসৌজন্য।

করিতে চেষ্টা করিয়াও রুদ্ধ করিতে না পারা নিশ্চয়ই এক রকমের দৌর্ব্বল্য। তাহার জন্য প্রকাশ্যে কাঁদাও এক হিসাবে দৌর্ব্বল্য। কিন্তু তাহা হইলে গোপনে বা নিতান্ত বন্ধুর সমক্ষে কাঁদা দৌর্ব্বল্য নহে। বীর নির্জ্জনে বা বন্ধুর সমক্ষে ক্রন্দন করিতে পারেন, তাহা দৌর্ব্বল্য নহে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উত্তরচরিত নাটকের রামের ক্রন্দনের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়াছে। প্রথম অঙ্ক হইতে শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত কেবল রামের দীর্ঘশ্বাস ও আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা—পড়িতে ধৈর্য্য থাকে না। যেই দুর্ম্মুখ সীতাপবাদবৃত্তান্ত রামের কর্ণে কহিলেন, অমনি রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। দুর্ম্মুখের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। পরে দুর্ম্মুখ চলিয়া গেলে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রন্দন পুরুষে শোভা পাইলেও, পুরুষের আর স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের প্রথা পৃথক। "ওরে বাবা, তুই কোথায় গেলি রে—" এরূপ ক্রন্দন স্ত্রীজাতিই করে, পুরুষে করে না। পুরুষ অপ্রত্যাশিত সংবাদে প্রথমে স্তম্ভিত হয়, চক্ষে অন্ধকার দেখে, চিন্তা করে, পরে মূর্চ্ছিতও হইতে পারে। পুরুষের ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ আসে না—কিঞ্চিৎ পরে আসে। কারণ, তাহার মনের প্রধান গুণ অনুভূতি নহে ; প্রধান গুণ, চিন্তা। চিন্তার সঙ্গে অনুভূতির সহিত একটা যুদ্ধ হয়ই।

তাহার উপরে যেই সীতাপবাদ, সেই বিসর্জ্জন—রামের যোগ্য নহে। "ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি", অথচ "ত্বাং পরিদদামি মৃত্যবে"। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন—

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্। শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

আপনাকে ক্রমাগত ধিক্কার না দিয়া নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রামের এ বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। যিনি গৃহে লক্ষ্মী, যিনি উৎপত্তি-পরিপূতা, যাঁহার সম্বন্ধে রামের ধারণা যে,—

নৈসর্গিকী সুরভিনঃ কুসুমস্য সিদ্ধা মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়িতানি।

তাঁহাকে বনবাস দিতে একবারও রামের দ্বিধা হইল না? এ শাস্ত্রের বিচার নহে, এ রাজধর্ম্ম নহে, এ মানুষের হৃদয়, এ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রকাণ্ড একটা কার্য্য করিতে গেলে—বিশেষতঃ যখন সে কার্য্য বিশ্বাস ও ইচ্ছার বিরোধী,—তখন মানুষের মনে মনে একটা যুদ্ধ চলিবেই। অন্তর্ব্বিরোধের এমন একটা সুযোগ পাইয়াও ভবভূতি তাহা হেলায় হারাইয়াছেন।

ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, তিনি মনুষ্য-হৃদয় জানিতেন না। সেই অজ্ঞতা তিনি দীর্ঘবিলাপ দিয়া পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। এই একঘেয়ে দীর্ঘ-বিলাপে পাঠকের ক্রমে বিরক্তির উদ্রেক হয়। অথচ কে অস্বীকার করিবে যে, এই রাম-বিলাপের কতকগুলি শ্লোক অতীব সুন্দর! কিন্তু বিলাপ অত্যধিক দৈর্ঘ্যে ও পুনরুক্তিতে বিরক্তিকর হইয়া উঠে—হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

সত্যই মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, রামের অধীরতা দেখিয়া কখনও কখনও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।

ভবভূতির রামচন্দ্র সজীব মনুষ্য নহেন। প্রথম অঙ্কে তাঁহার যে গুণগুলি কথায় দেওয়া হইয়াছে—কার্য্যে তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ সমস্ত নাটকখানিতে সীতাকে বনবাস দেওয়া ভিন্ন রামচন্দ্র আর কোনও কার্য্য করেন নাই। কেবল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। আমার মনে হয় যে, এ নাটকখানিকে উত্তর-রামচরিত না বলিয়া রামবিলাপ বলিলে ইহার উচিত নামকরণ হইত।

কালিদাস কি চরিত্র পাইয়াছিলেন, আর কি গড়িয়া তুলিয়াছেন! আর ভবভূতি কি পাইয়াছিলেন, কিরূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভবভূতি রাম-চরিত্রকে সীতানির্ব্বাসনে ও শম্বুক-বধে কতক বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে; এবং রামকে প্রথম অঙ্কে সদ্‌গুণরাশির আধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই ফুটে নাই। কার্য্যে রাম স্ত্রৈণ বালক। একবার দুর্ম্মুখের সমক্ষে হা হতোস্মি, একবার শম্বুকের কাছে হায় হায়; একবার বাসন্তীর অঞ্চল ধরিয়া "সখী! রক্ষা কর।" একবার পুত্রদ্বয়ের গলা ধরিয়া "গেলাম মরিলাম"; আর পরিশেষে পৌরজনের পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা।

রামায়ণের রাম ছল করিয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বটে, সীতার অপেক্ষা স্বীয় বংশমর্য্যাদা তাঁহার প্রিয়তর ছিল বটে, কিন্তু সে রাম একটা জীবন্ত জাজ্জ্বল্যমান মহান চরিত্র। রামায়ণের রাম এই সীতানির্ব্বাসন-সঙ্কটে কি কি করিয়াছেন?—

> তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
> সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতম॥
> বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
> হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে॥

রাম আজ্ঞা করিলেন,—

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ॥
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে।
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ॥
অকীর্ত্তির্যস্য গীয়তে লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ।
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে।
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্॥

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
তস্মাত্তবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকম্।
* * *
শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্।
আরোহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ॥
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যং সীতাং প্রতি কথঞ্চন।
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

রামায়ণের রাম কীর্ত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা কহেন নাই। আর একবারে—দৃঢ় অমোঘ আজ্ঞা। অথচ কোমলতার অভাব নাই।—একটা মানুষ বটে।

ভবভূতি এই রামকে নিষ্কলঙ্ক করিতে গিয়াছেন। দুই চারিটা কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিলেই তাহা সাধিত হয় না। সজীব রাম আঁকা চাই। ভবভূতির সে সাধ্য ছিল না। তাই তিনি রামকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া সুন্দর বালকের পাষাণপ্রতিমা করিয়া গড়িয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গৌড়ীয় নৌশিল্প।

ঐতিহাসিক তথ্য।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় নগরদ্বয় প্রায় চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ নদী দ্বারা বেষ্টিত। যে কোনও দিক্ হইতে বৈদেশিকগণ গৌড়াদি নগরে প্রবেশ করিতেন, সেই দিকেই তাঁহাদিগকে নদীপার হইতে হইত। বিশেষতঃ, গৌড় ও পৌণ্ড্রের অধিবাসিগণের নিয়ত স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্য নৌকার প্রয়োজন হইত। নদীপথে ও সমুদ্রবক্ষে বিচরণের জন্য, দেশ হইতে দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ সে কালে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকার ব্যবহার করিতেন। সমুদ্রপথে ভ্রমণের জন্য বড় বড় নৌকা এ দেশে যথেষ্ট নির্ম্মিত হইত। ইহা ব্যতীত এ দেশের রাজগণ যুদ্ধকার্য্যের জন্য ছোট বড় বিবিধ প্রকার সমর-তরণী নির্ম্মাণ করিতেন। বর্ষাকালে এ দেশ একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং নৌকা ব্যতীত একপদও অগ্রসর

হইবার উপায় ছিল না। আর দেশমধ্যে বড় বড় নদীর অভাব না থাকাতে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই যুদ্ধাদি কার্য্য, বাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রচারকগণের স্থানান্তরে গমন, এবং নৌসতু নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্যগণের নদীপারাপারের ব্যবস্থা এ দেশে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধরাজগণের সময়ে ধর্ম্মপ্রচারকগণ এ দেশ হইতে সিংহলাদি দ্বীপে গমন করিতেন। এ দেশ হইতে বৌদ্ধগণ ও বণিক্‌গণ চট্টগ্রামাদি প্রদেশে জলপথেই গমনাগমন করিতেন। এ দেশ হইতে আরবাদি দেশে বাণিজ্যতরণী নিয়ত গমনাগমন করিত। এ দেশী সুজনীও রেশমী বস্ত্রে বোঝাই পোতগুলি কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ইজিপ্ত, আরব, পারস্য, ইতালী ও সময়ে সময়ে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। রোম নগরে এ দেশের রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। এ দেশের বণিক্‌গণ দেশের প্রস্তুত পোতাশ্রয়ে সুদূর দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। হিন্দুরাজগণের সময়ে যথেষ্ট নৌব্যবহার হইত। বৌদ্ধপ্রভাবকালে নৌশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎপরে হিন্দু-রাজগণের সময়ে নৌশিল্প কিছু মন্দীভূত হয়। মোসলমান শাসনকালে নৌশিল্পের আবার উন্নতি হয়। মোসলমান বাদশাহী আমলে গৌড়াদি স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণের মাল-বাহী, সমরকার্য্যের উপযুক্ত তরণী ও শোভা-যাত্রার উপযোগী, জলবিহারের উপযোগী, বেগমগণের উপযোগী বিবিধাকার প্রমোদ-তরণী থাকিবার কথা শুনা যায়। এ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু করদ রাজগণ বাদশাহের আদেশমত যথেষ্ট যুদ্ধ-তরণী ও দ্রব্যাদিবহনোপযোগী নৌ রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিতেন।

নৌ-ব্যবহার।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকেই 'আদিশূর' বলেন। সেই সময়ে কাশ্মীরাধিপতি এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার রাজকীয় তরণী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটস্থ গঙ্গাবক্ষে অবস্থিত ছিল। তাঁহার সমর-তরণী ছিল, তাহাও অবগত হওয়া যায়। সে কালের যুদ্ধ-নৌগুলির আকার কীদৃশ ছিল, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া দুষ্কর। [রাজতরঙ্গিণী দ্রষ্টব্য।]

এ দেশে যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই তাম্রশাসনখানি মালদহ জেলার খালিমপুর গ্রামে এক কৃষক প্রাপ্ত হয়। আমি তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কে সংবাদ দি। উক্ত তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝিতে পারি, সেই সময়ে রাজগণের সৈন্যসামন্তাদি সহ নদী পার হইবার জন্য "নৌসেতু" নির্ম্মিত হইত; এই তাম্রশাসনেই তাহা ক্ষোদিত রহিয়াছে; যথা,—

"স খলু ভাগীরথী-পথ-প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-
সম্পাদিত-সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ"—[২৫।২৬ লাইন]

নৌ-সেতু।

এই প্রকারের যে 'নৌসেতু' নির্ম্মিত হইত, তাহার উপর দিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, শকটাদি অক্লেশে নিরাপদে গমনাগমন করিত। অতএব, সেই সেতু-নির্ম্মাণের উপাদানস্বরূপ নৌসমূহ ক্ষুদ্র ছিল না।

প্রধান রাজনৌরক্ষক।

রাজসংসারে যথেষ্ট নৌ রক্ষিত হইত। এমন কি, প্রত্যেক গ্রামের আবশ্যক রাজকার্য্যের জন্য নৌ প্রস্তুত থাকিত। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ও হিসাব রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, এবং

পালরাজ্য-কালে।

তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এক ব্যক্তি থাকিতেন; তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত।

ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে তাঁহাকে "তরিক" বলা হইয়াছে। কোনও ব্যক্তিকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদানকালে "তরিক"কে উপস্থিত থাকিতে হইত, তাহা জানা যায়।

সেনরাজ্য-কালে।

পালবংশীয়গণের তাম্রশাসনগুলিতে নৌরক্ষকের কথা আছে, এবং আনুলীয়া (নদীয়া) গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ-শাসন ও সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্র-শাসনে আমরা রাজকীয় নৌরক্ষকের নাম পাই।—"নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষা-জাবিকা দিব্যা—" ক্ষোদিত আছে। সুতরাং সেকালে 'Naval force'এর এক জন সর্ব্বেসর্ব্বার সমাচার পাই। সেই প্রাচীন কালের রঘু রাজাও জলপথে সমর-তরণী লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। পাল ও সেনবংশীয় রাজগণের সময়ে জলযুদ্ধের জন্য সমর-তরণী ছিল, এবং রাজারা যে যথেষ্ট নৌ রক্ষা করিতেন, তাহার সমাচার তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ দেখি।

বল্লালী আমলে।

মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। একদা কোনও বিশেষ কারণে শীঘ্র পুত্রকে আনিবার জন্য মহেশ মাঝিকে আদেশ দেন। মহেশ মাঝির ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সে তীরবেগে নৌকা চালাইতে পারিত। মহেশ মাঝি রাজভোগ্য সুন্দর প্রমোদ-তরণী লইয়া অতিসত্বর যুবরাজ লক্ষ্মণকে আনয়ন করে। তাহাতে মহেশ মাঝি মহেশপুর গ্রাম প্রাপ্ত হয়। মহেশ মাঝি তখন জাহাজের কাপ্তেন ছিল। "নৌবল" তখন রাজ্যরক্ষার্থও অপরিহার্য্য ছিল।

মোসলমান কাল।—দেশী যুদ্ধতরণী।

হজরৎ পাণ্ডুয়ার বাদশা ইলিয়াস শাহ হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব করিয়া এবং বাঙ্গালীর নৌসেনাদের সাহায্যে আলিশাহাকে পরাজিত করেন। হাজি ইলিয়াস বাদশাহের যথেষ্ট সমর-তরণী ও নৌসেনা ছিল, তাহা অবগত হইয়া "দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ এক হাজার জাহাজের বহর লইয়া গৌড়ে আগমন করেন।" [শামস্ সিরাজ আফিক্।]

"মালদহ" যখন প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহার পরেও, অর্থাৎ "১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিখু শেখ নামক এক সওদাগর, তিনখানি জাহাজ বহুমূল্য বস্ত্রে পূর্ণ করিয়া পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ায় প্রেরণ করেন।" [সার জর্জ্জ উড্।] সেই কালে যে জাহাজ এ দেশ হইতে সমুদ্র-পথে প্রেরিত হইত, তাহার মাঝি মাল্লারা এ দেশী ছিল।

এই সময়ে "মনসা-মঙ্গল" প্রভৃতি মনসার গীতাদি এ দেশে রচিত ও লিখিত ও প্রচারিত হইতেছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ভিখু শেখের মত আরও কত শেখ হয় ত গৌড় বা মালদহ হইতে সুজনী, সুতী ও রেশমী বস্ত্র বোঝাই বড় বড় সমুদ্রপোত বিদেশে পাঠাইয়াছিল। তখনকার বাণিজ্য ব্যাপারের কথা এখন দেশে গল্পচ্ছলে প্রচলিত রহিয়াছে। মনসার গীতে কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ও মঙ্গলচণ্ডীর গীতে সাধুর বাণিজ্যের কথা লিখিত আছে। যে সময়ে গ্রন্থকারগণ পুঁথী লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে লঙ্কায় বাণিজ্য ব্যাপার মন্দীভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা তাহা বৃদ্ধাদিগের নিকট গল্প শুনিয়া সিংহলের বাণিজ্য অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে ভিখু শেখের মত মহাজনকে জাহাজ বোঝাই মাল সাগরবক্ষে ভাসাইতে দেখিয়া থাকিবেন। তখন সমুদ্র-তরণী কত বড় ও কি প্রকার নির্ম্মিত হইত,

তাহাও হয় ত দেখিয়া থাকিবেন ; তাই বনের কাঠ কাটিয়া নৌকা-নির্ম্মাণের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

সত্যনারায়ণী ক্ষুদ্র পুঁথিতেও সওদাগরের সিংহলে বাণিজ্য করিবার কথা লিখিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের কথা লিখিত আছে ; তাহাতে নৌশিল্প ও বাণিজ্যের কথাও আছে। গৌড়ে এখনও এক ধনপৎ সওদাগরের প্রবাদ শুনিতে পাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে উল্লিখিত যে ধনপৎ সওদাগর সুবর্ণপিঞ্জর প্রস্তুত করাইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তিনিই গৌড়ে বহুদিন ছিলেন। আমরা সে ধনপৎ ব্যতীত আর এক ধনপৎ নামক ধনকুবের বণিকের সন্ধান পাই। তিনি গৌড়ের শ্রেষ্ঠ বণিক্ ছিলেন। এ দেশে শতাধিক বর্ষের প্রাচীন একটি গম্ভীরার গীতে এই ধনপৎ সওদাগরের ঐশ্বর্য্যের মহিমাসূচক গীত আছে। গীতে প্রকাশ,—তাঁহার এত অধিক জাহাজ গৌড়বন্দরে অবস্থান করিত যে, সময়ে সময়ে গঙ্গা হইতে জল তুলিবার অবকাশ থাকিত না।

ধনপৎ-সওদাগর-বিষয়ক গম্ভীরার গীতের কিয়দংশ।

[ধনপতি সওদাগর ও পানীহারী (১)]

উত্তর-প্রতিউত্তর।

পাঃ হাঃ।—কিস্‌কে জাহাজ লাগি এহি গৌড়া সাহারামে।

সঃ দাঃ। - আরে হামা ধনপতি সদাগর আয়ি দিল্লী সারাবাসে।

পাঃ হাঃ।—ঘাট্‌সে জাহাজ বোহার দূরা লে যাও হে পানী ভারনেসে আয়ি।

সঃ দাঃ।—মাস্থলা দিয়া হম্বা লোওরা পঞ্চাশামে, ঐহিনা বাকৃশাকে আগে।

পাঃ হাঃ।—গৌড়ে কিনারা হায় ভাগীরথী নদী, জাহাজসে ছালিয়া হায় ধনপতি। সব্ ঘাট বন্দ কিয়া জাহাজ লোঙরাসে, নাহি আদ্‌মি পাবে পানী ভরনে।

আরে ঘারেলা (২) লে যাই সখিয়া গালি কারাইছে কাহাজে মোরা আয়ি।

সঃ দাঃ।—মোরা কাহাকে বো গালি দিয়া মেরি, কর ও নসিহত আজ তেরে পানীহারী। কেয়া বোলেগা মোকে এইসা বোলি। তেরে গোলাপ (৩) সে মারেলা জোতেরি কে এই সাম লুটিকে লেবণে আরে নাহি কারাজা ভৈজায়কে। (ইত্যাদি)

---

(১) জলানয়নকারিণী দাসী।

(২) কলসী।

(৩) বাহুল।

গৌড় নগরের যে স্থানে লোহাগড় ও পাতালচণ্ডী নামক স্থান, তথায় প্রাচীন কালে বাণিজ্যতরণী-রক্ষার বন্দর ছিল। দেশের লোকে ঐ স্থানকে পোতাশ্রয় বলিত। এই স্থানে প্রস্তরময় সুন্দর নৌরক্ষার স্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, এই স্থানে প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে লৌহের শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকিত; তাহাতে বাণিজ্যার্থ আগত পোত বন্ধন করিত। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই উক্ত শৃঙ্খল দেখিয়াছেন।

গৌড়বন্দরে লৌহশৃঙ্খল।

এই প্রকারের একটিমাত্র শিকল যে "লোহাগড়ে"র নিকট ছিল, তাহা নহে। গৌড়ের লোহাগড় হইতে উত্তরে অমৃতী (প্রাচীন রমতী) নগর—পীছলী গঙ্গারামপুর (বৌদ্ধ গৌড়) পর্য্যন্ত গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্ব বাঁধান ছিল। এই স্থান প্রাচীন কালে বাণিজ্যবন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং এখানে নৌবন্ধন উদ্দেশে লৌহশৃঙ্খল প্রস্তরস্তম্ভে আবদ্ধ থাকিত। "শিকল গাড়া" নামক স্থানের শিকলটি অনেকেই দেখিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে গৌড়াগত ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমনের কথা লিখিত আছে। কাহারা নৌকা নির্ম্মাণ করিত, নৌকানির্ম্মাতৃগণের প্রাথমিক সম্মান কি প্রকার করিবার প্রথা সে কালে প্রচলিত ছিল, কি প্রকারে কোন্ কোন্ কার্ষ্ঠে নৌকা নির্ম্মাণ করিত, কোথায় কাহারা বৃক্ষচ্ছেদন করিত, নৌকার কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ জাতীয় কার্ষ্ঠের ব্যবহার হইত, নৌকার মন্দির কীদৃশ ছিল, যে সময়ে নৌকা ব্যবহৃত হইত না, তখন নৌকা কি প্রকারে রক্ষিত হইত, ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ এই চণ্ডী ব্যতীত অন্যান্য পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়।

ধনপতি সিংহল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বাণিজ্যপোতগুলি "ভ্রমরা"র জলে ডুবান ছিল। সে কালে সওদাগর বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার নৌকাগুলি জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইত। তাহাতে নৌকা ভাল থাকিত। ডুবারু আনিয়া ভ্রমরার জল হইতে নৌকা তুলিবার উদ্যোগ,—

"পূর্ব্ব হৈতে আছে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে। ডুবারু লইয়া সাধু গেলা তার কূলে॥"

সওদাগরেরা কথায় কথায় জলদেবতার পূজা দিতেন; কারণ, জলপথেই তাঁহাদের গতিবিধি। সওদাগর ভ্রমরার কূলে জলদেবতার পূজা দিলেন। তৎপরে দুই জন ডুবারু ভ্রমরার জলে নামিল।

নৌ-উত্তোলনকারী ডুবুরীর কথা।

তখন এ দেশে যথেষ্ট ডুবারু ছিল, এবং আধুনিক কালের ন্যায় ডুবারুর পরিচ্ছদ না থাকিলেও, সে কালে ডুবারুগণ নির্ভয়ে অনায়াসে গভীর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া জলমগ্ন নৌকার ও মুক্তাশুক্তির অনুসন্ধান করিত। সেকালে এক এক জন ডুবারুর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কেহ জলে ডুব দিবামাত্র জলের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় অবস্থা অবগত হইত। গ্রন্থাদিতে আমাদের দেশের ডুবুরীদের কথা কিছু অতিরঞ্জিতভাবে লিখিত হইলেও, তাহা অলীক বলিবার উপায় নাই। যখন "মুক্তাশুক্তি" উত্তোলন করিতে পারিত, বড় বড় নৌকাগুলি জলমগ্ন থাকিলে ডুব দিয়া তাহার সন্ধান করিতে পারিত, তখন বাঙ্গালার ডুবারীগণ বিখ্যাত ছিল। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,—

"এক ডুবে যাইতে পারে অর্দ্ধেক সাগর॥"

ডুবারুগণ একে একে ধনপতি সওদাগরের ডিঙ্গাগুলি তুলিতে আরম্ভ করিল।

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণের বান্ধা যার বৈঠকীর ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যায় মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গা খান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আনী গজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দু কূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটমুট।
যাহে গুরা দিল চালু বায়ান্ন পউট॥"

মধুকর ডিঙ্গাটি সুন্দর। তাহার বসিবার বৈঠকখানা (মন্দির) সোনার পাত মোড়া, এবং সোনার কাজ করা। তবে তাহাতে কত মণ ভার ধরিতে পারে, তাহার কথা নাই। "দুর্গাবর" ডিঙ্গাটি "আখণ্ড" নামক নৌকার স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় পশ্চাৎ পর্য্যন্ত) নৌকার দাঁড়ীরা বসিয়া দাঁড় বাহিত। সম্ভবতঃ ইহাও দ্রুতগামী ছিল। "গুয়ারেখী" ডিঙ্গাখানির মালুম কাঠ দেখিয়া দুই প্রহরের পথ যাইতে পারে। "মালুম কাঠ"=মাস্তুলের কাঠ। দুই প্রহরের পথ নৌকাখানি গমন করিলেও, গুয়ারেখীর "মালুম কাঠ" দূর হইতে দৃষ্ট হইত, সুতরাং "গুয়ামুখী" আকারে ও উচ্চতায় সুবৃহৎ ছিল।

"শঙ্খচূড়" একখানি বড় জাহাজ বলিলেই হয়; কারণ, "আনী গজ পানী ভাঙ্গে।" সাধারণতঃ মাঝিগণ তাহার নৌকা কত হাত পানী ভাঙ্গিতে পারে— জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "এ নৌকা তিন হাত বা এত হাত জলের উপর দিয়া যাইতে পারে।" এ হিসাবে বলিলে একশত, ষাট হাত গভীর জল

নহিলে "শঙ্খচূড়" যাইতে পারে না। ইহা বিশ্বাস করা চলে না ; তবে "গাঙ্গের দু কূল" শব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, নৌকাখানি আশী গজ চওড়া ছিল। সেকালে এ দেশে এত বড় বাণিজ্যপোত ছিল, তাহা হয় ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না ; কিন্তু অবিশ্বাসের ত কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। "চন্দ্রপাল" নৌকা অতি সুন্দর ছিল। যখন নদীমধ্য দিয়া গমন করিত, তখন তাহার সৌন্দর্য্যে নদীর উভয় তীর আলোকিত হইত। "ছোটমুখী" ডিঙ্গাতে বায়াম পৌটি "চালু" বোঝাই করা চলিত। আজকাল চল্লিশ মণে পৌটি হয় ; সুতরাং ২০৮০/০ মণ চাউল "ছোটমুখী"তে বোঝাই করা চলিত।

জল হইতে ডিঙ্গা "ডাঙ্গা"য় তুলিতে হইত, এবং তাহা ঘষিয়া পরিষ্কৃত করিয়া "গাহিনী" করিতে হইত। সূতার পলিতা পাকাইয়া নৌকার জোড়ের মধ্যে যে স্থানের সংযোগ কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, বোধ হইত, সেই স্থানে প্রেক দ্বারা পলিতাটি ক্ষুদ্র মুদ্গরের সাহায্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। তৎপরে জোড়ের মুখে "মোম ধূনা দিয়া সাধু গাহিল সাত নায়।" নৌকায় "গাব-কালী" দেওয়াটা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাহাই হউক, এই প্রকারে সে কালে বাণিজ্যার্থ নৌকা সাজাইয়া সাধু গাবর-গণকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন।

নৌকার এক অংশের নাম "রই-ঘর" ছিল। এই "রই-ঘরে" সওদাগর অবস্থান করিতেন। "রই-ঘর" অর্থে প্রধান ঘর ; "রই-কাঠ" অর্থেও নৌকার প্রধান কাষ্ঠখণ্ড।

"হাতে কেরোয়াল সব বসিল গাবর।"

হাতে দাঁড় ধরিয়া দাঁড়ীরা বসিল। সে কালে নৌকায় দাঁড়ী মাঝি ব্যতীত প্রহরীও লইতে হইত ; কারণ, পথে জলদস্যু ও স্থলদস্যুর যথেষ্ট ভয় ছিল। সেই জন্ত "দণ্ডধারী" ও "রায়বাঁশ" লইয়া কেহ কেহ রহিল। কতকগুলি লোক "ফাঁস" হস্তে করিয়া রহিল। ফাঁস দ্বারা কি কার্য্য হইত? দস্যুগণের মধ্যে এই ফাঁস ছুঁড়িয়া আকর্ষণ করিলে, কাহারও কাহারও গলদেশে ফাঁস আবদ্ধ হইত, এবং দস্যু ধৃত হইত।

জানা গিয়াছে, এই প্রকার মহাজনের নৌকায় অন্যান্য ক্ষুদ্র বণিক্-গণও মালপত্র বোঝাই দিয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা করিত। নৌকাপতি কমিশন্ পাইতেন মাত্র। যাত্রীর নৌকায় মালপত্র বোঝাই করা হইত না।

মালের জন্য স্বতন্ত্র নৌকা যাত্রীর নৌকার পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নৌকায় জাতীয় পতাকা উড়িত। পাল উড়াইয়া দিত, কিন্তু দাড়ীরা দাঁড় ফেলিয়াও নৌকা চালাইত। নৌকার আরোহী, দাঁড়ী, মাঝি ও রক্ষকগণের জন্য সমুদ্রে পতিত হইবার পূর্ব্বেই "নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।"

এক্ষণে আমরা দুই শতাধিক বর্ষের পুরাতন পুঁথি হইতে নৌকানির্ম্মাণ-প্রণালী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। মালদহের জগজ্জীবন কবির প্রণীত "মনসা-মঙ্গল" হইতেই প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আনিল ছুতোর নেঙ্গা শিষ্যগণ সাথে। চান্দ বলে কুশাই তাম্বুল খাও ধর।
বাণিএ্যাকে প্রণাম করিল জোড় হাতে॥ যাইব পাটনে চোদ্দ ডিঙ্গা সাজ কর॥"

চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যে গমন করিবেন বলিয়া কুশাই মিস্ত্রীকে ডাকিয়া "গুয়াপাণ" দিয়া তাহার সম্মান করা হইল। চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা বাঁধিবার আদেশ দিলে কুশাই বহু শিষ্যগণ সহিত কাষ্ঠের অনুসন্ধানে চলিল।

"চলিল কুশাই সঙ্গে লএ্যা শিষ্যগণ। নানাজাতি বৃক্ষ কাটে প্রবেশিয়া বন॥"

সে কালে নগরের অনতিদূরে অরণ্য ছিল। নগরবাসিগণের কাষ্ঠের প্রয়োজন হইলে উক্ত বনভূমি হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিত। নৌকা প্রস্তুত করিতে হইলেও বড় বড় নৌনির্ম্মাণ-কারখানার প্রধান অধ্যক্ষ বহু শিষ্য লইয়া অরণ্য হইতে আবশ্যক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা নৌ-নির্ম্মাণাদি পরিসমাপ্ত করিত। এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ বৃক্ষ কুশাই ছেদন করিতেছে;—

"শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি। আম্র কাঁঠাল কাটে কাটয়ে বকুল।
কাটিল নিখেরগাছ গাম্ভারি পারলি॥ চম্পা খিরনি কাটি করিল নির্ম্মূল॥"

এই প্রকার কয়েক জাতীয় বৃক্ষ ছেদন করিয়া আবশ্যকমত খণ্ড খণ্ড করিল, এবং সারি সারি ফেলিয়া রাখিল। পরে,—

"চিরিএ্যা করিল কালি লক্ষ তিন চারি॥" * * *

"বাছিএ্যা বসায় কাদা, কর্ম্মকর ভাল। আসন বাজিএ্যা বাগে আরক জলই পাট।
সারি সারি বসাইল লোহার গজাল॥ বাজিয়া গোলা তোলে মানুষ কাট॥"

সে কালে নৌকার নামকরণ-পদ্ধতি সুন্দর ছিল। কিন্তু সওদাগরগণের মধ্যে কতিপয় নৌকার নাম বড় প্রিয় ছিল; সে কারণ দেখিতে পাই, অনেক পুঁথিতে একই রকমের কয়েকটি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

চাঁদ সওদাগরের যে চৌদ্দখানি ডিঙ্গা প্রস্তুত হইল, তাহার বিবরণ দেখুন,—

"প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর। বান্ধিয়া মোহন গিরি পরম আনন্দ॥
রায়, মহাভেরা, মুরা, ধাউরা, ভ্রমর॥ সারঙ্গিয়া জাহাজ গোয়া আর শান সই।
শীতপপাটি উভমুখী কোচ কুড়াবক। চৌদ্দটি ডিঙ্গা করে আগে বাণিজ্যার ঠাঁই॥"

এই প্রকারের চৌদ্দখানি বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইলে, সাধু "মধুকরে" আরোহণ করিয়া গমন করিলেন ;—

"মধুকরে বসিয়া, আদেশ করে বাণিজ্যা,
ডিঙ্গা মেগ গাবরিয়া ভাই।"

কাণ্ডারীগণকে ও গাবরগণকে নৌকায় অবস্থান করিতে বলিল। কাণ্ডারী বাণিজ্যপোতের "হাল" ধরিত ; গাবরেরা দাঁড় টানিত ; এবং খালাসীরা কাজ করিত। কাণ্ডারী সারঙ্গের কাজ করিত। সেকালে "পাইলট্"ও ছিল। মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গলে" সে কথার আভাস আছে ;—

"আনিল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত। দিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ॥"

বাঙ্গালায় দেশী জাহাজী পাইলট্‌দিগকে দিশারু বলিত।

গৌড় নগরে নৌনির্ম্মাণ-স্থান।

বৌদ্ধ গৌড়ের অনতিদক্ষিণে, সোনাতলা ও কাঞ্চন সহরে বিস্তীর্ণ নৌশিল্পের কারখানা ছিল। প্রবাদমূলে অবগত হওয়া যায়, এই স্থানে অতি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোত ও সমরতরণী নির্ম্মিত হইত। তদ্ব্যতীত "খেল্‌নার না", বিবিধ প্রমোদ-তরণী ও ছোট ছোট "কোষা" নামক ক্ষুদ্র সমর-নৌ নির্ম্মিত হইত।

গৌড়ীয় নৌ-নির্ম্মাণ-স্থান।

মোসলমান গৌড়ের উত্তরপূর্ব্বাংশে "চিরাইবাড়ী" নামক স্থানে বাদশাহী আমলে বিস্তীর্ণ নৌনির্ম্মাণ-কার্য্যালয় ছিল। প্রবাদমূলে অদ্যাপি অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে রাজকীয় নৌ-নির্ম্মাণ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাতে সহস্রাধিক শিল্পী কর্ম্ম করিত। গৌড়ের সমুদায় আবশ্যক নৌ নির্ম্মিত হইত।

ভগ্ন বা জীর্ণ নৌসমূহ এই স্থানে সংস্কৃত হইত। সরকারী কর্ম্মস্থান ব্যতীত বড় বড় সূত্রধরের নৌ-নির্ম্মাণ-কারখানা এই স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে নৌ-নির্ম্মাণার্থ কাঠ চেরাই হইত ; তাহার শাল বহু দূর হইতে

শ্রুত হইত। সাধারণ পথিকগণ ইচ্ছা করিয়া চেরাই-বাড়ীর কর্কশ শব্দে বিরক্ত হইয়া উক্ত স্থানে গমন করিত না। প্রতিদিন দেশ বিদেশের বণিগ্‌গণ বড় বড় নৌকা ক্রয় করিবার জন্য এই চেরাই-বাড়ীতে আগমন করিত।

পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত নৌনির্ম্মাণ-স্থান।

হজরৎ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে "পালখানদীঘী" নামক এক প্রাচীন দীঘী আছে। পূর্ব্বে এই দীঘীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। তৎপরে মহানন্দা বিস্তীর্ণ জলময়ী মূর্ত্তিতে প্রধাবিত হইত। সেই সময়ে "মোড়-বল্লার ভিটা" নামক স্থানে—মহানন্দা তীরবর্ত্তী স্থানে পাণ্ডুয়া হইতে নদীতীরে গমনাগমনের জন্য একটি রাজমার্গ বিস্তারিত ছিল। "মোড়বল্লা" একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও বন্দর হইতে নগরে প্রবেশ করিবার সুরক্ষিত দুর্গদ্বার ছিল। সম্ভবতঃ এইটিই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। পালখান দীঘী ইহার সন্নিহিত। এই স্থানে "বেণিয়া-পাড়া" নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই বেণিয়া-পাড়ার অনতিদক্ষিণে বল্লাল কাঠাল। "কাঠাল" অর্থে অরণ্য। মোড়বল্লাল হইতে বল্লালনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের পার্শ্বে "লাঘাটা"য় নৌশিল্পের প্রাচীন কারখানা ছিল। প্রাচীন সূত্রধর-বংশীয়গণ ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান বলিয়া গল্প করিয়া থাকেন। এই বেণিয়া-পাড়ার বণিকগণের বাণিজ্যপোত ছিল। তাঁহারাও চাঁদ সওদাগরের ন্যায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

"মহাস্থান" নামক স্থানে বেণিয়াগণের সমাজ ছিল। তথাকার সাধুগণ পুনর্ভবা বাহিয়া বড় বড় নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া গৌড় ও সপ্তগ্রাম হইয়া সিংহলে যাইতেন।

অলঙ্কার কুণ্ড নামে ভালুকীর এক বেণে ছিলেন। বর্দ্ধমানের ধুস দত্ত— "ষোল শো বেণের মাঝে যাহার মহত্ব", ইছানী নগরের লক্ষপতি সাধু ও এইরূপ বহু সাধু সে সময়ে বড় বড় বাণিজ্যতরণী লইয়া বাণিজ্য করিত। গৌড়ের সাকরমা গ্রামের গর্ব্বেশ্বর দত্ত (প্রাচীন পুঁথি লেকমাল্লিকা) এক জন শ্রেষ্ঠ বণিক্ ছিলেন। ইঁহারাও বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে গমন করিতেন। ইঁহাদেরও বাণিজ্যতরণী ছিল।

মোগলপাঠান রাজত্বের সময় সাধুগণের বাণিজ্যতরণী লইয়া বিদেশ-ভ্রমণ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে আরবাদি দেশের বণিগ্‌গণ

এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। রোমান্‌, গ্রীক্‌, রুস প্রভৃতি দেশের বণিগ্‌গণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন।

অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ হইতে কার্পাসবস্ত্র রোমে নীত হইত।

"More than eighteen hundred years ago, they were used to be taken far away to Europe, to the great city of Rome. They were highly prized there and were called by the Romans 'Karpas' which is the Bengalee name for cotton."—History of Bengal.

"It is not improbable that the vessels which were engaged in this trade, went up the great river, the Padma to Sonargang to purchase their merchandize"—H. B.

আমরা ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোতারোহণে দূরদেশে গমনের বহু প্রসঙ্গ অবগত হই। সিরীয়া-নিবাসী বারদিসানেসের ভারত-কথা অতিরঞ্জিত হইলেও মধুর বটে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের রাজদূতের প্রমুখাৎ ভারত-কথা শুনিয়া তিনি ভারতের অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বৈশ্যগণ তখন বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু জানা যায়, ব্রাহ্মণগণও সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য করিতেন।

ডিওন খ্রুসোসটস্‌ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভারতীয় বণিগ্‌গণ সমুদ্রপথে অর্ণবপোতারোহণে ভারত হইতে দেশান্তরে গমন করিতেন। গ্রীকেরা তাঁহাদের দেশের যে নাবিক ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহাকে "ইণ্ডিকো-প্লিউ-ষ্টেস্" বলিতেন। এ ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় হইতে সিংহলে ও যবদ্বীপাদি স্থানে বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া গমন করিবার কথা কি অলীক ?

কয়েক জন বৈদেশিক মোসলমান বণিকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। তাঁহারা আরবাদি দেশ হইতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়া এ দেশে বাস করেন, এবং শেষজীবনে "ফকীরী" লইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু তাঁহাদের নাম ইতিহাসে লিখিত থাকা আবশ্যক। এ দেশে হিন্দু বেণিয়া-(সাধু)-গণের বিদেশ-গমন কিছু মন্দীভূত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বিদেশী আরবীয়গণের দস্যুতায় এ দেশের বণিকগণ বাণিজ্যার্থ আর সমুদ্রপারে গমন করিতেন না। এই দুঃখের কথা স্বর্গীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী গাহিয়াছেন,—

"বিংশতি বৎসর হৈল,   রঘুপতি দত্ত মৈল,
ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন।
আর সব সদাগর   তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥"

যে বাণিজ্যে গৌড়ীয় বেণিয়াগণ কোটীপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি কারণে সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন? মোসলমান আমলে অত্যাচারের ভয়ে বেণিয়ারা বিদেশে গমন করিত না। ক্রমে দেশে বসিয়া কেহ লবণ, কেহ বেণিয়াদী বব্বালের দোকান খুলিল। তখন তাহারা মোসলমান সওদাগরের নিকট পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ কেহ হাটে মাথাঘষা আমলা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মহাজনী ও ঋণদান করিয়া কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করিল। তার পর ত আইনের বলে এ দেশের জাহাজ-নির্ম্মাণ ও জাহাজ বোঝাই করিয়া মাল বিদেশে লইয়া যাওয়া উঠিয়া গিয়াছিল।

গৌড় কতক পরিমাণে হতশ্রী হইতে আরম্ভ হইলে, যে কয়েক জন বৈদেশিক বণিক্ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

(১) চম্বল আলী; (২) মিঞা ওলি; ও (৩) মাসুম শাহ। এই তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিন জন মোসলমান বণিকের পরস্পরের সহিত কুটুম্বিতা ছিল।

চম্বল আলি বোগদাদ হইতে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। তিনি যখন গৌড় নগরের সন্নিহিত পূর্ব্বপার্শ্বস্থ পদ্মাবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি দূর হইতে গৌড় নগরের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড় নগরের পরপারস্থ গোহালবাড়ী—('প্রাচীন নাম অজ্ঞাত; সম্ভবতঃ সুন্দরাবাড়ী নামে সেকালে পরিচিত ছিল।) গ্রামে তরণী হইতে অবতরণ করেন, এবং গোহালবাড়ীই ব্যবসায়ের স্থান মনে করিয়া এই স্থানে বাস করেন। গোহালবাড়ীতে সেই সময়ে বহু বস্ত্ররঞ্জক-দিগের বাস ছিল। এ দেশে তাহাদিগকে "রংরেজা" বলিত। এই স্থানে সে কালে মাথার পাগড়ী প্রস্তুত হইত। দেশের রমণীগণ "সুজনী" প্রস্তুত করিত। গোহালবাড়ীর বন্দরে এই সব দ্রব্যের যথেষ্ট আমদানী হইত। কেহ কেহ বলেন,—"বরখা গাজীর দরগা" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। যাহাই হউক,

গোহালবাড়ীর বরখা গাজীর দরগার ও তন্নিকটবর্ত্তী "বরখা পীরের পখুরে"র সন্নিকটে চম্বল আলী আপন বাসভবন নির্ম্মাণ করেন, এবং এ দেশে থাকিয়া কয়েকবার বাণিজ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চম্বল আলী সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আসেন নাই; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ "বরখা পীরে"র দরগা নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই বংশের লোক বিদ্যমান আছেন। চম্বল আলীর মাথার পাগড়ী, মশারি ও পিত্তলের খাট অদ্যাপি যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে।

মিঞা ওলি।

মিঞা ওলির আদি বাসস্থান আরবদেশ। তিনি বাণিজ্যব্যপদেশে গৌড়ে আগমন করেন। তাঁহার জাহাজ পিছলী গঙ্গারামপুরের মোহানা দিয়া গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বে আগমন করে। আমাদের বোধ হয়, গৌড়ের ধ্বংস হইলে পর যখন মালদহ অতুল ঐশ্বর্য্যে ও বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে মিঞা ওলি মালদহে বাণিজ্য করিতেন। তিনি তুলা, রেশম, মালদহের সুজনী, রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক নৌকা ছিল। একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলেন, "বাবা, তোমার নৌকা কতগুলি হইয়াছে, একবার দেখিব।" তাহাতে মিঞা ওলি তাঁহার নায়ের গাবরদিগকে প্রতি নৌকা হইতে এক জন হিসাবে একটি করিয়া দাঁড় হাতে করিয়া আসিতে বলেন। তাহাতেই তাঁহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল!

মাশুম্ শাহ।

পুরাতন মালদহের সন্নিকটে "মোগলটুলী" নামক মহল্লায় আরবাগত প্রসিদ্ধ বণিক্ মাশুম শাহ অবস্থান করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম মালদহের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া এই স্থানেই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মালদহের চালসেপাড়া, শর্ব্বরী প্রভৃতি স্থানের 'সুজনী' ক্রয় করিতেন। এক্ষণে মালদহী সুজনী নামে যাহা পরিচিত,—বলিতে কি, পূর্ব্বকালের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সেকালে অধিকাংশ রমণীই সুজনীর কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মতি ও মুগার ঝালর দেওয়া রেশমী সুজনী সে কালে বাদশাহ ও বেগমগণের প্রিয়বস্তু ছিল। সেই সময়ে মালদহের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যথেষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত

হইত। মাশুম শাহের সেই সকল স্থানে গদী ছিল; মালদহের শান্তিপুর, ঢাকা, বরেন্দ্রনগর, জগন্নাথপুর, চোরাড্যাং কালকামারা, পীরের ড্যাং, শিরসি, পিরোজবাদ, মনসুর ড্যাং, উচ্‌লা, বর্ম্মচাল প্রভৃতি প্রধান ছিল।

মাশুম শাহের ভ্রাতা মালদহের কাটরা নামক সুরক্ষিত সুন্দর বাজার নির্ম্মাণ করান। এই বাজারেই তাঁহাদের গুদামখানা ছিল। বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া বহু বণিক্ নির্ভয়ে এই কাটরার বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতেন।

মাশুম শাহের শতাধিক সুবৃহৎ অর্ণবপোত ছিল। তাঁহার পোতারোহণে অনেক বণিক আরবাদি দেশ হইতে এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, এবং এ দেশী পণ্যভার লইয়া স্বদেশে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেন। শেষজীবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরম ধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচিত ও সাধারণের সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি বহুমূল্য পণ্যপরিপুর্ণ বাণিজ্যতরী সাগরগর্ব্ভে নিমগ্ন হয়। এই সংবাদ যখন তিনি শ্রবণ করেন, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবনে আমার জাহাজ মারা পড়ে নাই, নিশ্চয় আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে!' এই বলিয়া তিনি বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন।

মালদহের মোগলটুলী নামক স্থানে মাশুম শাহের সুন্দর আবাস ছিল। তাঁহার বংশধরগণের নিকট অবগত হওয়া যায়, তিনি পুরাতন মালদহের মোগলটুলিস্থ সুন্দর "জুম্মা মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করেন। মালদহের প্রাচীন মস্‌জিদগুলির মধ্যে এই জুম্মা মসজিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মসজিদের নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এই মসজিদকে কেহ কেহ সোনা-মসজিদও বলিয়া থাকে। মসজিদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত আছে। সম্রাট আকবরের সময় ১০০৪ হিজিরায় এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। র‍্যাভেন্‌শা বলেন, "এই মসজিদ ৯৪৭ হিজিরায় (১৫৬৬ খৃঃ) মাশুম নামক বণিক্ নির্ম্মাণ করেন।" এই মসজিদটি যে মাশুম শাহার নির্ম্মিত, এই প্রবাদ এ দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। মাশুম শাহার উত্তরাধিকারিগণের মুখেও আমি অনেকবার এই কথা শুনিয়াছি।

এই মস্‌জিদটি মিশ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত, এবং ইহাতে হিন্দু দেবালয়ের প্রস্তর ইষ্টকও যথেষ্টপরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই সময়ে মালদহের ধর্ম্মকুণ্ড, দেবকুণ্ড, কালিয়াদহ ও নাগদহ নামক স্থানে যথেষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর দেবালয় ছিল। সে কালে মূর্ত্তিদ্বেষী মোসলমানগণ হিন্দুদের

দেবালয় ভগ্ন করিয়া তাহারই উপাদানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসিত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। এই মসজিদের পশ্চিমে বাঁধান সিঁড়ি মহানন্দায় গিয়াছে; এবং তাহার পার্শ্বে অনেকগুলি কবর আছে; সম্ভবতঃ মসজিদের খিজমদগারদের, অথবা তাঁহার আত্মীয়গণের সমাধি হইতে পারে।

এই মসজিদের কতক অংশ ইষ্টকে ও কতক অংশ প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রধান প্রবেশদ্বার কোনও হিন্দু দেবালয় হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। কোনও কোনও প্রস্তরে মোসলমানগণের শিল্পকলার নিদর্শন বিদ্যমান। মসজিদস্থিত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৭৯ হিঃ ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা মাশুম সওদাগর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রস্তরলিপিতে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল;—

Translation :—This place of worship became Known in the world and was called in India by the name of Kaba, as it was the second Kaba, the date is disclosed in Baitullah haram Masum 1566 A. D.

র‍্যাভেনশার মতে,—

From the above inscription it is known that the Mosque was built by one Masum sadagar in 979 A. H. (1566 A. D.).

এই মসজিদের চারি কোণে চারিটি সুউচ্চ মিনারেট ছিল। মাশুম সওদাগর নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি হাজী আবদুর কাদেরের পুত্র গোলাম গাউস নামক সৎ বালককে পোষ্য গ্রহণ করেন। শুনা যায়, হাজী আবদুর কাদেরও এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন যাহাই হউক, তিনি এক জন সিদ্ধ পীর ছিলেন। দিনাজপুর, ঘাটনগর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

গোলাম গাউস, মোগলটুলীতে বাস করিতেন না। নিমাসরাই নামক স্থানে যথায় প্রাচীন মিনারেট বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার পার্শ্বেই গোলাম গাউসের বাটী ছিল। মিনারেটটি তাঁহার সুবৃহৎ ইষ্টক-গৃহের পার্শ্বেই ছিল। মিনারেটের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তাঁহার একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। গোলাম গাউসের বংশধরগণ বলেন,—সেই মসজিদটি হাজী আবদুর কাদেরের প্রতিষ্ঠিত। নিমাসরাই মিনারেটটি যে উদ্দেশ্যে যে সময়ে নির্ম্মিত হউক না, হাজী সাহেবের সময় উহার উপর হইতে আজান দেওয়া হইত। উহা

হাজী সাহেবের কীর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত। মহরম, ইদ ও বকরাইদ উপলক্ষে এই মিনরেট মশালে ও আলোকমালায় শোভিত হইত। হাজী সাহেব ও গোলাম গাউসের জীবিতকালে মহরমের সময়ে নিমাসরাই নামক স্থানে মেলা বসিত, এবং উৎসব হইত। বেগমাবাদের পীরের দরগা হাজী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে তিনি যোগসিদ্ধ হয়েন। বেগমাবাদে সে কালে শতাধিক ফকীরের বাসস্থান ছিল। তাঁহারা যথেষ্ট নিষ্কর পীরাণ ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

এই স্থানের জঙ্গলাবাদে জঙ্গলী ফকীরের আস্তানা ছিল, এবং বহু সুমিষ্ট আম্রের মনোহর উদ্যান ছিল। কুমারবাগ একটি মনোহর সুমিষ্ট আম্রের উদ্যান ছিল। বাগবাড়ীও উদ্যান ছিল। গৌড়ের কোনও বেগম বেগমাবাদের ভূসম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, এবং বাগবাড়ী নামক স্থানে পুষ্পকানন ও সুমিষ্ট বিবিধ বিদেশজাত ফলফুলের উদ্যান করিয়াছিলেন। এই উদ্যানবাটী বেগম সাহেবার প্রিয় বিলাসনিকেতন ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম গণিপুর ছিল। তথায় বৌদ্ধদের একটা ষড়ভুজা শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ টামনা দীঘীর উত্তর পার্শ্বে এই দেবীর মন্দির ছিল। বেগম সাহেবা তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাতে এনামেল ইষ্টক দিয়া একটি সুন্দর মসজেদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগবাড়ীর প্রকাণ্ড তোরণ উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তোরণের দক্ষিণে পীরের ক্ষুদ্র দরগা ছিল। যে সময়ে বাগবাড়ীতে মোসলমান পল্লী বসিয়াছিল, সেই সময়ে কালু নামক এক হিন্দু মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাগবাড়ীতে পীর হয়েন। তাঁহারা চারি ভাই ছিলেন। তাঁহাদের কবর ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত পীরের আস্তানা "খোঁড়া পীরে"র দরগা বলিয়া খ্যাত। অদ্যাপি তাঁহাদের দরগা রথবাড়ীর সন্নিকটে রাজমহল রাস্তার পার্শ্বে বিদ্যমান। বাগবাড়ীকে লোকে ভ্রমক্রমে "বল্লালবাড়ী" নাম দিয়া ও শুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া, মহান্ ঐতিহাসিক ভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহাই হউক, গোলাম গাউসের বংশে গোলাম হোসেন নামক এক ফকীরের জন্ম হয়। তিনি পীর ছিলেন। তাঁহার পুত্র শের আলি বর্ত্তমান। তাঁহার নিকট আমি বহু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। শের আলি মিঞা এক্ষণে গোহালবাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মাথার পাগ, মশারি, বিছানার চাদর ও পিত্তলময় খট্টা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

গোলাম গাউস এক জন সিদ্ধপীরছিলেন। তিনি মালদহের অঘোরী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অনেক গল্প আছে। পল্লীকথায় তাহা লিখিত হইয়াছে।

দিনাজপুরের বিবি কিশোরী তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন এক টাকা করিয়া মুরশীদের প্রণামী দিতেন। বগুড়ায় তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। গোলাম গাউসের শ্বশুরালয় আরাপুরে ছিল। আরাপুরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। শুনা যায়, হাজী আব্দুর কাদেরের বিবাহ আরাপুরে হয়। তাঁহার সমাধি পুনর্ভবাতীরে ঘাটনগরে বিদ্যমান আছে। তিনি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। চামুস্ আলি তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। আরাপুরে তাঁহার কবর আছে।

গোলাম হোসেনের স্ত্রী নিমাসরাই-এর প্রসিদ্ধ মিনারেটের (১) পার্শ্বস্থ অট্টালিকা বিক্রয় করিয়া গোহালবাড়ীতে বাস করেন।

গৌড়ীয় পাদশাহী আমোলের সমসাময়িক তরণীর কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

শ্রীহরিদাস পালিত।

বিদেশী গল্প।

অতিথি।

পুষ্পচিত্রে সিদ্ধহস্ত, চিত্রকর গ্যামিচেট্ সেন্ট্ ল্যাজের ষ্টেশনে পাদচারণ করিতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিল! চিত্রকর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিচিত ডাক্তার রিগড্ সম্মুখে দণ্ডায়মান।

শিল্পী বলিলেন, "এ কে? ডাক্তার যে? বহুদিন পরে আপনাকে দেখিলাম।"

করমর্দ্দনের পর ডাক্তার বলিলেন, "আমার চিত্রের কি হইল?"

গত শীতঋতুতে কোনও নাচের মজলিসে উভয়ের পরিচয় হইয়াছিল। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা-কালে ডাক্তার চিত্রকরকে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিবার ফরমাস দিয়াছিলেন। সহসা সেই কথা স্বপ্নদৃষ্টবৎ তাঁহার মনে উদিত হইল। সে কথা এত দিন তাঁহার মনেই হয় নাই। ডাক্তারের অত্যন্ত 'ভোলা মন,' তাহা তিনি জানিতেন। বিশেষতঃ, এত দিনের মধ্যে ডাক্তার রিগড্ সে বিষয়ের আর কোনও উল্লেখও করেন নাই। সেই জন্য চিত্রকর ভাবিয়াছিলেন, ডাক্তার

১। কালিন্দী এবং মহানন্দার সঙ্গমস্থলে দিল্লীর 'Elephant tower'এর আদর্শে নির্ম্মিত একটি সুন্দর মিনারেট।

তাঁহার ফরমাসের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। এমন কি, চিত্রের বিষয় পর্য্যন্ত গ্যামিচেটের স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

চিত্রকর বলিলেন, "কোনও পুষ্পের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, এইরূপ কথা ছিল না ?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, চিত্রের বিষয়—গোলাপফুল।"

চিত্রকর বলিলেন, "এত দিন সময়ই পাই নাই। এবার গোলাপফুল ফুটিলে আপনার চিত্র পাইবেন।"

"রুয়েলে এখন যথেষ্ট গোলাপফুল ফুটিয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যে রকম ফুল চাহেন, পাইবেন। চলুন, আজ আমার ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ।"

এমন মধুর রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে গ্যামিচেটের চিত্রাগারে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাহইতেছিল না। সুতরাং তিনি ডাক্তারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন উভয়ে টিকিট কিনিয়া রেলযোগে রুয়েল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে ডাক্তারেরগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী উভয়কে বহন করিয়া পাগ্‌লাগারদের—ডাক্তারের আবাসের—অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

উচ্চ কারাপ্রাচীরের গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে গ্যামিচেটের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তোরণ উদ্ঘাটিত হইলে যখন পুষ্পোদ্যানের উজ্জ্বল শ্রী তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হইল, তখন তাঁহার মন হইতে বিভীষিকা অন্তর্হিত হইল।

প্রাচীরগাত্রে গোলাপ, আইভী ও নানাবিধ লতা ; অট্টালিকার সম্মুখে পার্শ্বে সর্ব্বত্র শ্যামল তৃণচিত্রিত ক্ষেত্র ; প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবকে বৃক্ষগুলি আচ্ছন্ন ও নত।

ডাক্তার রিগড্ অতিথিকে তাঁহার বিচিত্র গোলাপকুঞ্জে লইয়া গেলেন। চিত্রকর তথায় সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্টজাতীয় গোলাপের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত, পুলকিত ও আনন্দিত হইলেন।

"সত্য বলিতে কি, ডাক্তার, উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া এরূপ মনোরম স্থলে আসাও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া আমার মনে হয়।"

মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তাই কি ? যাহা হউক, আপাততঃ আপনাকে একাকী রাখিয়া আমি আমার রোগীদিগকে দেখিতে যাইতেছি ; কিছু মনে করিবেন না। এই সময় প্রত্যহ আমি তাহাদিগকে পরিদর্শন করি। সাড়ে বারোটার সময় আহারের উদ্যোগ হইবে। আশা করি, এই সময়ের মধ্যে আপনি পুষ্পনির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। ইচ্ছামত আপনার পুষ্পচয়ন করিবেন, তাহাতে কোনও সঙ্কোচ করিবেন না।" এই বলিয়া ডাক্তার জনৈক রক্ষীকে ডাকিয়া বলিলেন, "রোবিকে, তোমার ছুরী লইয়া আইস। এই ভদ্রলোক যে ফুল তুলিতে আদেশ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবে, বুঝিয়াছ ?"

ডাক্তার অভ্যাসবশতঃ অথবা অন্যমনস্কভাবে রক্ষকের দিকে চাহিয়া বোধ হয় একটু চোখ টিপিয়াছিলেন। সে উহার মনগড়া অর্থ করিয়া লইল।

গ্যামিচেট্ উল্লসিতহৃদয়ে কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গোলাপফুল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছামত পুষ্পও তুলিয়া লইতেছিলেন। রক্ষক এই নবাগত রোগীর প্রত্যেক কার্য্য মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এই বয়সে সে কতপ্রকার রোগীই যে দেখিয়াছে ! প্যারী নগরী হইতে আত্মীয়দিগের সহিত প্রায়ই তাহারা দুই এক দিনের নিমিত্ত পল্লীর

সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে আসিত; তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়াপাত হইত না। পুষ্পোদ্যানের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যখন তাহারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত, সেই অবসরে তাহাদের আত্মীয়বর্গ অন্তর্হিত হইতেন। পক্ষী অমনই জালে পড়িত!

এই রোগীটি সম্ভবতঃ অত্যন্ত নিরীহ। নহিলে ডাক্তার একাকী কি করিয়া তাহাকে রেলপথে লইয়া আসিলেন?

এই যুবকের বাহ্য ব্যবহার দর্শনে কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইত। বাহিরে উন্মাদের কোনও লক্ষণ নাই। কিন্তু রোবিকে পাকা লোক, বহুদর্শী; তাহাকে প্রতারিত করা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ, চিত্রকর যেরূপ ভাবে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, সুবিজ্ঞ বহুদর্শী রক্ষক তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল, হতভাগ্যের রোগ কোন্ জাতীয়।

রোবিকে লক্ষ্য করিল, চিত্রকর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরের সন্নিহিত হইতেছেন, বর্ণবৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য মস্তক ঘুরাইতেছেন, হেলাইতেছেন; তাঁহার টুপি স্থানচ্যুত হইয়াছে। একবার পুষ্পস্তবক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতেছেন, আবার বামহস্তে রক্ষা করিতেছেন। অবশেষে চিত্রকর তাচ্ছীল্যসহকারে গোলাপস্তবক ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া দলরাজির বর্ণ ও শোভা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শিল্পী বর্ণনির্ব্বাচনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন্ বর্ণ তাঁহার চিত্রের অনুকূল হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। হস্তস্থিত গোলাপস্তবকের দিকে নিমগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাঁহার মনে পড়িল,—সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর অ্যাপেলি বর্ণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া হতাশভাবে অসমাপ্ত চিত্রের উপর তুলিকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতেই কিন্তু অসমাপ্ত চিত্র সমাপ্ত হইয়াছিল! তিনি যাহা অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন, ভবিতব্যতার অনুগ্রহে, নিক্ষিপ্ত-তুলিকা-ভ্রষ্ট বর্ণ, অঙ্কিত চিত্রে পড়িয়া, অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিল।

গ্যামিচেট ভাবিলেন, তিনিও ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি গোলাপস্তবকগুলি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

রোবিকে ভাবিল, নূতন রোগীকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট পুষ্পগুলি এ ভাবে ভূমিতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে মনে মনে বিরক্ত হইল! আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। এখন যুবকটিকে কোনও কৌশলে কুঞ্জভবন হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। রক্ষক তখন বাক্যে জলপূর্ণ করিয়া প্রস্তাব করিল যে, সূর্য্যের উত্তাপে গোলাপগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। ছায়াশীতল কোনও কক্ষে লইয়া গিয়া পুষ্পগুচ্ছের উপর জলসেচন করা এখন কর্ত্তব্য। চিত্রকর এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে সংগৃহীত গোলাপগুচ্ছ সহ অদূরবর্ত্তী একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রক্ষক গৃহদ্বার চাবিবন্ধ করিয়া দিল! চিত্রকর বিস্মিত হইলেন!

"দ্বারে চাবি দিলে কেন?"

পৃষ্ঠ দ্বারা দরজা চাপিয়া ধরিয়া প্রশান্তভাবে রক্ষক বলিল, "কোনও চিন্তা করিবেন না। সে ঠিক হইয়াছে।"

অসন্তোষের স্বরে চিত্রকর বলিলেন, "এখনই দ্বার মুক্ত কর।"

"অত ব্যস্ত হইবেন না। এ ঘরে কোনও আগন্তুক প্রবেশ করিলে, যতক্ষণ ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা না করেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়।"

"তবে যাও, ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।"

"তিনি আহারে বসিয়াছেন। এখন তাঁহাকে বিরক্ত করিবার হুকুম নাই।"

"বা! আমি যে নিমন্ত্রিত, আজ মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিব।"

"হায়! হতভাগ্য! আপনার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি।"

গ্যামিচেট্ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তুমি কার সঙ্গে কথা কহিতেছ, মনে রাখিও।"

রক্ষক শিরঃসঞ্চালন করিল। চিত্রকর তখন অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে তাহার নিকট নিজের নাম, ধাম ও ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি যে ডাক্তারের প্রস্তাবিত চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তাহাও রক্ষককে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। রক্ষক এতকাল ধরিয়া কতপ্রকার রোগীর মুখে কত প্রকার বিচিত্র কাহিনী ও গল্প শুনিয়া আসিয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিকার ও প্রশান্তভাবে চিত্রকরের বক্তব্য শ্রবণ করিল।

তাহার ব্যবহারে গ্যামিচেট্ উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। চিত্রকরের হস্তে তখনও ছুরীখানি ছিল। রক্ষক মনে করিল, উন্মত্তের হস্তে শাণিত ছুরিকা—আশঙ্কাজনক। এখন অন্য লোকের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক।

"এতক্ষণ লোকটি বেশ শান্তই ছিল! এখন দেখিতেছি তাহা নয়।" এই ভাবিয়া সে সন্নিহিত একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কল টিপিয়া ধরিল। পর মুহূর্ত্তেই দুই জন বলিষ্ঠ ভৃত্য অন্য দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা চিত্রকরকে চাপিয়া ধরিল। তিনি আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা স্বল্পায়াসেই তাঁহার হস্ত হইতে ছুরীখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কারাগারের পরিচ্ছদ পরাইয়া, তাঁহার বাহুযুগল পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিয়া দিল।

রক্ষিবর্গ চিত্রকরকে তদবস্থায় রাখিয়া গৃহত্যাগ করিল। বহির্ভাগ হইতে দ্বার তালা দ্বারা রুদ্ধ করিতেও বিস্মৃত হইল না।

গ্যামিচেট তখন সাহায্য-প্রার্থনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প ক্ষণ পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, সে গৃহে অন্য বাতায়ন নাই। কেবল আলোক ও বাতাস প্রবেশের জন্য উপরে খানিকট ফাঁক আছে। সুতরাং তিনি প্রাণপণে চীৎকার করিলেও বাহির হইতে তাঁহার শব্দ কেহ শুনিতে পাইবে না।

কিয়ৎকাল পরে তিনি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া তিনি নিজেই হাসিয়া আকুল হইলেন! গত্যন্তর না দেখিয়া চিত্রকর তখন পুষ্পগুলি লইয়াই কালহরণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। সত্য সত্যই বহুক্ষণ তাঁহাকে এমন অবস্থায় থাকিতে হইবে না।

প্রায় দুই ঘটিকার সময় ডাক্তার রিগড ভোজনশেষে সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে ভোজনাগারের বাতায়নসমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোলাপ-বীথির দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র তিনি পথের উপর গোলাপদল ও ছিন্ন পত্ররাশি দেখিতে পাইলেন। তখন সহসা অতিথির কথা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল।

নিজের দুরারোগ্য অন্যমনস্কতার তিনি নিজের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। চিত্রকর তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নিশ্চয়ই এতক্ষণ প্যারী নগরীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কি দুর্দ্দৈব!

রোবিকে ডাক্তারের গতি বিধি বহুক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিল। সে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "আমি নূতন রোগীটিকে বেশ কায়দা করিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কোনও চিন্তা করিবেন না। সে পলাইতে পারিবে না।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "মূর্খ!"

রক্ষক সবিস্ময়ে দেখিল, গম্ভীরপ্রকৃতি ডাক্তার সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অত্যন্ত বিচলিতভাবে কারাকক্ষের অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র, ডাক্তারের মুখে ভীতি-চিহ্ন-দর্শনে চিত্রকর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন!

* * * *

সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে যখন গ্যামিচেটের অঙ্কিত চিত্র ডাক্তার রিগডের ভোজনাগারের প্রাচীরে বিলম্বিত হইল, তখন ডাক্তার তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলেন নাই যে, চিত্রের জন্য কত মূল্য তাঁহাকে দিতে হইয়াছে। গ্যামিচেটের বন্ধুবর্গ যখন তাঁহাকে উক্ত ঘটনা লইয়া পরিহাস করিতেন, তখন নবীন চিত্রকর বলিতেন, "যে মূল্যে গোলাপফুলের চিত্র বিক্রীত হইয়াছে, সেরূপ মূল্য যদি পাই, তাহা হইলে আমি কালই পুনরায় পাগলের পোষাক পরিধান করিতে সম্মত আছি।" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

নবম অধ্যায়।

রাত্রি অবসান হইয়াছে; সূর্য্য উঠিয়াছে; তথাপি শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এখানে শীত এত অধিক যে, আটটার পূর্ব্বে কেহই শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আজ আর অধিক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শীঘ্রই যাত্রার উদ্যোগ করিতে হইবে। ও দিকে ইয়ংবেল চামর লইয়া আমার তাম্বুর নিকট হাজির হইয়াছে। ভৃত্যদ্বয় শিবচিলুম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম।

---

* গেব্রিয়েল জেরিন্ রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

একটি চামরে আমার জিনিসপত্র বোঝাই হইল; অপরটিতে আমার আরোহণের জন্য দেশীয় জিন্ কসা হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চামরে আরোহণ করিলাম। জ্ঞানীমা মণ্ডী হইতে শিবচিলুম দুই দিনের রাস্তা। এখন আর চড়াই বা উৎরাই নাই। সমভূমিতে চলিতে হইবে। এই সমভূমি দেশীয় সমতল ভূমির ন্যায়। তবে এখানে গ্রাম নাই। দুই দিবস কাল প্রান্তরে প্রান্তরে চলিয়া শিবাচিলুম মণ্ডীতে পঁহুছিব।

এই প্রান্তরে বিলক্ষণ দস্যুভয়। প্রান্তরের সীমাস্থিত পর্ব্বতমধ্যে দস্যুগণ লুকাইয়া থাকে। দূর হইতে পথিকদিগকে দেখিলেই অশ্বারোহণ করিয়া পথিকদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসে। ইহার জন্যই পথিকেরা দল বাঁধিয়া চলে। দশ বিশ জন একত্র হইলে আর ভয় থাকে না। আমরা অদ্য আঠার জন পথিক দল বাঁধিয়া জ্ঞানীমা মণ্ডী হইতে শিবচিলুম যাত্রা করিলাম। আমরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবে চলিতেছি, কিন্তু কেহ কাহাকেও ছাড়িতেছি না; কারণ, বেশী অগ্রপশ্চাৎ হইলেই দস্যুরা আসিয়া আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্যব্যবসায়ী ভুটিয়া; ইহারা সকলেই বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া জ্ঞানীমা মণ্ডীতে আসিয়াছিল; এখন স্বীয় স্বীয় স্থানে চলিয়া যাইতেছে। এই সঙ্গীদের মধ্যে দুই জন লামা ও এক জন ডাবা ছিল। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই ইহাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইল। অদ্য আমাদিগকে দুইটি বৃহৎ নদী পার হইতে হইবে। অধিক বেলা হইলে বরফ গলিয়া নদীর বেগ বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং নদী পার হওয়া অসম্ভব হইবে। আর নদীতীরে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই; কারণ, দস্যুগণ আসিয়া আক্রমণ করিবে। সুতরাং আমরা অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম।

অনুমান বেলা এগারটার সময় নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই নদীটি খুব বৃহৎ। কৈলাস হইতে উৎপন্ন হইয়া জোহারের দিকে গিয়াছে। আজ নদীতে জলও বেশী নাই; নদীর বেগও কম; সুতরাং আমাদের নদী পার হইতে তত কষ্ট হইল না। সঙ্গীয় যাত্রীদের সঙ্গে অনেক মেষ ও ছাগ ছিল; তাহারা অনায়াসে বোঝা লইয়া নদী পার হইল। এদেশীয় মেষ ও ছাগল অতি বলবান। ইহারা পার্ব্বতীয় নদীর প্রখর স্রোত ভেদ করিয়া অক্লেশে নদী পার হইতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে

নদী পার হওয়া বড়ই কষ্টকর। সময় সময় এই সব নদীর স্রোতে মানুষ বিপন্ন হইয়া থাকে। আমি চামরীর পৃষ্ঠে নদী পার হইলাম। সঙ্গীরা পদব্রজে নদী পার হইল। কিন্তু নদী পার হইতে আমার সঙ্গীদের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। আমরা নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইলাম।

নদী পার হইয়া দেখি, আরও কতকগুলি যাত্রী তথায় অবস্থিতি করিতেছে। আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ ও অগ্নি সংগ্রহ করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছাতু ও চা খাইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। অনুমান বেলা দুইটার সময়ে আর একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এখন নদীর জল খুব বাড়িয়াছে। স্রোত এত প্রখর যে, কল্য আটটার পূর্ব্বে আর নদী পার হওয়া যাইবে না। বেলা আটটার পর হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত এ দেশীয় নদী পার হইবার সময়; কারণ, ঐ সময়ে নদীর জল কমিয়া যায়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতও কমে; সুতরাং আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

আমরা সকলে এই স্থানে রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রস্তর দ্বারা কতকটা স্থান ঘেরিয়া লইলাম। তাহার মধ্যে আসন পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভৃত্যেরা কাষ্ঠ ও জল সংগ্রহ করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিল। আমরা অপরাহ্নে আহার শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সকলেরই মনে ভয় ছিল, কখন ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে; ডাকাতের আর ভয় নাই। এ দেশীয় ডাকাতেরা দিনেই ডাকাতি করে। তাহারা প্রায়ই পর্ব্বতের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে, পথিকদিগকে দেখিলেই ঘোটকারোহণ করিয়া আসিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক আবার পর্ব্বতের আড়ালে চলিয়া যায়। এখন রাত্রি হইয়াছে। ডাকাতেরা আর দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কাজে কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু আজ আর আমাদিগকে অগ্নি জ্বালিতে হইল না। কারণ, দূর হইতে অগ্নি দেখিয়া যদি ডাকাত আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের সঙ্গীদের নিকট ৪।৫টি বন্দুক ছিল। তাহারা বন্দুক প্রস্তুত করিয়া পাহারাতে নিযুক্ত হইল। আমরা অনায়াসে ও নির্ভয়ে নিদ্রার ক্রোড়ে দিবসের ক্লান্তি দূর করিলাম। সুখে রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে করিতে আটটা বাজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া নদী পার হইলাম। এখন আমরা মাঠে মাঠে চলিতেছি। দস্যুভয়ে দৃষ্টি চঞ্চল। কতক্ষণে শিবচিলুম পঁহুছিব, কতক্ষণে দস্যুভয় হইতে উদ্ধার পাইব, সকলের এই ভাবনা। অদ্য আর রাস্তায় বিশ্রাম করিবার কাহারও সাহস হইল না। সকলেই প্রাণভয়ে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে বেলা বারটার পর একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রকাণ্ড একটি ছাতহীন প্রস্তরের গৃহ আছে। কিন্তু নিকটে জল নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ঘাপার রাজার সহিত মনান্তর হওয়াতে ব্রিটিশ-সীমান্তবাসী মরগায়ের প্রজারা এই গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই গৃহটি দুর্গের অনুরূপ। মরগায়ের প্রজারা এই ক্ষুদ্র দুর্গে থাকিয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এখান হইতে নদী প্রায় দুই মাইল। আমরা এখানে বিশ্রাম না করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। নদীতীরে যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া গেল। আমরা সকলে এখানে কিছু চা পান করিয়া অপরাহ্নে শিবচিলুম উপস্থিত হইলাম।

শিবচিলুম একটি ছোট খাট মণ্ডী। এই মণ্ডীর অধ্যক্ষ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কেদার সিংহ। কেদার সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গে ছিল। কেদার সিংহও আমাকে খুব ভালবাসিত। কেদার সিংহ আমা-দিগকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "আমি আপনাদের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আজ আপনাদিগকে পাইয়া দেহে প্রাণ আসিল। ভগবতীর প্রত্যক্ষ কৃপার চিহ্ন পাইলাম।" কেদার সিংহ পূর্ব্বে আমার থাকিবার জন্যে একটি তাম্বু খাটাইয়া রাখিয়াছিল। আমি আসিয়াই তাম্বুর ভিতরে আসন করিয়া লইলাম। এখন আমি কেদার সিংহের অতিথি। নানা উপচারে সে আমার সেবা করিতে লাগিল। আহারের জন্য আর কষ্ট পাইতে হইল না।

শিবচিলুম মণ্ডী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। অভ্রভেদী পর্ব্বতের মধ্যে শতদ্রুর একটি শাখা প্রবাহিত। নদীর উপকূলে সবুজবর্ণ ঘাস ও যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। এই মণ্ডীটি অতি ছোট। নদীর পূর্ব্ব তীরে ব্রিটিশ প্রজাদের তাম্বু; পরপারে ভুটিয়াদের তাম্বু। এই মণ্ডী ভেদ করিয়া তিব্বতের অপর অপর মণ্ডীতে যাইতে হয়। বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা জানীমা ও শেকরা মণ্ডী যাইবার সময় এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য করে। পরে অপরাপর মণ্ডীতে চলিয়া যায়। পূর্ব্বে বরফপাতে আমি অতিশয় ক্লান্ত

হইয়াছিলাম। আর কেদার সিংহ আমাকে অত্যন্ত অনুরোধ করাতে আমি এই স্থানে চার দিবস বিশ্রাম করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলাম। এখন আর আমার চলিবার শক্তি নাই। যত দূর পর্য্যন্ত চামর যাইতে পারে, তত দূর পর্য্যন্ত চামর ভাড়া করিয়া লইতে হইবে। এই মণ্ডীতে চামর ভাড়া পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানীমা মণ্ডী হইতে যে ইয়ংবেলের চামর আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম। সে আমাকে থাপা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া আসিবে। সে চার দিন শিবচিলুমে রহিল না; আপনার বাসস্থানে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চার দিন অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম দিবসের দিন মধ্যাহ্নে ইয়ংবেল দুইটি চামর লইয়া শিবচিলুমে আসিল। আমরাও অতি সত্বর আহারাদি সমাপন করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একটি চামরে আমি আরোহণ করিলাম। অপরটিতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিলাম। আমার ন্যায় আমার ভৃত্যেরাও অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহারা ২।৪সের বোঝাও লইতে অক্ষম। সুতরাং তাহাদের ব্যবহারীয় জিনিসপত্র চামরে বোঝাই হইল।

আজ প্রথমে চড়াই, পরে উৎরাই। আমরা শিবচিলুম হইতে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই আরোহণে বাহন ও সঙ্গীদের এত কষ্ট হইয়াছিল যে, সকলেই উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অচল হইয়া পড়িল। সুতরাং আমরা উচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়া দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রামের পরে আবার চলিতে লাগিলাম। প্রায় অপরাহ্ণ চারটার সময় "ডাকর" নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময়ও এই আড্ডাতে এক দিবস বাস করিয়াছিলাম। তখন ডাকরে কতকগুলি ভুঙ্গ ছিল। এখন ডাকর শূন্য, ভুঙ্গ উঠিয়া গিয়াছে। জন মানব পশু পক্ষীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা পাঁচ জন পথিক আজ ডাকরের একটি গুহাতে বাসস্থান নির্ণয় করিলাম।* বাহন দুইটিকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া ইয়ংবেল কাষ্ঠ আহরণ করিতে চলিয়া গেল। শিবচিলুম হইতে "নীমা" নামক এক জন ডাবা আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। তাহার বাস লাসার উত্তরে এক মাসের পথ। চারি বৎসর হইল, সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিব্বতের সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছে, এবং নেপালে যাইয়া পশুপতিনাথও দর্শন করিয়াছে। এখন সে গঙ্গোত্রী হইয়া জ্বালামুখী যাইবে। তাহার জন্যই সে আমার সঙ্গী হইয়াছে। নীমার আজ বড়ই আনন্দ, সে গঙ্গোত্রী দর্শন করিবে! আকার ইঙ্গিতে আমার নিকট আনন্দ

প্রকাশ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে নৃত্য করিতেছে। কাষ্ঠ আহরণ করা তাহার চির অভ্যাস। সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই কাষ্ঠ আহরণে চলিয়া গেল।

দুই ঘণ্টার মধ্যেই প্রচুরপরিমাণে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া নীমা বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল। ইয়ংবেলও যথেষ্ট কাষ্ঠ আনিয়াছিল। কাষ্ঠ আসিবামাত্র প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। ভৃত্যেরা সেই অগ্নিকুণ্ডেতে আহারীয় প্রস্তুত করিতে বসিল। ইয়ংবেল ও নীমা গান ধরিল। সেই গানের বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না। তবে বিষ্ণু সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—ইহারা গাহিতেছে, "আজ আকাশে মেঘ নাই, বাতাসও নাই, বরফও পড়িবে না, আর শুষ্ক কাষ্ঠ পাইয়াছি, পেট ভরিয়া খাইব, আর অগ্নির উত্তাপে সুখে নিদ্রা যাইব।" ইহাদের গান আর শেষ হয় না। রন্ধন প্রস্তুত হইয়াছে। আমি জোর করিয়া গান ভাঙ্গিয়া দিলাম ও সকলে মিলিয়া আহারে বসিলাম। আহারান্তে সকলে নিদ্রা গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার যাত্রার উদ্যোগ। চামর সুসজ্জিত হইল। আমরাও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া প্রস্তুত হইলাম। ইয়ংবেল আচ্ছা করিয়া আমার চামরটিকে জিন্ কসিয়া দিল, আর বলিল, "আজকার রাস্তা বড়ই বিকট। এমন চড়াই যে, অগ্রে আমি ও পশ্চাতে বিষ্ণু সিংহ না গেলে চামর ঠেলিয়া উঠাইতে পারিব না। খড়্গ সিংহকেও খুব পরিশ্রম করিয়া অপর চামরটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।" ইহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, আজ বড়ই বিকট রাস্তা। কি করি, শ্রীদুর্গা বলিয়া চামরে উঠিলাম। ইয়ংবেল চামরের নাসারজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিল। বিষ্ণু সিংহ চামরের পশ্চাৎ হইতে ঠেলিতে লাগিল। আমি চিত্রপুত্তলিকাবৎ চামরের পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলাম। এইরূপে একটা চড়াই উঠিলাম। আর চামরের পৃষ্ঠে বসিতে পারি না; হস্তপদে বিলক্ষণ ব্যথা হইয়াছে। বিষ্ণু সিংহ চামরের পৃষ্ঠ হইতে আমাকে নিম্নে অবতরণ করাইল। তাহারাও বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন বেলা ১০টা। সকলেরই ক্ষুধা লাগিয়াছে। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে জল ও কাষ্ঠের সম্পূর্ণ অভাব। সঙ্গে গোলমরিচ ও মিছরী ছিল। তাহা খাইয়া গলাটা সরস করিলাম। এমন সময় ইয়ংবেল বলিল, "এই ত খাইবার সময় হইয়াছে; কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে আমরা তিন মাইল রাস্তা আসিয়াছি। আর দুই

যাইল না গেলে জল বা কাষ্ঠ পাইব না, থাকিবারও স্থান নাই, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, উঠুন।" তাহারা আবার আমাকে ধরিয়া চামরে বোঝাই করিয়া দিল।

চামর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমার সঙ্গীরাও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সকলেরই গতি অতি মন্থর। আমরা মন্থরপদে অনুমান বেলা বারটার সময় "মনম" নামক আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। মনম আড্ডাটি বড়ই সুন্দর। জনমানবের সঙ্গে দেখা শুনা নাই। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে তিনটি গুহা আছে। ইহার একটি গুহাতে আমি আসন করিলাম; অপর একটিতে নীমা ও পূর্ণানন্দ রহিল। অপরটিতে রন্ধনশালা হইল। ভৃত্যেরাও সেই গুহাতে আশ্রয় লইল। পর্ব্বতের উচ্চে ও নিম্নে যথেষ্ট কাষ্ঠ আছে। অদ্য নীমার কার্য্য কাষ্ঠ-সংগ্রহ করণ, পূর্ণানন্দের কার্য্য জল আনয়ন। কারণ, ভৃত্যদ্বয়কে ও ইয়ংবেলকে এখনই পর্ব্বতের নিম্নস্থ ভুঙ্গে যাইয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে হইবে। অদ্য আমারও কিছু কার্য্য ছিল। চামর দুইটির রক্ষার ভার আমার উপর অর্পিত হইল। আমি পর্ব্বতের উপত্যকায় চামর চরাইতে চলিলাম।

এই উপত্যকাটির নিম্নভাগে একটি নদী আছে। সেই নদীতীরে বন্য চামর বিচরণ করিতেছে। বন্য চামরের ভয়ে কোনও মনুষ্য বা পালিত পশু নদীর পর পারে যায় না। আমি দূর হইতে বন্য চামর দর্শন করিতে লাগিলাম, আর আমার বাহনদিগকে চরাইতে লাগিলাম। নিম্নস্থ ভুঙ্গে দশ বারটি তাম্বু পড়িয়াছে। আমার ভৃত্যদ্বয় ও ইয়ংবেল সেই তাম্বুর নিকটে যাইয়া সংবাদ দিল, "এক জন কাশীর লামা পর্ব্বতের গুহাতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার আহারীয় নিঃশেষিত হইয়াছে; হয় মূল্য নিয়া আহারীয় বস্তু দাও, নতুবা সাধুসেবার জন্য আহারীয় প্রদান কর।" ভুঙ্গের অধিপতি বলিলেন, "আমরা মূল্য লইব না। তোমরা যাও; আমরা আহারীয় লইয়া যাইতেছি।" ভৃত্যদ্বয় ও ইয়ংবেল রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল। তাহাদিগকে আমি বলিলাম, "আজ হরিবাসর নাকি?" বিষ্ণুসিংহ বলিল "আজ্ঞা না। ভুঙ্গের সর্দ্দার ও অপরাপর লোক আহারীয় লইয়া আসিতেছে।" এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ইয়ংবেল ও আমার ভৃত্যদ্বয় তাম্রকূট ধূমপানের জন্য গুহায় চলিয়া গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভুঙ্গের সর্দ্দার চা, মাখন, ছাতু ও সের দুই

চাউল এবং একটি বৃহৎ মেষ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং বলিল, "আমরা গরীব, এই যৎসামান্য বস্তু আপনি গ্রহণ করুন।" আমি সাদরে তাহাদের উপহার গ্রহণ করিলাম। তাহারা আমাকে কিছুক্ষণ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেল।

ভৃত্যেরা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নীমা এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া হাজির হইল। পূর্ণানন্দ জল লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ চা প্রস্তুত হইল। আমরা সকলেই পেট পুরিয়া চা খাইলাম। পরে রন্ধন প্রস্তুত হইলে আহার করিলাম। এই দিবস এখানেই থাকিতে হইবে। সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন, পূর্ণানন্দ কে? পূর্ণানন্দ গিরি নামক সন্ন্যাসী, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, পূর্ব্বনিবাস আল্‌মোরা। এখন পূর্ণানন্দ আমার সঙ্গী। বেশ যত্ন করিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছে। আমি যখন মরগাঁয়ে অবস্থিতি করি, তখন পূর্ণানন্দ আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হয়। সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আছে। অদ্যকার দিবস বেশ কাটিয়া গেল। রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা গেলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। অদ্যকার রাস্তা মন্দ নহে। প্রথম খুব উৎরাই। এই উৎরাইএর পরেই নদী। এই নদীর তীরে তীরে আমাদিগকে চলিতে হইল। কিছুক্ষণ চলিয়া একটি জীর্ণ তাম্বু দেখিতে পাইলাম। এই তাম্বুতে ইয়ংবেলের প্রথমা স্ত্রীর বাসস্থান। ইয়ংবেল ইহাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটি অপরের চামর, ভেড়া ও ছাগল চরাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহা দ্বারাই অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সে অদ্য ইয়ংবেলকে পাইয়া বড়ই খুসী হইয়াছে। ইয়ংবেলও অনেক দিন পরে স্ত্রীকে দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এবং বলিতেছে, "অদ্য আপনারা এখানে থাকুন, এ বেচারার আতিথ্য গ্রহণ করুন।" ইয়ংবেলের বিশেষ অনুরোধে আমি তথায় থাকিতে প্রস্তুত হইলাম, ও ইয়ংবেলের স্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইয়ংবেলের স্ত্রী আমাকে তাম্বুটি ছাড়িয়া দিল। আপনার দ্রব্য সামগ্রী তাম্বু হইতে বাহির করিল। আমি তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাম্বুটি বড় জীর্ণ ও অতি সঙ্কীর্ণ। কষ্টে স্বষ্টে তিন জনের বেশী এখানে বাস করা যায় না। সুতরাং আমি বলিলাম, "তুমি এই তাম্বুতে থাক। আমি নদীতীরে আসন করিতেছি।" ইহাতে সে একটু দুঃখিত হইল। কিন্তু আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া সে নিজে নদীতীর পরিষ্কার করিয়া দিয়া আমার আসন করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান।

১

হের, প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
মগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

২

হের, ওই মহাকাশ— ল'য়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার॥

৩

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা।

৪

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আমরণ?

৫

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমায়ে, প্রিয়া?
বুঝেছ কি মনঃপ্রাণ সব?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য—
আত্মায় আত্মার অনুভব?

৬

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান?

কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান !

৭

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া !
শত শত ভগ্ন-স্তূপ কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া !

৮

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি কালের গরিমা !
পাষাণে পাষাণে রেখা,— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা !

৯

আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ ;
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

১০

এস, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্নিগ্ধ, স্তব্ধ করুণায় !—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায় !

১১

ল'য়ে প্রেম সুধারাশি এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া !
এস সুখ-দুখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহযোগী সাহিত্য।

শিবাজীর দরবারে ইংরেজ।

গত জুলাই মাসের "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামক সাময়িক পত্রে শ্রীযুত জে. এন্. চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন বোম্বাই ও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিবাজীর সহিত ইংরাজের সম্বন্ধবিষয়ক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শিবাজী অতি উচ্চশ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিক; তাঁহার মত রণনীতিকুশল ও রাজনীতিবিশারদ জগতে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক শিবাজীর চরিত্র ঘোরতর মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের বিন্দুমাত্র ঐক্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"শিবাজীর অসাধারণ কর্ম্মজীবনের অপরাহ্নে ইংরাজের সহিত তাঁহার সংস্রব ঘটে। তখন মহারাষ্ট্র-বীরের উন্নতির চরম অবস্থা। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সমগ্র পশ্চিমাংশে শিবাজীর বিজয়কেতন উড্ডীন হইয়া মহারাষ্ট্রগৌরব ঘোষণা করিতেছে। তিনি তখন রায়বির সিংহাসনে উপবিষ্ট। নিষ্ঠুর মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ও তদীয় বিপুল সেনাবাহিনী মহারাষ্ট্রবীরের প্রবল প্রতাপে ও বিক্রমে ভীত, সন্ত্রস্ত। নবজাগ্রত, বলদৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাতি তখন শিবাজীর মহিমা ও গুণের কীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ, তাঁহার পূজায় নিরত। এই অসাধারণ ক্ষমতাশালী বীরের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। ইহা উপন্যাসের মত মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক; কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে। শিবাজীর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জীবনের কার্য্যাবলীর ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, বিদ্বেষদোষদুষ্ট নিন্দাকারীদিগের মিথ্যা প্রবাদ তাহা দূরীভূত করিতে সমর্থ নহে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরাসী বীর নেপোলিয়নের সহিত মহারাষ্ট্রনায়ক শিবাজীর তুলনা করিয়া বলেন,—"নেপোলিয়নের উন্নতিপথে যে সকল সুবিধা বিদ্যমান ছিল, শিবাজীর তাহা আদৌ ছিল না। যেরূপ ঘোরতর অসুবিধা ও বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবাজী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নেপোলিয়নকে তত দূর অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই। নেপোলিয়ন ভাগ্যদেবীর বরপুত্র ছিলেন; কিন্তু শিবাজী তাহা নহেন। নেপোলিয়নের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কয়েক বৎসর পরেই স্বপ্নবৎ কালসাগরে বিলীন হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, নানা বিপৎপাত ও ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও উহা এখনও উন্নতমস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

অতঃপর প্রবন্ধলেখক শিবাজীর সহিত ইংরেজের সংস্রব কিরূপে প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন;—"যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন বোম্বাই নগরী বর্ত্তমান যুগের বিচিত্র হর্ম্ম্যমালাময়, সৌদামিনী-দীপ্তি-উদ্ভাসিতা বোম্বাই নগরীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী ছিল না। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র মৃন্ময় কুটীর, কদাচিৎ দুই চারিটি অট্টালিকা তদানীন্তন বোম্বাই নগরীর ভূষণ ছিল। খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর পাওয়া যাইত না। কেনেরী দ্বীপ হইতে জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হইত। বোম্বাইয়ে তখন ইংরাজ অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল না।

ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দশ বারটির অধিক ইংরেজরমণী তখন বোম্বাই নগরীতে বিদ্যমান ছিল না। সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা চারি পাঁচ শত হইতে পারে।"

তদানীন্তন মুসলমান ও মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তৃগণ ইংরাজদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার আলোচনায় শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"ইংরাজেরা তখন বণিক্‌মাত্র। তাঁহারা মোগল রাজপুরুষ ও নবজাগ্রত মহারাষ্ট্র, উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন। জেলিয়ন হইতে লোহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থলেই ইংরাজের কুঠী ছিল সত্য, কিন্তু সুরাট নগরেই তাঁহাদের বাণিজ্য অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ সদলবলে তথায় বাস করিতেন। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে সুরাট নগরই ইংরাজদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। কুঠীর অধ্যক্ষ তথায় ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্র ও মোগল তখন বিগ্রহে ব্যস্ত; সুতরাং উভয় পক্ষের কেহই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ইংরাজদিগের ব্যবহারে তখন হইতেই রাজশক্তির আভাস পরিস্ফুট হইতেছিল। এই ঔপনিবেশিকদিগের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনুমিত হয়, যেন তাঁহারা ভবিষ্যতের তিমিরজাল ভেদ করিয়া শত বৎসর পরে তাঁহাদেরই বংশধরদিগের বর্ত্তমান অবস্থা মানসনেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। যথাক্রমে মোগল ও মারাঠা এই স্বল্পসংখ্যক শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদিগের উদ্ধত ও আপত্তিজনক ব্যবহারের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; ঔরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হয় নাই। নানা কৌশলে তাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্যেই রহিয়া গেলেন। যেন কোনও অদৃশ্য হস্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বৈদেশিকদিগের জন্য এক নব সাম্রাজ্য সংগঠিত করিতেছিল। শক্তি ও গর্ব্বদৃপ্ত মোগল স্বপ্নেও সে সকল ভাবে নাই।"

অতঃপর শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় শিবাজী কি রূপে ইংরাজের বর্দ্ধনশীল শক্তি ও প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রাজাপুরের কুঠী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। কতিপয় কুঠীয়ালকে ধৃত করিয়া তিনি দুই বৎসর কাল তাহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপরাধ,— পানালা অবরোধকালে তাঁহারা চূণ, সুরকী, গোলা প্রভৃতির দ্বারা সিদ্দি মোহরের সহায়তা করিয়াছিলেন। অবরুদ্ধ কুঠীয়ালদিগের আত্মীয়গণ বহু অর্থ শিবাজীকে উপঢৌকন দিয়া বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করেন। শিবাজীর অর্থেরই প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তিনি সহজেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট আক্রমণ করেন। তখন সার জর্জ অক্সিনডেন্ সুরাটের যাবতীয় কুঠীর ডিরেক্টার ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অরম্ বলেন যে, শিবাজী ছদ্মবেশে তিন দিন সুরাট নগরে যাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ধনাঢ্য অধিবাসী-দিগের অট্টালিকা চিহ্নিত করিয়া রাখেন। নিজ অভিপ্রায় গুপ্ত রাখিবার নিমিত্ত শিবাজী চাউল ও বেসীন এই উভয় স্থলে শিবির-সন্নিবেশ করেন। অতঃপর তিনি বেসীনের শিবির হইতে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বাছিয়া লইলেন। তাঁহার আদেশে শিবিরমধ্যে পূর্ব্ববৎ নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। পাহারার বন্দোবস্তও পূর্ব্ববৎ রহিল। যেন লোকে মনে করিতে না পারে যে, এত সৈন্য শিবিরত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। শিবাজী সেনাদল সহ জন-বিরল

পথে অগ্রসর হইলেন। লোকে তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিবার পূর্ব্বেই তিনি সুরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। অধিবাসিবর্গ গৃহ ও ধনরত্ন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বাধা দিবার চেষ্টামাত্রও করিল না। শিবাজী এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। এবার কিন্তু শিবাজী ইংরাজ অথবা ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। ১৬৬৯—৭০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট আক্রমণ করেন। জেরাল্ড আঞ্জিয়ার তখন সুরাট কুঠীর প্রেসিডেণ্ট। তিনি স্বীয় কুঠী রক্ষার আয়োজন করিলেন। নগরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা সসৈন্য শিবাজীর নগরপ্রবেশ-সংবাদ শ্রবণমাত্র দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মারাঠীরা জনৈক ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় বারুদের দ্বারা দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অবশেষে নগরের প্রত্যেক গৃহ লুণ্ঠিত হইল। যাহারা মুক্তিমূল্য দিতে পারিল, তাহারাই শুধু পরিত্রাণ লাভ করিল। কিন্তু এবারেও ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় ইংরাজ ও ওলন্দাজ-দিগের কুঠীগুলি লুণ্ঠিত হইল না। শিবাজী কোনও শ্বেতাঙ্গ বণিকের অঙ্গে হস্তার্পণ করেন নাই। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার ও ধনরত্নাদি রায়রি দুর্গে প্রেরিত হইল।"

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজের প্রতি শিবাজীর ব্যবহারবিষয়ক অন্যান্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই মহারাষ্ট্র স্বদেশপ্রেমিকের লুণ্ঠন ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য ছিল না, যে সকল ঐতিহাসিক এই মিথ্যাপবাদের আরোপ করিয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই কলঙ্ক-ক্ষালনের জন্য যথেষ্ট যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

তান্তিয়ার পরাজয়ের পর নানার অবস্থা।

বিগত জুলাই মাসের "ইণ্ডিয়ান্ ওয়ার্ল্‌ড্" নামক সুপরিচালিত সাময়িক পত্রে "তান্তিয়ার পরাজয়ের পর নানার অবস্থা" শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

সুদক্ষ সেনাপতি তান্তিয়ার পরাজয়ের পর নানা ধুন্ধুপন্থের শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার জয়লাভের বিন্দুমাত্র আশাও রহিল না। চতুর্দ্দিক্ হইতে অনুসৃত হইয়াও তিনি বহুসংখ্যক অনুচর সহ কিরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে নানাকে ধৃত করিবার জন্য একখানি ঘোষণাপত্র মুদ্রিত হয় যে, কেহ ধুন্ধুপন্থকে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবেন, তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্রোহী দলের মধ্যে (ফরক্কাবাদ, বেরেলী ও বান্দার নবাব ও মণিপুরের রাজা ব্যতীত) যে কেহ নানার গতিবিধির সংবাদ দিতে পারিবেন, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেও মার্জ্জনা করিবেন, ইহাও ঘোষিত হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। নানাসাহেব ধরা পড়িলেন না। তিনি পরিজনবর্গ ও দলবল সহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী গুত্র নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়া ভাবিলেন, এইবার বোধ হয় অনুসরণকারিগণ ক্ষান্ত হইবে। তাহাদের ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা এখন তাঁহার কোনও অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে

না। কিন্তু নানাসাহেব ভুল বুঝিলেন। নেপালের জঙ্গবাহাদুর ইংরাজের পরম মিত্র ছিলেন। নানা ও তাঁহার বিদ্রোহী সেনাদলের সহিত তাঁহার কোনও সহানুভূতি ছিল না। এ জন্য তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকৃত রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহীদিগের স্থান নাই। নানা ও তাঁহার অনুচরবর্গ এই আদেশে ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর শুধু ঘোষণা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি লর্ড ক্যানিংকে অনুরোধ করিলেন যে, নেপালের সীমান্ত-প্রদেশে সেনাদল পাঠাইয়া দুর্বৃত্তদিগকে বিতাড়িত করা হউক। তদনুসারে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই নানার অনুসরণে সেনাদল প্রেরিত হইল। নানা বিতাড়িত হইয়া ক্রমশঃ গভীর সীমাহীন অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর আবাস—ভীষণ অরণ্যে ইংরাজ সৈন্য আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহারা হতাশভাবে চিরশত্রুকে চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের গভীর অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া ফিরিয়া গেল।

সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনের শেষাঙ্ক এইরূপে অভিনীত হইয়া গেল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য ও মহত্বগুণে ইতিমধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা শ্বেতাঙ্গদিগকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল, অথবা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, তাহারা ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীরা ক্ষমালাভ করিবে। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া কতিপয় সিপাহী অরণ্যাশ্রয় ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কেহ কেহ বা নানাসাহেবের ভয়ে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে সাহস করিল না।

যুদ্ধকালে যে সকল বিদ্রোহী অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এখন দুর্ব্বিবহ-ভীষণ-যন্ত্রণা-পূর্ণ আরণ্য জীবন যাপন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল। কিন্তু নানাসাহেবের কঠোর হৃদয় এত দুঃখ যন্ত্রণাতেও বিচলিত হইল না। আরণ্য-নিবাস হইতে তিনি স্যার হোপ্ গ্রাণ্টকে অশিষ্ট ভাষায় পত্র লিখিয়াছিলেন। ব্যর্থ রোষ ও ইংরাজের প্রতি ঘৃণা সেই পত্রের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে অতীব গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও নানা পূর্ব্ব-ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা বালা রাও ইংরাজ সেনাপতিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তিনি কোনও শ্বেতাঙ্গকে নিহত করেন নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতেও সম্মত আছেন। পত্রে তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ নগরে তাঁহার পত্নীর নিকট একটি দশবৎসরবয়স্কা ইংরাজ-বালিকা বাস করিতেছে। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এই পত্রে কোনও আস্থা স্থাপন করেন নাই। বালা রাওর অপরাধ সম্বন্ধে ইংরাজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার মিথ্যা ছলনায় ইংরাজ প্রতারিত হইলেন না।

উপর্য্যুপরি অসংখ্য বিপদে, দুঃখে ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া নানাসাহেব সীমাহীন, ভীষণ, নির্জ্জন অরণ্যে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কোনও জনপদে তাঁহার স্থান হইল না। কিন্তু তখনও কতিপয় অনুচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তদীয় ভ্রাতা বালা রাও অবশেষে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

পরিশেষে পেশওয়ে-বংশধরের এরূপ দুরবস্থা ঘটিল যে, দশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের প্রসিদ্ধ ছুরীখানিও তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই মহামূল্য প্রস্তরখানি প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যার সহায়তা করিবে বলিয়া তিনি এত দিন উহা কাছ-ছাড়া করেন নাই। সহচর ও অনুচরবর্গ লইয়া ভূতপূর্ব্ব পেশোয়ে অরণ্যানীর মধ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ছুইটি তাম্বু তাঁহার রাজপ্রাসাদ! দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপদ আসন্ন বুঝিয়াও তদীয় অনুচরবর্গ দিবারাত্রি অনাহতচিত্তে তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, রৌদ্র ও নানাবিধ দৈব দুর্য্যোগ তাহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। মাথা রাখিবার স্থানমাত্র তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা নানাসাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। এই সকল অনুচরের কাহারও কাহারও সমভিব্যাহারে তখনও শ্বেতাঙ্গ-মহিলা ছিলেন। কাণপুর ঘাট হইতে মুসলমান সিপাহীরা সুন্দরী যুবতী মহিলাদিগকে লইয়া গিয়াছিল। মুসলমান অশ্বারোহী সেনাদলের যুবক নেতার সহিত মিস্ হুইলার তখনও বাস করিতেছিলেন। সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অত্যাচারে যে সকল বিদ্রোহী অগ্রগণ্য ছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয়-সংখ্যক অশ্বারোহী মুসলমান সেনাদলই যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। হতভাগ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিকগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া আপনা-আপনি কলহ করিত। —"তোমার জন্যই আজ আমার এই দুর্দ্দশা। তোমার পরামর্শ না শুনিলে আজ অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে আমাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। আমার পরিবারবর্গও ভাসিয়া বেড়াইত না। হায়! তোমার কথা শুনিয়া আজ মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি; মৃত্যু ব্যতীত এ দুর্দ্দশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভ অসম্ভব।" আত্মকলহ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহী সেনাদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল; ধীরে ধীরে তাহারা মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিল।

নানা প্রত্যহ হিমালয়ের ভীম নীরবতার মধ্যে, পবিত্র জাহ্নবীসলিলে অবগাহন করিতেন। তাঁহার শিবিরের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর প্রবাহ আঁকিয়া বাঁকিয়া কলনাদে প্রবাহিত হইত। অবগাহনকালে এক জন অনুচর তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিত। স্নানশেষে যখন তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন অনুচরবর্গ তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তাঁহাকে তখনও তাহারা প্রভু ও রাজা বলিয়া মনে করিত। বালাসাহেবও তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিতেন। সন্নিহিত অপর বস্ত্রাবাসে পেশোয়ার পরিবার,—নানার পরিবারস্থিত মহিলাগণ বাস করিতেন। এই উদারহৃদয় করুণাময়ী রমণীগণ ইংরাজ-মহিলা ও শিশুদিগের জীবনরক্ষাকল্পে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মহৎ কার্য্যের পরিণামে তাঁহাদিগকে ভীষণ পার্ব্বত্য প্রদেশে নির্ব্বাসিতের জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। এই সকল দেবীর তিরস্কারে নানাসাহেবের হৃদয়ে সম্ভবতঃ ঘোর অনুশোচনার সঞ্চার হইয়াছিল, এবং বোধ হয়, সেই অনুশোচনার জ্বালায় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

"ভারতীয় চিত্র-কলা"।

আষাঢ়ের "প্রবাসী" পত্রে "ভারতীয় চিত্র-কলা" প্রবন্ধে শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক জন লেখক "ভারতীয় চিত্র-কলা"র সমর্থন ও "সাহিত্যে"র সমালোচককে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আর্য্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম,—"ভারতীয় চিত্র-কলা"র সমর্থন। দ্বিতীয়,—"সাহিত্যে"র সমালোচকের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ।

প্রবন্ধের প্রথম অংশ বিচারসহ না হউক, তাহার আলোচনায় কোনও হানি নাই। প্রকৃত চিত্র-কলার গৌরব-রক্ষার জন্য, তথাকথিত "ভারতীয় চিত্র-কলা"র অসারতা ও উদ্ভটতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর অক্ষম যুক্তি ও অপূর্ব্ব ন্যায়শাস্ত্রের বিশ্লেষণ আবশ্যক।

গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রে শ্রীযুত সুকুমার রায় "ভারতীয় চিত্র-শিল্প" প্রবন্ধে নিপুণভাবে অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর যুক্তি-তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন। সুকুমার বাবুর প্রবন্ধেই অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর অসার যুক্তি ভূমিসাৎ হইয়াছে। সুতরাং আমরা আর সে বিষয়ে পণ্ডশ্রম করিব না।

সুকুমার বাবু সম্ভবতঃ অনাবশ্যকবোধে অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর কতিপয় হাস্যাস্পদ উপপত্তির আলোচনা করেন নাই। আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"সাহিত্যে"র সমালোচকের মতে,—"প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ, 'নিখুঁত ফটোগ্রাফ' না হইলে কোনও চিত্র 'শিল্প' অভিধানের যোগ্য নহে।"

অর্দ্ধেন্দ্র মোক্তার মহাশয় মামলা জিতিবার জন্য আমাদের মুখে যে মন্তব্যের আরোপ করিয়াছেন, আমরা তাহা বলি নাই। ইহা অধম শ্রেণীর মোক্তারের বাক্‌চাতুরী, কিন্তু সাহিত্য-সমাজের অযোগ্য।

আমরা বলি,—'বিকৃতি' উচ্চ শ্রেণীর 'শিল্প' নহে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর মতে,—"মানুষের ভাবনা দ্বারা প্রকৃতির রূপ অবিকল থাকে না—উহা রঞ্জিত ও বিকৃত হয়—জড়-প্রকৃতি মনুষ্য-প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।" আবার,—"প্রকৃতির রূপ শিল্পের আখ্যানবস্তু করিতে হইলে তাঁহাকে শিল্পীর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে হয়।"

এই উদ্ভট তত্ত্ব সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না।— অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর মতে,—প্রকৃতির বিকার বা বিকৃত প্রকৃতিই চিত্রের প্রাণ, —বা তাহাই উচ্চ শ্রেণীর শিল্প! আশ্চর্য্য এই যে, এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব অর্দ্ধেন্দ্র বাবু অসঙ্কোচে ও শিশুসুলভ সরল বিশ্বাসে জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন,— ছাপিতে পাঠাইয়াছেন! গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা বটে!

আমরা জানিতাম, যাহা প্রকৃতির বিকৃতি, তাহা 'ক্যারিকেচর'। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবু 'ক্যারিকেচর'কেই জগতের শিল্পের চূড়ায় বসাইয়া দিয়াছেন! র‍্যাফেল, তিতিয়ান, ভ্যাণ্ডাইক প্রভৃতি এই উদ্ভট তত্ত্ব জানিতেন না,—তাই তাঁহারা স্বভাবে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন!

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু আবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রকৃতির রূপ উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হয়।" ইহা অবশ্য "সবজান্তা 'সাহিত্য'-সমালোচকের ম্যাণ্ডেট" নহে; "সবজান্তা" অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর "ম্যাণ্ডেট";—অতএব, আমাদের শিরোধার্য্য! অর্দ্ধেন্দ্রকুমার স্বীয় মতের সমর্থনে ইংরেজী কেতাব হইতে নজীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আমরা সেই নজীরের সহিত ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ অর্দ্ধেন্দ্র বাবু তাঁহার নজীর চর্ব্বণ করিতে থাকুন। যে নজীরে মানুষের নাক বিকৃত, কাণ লম্বা, আঙ্গুল লতানে, পা বক-ঠ্যাং-বিনিন্দী ও হাত হনুমৎস্পর্দ্ধী করিতে হয়, সে নজীর অর্দ্ধেন্দু বাবুদের মাথায় থাকুক। আমরা বলি,—

"চণ্ডালের হাড় দিয়া পোড়াও নজীরে,
ভস্মরাশি করি' ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।"

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"সাহিত্য-সমালোচকের আর এক অভিযোগ, "ভারতীয় নূতন পদ্ধতির চিত্রে আঙ্গুল ও পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। * * স্বভাবের ঠিক অনুরূপ না হইলেই যে মূর্ত্তিকল্পনা 'স্বভাবের বিরুদ্ধ' কিসে হয় তাহা বুঝিতে পারি না।" আমাদের বক্তব্য এই যে,—আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু কাহারও ঘটে বুদ্ধি দিতে পারি না। সে জন্য অর্দ্ধেন্দ্র বাবু বিধাতার নিকট আবেদন করুন। এই সহজ সত্যও যদি অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর মত বোদ্ধার বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমরা নাচার!

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন;—" 'আজানুলম্বিত বাহু', 'আকর্ণবিস্তৃত নয়ন',

'ব্যূঢ়োরস্ক', 'বৃষস্কন্ধ', 'পদ্মহস্ত', 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম' প্রভৃতির মনুষ্য-কল্পনা যদি 'উদ্ভট' ও 'স্বভাববিরুদ্ধ' না হয়, পুরাণোক্ত মহাপুরুষগণের চিত্র-কল্পনায় ঐরূপ 'উদ্ভট' ও স্বভাববিরুদ্ধ' রীতির অনুসরণে ভারতশিল্পীর অধিকার আছে।"

অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। হেলীর ধূমকেতুও অর্দ্ধেন্দ্র-বুদ্ধির সহিত দৌড়ের পাল্লা দিতে পারিবে না!

'আজানুলম্বিত বাহু' না হয় অর্দ্ধেন্দ্র বাবুদের একচেটিয়া হইয়া থাকুক, কিন্তু 'বৃষস্কন্ধ' প্রভৃতি বর্ণনায় অর্দ্ধেন্দ্র বাবু কি 'হুবহু নকল' বুঝিয়াছেন? যদি কোনও চিত্রকর মানুষের মস্তকের নীচে বৃষের স্কন্ধ আঁকিয়া দেয়, তাহা হইলে 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' জয়যুক্ত হইতে পারে, আর কোনও লাভ হয় কি? সাহিত্যে 'আকর্ণবিস্তৃত নয়নে'র বর্ণনা আছে। অতএব, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর মক্কেল চিত্রকরগণ মানুষের মুখে চোখের খাল কাটিয়া, সেই খাল কর্ণকুহরের অতলস্পর্শে মিশাইয়া দিবেন? 'পদ্মহস্ত' পড়িয়াই সুন্দরীর হস্ত হইতে করতলাদি বাদ দিয়া তাহার 'নুলো' প্রকোষ্ঠে একটি পদ্ম আঁকিয়া দিবেন? রামচন্দ্র 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম', সেই জন্য তাঁহাকে তৃণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিবেন? বারোয়ারীর রামচন্দ্র এইরূপ হরিদ্বর্ণ বটে, কিন্তু সেই আদর্শে তিনি কি 'ভারতীয় চিত্রকলা'র অনুগত রবীন্দ্রনাথের চিত্রে সবুজ রঙ্গ ফলাইবেন? 'তিলফুল নাসা'র বর্ণনাও ত বিরল নহে। অতএব, কোনও সুন্দরীর নাকটি কাটিয়া ক্ষতস্থলে একটি তিল ফুল বসাইয়া দিলে কি 'ভারতীয় চিত্রকলা'র জয়গান করিব? 'পূর্ণচন্দ্রনিভাননী'র মুখটি কাটিয়া গলার উপর একখানি বড় কাঞ্চন-থালা আঁকিয়া দিলে চলিবে কি?

ছি! দিবালোকে সাহিত্যের পবিত্র ক্ষেত্রে এমন করিয়া চলাইতে নাই। অর্দ্ধেন্দ্র বাবু জগতের সকল বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছেন, কেবল সহজ বুদ্ধিটুকু শাণাইবার সময় পান নাই! যদি সে দিকে একটু মন দিতেন, তাহা হইলে এমনতর বিড়ম্বিত হইতেন না।

"নবদূর্ব্বাদলশ্যাম" প্রভৃতির অর্থ অন্যরূপ। অর্দ্ধেন্দ্র বাবু স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "হিন্দু দেব দেবীর চিত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে,—যদি তাঁহার ভাগ্যে থাকে,—তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালা বহি ক'খানাই বা আছে, আগে সেগুলি পড়িয়া পরে বড় বড় ইংরেজী কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিলে অর্দ্ধেন্দ্র সমালোচক লাভবান হইতেন।

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু 'এনাটমী,' 'পার্স্পেক্টিভ্', 'লাইট্ এণ্ড শেড্' প্রভৃতি কর্ম্মনাশায় ভাসাইয়া দিতে বলিয়াছেন! তাঁহার মতে, 'এনাটমি' দুই প্রকার! ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কি বলেন? সাধারণ মানবের 'এনাটমি'র সহিত অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর 'এনাটমি' না মিলিতে পারে, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, উভয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। চিত্র-বিদ্যায় 'রেমো' 'শ্যেমো'র 'এনাটমি' ও 'ভারতীয় চিত্রকলা'র প্রতিপাদ্য মহাপুরুষগণের 'এনাটমি' স্বতন্ত্র, ইহা অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর নূতন আবিষ্কার! যাঁহারা কালীর অক্ষরে এমনতর

অহম্মুখতার পরিচয় দেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!"

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"তাজনির্ম্মাণের স্বপ্ন" নামক অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত—আমাদের মতে 'আঁচড়িত'—'পটে' "কল্পিত অশ্বের সূচ্যগ্র মুখ, 'এনাটমি'র হিসাবে অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু আখ্যানবস্তুর হিসাবে এই অত্যুক্তির আবশ্যক হইয়াছিল।" বটে! সে "আবশ্যক" কি মহাশয়? আবশ্যকমত ঘোড়ার মুখ 'ছুঁচলো' হইবে? 'থ্যাবড়া' বা সিন্ধুঘোটকের মত দন্তশালী না হইবে কেন? তাঞ্জোরের পুস্তকাগারে অর্দ্ধেন্দ্র বাবু "অশ্বশাস্ত্রের একখানি সুরঞ্জিত সচিত্র সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারই অনুরূপ অশ্বের চিত্র" দেখিয়াছেন। যখন তাঞ্জোরের অশ্বশাস্ত্রে এইরূপ অশ্বের চিত্র আছে, তখন পটুয়ার সাত খুন মাপ্! অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর যুক্তিগুলিও ক্রমে ক্রমে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র আঙ্গুলের মত অত্যন্ত লতানে হইয়া পড়িয়াছে! তাঞ্জোরের অশ্বশাস্ত্রে ঘোড়ার মুখ ছুঁচলো, অতএব ঘোড়ার মুখ সূচ্যগ্র হইতে পারে,—এমন যুক্তির বালাই লইয়া মরি! অর্দ্ধেন্দু বাবুরা 'ভারতীয় চিত্রকলা' নামক যে অশ্বডিম্বে তা দিতেছেন, আশা করি, সেই ডিম্ব ফুটিলে, জগতে ছুঁচলো-মুখ ঘোড়ার অভাব হইবে না!

চিত্রের মূলসূত্র ও সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুত সুকুমার রায় যাহা বলিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দ্র বাবু তাহার অনুশীলন করুন। ক্রমে বুদ্ধি খুলিতে পারে।

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু "সাহিত্যে"র সমালোচকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন। প্রথমেই বলিয়াছেন,—"সাহিত্যের সমালোচক * * তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় যে গালি বর্ষণ করিতেছেন"—ইত্যাদি। আমার বক্তব্য এই যে, যাহাকে তিনি 'গালি' মনে করিয়াছেন, তাহা গালি নহে। 'ভারতীয় চিত্রকলা'র নামে যাঁহারা দেশের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য পুষ্পাঞ্জলির যোগ্য নহেন। আমরা তীব্র গালির পরিবর্ত্তে বিদ্রূপের সাহায্যে দেশবাসীকে সাবধান করিতেছি। যাহা আপনার মতের প্রতিকূল, তাহাই গালি নহে, এই অমূল্য তত্ত্বটি কখনও ভুলিবেন না। আর, "সাহিত্যে"র সমালোচকের ভাষা 'অননুকরণীয়',—ইহাও ত স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কেন না, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধেই দেখিতেছি, তিনি 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করিয়াছেন। অনেক স্থলে অবিকল সেই ভাষার—অনুকরণ না হউক—'হনুকরণ' করিয়াছেন। একটি উদাহরণ এই,—"গলদেশের উপর ভগবান্ যে মুণ্ডটি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন।" "সাহিত্যে"র "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"য় কিছু দিন পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দ্র বাবু না বলিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। অনেক লেখক ছায়া লইয়া লিখিয়া থাকেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর চিত্রশাস্ত্রে ছায়াও নাই, আলোও নাই; তাই বোধ করি তিনি অনায়াসে কায়াটুকু গ্রহণ করিয়াছেন! এখন যদি তাঁহাকে "ভাসুরক" অভিধানে অভিহিত করি, ["চৌরঃ স ভাসুরকঃ"—ইতি পঞ্চতন্ত্রম্।] তাহা হইলে অন্যায় হয় কি?

বৈশাখের "সাহিত্যে" ভ্রমক্রমে "ল্যাণ্ডসীয়ারে"র স্থলে "সার যোশুয়া রেণল্ড" মুদ্রিত হইয়াছিল। কয়েকখানি "সাহিত্য" হস্তান্তরিত হইবার পর, এই ভ্রম "সাহিত্য"-সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর হয়। তৎক্ষণাৎ লাল স্লিপে ভ্রম-সংশোধন মুদ্রিত ও "সাহিত্যে"র মলাটে সংযুক্ত হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে"র "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"র শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল,—"বৈশাখের মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় ৬৪ পৃষ্ঠার চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে যথাক্রমে 'সার যোশুয়া রেণল্ড' ও 'রেণল্ডে'র স্থলে 'ল্যাণ্ডসীয়ার' করিয়া লইবেন।" কিন্তু বৈশাখের লাল টক্‌টকে কাগজটুকু ও জ্যৈষ্ঠের কালো কালীর এই ছাপাটুকু অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর নেত্রগোচর হয় নাই! তাই আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে শিল্প-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় অর্দ্ধেন্দ্রকুমার "সাহিত্য"-সম্পাদককে প্রকারান্তরে মূর্খ বলিয়াছেন! এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ! তাঁহার উদারতা 'বাস্তবিকই উপভোগ্য'। আমরা জানিতাম,—'ঘাট মানিলে কুকুরেও ছোঁয় না।' কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবু—থাক্, আর নাই বলিলাম।

কিন্তু স্মৃতি কেবল "সাহিত্য"-সম্পাদককে প্রতারিত করিয়াই ক্ষান্ত হইবার পাত্রী নহে! অর্দ্ধেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—"ন তথা বাধতে স্কন্ধং যথা বাধতি বাধতে।" স্কন্ধ শব্দ পুংলিঙ্গ;—অর্দ্ধেন্দু বাবু তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ—অর্থাৎ খোজা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। "স্কন্ধং" নহে, "স্কন্ধঃ"। অনুস্বার ও বিসর্গ, দুটোর একটা শব্দের ঘাড়ে চড়াইয়া দিলেই সংস্কৃত হয় না, অর্দ্ধেন্দ্র বাবু তাহা জানিয়া রাখুন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ!

ইহাকে আমরা মূর্খতা বলিব না, স্মৃতি-বিভ্রম বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। কেন না, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে দেখিতেছি, 'উপরোক্ত'! উপর্য্যুক্ত হয়, 'উপরোক্ত' শাজাহানের ঘোড়ার ছুঁচলো মুখের মত দুর্লভ! "অত্যুক্তির আবশ্যক হইয়াছিল।" অত্যুক্তি আবশ্যক হইতে পারে, "র" বর্ণটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এইরূপ প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, অর্দ্ধেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা বা সংস্কৃত কোনও ভাষারই চর্চ্চা করিবার সুযোগ পান নাই, তোতা পাখীর মত শুনিয়া শিখিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে 'শেখা বুলি' উদ্গার করিয়া থাকেন। তাই অম্লানবদনে বিসর্গটি পরিপাক করিয়া তাহার বদলে 'স্কন্ধ'কে অনুস্বারটি দান করিয়াছেন!

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"তাহার (সাহিত্য-সম্পাদকের) স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য।" এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ,
যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে!"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—কাহার "স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিক উপভোগ্য?" যাহাদের মতে গ্রীকশিল্প তুচ্ছ, মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল প্রভৃতি নগণ্য, চিত্রশিল্পে এনাটমী, পার্‌স্‌পেক্‌টিভ, লাইট্ এণ্ড শেড্ অনাবশ্যক, তাহাদের

"স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার উপভোগ্য ?" না, যাঁহারা 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া' অবনীন্দ্র-পন্থীদের চক্ষু উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের "স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার উপভোগ্য ?" দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পর্দ্ধা যদি উপভোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর "স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার" অন্ততঃ বিদ্রূপেরও যোগ্য নহে কি ?

অর্দ্ধেন্দ্র বাবু উপসংহারে ফয়তা দিয়াছেন,—"সাহিত্যের চিত্রসমালোচনা 'অনধিকারচর্চ্চা'।"

আর, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার, চারুচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর 'ধীমান' ও র‍্যাফেলগণের পক্ষে তাহা অনধিকারচর্চ্চা নহে! সে বিষয়ে তাঁহাদের অশিক্ষিতপটুত্ব! জীববিশেষ যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই ডাল ধরে, বেঙাচী যেমন ল্যাজ খসিবামাত্র লম্ফ দিতে থাকে, তেমনই ইঁহারা কলম ধরিয়াই 'আর্ট-ক্রিটিক্' হইয়াছেন! ইহার অর্থ এই, যাঁহারা অবনীন্দ্রনাথের মোসাহেব, ভারতীয় চিত্রকলার গুণগানে পঞ্চমুখ, তাঁহারা চিত্রসমালোচনার অধিকারী। আর, অবশিষ্ট সমগ্র দুনিয়া এ বিষয়ে অনধিকারী! নির্লজ্জতা ও আস্পর্দ্ধা আর কত দূর অগ্রসর হইতে পারে ?

আমাদের গালি দাও, কিন্তু চিত্রবিজ্ঞান ও গ্রীক্ শিল্প, এঞ্জিলো ও র‍্যাফেল প্রভৃতিকে তাচ্ছীল্য করিও না। কেন না, 'ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না'। কূপমণ্ডুক হইয়া থাকো, বিস্তৃত জগৎকে নাক তুলিয়া বিদ্রূপ করিও না।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

ভারতীয় চিত্রশিল্প।

["প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত।]

ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনাদি হইয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টাচরিত সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না। বিশেষতঃ, ভারতশিল্প প্রসঙ্গে গ্রীক ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা ও সমালোচনা করায় অবস্থাটা নিতান্তই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্র বাবু বা অপর কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সহজ গদ্যে আমাদের আপত্তি ও সন্দেহাদির মীমাংসা করিয়া দেন, তবে অনুগৃহীত হইব।

বোঝা গেল, ভারত শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোন সমাদর নাই। মক্ষিকায় মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর হুবহু অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন, কোন শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনও ধার ধারেন না। তিনি "এনাটমি, পার্সপেক্‌টিভ্ প্রভৃতি গ্রীকশিল্পের ঠুলি" চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন না। চিত্রাঙ্কণকালে চিত্রের উপাখ্যানবস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল নীল

কি সবুজ, এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্রবর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন, ঠিক তেম্‌নিটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয়, অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয়, সে সকল বাস্তব ব্যাপার —facts of nature—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাঁহার বিশেষত্ব। জড়জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোন্‌টা সম্ভব কোন্‌টা অসম্ভব, এ সকল আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয় নহে। শিল্পক্ষেত্রে Natureকে লইয়া টানাহ্যাঁচ্‌ড়া করা ওই বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব, জড়বুদ্ধিপ্রধান পাশ্চাত্যজগতেই সাজে—ইত্যাদি। তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোন স্থান নাই?

ভারতশিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" কিসে? আদর্শের উচ্চতাবশতঃ? না এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রগুলির সৌন্দর্য্যাধিক্যবশতঃ? শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ বিচারের প্রণালী কি? কোন্ বিশেষ সৌন্দর্য্য ভারতশিল্পের একচেটিয়া সামগ্রী? শুনিতে পাই, "আধ্যাত্মিকতা"ই ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত "আধ্যাত্মিকতা" কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক নায়িকার চোখে মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল, অথবা চারি দিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের অভাস দিলেন, তবেই কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে ত সোনায় সোহাগা! প্রায়ই ত দেখা যায় শিল্পের মধ্যে জাতীয় ভাব ও প্রকৃতির একটা ছাপ রহিয়াছে। ভারতশিল্পের উপরে যে ভারতীয় ধর্ম্মভাবের একটা ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতেই কি শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল, এবং শিল্প একবারে "ঐশ্বরিকতার অভিব্যক্তি" হইয়া দাঁড়াইল?

কিন্তু "ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য বাহিরে নয় ভিতরে।" চিত্রের যেটুকু বহিরংশ, যাহা শুধু চোখে দেখা যায়, সেইটুকুই তাহার যথাসর্ব্বস্ব নহে। তাহার প্রাণটি, অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের যে ভাবের দ্বারা তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন সেই ভাবটিই, তাহার আসল সৌন্দর্য্য (যদি ভাবটি চিত্রে বোধগম্য হইয়া থাকে)। শিল্পমাত্রই রেখাবর্ণাদি দ্বারা মনের ভাবকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা। ইহা ভারতশিল্পের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে—সকল শিল্পেরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। তবে, কেহ সোজাসুজি বক্তব্য বলিয়া যান, কেহ বা তাহাতে কবিত্ব উপমা অলঙ্কারাদি যোগ করিয়া দেন। কেহ প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেহ নরনারীর মুখশ্রীতে বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে পান,—আবার কেহ বা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য হইতে চিত্রের উপাদান

সংগ্রহ করেন। কিন্তু যিনি যে পথেই চলুন না কেন, সকলেরই গুরু Nature। জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনও অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই—Natureকে অবলম্বন করিয়াই—কল্পনার উৎপত্তি। যাহাকে কল্পনার ঘর বলিয়া কল্পনা করি, তাহার ইঁট সুরকি মালমশলা সবই Nature হইতে চুরি। এরূপ না হইলে এক জনের ভাব অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর হইত না।

শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহার সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন, এবং Nature হইতে সংগৃহীত উপাদান-গুলি আবশ্যক মত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারেন—ইহা কেহ অস্বীকার করে না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু নব্য ভারতশিল্পে সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক অদ্ভুতরসের যে প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সেগুলিও কি ভারতশিল্পের সাফল্যের নিদর্শন? চিত্রব্যাখ্যাদিতে ইহার সমর্থনে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, কাব্যে আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম প্রভৃতি অতিশয়োক্তিতে যখন কেহ আপত্তি করে না, তখন চিত্রশিল্পেও এবম্বিধ আতিশয্য কখনই প্রতিবাদযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের মধ্যে যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে, সেটাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? কাব্যের 'ভাষা' নামক জিনিসটা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ, বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাববিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোন কৃত্রিমতা নাই। কবি তাঁহার মানসমূর্ত্তিকে ভাষায় বর্ণনা করেন, কিন্তু চিত্রকর সেই মূর্ত্তিটিকেই চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কবির পরোক্ষচিত্রে যে অতিশয়োক্তি দূষণীয় বোধ হয় না, শিল্পে "তাহা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত" হইয়া প্রত্যক্ষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, তাহাকে "উদ্ভট" ছাড়া আর কি বলাযায়?

কাব্যের ন্যায়, শিল্পেও অলঙ্কার ও উপমার স্থান আছে—কিন্তু সেই অলঙ্কার ও উপমা ব্যাপারটাই যখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে চায়, তখনই আশঙ্কার কথা—বিশেষতঃ কাব্যের কৃত্রিম উপমাপদ্ধতিকেই যখন "উচ্চশিল্পে"র আদর্শ ধরিয়া লওয়া হয়। আরও ভয়ের কারণ এই যে, ভারতশিল্পোৎসাহিগণ "আর কোনও সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহাদের রচনায় স্থান পাইবে না" কেবল এই বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা দস্তুরমত কোমর বাঁধিয়া ইউরোপীয় শিল্পের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত! ইঁহাদের মতে "ভারতশিল্প" 'লেবেল' যাহাতে আঁটা নাই, তাহা আমাদের আলোচ্য হইতেই পারে না, এবং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু থাকা অসম্ভব! যুক্তিস্বরূপ বৈদেশিক ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হয়, "বিদেশীয় ভাষায় কাব্য লিখিয়া কে কবে যশস্বী হইয়াছে?" তবে কি এই যুক্তি অনুসারে বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চা করাও নিষিদ্ধ হইবে? তা ছাড়া, দুইটা স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে যে সকল মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য

সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, চিত্রের ভাষা মূলতঃ এবং স্বভাবতঃ বিশ্বজনীন।

সৌভাগ্যের বিষয়, যাঁহারা হাতে কলমে "ভারতশিল্প কি" তাহা দেখাইতেছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল বিচিত্র মতের একান্ত বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। বেশী কথায় কাজ কি, হ্যাবেল সাহেবের মতে, "অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি ইউরোপীয় ও ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ!" ইহাতে অবনীন্দ্র বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের অঙ্কিত চিত্রাদির "ভারতীয়ত্ব" কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য ঐ সকল চিত্র "খেলো" হইয়া গিয়াছে, আশা করি, এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। এই জাতীয় অনেক চিত্রেই যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, চিত্রের "ভারতীয়তা"ই তাহার একমাত্র অথবা সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় না। শিল্পকে যিনি যে ভাবে দেখিতেছেন, তিনি সেই ভাবে তাহার সাধনা করিবেন। গ্রীকশিল্প বা রোমীয়শিল্প ঐ পথে গিয়াছে, অতএব তোমার আমার ও পথে গতির্নাস্তি—এ কোন্ দেশীয় যুক্তি? আমাদের আর অন্য গতি নাই, "এই যে ভারতশিল্পরূপ কল্পতরু—আইস, আমরা ইহারই সুশীতল ছায়ায়" বসিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিল্পকে মর্ত্তমান দেখাই! ভারতশিল্প-প্রচারার্থিগণ শিল্পকে যে ভাবে দেখিতেছেন, কেহ যদি ঠিক সে ভাবে না দেখে, তবেই কি তাহাকে "উচ্চশিল্পের" রসগ্রহণে অক্ষম ঠাওরাইতে হইবে? সকল লোকে এক পথে যায় না—সকলের রুচি বা প্রকৃতিও এক নহে। মনকে রাফেল, রস্কিন, বা শুক্রাচার্য্যের দোহাই দিয়া একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন এবং সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও কম। প্রকৃত শিল্পী অন্তর্নিহিত শিল্পবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই শিল্প সাধনা করেন—"ভারতীয়" শিল্প, "গ্রীক" শিল্প প্রভৃতি নামধারী System বা প্রথা বিশেষের খাতিরে নহে!

নব্যপন্থী চিত্রকরগণ শিল্পের যে আদর্শ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিবেন, ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। হয় ত, ভাবপ্রধান শিল্পের এরূপ একটা পুনরুত্থান বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকিবে। প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়াবাড়ির মাত্রাটাও একটু উৎকট হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসাটা যেন ভয়ঙ্কর হইয়া না উঠে। নব্যশিল্পের শাস্ত্রকারগণ যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, কল্পনার দিব্য চস্‌মাটির উপর অত্যধিক মায়া বশতঃ চিত্রবিজ্ঞানের ঠুলিটিকে আবর্জ্জনাস্তানে ফেলিয়া দেন, এবং নিজ শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ অনন্যলভ্য 'দৈব' সম্পদ কল্পনা করিয়া "এই আদর্শই সকলের অবশ্য শিরোধার্য্য" বলিয়া জেদ্ ধরেন, ও একাধারে বাদী, উকীল, জজ ও জুরি হইয়া যাবতীয় শিল্পের দোষগুণ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হ'ন, তবেই ভয় হয়, বুঝি বা "অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘডম্বরে"র ন্যায় সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়।

শ্রীসুকুমার রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বাণী।—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। 'বিদেশীর মুখে বাঙ্গলার কথা—প্রাচীন বেঙ্গালা' সুলিখিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। লেখক এই প্রবন্ধে অনুসন্ধান-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র দে'র 'প্রাচীন বিক্রমপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা' উল্লেখযোগ্য। 'স্নেহের জয়' শ্রীযুত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। লেখকের মতে, ইহা 'গল্প'! কিন্তু ফকিরচন্দ্র সহসা গল্প লিখিতে বসিলেন কেন, 'স্নেহের জয়' পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'গল্প' কাহাকে বলে, এই সকল ফকীরের ঘটে সে বোধ নাই। যেমন আখ্যান-বস্তু, তেমনই রচনা। ফকির বাবু 'নয়ন হেলাইয়া' দেখেন! আবার লেখেন,—'আমাদের শান্তি, আনন্দ—পল্লীগ্রামের অবিচ্ছিন্ন স্নেহ-বন্ধনের ভিতর, জননীর যত্নসঞ্চিত শাক-অন্নের ভিতর।' ট্রামের টিকিটের 'পশ্চাদ্ভাগ দেখহ' এই ফকিরী ভাষার নিকট পরাজিত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এমনতর ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা লিখিয়া মাতৃভাষা কলুষিত করিবার কারণ কি? মোপাঁসা হইবার পূর্ব্বে দিন কত বাঙ্গলা ভাষা মক্স করিলে হয় না? সকলেই কি মহীরাবণের বেটা অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই অস্ত্র ধরিতে পারে? অনেকে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ডাল ধরে বটে, কিন্তু কলম ধরিবার সম্বন্ধে প্রকৃতি সেরূপ কোনও বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন নাই। ফকির বাবুর 'স্নেহের জয়ে'র সহিত শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্নেহের জয়' নামক গল্পটির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান! 'চিত্ররেখা'র 'স্নেহের জয়' ছাপা হইয়া গিয়াছে। ফকির বাবু সম্ভবতঃ জলৌকার মত সুধীন্দ্রনাথের মানসী-দুহিতার রক্তশোষণ করিয়া স্ফীত হইয়াছেন! এই গল্পটি ছাপিয়া 'বাণী'-সম্পাদক সাহিত্যে 'ফকিরী'র প্রশ্রয় দিয়াছেন। আগাছায় বাঙ্গালা সাহিত্য জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। দাগা বুলাইবার পূর্ব্বেই যাঁহারা মাসিকের আসরে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সাহিত্যে স্বতঃসিদ্ধ হইবার উপায় নাই। কঠোর সাধনা বিনা এ ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। মাসিকে নাম ছাপিবার লোভ সংবরণ করিয়া ফকিরচন্দ্রগণ প্রথমে নিভৃতে চর্চ্চা করুন। 'দ্বারকা' সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রীযুত নকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আষাঢ়ে ফকির বাবুর বৈশাখী গল্পের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। ফকির বাবুকে যাহা বলিয়াছি, নকর বাবুর সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। আর চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিব না। শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রীর 'জেস্তাক বা হম্মাম' ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জৈনাচার্য্য—বিজয়চন্দ্র সূরি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বটের কথা' লিখিয়াছেন। বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই। 'নবজীবনে' রবীন্দ্রনাথের বটের কথা পড়িয়াছেন কি? তাহাতে জল ঢালিয়া, 'পান্সে' করিয়া ফকিরচন্দ্র 'বটের কথা' রচনা করিয়াছেন! ইহা 'অনুকরণ' নহে, এক প্রকার সাহিত্য-চৌর্য্য। বোধ করি, 'দিনে ডাকাতী' বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। অমূল্য বাবুর 'বাণী' কি শেষে 'চোর-বাগানে' পরিণত হইল?—ফকির বাবুর তালকাঁকুড় বোধ নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবের ঘরে চুরী করিয়া তিনি সেই প্রাচীন বটের শাখায় জটায় বিড়ম্বনা জড়াইয়া দিয়াছেন! বাহাদুর বটে। বিশ্বরদের ভাষা একটু বদলাইয়া ফকির বাবুকেও বলা যায়,—

'ভ্যালা মোর বাপ, আচ্ছা মদ্দ!
সিঁদ-কাঠী দিয়ে লিখ্‌ছ গদ্য।'

শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রীর 'গীতায় নূতন শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা' পণ্ডিত-সমাজের নিবেদ্য। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বারাণসী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু

'এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক'

প্রভৃতি চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। আর কবিতা ঐতিহাসিক ঘটনার 'কিরিস্তি' হইতে পারে না। 'বারাণসী' ঐতিহাসিক বিদ্যার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত, অথচ ভাবে দরিদ্র হইয়াছে। শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক' পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ই প্রথমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 'বাণী' সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্র প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। [illegible]

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর 'ভণ্ড শব্দ' নামক উপাদেয় প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বেশ-বিভ্রাট' নামক রচনাটি গল্প কি না, বলিতে পারি না। এমন অন্তঃসারশূন্য অখণ্ড রচনা সচরাচর দেখা যায় না। অথচ ইহার জনক ফকিরচন্দ্র বাবা বৈদ্যনাথের গরুর মত বদান্য! যে সম্পাদক শরণাগত হন, তাঁহাকেই রচনা-রত্ন দান করেন! কেবল 'বেশে বিভ্রাট' নয়, ফকির বাবুদের কল্যাণে মাসিকেও বিষম বিভ্রাট ঘটিল। শ্রীযুত রসময় লাহার 'ধীমতী' একবারে রসশূন্য। কর্ত্তা রসময়, কিন্তু কার্য্যে এক বিন্দু রস নাই।

'সারতে দিলে কামিজ সেলাই খোলা
বরং আরো ছিঁড়ে ফেলেন জোরে;
"কলা বিদ্যার বোঝো তুমি কলা"
বলে দেখান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মোরে।'

শ্রীমতী যদি এই রচনাটি পড়িয়া শ্রীমানের মুখের উপর শেষের দুই ছত্র উচ্চারণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিব,—তিনি নিশ্চয় 'ধীমতী'। কেন না, কলা দেখাইলে কবিতাও হয় না, রঙ্গও হয় না; বীভৎস রসের উদ্রেক হয় বটে। 'ধীমতী' রুচি-বিকারের নিদর্শন। ইহা হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু কৃপার খাদ মিশ্রিত থাকে। শ্রীযুত বিমলাচরণ লাহার 'সিংহল-কাহিনী'তে বিশেষ কোনও তথ্য নাই। শ্রীযুত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গাছ ও মালী' নামক চতুষ্পদী মন্দ নহে। 'কাঁচির চাপে'র বদলে 'ধারে' কাটিলে মন্দ হইত না। 'বাণী' এবার 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরে' পূত হইয়াছেন।—'মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী মহকুমার ভরতপুর গ্রামে মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীরাধিকার অবতার শ্রীগদাধর আচার্য্যের পাট। এইখানে গদাধরের স্থাপিত গোপাল দেবের বিগ্রহ আজিও বর্ত্তমান।' এই গোপাল দেবের মন্দিরে ভাগবতের একখানি প্রাচীন জীর্ণ পুঁথি আছে। এই পুঁথির এক স্থানে টীকায় মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর আছে। যে পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর আছে, পরিবৎ তাহার ফটো আনিয়াছেন। সেই ফটো হইতে এই প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবাসী।—শ্রাবণ। চিত্রকর মোলারামের 'প্রেমযাত্রা' নামক পটখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার সম্বন্ধেও সংক্ষেপে বলা যায়,—'কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন।' ইহা 'প্রেমযাত্রা' কি যুদ্ধযাত্রা, তাহা পট দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। তবে ইহাকে 'ভারতীয় চিত্র-কলা'র 'গঙ্গাযাত্রা' বলিলে কোনও ক্ষতি নাই। 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত 'নোট'। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি মেহেদির পাতা'র গল্পত্ব অত্যন্ত অল্প, ন্যাকামী অত্যন্ত প্রচুর। তবে ইহাতে মৌলিকতার বহু চিহ্ন আছে। নমুনা,— 'বেতসলতার "মতো"!' সর্ব্বসাধারণ অবশ্য 'মত'ই লিখিয়া থাকে। চারুচন্দ্রও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের 'মতো' ফনেটিক বানানের পক্ষপাতী! তরুণ তরুণীর আদ্যক্ষর 'তো'র মতই উচ্চারিত হয়; কিন্তু চারুচন্দ্র তাহাতে ও-কার সংযোগ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় চারুচন্দ্রেরও 'সকল কাজেই originality', অতঃপর তাহা কে অস্বীকার করিবে? চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন,— 'মর্ম্মজালায়নের অন্তরালে।' জাল শব্দের অর্থ,—গবাক্ষচ্ছিদ্র, গবাক্ষ; অয়নের সুপ্রচলিত অর্থ,—পথ। সুতরাং জালায়ন = গবাক্ষের পথ! আমরা অভিধান দেখিয়া এই বিষম-পদ-ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম! 'মেহেদির পাতা'র আদ্যোপান্তে কেবল বাক্যের ছটা। আবার ভাবের ঘটাও তদ্রূপ,—'মাটীর সরায় সোনার তবক মোড়া ছাঁচিপান—ছেঁচা, তাহার অন্তর কাটিয়া শোণিতধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।' পানের বুকের এই শোণিতধারা দেখিয়া যাহার নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া না পড়িবে, সে অত্যন্ত পাষণ্ড, তাহা আমরা শতবার বলিব। আমরা আর লিখিতে পারিতেছি না, অশ্রুধারায় নয়ন অন্ধ হইয়া আসিতেছে, কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে। 'এই অন্তর-কাটা' দুঃখেই বোধ করি পান আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ খাইয়াছিল, বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। আর সেই বিষজর্জ্জরিত পান খাইয়াই পল্লীকবিরা পানের হুজুক তুলিয়াছিলেন! চারু বাবু লিখিয়াছেন,—'সদ্য বিবাহ!' অভিপ্রেত বোধ হয় সদ্যস্ক।

মানসসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ;— উদ্ধারের ঘটা দেখিয়া 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' মনে পড়ে! চক্রবর্ত্তী লেখকের প্রতিপাদ্য এই,—'প্রত্যেক কবিই আংশিক রূপে ঋষি। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব এইখানে।' অত্র প্রবন্ধে? উপসংহার,—'ধন্য কবি! ধন্য বঙ্গভাষা। ধন্য বঙ্গভূমি!' আমরাও বলি,—'ধন্য চক্রবর্ত্তী! ধন্য বঙ্গভাষা। ধন্য বঙ্গভূমি!' এমন গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঋষিত্বের এমন লক্ষণ অন্য দেশে বিকশিত কি?—অতএব ধন্য—ইত্যাদি। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কারলীর গিরিগুহা' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমান' নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই অপমান করিয়াছেন। 'সাহিত্যে যাঁহারা অপভাষার সং দেখিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'তাঁতি পোকা' পড়িয়া দেখুন। শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষের 'বর্ষাসুন্দরী' পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। শ্রীযুত সুকুমার রায়ের 'ভারতীয় চিত্র-শিল্প' সুচিন্তিত ও সুলিখিত নিবন্ধ। আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃ-অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দের ঝঙ্কারে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্দ্র ধ্বনি মনে পড়ে। কিন্তু 'মাতৃঅভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দ গ্রথিত বক্তৃতা।

'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,'

সু-কল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'—নীড়ে অর্থাৎ পাখীর বাসায় জননী জাগিতেছেন, এই খঞ্জ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। প্রথমেই শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্কিমচন্দ্র'। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ। আজ কাল নূতন লেখকগণের রচনায় এমন ভাষাসংযম সচরাচর দেখা যায় না। লেখকের ভাব-প্রকাশ-শক্তিও প্রশংসনীয়। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, নবীন সাধকের সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। শ্রীযুত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ' উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' ডারুইন-প্রণীত 'Descent of Man' নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করিবে। শ্রীযুত রাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশে হিন্দু জাতির হ্রাসের কারণ' এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুত প্রফুল্লনারায়ণ রায়ের 'পরিচয়' গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মজুমদারের 'পল্লীস্মৃতি' কবিতা শব্দের হার। 'সূর্য্যপূজা' ও 'নীলকণ্ঠ' চলিতেছে।

নব্য-ভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'সাংখ্যসূত্র' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ 'সেকালে ও একালে' নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু গুছাইয়া সব কথা বলিতে পারেন নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের গহনে প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সন্ধানে পাঠককে দিশাহারা হইতে হয়। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কবি রজনীকান্ত' প্রবন্ধে শ্রীযুত রজনীকান্ত সেনের কবিতা ও কবিত্বের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা সর্ব্বত্র সফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও বিফল হইয়াছে। লেখকের রচনায় সমালোচনা-শক্তির কোনও পরিচয় পাইলাম না। শ্রীযুত বেণো-য়ারীলাল গোস্বামী 'কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রাস্ত' নাম দিয়া যে অমিত্রাক্ষর লিখিয়াছেন, আমরা তাহার রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। ইহাতে মিল নাই বটে, কিন্তু মিলের অভাবই অমিত্রাক্ষরের একমাত্র লক্ষণ নহে। ইহাতে অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিই নাই। লেখকের

'শুকতির নির্ম্মল্ছদে পুতলীরাজনে'

প্রভৃতি দুরূহ, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ছুছুন্দরীবধ কাব্যের 'দ্রুহিণ-বাহন-সাধু অনুগ্রহনিয়া' প্রভৃতি মনে পড়ে। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ' [illegible] বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অনুদিত 'অর্থশাস্ত্র' উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্র বাবু কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'ফাল্গুন মাসে' কবিতায় কবির দোষ ও গুণ সমভাবে বর্ত্তমান। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ' প্রবন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু নাই।

বঙ্গভূমি।

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থিরনেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল!
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'!
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিমুখ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা !
  বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
  চরণ-অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
  রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি !
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
  ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি !

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
  হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল ;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
  বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল !

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
  ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
  ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
  কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ ঘূৎকার,
  বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
  পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
  খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
  পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
  এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

নবম পরিচ্ছেদ—শেষ।

এই স্থানের নাম "সুকছঙ্গ"। অদ্য আমাকে এইখানেই বিশ্রাম করিতে হইল। ইয়ংবেলের স্ত্রী বড় দরিদ্র। ছাগল চরাইয়া খায়, এক বেলা বই আহার মিলে না। এখানে দারুণ শীত। এই শীতনিবারণের জন্য একখানিমাত্র ছিন্ন কম্বল আছে। এই কম্বলই তাহার পরিধেয়, এবং লজ্জানিবারণ বস্ত্র। আমি তাহার এইরূপ দশা দেখিয়া তাহাকে একটি টাকা দিলাম। সে এত আনন্দিত হইল যে, টাকাটি পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। এই দিবস সমস্ত রাত্রি খুব বৃষ্টি ও বরফপাত হইয়াছিল। আমাদিগকে একমাত্র অগ্নিকুণ্ড সহায় করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইয়াছিল, এবং বরফ ও বৃষ্টিপাত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রত্যূষে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া "গেঙ্গুল" নামক আড্ডার দিকে চলিলাম। এই আড্ডায় পঁহুছিতে ছয় ঘণ্টা লাগিয়াছিল। কারণ, গতরাত্রের বৃষ্টি ও বরফপাতে আমরা সকলেই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলাম। গেঙ্গুলে একটি অনতিবৃহৎ গুহা পাইলাম। এই গুহাতে অদ্য বাস করিতে হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে থাপা অভিমুখে চলিলাম। থাপা এই স্থান হইতে ছয় মাইল। এই ছয় মাইল রাস্তা অতি বিকট হইলেও বড় সুন্দর। অদ্য আর চলিতে আমাদের বড় একটা কষ্ট হইল না। স্বভাবের সৌন্দর্য্যে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় দুইটার পর থাপাতে উপস্থিত হইলাম।

ঘাপা একটি রাজধানী। এখানকার রাজার নাম ঘাপা জুন্। ঘাপার নীচে একটি নদী। নদীর পশ্চিমতটে অতি উচ্চ মৃত্তিকার পাহাড়। এই মৃত্তিকার পাহাড়ের মধ্যে খনন করিয়া বাসোপযুক্ত গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল গৃহে স্থানীয় অধিবাসীদিগের বাস। অধিবাসীদের গৃহগুলি শ্বেত ও নীল পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত। এই মৃত্তিকাময় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দেবালয় ও লামাদিগের বাসস্থান, এবং নিম্নে বাজার। এই বাজারকে "মণ্ডী" কহে। "নীতি" গ্রামের লোকেরা এখানে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। কুরকুটি গ্রামের যশপাল সেয়ানা এই মণ্ডীর প্রধান কর্ত্তা। কেবল যে নীতির লোকে এখানে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে, এমন নয়; নীতিপাশের নিকবর্ত্তী এক মরগাঁও ভিন্ন সমস্ত গ্রামের লোকদেরই ঘাপা বাণিজ্যস্থান।

আমি নদীর পশ্চিম তটে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার বাহনদিগের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই বিশ্রামে কোনও প্রকার আরাম লাভ করিতে পারিলাম না; কারণ, এখানে আশ্রয়স্থান নাই। নদীতীর বড়ই শীতল। আবার আজ হাওয়া উঠিয়াছে, কলেবর কম্পান্বিত; অগ্নি ও আশ্রয় ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও টিকিবার যো নাই; সুতরাং বিষ্ণু সিংহের পরামর্শে জিনিসপত্র সব ছাড়িয়া যশপাল সেয়ানার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। নদীতীর হইতে একটু উপরে উঠিয়াই দেখি, লোকে লোকারণ্য। মধ্যস্থলে সমভূমি। চতুর্দ্দিকে গুহার অনুরূপ গৃহ। উত্তর দিকে রাজভবন। এখানে নীতিপাশের লোকেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাদের মধ্যে ২।৪ জন আমার পূর্ব্বপরিচিত ছিল। তাহারা আমাকে যশপাল সেয়ানার গৃহে লইয়া গেল। যশপাল সেয়ানা এখানে আমাকে দেখিয়া বলিল,—"চলুন, রাজবাড়ীতে যাই।" আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম,—"ভাল কথা, আমি হোতি পাসে পুলিসকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, যাইবার সময় ঘাপার রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব। অদ্য আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে; চল, শীঘ্র চল।"

বিষ্ণু সিংহ ও যশপাল সেয়ানা আমার সঙ্গে গেল। পূর্ণানন্দ আমার সঙ্গে ছিল। আমরা নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলাম। যশপাল সেয়ানা বলিল,—"আপনারা দ্বারদেশে অপেক্ষা করুন, আমি রাজার হুকুম লইয়া আসিতেছি।" রাজবাড়ীটি আমাদের দেশীয় ধর্ম্মশালার অনুরূপ। ফটকের সম্মুখে ছোট খাট প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণকে

পশুশালা বলিলেও চলে। এখানে দুই তিন শত ছাগল, পাঁচ ছয় শত ভেড়া, দশ বারটা কুকুর, বিশ পঁচিশটা চামরী গাই। আর একটি গৃহ কাষ্ঠ ও ঘুটিয়াতে পরিপূর্ণ। আমরা রাজবাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া কুকুরগুলি বড়ই আস্ফালন করিতে লাগিল। ভয়ে আমাদের আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল; তবে রক্ষা এই যে, কুকুর মহাশয়েরা বন্ধন অবস্থায় ছিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে তিন জন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে দুই জন কুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইল। এক জন আমাকে বলিল,—"রাজা ডাকিয়াছেন, চলুন।"

আমি একেবারে যাইয়া রাজার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানার বামপার্শ্বে রন্ধনশালা, দক্ষিণপার্শ্বে গুদাম-ঘর। রাজার বৈঠকখানাটি শীতপ্রধান দেশের উপকরণে সুসজ্জিত। রাজা উচ্চ আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে তাঁহার পুত্র বসিয়া লেখাপড়া করিতে-ছেন। রাজার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে আরও কতকগুলি আসন আছে। সেই আসনগুলি আর কিছুই নহে, রেলগাড়ীর সেকেণ্ড ক্লাসের গদীর অনুরূপ; তবে গদীগুলি খাঁটী পশমের! এ গদীর সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠের বেঞ্চ, এই বেঞ্চের উপরিভাগ লাল কম্বলের দ্বারা আবৃত। এই বেঞ্চগুলিকে ক্ষুদ্র dining table বলিলেও চলে; কারণ, ঐ কম্বলাবৃত বেঞ্চগুলির উপরে চাএর পেয়ালা সুসজ্জিত, এবং তাহার পার্শ্বে কাষ্ঠের সুবৃহৎ কৌটাতে ছাতু ও তিব্বতীয় পনীর সুসজ্জিত। আমি যাইবামাত্র রাজা তাঁহার দক্ষিণ-দিকস্থ আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং বিষ্ণু সিংহ ও যশপাল সেয়ানা বামপার্শ্বে উপবেশন করিল।

রাজা আমার অবস্থা দেখিয়া ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন,—"চা লইয়া আইস।" ভৃত্য চা লইয়া আসিল। আমরা সকলেই চা পান করিয়া শীতনিবারণ করিলাম। ক্ষুধাও দূর হইল। রাজা বলিলেন,—"আপনি এখানে আসিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তবে এখন কোথায় উঠিয়াছেন? আপনার জিনিসপত্র কোথায়?" আমি বলিলাম,—"নদীতীরে জিনিসপত্র পড়িয়া রহিয়াছে ও আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। কোথায় থাকিব, তাহার এখনও স্থিরতা নাই।" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্রকে আদেশ করিলেন,—"তুমি একটি ভাল তাম্বু পাঠাইয়া দাও, আর কাষ্ঠ এবং আহারীয় জিনিসপত্র পাঠাইয়া দাও।" রাজপুত্র তাঁহার ২।৩ জন ভৃত্য

ও আমার সঙ্গী ইয়ংবেলকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজা আমাকে বলিলেন,—"আপনার তিব্বতের সমস্ত তীর্থ দর্শন হইয়াছে ত? রাস্তায় কোনও কষ্ট হয় নাই?" আমি উত্তর করিলাম,—"তিব্বতে আমাদের পাঁচটি তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে ত্রেতাপুরী, মানস সরোবর, কৈলাস ও খুজরুনাথ দেখা হইয়াছে, থুলিংমঠ বাকী আছে। তাহা দর্শন করিয়া গঙ্গোত্রীর দিকে যাইব।" রাজা বলিলেন,—"তা বেশ! এখানে ২।৩ দিন বিশ্রাম করুন, পরে থুলিংমঠে যাইবেন।" এই বলিয়া তিনি বেদান্তদর্শনের কথা তুলিলেন। আমি বেদান্তদর্শনের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলাম। তিনি বৌদ্ধদর্শনের দ্বারা আমার মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ বাদ প্রতিবাদের পর রাজা বলিলেন, "বেদান্তমত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে সমর্থ।" আমি বলিলাম,—"বুদ্ধ আমাদের অবতার; তাঁহার মত খণ্ডন করিতে আমি প্রস্তুত নহি। তবে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "আপনি কাশীর লামা। কাশীর লামাদিগকে আমরা গুরু বলিয়া মানি। আর আপনার সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিব না।" আমি বলিলাম,—"যদি তাহাই হইবে, তবে আপনারা আমাদিগকে তিব্বতে প্রবেশে বাধা দেন কেন? আমি জামীন্ দিয়া তিব্বতে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। যাহারা জামীন্ না দিতে পারিবে, তাহারা ত তিব্বত-প্রবেশের অধিকার পাইবে না, এবং কৈলাস ও মানস সরোবরাদি মহাতীর্থ ভ্রমণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। মানস সরোবর, কৈলাস ও ত্রেতাপুরী আমাদের মহাতীর্থ। পূর্ব্বকালে কাশী-লামারা অবাধে এই সব তীর্থে ভ্রমণ করিতে পারিতেন; এখন এই নিয়ম হইল কেন?" রাজা উত্তর করিলেন,—"কথা সত্য বটে, কিন্তু আমরা বিপন্ন হইয়া জামীনের নিয়ম করিয়াছি। প্রায় প্রতিবৎসরই দুই এক জন করিয়া ইংরাজ রাজার লোক ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং আমাদের দেশের নক্সা ও রাজকীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ রাজার নিকট প্রদান করে। এই ছদ্মবেশীদের মধ্যে অধিকাংশই সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়া আসিয়া থাকে। বিশেষতঃ, বার তের বৎসর অতীত হইল, শরচ্চন্দ্র দাস নামক জনৈক লোক লাসাতে লামার বেশে আসিয়াছিল। সে আমাদের অনেক গুহ্য কথা ইংরাজদের বলিয়া দিয়াছে। সেই অবধি নিয়ম হইয়াছে যে, লাসাতে কোনও বিদেশী বা অপরিচিত সন্ন্যাসী স্থান পাইবে না, এবং কোনও প্রবেশ-দ্বার দিয়া বিনা জামীনে কোনও সন্ন্যাসী

তিব্বতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। তবে সকল ঘাটার পুলিসকেই হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, প্রকৃত সাধুকে কখনই রোধ করিও না, সামান্য জামীন্ লইয়াই ছাড়িয়া দিবে।" আমি তাঁহার কথায় নিরুত্তর হইলাম।

এই সমস্ত কথা ও অন্যান্য কথাতে দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। ক্ষুধায় আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া রাজার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীতীরে আসিয়া দেখি, এক প্রকাণ্ড তাম্বু খাটান হইয়াছে; তাম্বুর মধ্যে আমার জিনিসপত্র রহিয়াছে; বাহিরে রন্ধন হইতেছে; তাম্বুর মধ্যে আমার বিছানা প্রস্তুত; বিছানার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে।

আমি আসিয়াই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিলাম; যশপাল সেয়ানা, বিষ্ণু সিং, আর চার পাঁচ জন লামা আমাকে ঘেরিয়া বসিল। আমাদের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দেব উপাসনা কেন, এই সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এক জন প্রধান লামা বলিলেন,—"বুদ্ধও দেবতা; শিব, তারা গৌরী, উমা প্রভৃতিও দেবতা; সুতরাং আমরা দেবউপাসক বৌদ্ধ।" "আমি উত্তর করিলাম, "বৌদ্ধধর্ম্মের কোন্ পুস্তকে দেব-উপাসনার বিধি আছে?" তিনি অনেক পুস্তকের নাম করিলেন; তাহার মধ্যে মহাচীন তন্ত্রের নাম আমার স্মরণ আছে। লামাজী আরও বলিলেন,—"দেখুন, কৈলাসের প্রথম মঠে হরগৌরী ও মহাকালীর মূর্ত্তি আছে; খুজরুনাথে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি আছে; ত্রেতাপুরীর দুই একটি মূর্ত্তি বাদ দিলে সবগুলিই শিব ও শক্তি মূর্ত্তি। আর খুজরুনাথে দশ অবতারের মূর্ত্তি আছে, এবং থুলিং মঠে বহুবিধ শক্তি মূর্ত্তি রহিয়াছে।" আমি তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম,—"আমি এই সব মূর্ত্তি দেখিয়াছি; যাইবার সময় থুলিং মঠের মূর্ত্তিসমূহও দেখিতে পাইব। তবে আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, এই সব ত আমাদের শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি; আপনাদের শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি কোথায়?" লামা বলিলেন, "আমরা আপনাদের দেশ হইতেই শাস্ত্র পাইয়াছি; আমাদের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র কাশী ও জ্বালামুখী হইতে কাশী-লামারা আসিয়া এখানে প্রচার করিয়াছেন। আপনি যদি তিব্বতের অক্ষর চিনিতেন, তাহা হইলে মহাচীন তন্ত্র ও অপরাপর গ্রন্থ আপনাকে দেখাইতে পারিতাম।" লামার সঙ্গে কথা শেষ হইতে না হইতে এক জন রাজদূত আসিয়া বলিল,—"রাজা আপনাকে ডাকিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু সিং ও যশপাল সেয়ানার মুখ চুণ হইয়া গেল। তাহারা উভয়েই

বলাবলি করিতে লাগিল,—"বোধ হয় রাজা সন্দেহ করিয়া স্বামীজীকে গ্রেপ্তার করিবেন। এখন রাজসমীপে যাওয়া উচিত, না পলায়ন করা উচিত?" আমি বলিলাম, "সন্দেহের কোনও কারণ দেখিতেছি না, আমার মনে উদ্বেগ হইতেছে না; এস, আমরা রাজার নিকটে যাই।" এই বলিয়া আমি অগ্রে অগ্রে চলিলাম, বিষ্ণু সিং ও যশপাল্ সেয়ানা আমার পশ্চাতে চলিল।

অগৌণে রাজসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই রাজা বলিলেন, "আমার স্ত্রী ও আমার কন্যা আপনাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আগ্রহান্বিতা হওয়াতে আপনাকে আবার কষ্ট দিলাম।" এই বলিয়া রাজা তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই আমাকে প্রণাম করিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই মূর্ত্তি সৌম্য, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। মাথায় মুকুট, বেণী স্কন্ধে দোদুল্যমান, রং শুভ্র, চক্ষু টানা; দেখিলে বোধ হয়, এ দেবীমূর্ত্তি। ইঁহাদের আকার প্রকার দেখিয়া আমার দেশের দুর্গামূর্ত্তি মনে হইল। রাণী আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি সত্বরই লাসায় যাইব, পথে যেন ডাকাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।" আমি বলিলাম,—"আপনার যথেষ্ট লোকবল আছে, সঙ্গে অস্ত্রধারী সৈন্য সামন্ত যাইবে, আপনার ভয় কিসের?" এই কথার পর রাজা বলিলেন,—"আমাদের দেশের ডাকাতেরা বড়ই দুর্ব্বৃত্ত, রাজা বা সৈন্য সামন্তকে কোনও ভয় করে না; অবসর পাইবামাত্র সদলে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রস্থান করে; তাই রাণী আপনার নিকট দৈববল প্রার্থনা করিতেছেন; আপনি আশীর্ব্বাদ করিলেই আমরা নিরাপদে লাসায় পঁহুছিতে পারিব।" আমি বলিলাম,—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, লাসার রাস্তায় আপনাদের কোনও বিপদ্ হইবে না; আপনারা নিরাপদে ও সুস্থশরীরে দেশে পৌঁছিতে পারিবেন।" আমার কথা শুনিয়াই ইঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন। রাণী আমাকে একখানি উৎকৃষ্ট পশমের আসন ও রাজকন্যা আমাকে এক জোড়া "ভাল লম্" অর্থাৎ তিব্বতীয় জুতা উপহার দিলেন। রাণী আমাকে বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আপনি বরফের মধ্যে চলিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার ইচ্ছা, আপনার চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া এবং জিনিসপত্র লইবার জন্য একটি চামরী আপনাকে দিই।" আমি বলিলাম,—"না মা, আমি সন্ন্যাসী; ও সব পশুতে আমার কোনও

প্রয়োজন নাই। আমি চাকর ভাড়া করিয়া লইয়াছি; তাহাতেই স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব।" এই বাপা জুন বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক লোক, ইনি নানা গবর্মেণ্টের° কার্য্য উপলক্ষে একবার দার্জিলিং গিয়াছিলেন ও ভ্রমণের জন্ত কলিকাতায়ও গিয়াছিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখনও আমাদের আহার হয় নাই। আমি [illegible] বিদায় লইয়া তাম্বুতে চলিলাম; যাইবার সময় রাজা বলিলেন,—"দুই তিন দিন এখানে অবস্থিতি করুন।" আমি বলিলাম,—"শীত ঋতু আসিতেছে, দশ বার দিনের মধ্যেই বরফ পড়িবার সম্ভাবনা; এখন অবস্থিতি করিলে নিরাপদে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত যাওয়া অসম্ভব; সুতরাং কাল প্রত্যুষেই আমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব।" রাজা আমার কথায় সম্মত হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

অনুমান রাত্রি নয়টার সময় আমি তাম্বুতে আসিলাম। এ দিকে পেট জ্বলিয়াছিল, আহারীয় খুব সুন্দর রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। আজ অনেক দিনের পর ডাল ভাত খুব পেট ভরিয়া খাইলাম, এবং পরমান্ন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা খাইয়া মুখ বদ্‌লাইয়া লইলাম। অবিলম্বে অগ্নিপার্শ্বস্থিত আসনে শুইয়া পড়িলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম, বাপা জুনের স্থায় অমায়িক রাজা আছে কি না সন্দেহ। ইনি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, কোনও দেশের রাজা অন্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন নাই। আমি সম্পূর্ণ বিদেশী, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, পথের ফকীর; আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার রাজার উচ্চ ধর্ম্মভাবের পরিচয় ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি চণ্ডীতে পড়িয়াছি,—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—জগতের স্ত্রীরূপিণী আমি। আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক স্ত্রীজাতির হৃদয়ে সর্ব্বদা স্নেহরূপিণী জগদম্বা বাস করেন। বিশেষতঃ, রাজপত্নী ও রাজকন্যার দেবদুর্ল্লভ সৌজন্যে আমার সেই ভাব বদ্ধমূল হইয়া গেল। এইরূপ ও অন্যান্য নানা প্রকার চিন্তার জন্য আর নিদ্রা আসিল না।

প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই আসন হইতে উঠিয়া বসিলাম। বিষ্ণু সিংহ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, [illegible] এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখনই চা প্রস্তুত হইতে লাগিল, আহারও প্রস্তুত হইল। বিষ্ণু সিংহ বলিল,—"আপনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আহার করুন। এই স্থান হইতেই আমাদিগকে বিকট

চড়াই চড়িতে হইবে। ভিব্বতের আর কোথাও এরূপ বিকট চড়াই নাই। চড়াইটি দুই মাইল। এই দুই মাইল চড়িতেই যান বাহন, মানুষ গরু সকলেরই প্রাণান্ত হইবে।"

পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল, ইয়ংবেল আমাকে থুলিং মঠ পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিবে; বাহনের আর ভাবনা নাই। ইয়ংবেল সুসজ্জিত হইতে লাগিল। রন্ধন প্রস্তুত হইল। আহারাদি করিতে করিতে আটটা বাজিয়া গেল। আমি আহার করিয়া তাম্বুর বাহিরে আসিলাম। ইয়ংবেল ও বিষ্ণু সিংহ তাম্বুটি রাজবাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিল। খড়্গ সিংহ ও পূর্ণানন্দ আমার চামরটি সুসজ্জিত করিল ও চামরটিতে জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া দিল। বিষ্ণু সিংহ ও ইয়ংবেল আসিলে আমরা যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইয়াই দেখি, উচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতগুলি মাটীর। রাস্তার মাঝে অতি উচ্চ মৃত্তিকার স্তম্ভ রহিয়াছে। তাহার এ দিক ও দিক দিয়া আঁকা বাঁকা রূপে পথ চলিয়া গিয়াছে। আমি চামরের উপরে সোয়ার ছিলাম, আমার উঠিতে কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু সঙ্গীরা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিতেছে। আমার অগ্রে ভারবাহী চামর যাইতেছিল; সে আর উঠিতে পারিল না; রাস্তাতে বসিয়া পড়িল, এবং নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় বিষ্ণু সিংহ, খড়্গ সিংহ ও পূর্ণানন্দ বাহনটিকে ধরিয়া ফেলিল। এই সময়ে ইহারা যদি ভারবাহী চামরটিকে না ধরিত, তবে আমরা সকলেই তাহার চাপে নীচে পড়িয়া যাইতাম, কাহারও কোনও চিহ্ন থাকিত না। বিষ্ণু সিংহ ও ইয়ংবেল ভারবাহী চামরের পৃষ্ঠ হইতে অনেক বোঝা নিজের পৃষ্ঠে লইল। প্রায় ৪ ঘণ্টার পর আমরা এই দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া সমভূমিতে আসিলাম।

আর কোনও কষ্ট নাই, আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিতেছি। অনেক নীচে আসিয়া পড়িয়াছি। শীতের বড় উপদ্রব নাই। খুব রৌদ্র উঠিয়াছে। এখন চারি দিকে পর্ব্বত বড়ই সুন্দর। আজ অনেক দিন পরে সমভূমি পাইয়াছি। খুব দ্রুতবেগে চলিয়া অপরাহ্নে "কৈলাক" নামক আড্ডাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই কৈলাক বাপা জুনের গোলাবাড়ী। এখানে একখানি ঘর আছে। সেই ঘরে গোলাবাড়ীর অধ্যক্ষ থাকে, এবং বাপা জুনের অশ্বরক্ষক ও গোরক্ষক বাস করে। এতদ্ভিন্ন চারি পাঁচটি মৃত্তিকার ক্ষোদিত গুহা আছে; সেই গুহাতে পথিকেরা আসিয়া আশ্রয় লয়। এই

গোলাবাড়ীর নিম্নে একটি নদী। আমরা নদী পার হইয়া একটি গুহা আশ্রয় করিলাম। ঝাপা জুনের ভৃত্যেরা আসিয়া গুহাটি পরিষ্কার করিয়া দিল। আমরা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই স্থানে অনেক দিনের পর শ্যামলবর্ণ শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। যথেষ্ট যব ও মটর কলাই হইয়াছে; উপরের একটি ঝরণা হইতে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা ক্ষেতে জল আসিতেছে। দেখিয়া দেশ বলিয়া মনে হইল। অনেক দিন পরে শস্যক্ষেত্র-দর্শন ও ভ্রমণে বড় আনন্দ পাইলাম। অদ্যকার রাত্রি এই স্থানেই যাপন করিতে হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইলাম। অদ্য আর শতদ্রু পার হওয়া অসম্ভব; কারণ, এখানে শতদ্রুর পরিধি প্রায় তিন মাইল হইবে। বরফ গলিয়া শতদ্রু এখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শীতলতা ও স্রোতের জন্য শতদ্রুর জল স্পর্শ করা কষ্টকর, সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া শতদ্রুর দক্ষিণ তীরেই থাকিতে হইল।

এই স্থানের নাম "গুরুলা"। পথিকেরা প্রায় এই গুরুলাতে আসিয়া অবস্থিতি করে। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও আমাদিগের আহার হয় নাই। এখানে জল ও কাষ্ঠ বড় সুলভ। আমরা জলের নিকটে আড্ডা করিলাম। সত্বর রন্ধন প্রস্তুত হইল; আহারাদি কার্য্য সমাধা হইল। মনে করিয়াছিলাম, এই নদীতীরেই রাত্রিযাপন করিব, কিন্তু তাহা হইল না। অপরাহ্নে আকাশে খুব মেঘ দেখা দিল। আমরা বরফপাতের ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইলাম।

এই দিন 'গুরুলা'তে অনেকগুলি লোক; তাহাদের সঙ্গে ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও চামর আসিয়া এখানে জমা হইয়াছিল। তাহারাও ভয়ে শতদ্রু পার হইল না, এইখানেই রহিয়া গেল। ইহাদের আসিবার পূর্ব্বেই আমরা গুহা দখল করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাদের বরফপাতে একান্ত কষ্ট হইয়াছিল, এবং দশ বারটা ভেড়া ও ছাগল মারা পড়িয়াছিল। ইহার তিন দিন পূর্ব্ব হইতে এক জন নাগা সাধু আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। তিনি মানসসরোবর-দর্শনের জন্ত তিব্বতে প্রবেশ করেন, কিন্তু ভয়ে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমাদের সঙ্গে "থুলিং মঠ" হইয়া গঙ্গোত্রী যাইতেছেন। ইনি বড় নেশাখোর; গাঁজা, চরস ইঁহার একচেটে সম্পত্তি। আজ ইঁহার বড় স্ফূর্ত্তি; এক জন ভুটিয়ার নিকট কিছু চরস পাইয়াছেন। চরসের নেশায় বিভোর হইয়া আমাকে বলিলেন,—"এই জঙ্গলে অনেক বুটি

পাওয়া যায়; আমি এই বুটি পরীক্ষা করিয়া দেখিব। সেই বুটির রং সবুজ বর্ণ, ফল মহুরের ডালের অনুরূপ।" বাবাজী বুটি সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট আনিলেন। আমি বলিলাম যে, "এই বুটির গন্ধে আমার মাথা ঘুরিতেছে, তুমি খাইও না।" তিনি উত্তর করিলেন,—"আমি ত আর বাঙ্গালী সাধু নই যে, নেশাকে ভয় করিব; ইহা খাইয়া আমার খুব নেশা হইবে, আর আরামে দিনরাত্রি কাটিয়া যাইবে।" বাবাজী সেই জিনিস খাইয়া নদীতীরে গেলেন, দুই তিন ঘণ্টা আর তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে বিষ্ণু সিংহকে পাঠাইয়া জানিলাম, তিনি নদীতীরে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি ও পূর্ণানন্দ যাইয়া দেখি, বাবাজীর শ্বাস প্রশ্বাস আছে মাত্র; জীবনের আর কোনও চিহ্ন নাই। অবশেষে শতদ্রুর ঠাণ্ডা জল সেচন করিতে করিতে তাঁহার কথা বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার কথা না শুনিয়া আজ মরিয়াছিলাম; যাহা হউক, আর এমন কর্ম্ম করিব না।"

বাবাজীর আর চলিবার শক্তি নাই। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গুহার মধ্যে আনিয়া রাখিলাম। পর দিবস প্রাতে তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। অদ্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সকলে বলাবলি করিতেছে, "অদ্য বড় বিপদের দিন; শতদ্রু পার হইবার সময় কাহার ভাগ্যে কি আছে, বলা যায় না। তবে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমরা আর ভাবিয়া কি করিব?" এই বলিয়া ভৃত্যেরা চা প্রস্তুত করিতে গেল। ইয়ংবেল মাঠ হইতে চামর নিয়া আসিল। শীঘ্রই প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলাম। আজ আর বড় একটা আহার করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না; সকলেরই মনে শতদ্রু পার হইবার চিন্তা। ইয়ংবেল ভারবাহী চামরটিকে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল; আমি আমার চড়িবার চামরে আরোহণ করিলাম। আমার চামরের বন্ধনরজ্জু বিষ্ণু সিং ধরিল; খড়্গা সিং, নাগা বাবা ও পূর্ণানন্দ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অতি অল্প সময়েই শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইলাম। শতদ্রুর বেগ দেখিয়া আমাদের মনেও ভয় হইল। পুল নাই, নৌকা নাই, জল অতিশয় ঠাণ্ডা! এই ভীষণ নদী পার হইব কি করিয়া? আমি তীরে উপস্থিত হইয়া এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি, ইয়ংবেল ভারবাহী চামরটিকে লইয়া জলে নামিয়াছে। তাহার দেখাদেখি আমার চামর লইয়া বিষ্ণু সিং জলে নামিল। চামর দুইটি বীরের ন্যায় শতদ্রুর প্রখর স্রোত ভেদ করিয়া

ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বিষ্ণু সিং ও ইয়ংবেল এক একবার পদস্খলিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে; তাহার পরেই আবার চামরের বন্ধনরজ্জু ধরিয়া স্থিরপদে দণ্ডায়মান হইতেছে। এইরূপ প্রায় তিন ঘণ্টা চলিয়া আমরা শতক্রুর পর পারে উঠিলাম।

আমার সঙ্গীরাও আমার সঙ্গে আসিলেন, কিন্তু নাগা বাবা দুই তিন বার জলে ডুবিয়াছিলেন; পূর্ণানন্দ ও খড়্গা সিং তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আমরা শতক্রুর পারে উত্তীর্ণ হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। অদ্য রাস্তায় জলও নাই, কাষ্ঠও নাই; থুলিংমঠে না গেলে আর জল, কাষ্ঠ পাইব না। এখান হইতে থুলিংমঠ বার তের মাইল হইবে। বিষ্ণু সিং বলিল,—"এখানে জলও আছে, কাষ্ঠও আছে, আহারাদি করিয়া যাই।" ইয়ংবেল বলিল,—"তাহা হইলে অদ্য আর থুলিংমঠে পঁহুছিতে পারিব না; এখানে রাত্রিযাপনের কোনও প্রকার উপায় নাই। আর দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের বরফ গলিয়া শতক্রুর জল তীরভাগ আক্রমণ করিবে। তাহার পর, উপরে উঠিলেই বন্য চামরীর ভয় আছে; তাহারা অপরাহ্নে এই রাস্তায় শতক্রুর জল খাইতে আসে। বন্য চামরী যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই মারিবে। আমাদিগকে ত মারিবেই, চামর দুটিরও রক্ষা নাই।"

ইয়ংবেলের কথায় আমরা কিছু জল লইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। প্রথম কতকটা চড়াই উঠিলাম, তার পরই সমভূমি; আবার কতকটা চড়াই, আবার কতকটা সমভূমি। এইরূপে কত চড়াই কত সমভূমি অতিক্রম করিলাম, তাহার গণনা নাই। তাহার পর সমভূমি; এই সমভূমি থুলিংমঠের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই চড়াই ও সমভূমি দেখিয়া মনে হইল, এখানে একদিন সমুদ্র ছিল; সমুদ্রলহরীতে এই ভূমিকে বিষম করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সমভূমিতে উঠিয়াই প্রকাণ্ড ময়দান পাইলাম। এই ময়দানের মধ্যে দলে দলে বন্যঘোটক ভ্রমণ করিতেছে, আর আমাদের দেখিয়া এ দিকে ও দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এই মাঠ প্রকাণ্ড ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মত বোধ হইতে লাগিল। এই মাঠ পার হইয়াই রাস্তার বাম পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর। এই গহ্বরের মধ্যে উচ্চ উচ্চ মৃত্তিকাস্তম্ভ বাঁশঝাড়ের ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, এখানেও জল জমিয়াছিল, সমুদ্রজলে মৃত্তিকাময় পর্ব্বতকে ধৌত করিয়া সমুদ্রবীর্য্যেরমু

জয়নিশান রাখিয়া গিয়াছে। আমরা এই স্থান অতিক্রম করিয়াই এখন উৎরাই ধরিলাম।

উৎরাইর উভয় দিকেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃত্তিকার স্তম্ভ। এই বিশাল স্তম্ভগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, ইহা কোনও রাজভবনে প্রবেশ করিবার প্রকাণ্ড তোরণ। এই সব তোরণরাশি ভেদ করিয়া আমরা অনবরত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। পথ আর ফুরায় না। থুলিং মঠ দেখা যায় না। এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় থুলিং মঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্রমশঃ।

ডিটেক্‌টিভের স্ত্রীলাভ।

১

প্রথম দৃশ্য চোরবাগানের মাথায়। শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু চিন্তিত, এবং কিছু বিরক্ত। পুরাতন সুপক্ক গোঁফে তা দিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

বৈকুণ্ঠনাথের অনেক টাকা, এবং পরিবার অল্প। পুত্র ননীলাল, বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম,—দিব্য ছোক্‌রা, তরুণ গোঁফ, অরুণ-কান্তি। কন্যা সুমিত্রা অতি সুশ্রী মেয়ে, বয়স তের, বেথুন স্কুলে পড়ে।

বৈকুণ্ঠনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারী বি. এ পাশ করিয়াছে। ননীলাল কেবল মাত্র বি. এ. ক্লাসে উঠিয়াছে। বিহারী পিতৃমাতৃহীন। সংসারে কেবলমাত্র খুল্লতাত বৈকুণ্ঠনাথ সহায়। বিহারী ও ননীলাল হরিহর-আত্মা। বিহারীর ভরণপোষণ, লালনপালন, আজীবন বৈকুণ্ঠনাথই করিয়া আসিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সেকালের গৃহস্থ। ধনসঞ্চয় ছাড়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অন্য কোনও কল্পনা ছিল না। তিনি হরিনামের মালা দ্বারা সুদ জপ করিতেন, এবং কোষাকুশি দিয়া বিষয়কর্ম্মের চিন্তা করিতেন।

গৃহিণী অজীর্ণরোগকাতরা। কালীঘাটের পূজা লইয়াই ব্যস্ত।

সে দিন বৈকুণ্ঠনাথের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা বিহারীলালের বিবাহের প্রস্তাব।

পাত্রীর নাম ইন্দু। বিহারী এলাহাবাদে বেড়াইতে গিয়াছিল। ইন্দুর

ভ্রাতা তখন সপরিবারে তীর্থদর্শন উপলক্ষে প্রয়াগে ছিলেন। সেইখানেই উভয় পক্ষের পরিচয় হয়। বিহারী ইন্দুকে দেখিয়াছিল। ইন্দুর ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টেলিগ্রাফ আফিসের কেরাণী। বাটী মাণিকতলায়।

বিপিন তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া একবার ভাবিয়াছিল, বৈকুণ্ঠ বাবুর নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিবে। কিন্তু সাহস পায় নাই! বিপিন দরিদ্র। তাহার পিতা কিছু রাখিয়া যান নাই। কেবল বিধবা মাতার তিন হাজার টাকার গহনা ছিল, এবং নিজের সঞ্চিত দুই সহস্র টাকা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়াছিল। বিপিনের দুইটি কন্যা। তাহার পক্ষে বৈকুণ্ঠনাথের ঘরে ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাব বাতুলতা-মাত্র।

কথাটা ননীলাল জানিতে পারিল। কি মধুর কল্পনা! প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে প্রথম দর্শন! প্রণয়! এবং বিহারী দাদা! ননী চট্‌ করিয়া বিপিনের বাটীতে গেল। পাকে প্রকারে ইন্দুকে দেখিল। বিহারী দাদার উপযুক্ত বটে! কি সুন্দর মুখ! এবং কেমন শান্ত-সুশীলা, গৃহকর্ম্মরতা!

কিন্তু ননীলাল পিতাকে জানিত। বৈকুণ্ঠনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সাত হাজার টাকা না পাইলে বিহারীর বিবাহ দিবেন না। "বিহারীকে জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়াছি, এবং সে বি. এ পাশ করিয়াছে, শীঘ্রই উকীল হইবে। উভয় কারণে প্রতিপক্ষের সপ্ত সহস্র মুদ্রা দেয়। নচেৎ আমার কন্যার বিবাহে আমি টাকা কোথায় পাইব?" ইত্যাদি।

ননীলাল চুপি চুপি মাতাকে ধরিয়াছিল। গৃহিণী কখনও কর্ত্তাকে টাকা ছাড়িতে অনুরোধ করেন নাই। অদ্য করিয়াছিলেন। "মা কালীর যা ইচ্ছা!"

বৈকুণ্ঠনাথ চটিয়া আগুন। "আমি জানি, বিপিনের বিধবা মাতার দশ হাজার টাকার গহনা আছে। বিশেষতঃ বিপিনের মত ছেলে পাওয়া ভার। মনে করিয়া দেখ, এমন স্থলে কত টাকা দেওয়া উচিত।" (ঘোর চীৎকার।)

গৃহিণী তাড়া খাইয়া নির্জ্জন গৃহে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। "কি ঘোর অপমান! বিহারী ত আমার পেটের ছেলে নয়। তবে মায়া হয়, তাই বলিয়াছি। মা কালী বৃদ্ধ বয়সে এত লাঞ্ছনা করিলেন কেন?" (ক্রন্দন।)

তাই অদ্য বৈকুণ্ঠনাথ বিরক্ত ও চিন্তিত। অনেক ক্ষণের পর তিনি

ননীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার মাকে বল, আমি দুই হাজার টাকা ছাড়িয়া দিব।" এই বিরাট আত্মত্যাগের পর বৈকুণ্ঠনাথ বসিয়া পড়িলেন।

২

যথাসময়ে বিপিনচন্দ্র জানিতে পারিল যে, পাঁচ হাজার মুদ্রা ব্যতীত বিহারীর সহিত ইন্দুর বিবাহ অসম্ভব। ইন্দু বিপিনের অতিস্নেহের। পিতার আদরের স্মৃতি। বিধবা মাতার নয়নের তারা। বিপিনের স্ত্রীবিয়োগের পর ইন্দু রোগে শোকে বিপিনের একমাত্র ভরসা। ইন্দুর স্নেহের মূল্য নাই। তাই মাতা ও পুত্র পরামর্শ করিয়া, যাহা কিছু সংসারে সম্বল ছিল; দিতে সম্মত হইল।

বিহারী লুকাইয়া ননীকে বলিয়াছিল, "কোনও ভয় নাই। আমি রোজগার করিয়া টাকা শোধ করিয়া দিব।"

কিন্তু ননীলালের হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছিল। "বাবা কি নিষ্ঠুর! বৌকে কোন্ মুখে দেখিব? কি করিয়া তাহাকে বুঝাইব? আমরা যাহার ভাইকে সর্ব্বস্বান্ত করিব, তাহার কি শ্বশুর দেবরের উপর শ্রদ্ধা থাকিবে?" ননীলালের সুরম্য কল্পনাকাননে কুঠারাঘাত হইল। ননীলাল কলেজে না গিয়া বাটীতে লুকাইয়া রহিল। ঘরের বাতায়নপার্শ্বে গিয়া কাঁদিল।

তখন বেলা তিনটা। সুমিত্রা স্কুল হইতে আসিয়া বাগানের দিকে ফুল তুলিতে গিয়াছিল। হঠাৎ ভাইকে কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, এবং চুপি চুপি ননীলালের পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

সুমিত্রা স্তম্ভিত হইয়াছিল। কারণ, ননীলাল তাহার নিকট বীরাগ্রগণ্য দেবতাস্বরূপ! শৌর্য্যে, বীর্য্যে, দয়া দাক্ষিণ্যে, ননীর মত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল না। ননী, মাতার যাহা কিছু ছিল, তাঁহার নিকট হইতে ভুলাইয়া লইত, এবং দানে ধ্যানে খরচ করিত। ননীলালের চক্ষু ইতিপূর্ব্বে কখনও জলভারাক্রান্ত হয় নাই।

ননীলাল মিথ্যা কথা কহা বৃথা বিবেচনা করিয়া কহিল,—"বাবা অন্যায় করিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইতেছেন। বিপিন বড় গরীব। তাহার মার গহনা বেচিয়া ও যাহা সম্বল আছে—তাহা মিলাইয়া পাঁচ ছ' হাজার টাকা হইবে। তাহা না দিলে বিপিন দাদার বিবাহ হইবে না, এবং অমন ভাল বৌ ঘরে আসিবে না।"

সুমিত্রা বালিকাসুলভ কল্পনায় ভাবিল,—"পাঁচ হাজার টাকা! না জানি কত টাকা!

"কেন, বাবা অত টাকা লইবেন কেন?"

ননী। সেই ত কথা! তোমার বিবাহের জন্য।

সুমিত্রার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; ঘৃণায়, লজ্জায় ও ক্রোধে তাহার কপোল ও মুখমণ্ডল আরক্ত হইল।

অন্য কোনও বালিকা হইলে পলাইয়া যাইত। কিন্তু সুমিত্রা গেল না। সুমিত্রা বুদ্ধিমতী।

"দাদা, ওটা মিথ্যা কথা। বাবার অনেক টাকা আছে। তবে, বাবা টাকা ছাড়া কথা কন না। আমি বাবাকে বলিব যে, টাকা লইলে আমি বিবাহ করিব না।"

ননীলাল কি ভাবিতেছিল। ভগিনীর সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিল, সংসারে তাহার দুঃখে এক জন দুঃখী আছে।

"সুমী! তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় আছে। পরে সব বলিব। যাহাতে বৌ এ কথা না জানিতে পারে, এখন আমি তাহার উপায় করি।"

ননীলাল শীঘ্রগতি চাদর ও চটি লইয়া ট্র্যামকার্ ধরিতে গেল। সুমিত্রা বাতায়নপার্শ্বে সন্ধ্যানক্ষত্র গণিতে লাগিল। বিবাহ? কেনই বা লোকে বিবাহ করে? আর টাকা নহিলে বিবাহ হয় না কেন? গরীব লোকের ত টাকা নাই। তাহারা কি করিয়া বিবাহ করে? তাদের দিন চলে কিসে?

৩

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী শনিবার ইন্দুর বিবাহ। কত সাধের ইন্দু! বিপিন টাকার কথা ইন্দুকে জানিতে দেয় নাই। যদি বালিকার মনে কালিমা পড়ে! যদি ইন্দু এক দিনের জন্য দুঃখিনী হয়!

কিঞ্চিৎ সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। দানসামগ্রী, ঘড়ি ও ঘড়ির চেন, হীরার আংটী, এবং নগদ পাঁচ হাজার অর্থাৎ ৩৩৩ গিনি লইয়া কর্ত্তা যথাসময়ে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

নূতন বৌকে দেখিয়া গৃহিণীর ও সুমিত্রার সুখের সীমা রহিল না।

পরদিন প্রভাতে ৫১।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের দ্বিতলে সি. আই. ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে অতি উৎকৃষ্ট চা পান করিতেছিলেন। ৫১।১ নং বাটীর নিম্নতলে কেরাণী

বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। গত নিশাকালে বন্ধুর ভগিণীর বিবাহে, বরযাত্রিগণের অভ্যর্থনা ও ভোজনাদির ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইয়া ২নং বিপিনচন্দ্রের প্রায় রাত্রিজাগরণে ভোর হইয়া গিয়াছিল। অতএব তিন পেয়ালা চা পান করিয়া ডিটেক্‌টিভ্ বিপিন চক্ষু উন্মীলন করিলেন।

"দেখ সুধীর, বিবাহটা খুব নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে।"

বন্ধুবর সুধীর বলিলেন, "দিব্যি বর!"

বিপিন। এবং দিব্যি মেয়ে! তবে বরকর্ত্তা অতি জঘন্য! আমার মতে তাঁহার বাটীতে চুরি করা উচিত। যেখানে এরূপ দাবী দাওয়া, ডাকাতি, সেখানে চুরি করা ধর্ত্তব্য অপরাধ নহে।

সুধীর বলিল, "ছি! অমন কথা বলা উচিত নয়। মনে থাকে যেন তুমি সি. আই. ডির।"

বিপিন ঈষৎ হাস্য করিল। "আমি ঠাট্টা করিয়াছি। আমার মতে, বিবাহ করাটা এ দেশে অতি জঘন্য ব্যাপার! প্রথমতঃ, মনের মত স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না; এবং দ্বিতীয়তঃ, পাওয়া গেলেও টাকার ইতিহাস দাম্পত্য-জীবন বিকৃত করিয়া তুলে।"

বিপিনচন্দ্র পুলিস ডিপার্টমেণ্টে খ্যাতনামা যুবাপুরুষ। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কৌশলে, নির্ভীকতায় তাহার ন্যায় অন্য কেহ ছিল না। বিপিন অতিশয় গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। অনেকের বিপিনকে দেখিয়া "সাহেব" বলিয়া ভ্রম হইত।

বিপিনচন্দ্র আলস্য-সহকারে জৃম্ভন করিয়া নেক্‌টাই পরিধান করিতে গেল। এমন সময় ডাকঘর হইতে একটা পার্শ্বেল আসিয়া উপস্থিত।

পার্শ্বেল-বহিতে রসিদ দিয়া বিপিনচন্দ্র পার্শ্বেল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ডাকহরকরা চলিয়া গেল।

সুধীরচন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়াছিল। হঠাৎ পার্শ্বেলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"কোনও স্ত্রীলোকের হাতের লেখা।"

বিপিন হাসিয়া বলিল,—"বোধ হয় বুড়ীর পুরাতন জ্যাকেট্।" বুড়ী বিপিনের ভগিনী, হুগলীতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ভ্রাতাকে পার্শ্বেল পাঠাইয়া বিরক্ত করে।

কিন্তু তাহা নয়। হাতের লেখা বুড়ীর নহে। বিপিন কিছু আশ্চর্য্য হইয়া পার্শ্বেলের বাক্স ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

বাক্সের মধ্যে ৩৩৩ সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা একটি থলিয়ায় নিবদ্ধ, এবং তাহার মধ্যে একখানি পত্র।

"আপনার ভগিনীর বিবাহে নিঃসম্বল হইয়া সংসারে অমূল্য স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পুরস্কার নাই। আমাদিগের বিবেচনায় সেই টাকা প্রত্যর্পণ করা উচিত। সেই জন্য রাত্রিকালে আপনার স্বর্ণমুদ্রা চুরি করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম। এখন সাবধানে রক্ষা করিবেন। পরে যাহা হয় হইবে।—তস্কর।"

বিপিনচন্দ্র দুইবার স্বর্ণমুদ্রা দেখিলেন, দুইবার পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। সুধীরকে দেখাইলেন। সুধীর কিছু ভীত হইয়া পড়িল।

"পুলিস-কমিশনর সাহেবকে বলা উচিত।"

৪

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "কখনই না। প্রথমতঃ, পার্শেলটা ১নং বিপিনচন্দ্রের। ভ্রমক্রমে দ্বিতলের অধিবাসী ৫১।১নং বাটীর বিপিন-চন্দ্রের হস্তগত। আমি দিলেও, ১নং বিপিনচন্দ্র চোরামাল লইবে না। আমি নির্দোষ, তাহার সাক্ষী তুমি শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত—পুলিস-অফিসের হেড্ বাবু, এবং বিখ্যাত সচ্চরিত্র ভদ্রলোক।

দ্বিতীয়তঃ, আমি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার, এবং ডিটেক্‌টিভ মিষ্টার বিপিন-চন্দ্র; কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য। অতএব বন্ধুবর সুধীরচন্দ্রকে আপাততঃ চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়া আমি তদন্তে রত হইব।"

সুধীর। কাজটা বে-আইনী হইবে।

বিপিন। মধ্যে মধ্যে এরূপ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, গৃহকর্ত্তার অবস্থা অবগত হইতে চলিলাম। ক্রমশঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার্য্য।

উভয় বন্ধু এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকতলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুধীর বাটী চলিয়া গেল।

বিপিনচন্দ্র পথে অনেক ভাবিয়াছিল। "চুরিটা কিছু অদ্ভুত। চোর কাঁচা। ইহার মধ্যে নবীনা রমণী আছে। হয় ত বেকুফ, কিন্তু হাতের লেখাটা সুন্দর, কম্পিত হস্তের লিপি।" বিপিন অনেক কথা ভাবিল।

এ দিকে শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শয্যাশায়ী। প্রভাত-কালে তোড়া গিনি-শূন্য দেখিয়া তিনি বাক্‌শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে

চতুর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করিয়া এবং সকলকে গালি দিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার গৃহসংলগ্ন আম্রবৃক্ষের ডালের উপর দিয়া চোর আসিয়াছিল, এবং দ্বিতলের দ্বার খোলা পাইয়া নির্ব্বিবাদে সুবর্ণমুদ্রা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভৃত্যগণ তাহা বিশ্বাস করে নাই। এবং যথাক্রমে থানায় সংবাদ যাওয়াতে তাহারা পুলিস-সমাগম অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া তটস্থ হইয়া বসিয়া আছে।

বিপিনচন্দ্র পাড়াতে সংবাদ পাইয়া থানায় উপস্থিত। দারোগা মহাশয় সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—"বড় সাহেবের অনুমতিক্রমে ইহা সি. আই. ডিপার্টমেণ্টে আপনার হস্তে তদন্তের ভার ন্যস্ত হইয়াছে।"

বিপিনচন্দ্র পুনর্ব্বার বাসায় গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং পার্শ্বেলের আবরণ, পত্রাদি, ও স্বর্ণমুদ্রা সমেত থলিয়া ব্যাগের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

শয্যাশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ সাহেবের মত একটা লোক দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। বিপিন বলিল, "আপনার চুরি সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিতে আসিয়াছি। আমি ডিটেক্‌টিভ মাত্র, পুলিসের হাঙ্গামার ভয় আপাততঃ কিছুই নাই। কেবল আপনার গৃহের বাহিরে ও বাটীর মধ্যে একবার দেখিয়া এবং আপনার পরিবারস্থ লোকদিগের সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া, কি প্রকারে চুরি হইয়াছিল, তাহার একটা আভাস পাইতে চাহি। আমাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। বোধ হয়, আমার পিতাকে জানিতেন। হুগলীর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।"

বৈকুণ্ঠ বাবু। কি আশ্চর্য্য! তুমি ঠাকুরদাসের পুত্র! সে যে আমার বাল্যকালের প্রিয়তম বন্ধু—ও গো!—(বাটীর মধ্যে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া)

গৃহিণী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু বলিলেন, "কোনও লজ্জা নাই, ইনি আমাদের ঠাকুরদাসের ছেলে, নহিলে এত ফর্সা হইবে কেন?"

বিপিনচন্দ্র উভয়কে নমস্কার করিলেন।

কর্ত্তা। তুমি কি দারোগা?

বিপিন। ইনস্পেক্টর।

কর্ত্তা। মাইনে কত?

বিপিন। আপাততঃ দুই শত টাকা।

কর্ত্তা। তা মন্দ কি? আর আমি জানি, তোমাদের ত টাকার অভাব নাই। তবে এখন কি করিতে হইবে?

বিপিন। কেবল আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারীকে আমি জানি, এবং বিহারীর স্ত্রী ও তাহার ভ্রাতা, আমরা একই বাটীতে থাকি। ইন্দু আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিত।

কর্ত্তা। তোমার বিবাহ হয় নাই?

বিপিন। (সলজ্জে) না।—আমি এখন বাটীর মধ্যে যাইতে চাহি।

৫

একটা তদন্ত হইবে শুনিয়া ভৃত্যগণ রন্ধনশালায়, এবং সুমিত্রা নিজের গৃহে লুকাইল। ননীলাল ও বিহারীর সহিত নবাগত বিপিনচন্দ্র কথোপকথনে রত হইলেন।

বিপিন। আমার বেশ বিশ্বাস যে, আম্রবৃক্ষের উপর দিয়াই চোর আসিয়াছিল। ননীলাল বাবুর মত কি?

ননীলাল। ঠিক তাই। আর কোনও রাস্তা নাই।

বিপিনচন্দ্র বিহারী ও ননীলালের সহিত বাটীর ইতস্ততঃ পরিদর্শনে রত হইলেন। উদ্যান, রন্ধনশালা, গো-শালা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া ও ভৃত্যদিগকে জেরা করিয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইলেন।

ইন্দু ও সুমিত্রা বাতায়নপথে ডিটেক্‌টিভের কার্য্যকলাপ কৌতুহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সুমিত্রা। দিদি, উনি কি বাঙ্গালী?

ইন্দু। (হাসিয়া) উনি যে আমাদের বিপিন দাদা। আমরা এক বাসায় থাকি। এই বয়সে দশটা ডাকাতি ধরিয়াছেন। পুলিসের সাহেব ওঁর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করেন না। যেমন সাহসী, তেমনই সৎস্বভাব; এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

সুমিত্রা ভাবিল, "দশটা" ডাকাতি! কি ভয়ানক!

ইত্যবসরে বিপিনচন্দ্র বাতায়নের সম্মুখে উদ্যানপরিদর্শনকালে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া ইন্দুকে দেখিতে পাইলেন ও ঈষৎ হাসিলেন।

"ভাল আছ ত?"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া সলজ্জে কহিল, "আছি।"

সুমিত্রা সরিয়া গেল।

বিপিনচন্দ্র বিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটি বালিকা ইন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, উনি কে?"

বিহারী। আমার ভগিনী সুমিত্রা, ননীর ছোট, বেথুন স্কুলে পড়ে। উহার বিবাহের সন্ধানে আছি।

বিপিন। বেশ মেয়েটি! আমি শীঘ্রই বিবাহের সন্ধান করিয়া দিতেছি। বাটীতে অন্য কোনও স্ত্রীলোক নাই?

ননী। না, কেবল মা।

বিপিন। বেশ, এখন একবার বাটীর মধ্যে যাওয়া দরকার।

বিপিনচন্দ্র বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়াই ইন্দুর নিকট গেল। গৃহিণী ইত্যবসরে বিলক্ষণ রকম জলখাবার যোগাড় করিয়াছিলেন। শ্রান্ত বিপিনের নিকট তাহা সুধাময় বোধ হইল।

বিপিন ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রা আমাকে ভয় করে?"

ইন্দু। তা, তুমিই জিজ্ঞাসা কর না, লজ্জা কিসের?

বিপিন। সুমিত্রার নিকট দুই একটা কথা জানা দরকার। আমি শুনিলাম, সে রাত্রে কর্ত্তা সুমিত্রার নিকট চাবি রাখিয়া বারান্দায় শুইয়াছিলেন। যে আলমারীতে মোহর ছিল, তাহার তালা ভাঙ্গা নাই, এবং অনেক টাকা সেই আলমারীতে থাকা সত্বেও কেবল 'তোমাদের' মোহর চুরি যাওয়া আশ্চর্য্য নহে কি?"

ইন্দু মোহরের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের' মোহর কি বিপিন দাদা?"

বিপিন চট্ করিয়া বুঝিলেন যে, তাহার ভ্রাতৃদত্ত পাঁচ সহস্র টাক যৌতুকের কথা ইন্দুকে বলা হয় নাই।

বিপিন বলিল, "সবই ত তোমাদের, তুমি কি এখন এ বাটীর পরিবার নও?"

ইন্দু উঠিয়া সুমিত্রাকে ডাকিতে গেল।

বিপিনচন্দ্র হঠাৎ ইন্দুকে বাধা দিয়া বলিলেন, "একটা কথা, আমি এখন এজেহার লইতে চাহি না, কিংবা যদিও লই, তবে তাহা প্রকাশ করিতে চাহি না। তোমার ঠাকুরঝির সহিত আমার এক জন বন্ধুর বিবাহের

প্রস্তাব হইয়াছে। আমি তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিব, এবং হাতের লেখা প্রভৃতি পরীক্ষা করিব। ইহাই আমার উদ্দেশ্য। বিবাহের কার্য্য ও তদন্তের কার্য্য এক সঙ্গে হইয়া যাওয়াই ভাল। তুমি কি বল?”

ইন্দু কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিল, “ঠিক।”

৬

সুমিত্রা নিজের ঘরে বসিয়া আছে। অনেক কথা ভাবিতেছে। সুমিত্রা অতিশয় ভয় পাইয়াছিল। যে দশটা ডাকাতি ধরিয়াছে, সে নিশ্চয় চুরির কিনরা করিবে। তাহা হইলে ননী দাদার উপায়? সুমিত্রা বালিকা। দাদার কথা শুনিয়া আল্‌মারীর চাবি দিয়াছিল। দাদার অনুরোধে পত্র লিখিয়াছিল। কি জানি, যদি কোনও ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে?

কিন্তু ইন্দু আসিয়া যখন বলিল যে, বিপিন বাবুর মতে আম্রবৃক্ষ হইতেই চোর আসিয়া চুরি করিয়াছে, তখন সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

ইত্যবসরে গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, “সুমী, বিপিন বাবু তোর একটা বিবাহের যোগাড় করিতেছেন, তোকে দেখিতে চাহেন। কর্ত্তার ইচ্ছা যে, আজই দেখুন। তোর চুল বাঁধিয়া দি।”

বিপিনচন্দ্র ইত্যবসরে হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কোনও দরকার নাই, আপনি একটু যান, ইন্দু তুমি থাক।” গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

সুমিত্রা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বিপিনচন্দ্র একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, “কোনও ভয় নাই। আমি বেশী বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ কালকার লোক হাতের লেখা দেখিতে চায়! আমার বন্ধু, যিনি বিবাহ-অভিলাষী, তাঁহার হাতের লেখার উপরই টান বেশী। এখন, বক্তব্য এই যে, আম্র বৃক্ষের তলায় তোমার একটু হাতের লেখা পাইয়াছি।”

ইন্দু। (হাসিয়া) তাই না কি? কোন আম্রবৃক্ষ?

বিপিন। যে আম্রবৃক্ষের ডাল দিয়া চোর আসিয়াছিল। ডালটা এত সরু যে, নিতান্ত ক্ষুদ্র চোর ভিন্ন তাহা বাহিয়া আসা অসম্ভব। তাহারই নীচে একখণ্ড কাগজ পাইয়াছি। সেটা ঠিক তোমার ঘরের জানালার নীচে। কাগজখানা আর কিছুই নহে। একটা ঠিকানা,—‘বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৫১।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট’। কিন্তু লেখাটা সুন্দর! লেখাটা একবার নহে, দুইবার নহে, অনেকবার। নামটা আমার; তাই আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিত। (ইন্দুর প্রতি) লেখাটার সঙ্গে তোমার ঠাকুরঝির

বহির মলাটের লেখা মিলিতেছে। কালিও একই। তবে কালিটা নীলবর্ণ। নীল কাগজের উপর প্রায় মিশাইয়া গিয়াছে। লেখাটা আমার বড় পছন্দ হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "তবে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি এক কথায়। গত কল্য যখন ট্রামওয়ে হইতে নামি, তখন একটা পার্শেলের ছেঁড়া কাগজ আমাদের বাসার সম্মুখে পড়িয়াছিল, সেটাও ইহারই নকল। সে কথা যাক্, এখন আর একটা জিনিস দেখাইব।"

বিপিনচন্দ্র পকেট হইতে একটি রেশমের থলিয়া বাহির করিলেন। "এমন সুন্দর থলিয়া আমি দেখি নাই, অন্ততঃ বাজারে বিক্রয় হয় না"—

ইন্দু। কি আশ্চর্য্য! ওটা যে ঠাকুরঝির বোনা। আমার বালিশের নীচে ছিল।

বিপিনচন্দ্র। তাহা হইলে চোর তোমাদের ঘরে এসেছিল। কারণ, চোরের যখন মতলব কেবল ৩৩৩ গিনি লওয়া, তখন সকল বাড়ী উট্‌কাইয়া তাহার উপযুক্ত থলিয়া সংগ্রহ করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সে কথা যাক। উনি (সুমিত্রাকে দেখাইয়া) যে অতি সুন্দর থলিয়া বুনিতে পারেন, তাহাও ঠিক।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। হৃদয় অতিশয় কম্পিত হইতেছিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে! উনি প্রায় সব জানিতে পারিয়াছেন। সুমিত্রা অতি কাতরদৃষ্টিতে বিপিনচন্দ্রের দিকে চাহিল। বিপিন দেখিল, চক্ষুর দৃষ্টি অতি সুন্দর।

কিন্তু আর রক্ষা নাই! বিপিনচন্দ্র চট্ করিয়া ঘরের মধ্যে জিনিসগুলি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিল। একটা হাতুড়ি, গোটা কতক পেরেক, বাদামী সুতা, গঁদের আঠা প্রভৃতি বাহির করিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা হইতেছে,—একটা পার্শেল তৈয়ারি করি।"

সুমিত্রা আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চাহিল। বিপিন ধীরভাবে বলিল, "কোনও ভয় নাই।"

ইন্দু অতিশয় কৌতূহলপরবশ হইয়া সুমিত্রাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসাইল। বিপিন ব্যাগ হইতে পার্শেলের ভগ্ন কাষ্ঠ ও আবরণবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পুরাতন পার্শেলটি নূতন করিলেন, এবং তাহার উপর সুমিত্রার স্বহস্ত-লিখিত 'বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' সাঁটিয়া দিলেন।

বিপিনচন্দ্র বলিলেন, "ইহার মধ্যে কেবল গিনি নাই।" এই বলিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সুমিত্রার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। ইন্দু ভয় পাইয়া বলিল, "সুমী, ছোট-ঠাকুরকে ডাকিব ?"

সুমিত্রা অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "না ; বিপিন বাবু এক জন দস্যি, কখনও দাদাকে ডাকিও না। মারিয়া ফেলিবে।"

ডিটেক্‌টিভ বিপিনচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া কর্ত্তার নিকট পঁহুছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "বাবা ! খবর কি ?"

বিপিনচন্দ্র। আপনার চোরা মালের কিনারা হইয়াছে।

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন, এবং আহ্লাদসহকারে বলিলেন, "কোথায় ?"

বিপিন। এই আম্রবৃক্ষের নিকটেই। চোর তাড়াতাড়িতে গিনির তোড়া বাগানে ফেলিয়া গিয়াছিল।

কর্ত্তা। বাবা ! তোমার খুব বাহাদুরী। এখন ইহার পুরস্কার ?

বিপিন। পুরস্কারের কথা বিহারীলালকে বলিয়া যাইতেছি।

বিহারী পুরস্কার সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিল, যথাসময়ে তাহা কর্ত্তাকে নিবেদন করিল,—"বিপিন সুমিত্রাকে বিবাহ করিতে চাহে। সুমিত্রারও মত আছে। বিপিন টাকা লইবে না, এবং যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নং ১ বিপিনচন্দ্র অর্থাৎ বিহারীর শ্যালককে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

ননীলাল বলিল, "ও তুখোড় জাঁহাবাজ্ লোক। সুমীকে ভয় দেখাইয়া রাজি করিয়াছে।" সুমিত্রা ভাবিয়া দেখিল, ঠিক তাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "বিবাহ হইলেও আমি উঁহার সম্মুখে মুখ দেখাইব না।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শাদ্-উল্লা খান্।

মোগল রাজত্বের ইতিহাসপাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, সম্রাট্ শাহ-জাহানের অধিকারকালে মোগল-রাজকোষের অবস্থা অতি স্বচ্ছল ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালের তুলনায় শাহজাহানের রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহাদি অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ-

বিগ্রহাদি সেরূপ প্রবল ছিল না বলিয়া রাজকোষে যথেষ্টপরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। আর সেই বিপুল বিত্ত আগ্রা দুর্গের পুন-র্নির্ম্মাণ, তাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববিশ্রুত ময়ূর-সিংহাসনের স্বপ্নময় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রচুরপরিমাণে ব্যয়িত হয়।*

শাহজাহানের সময়ে রাজকোষের এই স্বচ্ছল অবস্থার মূল কারণ,—উজীর শাদ্-উল্লা খান্। বর্ত্তমান যুগে আমরা ভারত গবর্মেণ্টের রত্নস্বরূপ যে সমস্ত রাজস্বমন্ত্রীর নাম শুনিয়াছি, শাদ্-উল্লা খান্ তাঁহাদের অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন ছিলেন না। শাদ্-উল্লা কেবল যে রাজস্ব-বিভাগ লইয়াই ছিলেন, এরূপ নহে। সকল বিভাগেই তিনি দিল্লীশ্বরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। কি যুদ্ধ-বিগ্রহ, কি রাজস্ব-বন্দোবস্ত, কি কর্ম্মচারীর নিয়োগ—সকল বিষয়েই শাহজাহান শাদ্-উল্লা খাঁর পরামর্শ না লইয়া কাজ করিতেন না।

এই মন্ত্রিপ্রবর শাদ্-উল্লার ঘটনাময় জীবনের কোনও ইতিহাসই নাই। অনেকেই ইঁহার জীবনের কথা দূরে থাক, নাম পর্য্যন্ত জানেন না। শাহ-জাহান-নামায় শাদ্-উল্লা জুম্‌লাট-উল্-মুলুক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শাহজাহানও ইঁহার কৃতিত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নানা স্থান হইতে সারসংগ্রহ করিয়া "সাহিত্যে"র পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর শাদ্-উল্লা খাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শাদ্-উল্লা খাঁ অতি দরিদ্রের সন্তান। যিনি এক দিন সেই সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ম-মাস ও তারিখ সম্বন্ধে কোনও সঠিক্ বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার সম-সাময়িক ইতিহাসলেখকগণ বলেন,—১০০৮ হিজিরাতে পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝাঙ্গ বিভাগের চিনিয়াট নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শাদ্-উল্লা খাঁ অতি ভাগ্যহীন। যে দিন তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিলেন, সেই দিনই তাঁহার পিতা লোকান্ত-রিত হয়েন। ইহা অপেক্ষা মানবজীবনে শোচনীয় দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের হিন্দু-জ্যোতিষমতে নিশ্চয়ই শাদ্-উল্লা খাঁ গণ্ডযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর কাল মাতৃক্রোড়ে অতিকষ্টে পালিত হইয়া, শাদ্-উল্লা সেই শৈশবেই মাতৃহীন হয়েন। এই সময়ে তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হয়।

সাধারণের বদান্যতায় তাঁহার বাল্যজীবন পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এই দুর্ভাগ্য শিশুকে নিয়তির কঠোর পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রতিবাসীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "মহল্লাওয়ালা"রা (প্রতিবাসীরা) চাঁদা করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্নবস্ত্র, বিদ্যা, সবই পরের দয়ার উপর নির্ভর করিত।

বালক শাদ্‌-উল্লা অতিশয় মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত মোল্লাদের নিকট তিনি আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। অল্প দিনের মধ্যেই, বাল্যাবস্থাতেই, সমগ্র কোরাণ-শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল। কৈশোরের প্রথম অবস্থায় শাদ্‌-উল্লা খান্‌ এক জন নামজাদা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। নানা স্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে আসিল। তাহাদের নিকট যে বৃত্তি আদায় হইত, তাহাতেই তাঁহার সংসার চলিতে লাগিল। নিয়তির পীড়ন ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া গেল।

এই সময়ে সুফী খোজামোল্লা নামক এক জন ভারত-বিশ্রুত মুসলমান পণ্ডিত চিনিয়াটে আসিয়া বাস করেন। তদানীন্তন মুসলমান-সমাজে ইনি এক জন গণনীয় মনীষী ছিলেন। শাদ্‌-উল্লা খাঁ এই সুফী মোল্লার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সমগ্র মুসলমান-শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিলেন।

সম্রাট্‌ শাহজাহান এই সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য লাহোরের রাজপ্রাসাদে আসেন। ঘটনাক্রমে যুবক শাদ্‌-উল্লা খাঁর পাণ্ডিত্যের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। সম্রাট্‌ শাদ্‌-উল্লাকে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহার সহিত কথোপকথনে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বচর করিয়া লন, এবং প্রত্যাগমনসময়ে তাঁহার আগ্রায় যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্‌ করিয়া দেন।

এই সময় হইতে ভাগ্যবিতাড়িত, সহায়সম্পত্তিহীন শাদ্‌-উল্লা খাঁর ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। কে জানিত, এই শাদ্‌-উল্লা খাঁ এক দিন মোগলসম্রাটের শ্রেষ্ঠ রাজমন্ত্রীর পদে আসীন হইবেন? সমগ্র হিন্দুস্থান তাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইবে? ১০৫০ হিজিরাতে রোমজানের ১০ তারিখে শাহজাহান তাঁহাকে দিল্লীর রাজসরকারের কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে রাজসরকারে ভাগ্যোন্নতি করিবার প্রধান পথ ছিল বাহুবল। প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা হইলেই লোকে অতি সহজে সম্রাটের দরবারে উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু শাদ্‌-উল্লার

এ সব কিছুই ছিল না। সম্রাট শাহজাহান গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য অনেক শূরবীর আছে, কিন্তু সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত ও উন্নতিবিধানের জন্য এক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রীর একান্ত অভাব। তিনি শাদ্‌-উল্লাকে রাজস্ব-বিভাগেই নিযুক্ত করিলেন। পাঁচ বৎসর কাল রাজস্বসম্বন্ধীয় নানা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ১০৫৫ হিজিরার ২৫ রজবে তিনি বাদশাহ কর্ত্তৃক বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মকুশলতাবলে তিনি মোগল-সম্রাটের অতীব বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে ইস্‌লাম খাঁ নামক এক জন প্রবীণ রাজকর্ম্মচারী ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শাহজাহানের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে না সরাইলে শাদ্‌-উল্লাকে প্রধান উজীরের পদ দেওয়া অসম্ভব। এই জন্য বাদশাহ একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ইস্‌লাম খাঁকে বলিলেন,—"আমার সভাসদ্‌গণের মধ্যে এমন এক জন লোকের নাম নির্দ্দেশ কর, যে ব্যক্তি দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার উপযুক্ত। বোধ হয়, তুমি শুনিয়াছ—দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা খাঁ দুরাম খাঁ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমি এমন এক জন লোক চাই যে, যিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন।" ইস্‌লাম খাঁ করযোড়ে বলিলেন, "জাঁহাপনা, দাক্ষিণাত্যের ন্যায় বিস্তৃত বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে, এমন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি এ রাজসভায় অত্যন্ত বিরল। সম্রাটের অনুমতি পাইলে এ দাসই দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।" বাদশাহ জানিতেন, ইস্‌লাম খাঁ এইরূপ উত্তরই দিবেন। তিনি বিনা আপত্তিতে ইস্‌লাম খাঁর প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ রাজধানী ত্যাগ করিলে, বাদশাহ তাঁহার স্থলে শাদ্‌-উল্লা খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

যে শাসনকালে প্রজারা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি ভোগ করে, রাজ্যমধ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি থাকে না, প্রজাপ্রদত্ত করে রাজকোষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই রাজত্বকাল যদি সুশাসনের পরিচায়ক হয় তাহা হইলে শাদ্‌-উল্লা খাঁর আমলে সমগ্র হিন্দুস্থান সেই সুখময় অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল। রাজস্ব সম্বন্ধে নানাবিধ নূতন বিধানের প্রণয়ন ও দেশমধ্যে দস্যু তস্করাদির উপদ্রব-নিবারণের জন্য নানাবিধ কঠোর নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া

মোগল-রাজত্বের বিধানানুসারে প্রজাগণ স্থানীয় ও বিভাগীয় রাজকোষে সাক্ষাৎভাবে খাজনাপত্র দাখিল করিতে পারিত। অনেক জমীদার ও তালুকদার, যাঁহারা দিল্লীতে সরাসর খাজনা পাঠাইতে পারিতেন না, কিংবা আগ্রা ও দিল্লীর রাজসভায় যাঁহাদের প্রতিনিধি বা উকীল ছিল না,— তাঁহারাও স্থানীয় সুবেদার ও ফৌজদারের নিকট রাজস্ব জমা দিতেন। কিন্তু এই সকল স্থানীয় কর্ম্মচারীরা উৎকোচ না পাইলে রাজস্ব যথাসময়ে রাজধানীতে চালান দিত না, কিংবা নষ্টামি করিয়া খাজনা বাকী করিয়া দিয়া জমীদারের অনিষ্ট করিত। শাদ্-উল্লা খাঁ এ সম্বন্ধে নানাবিধ হিতকর ব্যবস্থা করিয়া স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের উৎকোচ-গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। প্রজা ও জমীদারবর্গ এ জন্য তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। অনেক সময়ে জমীদার, তালুকদার ও পত্তনীদারগণ খাজনা বাড়াইবার জন্য হয় ত কোনও গরীব প্রজার জোত বরখাস্ত করিয়া তাহার প্রদত্ত জমা অপেক্ষা উচ্চ হারে অপরকে তাহার ভোগদখলী জমীগুলি বিলি করিতেন। ইহাতে গরীব প্রজা সহসা জোতস্বত্ব হারাইয়া নাতোয়ান্ হইয়া পড়িত। তাহাদের আর জমীর উপর ততটা মায়া থাকিত না। তাহারা জমীর উন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টাও করিত না। শাদ্-উল্লা খাঁ গরীব প্রজার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া এক রাজাদেশ প্রচার করেন যে, বিশেষ কারণ বিনা কোনও জমীদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা প্রজার জোত উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। মোটের উপর তিনি গরীব প্রজার মা বাপ, অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের যম ও জমীদারদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বন্দোবস্তে অনেক প্রজা তাহাদের পূর্ব্বদখলী জমীসমূহ পুনরায় ভোগ দখল করিতে থাকে।

শাদ্-উল্লা খাঁ বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতিশাস্ত্রে সুদক্ষ না থাকিলেও, তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত ব্যাপারই নখ-দর্পণে রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে সমগ্র মোগল রাজ্যের-রাজস্ব ১৭ কোটী মুদ্রা হইতে ২৩ কোটীতে উঠিয়াছিল। মোগল বাদশাহ দিগের খাস সম্পত্তিগুলির আয়ও এই সময়ে প্রায় ছয় গুণ বাড়িয়াছিল।

মোগল-শাসনকালে আর একটি সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। সমগ্র হিন্দুস্থানের নানা বিভাগে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ভার বাদশাহগণ বরাবরই

শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিভাগে তাঁহারাই সর্ব্বশক্তিময় ও প্রজার দণ্ডমণ্ডের বিধাতা ছিলেন। এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্র বাদশাহগণ উৎকোচগ্রহণ, অত্যাচার, প্রজাপীড়ন, সুন্দরী রমণীর সতীত্বনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন, এবং সে সমস্ত অত্যাচারের সংবাদ কখনও সম্রাটের সিংহাসনতলে পঁহুছিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা আবার অনেক সময় রাজ্যের প্রচলিত মাশুল প্রভৃতি ব্যতীত আরও নূতনবিধ করের প্রবর্ত্তন করিতেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ অত্যাচার-সঞ্চিত সমস্ত অর্থই তাঁহাদের নিজের বিলাসভোগে ব্যয়িত হইত।

শাদ্-উল্লা খাঁ যখন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, তখন এরূপ অনেক অত্যাচারের কাহিনী নিত্যই শুনিতে পাইতেন। মোগল-সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি এই অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের প্রজার প্রতি অযথা অত্যাচার-দমনের পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। বাদশাহকে বলিয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশেই মোগল শাসনকর্ত্তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কতকগুলি গুপ্ত-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই সকল প্রতিনিধি উচ্চবংশসম্ভূত, সচ্চরিত্র, সৎসাহসী ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইত। এমন চরিত্রবান্ লোক এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, যাঁহাদের উপর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা কোনরূপ প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না। ইঁহারা প্রতিদিন এই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কৃত কর্ম্ম আরজীরূপে লিখিয়া বাদশাহের দরবারে পাঠাইতেন, এবং দিল্লীশ্বর নিজে সেই সকল আরজী পাঠ করিয়া তাহার উপর হুকুম লিখিয়া দিতেন।

একবার সুরাট বিভাগের কোনও শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া জনৈক স্থানীয় গুপ্ত-প্রতিনিধি সম্রাটের সকাশে এক আরজী পেশ করেন। আরজীতে লিখিত ছিল,—"এই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আমদানী রপ্তানীর উপর নূতন শুল্ক বসাইয়া উপকূলবাসী প্রজাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ আদায় করিতেছেন। এই অন্যায় উপায়ে সংগৃহীত অর্থের এক কপর্দ্দকও দিল্লীর রাজকোষে প্রেরিত হয় না। শাসনকর্ত্তার বিলাস-ব্যসনেই তাহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের উপর নানাবিধ নূতন আবওয়াব জারি করিয়া অযথা অত্যাচার করিতেছেন।"

এই আরজী সম্রাট্ শাহজাহানের হস্তগত হইবামাত্র তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই আদেশ হইল,—"মোগল-শাসনের কলঙ্কস্বরূপ এই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করা হউক, এবং তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হউক।" সম্রাটের এই আদেশ পঁহুছিবামাত্র স্থানীয় ফৌজদার সেই শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

সেই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা সম্রাটের দরবারে আনীত হইল। বাদশাহ নানাবিধ প্রশ্ন দ্বারা বুঝিলেন—লোকটা সত্যই ঘোর অত্যাচারী। দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া সে মোগল সাম্রাজ্যের সুশাসনে কলঙ্কের অরোপ করিয়াছে। প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু এই শাস্তি এমন ভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোনও শাসনকর্ত্তা এরূপ যথেচ্ছাচারী না হইতে পারে। সম্রাট্ আদেশ করিলেন,—"ক্ষুধিত বিষধর সর্প তাহার জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হউক। সর্প-দষ্ট হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে সে রাজদণ্ডের প্রখরতা বুঝিতে পারিবে।"

এই হতভাগ্য বন্দীর আত্মীয় স্বজন যাহারা সেই রাজসভায় উপস্থিত ছিল, সকলেই এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। এই হতভাগ্যকে ভীষণ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাদশাহকে অনেক স্তুতি মিনতি করিল। এমন কি, রাজবংশধরেরাও ইহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া দণ্ড-লাঘবের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

বন্দী কারাগারে প্রেরিত হইল। রজনী প্রভাত হইলেই তাহার জীবন যাইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্দীর কয়েক জন আত্মীয় উজীর শাদ্-উল্লা খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। এই হতভাগ্য শাসনকর্ত্তার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া শাদ্-উল্লা খাঁর হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি সেই রাত্রেই একখানি আরজী লিখিয়া রঘুনাথ রাও নামক এক হিন্দু মুন্সীকে দিয়া তাহা সম্রাট সকাশে পেশ করিলেন। আরজীতে লেখা ছিল,—"জাঁহাপনা! আর্ত্তের রক্ষক! দীনের আশ্রয়! আমি এ অপরাধীকে মার্জ্জনা করিতে প্রার্থনা করিতেছি না। তবে আমার প্রার্থনা, এই লোকটাকে আরও সপ্তাহকাল বাঁচিতে দেওয়া হউক। ইতিমধ্যে উহার অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাণ রাজসরকারের হস্তগত হইতে পারে।" শাদ্-উল্লা খাঁর অনুরোধেই বাদশাহ আপাততঃ সেই বন্দীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিতে আদেশ করেন।

ইতিমধ্যে শাদ্-উল্লা খাঁ তাহার অনুকূলে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে পেশ করেন। তাহার ফলে সেই হতভাগ্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়। কিন্তু তাহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হয়।

যাহাতে সম্রাটের প্রজাগণ ন্যায়-বিচার প্রাপ্ত হয়, শাদ্-উল্লা খাঁ তাহার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারই বিধানানুসারে অতি দরিদ্র প্রজাও সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজের অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারিত। এই জন্য রাজ্যমধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতা কমিয়া যায় এবং সকল প্রজাই বাদশাহ ও তাঁহার উজীরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকে।

এক দিন সম্রাট শাহজাহান ছদ্মবেশে রাজপথে ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। সম্রাট শুনিলেন,—পথিপ্রান্তে এক ছিন্নকন্থাধারী ভিক্ষুক বলিতেছে,—"আল্লাকে ধন্যবাদ যে, আমরা এরূপ করুণহৃদয় বাদশা ও ন্যায়বান উজীর পাইয়াছি। সম্রাটও খোদাকে ভয় করিয়া চলেন, এবং রাজ্যের প্রধান উজীর শাদ্-উল্লা খাঁও ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান।" সম্রাট পথিমধ্যস্থ এক হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্রের মুখে এইরূপ শাসন-সুখ্যাতি শুনিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং তখনই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুক্তকরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

কেবল যে রাজস্ব বিভাগে কর্তৃত্ব করিয়াই শাদ্-উল্লা খাঁ তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। যুদ্ধকার্য্যেও তিনি যথেষ্ট সাহস, শক্তি ও প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। কান্দাহার অভিযানে তিনিই সেনা-নায়কতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত তুষারপাতের জন্য তিনি সেই অভিযানে আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১০৬৪ হিজিরায় বাল্‌খ ও বাদাক্‌শান প্রদেশে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শাহজাদা মুরাদ সেনাপতিরূপে সীমান্তপ্রদেশে প্রেরিত হন। কিন্তু অত্যধিক তুষারপাত, পথের কষ্ট প্রভৃতি কারণে বিলাসী মুরাদ, সেনাপতিত্বে ইস্তফা দিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। শাহজাহান শাদ্-উল্লার শক্তি-পরীক্ষার জন্য তাঁহাকেই রাজকুমার মুরাদের স্থানে এই অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য, শাদ্-উল্লা খাঁ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সেই বিদ্রোহপূর্ণ প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া আসেন।

শাদ্‌-উল্লা খাঁ সুন্নী-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতিই আধিপত্য করিত। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"সামান্য অবস্থা হইতে খোদাতালা আমাকে এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমার হস্তে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা দ্বারা সাধারণ সন্তানগণের (প্রজাবৃন্দের) উপকার করাই তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের প্রধান পথ।"

শাহজাহানের সময় দিল্লী ও আগ্রার রাজসভা শোভাসম্পদময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, জুম্মা ও মতি মসজিদ প্রভৃতির নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধানে করিবার ভার প্রধান উজীর শাদ্‌-উল্লা খাঁর হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল।

১৬৫৬ হিজিরায় চৈত্র মাসে শাদ্‌-উল্লা খাঁ ইহলোক ত্যাগ করেন। বাদশাহ তাঁহাকে সপ্তহাজারী মন্সবদারের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। শাদ্‌-উল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার একাদশবর্ষীয় পুত্র লুৎফ্‌-উল্লা খাঁন্ পিতৃগৌরবে ভূষিত হন।

শাদ্‌-উল্লা খাঁ কবে মাটীতে মিশিয়াছেন—কিন্তু এখনও ইতিহাস স্বর্ণময় অক্ষরে তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

জগৎ-কথা।

১৮

ওজন আর বস্তু যদি পৃথক হইল, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক সের সোনা আর এক সের রূপার ওজন সমান কি না? এক সের চাউলের ওজন এক সের লোহার বাট্‌খারার ওজনের সমান কি না? প্রশ্নটা আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। নিক্তিতে বা দাঁড়িতে আমরা দুইটা দ্রব্যের ওজন সমান কি না, তাহাই দেখি। এক পাল্লায় থাকিল চাউল, অন্য পাল্লায় থাকিল লোহার বাট্‌খারা। দাঁড়ি সোজা হইলে বুঝিব, দুই পাল্লায় সমান টান পড়িয়াছে, দুই পাল্লাই সমান বেগে ভূমিমুখে নামিতে চাহিতেছে; দাঁড়ির মাঝখানটা আট্‌কান থাকাতে কেহই নামিতে পারিতেছে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, দুই ধারেই ওজন সমান; বস্তু সমান কি না, প্রতিপন্ন

হয় না। চাউলের ও বাট্‌খারার ওজন সমান হইল, কিন্তু উভয়ের বস্তু সমান, কে বলিল ? উভয়েরই বস্তু এক সের, তাহা কিরূপে জানিব ? বস্তু আর ওজন যদি একই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না ; কিন্তু যখন দেখিতেছি, ওজন স্থানভেদে ভিন্ন হয়, বস্তু ভিন্ন হয় না, তখন ওজন সমান হইলেই যে বস্তু সমান হইবে, কে বলিল ?

ফলে ওজন যখন সমান, বস্তু তখন সমান হইবে, ইহা হঠাৎ বলা চলে না। বস্তু সমান কি না, তাহা পরীক্ষার স্বতন্ত্র উপায় থাকা উচিত।

বস্তুর আর একটা নাম দিয়াছি 'জড়ত্ব'। এই জড়ত্ব কি, কোন্ ধর্ম্মকে জড়ত্ব বলিতেছি, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝি নাই। উহা পারিভাষিক সংজ্ঞা—স্পষ্ট অর্থ না দিলে উহা মাপিবার উপায় পাওয়া যাইবে না।

প্রথমে মানিয়া লইতে হইবে, ওজনের সহিত উহার কোন সম্পর্কই নাই। নব্বই মন লোহা কলিকাতা হইতে বিলাতে লইয়া গেলে উহার ওজন একটু বাড়ে, দার্জ্জিলিঙ্গে লইয়া গেলে ওজন একটু কমে ; চাঁদ যত দূরে, তত দূর লইয়া গেলে উহার ওজন কমিয়া এক সের লোহার ওজনের তুল্য হয় ; পৃথিবীর কেন্দ্রে লইয়া যাইতে পারিলে ওজন একবারে কিছুই থাকিবে না। কাজেই এই ওজনটা একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। লোহার লৌহত্বের সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। লোহার ওজন এইরূপ অল্লাধিক হয় বটে, কিন্তু এমন কিছু ঐ লোহাতে আছে, যাহা কমেও না, বাড়েও না। উহাই লোহার বস্তু। ওজন যদি একবারে নাই থাকিত, তাহা হইলেও উহাতে সেই বস্তুর কোন তারতম্য হইত না। সেই বস্তুই ঐ দ্রব্যের জড়ত্ব ; এই জড়ত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক সের চাউল দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম ; ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ভূকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইলে উহার ওজন একবারে কমিয়া যাইবে। কিন্তু উহার ক্ষুধা-নিবারণের শক্তি হইতে কিছুই কমিবে না। উহার বস্তু—উহার জড়ত্ব সমান থাকিবে। কাজেই ওজন করিয়া বস্তুর পরিমাণ ঠিক্ হয় না। এখন প্রশ্ন এই—এই বস্তুর পরিমাণ করিব কিসে ? কোন্ দ্রব্যে কতটা বস্তু আছে, নির্ণয় করিব কিরূপে? দুইটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টার বস্তু অধিক, কোন্‌টার অল্প, তাহা নির্ণয় করিব কিরূপে ?

বস্তু পরিমাণের উপায় ধাক্কা। মনে কর, একটা খালি ঘড়া, আর একটা জলপূর্ণ ঘড়া উভয়ের সমান আকার—সমান আয়তন, অথচ ধাক্কা দিলেই বুঝা যাইবে, কোন্‌টায় বস্তু আছে অধিক। ছোট একটা ধাক্কা দিলে খালি

ঘড়াটা হটমট করিয়া দূরে গিয়া পড়িবে, পূর্ণ কুম্ভটা হয় ত স্বস্থান হইতে নড়িবেই না। এইরূপ ধাক্কা দিয়া কোন্‌টা কত দূর নড়িয়া যায়, তাহাই দেখিয়া আমরা মোটামুটি বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করি। দুইটা জিনিসের উপর ধাক্কা সমান হওয়া চাই, নতুবা তুলনা সম্ভবে না। ঠিক্ সমান ধাক্কা খাইয়া যেটা অল্প বিচলিত হয়, তাহার বস্তু অধিক, এবং যেটা অধিক বিচলিত হয়—সেটার বস্তু অল্প, বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু দুই ধাক্কা ঠিক্ সমান হইল কি না, বলা খুব সহজ নহে। স্প্রিং কিংবা রবরের দড়ির টান দিয়া বরং এই ধাক্কার পরিমাণ চলিতে পারে। দুইটা স্প্রিংএ যদি সমান টান পড়ে, তাহা হইলে ধাক্কাও সমান হইবে মনে করা যাইতে পারে।

অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, দুই জন আরোহী দুইখানা সমান আকার আয়তনের ভেলায় চড়িয়া জলে ভাসিতেছে। এক জন যদি দড়ি দিয়া বা আকর্ষী দিয়া অন্য জনকে টানে, তাহা হইলে কি হইবে? দেখা যাইবে, দুইখানা ভেলাই পরস্পর নিকটে আসিতেছে। তা যে ব্যক্তিই টানুক না কেন। রামের ভেলা শ্যামের দিকে চলিতেছে, শ্যামের ভেলাও রামের দিকে চলিতেছে। যদি দেখা যায়, দুই ভেলাই ঠিক্ সমান বেগে পরস্পর অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিব, দুইটারই বস্তু সমান। রাম সমেত রামের ভেলা, আর শ্যাম সমেত শ্যামের ভেলা, উভয়েতেই সমান বস্তু আছে। আর যদি দেখি, একের বেগ অধিক, অন্যের বেগ অল্প, তাহা হইলে বুঝিব, যাহার বেগ অধিক, তাহার বস্তু অল্প, যাহার বেগ অল্প, তাহার বস্তু অধিক।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বস্তুর সমানতা অথবা অল্পাধিক্য পরিমাণ করা যাইতে পারে। যাহাতে বস্তু যত অল্প, জড়ত্ব যত অল্প, সে বিচলিত হয় তত সহজে; যাহাতে বস্তু যত অধিক, জড়ত্ব যত অধিক, সে বিচলিত হয় তত প্রয়াসে।

যাহা হউক, এটা স্থির হইল যে, ওজনের কাছ দিয়া না গিয়াও বস্তু মাপিবার উপায় আছে। এইরূপে যেন স্থির হইল, এই লৌহপিণ্ডের বস্তু ঐ স্বর্ণপিণ্ডের বস্তুর সমান। এখন দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া উভয়ের ওজন সমান কি না, পরীক্ষা কর। বস্তুগত্যা দেখা যায়, দুটি দ্রব্যের বস্তু সমান হইলে ওজনও সমান হয়—তা সোনা রূপা, কাঠ পাথর, জল বাতাস, যে দ্রব্যই হউক না। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—প্রকৃতির খেয়াল বলিতে হইত। বস্তু বা

হইত, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ থাকিত না। বস্তু সমান হইলেই যে ওজন সমান হইতেই হইবে, প্রকৃতির উপর এমন জোর হুকুম কেহ দিতে পারে না। বস্তু সমান হইয়াও ওজন সমান না হইতে পারিত। কিন্তু প্রকৃতির এমনই খেয়াল হইয়াছে যে, যে যে দ্রব্যের বস্তু সমান, সেই সেই দ্রব্যের ওজনও সমান হইয়াছে। হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। ওজন সমান দেখিয়াই আমরা বস্তু সমান দেখি। নিক্তিতে যখন দেখি, দুই পাল্লায় ওজন সমান, তখন জানিতে পারি বস্তুও সমান। এইরূপে খুব সহজেই বস্তু-সামান্য দেখিয়া লই। যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে তুলদাঁড়িতে ওজন করিয়া বস্তু-সামান্য পরীক্ষা করা চলিত না। চাউলের দোকানে বস্তু কিনিতে গিয়া উহার ওজন দেখিলে চলিত না।

এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার মত ব্যাপক নিয়ম আর নাই। কঠিন, তরল, বায়বীয়, যাবতীয় পদার্থ এই নিয়ম মানিয়া চলে; এমন জিনিস এ পর্য্যন্ত গোচরে আসে নাই, যাহা এই নিয়ম মানে না। কিন্তু তাই বলিয়া কালি যদি এমন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হয়, যাহার বস্তু এক সের, কিন্তু যাহার ওজন এক সের সোনার ওজনের সমান নহে, তাহা হইলে প্রথমে সন্দেহ করিব বটে; কিন্তু পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণে সন্দেহ দূর হইলে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। উহা যে একবারে অসম্ভব, উহা হইতেই পারে না, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।

এক সেরের যে ওজন, অন্য এক সেরেরও যখন প্রকৃতির বিধানে ঠিক্ সেই ওজন, তখন দুই সেরের ওজন এক সেরের দ্বিগুণ, তিন সেরের ওজন তিন গুণ হইবে। তা যে জিনিসই লও না কেন। বস্তুর সহিত ওজনের এই যে গূঢ় সম্পর্ক, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে স্পষ্ট কেহ জানিতেন না। গালিলিও অনেকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নিউটনই নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ওজন বস্তুর সমানুপাতিক। উহা সোনা লোহা ভেদ জানে না। এক সের লোহা ও এক সের তুলার ওজন সমান, বস্তুও সমান, তাহা নিউটনের পূর্ব্বে জোর করিয়া বলিবার উপায় ছিল না, অথচ মানুষ নিউটনের কতকাল পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞাতসারে ওজন করিয়া বস্তু খরিদ করিয়া আসিতেছে।

১৯

গল্পে আছে, নিউটন একদিন আপেল্ ফল গাছ হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন ও ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন, ফল পড়ে, কেন না পৃথিবী উহাকে টানে। পৃথিবীর এই টানিবার শক্তির নাম মাধ্যা-কর্ষণ, উহাই ভূপতনের কারণ, এবং এই কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই নিউটনের মহত্ব!

এটা কোন কাজের কথাই নহে। আগে বলিয়াছি, পৃথিবী ফলকে টানে বলাও যা, ফল পৃথিবীর দিকে চলে বলাও তা; উভয়ই অলঙ্কারযুক্ত ভাষা; বিজ্ঞানের নিকট উভয়েরই এক অর্থ। ফল যে পৃথিবীর দিকে চলে, তাহা নিউটনের পূর্ব্বেও সকলেই জানিত, মহামূর্খেও জানিত, পশুতেও জানিত। কাজেই ফল চলে বা পৃথিবী টানে বলায় কাহারও কোন মহিমা নাই। পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে, তাহা সকলেই যেমন জানিত, নিউটনও তেমনই জানিতেন। কেন এবং কিরূপে টানে, তাহা তখন কেহ জানিত না, এখনও জানেও না; নিউটনও তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন নাই। তবে নিউটনের মহত্ত্ব কিসে? নিউটন করিয়াছেন কি?

নিউটনের একটা কাজ আগেই বলিয়াছি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, যাহার নামান্তর ওজন, প্রাকৃতিক নিয়মে বা প্রকৃতির খেয়ালে কেবল বস্তুর অপেক্ষা করে, অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কমাত্র রাখে না, তাহা নিউটনই স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন।

আর করেন কি? নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ যে পৃথিবীর পৃষ্ঠের নিকটেই কাজ করে, তাহা নহে; উহা বহুদূরব্যাপী। এমন কি, চন্দ্রের নিকটও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া দেখা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পিঠ ৪০০০ মাইল দূরে; আর চন্দ্র তাহার ষাটি গুণ দূরে, অর্থাৎ ২৪০০০০ মাইল দূরে। এত দূরেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে।

কিসে জানিলে? মাধ্যাকর্ষণের কাজ কি? উহার কাজ বেগ বাড়ান, পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে সকল দ্রব্যের বেগ বাড়ান। নিউটন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, চন্দ্র নিজেই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমাগত যাইবার চেষ্টায় আছেন। সেই চেষ্টা আছে বলিয়াই চন্দ্র সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। নতুবা এতদিন পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেন, তাহার স্থিরতা নাই। চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে

চলিতেছেন,—চলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার বক্ররেখায়, বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ ; নতুবা ঋজুরেখায় কোথায় যাইতেন কে জানে !

চন্দ্র ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিতেছেন, বেগে চলিতেছেন, বর্দ্ধমান বেগে চলিতেছেন, ইহা আপাততঃ বোধ হয় না ; কিন্তু নিউটনের হিসাবে এ বর্দ্ধমান বেগ ধরা পড়িয়াছিল। তবে চন্দ্রের বেগের বৃদ্ধির হার অতি অল্প ; ভূপৃষ্ঠে বেগবৃদ্ধির হার সেকেণ্ডে ৩২ ফুট ; চন্দ্রের ভূমিমুখে বেগ-বৃদ্ধির হার উহার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ।

ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের দূরত্বের ৬০ গুণ, আর চন্দ্রের বেগ-বৃদ্ধির হার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ। ৩৬০০=৬০×৬০ ; কি বিচিত্র ব্যাপার ! দূরত্ব যত বাড়ে, বেগবৃদ্ধির হার তাহার বর্গের অনুপাতে কমে।

বলের কাজ বেগ বাড়ান ; ওজন বা মাধ্যাকর্ষণ বেগ বাড়ায়। কাজেই ভূপৃষ্ঠে এক সের বস্তুর যে ওজন, চন্দ্রমণ্ডলে এক সের বস্তুর পৃথিবীর অভিমুখে ওজন তার চেয়ে অনেক কম ; ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ। অথবা ভূপৃষ্ঠে এক সেরের যে ওজন, চন্দ্রে ৩৬০০ সেরের বা ৯০ মণের সেই ওজন। পৃথিবীর অভিমুখে ওজন বলিলাম ; কেন না, চন্দ্রের অভিমুখেও আবার চন্দ্রস্থ দ্রব্যের ওজন আছে, তাহার পরিমাণ স্বতন্ত্র।

নিউটন এই অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। নিউটন আর কি করেন ? চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর গ্রহও ঠিক্ সেইরূপ সূর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্ব নিউটনের জানা ছিল ; নিউটন দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্য অভিমুখে পতনশীল, বর্দ্ধমান বেগে পতনশীল ! হিসাব করিয়া দেখিলেন, বেগের বৃদ্ধির হার সর্ব্বত্রই দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমিয়া থাকে। যাহার দূরত্ব তিন গুণ অধিক, তাহার বেগবৃদ্ধির হার নয় ভাগের এক ভাগ, এইরূপ হিসাব। অর্থাৎ, মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সর্ব্বত্রই একই নিয়মের অধীন।

প্রকৃতির ইহা আর একটা খেয়াল ; কেন এই খেয়াল, তাহা নিউটনও জানিতেন না, তার পরেও এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারেন নাই ; কিন্তু এই সৌরজগদ্ব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা নিউটন।

কেবল যে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের আর সূর্য্যের অভিমুখে গ্রহগণের এই ভাব, তাহা নহে ; নিউটন বলিলেন, গ্রহগণের পরস্পরের প্রতিও এই

ভাব, এই একই নিয়মে, একই বিধানে, পরস্পরের অভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে।

মঙ্গলের ভ্রমণপথ ভিতরে, বৃহস্পতির ভ্রমণপথ বাহিরে। মঙ্গল সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; কিন্তু বাহিরে বৃহস্পতি থাকায় তাহারও দিকে মঙ্গলের টান আছে; তাই ঠিক্ সেই বৃত্তাকার পথে চলিতে পারে না; একটু বৃহস্পতির দিকে হেলিয়া চলে। এখানেও বেগবৃদ্ধির সহিত দূরত্বের সেই অনুপাত। কিঞ্চিৎমাত্র হেলিয়া চলে, কেন না সূর্য্যের বস্তুর কাছে বৃহস্পতির বস্তু-পরিমাণ অতি অল্প।

নিউটন দেখাইলেন, সৌরজগতের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়মের রাজত্ব; এটা কবির ভাষায় বলিলাম। প্রত্যেক দ্রব্য অপর দ্রব্যের অভিমুখে চলিতে চাইতেছে, ঐ নিয়মে। নিউটন সৌরজগদ্ব্যাপী এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। এই জন্য নিউটনের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের স্পর্দ্ধা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি করিতে পারেন না। এ বিষয়ে নিউটন অদ্বিতীয়।

২০

আগে বলিয়াছি, যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। নিউটন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন, মাধ্যাকর্ষণের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক; অন্য ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। নিউটন সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি অন্বেষণ করিয়া মাধ্যাকর্ষণের সহিত দূরত্বের সম্পর্ক বাহির করেন। এখানে পরীক্ষা চলে না; কেন না, গ্রহ উপগ্রহের গতি-বিধিকে ইচ্ছামত নিয়মিত করা সাধ্য নহে।

কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার নূতন জ্ঞান অর্জ্জনে সাহায্য করে; ইহাতে পথ দেখাইয়া দেয়, কোন্ দিকে চলিলে নূতন তথ্যের সংবাদ জানিব। কেবল অন্ধের মত হাতড়াইতে থাকিলে দৈবক্রমে জ্ঞান অর্জ্জিত হইতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম দীপশিখা জ্বালিয়া নূতন জ্ঞানলাভের পন্থা দেখাইয়া দেয়। মানুষ জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

একটি উপদৃষ্ট উদাহরণ আছে। নিউটনের শত বৎসর পরে ইংলণ্ডে হর্শেল নামে জ্যোতির্বিৎ ছিলেন। তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত বৃহৎ দূরবীণ দ্বারা একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন; উহার ভ্রমণপথ শনিরও বাহিরে। উহার ইংরেজি নাম উরেনস্। আমরা বলিব বরুণগ্রহ। উহার, গতিবিধি

আলোচনা করিয়া দেখা গেল, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের সমীপে উহার যে পথে চলা উচিত ছিল, সে পথে না চলিয়া একটু বাহির ঘেঁসিয়া চলিতেছে। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে ইহার কারণ অনুমিত হয়। উহারও বাহিরে একটি গ্রহ আছে, যাহার টানে রাস্তা ঐ দিকে হেলিয়াছে। কোথায় কত দূরে গ্রহ থাকিলে ভ্রমণপথের ঠিক্ সেই ব্যতিক্রমটুকু ঘটিবে, তাহার হিসাব করিতে পাকা গণিতজ্ঞ আবশ্যক। বহুদিন পরে আডাম্‌স্ নামক ইংরেজ গণিতবিৎ হিসাব করিয়া বলিলেন, আকাশের অমুক স্থানে সেই গ্রহ থাকা উচিত। আডাম্‌স্ তাঁহার কাগজপত্র জ্যোতির্ব্বিৎ এয়ারির নিকট পাঠাইলেন। এয়ারি তাহা বাক্সতে বন্ধ রাখিলেন। এ দিকে ফরাসী জ্যোতিষী লেবেরিয়ে ঠিক্ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ফেলেন। এক জন জর্ম্মান জ্যোতিষী লেবেরিয়ের নির্দ্দিষ্ট খগোল-প্রদেশের দিকে দূরবীণ ধরিয়া নূতন গ্রহটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আডামসের কাগজপত্র তখনও এয়ারি সাহেবের বাক্সে। এই নবাবিষ্কৃত গ্রহের ইংরেজি নাম নেপচুন।

২১

নেপচুনের বাহিরে আর কোন নূতন গ্রহ বাহির হয় নাই। নেপচুনের ভ্রমণপথই এখন সৌরজগতের সীমা বলিয়া গৃহীত হয়। উহার বাহিরে তারাজগৎ; কত কোটী তারকা জগতে ছড়াইয়া আছে; এক একটা তারকা এক একটা সূর্য্যস্থানীয়, অনেকে সূর্য্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্; হয় ত তাহাদেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে। প্রশ্ন উঠে, এই সকল তারকাসমূহের মধ্যেও পরস্পর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ার প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। উহাদের পরস্পর দূরত্ব এত অধিক যে, তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের গোচরেই আসে না। অধিকাংশ তারার দূরত্ব আমরা জানি না। গোটা কয়েকের মোটামুটি জানা গিয়াছে; তার মধ্যে যেটা সব চেয়ে নিকটে আছে, তাহার আলো পাইতে সাড়ে চারি বৎসর অতীত হয়। আলো সেকণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ বেগে চলে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় সাড়ে চারি কোটী ক্রোশ দূরে থাকে; উহার আলো পৃথিবীতে আসিতে ৮ মিনিট লাগে। যাহার আলো আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে, তাহার দূরত্ব কি ভীষণ! সেই তারার গতিবিধির সহিত সূর্য্যের কোনও সম্পর্ক থাকিলেও তাহা সম্প্রতি ধরিবার আশা নাই। এইরূপ তারায় তারায়।

তবে গোটা কতক উদাহরণ আছে; গোটা কতক জোড়া তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; জোড়ার মধ্যে একটা অন্যটার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; পরস্পরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাদের ভ্রমণপথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত উহাদের গতিবিধির সামঞ্জস্য আছে। ইহাই দেখিয়া বলিতে সাহস হয়, সৌরজগতের বাহিরেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বর্ত্তমান।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে প্রায় দেখা যায়,—মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী। এত বড় কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত। প্রথমেই ভাবা উচিত, বিশ্ব কি?

উৎকৃষ্ট দূরবীণের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর বহু লক্ষ তারকা দেখা যায়; অধিক দূরে তারা হইতে আলো আসিতে হয় ত কত শত বা কত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়। আরও দূরে দূরে হয় ত আরও তারা রহিয়াছে, তাহারা এখনও দূরবীণেও ধরা পড়ে নাই। এই তারকা-জগতের সীমা কোথায় তাহা আমরা জানি না; সীমা আছে কি নাই, তাহাও বলিতে পারি না। যদি সীমা থাকে, তাহাই কি বিশ্বজগতের সীমা? সেই যদি বিশ্বজগতের সীমা হয়, তবে তাহার পর কি আছে? কেবলই কি শূন্য,—মহাশূন্য?

বিশ্বজগতের যে অংশের সহিত আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়, তাহার মধ্যে সৌরজগতে, ও গোটাকতক তারকার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া দেখিতে পাই; ইহা লইয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী, এত বড় কথা এক নিশ্বাসে বলিবার পূর্ব্বে একটু থামা উচিত। হয় ত মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী, হয় ত নহে। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্য্যন্ত।

২২

পৃথিবীর মত একটা বৃহৎ জড়পিণ্ডের সমীপে আম জাম আকৃষ্ট হয়—বা অতি দূরবর্ত্তী চন্দ্র পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। আবার অতি বৃহৎ জড়পিণ্ড যে সূর্য্য, যাহার আয়তন বার লক্ষ পৃথিবীর সমান ও যাহার বস্তু তিন লক্ষ পৃথিবীর সমান, সেই প্রকাণ্ড সূর্য্যের অভিমুখে অতি দূরবর্ত্তী নেপচুনগ্রহ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, ইহাও দেখা গেল। কিন্তু একটা নারিকেল ফল আর একটা নারিকেল ফলকে আকৃষ্ট করে কি না? নিউটন বলিয়াছিলেন, যাহার

বস্তু-পরিমাণ যত, তাহার আকর্ষণ তত। সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহের তুলনায় নারিকেল ফলের বস্তু এত কম যে, নারিকেলের অতি নিকটেও আর একটা নারিকেল রাখিয়া উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করা সাধ্য বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু এক সময়ে যাহা অসাধ্য থাকে, অন্য সময়ে তাহা সাধ্য হয়। নিউটনের বহুদিন পরে ক্যাবেণ্ডিশ সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিয়া দেখাইলেন, একটি সীসার গোলা—যাহার বস্তু অতি অল্প, সে অন্য সীসার গোলার দিকে াকৃষ্ট হয়।

দুইটার মধ্যে কোন্‌টা আকৃষ্ট হয়? এটা ওটার দিকে, ওটা এটার দিকে আকৃষ্ট হয়। উপরে যুগল তারার কথা বলিয়াছি; সেও সেইরূপ। দুটা তারার মধ্যে এটা ওটার দিকে, ওটা এটার দিকে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণটা পরস্পর। তবে ১নং তারা সেকণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, ২নং তার সেকণ্ডে ঠিক্ সেই বেগ অর্জ্জন না করিতে পারে।

কোন্ তারার কতটা বস্তু, এই বেগ-বৃদ্ধির মাত্রা দেখিয়া তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত হয়। বস্তু শব্দের আমরা যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে যাহার বেগ-বৃদ্ধি বেশী, তাহার বস্তু কম, যত বেশী, তত কম। মনে কর, ১নং তারা সেকণ্ডে যে বেগ অর্জ্জন করে, ২নং তারা সেকণ্ডে তাহার দশ গুণ বেগ অর্জ্জন করিতেছে। ঘড়ি ধরিয়া ইহাই দেখা গেল। এখন পূর্ব্বদত্ত পারিভাষিক অর্থ অনুসারে ২নং তারার বস্তু কম, ১নং তারার বস্তু বেশী; কত বেশী? দশগুণ বেশী। ২নং তারার বস্তু যদি এক সের হয়, ১নং তারার বস্তু দশ সের। ২নং তারার বস্তু যদি হয় কোটী মণ, ১নং তারার বস্তু দশ কোটী মণ।

ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, ১নং তারার বেগ-বৃদ্ধির হারকে উহার বস্তু পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়, ২নং তারার বেগ-বৃদ্ধির হারকে উহার বস্তু-পরিমাণ দিয়া গুণ করিলেও সেই গুণ-ফল পাওয়া যাইবে। প্রথমের গুণফলের নাম ক্রিয়া, উহা দ্বিতীয়ের অভিমুখে; দ্বিতীয়ের গুণফলের নাম দাও প্রতিক্রিয়া, উহা প্রথমের অভিমুখ। ফল হইল, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখ।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এই সমানতা নিউটনের প্রণীত অন্যতম গতির নিয়ম নামে পরিচিত। নিউটন বলিয়াছেন, যেখানে ক্রিয়া, সেইখানেই তাহার বিপরীতমুখে প্রতিক্রিয়া; এবং উভয়ের মাত্রা সমান।

এই নিয়মটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিব কি না? ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। দুইটা বস্তুর পরস্পরের প্রতি গতিবিধি দেখিয়াই আমরা বলিয়া থাকি, এটার যখন বেগ-বৃদ্ধির হার এত বেশী, তখন উহার বস্তুর পরিমাণ এত কম। বস্তু শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞাই এই। বস্তু শব্দটি ঐ অর্থে প্রয়োগ না করিয়া অন্য অর্থে প্রয়োগ করা স্বচ্ছন্দে চলিত। তাহা হইলে ক্রিয়ার মাত্রা প্রতিক্রিয়ার মাত্রার সমান হইত না। কাজেই এই যে নিয়ম, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে; উহা একটা পারিভাষিক সূত্রমাত্র।

কিন্তু এইখানে আর একটি কঠিন প্রশ্ন আসে। মনে কর, যুগল নক্ষত্রের বদলে ক্যাবেণ্ডিশের গোলাই লইলাম। দুইটি গোলার বদলে তিনটি গোলা লইলাম। একটি সীসার, একটি রূপার, একটি সোনার। সীসার গোলাটি এক সের। সীসার গোলার নিকট রূপার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, রূপার বেগ-বৃদ্ধির হার সীসার অর্দ্ধেক। অতএব বলা গেল, রূপার গোলার বস্তু দুই সের। আবার সীসার গোলার নিকট সোনার গোলা রাখিয়া দেখিলাম, সোনার বেগবৃদ্ধির হার সীসার সিকি; অতএব সোনার গোলার বস্তু চারি সের।

এখন প্রশ্ন রূপার গোলার কাছে সোনার গোলা রাখিলে উহার ব্যবহার, উহার গতিবিধি, উহার বেগবৃদ্ধি কিরূপ হইবে?

সীসার নিকট রূপার গতিবিধি জানি; সীসার নিকট সোনার গতিবিধি জানি; তাহার উপর ভর করিয়া কি বলা যায়, রূপার নিকট সোনার গতিবিধি কিরূপ হইবে? কখনই না।

রামের সহিত শ্যামের বিবাদ ও রামের সহিত যদুর বিবাদ দেখিয়া কি বলা যায়, শ্যামের সহিত যদুর বিবাদ না সদ্ভাব? বলিতে পার, রাম-শ্যাম স্বাধীন চেতনদ্রব্য, সোনা রূপা জড়দ্রব্য; কাজেই ঐ আপত্তি থাকিবে না। আচ্ছা, উদজান অম্লজানে পোড়ে; গন্ধক অম্লজানে পোড়ে; গন্ধক উদজানে পুড়িবে কি না? উত্তর দেওয়া চলিবে না। পৃথক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পোড়ে কি না। পোড়ে তথাস্তু, না পোড়ে, তথাস্তু।

সেইরূপ এখানেও বিনা পরীক্ষায় বলা যাইবে না, রূপার নিকট সোনার ব্যবহার কিরূপ। সীসার সহিত ব্যবহার দেখিয়া বলিয়াছি, রূপা দুই সের আর সোনা চারি সের; ঐরূপ বলিয়াছি বলিয়াই সোনা রূপার প্রতি

আমার মনের মত ব্যবহার করিতে বাধ্য নহে। কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা প্রকৃতির বিধান, আমার আয়ত্ত নহে।

কিন্তু প্রকৃতির বিধান বিচিত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেই সোনার কাছে রূপার বেগ যে হারে বৃদ্ধি পায়, রূপার কাছে সোনার বেগ ঠিক্ তাহার অর্দ্ধেক হারেই বৃদ্ধি পায়। অতএব আমার অবলম্বিত ভাষায় সোনার বস্তু রূপার দ্বিগুণ।

সীসার প্রতি উভয়ের ব্যবহার পৃথক্ ভাবে দেখিয়া ঠিক্ করিয়াছিলাম, রূপা দুই সের, সোনা চারি সের। রূপা সোনা পরস্পরের ব্যবহার দেখিয়া ঠিক্ হইল ঐ ভাষা এখানেও চলিবে; সোনার বস্তু রূপার বস্তুর দ্বিগুণই থাকিতেছে। প্রকৃতির বিধান এইরূপ।

প্রকৃতির বিধান যদি অন্যরূপ হইত; অর্থাৎ, সীসার প্রতি ব্যবহার দেখিয়া যদি স্থির করিতাম, সোনার বস্তু রূপার দ্বিগুণ, আর পরস্পর ব্যবহারে যদি স্থির হইত, সোনার বস্তু রূপার দশগুণ, তাহা হইলে আর ঐরূপ পরিশ্রম করিয়া বস্তু-পরিমাণে কোন লাভই থাকিত না। এক একটা জিনিসের কাছে বস্তুর মাত্রা এক এক রকম হইলে, ইহার বস্তু কত, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই অসম্ভব হইত। অন্ততঃ বস্তু শব্দ আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করিব স্থির করিয়াছি, সে অর্থে কোনও জিনিসের বস্তু-নির্দ্দেশ চলিত না।

ফলে প্রকৃতি এখানে করুণাময়ী। তাঁহার দয়ায় আমরা কোন একটা দ্রব্যের তুলনায় আর পঞ্চাশটা জিনিসের বস্তুমাত্রা স্থির করিয়া লইলে ভবিষ্যতে ঠকিতে হয় না। সেই বস্তুমাত্রা দেখিয়াই ঐ পঞ্চাশ জিনিসের কাহার প্রতি কাহার কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ গতিবিধি হইবে স্থির করিতে পারি। ফল হইয়াছে এই যে, একবার কোন্ দ্রব্যের কত বস্তু ঠিক্ করিয়া লইলে ভবিষ্যতে আর মতপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। যাহা এক সের, তাহা দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে এক সেরই থাকে; যাহা দশ সের, তাহা দশ সেরই থাকে। ইহা প্রকৃতির খেয়াল, বা প্রাকৃতিক নিয়ম; কেন না, ইহা তর্কে পাইবে না, ইহা পরীক্ষিত অবেক্ষণ-লব্ধ সত্য। এই সত্য আছে বলিয়াই বস্তু মাপা সম্ভব হইয়াছে, ও বস্তু মাপিয়া ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমানতা-নির্দ্ধারণও সম্ভবপর হইয়াছে। নিউটনের বর্ণিত গতির নিয়মটি প্রাকৃতিক নিয়ম নহে; কিন্তু উহার মূলে প্রাকৃতিক নিয়ম রহিয়াছে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সাবধান হইয়া থাকা

উচিত। সঞ্চিত জ্ঞানের কোন্‌টুকু বিচারলব্ধ—তর্কলব্ধ, তাহা পদে পদে সাবধানে নির্ণয় করিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না।

উল্টা বিচার ধর্ম্মাধিকরণেই শোভা পায়; বিজ্ঞানশাস্ত্রে শোভা পায় না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে প্রচলিত একটা উল্টা বিচারের উদাহরণ দিব।

প্রশ্ন,—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সমান। তবে আম পৃথিবীর দিকে চলে, পৃথিবী আমের দিকে আকৃষ্ট হয় না কেন?

প্রচলিত উত্তর,—বস্তুর পরিমাণ ও বেগবৃদ্ধির হার এই দুয়ের গুণফল দেখিয়া ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নির্ণীত হয়। এ স্থলে ক্রিয়া=প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তু×পৃথিবীর বেগবৃদ্ধির হার=আমের বস্তু×আমের বেগ-বৃদ্ধির হার। এখন, পৃথিবীর বস্তু অত্যন্ত অধিক, আমের বস্তু অত্যন্ত অল্প, অতএব, পৃথিবীর বেগবৃদ্ধির হার অতি অল্প, আমের বেগবৃদ্ধির হার অতি অধিক। অর্থাৎ পৃথিবীর অর্জ্জিত বেগ এত কম যে, উহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আমের বেগটাই চোখে পড়ে।

[এই বিচারে অবশ্য চন্দ্র সূর্য্যাদির অস্তিত্ব ধরা হয় নাই।]

প্রকৃতপক্ষে এই বিচার উল্টা।

প্রকৃত বিচার এই;—

আমই পৃথিবীর দিকে চলে, পৃথিবী অচল অথবা প্রায় অচল, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। কেন এমন হয় তাহা আমরা জানি না। তবে, আমের অর্জ্জিত বেগ অধিক, ও পৃথিবীর অর্জ্জিত বেগ নগণ্য; কাজেই আমরা বলি, আমের বস্তু অল্প ও পৃথিবীর বস্তু অত্যন্ত অধিক। কেন না, বস্তু-নির্ণয়ের অর্থই এই, উপায়ই এই।

যাহার অর্জ্জিত বেগ যত অল্প, তাহার বস্তু তত অল্প, অর্থাৎ আমের বস্তু×আমের অর্জ্জিত বেগ=পৃথিবীর বস্তু×পথিবীর অর্জ্জিত বেগ; অর্থাৎ ক্রিয়া=প্রতিক্রিয়া।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সহযোগী সাহিত্য।

সিংহলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

"মাদ্রাজ মেল" নামক পত্রিকায় জনৈক সংবাদদাতা এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন ;—

সিংহলবাসিগণ কত দিন এই দ্বীপ অধিকার করিয়া তাহাতে বসবাস করিতেছে, তাহা বলা যায় না। তবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ হইতে ৪৩০ অব্দের মধ্যে তাহারা 'বিজয়' রাজের নেতৃত্বে উত্তর-ভারত হইতে আসিয়া সিংহল দ্বীপ জয় করে। এই সময়কার ঘটনাবলীর দুইখানি ইতিহাস আছে—একখানি "মহাবংশ," এবং অপরখানি "দীপবংশ"। ঘটনাবলীর কয়েক শত বৎসর পরে খ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উভয় গ্রন্থই পালি ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬০ অব্দ হইতে যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়।

এই বিজয় নৃপতি প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিলে পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা পাণ্ডুবাস তাঁহার সিংহাসনে আসীন হন। ইনিও পিতৃব্যের ন্যায় এক জন ভারতীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রাজকুমারীর সহিত তাঁহার ছয় জন ভ্রাতা সিংহলে আসেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে এক একটি নগর-স্থাপন করেন। ইহার মধ্যে অনুরাধ নামে জনৈক রাজশ্যালক অনুরাধপুর-নামক সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করেন। পরে এই অনুরাধপুর সিংহলের রাজধানী হইয়া পরবর্ত্তী রাজার রাজত্ব-সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। এই রাজার রাজত্বকালের প্রায় এক শতাব্দীর পরে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সূত্রপাত হয়। যখন ভারতের রাজা ধর্ম্মাশোকের পুত্র 'মাহিন্দ' (মহেন্দ্র) সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করিলেন, তখন তাঁহার সহোদরা সিংহল দ্বীপে স্বয়ং বুদ্ধদেব যে বৃক্ষতলে আসীন হইয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটি শাখা আনয়ন করিয়াছিলেন। সিংহলাধিপ তখন ধর্ম্মোৎসাহে ও নবীন উদ্যমে কতিপয় সুন্দর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করান। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে সে কালের প্রাচীন শিল্পকলা ও কারুকার্য্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরাধপুর নগরে অনেকগুলি এই প্রকার ভগ্নস্তূপ ও প্রাচীন হর্ম্ম্যনিকেতনের ধ্বংসাবশেষ—কোনটি বা একেবারে লুপ্তাবস্থায়, আর কোনটি বা নষ্টপ্রায়াবস্থায়—বর্ত্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহা নিঃসন্দেহ। এখন এই প্রাচীন কীর্ত্তিভূমিতে যদিও তাদৃশ লোকবাস নাই, তথাপি পূর্ব্বে এই নগর রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, কিংবা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের জন্যই হউক, এই স্থানে অনেক লোকের বসবাস ছিল। এই অনুরাধপুরে প্রাচীন মঠ বা মন্দিরের মধ্যে কতিপয় ডাগোবা বা স্মৃতিমন্দির ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব বা তাঁহার কোনও বিশিষ্ট শিষ্যের স্মৃতিকল্পে যে মঠ, মন্দির, বা স্তূপের প্রতিষ্ঠা হইত, তাহাকে ডাগোবা বলিত। থুপারাম স্মৃতিমন্দির ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সিংহলে প্রবাদ আছে যে, এই ডাগোবায় বুদ্ধদেবের স্কন্ধের একখানি অস্থি সংরক্ষিত আছে। তিস্সারাজ—যিনি এই মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা,—তিনি দেবগণের নিকট হইতে বুদ্ধের এই অস্থি পাইয়াছিলেন। যখন এই অমূল্য নিধি হস্তিবাহনে সিংহলে

আনীত হইতেছিল, তখন সহসা তাহা ৫০০ হাত উচ্চে উত্থিত হইয়া ভীষণ ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল,—ও উপস্থিত লোকসমাজ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া তন্নিঃসৃত অগ্নি ও বারিরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এখন ভগ্নাবস্থায় মন্দিরটি বা ভগ্নস্তূপটি ৬০ ফিট উচ্চ, এবং ইহার ব্যাস প্রায় ৪০ ফিট। কিন্তু খনন করিয়া দেখা গিয়াছে, যে ভিত্তির উপর মন্দিরটি প্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহার ব্যাস প্রায় ১৬০ ফিট; সুতরাং প্রথমাবস্থায় ইহা নিতান্ত সামান্য মন্দির ছিল না।

উল্লিখিত মন্দির ভিন্ন আর একটি মন্দির আছে। তাহা 'স্বর্ণধূলি' নামে অভিহিত হয়। ইহা প্রায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। দূর হইতে ২০০ শত ফুট উচ্চ পাহাড় বলিয়া মনে হয়। ইহা বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আবৃত। কিন্তু খনন করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত। নিকটে প্রহরিগৃহ, এবং তৎসংলগ্ন কতকগুলি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। স্তম্ভগুলি এমন ভাবে অবস্থিত যে, দেখিয়া বোধ হয়, যেন পূর্ব্বে ইহাদের উপর ছাদ ছিল। পথদ্বার হইতে বাহিরে গেলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে প্রশস্ত পথ ছিল, তাহাতে পূর্ব্বে হস্তীর মিছিল যাইত। এই স্থান হইতে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৫০০ শত ফিট্ একটি সুন্দর ভিত্তির উপরে উঠিয়াছে—ইহা ৪০০ শত মৃণ্ময় হস্তীর উপর স্থাপিত। এই মৃণ্ময় হস্তীগুলি প্রাচীরের কাজ করে। এই স্থানের সুন্দর কারুকার্য্য ও শিল্পের বিকাশ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক মৃণ্ময় হস্তীর দন্ত গজদন্তে খচিত ছিল; এখনও তাহার ছিদ্র বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল আরও সুব্যক্ত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন সিংহলে আর একটি ডাগোবা বা স্মৃতিমন্দির আছে। জগতে তাহার সমকক্ষ নাই। পৃথিবীর মধ্যে 'অভাগেমাকার' মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রথম ইহার উচ্চতা ৪০৫ ফিট ছিল। এখন কালের প্রবল আঘাতে ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতেছে। এই বৌদ্ধস্তূপে ও তাহার সান্নিধ্যে সুন্দর শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্যের অভিব্যক্তি আছে। সেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শত শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পী ও কলাবিদ্যাবিশারদগণ কত দূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সিংহলের প্রায় সর্ব্বত্র বুদ্ধদেবের ও অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটির শিল্পচাতুরী ও নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া প্রাচীন শিল্পবিদ্যার তুলনায় অধুনাতন স্বল্প বিদ্যার প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। লজ্জায় ও ঘৃণায় ও দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। অনুরাধপুরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি—যেন কল্যাকার প্রস্তুত, এমন সুন্দর ও চমৎকার বলিয়া মনে হয়। ফল কথা, এই সমস্ত প্রাচীন গৌরবের শ্মশানশায়ী ভগ্নস্তূপ বা সুন্দরের শেষ স্মৃতিচিহ্নের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রথমাবস্থার সেই অলৌকিক উন্নতির অনুধ্যান করিলে মনে হয়, সেই এক কাল, আর এই এক কাল! কত ধৈর্য্য, কত অর্থ, কত শিক্ষার ফলে তবে এই শিল্প-সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে নিবিড় অরণ্যে যে প্রাচীন মন্দির উৎখাত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, এই মন্দিরটি, প্রায় সহস্র বৎসর লোকচক্ষুর অগোচর ছিল। তবু এই মন্দিরের পারিপাট্য চাকচিক্য, ও সংস্থানের রমণীয়তা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এখনও

যে অনুরাধপুরের সন্নিহিত জঙ্গলে এইরূপ শত শত মন্দির নিহিত নাই, তাহা কে বলিতে পারে ?

এতদ্ভিন্ন একটি সুরম্য হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ এখনও সিংহলের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এই হর্ম্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের গোপিকার ন্যায় ১৬০০ শত স্তম্ভ বিরাজমান। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৫০ ফুট পরিমাণ একটি সভাগৃহের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, ইহাতে এক সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিতের বাসোপযোগী স্থান ছিল। এই প্রাসাদের সভাগৃহে অনেক স্বর্ণরৌপ্যখচিত আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল ; তাহা সিংহলদ্বীপবাসী ও তামিল সৈন্যের বিরোধকালে ক্রমশঃ অপহৃত হইয়াছে। এই প্রাসাদের স্তম্ভগুলি যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা সিংহলদ্বীপের কোনও পর্ব্বতে নাই। পুরাকালে লোকের শিল্পনিপুণতা ও পরিশ্রমপ্রিয়তা ও কর্ম্মানুষ্ঠানবাসনা কত বলবতী ছিল !

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

বঙ্গদেশের প্রথম মুসলমান রাজধানী।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'মডারণ রিভিউ' পত্রে গৌড় সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সার-সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন রাজধানীর উল্লেখ করিতে হইল, বহুকাল হইতে সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ের নামই স্মৃতিপথে উদিত হয়। পূর্ব্ব-ভারত সাম্রাজ্যের নাম গৌড় ; তাহার প্রধান নগরীর নামও গৌড়। দেশের সহিত নগরের নামের এইরূপ সমতা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

গৌড় সুপ্রাচীন। ইহা ক্রমান্বয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের অধিকৃত ছিল। অদ্যাপি কোনও অনুসন্ধিৎসু ইহার ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই তিন বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর অতীত প্রভাবের কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। মুসলমান হিন্দু দেবদেবী বা বুদ্ধমূর্ত্তি বিশিষ্ট মন্দির ভাঙ্গিয়া, সেই উপাদানেই তাহার মসজিদ গড়িয়াছে, বহু স্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রাভেনশা যথার্থই বলিয়াছেন,—প্রায় দেখা যায়, মসজিদ-নির্ম্মাণে যে সকল মার্ব্বেল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পশ্চাৎদিকে দেবদেবীর বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তদানীন্তন মসজিদের আকার ও গঠনপ্রণালী অনেকাংশে হিন্দুস্থাপত্যের মত। বিজেতা কখনও কখনও পরাজিতের অনুকরণ করেন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

মুসলমান অশ্বারোহিগণের অধিনায়করূপে বখ্‌তিয়ার খিলিজি সর্ব্বপ্রথম গৌড় নগরী অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি গৌড় নগর ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণাবতী রাজধানী করিলেন। লক্ষ্মণাবতী অচিরে বিদ্যামন্দির, ধর্ম্মভবন ও উপাসনালয়ে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এ কথাও দুটি কারণে বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, তথায় সৌধভবনাদির কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক জীবনে অভ্যস্ত বখ্‌তিয়ারের পক্ষে শান্তিময় রাজপ্রাসাদে জীবন-যাপন নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় পুনর্ভবা নদীর তীরবর্ত্তী

দেবীকোট নামক সেনানিবাসে স্থাপিত হইত। দিনাজপুর জেলার আধুনিক দমদমা প্রাচীন দেবীকোটের স্থান অধিকার করিয়াছে। তিব্বত অভিযানে বিফলমনোরথ হইয়া বখ্তিয়ার যখন পলায়ন করেন, তখন তাঁহার এক জন অনুচর এইখানে বখ্তিয়ারকে হত্যা করে। বখ্তিয়ার উত্তরবঙ্গে তনুত্যাগ করিলেও, দক্ষিণ বিহারে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। এই ঘটনা হইতেও স্পষ্ট প্রতীত হয়, উত্তর-বঙ্গের অংশবিশেষে বখ্তিয়ারের প্রভাব সুদৃঢ় ছিল না।

অধ্যাপক ব্লকম্যান্ তদানীন্তন কালের ইতিহাস লিখিতে গিয়া ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন। বখ্তিয়ার খিলিজি হইতে আরম্ভ করিয়া উপর্য্যুপরি মুসলমান-আক্রমণ-তরঙ্গ উত্তর-বঙ্গকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু উত্তর-বঙ্গের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও, উহা কখনও মুসলমানের সম্পূর্ণ অধীন হয় নাই। বর্ত্তমান দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবীকোট তখন উত্তর দিকে মুসলমানের প্রথম সেনানিবেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং বলিতে হয়, দেবীকোটই প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বভারতের প্রথম মুসলমান রাজধানী; এবং প্রথম সুলতান গিয়াসুদ্দীনের শাসনকালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণাবতী এই রাজধানীর স্থান অধিকার করে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে লখণৌতি নামের উল্লেখ দেখা যায়। বলিতে হইবে কি, এই লখ্ণৌতি লক্ষ্মণাবতীরই অপভ্রংশ?

৬১৪ হিজিরায় প্রথম গিয়াসুদ্দীনের রৌপ্যমুদ্রা ও ৬১৬ হিজিরায় স্বর্ণমুদ্রা প্রথম প্রচলিত হয়। এই উভয় মুদ্রায় 'গৌড় হইতে মুদ্রিত' এই কথাগুলি লিখিত আছে। এই মুদ্রায় দণ্ডহস্ত অশ্বারোহীর মূর্ত্তি যে তৎকালপ্রচলিত হিন্দু-মুদ্রায় অঙ্কিত বল্লমহস্ত রাজপুতবীরের চিত্রের অনুকরণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথম সুলতান গিয়াসুদ্দীন জামিও অনেক ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। কিন্তু সে সকলের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাসানকোট নামক দুর্গ তাঁহার নামে পরিচিত। কিন্তু অদ্যাপি এই দুর্গ বা তাহার অবস্থান-স্থান আবিষ্কৃত হয় নাই। সুলতান আলতামাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী ও এই দুর্গ অধিকার করেন। সুলতানের মৃত্যুর পর নগরের উপাস্তস্থিত এই দুর্গ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ হয়। বিজয়ী মুসলমানের অধিষ্ঠিত লখণৌতি নগর এই দুর্গের সন্নিহিত ছিল, ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কিন্তু লখ্ণৌতি যে হিন্দু অভিধান, এবং লক্ষ্মণাবতীরই অপভ্রংশ, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, মুসলমান সুলতান নগর নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দু-অভিধান কেন গ্রহণ করিলেন? ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে, লক্ষ্মণাবতী নগর পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান ছিল; সুলতান নগরের উন্নতিসাধন ও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

জলপ্লাবন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য প্রথমে সুলতান গিয়াসুদ্দীন অত্যুন্নত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিনহাজ লখ্ণৌতি পরিদর্শন করেন। র‍্যাভেন্‌শা তাঁহার মানচিত্রে এই পথের অংশবিশেষ অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু অধুনা স্থানীয় লোকেরা এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। নগরের সম্মুখভাগ উচ্চশিখর-সমন্বিত সৌধমালা ও বিভিন্ন অট্টালিকারাজি দ্বারা পরিশোভিত। র‍্যাভেন্‌শা বলেন,—ইষ্টকেও বিচিত্র

কারুকার্য্য বিদ্যমান। কিন্তু এখন সে অট্টালিকাদির চিহ্নও নাই। মহাকালের প্রভাবে এখন তাহা আরণ্য লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন, এবং অসংখ্য শাখামৃগের বিচরণ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

বখ্‌তিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া আলি শাহের সময় পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ-শত বৎসর কাল কোনও মুসলমান শাসনকর্ত্তা বৃহৎ ইমারত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন নাই। এ সময়ে দিল্লী ও গৌড়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। গৌড়ের অধিকাংশ শাসনকর্ত্তা আবার দিল্লীর সম্রাটের নিযুক্ত বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুতরাং ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা অল্পকালের জন্য সেখানে বাস করিতেন; সম্ভবতঃ, সেই জন্য নগরের উন্নতিবিধানে তাঁহাদের ইচ্ছা বা ব্যগ্রতা ছিল না।

এই সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্য কেবলমাত্র তিন ছত্র ক্ষোদিত অক্ষরে শিলাখণ্ডে বিদ্যমান। সেই শিলাখণ্ড এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় বিরাজ করিতেছে। তাহাতে প্রকাশ,—সামসুদ্দীন আলতামাসের রাজত্বকালে তাঁহার এক জন অসিযোদ্ধা কতলু খাঁ গৌড়ে একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। কানিংহাম নগরের উত্তর প্রান্তে গঙ্গারামপুরের অরণ্যে আর একটি ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, জেলালুদ্দীনের শাসন-সময়ে ৬৪৭ হিজিরায় একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাজিপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা হাজি ইলাস্‌ সুলতান সামসুদ্দীন ইলাস্‌ নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হন। তিনি ভাঙ্গে অতিশয় আসক্ত ছিলেন বলিয়া, এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র ভাঙ্গড়া নামে পরিচিত। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশাবলী রাজত্ব করেন। পাণ্ডুয়ায় সামসুদ্দীন বাস করিতেন। এখনও ছতিশগড়ের ধ্বংসস্তূপে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক। তাঁহার পুত্র সেকেন্দার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। আদিনা সম্পূর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি শত্রু-হস্তে নিহত হন। মুমূর্ষু পিতাকে সম্বোধন করিয়া পুত্র বলিলেন,— "পিতঃ, একবার চক্ষু উন্মীলন করুন; আপনার শেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন; আমি নিশ্চয়ই তাহা পূর্ণ করিব।" পিতা একবার চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন,—"চিরদিনের জন্য চলিলাম, তুমি সগৌরবে রাজত্ব ভোগ কর।"

ইলাস-শাহী বংশের প্রভুত্ব কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হইল। রাজসাহীর এক জন হিন্দু জমীদার রাজা গণেশ আপনার বাহুবলে রাজ্যাধিকার করিলেন। পাণ্ডুয়ায় যে মন্দিরগুলি আজও পাণ্ডুয়ার গৌরব ও কীর্ত্তির ঘোষণা করিতেছে, সেগুলি রাজা গণেশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজা গণেশের প্রতিষ্ঠিত কোনও মন্দির বর্ত্তমান নাই। গৌড়ের একটি দীর্ঘিকার নাম, জেলানি-দীঘি, এবং পাণ্ডুয়ার 'এক-লক্ষী' নামক মস্‌জিদ জেলালউদ্দীনের স্মরণচিহ্নরূপে অবস্থিতি করিতেছে। এক জন ক্রীতদাস তাঁহার পুত্রকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করিয়াছিল। নাসিরুদ্দীন প্রথম সুলতান মামুদ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গৌড়ের দুর্গ-সংস্কার, তোরণ ও প্রাসাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নগরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। দ্বি-শতাব্দীব্যাপী অপ্রতিহত মুসলমান-শাসনের মধ্যে তিন জন হিন্দু রাজার অভ্যুদয় বিস্ময়াবহ বটে। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজা গণেশ গৌড়ের বাদশাহকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ইলাস শাহের বংশধরগণ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সমুদ্রপথে এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বাণিজ্যতরী প্রেরিত হইত। এই বাণিজ্যই তদানীন্তন বঙ্গদেশের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কারণ। •

১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "এসিয়াটিক জর্ণালে" Pantheer কর্ত্তৃক চীনভাষা হইতে অনূদিত"চীনবিবরণী"-পাঠে অবগত হওয়া যায়, তখন চীন ও বাঙ্গলা দেশের রাজদূত উপহার-সম্ভার লইয়া পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করিত। এই চীন-বিবরণীতে দেখা যায়, সিরাজের পুত্র গিয়াসউদ্দীন ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার তালিকায় আশমানী বর্ণের পুষ্পে খচিত, শ্বেত-চীনামাটী নির্ম্মিত পানপাত্রের উল্লেখ আছে। এই বিবরণী হইতে আরও জানিতে পারি যে, সে সময়ে বাঙ্গলা দেশে একরূপ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল, তাহার নাম Tong-kia, অর্থাৎ তঙ্কা। উহার ওজন ২৪ গ্রেণ।

প্রথম মামুদ ইলাস-শাহ বংশের নষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধার করেন। তদবধি চিরকালের জন্য পাণ্ডুয়ার পরিবর্ত্তে গৌড় রাজধানী হইল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ প্রথম মামুদ ও তৎপুত্র বারবাকের অধিকারকালে গঠিত। বারবাকের মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইল, লুণ্ঠন ও হত্যা অবাধে চলিতে লাগিল। বারবাকের আবিসিনীয়া-দেশীয় ক্রীতদাসগণ সৈন্যদিগকে বশীভূত করিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করে।

মহম্মদের বংশধর, আরববাসী, অসমসাহসিক আলাউদ্দীন হোসেন শা গৌড় নগরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বংশাবলী প্রজাসাধারণের হিতকল্পে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ইলাস-শাহ বংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পর হইতে গৌড় নগরী সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একবার রাজ্যে সিংহাসনের জন্য বিপ্লব ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু হোসেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নসরতের অধিকারকালে আবার গৌড় নগর পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হয়। গোলাম হোসেনের 'রিয়াজ' গ্রন্থে আমরা এই সমৃদ্ধির উল্লেখ দেখিতে পাই। তখন লখ্‌নৌতি-নগরে ও পূর্ব্ববঙ্গে স্বর্ণপাত্রে আহার প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কোনও বিশেষ উৎসবে যিনি যত স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, তিনি তদনুরূপ খ্যাতি লাভ করিতেন। বহুব্যয়সাধ্য সুগঠিত সৌধ-ভবনাদির ধ্বংসাবশেষে এখনও গৌড়নগরীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় সুপ্রকাশিত। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের লুণ্ঠন, এবং ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের লোকক্ষয়ে গৌড় নগর চিরদিনের জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

ইহার প্রধান কারণ,—লোকক্ষয়কর, 'জনপদবিধ্বংসী' মহাব্যাধি; জেনারল কনিংহাম এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—যত দিন নগরের চারি দিকে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল, এমন কি, যত দিন নগর হইতে কিছু দূরে প্রবাহিত হইলেও ভাগীরথীর প্রবাহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তত দিন গৌড় স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন ভাগীরথী ক্ষীণাঙ্গী হইয়া পড়িলেন, নগরের আবর্জ্জনারাশি বিধৌত হইবার সুবিধা রহিল না, তখন মহামারীর সূত্রপাত হইল। ৯৮৩ হিজিরা (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) মহামারীতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ, বহু রাজকর্ম্মচারী ও অসংখ্য অধিবাসীর মৃত্যু হয়।

এইরূপে গৌড় নগরের ধ্বংসের সূচনা হয়। লোকের বাস না থাকিলে বড় বড় অট্টালিকার যে দশা হয়, গৌড়ের প্রাসাদাদির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। কত অসংখ্য অট্টালিকা, কত সুন্দর শিল্পমণ্ডিত দেবালয়—কিন্তু সকলই শূন্য! তখন এক নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইল। বহু লোক সেই সকল অট্টালিকা হইতে ইষ্টক ও প্রস্তর খুলিয়া লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে লাগিল। প্রথমে মোগলেরা, পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। কারণ, ইহাতে তাঁহাদের অর্থাগমের নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা যাহাদিগকে 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্র দিতেন, কেবল তাহারাই অট্টালিকাদি ভাঙ্গিবার অধিকার পাইত।

গ্রাণ্টের 'Analysis of the finances of Bengal গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,— এইরূপে 'Quinxal Khist Kor' আট সহস্র টাকা আদায় হইত। গৌড়ের সন্নিহিত কয়েক জন ভূস্বামীর নিকট হইতে প্রতি বৎসর এই কর আদায় হইত। এই করের কল্যাণে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সমৃদ্ধিশালী গৌড় নগর ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতে লাগিল। ইহাই গৌড়-ধ্বংসের গূঢ় ইতিহাস।

দেশের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ আছে, তিনি বিশ্রুতকীর্ত্তি, গৌরব-সমুজ্জ্বল প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ একবার দেখিয়া আসুন।

মানবের বিবর্ত্তন।

বিবর্ত্তন ক্রমবিবর্ত্তন নহে। নিম্নতম জীব হইতে ক্রমোন্নত হইয়া মানব জাত হইয়াছে, এই পুরাতন মত এখন আর স্বীকৃত হয় না। এখন প্রধান প্রধান জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, নিম্নতর জীব অকস্মাৎ বিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চপদবীতে আরোহণ করিয়াছে। সুতরাং বিবর্ত্তন শব্দে অকস্মাৎ-বিবর্ত্তন বুঝিতে হইবে। *

এখন জিজ্ঞাস্য এই, নিম্নতম জীব হইতে ত অকস্মাৎ বিবর্ত্তিত হইতে হইতে মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইলাম। ইহার পর বিবর্ত্তিত হইয়া আর কি হইব? বিবর্ত্তনের প্রাকৃতিক নিয়ম কি এত যুগযুগান্তর পরে মানব পর্য্যন্ত

* That the form has been slowly acquired * * * * This is the Darwinean view which we also reject. *Morgan's Evolution and Adaptation* p. 348.

The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception the theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps. *De Vries' Species and Varieties, Preface.*

আসিয়াই রহিত হইবে? অথবা মানব আরও বিবর্ত্তিত হইবে? যদি হয়, তবে কোন্ দিকে হওয়া সম্ভব?

এখন পর্য্যন্ত জীবদেহের সর্ব্বোচ্চ বিবর্ত্তন স্তন্যপায়ীর রূপ। মানব স্তন্যপায়ীদিগের শীর্ষস্থানীয়। এ পর্য্যন্ত স্তন্যপায়ী ইতর জীবগণের দেহের সহিত মানবদেহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, মানবের মাথা বড় হইয়াছে; গলাও বানরাদির অপেক্ষা একটু লম্বা হইয়াছে। হাত নীচে নামিয়াছে, বুক বেশী প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু লম্বায় কমিয়াছে; পীঠও তদ্রূপ। পদদ্বয় একটু উপরে উঠিয়াছে। হস্ত পদের (বিশেষতঃ পদের) অঙ্গুলিগুলি ক্ষীণ, খর্ব্ব ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। সকল জীবই বিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে কোনও কোনও দেহাংশ হারাইয়াছে, আবার কোনও কোনও নূতন দেহাংশ লাভ করিয়াছে। বিবর্ত্তনের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন লাভের ইতিহাস নহে। লাভ ও ক্ষতির মধ্য দিয়া জীবদেহ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানবেরও তাহাই হইয়াছে। মানবের চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, হনু, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, হস্ত, পদ ইত্যাদি প্রায় সকলই ইতর জীবের তুলনায় ধ্বংসের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। * এ সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে "সাহিত্যে" "মানবদেহের পরিণতি" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া আমি একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। স্থূল কথা এই যে, মানবের দেহ অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত; কিন্তু মস্তক ও মস্তিষ্ক, এই দুইটি অংশ অনন্যসাধারণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ডারুইন্ দেখাইয়াছেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন জীববিবর্ত্তনের একটি প্রধান কারণ। এই মত যদিও পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ে সমাদর প্রাপ্ত হইতেছে না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধি এখনও পণ্ডিত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিকনির্ব্বাচন ইতর প্রাণীদিগের দৈহিক পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিয়া বিবর্ত্তনের সহায়তা করিয়াছে। তাহাদিগের দৈহিক পরিবর্ত্তন অনুকূল হইলে তাহারা টিকিয়া গিয়াছে, নচেৎ বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের বিবর্ত্তনের ইতিহাস এইরূপ। দৈহিক পরিবর্ত্তন যদি অবস্থার উপযোগী হইল, তবে তাহারা বাঁচিয়া গেল। নচেৎ দলে দলে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি নাই—এমন

---

* Cf. Weidersheim's tructure of Man.

বলিতেছি না; অথবা তাহাদিগের মানসিক বিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাও নহে। অবশ্যই হইয়াছে। কিন্তু ইতর জীবের দেহই প্রধান, বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত ছোট কথা; কিন্তু মানবের বুদ্ধিই প্রধান, দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট কথা। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অরক্ষিতদেহ মানব কেবল বুদ্ধিবলেই জীবরাজ্যের রাজ হইয়াছে। তাহার ক্ষেত্রে বুদ্ধিই প্রধান।

বুদ্ধির ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। জীবরাজ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে জীবের মস্তিষ্ক পদার্থ যত উন্নত হইয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুপাতে উন্নত হইয়াছে। মানবের নিকটবর্ত্তী নিম্নতর জীব শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি; কিন্তু মানবের মস্তিষ্ক তাহাদের অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক বর্দ্ধিত। বিবর্ত্তনের ইতিহাস স্পষ্টই শিক্ষা দিতেছে যে, জীবের উন্নতিসহকারে দেহের প্রাধান্য কমিতেছে; মস্তিষ্কের অর্থাৎ বুদ্ধির প্রাধান্য বাড়িতেছে।

মস্তিষ্ক পদার্থ কতকগুলি স্নায়ুতন্তু, স্নায়ুগণ্ড, আবর্ত্ত ও প্রণালীর* সমষ্টিমাত্র। ইহার মধ্যে আরও এক পদার্থ আছে, যাহা এখনও স্নায়ুগণ্ডতে রূপান্তরিত হয় নাই। এই পদার্থই মূল। ইহা হইতেই স্নায়ুতন্তু প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। ইহা পৃষ্ঠবংশে ও মস্তিষ্কে বিদ্যমান। ইহাকে স্নায়ুবীজ বলিব। ইংরাজিতে ইহাকে Neuroglia নিউরোগ্লিয়া বলে।† এই পদার্থ বিকার প্রাপ্ত হইয়া স্নায়ু, স্নায়ুতন্তু, ও স্নায়ুগণ্ডে পরিণত হইয়াছে; আর সেই উপলক্ষে কর্ম্মানুসারে কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিভক্ত হইয়াছে;—যেমন দৃষ্টিকেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, বুদ্ধিকেন্দ্র ইত্যাদি। দৃষ্টিকেন্দ্রের যোগে দর্শনকর্ম্ম, শ্রুতিকেন্দ্রের

* Convolution and fissur.

† The neuroglia or intermediate substance * * has been most commonly regarded as a comparatively insignificant connective tissue, though some physiologists have always been willing and even anxious that it should be credited with higher develoomental and functional capacities. * * This intermediate tissue is the probable matrix wherein and from which new nerve fibres and new nerve cells are evolved in animals of whatever kind or degree of organisation, during their advance in reflex instinctive or intellectual acquirements * * * If some of the cells and nuclie usually assigned to the neuroglia are in reality potential or umbryo nerve cells, the importance of this intermediate tissue as a formative matrix in which new developments may take place, will at once appear.

Bastian's Brain as an organ mind p. p. 38, 39, 40.

যোগে শ্রবণকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু স্নায়ুবীজ এখনও কর্ম্মানুসারে রূপান্তরিত হয় নাই, এবং কিরূপ ভাবে রূপান্তরিত হইবে, তাহাও বলা যায় না। হয় ত যাহা এখন্ কল্পনাও করিতে পারিতেছি না, সেইরূপ অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। হয় ত কোনও অভিনব ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে পারে; অথবা মানবের বুদ্ধি অন্য অচিন্তনীয় পথে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু এ সকল অনুমানের কথা। যাহা প্রমাণিত সত্য, তাহা এই;—মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গা দ উপরে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং আরও হইবে, কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান আকৃতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে। ইতর জীবের বিবর্ত্তন আকৃতির পরিবর্ত্তনেই প্রধানতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। মানবের ক্ষেত্রে তদ্রূপ না হইতে পারে; কারণ, মানব তাহাদিগের ন্যায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধির দাস নহে। অতি অসভ্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানবের বুদ্ধি অসাধারণ প্রসার পাইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অসভ্য মানবের মস্তিষ্ক ও সভ্য মানবের মস্তিষ্ক গুরুত্বে, আয়তনে, অথবা আবর্ত্তে অধিক বিভিন্ন নহে। এ কথার অর্থ এই যে, মানব-মস্তিষ্কের যাহা কিছু উন্নতি এ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ক্রিয়াবিষয়ক (func-tional), আকৃতিবিষয়ক নহে। এই পদার্থের ক্রিয়াশক্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে। সভ্যতার উন্নতির সহিত ইহার ক্রিয়াবিষয়ক উন্নতি হইবেই। বুদ্ধিবৃত্তির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যে ক্ষুদ্র এক পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক কোণে বসিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অপর প্রান্তের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অতীন্দ্রিয় পরম-পরমাণুর সংস্থান ও গতির নির্ণয় করিতেছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির সীমাবধারণ নিতান্তই অসম্ভব। বুদ্ধি এখনই দেহের ক্রিয়া-সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে, মনের ধারণাশক্তির উপরে উঠিয়াছে। মানব বুদ্ধিবলে সপ্রমাণ করিল যে, এমন দুই রেখা হইতে পারে, যাহা অনন্তকাল বর্দ্ধিত করিলেও মিলিত হইবে না, কিন্তু পরস্পর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইবে। আশ্চর্য্য! ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইবে, অথচ অনন্তকালে মিলিবে না! মন কি ইহা ধারণা করিতে পারে? কখনই না। বুদ্ধি মনকে অতিক্রম করিয়াছে। বুদ্ধিবলে মানব গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে, কিন্তু সেই অত্যুচ্চ দেশের শৈত্য মানবের দেহ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলিয়াছি, বুদ্ধি এখনই দেহ মনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ভবিষ্যতেও এ ব্যাপারের নিবৃত্তি হইবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যায় না। বরং স্নায়ুবীজের বিষয় বিবেচনা

করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবীয় বুদ্ধি কালে আরও সূক্ষ্মতর অভিনব পথে প্রকটিত হইতে পারে।

জীব-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে লইয়া যায়। কিন্তু যখন তাহার সহিত ভারতীয় বৈদান্তিক চিন্তাস্রোতঃ মিলাইতে বসি, তখন এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে পারি না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইতর জীবের তুলনায় মানবের দেহ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ স্ফুরণ হইতেছে। এক্ষণে স্মরণ করুন, বেদান্ত পঞ্চকোষ স্বীকার করেন; তাহার মধ্যে জ্ঞানময় কোষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জ্ঞানময় কোষ ত্রিদেহেই বিদ্যমান; স্থূল দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কারণ দেহেও ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে এই ক্ষয়শীল, উত্তরোত্তর ধ্বংসশীল মানব-দেহ কালে পরিত্যক্ত হইবে, এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। দেহ যখন বুদ্ধিবিকাশের বিঘ্নকর হইয়া উঠিতেছে, আর উহার সহায়তা করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন উহা পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভবপর হইতেছে; কারণ, যাহার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়, অথবা থাকে না, তাহা পরিত্যক্ত হওয়াই নিয়ম। মানব-দেহের ও দৈহিক ক্রিয়ার ক্ষয়শীলতা বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতেছে। এমন স্থলে ভারতীয় চিন্তাপ্রসূত সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার করায় কোনও দোষই দেখি না। এই সূক্ষ্ম শরীর স্বীকার করিলে, এবং তাহাতেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার হওয়া সম্ভব, এ কথা স্বীকার করিলে, মানব-বিবর্ত্তনের পরিণতি বুঝিতে অধিক আয়াস স্বীকার করার আবশ্যক হয় না। শুক নারদাদি এক সময়ে স্থূল-দেহধারী ছিলেন, এখন তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে জ্ঞানময় কোষে অবস্থিত। অবিশ্বাসী যাহাই মনে করুন, জীব-বিজ্ঞানের সহিত এই সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই। বিজ্ঞান স্বীকার করে, দেহ ক্ষয়শীল, বুদ্ধি বর্দ্ধনশীল; বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করে, মস্তিষ্কই বুদ্ধির আধার, আর সেই মস্তিষ্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্নায়ুবীজের কোষ সকল নিহিত আছে। সুতরাং প্রায় সকলই ত স্বীকার করা হইল। স্থূলদেহ বুদ্ধিবিকাশের বিঘ্নকর, তাই বুদ্ধি তাহাকে অতিক্রম করিতেছে। পূর্ণমাত্রায় অতিক্রম করিলে সূক্ষ্মদেহাধিষ্ঠিত হওয়া কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে। মানব-বিবর্ত্তনের ইহাই নিকটবর্ত্তী পরিণাম। কিন্তু শেষ পরিণতি সেই সর্ব্ববীজরূপ, সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমধর্ম্মিতা। এ বিষয় এ স্থলে বিচার্য্য নহে; ইহা প্রধানতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত। যাহা হউক, মানবের নিকটবর্ত্তী বিবর্ত্তন স্থূল দেহের ত্যাগ, এবং জ্ঞানময় কোষ অবলম্বন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। ভাদ্র। প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা—ত্র্যহস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না! ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্ম্মোপদেশ আছে, কবিত্ব নাই। শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন, তাহা কে বলিবে? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নির্ব্বাণ' লাভ করিল।

'রাখোরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।'

রবীন্দ্রনাথও ইহা মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই,—'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।' কর্ম্মযোগে ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িবে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। এত দিন ঘাম হইতে 'ঘামাচি'র সৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর 'কর্ম্মযোগের ঘর্ম্ম' কবিতায় পরিণত হইতেছে! রবীন্দ্র বাবু যদি গদ্যে 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রচার করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কবি-কীর্ত্তিকে এত ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় না। শ্রীযুত শরৎকুমার লাহিড়ীর 'বিদ্যাসাগর-কথা' সুলিখিত। মান্দ্রাজী বালকের প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে একটু ভুল আছে। এই স্বল্প পরিসরে তাহার সংশোধন সম্ভব নহে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'চন্দ্র' পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেখিতেছি, চন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করিতেছে—তিনি 'চন্দ্রাহত' হইয়াছেন। নতুবা 'বন্ধু' নামক গল্পটি ছাপিতেন না। 'বন্ধু' অস্বাভাবিক, উদ্ভট। আখ্যান-বস্তু নাই বলিলেও হয়; যদি থাকে, তাহা হোমিওপ্যাথী ঔষধের সহস্র ক্রমের মত সূক্ষ্ম ভাবে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুচিও ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে! শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কনখল' ও শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবকাশ' উল্লেখযোগ্য—সুখপাঠ্য। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি' নামক গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালীপ্রসন্ন ঘোষ' প্রবন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য নাই। লেখকের ভাষা অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল। 'জীবনী' জীবনচরিত নহে। এই প্রবন্ধে জানা গেল, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবু 'পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকার সভ্যতা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি, শীঘ্র আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পাইব। শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি রজনীকান্ত সেনের প্রতি' নামক রচনায় কবিত্বের কোনও সন্ধান পাইলাম না!

'গাও কবি, বুক-ভরে,
কণ্ঠ-চিরে গেয়ে যাও গান'

যদি কবিতা হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার! 'কণ্ঠ-চিরে' গান—প্রাণ-চিরে কবিতা হয় না। বাঙ্গালা দেশের তথাকথিত কবিকুষ্মাণ্ডদিগকে তাহা বুঝাইবার কোনও উপায় নাই। আর কবিই বা কত! 'যত ছিল নাড়াবুনে, সব হোলো কীর্ত্তুনে।' যাহারা কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইতেছেন, তাঁহাদের জন্য দুঃখ না করিয়া না থাকা যায় না। শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্তের 'কবি রজনীকান্ত সেন' ছাপা হইল কেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কার্ত্তিকচন্দ্রের ভাষা তাঁহার বাহন ময়ূরের ন্যায় পেখম তুলিয়া নাচিতেছে।—যথা,—'মৈত্রী—প্রেম!'

সুপ্রভাত। ভাদ্র। শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুপ্রভাত' নামক কবিতায় কোনও বিশেষত্ব নাই। 'জাগিয়াছে জাগরণ, ধরি উত্থানের হাত' উদ্ভট বটে, কিন্তু হাস্যরসের উদ্দীপক। কথা গাঁথিলেই কবিতা হয় না। চণ্ডী বাবু 'বিধাতার শঙ্খনাদ' শুনিয়াছেন, 'সুপ্রভাত' দেখিয়াছেন। আমরা দুর্ভাগ্য, কেবল তাঁহার রচনাপঙ্ক ঘাঁটিয়া মরিলাম। শ্রীযুত

'কাহারও সে করচিহ্ন হয়ে যায় গভীর অঙ্কিত,
কা'রো বা ফুটে না, কা'রো ক্ষণ পরে হয় অপনীত।'

গুহ কবির 'কর-চিহ্ন' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষাও' ফোটে নাই,—অতএব ক্ষণপরে অপনীত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিংহগড়' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত সত্যবন্ধু দাসের 'কামরূপ রাজ্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়ের 'বাংলা দেশ' পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি অসমসাহসী—অকুতোভয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যখন 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এই অপচার ছাপাইয়াছেন, তখন নিশ্চয় 'ত্রিভুবন-বিজয়ী' হইবেন।

'হরষ-মনে কৃষক-কুলে
সোনার ক্ষেতে ধান-বীজ বোনে রে!'

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ 'হরিষ-মনে' কবিতার বীজ না বুনিয়া সোনার—অন্ততঃ মাটীর ক্ষেত্রে 'ধান-বীজ' বুনিলেও অনেকের জীবন সার্থক হইতে পারে। 'পত্রাবলী' কেন মুদ্রিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। না ছাপিলেই ভাল হইত। শ্রীমতী লীলার 'উদ্দেশে' নামক কবিতায় বিশেষত্ব নাই;—রোমন্থন কবিতা নহে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর 'নারিকেলের চাষ ও তাহার ব্যবহার' উল্লেখযোগ্য,—সময়োপযোগী।

আর্য্য-জীবন। ভাদ্র। নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র। দ্বিতীয় সংখ্যা। 'সারধর্ম্ম' ও 'পুরাতত্ত্ব' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ। মামুলী মতের পুনরাবৃত্তি। লেখকগণ 'অধিকারী' কি না, বলিতে পারি না। শ্রীযুত প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামপাল' এক বিন্দু প্রবন্ধ—'নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে!' এই ক্ষুদ্র মাসিকে কবিতার বহর দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে ব্যাঙ্গের ছাতার মত ভুঁইফোঁড় কবির অভ্যুদয় হইতেছে! সোনার বাঙ্গালা পর্য্যাপ্ত শস্যের পরিবর্ত্তে এখন কেবল প্রচুর কবি প্রসব করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার বুকে বহু পাগলাগারদ বা 'কবি-নিবাস' নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুত পরিমলকুমার ঘোষ 'অবসানে' লিখিয়াছেন,—'মৌন হিয়া ম্লান সচঞ্চল!' শুধু 'চঞ্চলে' শাণিল না—তাই 'স' যুড়িয়া দিয়াছেন! ইঁহার 'গুঞ্জরণ লাজমুক্ত!' নতুবা তিনি 'অবসান' দিবালোকে প্রকাশ করিতেন না। শ্রীযুত সুখরঞ্জন রায় আরও ভয়ঙ্কর কবি। ইনি 'বাষ্পাভিযানে' নামক উন্মত্তপ্রলাপে লিখিয়াছেন,—

'টানে ওগো টানে মোরে টানে টানে টানে
টানিছে হিয়ার টানে;'

কে কাহাকে টানিতেছে, বলুন দেখি? 'ছায়া-নিচোলেতে ঘেরা' গ্রামখানি, 'মাঠেতে সোনার ধান, পুকুরেতে পানা', 'লোক-চলা পথে রাখাল-বেণুর গঁৎ'—গৎ-শব্দের শূর্পণখা-সুলভ উচ্চারণ!—'নারিকেল শাখে শাখে বাতাসের হাঁকা', 'ঘন-বন কত পাখী-ডাকা'—সবই এই 'বিটকেল' কবিকে বাহু বাড়াইয়া টানিতেছে! তাই কবি 'টানে ওগো'—ইত্যাদি! পুকুরের পানা, বাতাসের হাঁকা, বেণুর 'গঁৎ', সোনার ধান, এমন কি, সমস্ত গ্রামখানিকে ইনি 'বাহু' দান করিয়াছেন! দাতা বটে! ইনি বিধাতা অপেক্ষাও অধিক কুশলী। বিধাতাও পানা প্রভৃতিকে বাহু দিতে পারেন নাই! ধন্য কবি!' ইনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'অনন্ত মিলনঠাঁই আছে কোনওখানে?' উত্তর, আপনাদের মিলন-ঠাঁই—বাতুলাশ্রম। যাত্রা করিবেন কি? 'দুর্গা! দুর্গা!' বলিবার অবকাশ দিবেন কি? 'কবিতা-গুচ্ছের সব কবিই এই শ্রেণীর। শ্রীযুত দুর্গামোহন কুশারী 'মধুরে' শেষ করিয়াছেন। তাঁহার Master Pieceএর নাম 'প্রবাস-যাত্রা।'—নমুনা,—'কাঁদে কেড়ালিয়া অহহঃ—অহরে?' 'কেড়ালিয়া' কি মহাশয়? শুনিলেই আতঙ্ক হয়! ব্যাপারটা কি? আবার,—

'লক্ষ্মী প্যাঁচারা বসে কি সেথায় মাঁদার গাছে?'

আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—

'আর্য্য-জীবন-কবি কি সেথায় শাখায় নাচে?'

পাথারে।

নব-বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গলার কবি গাহিয়াছেন,—

"নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান,
আমি ভাবিতেছি ব'সে কি গাহিব গান!"

কিন্তু আমাদের পল্লী-প্রকৃতির সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারা জানেন, নদী যখন "কূলে কূলে" ভরিয়া উঠে, তখন আর "ক্ষেত ভরা ধান" দেখা যায় না, ক্ষেত তখন জলে জলময় হইয়া উঠে, এবং কূলপ্লাবী ভরা নদীর বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া কবি-হৃদয়ে গান গাহিবার আগ্রহ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেও, অকবি কৃষকেরা তাহাদের সংবৎসরের অন্ন-বস্ত্রের একমাত্র উপায় পক্কপ্রায় ধান্যশীর্ষগুলি বানের জলে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া, 'মাথাল' মাথায় দিয়া, 'কাস্তে' হাতে লইয়া, জলমগ্ন ক্ষেতের 'আইলে' বসিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে।—এবার আমাদের পল্লী অঞ্চলে এই দৃশ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি,—দূর হইতে কল্পনা-নেত্রে যাহা সুন্দর দেখায়, বস্তুতঃ তাহা কিরূপ হৃদয়বিদারক!

এবার বর্ষায় আমাদের জেলায় জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। চারি পাঁচ বৎসর এ অঞ্চলে এমন 'বান' হয় নাই। বিশেষতঃ বন্ধুবর সু—বাবু এবার একখানি সুন্দর ও সুপ্রশস্ত 'ভাউলে' প্রস্তুত করাইয়াছেন; 'জল বেড়াইবার' এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে আর কখনও তাহা পাইব না ভাবিয়া একদিন 'চাল চিঁড়া বাঁধিয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য বন্ধুকে অনুরোধ করিলাম। বন্ধুবর একে উকীল, তাহার উপর জমীদার, এবং তদুপরি কবি প্রকৃতির লোক; তিনি জলযাত্রার আয়োজন করিয়া সংবাদ দিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

১৮ই ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, রাত্রে বাহিরে যেমন দুর্ভেদ্য অন্ধকার, ঘরে তেমনই দুঃসহ গুমট্; রাত্রি দশটার সময় আমার পাঠ-গৃহে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারের উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া কেরো-সিনের উজ্জ্বল আলোকে একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিলাম। নভেলের

নায়ক জাপানী, নায়িকা ইংরাজ-দুহিতা; রস বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। আমাদের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী রাজপথ জনশূন্য, কোনও দিকে জন মানবের সাড়া শব্দ ছিল না; কেবল অদূরে বাঁশ-বনের অন্তরালবর্ত্তী একটি জলপূর্ণ গর্ত্তে নানাজাতীয় ভেক সমস্বরে বর্ষার আবাহন-সঙ্গীত গাহিতেছিল; তাহাদের সেই অশ্রান্ত মকধ্বনি বর্ষাসলিলে সিক্ত পল্লী-প্রকৃতির রহস্য-ভাষের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। গৃহপ্রান্তে নিবিড় দূর্ব্বাদলের অন্তরালে ঝিঁঝিঁর দল যেন করাত দিয়া কাঠ চিরিতেছিল; সে শব্দের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত কাঁঠাল গাছ ও শিশু গাছের পাতায় পাতায় সহস্র সহস্র জোনাকী টিপ টিপ করিয়া জ্বলিয়া প্রকৃতির অন্ধকার যবনিকার উপর হীরকছটার বিকাশ করিতেছিল, এবং দুই একটা শৃগালকে মধ্যে মধ্যে আম বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদের 'বাঘা' কুকুরটা রোয়াকের উপর বসিয়া এক এক বার চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় সু—বাবুর ধীবর ভৃত্য খুদীরাম হালদার আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাত্রি তিনটার সময় বাবু 'জল বেড়াইতে' যাইবেন, আপনাকে সংবাদ দিতে বলিলেন।"—বাবুর অদ্ভুত সখের পরিচয়ে কিছু ভীত হইলাম, কিন্তু দমিলাম না। রাত্রি তিনটার পূর্ব্বেই উঠিতে হইবে ভাবিয়া সেদিন একটু সকালেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে উঠিতে পারিব কি না ভাবিয়া মন বড় উৎকণ্ঠিত হইল; শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইল না; বড় গরম বোধ হইল; শয়ন-কক্ষের দুই একটি বাতায়ন খুলিয়া দিলাম; দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে পূর্ব্বাকাশের নক্ষত্রগুলি ঢাকিয়া গিয়াছে।

তাহার পর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম, বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ শীতল জলকণাস্পর্শে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে ভাবিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া দেখি, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে! ছাদের জল 'নালি' দিয়া সশব্দে নীচে আছড়াইয়া পড়িতেছে; সমস্ত আকাশ গাঢ়কৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন, যেন প্রলয়ের বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে!—ঘড়ি খুলিয়া হরিকেন ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, রাত্রি আড়াইটা, আর অর্দ্ধঘণ্টা দূরের কথা, সমস্ত রাত্রির মধ্যে যে বৃষ্টি ছাড়িবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। বাতায়নগুলি রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিলাম, আর কোনও উদ্বেগ রহিল না।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, অরুণের লোহিত কিরণ নির্গলিতাম্বুগর্ভ শুভ্র মেঘস্তরে পড়িয়া বড় মনোহর কান্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, কে যেন মেঘে সিন্দুর ঢালিয়া দিয়াছে! প্রভাত-অরুণের রক্তিমচ্ছটা সাসীর উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে।

ভাবিলাম, বন্ধুবর বোধ হয় দলবল সঙ্গে লইয়া প্রত্যুষেই জলযাত্রা করিয়াছেন। ক্ষুণ্ণমনে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম।

হঠাৎ বাহিরে ডাক শুনিলাম, "বাবু, বাবু!"

পূর্ব্বরাত্রের খুদীরাম হালদার জানাইল, বাবুরা নৌকায় উঠিতেছেন, আর বিলম্ব নাই।

পাথারে ভাসিবার জন্য ভরা অমাবস্যায় গৃহত্যাগ করিলাম। খোকা আবদার ধরিল, "আমি যাবো, বাবা!" তাহাকে ধমক দিয়া বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি—বন্ধুবর পরমনিশ্চিন্তচিত্তে গড়গড়ার নল মুখে পুরিয়া মক্কেলের আরজি দেখিতেছেন!

আমি বলিলাম, "রবিবারেও মামলা! স্বর্গে ঢেঁকিকে বিশ্রাম দাও, ওঠ, বেলা হইয়া গেল।"

বন্ধু বলিলেন, "বস, সংকীর্ত্তন পার্টির সকলে আসিয়া জুটুক। পাথারে কীর্ত্তন বড় মধুর লাগিবে।"

কিশোরী বাবু সংকীর্ত্তন দলের কাপ্তেন। তিনি তিন চারি জন দোহার সহ অল্পক্ষণ পরে উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদাবলী, এবং দুই জোড় করতাল। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদারবিন্দ-মকরন্দাভিলাষী সংকীর্ত্তন-বিলাসী কিশোরীমোহন বলিলেন, "এক জোড়া খোল লইব কি? হরিনাম জমিবে ভাল।"

বন্ধু বলিলেন, "তাহা হইলে সেই সঙ্গে নৌকায় একটা পাঁঠা লইতে বলিয়া দিই, শক্তি-চৈতন্যে কোমল-মধুর মিলন হইবে। জলের উপর কোমল ছাগমাংস অমৃতের মত লাগিবে।"

সুতরাং খোল লইবার প্রস্তাব চাপা পড়িয়া গেল।

এক জোড়া উকীল, একটি হাকিম, একটি ডাক্তার, একটি গ্রন্থকার, একটি মোক্তার, একটি জমীদার, একটি সেতারু, এবং তিনটি নাবালক বোটে আরোহণ করিলেন। 'শ্রীদুর্গা' বলিয়া ভৈরব-বক্ষে বোট ভাসাইয়া দেওয়া হইল।

আমি বলিলাম, "অনেক বেলা হইয়া গেল; স্নান করিয়া লইলে হইত।" বন্ধু বলিলেন, "আঃ রাম, বাড়ীত রোজ স্নান করা যায়। পাথারে গিয়া স্নান না করিলে মজা কি?"

মজার আশায় স্নানের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নে উদর দেব চঞ্চল হইয়া উঠিলে কি ব্যবস্থা হইবে, ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বন্ধুকেও সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। দেখিয়াছিলাম বটে, সঙ্গে এক কলসী মুড়ি লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষুধানলে তাহা ত খড়ের ইন্ধন!

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আহারাদি কার্য্যে বন্ধুবরের উৎসাহ আমাদের দলস্থ সকলের অপেক্ষা অধিক,—তিনি পূর্ব্বেই তাহার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বোটের সঙ্গে সঙ্গে একখানি জেলে ডিঙ্গী চলিল; তাহাতেই প্রচুরপরিমাণে রসদ লওয়া হইয়াছিল; গুটি দুই মৃণ্ময় উনন ও একরাশি শুষ্ক জ্বালানী কাঠ সেই ডিঙ্গীর পাটাতনের উপর সজ্জিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

আমাদের বোট ও তাহার 'ল্যাং বোট' সেই জেলেডিঙ্গী নদীপথে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

ভৈরব প্রাচীন নদী। কিন্তু এমন বাঁক বোধ হয় বঙ্গের কোনও নদীতে নাই। নদীপথে যাইতে যাইতে নদীকূলে যে দুই একটি বটগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর বাঁক ঘুরিয়া সেই বটতলায় আসিতে সমস্ত দিন লাগে, এরূপও দেখা গিয়াছে। একে মূল নদী পদ্মা জলাভাবে এই শাখায় যথেষ্ট জলধারা ঢালিয়া দিতে পারে না, তাহার উপর এই রকম বাঁক, সুতরাং বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে নদীতে জল থাকে না, কোথাও এক গলা, কোথাও এক বুক জল থাকে, তাহাও শৈবালদাম-সমাচ্ছন্ন; স্রোতের অভাবে নদীর অধিকাংশ স্থলেই হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। কৃষকেরা জলের ধার পর্য্যন্ত হল-চালনা করিয়া শস্য বপন করে, সেই জন্য নদী আরও অধিক ভরাট হইয়া উঠিয়াছে; তাই শীর্ণকায়া অগভীর বক্রগামিনী স্রোতোহীনা নদীর অবস্থা দেখিলে নদীতীরবর্ত্তী পল্লীবাসিগণের চক্ষুতে জল আসে। দুই শত মণ বোঝাই নৌকাও নদীপথে চলিতে পারে না, স্থূল শৈবাল বা টোপা-পানার স্তূপ ভেদ করিয়া পল্লীবাসিগণ নদীপথে নৌকারোহণে গ্রামান্তরেও যাইতে পারে না; শৈবালদলে দাঁড় বাধিয়া যায়, পালেও নৌকা চলে না।

বদ্ধনদী ম্যালেরিয়া ও মশকের আশ্রয়দুর্গে পরিণত হইয়াছে। বর্ষাকালে কোনও কোনও বার নদীতে অল্প জল আসে, তখন নদীবক্ষ যৎসামান্য স্ফীত হইয়া উঠে মাত্র, তাহাতে নদীবক্ষঃসঞ্চিত স্থূল শৈবালরাশিও ভাসিয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর অন্তর এক একবার নদীতে বান আসে। পদ্মার উভয় কূল প্লাবিত করিয়া বর্ষার জলরাশি যেবার মাঠে প্রবেশ করে, সেইবার সেই বিপুল জলরাশি শত শত বিল, ঝিল, পয়োনালা ভাসাইয়া, খালের বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া ভৈরবে প্রবেশ করে; শত দিক হইতে শত ধারায় জল আসিয়া ভৈরবের সংকীর্ণ বক্ষ পূর্ণ করে; পদ্মা, ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী,—সকল নদীর সহিত ভৈরবের মিলন হয়, এবং এই সকল নদীর উচ্ছ্বসিত সলিলরাশি ভৈরবের শোভা ও সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করে।

এবার সেই অবস্থা। বোট চলিতে লাগিল। দেখিলাম, নদীজল উভয় কূল প্লাবিত করিয়া নদী তীরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রগুলি ডুবাইয়া পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বৎসরের অন্যান্য সময় পারঘাটার সন্নিহিত যে বটবৃক্ষমূলে গরুর গাড়ী রাখিয়া গাড়োয়ানেরা 'তিউড়ি' খুঁড়িয়া ভাত রাঁধিয়া খাইত, সেখানে এখন এক বাঁশ জল! বর্ষার জলস্রোত বটগাছের কাণ্ডে ও 'বয়া'-গুলিতে বাধিয়া কল-কল ছল-ছল শব্দে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঘাট-মাঝিদের চালাঘরখানি এক গলা জলে দাঁড়াইয়া আছে। সর্প, ভেক ও ইন্দুর তাহার চালে আশ্রয় লইয়াছে;—সকলেরই সমান বিপদ, তাই তাহারা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে!

প্রভাতে সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। বোটের দীর্ঘ মাস্তুলে দুইখানি পাল তুলিয়া দেওয়া হইল। পালে বাতাস লাগিয়া তাহা ফুলিয়া উঠিল; বায়ুবেগে বোট প্রতিকূল স্রোত ভেদ করিয়া, প্রভাত-বাত-বিক্ষুব্ধ নদীতরঙ্গ বক্ষে দলিয়া, ষ্টীমারের মত বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল; বোটের বক্ষঃস্থলে ও উভয় পার্শ্বে আহত তরঙ্গরাশির তর-তর কল-কল ছল-ছল ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হইতে লাগিল। আমরা হর্ষোচ্ছ্বসিতহৃদয়ে নদীর উভয় কূলের দিকে চাহিয়া তীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম, মধুর শারদ প্রভাতে মেঘ ও রৌদ্রের ছায়ালোক প্রতিফলিত পল্লীপ্রকৃতির সেই বর্ষাসজল শোভার তুলনা নাই।

কি দেখিলাম?—দেখিলাম, বর্ষার জল উভয় তীরে সংকীর্ণ গ্রাম্য ঘাটের

পথে বহু দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ঘাটের পথের দুই ধারে বাবলা গাছের বেড়া দেওয়া ধানের জমী, পাটের ক্ষেত, আম কাঁঠালের বাগান। বাব্লা গাছের শাখাগুলি পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে; ধান ও পাটগাছগুলি সলিল-সমাধিবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; অদূরবর্ত্তী কলাবাগানে এক বুক জল,—কলার ছোট ছোট 'তেড়'গুলি ডুবিয়া গিয়াছে—সুদীর্ঘ কদলীপত্রগুলি স্রোতের বেগে একবার ডুবিতেছে, একবার ভাসিয়া উঠিতেছে। সুবিস্তীর্ণ কাশ-ক্ষেত্রেও এক বুক জল; তাহার উপর রাশি রাশি কাশকুসুম বায়ুভরে বিকশিত হইতেছে; শত শত বিহঙ্গম কাশকুসুমের শুভ্র অগ্রভাব চঞ্চুপুটে লইয়া উড়িয়া যাইতেছে, এবং জলমধ্যে অর্দ্ধমগ্ন বাব্লা গাছের শাখায় তদ্দ্বারা শুভ্র সুকোমল নীড় রচনা করিতেছে।

পল্লীযুবতীগণ কলসী কক্ষে লইয়া দল বাঁধিয়া গল্প করিতে করিতে নদীতে স্নান করিতে আসিতেছে। কাহারও পরিধেয় বস্ত্র শেফালিকার কুসুম-বৃন্তের রঙ্গে রঞ্জিত; কেহ এক হাঁটু জলে বসিয়া মাটী দিয়া ঘড়া মাজিতেছে; কেহ দন্তমার্জ্জনের জন্য অঞ্চল হইতে ঘুঁটের ছাই খুলিতেছে; কেহ আবক্ষ জলে দণ্ডায়মান হইয়া মাথায় গামছা দিয়া কাপড় কাচিতেছে; কোনও চপলা পল্লীবালিকা ঘড়ার উপর ভর দিয়া অল্প জলে সাঁতার দিতেছে তাহার পায়ের জল কোনও স্নানরতা বর্ষীয়সী বিধবার মাথায় পড়িল, বিধবা বালিকাকে কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিল। অবগুণ্ঠনাবৃতা পল্লী-যুবতীরা উভয় কর্ণে তর্জ্জনী গুঁজিয়া 'ভুস' 'ভুস' করিয়া ডুব দিতেছে, কাহারও নাসিকায় নথ, কাহারও নাসিকায় নোলক। পল্লীবালকেরা একটু দূরে স্নান করিতে নামিয়া 'ডুব সাঁতার' দিতেছে, এক স্থানে ডুবিয়া দশ হাত তফাতে জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিতেছে, আবার ডুবিতেছে; অপেক্ষা-কৃত বয়োবৃদ্ধ বালকেরা নদীর স্রোতে গা ভাসাইয়া মধ্য-নদী দিয়া অন্য ঘাটে চলিয়াছে। মনে পড়িল, বাল্যকালে আমরাও এই ভাবে কূলপ্লাবিনী বর্ষার নদীতে ঘাটে ঘাটে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইয়াছি; আজ ইহাদের কাজ দেখিয়া মনে হইতেছে—এত সাহস ভাল নয়; বয়স হইলে মানুষ অধিক সাবধান হয়।

নদীর অপর পারে উচ্চ পাড়, পাড়ের নীচে 'হাঁড়োল'। জলরাশি সেখানে ক্রমাগত ঘুরিতেছে। স্রোতের বেগ সেখানে বড় প্রবল; ঘূর্ণিত জলে ঝাউ গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে; প্রভাত বাতাহত মৃদু-বিকম্পিত ঝাউ-শীর্ষ-

হইতে ক্রমাগত শর-শর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে ; নদীর ছল-ছল শব্দের সহিত ঝাউর মর্ম্মরধ্বনি মিশিয়া মধুর স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল ঝাউ গাছের নিম্নে পূর্ব্বে বাবুদের 'কামরা' ছিল, কামরার এখন চিহ্নমাত্র নাই, লতামণ্ডিত শৈবালাবৃত কৃষ্ণবর্ণ একটি জীর্ণ প্রাচীর 'বাবু'দের অতীত গৌরব ও পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সমাধির চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। স্থানটি এখনও 'কামরার বাগান' নামে খ্যাত। বাগানের অবস্থাও শোচনীয় ; কয়েকটি আম ও লিচু গাছের অগ্রভাগ উন্নতশীর্ষ ঝাউ বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরাল হইতে দেখা যাইতেছে। তাহার পাশেই খানিকটা উচ্চ পতিত জমী, কয়েকটি তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে দণ্ডায়মান। তালগাছে কাঁদি কাঁদি কালো তাল ফলিয়া আছে। একটা তাল গাছের মাথায় বসিয়া একটা চীল রোদ পোহাইতেছে. কি শিকারের সন্ধান করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না, মধ্যে মধ্যে বিদীর্ণকণ্ঠে 'চাঁ-ই-ই' শব্দে ডাকিয়া উঠিতেছে, তাহা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ বলিয়াই মনে হইল। ধোপা ও ধোপানীরা পাটে কাপড় আছড়াইতেছে, অন্য পার হইতে তাহার প্রতিধ্বনি আসিতেছে। খর্জ্জুর বৃক্ষের নিবিড় পত্ররাশির মধ্যে গোটাকত ছাতারে পাখী বসিয়া 'ক্যাঁচ ক্যাঁচ' শব্দে ডাকিতেছে, এবং একটি পক্ষী বৃক্ষপত্র হইতে উড়িয়া মাটীতে বসিলেই অন্যগুলিও তাহার অনুসরণ করিতেছে। ধোপারা রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া খোলা মাঠে মেলিয়া দিয়াছে ; প্রশস্ত মাঠ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত হইয়া শ্যামায়মান দূর্ব্বাদলের বৈচিত্র্য ভঙ্গ করিতেছে।

এই মাঠের পাশে পানের বরজ। তাহার চতুর্দ্দিকে জঙ্গল,—আম গাছ, জাম গাছ, তেঁতুল গাছ, শিমুল গাছগুলি নানাজাতীয় বনলতায় সমাচ্ছন্ন। অদূরে 'পোড়ো এড়ে'। এখানে অনেক ব্যাঘ্রের বাস, তাহারা দিবাভাগেই ছাগল বাছুর শিকার করে। বরজের মধ্যে সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা বারুইদের কিছুই বলে না! কোনও শিকারী ব্যাঘ্রশিকারে আসিলে বারুইরাও বাঘ দেখাইয়া দেয় না ; বাঘগুলিকে তাহারা বরজের রক্ষী মনে করে! বাঘের ভয়ে রাত্রে কেহ পান চুরী করিতে সাহস করে না।

'মর ঘাটী' অর্থাৎ শ্মশান-ঘাট অতিক্রম করিয়া নৌকা কালাচাঁদপুরের পারঘাটার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অন্যান্য সময় শ্মশান-ঘাটে শব-বহনের বংশদণ্ড, বাঁশের মাচা, ছেঁড়া কাঁথা, বালিস প্রভৃতি পড়িয়া থাকে ; এখন

বানের জলে সে সকল ভাসিয়া গিয়াছে। শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য অন্তর্হিত। খেয়াঘাটে খেয়ার নৌকা আরোহী লইয়া এক পার হইতে অন্য পারে যাইতেছে। খেয়া নৌকার উপর একখানি গরুর গাড়ী, গাড়ীতে বস্তা বস্তা আউস ধান, এক জন কৃষক এক আঁটি ঘাস মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, গোয়ালিনী দুধের ভাঁড় সম্মুখে লইয়া নৌকায় বসিয়া আছে; একটি রাখাল-বালক 'বুঁদি'র আগুনে গেঁটে কলিকায় তামাক সাজিতেছে; মাঝি নৌকার মাথায় বসিয়া নগি ঠেলিতেছে, নগিতে 'থই' না পাইলে হাল ধরিতেছে; আর একটি বালক অন্য দিকে বসিয়া একখানি জীর্ণ দাঁড় টানিতেছে, দাঁড়ের জল ছলাৎ ছলাৎ করিয়া নৌকায় উঠিতেছে; মাঝির পদপ্রান্তে একটি তালপাতার ছাতি পড়িয়া আছে।

পার-ঘাটার উপর অনেকখানি সমতল ক্ষেত্র। সেখানে কৃষকদের খামার। এমন সুপ্রকাণ্ড উৎকৃষ্ট খামার নিকটে আর কোথাও নাই। এই খামার উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া সেখানে নদীর জল উঠে না, রৌদ্র ও বায়ু-প্রবাহ অব্যাহত। কৃষকেরা আউস ধান কাটিয়া বিভিন্ন স্তূপে 'পালা' দিয়া রাখিয়াছে। ধান মাড়াই আরম্ভ হইয়াছে। রাশি রাশি সুপক্ব ধান্য-শীর্ষ বিছাইয়া, এক এক জন কৃষক পাঁচ ছয়টি বলদ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই ধানের উপর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে; বলদগুলি ধান মাড়িতে মাড়িতে নতমুখে 'পোয়াল' চর্ব্বণ করিতেছে; পিঠে পাঁচনের ঘা পড়িতেছে, কিন্তু তাহারা মুখ না তুলিয়াই ঘুরিতেছে; আর এক জন কৃষক 'মাথাল' মাথায় দিয়া 'কাঁদাল' দিয়া ধানের শীষগুলি উল্টাইয়া দিতেছে। স্থানে স্থানে পোয়ালের গাদা; কোথাও ধান শুকাইতেছে; কোথায়ও কৃষকেরা বড় বড় 'কুলা' ধানে পূর্ণ করিয়া ও উভয় হস্তে সেই কুলা মাথার ঊর্দ্ধে তুলিয়া, কুলার এক প্রান্ত কাৎ করিয়া, কুলাখানি ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতেছে, আর ধানগুলি অল্পে অল্পে নীচে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ধূলা, ময়লা ও 'চিটা'গুলি বায়ুপ্রবাহে উড়িয়া একটু দূরে সঞ্চিত হইতেছে। মাথায় ঝুঁটিবাধা গৈরিক-আলখেল্লাধারী বৈরাগীরা পায়ে নূপুর আঁটিয়া 'গাবগুবাগুব' ও খঞ্জনী বাজাইয়া খোলায় খোলায় গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে। আমরা দেখিলাম, দুই জন বৈরাগী কাঁধে লম্বা ঝুলি লইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া মোটা গলায় মেঠো সুরে গাহিতেছে,—

"বলে গেলিনে ব'লে রে ভাই, ভেবেছিলাম আমি চিতে,
দীনকে বুঝি ভুলে গেছে দিন পেয়ে সে রামামিতে!"—

মুগ্ধ অম্বরতলে, শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তরে, গ্রাম্য বৈরাগীগণের এই মেঠো গান পল্লীজননীর স্নেহোদ্বেলিত-রস-মাধুর্য্য-পূর্ণ অকপট হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইল; এবং সেই সঙ্গীত-তরঙ্গে আমাদের সহযাত্রী সেতারু মহাশয়ের সেতারের ঝঙ্কার ডুবিয়া গেল।

সম্মুখে কামদেবপুরের অপ্রশস্ত খাল। অন্যান্য ঋতুতে খালের গর্ভে বিন্দুমাত্র জল থাকে না, দীর্ঘ তৃণদলে, লতাগুল্মে, শেয়াকুল, কালকাসিন্দা, এরণ্ড প্রভৃতি গাছে খাল পূর্ণ থাকে; এবার দেখিলাম, বানের জলে খাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; জলরাশি উভয় কূল ছাপাইয়া বাগানে, ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষেতের শত শত বিঘা পক্কপ্রায় আউস ধান ডুবিয়া গিয়াছে; আর দুই দিন সময় পাইলে অধিকাংশ ধান কৃষকেরা ঘরে তুলিতে পারিত, কিন্তু এক রাত্রেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলরাশি আসিয়া মাঠ ডুবাইয়া দিয়াছে, কৃষকদের দীর্ঘকালের পরিশ্রম ও সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছে। যে স্থানের জমী অপেক্ষাকৃত উচ্চ, যেখানে একবুক জল, কৃষকেরা দলবদ্ধ হইয়া কাস্তে দিয়া সেই 'ডুবোধান' কাটিতেছে, এবং দুই একখানি ছোট ডিঙ্গীতে সেই ধান বোঝাই করিতেছে; কেহ কেহ ডিঙ্গীর অভাবে কলাগাছের মাড় আনিয়া তাহাই ধানে পূর্ণ করিতেছে। ডিঙ্গীগুলি ধান্যশীর্ষে পূর্ণ হইলে তাহারা তাহা গ্রামের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে,—ধান্যকর্ত্তনরত কোনও কোনও কৃষক বলিতেছে, "আরে ও সাঙ্গাৎ, এই বোঝাটা নিয়ে যা ভাই!" কিন্তু ডিঙ্গীতে সাঙ্গাতের দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই, ধানের বোঝার উপর দাঁড়াইয়া সে লগি ঠেলিতেছে। কবি হইলে সে হয় ত বলিতে পারিত,—

"স্থান নাই, স্থান নাই, ছোট এ তরী,
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

ধান গিয়াছে; খালের ধারে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাহারা অড়হর বপন করিয়াছিল। তাহাদেরও সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। অড়হর ক্ষেত্র জলপ্লাবিত অড়হরক্ষেত্রে জল উঠিলে গাছ কয়েক দিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। অড়হর এ অঞ্চলের প্রধান রবিশস্য।

খালে প্রবেশ করিয়া আমাদের বোটের পালে বেশী বাতাস পাইল। বোট তীরবেগে প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। সেতারু কেরাণী মহাশয় এতক্ষণ পিড়িং পিড়িং করিয়া সেতার বাজাইতেছিলেন, এইবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দুই জোড়া করতাল বিষম খচমচ আরম্ভ করিয়া দিল। গায়কেরা গাহিতে লাগিলেন,—

"সংকীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে !"

খালের উভয় পার্শ্বে বড় বড় তেঁতুলগাছ, বট পাকুড়ের গাছ, বাঁশের ঝাড়। বাঁশের অগ্রভাগ নত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছে, বড় বড় গাছের কাণ্ডগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে, শাখার চতুর্দ্দিকে জল থই থই করিতেছে। বেত বনে জল প্রবেশ করিয়াছে,—খর স্রোতে শর-শর শব্দ হইতেছে; উচ্চ পাড়ের উপর কৃষকগণের কুটীর, গোশালা, বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা গরুর খোঁয়াড়; খোঁয়াড়ের মধ্যে গোময়স্তূপ; কৃষকপত্নীরা গৃহপ্রাচীরে গোময়ের 'চাপাড়ি' দিতেছিল; গান শুনিয়া তাহারা সারি বাঁধিয়া খালের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সরল মুখে হাসি, চক্ষুতে বিস্ময় ও কৌতুক পরিস্ফুট। দুই এক জন রাখাল কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসিয়া 'হেঁসো' দিয়া গরুর জন্য 'গ্যামা' চুরাইতেছিল। চাষার ছেলে মেয়েরা উলঙ্গদেহে 'পাথি'তে জলপান লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত চর্ব্বণ করিতেছিল; তাহারাও খালের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রাখালেরা তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া তাহাদের পাচনের উপর ভর দিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। একটি বকুল গাছের নীচে এক বুক জল। বকুলের ডালে একখানি বোঝাই নৌকা বাঁধা, নৌকার কাছে কয়েকটি চাষার ছেলে মেয়ে জল-ক্রীড়া করিতেছিল; তাহারা আমাদের বোট দেখিয়া তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া সিক্তদেহে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন দৃশ্য তাহারা জীবনে এই প্রথম দেখিতেছে!—বোট দ্রুতবেগে পশ্চিম মুখে ইঁটাখালি গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। এতক্ষণ বেশ রৌদ্র ছিল; কোথা হইতে একখানি মেঘ আসিয়া সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল, খালের জলে মেঘের ছায়া পড়িল। আকাশের চারি দিকেই খণ্ড খণ্ড মেঘ, কোনওখানির বর্ণ শুভ্র, কোনওখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ,—রমণীর কৃষ্ণ কুন্তলরাশির ন্যায় বায়ুবেগে দূরে ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে।

সম্মুখে যত দূর দৃষ্টি চলে—কেবল জল! জলের মধ্যে বটগাছ, বাবলা গাছ, শিমুল গাছ ঊর্দ্ধে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাই পাথার!—পাথার লক্ষ্য করিয়া বোট চলিতে লাগিল। ইঁটাখালির নিকট বোট উপস্থিত হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা খালের ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। এই গ্রামের অধিকাংশ লোকই তন্তুবায়; তাহারা বড় কৃষ্ণভক্ত। সংকীর্ত্তন শুনিয়া গ্রামবাসীরা ভক্তিবিহ্বলচিত্তে সংকীর্ত্তনকারীদের

প্রণাম করিতে লাগিল। রাজহংসবৎ শুভ্র বোটখানি মুক্তপক্ষে জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে—আর বোটের আরোহিগণ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ভক্তি-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে—এ দৃশ্য বোধ হয় তাহাদের নিকট নূতন।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র; নানাজাতীয় পুরাতন বৃক্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। বোটের উপর হইতে বৃক্ষান্তরালপথে দুই চারিখানি মৃৎকুটীর দেখিতে পাইলাম মাত্র। বোট হইতে গ্রামের আভ্যন্তরিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেল না। খালের উভয় তীর সতেজ শ্যামল বৃক্ষে ও জঙ্গলে আবৃত।

বেলা প্রায় বারোটার সময় বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইল। বোটের গতি মন্থর হইয়া আসিল। আমরা পাল নামাইয়া চারিখানি দাঁড়ের সাহায্যে বোট চালাইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভাটুপাড়া নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামখানি বন্ধুর জমীদারী। এখানে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী আছে।

এখানে আহারের আয়োজন করাই সঙ্গত মনে হইল। কিন্তু কোথায় রন্ধন হইবে? চারি দিক পাথার, সর্ব্বস্থান ডুবিয়া গিয়াছে। খালের ধার হইতে গোলাবাড়ী কিছু দূরে। রসদপত্র সেখানে টানিয়া লইয়া গিয়া রন্ধনাদির আয়োজন করা অনেকেই সঙ্গত মনে করিলেন না।

খালের ধারে বাঁশের বাগান। কয়েকটি বৃদ্ধ আমগাছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাবলা গাছ ও কালকাসিন্দার গুল্ম। স্থানটি অত্যন্ত 'নোংরা', সেঃস্থানে বসিয়া কাহারও আহারের প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ একটা বুদ্ধি যোগাইল। আমরা যে স্থানে বোট ভিড়াইয়াছিলাম, সেইখানে পাঁচ শত মণ বোঝাই লইতে পারে, এরূপ একখানি বৃহৎ নৌকা খালি পড়িয়াছিল। সেই নৌকাখানিকে রন্ধনশালায় পরিণত করাই সকলের সঙ্গত মনে হইল।

তখন সেই নৌকায় রসদের নৌকা হইতে উনন দুটি তুলিয়া লওয়া গেল। বন্ধুর কর্ম্মচারী অধিকারী রন্ধন-বিদ্যায় ওস্তাদ; তিনি একাকী দুই শত লোকের পোলাও গলাইতে পারেন। তিনি রন্ধনের সকল ভার লইয়া আমাদের নিশ্চিন্ত করিলেন। প্রচুর কাঠ আনীত হইয়াছিল; কতকগুলি তরকারীও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। অধিকারী ঠাকুর পূর্ব্বেই তরকারীগুলি কুটিয়া রন্ধনোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। সঙ্গে হাতা, বেড়ী, হাঁড়ি, ডেগচী, তেল, ঘি, মশলা,—সকলই আসিয়াছিল। সেই খড় নৌকায় মহাসমারোহে রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল।

সংকীর্ত্তনকারীরা বলিলেন, তাঁহারা আতপান্ন 'সেবা' করিবেন। অগত্যা তাঁহাদের জন্য আতপ চাউলের খিচুড়ীর ব্যবস্থা হইল। আমাদের ন্যায় ভক্তিহীন পাষণ্ডের জন্য উষ্‌না চাউলের ভাত, ডাল, তরকারীর বন্দোবস্ত। কিন্তু ক্ষুধানল সকলেরই উদরে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। এক কলসী মুড়ী দেখিতে দেখিতে উদর-গহ্বরে আশ্রয় লাভ করিল! কয়েক সের রসগোল্লা আসিয়াছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। আরও কিছু চাই!

বন্ধু প্রমাদ গণিলেন! তিনি আমাদের host, অতিথিসৎকার তাঁহার কুলধর্ম্ম। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া গোলাবাড়ীর গোমস্তা মুহুরীদের ডাকাইয়া আনিলেন। অবিলম্বে মুড়ী এক কাঠা ও কতকগুলি শশা ও লঙ্কা মরিচ আনিবার হুকুম হইল।

আধঘণ্টার মধ্যে এক কাঠা মুড়ী, দশ বারোটি শশা, দুই মুঠা লঙ্কা মরিচ আসিল। তিন চারিটি নারিকেল ভাঙ্গা হইল। আবার পূরাদমে 'ব্রেকফাষ্ট' চলিতে লাগিল। জলের উপর ক্ষুধানল কেরোসিন-সংস্পর্শে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। নৌকার মাঝি মাল্লারাও কোঁচড় ভরিয়া মুড়ি খাইল। বাদ থাকিলেন কেবল অধিকারী ঠাকুর। অতিথিসেবা না হইলে তিনি জল-গ্রহণ করিবেন না।

খালের ধারে আম্রবৃক্ষমূলে চেয়ার পাতিয়া আমরা দুই বন্ধু বিশ্রাম করিতে বসিলাম। অভিনব পল্লীদৃশ্যে চক্ষু জুড়াইয়া গেল। বাঁশবনে বসিয়া ঘুঘু ডাকিতেছে, দহিয়াল শিষ্‌ দিতেছে, পাপিয়া প্রেমসঙ্গীত গাহিতেছে। পদতলে জলস্রোতের অশ্রান্ত ধ্বনি। মাথার উপর বৃক্ষচ্ছায়া, শীতল ও স্নিগ্ধ। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। পল্লীরমণীরা খালের জলে স্নান করিতে আসিতেছে; তাহাদের কলকণ্ঠের হাস্যে খালতীর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহাদের জীবন কি সুখের! কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, অভাবের অতৃপ্তি নাই; ঐ জলস্রোতের ন্যায় তাহাদের সরল, আড়ম্বর-বিহীন, আবিলতা-বর্জ্জিত জীবন একই ভাবে কাটিয়া যাইতেছে; এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহাদের পৃথিবী; তাহাদের জীবনের সকল কামনা, সকল সুখ, সকল চিন্তার অবলম্বন—তাহাদের ঐ ক্ষুদ্র কুটীরগুলি। এমন জীবন কি আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে?

খালের ধারে আমগাছের ছায়ায় বসিয়া মনে হইল, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি! কিন্তু সে স্বপ্ন অধিক কাল স্থায়ী হইল না। বোটের অধিকাংশ আরোহী
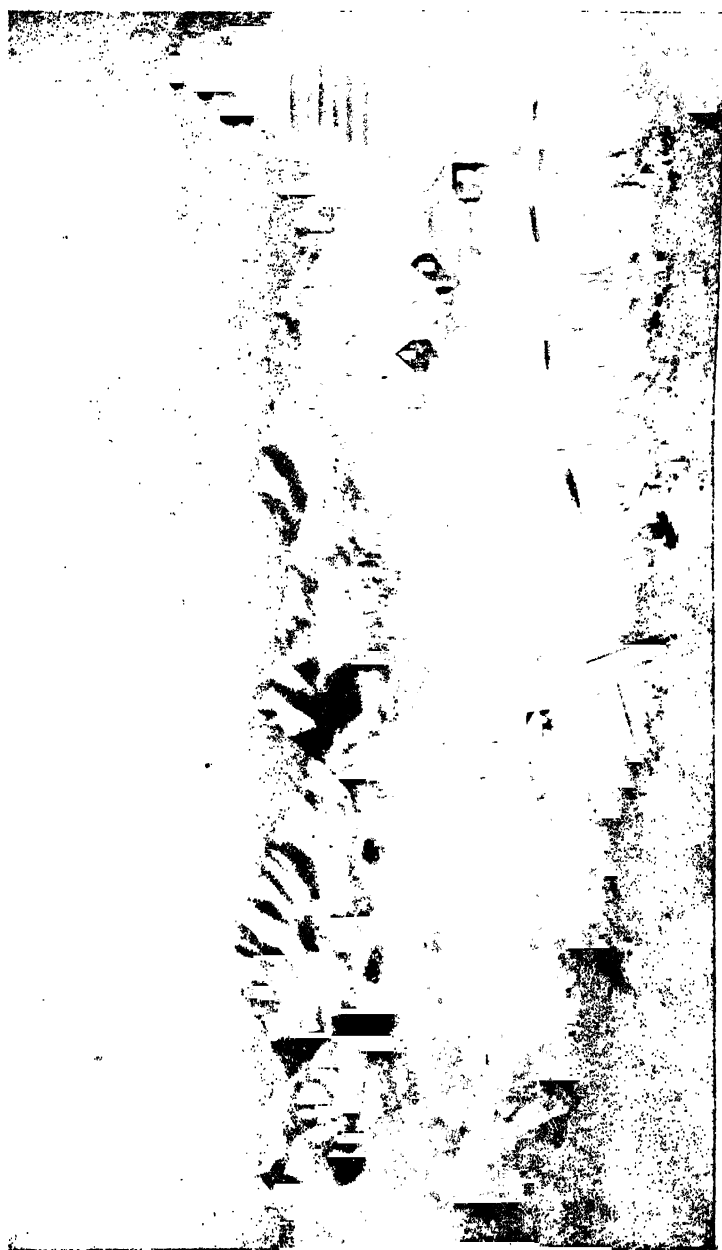
মুড়ি 'ফাঁকাইয়া', শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া, নাসিকা গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গ্রামের দফাদার আমাদের আহারের অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দশ বারোটা কাঁসার গেলাস ও ডজন খানেক বাটি লইয়া আসিল। টাট্‌কা সর্ষপ তৈলও অনেকখানি আসিল। বন্ধুর ভৃত্য তাঁহার ভুঁড়িতে মহা উৎসাহে তেল মাখাইতে লাগিল। আমি গায়ে মাথায় খানিকটা তেল লেপিয়া খালের জলে লাফাইয়া পড়িলাম। কেমন শীতল জল! বানের জল হইলেও তেমন পঙ্কিল নহে। সে জল হইতে শীঘ্র উঠিতে ইচ্ছা হইল না; কিন্তু যখন শুনিলাম, জলে কুমীর দেখা দিয়াছে, তখন আর অধিকক্ষণ জলে থাকিতে সাহস হইল না। স্নান করিয়া তেমন তৃপ্তি বহু দিন লাভ করি নাই।

বন্ধুর সকল কার্য্যেই মৌলিকতা, এমন কি স্নানে পর্য্যন্ত! ঘণ্টা খানেক ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিস করিয়া তিনি রন্ধনের বড় নৌকায় পদক্ষেপ করিলেন। নৌকার লাঙ্গুল হইতে একটি বাঁশের দোলা জলে নামাইয়া দেওয়া হইল; তিনি স্নান করিবার জন্য সেই দোলার উপর বসিলেন;—কটিদেশ পর্য্যন্ত জলের নীচে, অবশিষ্ট দেহ উর্দ্ধে। এই ভাবে বসিয়া গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "খুদীরাম, গড়গড়া আন্।" ভৃত্য নৌকায় গড়গড়া লইয়া গিয়া দীর্ঘ নলটি তাঁহার হাতে দিল, তিনি স্নান ও ধূমপান এক সঙ্গে চালাইতে লাগিলেন! সেই সময় তাঁহার একখানি ফটো তুলিয়া বিলাতের কোনও মাসিকের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারিলে, তাহা উদ্ভট সামগ্রীর তালিকা-ভুক্ত হইয়া অনেক দামে বিক্রীত হইতে পারিত।

রন্ধন শেষ হইতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিল। গোলাবাড়ীর গোমস্তা আমাদের প্রতি বড় সদয়! সে কতকগুলি কাগজী লেবু, আধ সের স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট টাট্‌কা গব্যঘৃত, এক বাটি ঘোল ও এক বোঝা কলাপাতা লইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া বড় নৌকায় আসিল।

নৌকার ভিতর বাঁশের পাটাতন বিছাইয়া আরোহিগণ কলাপাতায় আহারে বসিলেন। আতপের খিচুড়ী যাঁহাদের, তাঁহারা এক দিকে বসিলেন; ভাত ডালের প্রার্থীরা অন্য দিকে বসিলেন। আমরা দুই জন অতিরিক্ত বুদ্ধিমান;—নৌকার ভিতরে গরম লাগিবে বলিয়া ছাউনীর বাহিরে মাচার উপর বসিলাম।

অধিকারী রাঁধিয়াছিলেন যেন অমৃত! 'চড়চড়ি'র ডাঁটা যেন ইন্দ্রের নন্দন-

কানন হইতে আমদানী, আর সূর্য্যি-কুমড়োই বা মিষ্ট কত? বিশেষতঃ, মুগের ডালে সেই টাট্‌কা সুগন্ধপূর্ণ গব্য ঘৃত—যেন গাঢ় ক্ষীরের উপর মর্ত্তমান রম্ভা!—ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর তুলনা সে সময় মনে আসিল না। কিন্তু আমাদের অতিবুদ্ধির ফল ফলিল। ডালমাখা ভাতগুলি উঠিয়াছে, এমন সময় ঝম্ ঝম্ শব্দে মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। "ছাতা আন্, ছাতা আন্, কি বিপদ! এখনও যে ঘোল বাকি!" বাবু বলিলেন, "যা থাকে কপালে, ঘোল না খাইয়া উঠিতেছি না, ভিতর বাহির দুই ঠাণ্ডা হইয়া যাক্।" ডাক্তার ছাউনির ভিতর হইতে হাঁকিলেন, "তাহা হইলে বিকারে ধরিবে।" ছাউনির ভিতর যাঁহারা খাইতে বসিয়াছিলেন, আমাদের বুদ্ধির বহর দেখিয়া তাঁহারা বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

ছাতি মাথায় দিয়া আহার শেষ করিয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় বোটের ভিতর আশ্রয় লইলাম। বিষের ভয়ে তাম্বূলচর্ব্বণ বন্ধ, বন্ধুর একটা ব্যয় বাঁচিয়া গেল! সুপারী চর্ব্বণ করিতে করিতে কেহ কেতাব লইয়া বসিলেন, কেহ গল্প জুড়িয়া দিলেন, সেতারু মহাশয় এক কোণে বসিয়া পিড়িং পিড়িং আরম্ভ করিলেন। মাঝি ও চাকরদের আহার শেষ হইতে তখনও অনেক বিলম্ব। অধিকারী মহাশয় আবার এক হাঁড়ী ভাত চড়াইয়াছিলেন।

মাঝিদের আহার শেষ হইতে সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহারাদি শেষ হইলে অধিকারী মহাশয় রসগোল্লার রস, লেবু, ঘোল ও খালের জলের সহযোগে চমৎকার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিলেন! আহারের পর অনেক ঘোল উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এই ভাবে তাহার সদ্ব্যবহার হইল।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাথারের দিকে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আকাশে তখনও মেঘ ছিল। এবার দাঁড়ে নৌকা চলিতে লাগিল। সম্মুখে রাত্রি, পথ অজ্ঞাত, পালভরে নৌকা চলিতে চলিতে বট গাছেই বাধিবে, কি বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করিবে, তাহা স্থির করা কঠিন। অমাবস্যার রাত্রে মাঝিরা পাল খাটাইতে সাহস করিল না; আমাদেরও বিপন্ন হইবার ইচ্ছা ছিল না।

রাত্রি প্রায় আটটা পর্য্যন্ত পাথারে ঘুরিয়া, রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ও দিক্‌ভ্রান্ত হইবার ভয়ে আমরা নৌকা ঘুরাইয়া দিলাম। অনুকূল স্রোতে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত আকাশ, নিম্নে জল-স্থল সমস্তই তিমিরাবৃত; দৈবাৎ তটস্থ কোনও কৃষকের কুটীর হইতে মৃদু দীপালোক অরণ্যের অন্তরালপথে নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, এবং চলিতে

চলিতে কোনও জেলে ডিঙ্গী হইতে মৃৎপ্রদীপের আলোকচ্ছটা নদীজলে বহু দূর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইতে দেখা যাইতেছিল। অনন্ত আকাশতলে অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ধূসর অরণ্যশ্রেণী নিস্তব্ধভাবে যেন বিশ্বদেবতার আরাধনায় রত।

একটি সুকণ্ঠ বন্ধু হারমোনিয়ম লইয়া ভাবাবেশে গান ধরিলেন,—

"প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসায়ো না যমুনা-সলিলে!"

বোটের ছাদে শয়ন করিয়া এই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কখন নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, স্মরণ নাই। গানের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ের ঝুপঝুপ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রকৃতি জননী নদীবক্ষঃপ্রবাহিত সুশীতল মুক্ত সমীরণহিল্লোলে যেন আমাদিগকে বীজন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইঁটাখালী গ্রামস্থিত বৈষ্ণবদের আখড়া হইতে মৃদঙ্গ-ধ্বনিসহযোগে যে মধুর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তাহা মধুর স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমাদের গ্রামপ্রান্তস্থ থানার ঘাটে নৌকা লাগিয়াছে। লণ্ঠনের আলোতে ঘড়ি খুলিলাম, তখন রাত্রি দশটা। ঝিল্লীধ্বনি-মুখরিত, অন্ধকারসমাচ্ছন্ন, কর্দ্দমাক্ত সংকীর্ণ বনপথ দিয়া ত্রস্তপদে গৃহে ফিরিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেশদ্রোহী।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী কোনও পল্লীতে গার্সিয়া ডি প্যারেডে নামক জনৈক সনন্দপ্রাপ্ত ভৈষজ্য-বিক্রেতা বাস করিত। ঔষধাদি ব্যতীত বিবিধজাতীয় সর্প, ভেক ও বৃষ্টির জল প্রভৃতিও তাঁহার দোকানে বিক্রীত হইত। প্যারেডে চিরকুমার ও ঘোরতর মানবদ্বেষী ছিলেন। শুনা যায়, তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক মুষ্ট্যাঘাতে একটি বৃষ বধ করিয়াছিলেন।

হেমন্তের অপরাহ্ন—শীত অত্যন্ত প্রবল, আকাশে ঘোর দুর্য্যোগের চিহ্ন প্রকটিত। মেঘে মেঘে গগনমণ্ডল ছাইয়া গিয়াছে। কোথাও আলোকের রেখামাত্র নাই। পল্লী, প্রান্তর ও পথ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এই ঘোর দুর্য্যোগে, ভীষণ রজনীর অন্ধকারে, রাত্রি দশ ঘটিকার সময় "কনষ্টিউসন প্লেস্" নামক স্থানে কতিপয় ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল। সেই ঘনান্ধকারে তাহাদের মূর্ত্তি আরও বিভীষণ দেখাইতেছিল। ছায়ামূর্ত্তিগুলি ধীরে ধীরে গার্সিয়া ডি প্যারেডের দোকানের অভিমুখে অগ্রসর হইল। রাত্রি আট ঘটিকার পূর্ব্বেই দোকানের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

একটি ছায়ামূর্ত্তি বলিল, "এখন কি করা যায়?"

আর এক জন বলিল, "বোধ হয়, আমাদিগকে কেহ দেখিতে পায় নাই।"

রমণীকণ্ঠে কেহ বলিল, "দরজা ভাঙ্গিয়া ফেল।"

তখন পনর কুড়ি জন সমস্বরে, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "সবাইকে মারিয়া ফেল।"

জনৈক বালক বলিল, "ডাক্তারটার ভার আমার উপর রহিল।"

"ব্যাটা যেন কশাই, সুদখোর ইহুদী!"

"ঘোরতর ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক!"

"বিশ জন ফরাসী সৈনিকপুরুষ আজ নাকি উহার দোকান-ঘরের মধ্যে বসিয়া ভোজন করিতেছে। ডাক্তার উহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে।"

"কথাটা ঠিক বটে। একা আসিলে পাছে বিপদ ঘটে, তাই দল বাঁধিয়া আসিয়াছে।"

"হায়! আজ যদি উহাদিগকে আমার গৃহে পাইতাম! কয়েক জন সৈনিক সেদিন আমার বাড়ীতে বাসা লইয়াছিল। তিন জনকে কৌশলে আমি কূপের জলে ডুবাইয়া মারিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী কাল রাত্রিকালে এক জন ফরাসী সৈনিকের গলায় ছুরী মারিয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে।"

জনৈক সন্ন্যাসী বলিলেন, "কয়েক দিবস হইল, আমি দুইটি সৈনিককে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি। তাহারা আমার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল। যখন দুই জনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই সময়ে আমি কয়লা ধরাইয়া দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম; খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া গিয়া দেখি, দুই জনেই মরিয়া কাঠ হইয়া আছে!"

"দেখ দেখি ভাই, সকলেই শত্রু-বধের জন্য কত রকম কৌশল করিতেছে, আর এই বৈদ্য ব্যাটা কি না উহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেছে?"

"হতভাগা কাল যখন সৈনিকদিগের সঙ্গে যাইতেছিল, তখন উহাদিগের কত তোষামোদই করিতেছিল!"

"গার্সিয়া ডি প্যারেডে যে এমন কাজ করিবে, ইহা আগে কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! এক মাস পূর্ব্বে সেই ত সকলের অপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কি স্বদেশপ্রীতি! কি উৎসাহ! গ্রামের মধ্যে তার চেয়ে কেহই ত দেশের রক্ষার জন্য অধিক যত্ন করে নাই!"

"সে ঠিক কথা। তখন সে রাজা ফার্দ্দিনন্দের চিত্র বিক্রয় করিত।"

"আর এখন সে নেপোলিয়নের ছবি বেচিতেছে!"

"শত্রু-সৈন্যের গতিরোধের জন্য সেই ত আমাদিগকে প্রথম উৎসাহিত করিয়াছিল।"

"এখন তাহারা যেই দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, অমনই সে উহাদের দলে মিশিয়াছে!"

"সমস্ত সামরিক কর্ম্মচারীকে সে আজ ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছে।"

"ঐ শুন ভাই, দোকানের মধ্য হইতে সম্রাট নেপোলিয়নের জয়ধ্বনি উঠিতেছে!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না, ধৈর্য্য ধর। এখনও ঠিক সময় হয় নাই।"

এক রমণী বলিল, "দাঁড়াও, আগে সব মাতাল হইয়া পড়ুক। তখন দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া সকলকেই নিকাশ করিতে হইবে। কেহ যেন পলায়ন করিতে না পারে।"

জনতার মধ্য হইতে এক জন চীৎকার করিয়া বলিল, "প্যারেডেকে চার-টুকরা করিয়া কাটিব।"

"চার-টুকরা!—আট টুকরা করিতে হইবে। পাকা ফরাসী অপেক্ষা, ফরাসী-ভাবগ্রস্ত স্পানিয়ার্ড অধিক ঘৃণার্হ। ফরাসীরা নির্দ্দোষ অধিবাসীদিগকে পদদলিত করিতেছে, কিন্তু স্পেনের সন্তান স্বদেশকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিতেছে, শত্রুকে সহানুভূতি করিতেছে। এমন স্পানিয়ার্ড দেশের কলঙ্ক, দেশবাসীর শত্রু। ফরাসী নরহত্যাকারী, কিন্তু দেশদ্রোহী স্পানিয়ার্ড পিতৃহন্তা!"

* * * * *

দোকানের বাহিরে যখন উক্তরূপ ব্যাপার ঘটিতেছিল, তখন গার্সিয়া ডি প্যারেডে অতিথিবর্গ সহ গৃহমধ্যে বসিয়া পরমানন্দে পান-ভোজনে ব্যাপৃত।

সত্যই বিশ জন সামরিক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্যারেডের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চচত্বারিংশ হইবে। আকৃতি দীর্ঘ ও কৃশ; বর্ণ ঈষৎপীতাভ। কোটরগত কৃষ্ণতারক নয়নের দৃষ্টি গভীর। ললাটদেশ মসৃণ ও প্রশস্ত।

ভোজের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য টেবিলের উপর শোভা পাইতেছিল। সুরাও উৎকৃষ্টজাতীয়। নিমন্ত্রিতগণ অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে গল্প করিতেছিলেন। হাস্য, কৌতুক ও সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন পানীয় চলিতেছিল।

জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী নেপোলিয়নের কোনও গুপ্ত দোষের উল্লেখ করিলেন। অপর এক জন মাদ্রিদ নগরের স্মরণীয় ২রা মে তারিখের ঘটনার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পিরামিডের যুদ্ধ, ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের বিষয়ও আলোচিত হইল।

গার্সিয়া ডি প্যারেডেও সুরাপান করিতেছিল। অতিথিবর্গের ন্যায় সেও হাসিতেছিল, বকিতেছিল। সময়ে সময়ে তাহার হাস্যধ্বনি নিমন্ত্রিতগণের উচ্চহাস্যকেও ডুবাইয়া কক্ষমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সম্রাট নেপোলিয়নের সে যেরূপ প্রশংসা করিতেছিল, তাহাতে ফরাসী সৈনিক পুরুষেরা তাহাকে মাথায় রাখিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ফরাসীদিগের এই ব্যবহারে সে মহা আনন্দিত হইল।

সে বলিল, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমার স্বদেশবাসী স্পানিয়ার্ডরা আপনাদিগের কার্য্যে বাধাদান করিতে উদ্যত হইয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে। আপনারা বিপ্লবপন্থী! স্পানিয়ার্ডদিগকে জড়তাময় নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত, সমগ্র দেশ হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত ঘন-তিমির-জাল ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, আমাদিগের প্রাচীন রীতি নীতির পরিবর্ত্তন-সাধন, নাস্তিকতা-প্রচার, এ জীবনের পর অন্য জীবন নাই, ব্রত, উপবাস, মিতাচার প্রভৃতি কুসংস্কার,—সভ্যজাতির নিতান্ত অনুপযুক্ত,—এই শিক্ষা দিবার জন্য মহাশয়দিগের এ দেশে শুভাগমন হইয়াছে। আপনারা আমাদিগকে বুঝাইতে আসিয়াছেন যে, সম্রাট নেপোলিয়নই ঈশ্বরের অবতার, সমগ্র জাতির পরিত্রাতা, এবং মানবজাতির একমাত্র বন্ধু। ভদ্রমহোদয়গণ! সম্রাট চিরজীবী হউন!"

সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ সমস্বরে, উৎসাহভরে বলিলেন, "সাবাস্, ভাই!"

ভৈষজ্য-বিক্রেতা নতমস্তকে সে প্রশংসাবাদ গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার আননে উৎকণ্ঠার চিহ্ন কেন?

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে মস্তক উন্নত করিল। তখন তাহার মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ হাস্যদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল। একপাত্র মদিরা পান করিয়া সে বলিল,—

"আমার কোনও পূর্ব্বপুরুষ হারকিউলিসের ন্যায় জোয়ান, ভয়ঙ্কর বর্ব্বর ও গোঁয়ার ছিলেন। তিনি এক দিন দুই শত ফরাসীর জীবনসংহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইতালীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি আমার ন্যায় ফরাসীদিগের অনুরক্ত ছিলেন না! মূর যুদ্ধে তিনি বড়ই প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহাকে আলেকজন্দর বার্গিয়ার রক্ষাকল্পে ইতালীতে প্রেরণ করেন। প্যাডিয়ার যুদ্ধে জনৈক ফরাসা নৃপতিকে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন। তাঁহার তরবারি তিন শতাব্দী ধরিয়া মাদ্রিদের ধর্ম্মমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ হইল, মুরাট নামক জনৈক ফরাসী উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্যারেডে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারীর মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভৈষজ্য-বিক্রেতার ব্যবহারে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে, কেহ সহসা তাহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। পানপাত্র তুলিয়া লইয়া সে বলিল, ভদ্র মহোদয়গণ! আমার এই পূর্ব্বপুরুষ অতি বর্ব্বর ছিলেন। তিনি এখন অতীতের অন্ধতমোময় গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। আসুন, আমরা এখন প্রথম ফ্রান্সিসের সেনাদল ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টির স্বাস্থ্যকামনায় আসব পান করি।"

বক্তৃতার শেষাংশ শ্রবণে সৈনিকপুরুষদিগের মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল। হর্ষোল্লাসসহকারে তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

পানপাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে শূন্য হইয়া গেল।

রাজপথে, দোকানের সম্মুখভাগে তখন একটা গোল উঠিল।

জনৈক সৈনিকপুরুষ চমকিতভাবে বলিলেন, "ও কি?"

প্যারেডে নীরবে হাস্য করিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "উহারা আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে!"

"উহারা কাহারা?"

"গ্রামবাসীরা।"

"আমাকে ফরাসী-পক্ষাবলম্বী দেখিয়া উহারা উত্তেজিত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উহারা আমার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। যাক্, তা'তে আর কি হ'বে? আসুন, আমাদের ভোজ শেষ করা যাউক।"

কতিপয় সুরাপ্রমত্ত সেনানী বলিলেন, "হাঁ সেই ভাল। আত্মরক্ষায় আমরা অসমর্থ নহি। আসুক না, তখন দেখা যাবে।"

পানপাত্রের ঠুন্ ঠান্ শব্দ আরব্ধ হইল।

"জয়, নেপোলিয়নের জয়। ফার্দ্দিনান্দ জাহান্নমে যাউক! স্পানিয়ার্ড-দিগকে মারিয়া ফেল।" ইত্যাদি শব্দে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

গোলমাল, চীৎকার কিছু কমিলে ভৈষজ্য-বিক্রেতা ডাকিল, "সেলি-ডেনিও!"

বিবর্ণমুখে, কম্পিতকলেবরে ভৈষজ্যবিক্রেতার সহকারী সেলিডেনিও কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্যারেডে বলিল, "কাগজ, কলম ও কালী লইয়া আইস।"

সহকারী মস্যাধার ও কাগজ সহ ফিরিয়া আসিল।

ভৈষজ্য-বিক্রেতা বলিল, "আমার পার্শ্বে ব'স। যাহা লিখিতে বলি, লিখিয়া যাও। দু'টা ঘর কর। দক্ষিণ দিকের ঘরের উপরে লেখ 'খরচ', বাম দিকে 'জমা'।"

কম্পিতকণ্ঠে সহকারী বলিল, "মহাশয়, বড়ই বিপদ। গ্রামবাসীরা বাহিরে জমায়েৎ হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে,—'দেশদ্রোহীকে মারিয়া ফেল! এতক্ষণ বোধ হয় দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।"

"ও দিকে কান দিও না। আমি যা বলি, তাই লিখিয়া যাও।"

সেনানীগণ পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন! সম্মুখে আসন্ন ধ্বংস ও মৃত্যু; অথচ লোকটা তখন আয় ব্যয়ের তালিকা, দোকানের হিসাব-পত্র লইয়া ব্যস্ত!

প্রভুর আদেশমত সেলিডেনিও কাগজ কলম লইয়া বসিল।

অতিথিবর্গের দিকে ফিরিয়া, চিন্তিতভাবে প্যারেডে বলিল, "গোড়া থেকেই আরম্ভ করা যাক্। আপনি ত সেনাপতি? আচ্ছা, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এ যাবৎ আপনি স্বহস্তে কতগুলি স্পানিয়ার্ডকে মারিয়াছেন?"

চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া, গুম্ফে তা দিতে দিতে সেনাপতি বলিলেন, "আমি?—সম্ভবতঃ দশ বার জন।"

ভুটিয়া ভিক্ষু

ART PRESS

সহকারীর দিকে ফিরিয়া প্যারেডে বলিল, "ডান দিকের ঘরে লেখ—এগারো।"

সৈনিকপুরুষেরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

ভৈষজ্য-বিক্রেতা সে দিকে লক্ষ না করিয়াই বলিল, "সহকারী সেনাপতি মহাশয়! আপনি কয় জনকে নিহত করিয়াছেন?"

"প্রায় ছয় জন।"

"আমি বিশ জন।"

"আমার নামে লিখুন, আট জন।"

একে একে প্রত্যেক সৈনিকপুরুষ এক একটা সংখ্যার উল্লেখ করিয়া গেলেন।

সহকারী যেমন শুনিতেছিল, তেমনই সংখ্যা ফেলিয়া যাইতেছিল।

লেখা শেষ হইলে প্যারেডে বলিল, "আবার আরম্ভ করা যাক্। সেনাপতি মহাশয়! আচ্ছা, যদি যুদ্ধ আরও তিন বৎসর চলে, তাহা হইলে আপনি আরও কয় জন স্পেন-বাসীকে হত্যা করিবেন?"

সেনাপতি বলিলেন, "কে বলিল, এত দিন যুদ্ধ চলিবে?"

"আমার অনুমানমাত্র! মোটামুটি একটা হিসাব করিতেছি।"

"বোধ হয় আরও এগারো জন।"

"সেলিডেনিও! বাম দিকের ঘরে লেখ এগারো। তার পর, মহাশয়, আপনি?"

পর্য্যায়ক্রমে ভৈষজ্য-বিক্রেতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। কিন্তু অতিথিদিগের মস্তিষ্ক তখন ঠিক ছিল না। কেহ কেহ অতিরিক্ত, অসম্ভব সংখ্যার উল্লেখ করিতেছিল।

কেহ বলিল, বিশ, কেহ পঞ্চদশ, কেহ শত! কেহ বা বলিল, সহস্র!

গার্সিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "সেলিডেনিও, প্রত্যেকের নামে দশ দশ করিয়া লিখিয়া যাও। বেশ! এইবার দুই দিকেই ঠিক দাও।

বেচারা সহকারী আতঙ্কে কাঁপিতেছিল। তাহার মস্তিষ্ক কাজ করিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু তথাপি যন্ত্রচালিতবৎ সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিল।

কক্ষমধ্যে ভীষণ নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেলিডেনিও বলিল, "খরচ দুই শত পঁচাশী, জমা দুই শত।"

"অর্থাৎ, দুই শত পঁচাশী জন ইতিমধ্যে মরিয়াছে! আরও দুই শতের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহারাও শীঘ্র মরিবে। মোট সংখ্যা চারি শত পঁচাশী।"

যে স্বরে প্যারেডে বলিতোছল, তাহাতে সেনানীদিগের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

ভৈষজ্যবিক্রেতা উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমরা বীর-পুরুষ! আজ আমরা সত্তর বোতল মদ পান করিয়াছি! অর্থাৎ এক শত চল্লিশ পাঁইট সুরা—মাথা পিছু সাত বোতল। আমরা যদি বীর নহি,—তবে কি?"

বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাহিরের দ্বার ভগ্ন হইল। সেলিডেনিও বিবর্ণমুখে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ভগবন্! রক্ষা কর! ঐ তাহারা ঘরে ঢুকিয়াছে!"

অসীম ধৈর্য্যসহকারে, প্রশান্তস্বরে প্যারেডে বলিল, "রাত্রি কত?"

"এগারটা বাজিয়া গিয়াছে!—কিন্তু উহারা যে এখনই আসিয়া পড়িবে?"

"আসুক। এই সময়েই আমি উহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

দুই তিন জন সেনানী উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মত্ততা-বশতঃ উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্খলিতচরণে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

"কেহ কেহ টেবিলে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "আসুক না কেন, আমরাও প্রস্তুত আছি।"

তখন দোকানের মধ্যে অভিশাপ, গালাগালি ও চীৎকার ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীকে মারিয়া ফেল।"

পল্লীবাসীদিগের কণ্ঠস্বরে গার্সিয়া সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আননে আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, বিজয়-উল্লাসে নয়নযুগল জ্বলিতেছিল। গম্ভীরস্বরে সে বলিল, "ফরাসীগণ! আপনাদের মধ্যে কেহ যদি এরূপ সুযোগ পাইতেন যে, তাহাতে আপনাদের দুই শত পঁচাশী জন স্বদেশবাসীর জীবননাশের প্রতিশোধ লইতে পারেন, এবং আরও দুই শত দেশবাসীর জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আপনারা সেই শত্রুদিগকে শাস্তি দিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন? তাহাতে যদি

নিজের জীবনও বিসর্জ্জন দিতে হইত, জাতীয় স্বাধীনতা ও দুই শত স্বদেশী বীরের জীবনরক্ষাকল্পে কি আপনারা তুচ্ছ আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন? দেশের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় জীবন কি বিসর্জ্জন করিতেন না?"

সৈনিকপুরুষেরা পরস্পরের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "লোকটা বলে কি হে?"

"প্রভু! আর রক্ষা নাই! আমরা গিয়াছি। তাহারা এই ঘরের দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।"

"দরজা খুলিয়া দাও। উহারা ঘরের মধ্যে আসুক। প্যাডিয়ার সৈনিক-পুরুষেরা কেমন করিয়া মরিতেছে, উহারা স্বচক্ষে দেখিয়া যাক্।"

আসন্নমৃত্যু-দর্শনে ফরাসীরা ভীত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তরবারি কোষোন্মুক্ত করিতে গেলেন, কিন্তু হস্ত উঠিল না।

চীৎকার করিতে করিতে পঞ্চাশ জন ক্রুদ্ধ পল্লীবাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জনতার মধ্য হইতে এক রমণী চীৎকার করিয়া বলিল, "উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

গার্সিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "দাঁড়াও!"

যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল।

"লাঠী, সোঁটা, পিস্তল, বন্দুক—কিছুরই প্রয়োজন নাই। তোমরা ইদানীং আমার সম্বন্ধে যাহাই ভাবিয়া থাক না কেন, দেশের স্বাধীনতা-রক্ষা-কল্পে আমি যাহা করিয়াছি, তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিতে না। ঐ দেখ, যে বিশ জন ফরাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহারা পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে ছুঁইও না। উহারা বিষপান করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হলাহল পান করিতে হইয়াছে।"

পল্লীবাসীরা বিস্ময়ে, আতঙ্কে ও আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা কয়েক জন সেনানীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহাদের প্রাণ-পক্ষী বহুক্ষণ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে।

মরণাহত ভৈষজ্যবিক্রেতার দেহ কতিপয় নাগরিক ধারণ করিয়া রহিল। পূর্ব্বে তাহারাই উহাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল।

অসংলগ্নভাবে সে বলিল, "সেলিডেনিও, অহিফেনের দ্বারা কাজ সারিয়াছি। করুণা নগর হইতে আরও অহিফেন আনাইয়া রাখিও।"

আর কথা ফুটিল না।

কেহ কেহ প্রজ্বলিত বাতি প্যারেডের দেহের চারি পার্শ্বে স্থাপন করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে ভগবানের নাম শুনাইতে লাগিল। জীবন-প্রদীপ ক্রমে নিভিয়া আসিল। সব শেষ হইয়া গেল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পূজার আসর।

১

দুর্দ্দিনের দুঃখমেঘ আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে ক্ষণকালের জন্য মুছিয়া, হেমবর্ণ শরৎঋতু বঙ্গের ক্লিষ্ট মুখে ঈষৎ হাস্যের আয়োজন করিতেছিল।

বিধুভূষণ বসু যদিও দরিদ্র কেরাণী, তবুও একখানা বাড়ী আছে। যদিও টাকাকড়ি কম, কিন্তু একখানি ছোট খাট প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত কিছু টাকা ছিল, এবং গৃহিণী সেকালের এক-জমীদারের কন্যা। সন্তানাদির মধ্যে একমাত্র কন্যা সুরমা।

বিধুভূষণ বাবু গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটু হাসি খুসির যোগাড় করিলে কি রকম হয়?"

গৃহিণী সুন্দর আননের ধ্বংসাবস্থা কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে সম্মুখীন করিয়া কহিলেন, "মন্দ হয় না, তবে এই শেষ। সঞ্চিত টাকা প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। বেশী বাড়াবাড়িকরিলে সুরমার বিবাহ হওয়া সুকঠিন।"

ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত আকাশ, এবং নিম্নে গৃহিণীর বিষণ্ন নেত্রদ্বয়। উভয়ের লক্ষণ বিলক্ষণ রকম পর্য্যালোচনা করিয়া বিধু বাবু দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগই শ্রেয় বিবেচনা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার সোহাগিনী কন্যা সুরমা আসিয়া বলিল, "বাবা, এবার একটা 'বুসনে'র হার্মোনিয়ম কিনিয়া দাও।"

পিতৃদেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"

সুরমা। এক শ' কুড়ি টাকা। বেশী নয়।

বিধুভূষণ। সুরমা, তোমার আবদার এবার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়া গিয়াছে। এক শ' কুড়ি টাকার হার্ম্মোনিয়ম কিনিলে এ যাত্রা আর পূজা হয় না। হঠাৎ এ সখ্ হইল কিসে?

* স্পেনদেশীয় পেড্রো এ. ডি. এলারকন্ রচিত গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

সুরমা। আমার সই মালতী একটা কিনিয়াছে। তা'র মাষ্টার্ মহাশয় বলেন যে, অন্যান্য হার্ম্মোনিয়মগুলো বেসুরা।

মালতী পূর্ব্বে সুরমার সঙ্গে মহাকালী পাঠশালায় পড়িত, এখন বিবাহ হইয়াছে।

সুরমার মাতার ক্রমে রাগ বাড়িতেছিল।—"তোর কিছু বুদ্ধি নাই, তুই তের বৎসরের মেয়ে, দেখিলে বোধ হয় ষোল। তোর বিবাহ দিলে ছেলে পুলে হইত। মালতী আর তুই কি সমান? মালতীর বাবার দুই লক্ষ টাকা, আর তুই এক জন কেরাণীর মেয়ে। তোর কি ওঁর অবস্থা দেখিয়া একটু দুঃখ হয় না? দিন চলিবে কিসে?"

তাড়া খাইয়া সুরমার মুখ ছোট হইয়া গেল। চখে জল আসিল। সুরমা পিতার কোলে গিয়া মুখ লুকাইল। ইতিপূর্ব্বে সে কখনও তাড়া খায় নাই। দরিদ্রতার কথা ভাবে নাই। দিন যে আপনিই চলে না, টাকা যে আপনিই আসে না, এবং আবদার করিলেই যে থাকে না, তাহা সে পূর্ব্বে জানিত না। বুদ্ধিমতী বুঝিল, কোমল হৃদয়ে স্বাভাবিক করুণা ফুটিয়া উঠিল।

সুরমা ক্ষীণ ভগ্নস্বরে বলিল, "বাবা, আমি তামাসা করিতেছিলাম। হার্ম্মোনিয়ম কি হ'বে?"

কিন্তু সে অনুতপ্ত মুখের অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া বিধুভূষণ ভাবিলেন, "এই ত আমার মা, গিরিরাজের দুঃখিনী উমা, আমার আবার ভাবনা কিসের?"

পিতার মনের ভাব বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া কন্যা মাতার নিকট গেল। মাতা অঞ্চলের অগ্রভাগ দিয়া কন্যার চোখের জল মুছিয়া দিলেন।

বিধুভূষণ। তোমার হার্ম্মোনিয়ম আমি কিনিয়া দিব।

কথাটা প্রতিজ্ঞার মত সুরমার কানে লাগিল। মাতা দ্বিরুক্তি করিলেন না।

সুরমার ভয় হইল। বোধ হয়, পিতা মনে ব্যথা পাইয়াছেন। বোধ হয়, তাহার জন্য এ বৎসর দুর্গোৎসব হইবে না। তা কি কখনও হয়? প্রাণ থাকিতে সুরমা তাহা হইতে দিবে না।

সুরমা বুদ্ধি আঁটিল। মুখ ভরিয়া হাসিল। সে বলিল, "একটা কথা বলি নাই। মালতী বলিয়াছে, একশ্ চেঞ্জে পুরাণো হার্ম্মোনিয়ম পাওয়া যায়। ঠিক সেই রকম, দাম চল্লিশ টাকা। তাদের সরকার মহাশয় কিনিয়া দিবে। আমার কাছে কুড়ি টাকা আছে, আর মাকে কুড়ি দিতে হ'বে। তাহা

হইলেই চলিবে। আমি এখনও ভাল করিয়া গান শিখি নাই, ভাল বাজাইতেও পারি না। নূতন হার্ম্মোনিয়মে কি হবে?"

এইরূপে আনন্দ ও নিরানন্দের অসাধারণ সামঞ্জস্য করিয়া সুষমা আবার হাসিল, এবং আনন্দের উচ্ছ্বাসে পিতা ও মাতাকে আবার হাসাইল, এবং পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হাসিল।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি! অত হে'স না, বারান্দায় একটি বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন।"

বিধু বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, কথিত ভদ্রলোকটি চলিয়া গিয়াছেন।

২

পরদিন প্রাতঃকালে সুরমা মালতীকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল,—"সই, তোমাদের সরকার ম'শায়কে দিয়া একশ্‌চেঞ্জ হইতে একটা পুরাণো হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া পাঠাইও, যেন চল্লিশ টাকার বেশী না হয়, লোক আসিবামাত্র মা দাম দিবেন। তোমার সুরমা।"

কিন্তু মালতী সে দিন বড় ব্যস্ত। গত কল্য তাহার ভ্রাতা কুমুদ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে মস্ত একটা পিয়োনো।

আজ গৃহ সুসজ্জিত হইতেছে। বড় কামরাটির মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতের মত পিয়ানো সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে টেব্‌ল হার্ম্মোনিয়ম, তান্‌পুরা, বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীর ন্যায় শোভমান। বন্ধুগণের পরামর্শে নূতন আড্ডার নাম 'সঙ্গীত-কৈলাস' ধার্য্য হইয়াছে।

কুমুদ বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতপ্রিয়, এবং বিলাতে গিয়া পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিদেশী সুরের রীতিমত কসরৎ করিয়াছিল। সেকালে কুমুদের গলা বিলক্ষণ মিষ্ট ছিল, এবং সে ওস্তাদী করিয়া পাড়া জয় করিত। কুমুদের নিকট কেহ ভয়ে গাহিতে পারিত না।

"ওটাতে ধৈবত অতি কোমল হওয়া চাহি"—"কড়ি মধ্যমটা বেশী করিয়া খোঁচ দিও, নচেৎ বসন্ত রাগিণী লাগিবে না" ইত্যাদি বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্যগণের বুলি কুমুদের মুখে দিবানিশি লাগিয়া থাকিত। এবার না জানি কত বড় একটা দিগ্‌জ পণ্ডিত হইয়াছে!

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এ পিয়ানোর দাম কত?"

কুমুদ হাসিল। "এটা অমূল্য। বন্ধুর উপহার। সে বন্ধু ছোট খাট

লোক নয়। সঙ্গীতজগতের সরস্বতী। 'মিস—'। তোমাকে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

মালতী সগর্ব্বে বলিল, "কি আশ্চর্য্য!"

কুমুদ। বলিয়াছিলেন 'হে সিন্ধুনদবাসী! (অর্থাৎ আমি) আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমাকে দিলাম (অর্থাৎ পিয়ানো।"

মালতী শুনিতে লাগিল।

কুমুদ একখানি টুলের উপর বসিয়া আস্তীন গুটাইতে লাগিল, এবং বলিল, "তাঁহাকে না দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। ঠিক 'জুনো'র মত চেহারা। খুব লম্বা গলা। হংসের ন্যায়। গলা লম্বা নহিলে মিষ্ট হয় না। তা জান ত?"

মালতী বলিল, "জানি।"

কুমুদ। যেমন মিষ্ট গলা, তেমনই জোর। অপূর্ব্ব 'সোপ্রানো'। আমাকে গাহিতে শুনিয়া প্রথমে হাসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যেমন আমি মল্লার রাগিণী আরম্ভ করিলাম, অমনই সুন্দরী স্তম্ভিতা, পুলকিতা ও ভয়ানক মোহিতা হইয়া বলিলেন, 'ধন্য!' সকলের মুখ কালো হইয়া গেল।"

মালতী। কেন দাদা?

কুমুদ বলিল, "মল্লার কায়দা দোরস্ত করিয়া গাহিলেই মেঘ হয়! অবশ্য, মানুষের মুখে হয়, আকাশে হয় না। ক্রমে বৃষ্টির মত মর্ম্ম হয়, ভেকের মত শ্রোতারা আহ্লাদে রুদ্ধস্বরে আনন্দে হাসিতে থাকে। পাছে গায়ক অপ্রস্তুত হয়, অতএব জোরে হাসিতে পারে না। রুমাল মুখে দেয়। আমাদের দেশে মল্লার রাগিণী সকলে বুঝে না, বিলাতে বেশ বুঝে। তাহারই পুরস্কার এই পিয়ানো। এটার আওয়াজ ভয়ানক জোর। সে জন্য আমি শীঘ্র বাজাইতে চাহি না। কিন্তু এটা কিছু বেসুরা। বিদেশের শ্রুতির সঙ্গে আমাদের শ্রুতির একটু প্রভেদ আছে। স্কেল্ বদলাইলে পর্দাগুলো বেসুরা লাগে। আমি এক সেট নূতন 'রিড্' আনিয়াছি। একটা মনের মত হার্ম্মোনিয়ম তৈয়ারি করিব। হার্ম্মোনিয়মের কথা উঠিতেই সুরমার প্রাতঃকালের চিঠির কথা মালতীর মনে হইল। সে এ দিক ও দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া পত্রখানির অন্বেষণ করিতে লাগিল।

"যাঃ, হারাইয়া গিয়াছে।"

কুমুদ। কি হারাইয়াছে মালতী ?

মালতী। সুরমার চিঠি। সুরমাকে মনে পড়ে ?

কুমুদ ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া স্মৃতির উদ্দীপন করিতে চাহিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিল, বলিল, "কৈ ? আমার মনে পড়ে না।"

মালতী। সেই যে মেয়েটি আমাদের বাড়ী এক দিন মার কাছে বসিয়া 'আমার দেশ' গাহিয়াছিল।

কুমুদ। একটু মনে পড়িয়াছে। মেয়েটা ভয়ানক কালো, এবং গলাটা বিড়ালের ছানার মত।

মালতী বন্ধুর অযথা নিন্দায় চটিয়া গেল। যাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মিসেস্ হুইলার বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং বিলাতে আছে কি না সন্দেহ", এবং যাহার গলা শুনিয়া কেহ মুখ ফিরাইতে চাহে না, সেই সুরমার অপমান!

মালতী। তোমার মিস্ জুনোর অপেক্ষা ভাল।

কুমুদ হাসিল; সে মিস্ 'জুনো'কে বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল; দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছিল; নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কুমুদ বলিল, "মালতী! অভয়কে পত্র লেখ। কাল হইতে আমি গলা সাধিব।"

অভয় মালতীর স্বামী। মালতী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। "দাদার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।"

৩

বৃষ্টি বিলক্ষণ নামিয়াছে। বিধুভূষণ বাবু আপিসে গিয়াছে। সুরমাদের স্কুলের পূজার ছুটীর আজ প্রথম দিন। অন্য কিছু কাজ নাই। সুরমা মার নিকট বসিয়া "বসুমতী" পড়িতেছিল।

এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল যে, "একটা লোক গোটা দুই তিন হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় 'ও বাড়ীর' মালতী দিদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সুরমা দ্রুতপদে বারান্দায় গেল। সুরমার মা চুল বাঁধিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রহিলেন।

যে লোকটা হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আসিয়াছিল, তার বয়স বেশী নয়, পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ। ভয়ানক কালো। হাবশীর মত। লম্বা লম্বা চুল। কোঁকড়া দাড়ী। চোখে চশমা।

কাঞ্চনজঙ্ঘা।
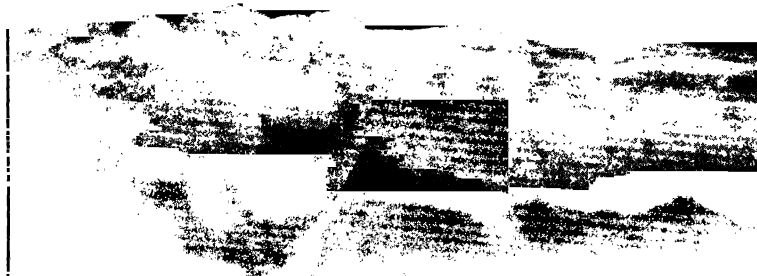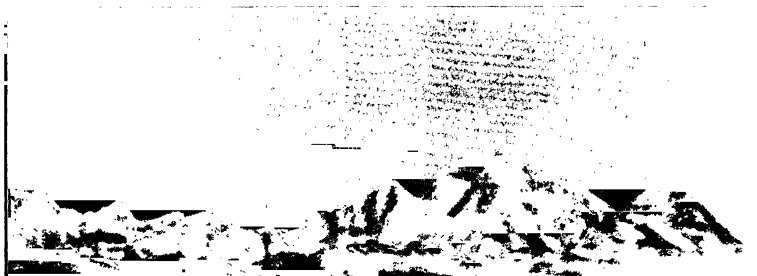
আগন্তুক। মিত্তিরদের বাড়ীর সরকার মহাশয় বলেছিলেন, এ বাড়ীর একটি মেয়ের হার্ম্মোনিয়ম দরকার। তাই এনেছি।

সুরমার মা বলিলেন, "আপনি বসুন না।"

আগন্তুক। আমি ছোটলোক। বাদ্য যন্ত্র টিউন করিয়া থাকি। আমি নীচে বসিব। আপনারা চেয়ারে বসুন। আমি হ্যারল্ডের বাড়ীতে কাজ করি।

সুরমার মা। তোমার মাইনে কত?

টিউনার। পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু মা! সারাদিন, এমন কি রাত্রিতেও খাটিতে হয়। চোখে আর ভাল করিয়া দেখিতে পাই না।

বোধ হয় অশ্রুর মত খানিকটা চশমার মধ্যে, এবং হাসির (দুঃখের?) মত খানিকটা আগন্তুকের ওষ্ঠের মধ্যে রহিয়া গেল।

সুরমার মার স্ত্রীস্বভাবসুলভ দুঃখ উছলিয়া উঠিল। সুরমা দূরে গিয়াছিল, কিন্তু লোকটার কাতর স্বর শুনিয়া কাছে আসিল।

সুরমা। হার্ম্মোনিয়মের দাম কত?

টিউনার। জিনিস বুঝিয়া দাম। আমি বরাবর মিত্তিরদের বাড়ী যন্ত্র 'সল্লাই' করিয়া থাকি। চল্লিশ টাকার বেশী কোনটা নয়।

তিন চারিটি হার্ম্মোনিয়ম ঠিকা গাড়ী হইতে নামাইয়া টিউনার সুরমার সম্মুখে রাখিল, বলিল, "কোন্‌টা ভাল, দেখিয়া লউন।"

সুরমা এক একটি করিয়া সবগুলি বাজাইয়া দেখিল। যেটা সকলের চেয়ে দেখিতে ভাল ও চকচকে নূতন, সেটা বেসুরা। যেটা অত্যন্ত কদাকার ও ভাঙ্গা, সেইটাই অতি মধুর, সুস্বর, সুস্পষ্ট।

"এইটা ভাল।"

সুরমার মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর কি পছন্দ!"

টিউনার কিছু গম্ভীরভাবে বলিল, "মা! বাস্তবিক ওটাই ভাল। আমি আপনার কন্যার সুর-নির্ব্বাচনে বড় খুসী হইয়াছি। (সুরমাকে লক্ষ্য করিয়া) আবার বাজাইয়া দেখুন।"

সুরমা। আমি ভাল বাজাইতে জানি না। কিন্তু বোধ হয় ঐ ভাঙ্গা হার্ম্মোনিয়মটির মধ্যে নূতন 'রিড্‌' আছে। তুমি একবার জোর করিয়া বাজাও ত, আমি আওয়াজটা আর একবার শুনি। আমি ওটা মেরামত করিয়া লইব।

টিউনার হুকুম পাইয়া পর্দ্দাগুলির উপর একবার তরঙ্গ খেলাইয়া গেল। তৎপরে একটা বিদেশী সুর ধরিল।

ছোটলোক হইলে কি হয়? বাজাইতে জানে। অতি সুন্দর বাজাইতে জানে। সে সুরের পর্দ্দা দিয়া জগৎকে প্রমত্ত করিতে পারে। সুরগুলি যেন তার বাল্যকালের সাথী। বড়ই আশার সুর। বড়ই সাধের। সে সাধ যেন পূরে নাই। বহুদূর,—অতিশয় দূরস্থিত প্রণয়ের আদর্শকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। স্পর্শ করিবার সাহস নাই। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে।

ক্রমে সুর বলীয়ান হইল। জীবনের সাধ নাই বা মিটিল? সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরা নির্জীব বসিয়া কেন? উদ্যম, প্রীতির উপর প্রীতি, একই মন্ত্রে দীক্ষা, একই মায়ের সন্তান—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঘনীভূত হইয়া বসুজা মহাশয়ের ক্ষুদ্র বাটীর বায়ুরাশি আলোড়িত করিতেছিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে।

সুরমা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। সুরমার মাতা নিদ্রাভিভূতা হইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

"এটা জর্ম্মানির সুপ্রসিদ্ধ 'ন্যাশনাল মার্চ'।"

সুরমা ও তাহার মাতা চমকিয়া উঠিল।

মাতা। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

সুরমা কম্পিতস্বরে কহিল, "না মা, তুমি জাগিয়াছ।"

টিউনার হাসিয়া বলিল, "হাঁ, মা এবার জাগিয়াছেন।"

সুরমা। তুমি বড় চমৎকার বাজাও। তোমার নাম কি?

টিউনার। 'পশুপতি'। দিন রাত্রি সাহেব সুবো সুরজ্ঞ লোকের কাছে থাকিয়া গোটাতক গৎ শিখিয়াছি। যদি আপনার শিখিবার ইচ্ছা হয়, তবে এক জন মেম আছে, পাঠাইয়া দিতে পারি। মাসে কুড়ি টাকা করিয়া দিলে সে শিখাইতে পারে।

সুরমা। আমি বিলাতী সুর বড় ভালবাসি না, তবি যদি বিলাতীর মধ্যে অমন সুন্দর ভাব থাকে—

টিউনার। আমার দাম দিন, প্রায় তিনটা বাজিতে চলিল।

দাম পাইয়া টিউনার ফিরিয়া গেল।

৪

আজ মিত্তিরদের বাড়ীতে অনেক লোক গান শুনিতে আসিয়াছে। মহিলা শ্রোত্রীদের জন্য অন্যকার আসর।

অভয় বাবু লুকাইয়া মালতীকে বলিলেন, "আমার বড় ভয় হইয়াছে।"

স্বামীর ভয়ের কথা শুনিয়া মালতী কিছু উদ্বিগ্না হইয়া পড়িল। কথাটা আর কিছু নয়, কুমুদের 'রিহার্সেল' তাহাদের পছন্দ হয় নাই। সে বিকট রকম চীৎকার করে। হাসাইতে পারে, কিন্তু কাঁদাইতে পারে না।

মালতী। ওটা চালাকী। দাদার গলা বড় মধুর। বোধ হয় উনি আমাদের লইয়া তামাসা করেন।

কুমুদ পরিপাটী রকমে বেশ ও কেশ বিন্যাস করিয়া উপস্থিত। অভয় ভাবিল, কুমুদ ইচ্ছা করিলে রমণী-মহলে একটা বিপ্লব করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু মতলবটা অন্যতর। কি সুন্দর চেহারা!

অভয়। তুমি ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া সকলকে চটাও কেন?

কুমুদ। কথাটা 'চটাও' নয়, 'উৎসাহিত।' আমাদের দেশে চীৎকার ও বিজ্ঞাপন ছাড়া উৎসাহের অন্য কোনও পথ নাই।

অভয়। আজ মিস্ দত্তেরা আসিবেন। তিন ভগ্নীই সুরজ্ঞ।

কুমুদ। আমি তজ্জন্য প্রস্তুত।

ক্রমে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সুন্দরীগণ পার্শ্বের ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুমুদ মালতীকে চুপি চুপি বলিল, "আমি পিয়ানোর পার্শ্বে লুকাইয়া থাকি, তুমি কনিষ্ঠা মিস্ দত্তকে দিয়া একটি গান গাহাও।" সুচতুরা মালতী আহ্লাদে আট্খানা।

প্রকাণ্ড পিয়ানোর পার্শ্বে কুমুদ লুকাইয়া থাকিল। মালতী কুমারী দত্তকে লইয়া নিকটস্থ বড় হার্ম্মোনিয়মের নিকট গেল। "অনিলা! তুমি একটা গাও।"

অনিলা কিছুতেই রাজি নহেন। কিন্তু মালতী বলিল, "দাদা এখনও গড়ের মাঠ হইতে ফেরেন নাই।"

অনিলাসুন্দরী লম্বিত বেণী চেয়ারের পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া, এবং হাতের লেস্গুলি ঈষৎ গুটাইয়া হার্ম্মোনিয়মের পর্দ্দায় অঙ্গুলি নিবিষ্ট করিলেন। অনেক স্ত্রীলোক শুনিতে আসিলেন।

অনিলার গলা সতেজ। অতি তীব্র। রবি ঠাকুরের অর্দ্ধেক গান

মুখস্থ। ক্রমে সুর চড়াইয়া, কেশ দুলাইয়া, রাগ রাগিণীর বিস্তার করিয়া অনিলা 'সঙ্গীত-কৈলাস' প্রতিধ্বনিত করিলেন।

এমন সময় মিষ্টার বিনোদ ঘোষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদ কৈ ?"

ব্যারিষ্টার বিনোদ বাবু মিস্ দত্তের প্রখ্যাত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বিনোদকে দেখিয়া অনিলা একটু দূরে গেলেন। ক্রমে দূরে গিয়া পিয়ানোর কাছে দাঁড়াইলেন।

কুমুদ পিয়ানোর পার্শ্ব হইতে বাহির হইলেন। মিস্ দত্ত সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন।

কুমুদ। ভয় নাই। আমি আপনার গানে মোহিত হইয়াছিলাম। বাহির হইতে পারি নাই। যদি অসভ্যতা না হয়, তবে আমি বলিতে চাহি যে, আপনার মত একাধারে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত, ভারতবর্ষে কেন, বিলাতেও বিরল। কি বল বিনোদ ?

বিনোদ ঈষৎ হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে একটু বিরক্তিচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। হঠাৎ পর্ব্বতের আড়াল হইতে 'নটের প্রবেশ'— অভিনয়টা বিনোদের ভাল লাগে নাই।

স্ত্রীমহলে সকলেই (কেবল মালতী ছাড়া) বুঝিল যে, অনিলা কুমুদের মনোহরণ করিয়াছে।

এখন কেবল কুমুদের পালা।

কুমুদ প্রকাণ্ড পিয়ানোটা লইয়া বসিল। মালতী জানিত, "যদি দাদা ভালবাসিতে চাহে, তবে অনিলাকে কাঁদাইবে ; যদি মনে না ধরিয়া থাকে ত হাসাইবে।"

কুমুদের হাতে চাবিগুলি প্রথমে কোমলভাবে বাজিয়া উঠিল, একটা অপার্থিব স্বর ! সে স্বর সকলের হৃদয় কাঁপাইয়া গেল, কিন্তু তৎপরেই একটা অদ্ভুত সুর ও বেসুর মিশ্রিত 'পোল্কা'—টিউন, এবং বিকট শব্দে গান,—

'আমার প্রথম বারের বৌ'—
সে নাইকো হেথায়,
পেয়ে মনে ব্যথা,
আছে তারার মাঝে লুকিয়ে—
'সেই আমার দ্বিতীয় বারে'র,—
এবং 'তৃতীয় বারে'র
এবং ভূতের, বর্ত্তমানের, এবং ভবিষ্যতের,

(অতি কোমল স্বরে,—রামকেলী)

সে রেখে গেছে চক্ষু দুটি,
তারা চেয়ে থাকে সন্তানের মত,
কিন্তু একটি চক্ষু নিয়ে গেছে,
সেটা মায়া দেশের পর পারে—
পর পারে!—ভাই—পর পারে—

অনিলা। (হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য গান!

কুমুদ। এটা মহাদেবের গান, তৎসঙ্গে ষাঁড়ের চীৎকার। গৌরীর শোকে পশুপতির আক্ষেপ। মিস কোরেলির প্রিয় গান। গ্রামোফোনের 'It is my master's voice'।

বিনোদ। ঐ ষাঁড়ের চীৎকার?

অনিলা। (বিরক্তিসহকারে) না, ঐ শেষভাগটা। কি সুন্দর 'টোন্'। অমন কখনও শুনি নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

কিন্তু বিনোদ ও মালতী উভয়েই বুঝিল যে, 'প্রথম বারের বৌ' অন্য কেহ। অনিলাও বুঝিয়াছিল।

৫

বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পূজা। শ্যামবাজারের একটা অতিরিক্ত দূরস্থিত পাড়ায়। বাড়ীখানি সেকালের। পূজার দালান ও একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে।

ছোট একখানি প্রতিমা, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। সুরমার নিজের হাতের কারিকুরি তাহাতে অনেক। লক্ষ্মীর কাপড়, সরস্বতীর বীণা, কার্ত্তিকের কোঁচান চাদর, সব সুরমার তৈয়ারী।

পূজার জন্য সঞ্চিত বাগানের ফুল সুরমা তুলিয়াছিল। শ্বেত ও রক্ত চন্দন, বিল্বপত্র ও তুলসীর আয়োজন সুরমাই করিয়াছিল। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের সস্নেহ অভ্যর্থনা, পরিবেশন এবং তাহাদের পানের আয়োজন সুরমার ভার। দুই দিন ধরিয়া বন্ধুবর্গ অনেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সকলেই সুরমার যত্নে মোহিত। সুরমা রাজরাণী হইবার উপযুক্তা। সকলের আশীর্ব্বাদ সুরমার মস্তকে পড়িল।

আজ নবমী। বিধুবাবুর প্রতিবাসী যুবকেরা চেষ্টা করিয়া শ্যামবাজারের 'কনসার্ট পার্টী' যোগাড় করিয়াছে।

পাড়ার রায় মহাশয় পূজার দালানে বসিয়া প্রকাণ্ড আলবোলা টানিতে-ছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল। "বিধু এখানে এসত।"

বিধুভূষণ সম্মুখীন হইলেন।

রায় মহাশয়। দেখ, তুমি মিত্তিরদের বাড়ীতে কাহাকেও নিমন্ত্রণ কর নাই?

বিধুভূষণ। (মস্তককণ্ডূয়ন পূর্ব্বক) না।

রায়। কেন?

বিধু বাবু। অনেকের আপত্তি আছে।

বিধুভূষণ স্বীকার করিলেন যে, হরিচরণ মিত্র এক জন বিনয়ী, সদাচারী, ও বর্দ্ধিষ্ণু লোক, কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া ভুল করিয়া-ছেন। মিত্রজা নিজে কাশীবাসী, এবং কুমুদ সবেমাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে। হয় ত সে পূজায় ডাকিলেও আসিবে না। কিন্তু মালতী সুরমার বড় বন্ধু। সুরমার যেন বড় ইচ্ছা যে, মালতী একবার আসে। অথচ মালতীকে ডাকিয়া কুমুদকে বাদ দেওয়া চলে না। কুমুদ আসিলে অনেকে চটিয়া যাইবে।

রায় মহাশয় পুনর্ব্বার বলিলেন, "কেন?"

বিধুভূষণ। সে বিলাত ফেরৃতা।

রায় মহাশয় সক্রোধে বলিলেন, "কোন শাস্ত্রে আছে যে, বিলাত-ফেরৃতা শারদীয়া মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইবে না?"

রায় মহাশয় হিন্দুদিগের অগ্রগণ্য, সেকালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিদ্যাসাগরী উত্তেজনা দেখিয়া অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে আসিল।

সঙ্গীতাচার্য্য গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "আমাদের গান বাজনার কি তাল-ফেরৃতা নাই? বিলাত-ফেরতা অনেকটা সেই রকম। এখন পুরাতন রাম-প্রসাদী মত প্রচলিত করা উচিত।"

কালিকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিঞ্চিৎ তর্কের আঘ্রাণ পাইয়া বলিলেন, "কথাটা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইলে চলিবে না। যদিও সমাজের শিথিলতাবশতঃ আমরা পূজার আসরে বিলাত-ফেরত, এমন কি, সাহেব সুবোও ডাকিয়া

থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে পূজার দালানে হিন্দুর সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে বলা বোধ হয় আপনাদিগের অভিপ্রায় নয়।"

রায় মহাশয়। তার মধ্যে একটা কথা আছে। যদি তার মায়ের উপর ভক্তি থাকে, তবে কোনও বাধা নাই।

ভট্টাচার্য্য। তবে চণ্ডালের সঙ্গে বসিয়া খান না কেন? তাহারও ভক্তি আছে।

রায় মহাশয়। চণ্ডালের সহিত চণ্ডাল খাইবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ খাইবে। কায়স্থের সহিত কায়স্থ খাইবে। সকলেই হিন্দু। যাঁহারা দেবীর পূজা করেন, তাঁহারা হিন্দু। 'বিলাত-ফেরত' বলিয়া কোনও ধর্ম্ম নাই। যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদিগকে ডাকিও না। তারা দূরে থাকুক।

গোকুল। হিন্দু ধর্ম্ম কি বিশ্বগ্রাসী?

ভট্টাচার্য্য। এটা বোধ আপনার নূতন বিধি। যে বৈদিক আচার হইতে ভ্রষ্ট, সে হিন্দু কি প্রকারে?

রায় মহাশয়। ভট্টাচার্য্য! কোন বেদে তোমার প্রতিমা-পূজা আছে? বেদ ভক্তি দিয়া তন্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাই তোমার 'হিন্দু ধর্ম্ম'। মনুর পূর্ব্বে বহু ব্রাত্যজাতি আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিত। তাহারা তান্ত্রিক ছিল। তাহাদিগের তন্ত্রমন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা, মারণ, বশীকরণ, গ্রহাচার্য্য ও সূর্য্যোপাসনা বর্ণাশ্রমের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। তাহারাও সদাচারী ছিল। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায় দেখ। তাহাদিগকে লইয়াই বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তন।

ভট্টাচার্য্য। তন্ত্র কি বেদের অঙ্গ নয়?

রায় মহাশয়। দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, দেবীতন্ত্র, এ সব জাতীয় ধর্ম্ম। বৈদিক উপাসনা তাহাদিগের শীর্ষে। তন্ত্র দ্বারা জাতি জাতিকে আলিঙ্গন করে, উপাসনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করে। এই যে পূজা, ইহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ইহাতে বর্ণাশ্রমের আচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রাদ্ধে, বিবাহে করিতে পার। কি বল গোকুল?

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "অবশ্য, আমার মনে পড়ে, মধু বাঁড়ুয্যে কানা খোঁড়া ভট্টাচার্য্যদিগকে গান শুনিতে দিতেন না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহা চটিয়া চলিয়া গেলেন। রায় মহাশয় বিধু বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি এখনই গিয়া কুমুদকে সন্ধ্যাকালে কন্সার্ট শুনিতে ডাক। যদি কাহারও আপত্তি থাকে, বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া জল

খাওয়াইয়া দিও। সে এক জন খাঁটী ছোক্‌রা। গভীরবুদ্ধি, এবং মুক্ত-হৃদয়। তাকে দেখ, তার পরে অন্য কথা হইবে।"

৬

নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। বিধুভূষণ দেখিলেন, কুমুদ সেই পূর্ব্বেকার কুমুদই আছে। সেই বিনয়ী, মিষ্টভাষী, স্বপ্নময় কুমুদ! বিধুভূষণ লজ্জিত হইলেন। কুমুদকে না ডাকা তাঁহার ভুল হইয়াছিল। মালতীও আসিল।

কুমুদ ধুতি চাদর পরিয়া আসিল। প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রায় মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বাবা, ব'স, তুমি মিত্র বংশের উপযুক্ত সন্তান। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি হিন্দুসমাজের ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

কুমুদ রায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। সেই পুরাতন রায় মহাশয়। যাঁহার পরামর্শ না লইয়া কুমুদের পিতা কখনও কোনও কার্য্যে হাত দেন নাই।

রায় মহাশয়। বাবা! শুনিয়াছি, তুমি বড় ভাল গাও। আমরা ইংরাজী গান বুঝি না, তবে যদি একটা বাংলা গান – বুঝিলে?

কুমুদ। (লজ্জিতভাবে) বুঝিয়াছি। আচ্ছা, সুর যোগাড় হইলে গাহিব।

রাত্রি প্রায় দশটা। মহানবমী পূজা হইয়া গিয়াছে। শ্যামবাজারের কনসার্ট আসরে নামিয়াছে। কাহারও বাঁশীর টিপ, কাহারও বেহালার ছড়ের প্রথম কম্পিত তান, কাহারও মন্দিরার ঈষৎ নিক্বণ উদ্যানের সন্ধ্যা-পুষ্পকলিকার ন্যায় ফুটিতে লাগিল। ক্রমে ঐক্যতান আরব্ধ হইল। পূজার দালান কাঁপাইয়া ধ্বনি উঠিল, বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইল।

অধ্যাপক গোকুলচন্দ্র ইত্যবসরে কুমুদকে বলিলেন, "একটু সিদ্ধি খাবে?"

কুমুদ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। সামান্য একটু।"

গোকুলচন্দ্র বাদাম ও জাফ্রাণ দিয়া একটু পুরাণো সিদ্ধি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কুমুদ তাহা পান করিল।

গোকুল। কোন সুরে গাহিবে?

কুমুদ। "মধ্যমে।"

কনসার্টের গৎ থামিয়াছে। আসর নিস্তব্ধ। অনেকে কুমুদের গান শুনিতে উৎসুক। বিনয় বাঁশী লইয়া বসিল; বিপিন হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আসিল। কুমুদের সঙ্গে বাজাইবে। কুমুদের গলায় মোহন মন্ত্র আছে.

কোন দিক হইতে কোথায় যায়, ধরা যায় না, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও পাগল করিয়া তুলে। বিপিন ভিন্ন আর কেহ কুমুদের সঙ্গে বাজাইতে পারে না।

কিন্তু আজ কুমুদের ভঙ্গী অন্য রকম। কুমুদের দৃষ্টি স্বপ্নময়।

কুমুদ বলিল, "বিনয়! এ হার্ম্মোনিয়মটার বড় তেজ্‌ আওয়াজ। একটা মৃদু সুরের বক্স্-হার্ম্মোনিয়ম এ বাড়ীতে পাওয়া যায় না কি?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "বিধু, দেখ ত, একটা ছোট বাজ্‌না তোমাদের বাড়ীতে নাই কি?"

বিধুভূষণ বলিলেন, "একটা আছে, সেটা ভাঙ্গা, কিন্তু আওয়াজটা মিষ্ট।"

বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়া সুরমাকে ডাকিলেন। "মা, তোমার হার্ম্মোনিয়মটা দাও ত, কুমুদ বাবু গাহিবেন।"

সুরমা সলজ্জে কহিল, "ওটা যে ভাঙ্গা।"

বিধুভূষণ। তাহাতেই চলিবে। সঙ্গে বেহালা ও বাঁশী আছে। তোমরা আড়াল হইতে শুনিও।

পিতা চলিয়া গেলে সুরমা মালতীকে বলিল, "সই, তোমার সেই হার্ম্মোনিয়মটা।"

মালতী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌টা?"

সুরমা। যেটা তুমি পাঠিয়েছিলে।

মালতী। তুমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছ?

সুরমা। সেই যে হ্যারল্ডের বাড়ীর টিউনার—তাহার নাম বুঝি পশুপতি—

মালতী ভাবিল, সুরমা বিদ্রূপ করিতেছে। সে বলিল, "সই! তোমার চিঠি হারিয়ে ফেলেছিলেম, আজ সাত দিন হ'ল, গোলমালে মনেই ছিল না।

মহাতর্কের পর সাব্যস্ত হইল যে, বোধ হয় সরকার মহাশয় চিঠিখানি পাইয়া আজ্ঞাপালনপূর্ব্বক প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সুরমা। সে কথা যাক্। আমি শুনিয়াছি, তোমার দাদা বড় জোর করিয়া বাজান। পর্দাগুলো ভেঙ্গে ফেলবেন না ত?

মালতী। খুব সম্ভব। তা কি হবে, আমি আর একটা দেব।

সুরমা। অমনটি হবে না। ও রকম রিড্‌ এ দেশে পাওয়া যায় না।

মালতী। তোর জন্যে বিলাতের রিড্‌কে আমদানী করিল?

সুরমা। তা জানি না। হঠাৎ পাইয়াছি।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "সেই, বাবুটি গাচ্ছে'ন। কি সুন্দর গলা!"

সুরমা। কোন্ বাবু?

ঝি। সেই যে দিন তুমি বাবার কাছে হর্ম্মোনিয়মের জন্যে আবদার ক'রেছিলে, সেই দিন তিনি বারান্দায় ব'সে—বোধ হয় একমনে তোমাদের কথা শুন্‌ছিলেন।

মালতী। যাঃ পাগলী, ও যে আমার দাদার গান।

বস্তুতঃ কুমুদ গাহিতেছিল। কুমুদ দেবীপ্রতিমার সম্মুখে কলকণ্ঠে ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেছিল।

৭

সে গানটা পুরাতন, কিন্তু সুরটা নূতন।

"আর যেন নবমীর নিশি পোহায় না।"

গিরিরাজের বড় ভয়! পাছে নবমীর নিশি পোহায়! পাছে দশমীর দগ্ধ প্রভাত আসে!

সেই বিষাদপূর্ণ স্বপ্নসঙ্গীত কুমুদ অপূর্ব্ব-ধারায় গাহিতেছিল। সে ধারা বঙ্গে ভক্তিলোপ হইবার পরে কেহ শুনে নাই।

তানের উপর তান। কাতর, করুণ স্বর, অথচ আশাপূর্ণ। সুর নিখুঁত, রাগিণী প্রভাময়ী, সাধক তন্ময়। অচেতনা বিভাবরী সচেতনা হইয়া উঠিল। সভাস্থ সকলে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ;—সকলের নয়নে বারিধারা! সম্মুখে বিশ্বজননীর প্রতিমা হাস্যময়ী। বোধ হয় বলিতেছেন, "আমি এ রকম গান শুনিলে আর ফিরিয়া যাইব না।"

রায় মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "বাবা, তুমি আজ পতিত হিন্দু ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিলে। ধর্ম্মের মধ্যে তুমি প্রাণ দিয়াছ। সুরের মধ্য দিয়া অ মাকে চেতনা দিয়াছ।"

ভট্টাচার্য্য নস্য লইয়া বলিলেন, "অনেকটা তাই। তবে ইহারা বিলাত যায় কেন? 'কালস্য সূক্ষ্মা গতিঃ'।"

সঙ্গীতাধ্যাপক গোকুলচন্দ্র কখনও কাহারও প্রশংসা করেন না। আজ বলিলেন, "শ্যামবাজারের কেন, কুমুদ বঙ্গদেশের মুখ রাখিবে। এমন ধৈবত কোমলের পোঁচ কোনও ওস্তাদ এ পর্য্যন্ত [illegible] দিতে পারে নাই।"

রায় মহাশয় বিধুভূষণকে ডাকিয়া কানে কানে বলিলেন, "কুমুদকে রাটীর

মধ্যে লইয়া যাও। যদি সুরমার উপযুক্ত পাত্র এ দেশে কেহ থাকে, তবে কুমুদ। কথাটা বুঝিয়া দেখিও।"

বিধুভূষণের চোখের জল তখনও শুকায় নাই। তিনি কেবল ভাবিতে-ছিলেন, "আর যেন নবমীর নিশি পোহায় না।" কি সত্য কথা! আর কত দিন এ জীবনের নিশা? হঠাৎ রায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "তাই ত! সুরমা গেলে আর আমার থাকিবে কি?" আবার তাঁহার অশ্রুধারা নয়নে বহিল। "তুই কি তবে প্রভাতে কৈলাসে যাইবি মা?"

মালতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সুরমা কোথায়? বালিকা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী সুরমা?

সুরমার মাতা কুমুদের জলখাবারের আয়োজন করিতে গিয়াছেন। সুরমা বাতায়নপার্শ্বে উদ্যানের দিকে একাকিনী। একটি রজনীগন্ধ লইয়া দেখিতেছিল।

কুমুদ লুকাইয়া আসিয়াছে।

"সুর! চিনিতে পার? আমি কুমুদ। বিলাত যাইবার আগে তোমার হাতে একটা রজনীগন্ধ দিয়া গিয়াছিলাম, বোধ হয় মনে আছে?"

সুরমা কথা কহিল না; রজনীগন্ধটি নতমুখে ছিঁড়িতে লাগিল।

কুমুদ বুঝিতে পারিল। সুরমার করস্পর্শ করিল। সুরমা বাধা দিল না।

"সুর! তখন নিজের মন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু দূরে গিয়া বুঝিয়াছিলাম। এই দুঃখী দেশের মধ্যে যে ভুবনভরা রূপ ও চিরপবিত্র, স্নেহপূর্ণ হৃদয় আছে, তাহা তোমাকে ছাড়িয়া গিয়া মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু একটা বড় ভয় হইয়াছিল।"

সুরমা হৃদয়ের প্রথম উদ্বেগ সংবরণ করিয়াছে। তাহার বাল্য-কল্পনার দেবতা কুমুদ আজ সম্মুখে। তাহার তরুণ হৃদয়ে সেই মধুর শৈশব-স্মৃতি পুরাতন সাহস জাগাইয়া তুলিল।

কুমুদ। ভয় হইয়াছিল, হয় ত তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সুরমা। যাও—

কুমুদ বলিল, "আমি যাইতে আসি নাই, লইতে আসিয়াছি। হৃদয়ের উদ্বেগে বিলাত হইতে আসিয়াই তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। তোমার পিতার নিকট সেই মধুর আবদার, আর তোমার, ভুবনমোহিনী হাসি—

"আর সুর! আমি কেমন টিউনার সাজিয়াছিলাম? তুমি চিনিতে পার নাই!"

সুরমা লজ্জানম্রমুখে বলিল, "পরে চিনিতে পারিয়াছি।"

বোধ হয় কুমুদ সুরমার মুখখানি জোর করিয়া তুলিতে চাহিল,কিন্তু মালতী গৃহ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দাদা কৈ!"

কুমুদ একলম্ফে উদ্যান পার হইয়া ঘরে গেল। "আমি রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলেম।"

মালতী। আর, সেই "বিড়ালের ছানা কালোমুখ" সই,—গেল কোথায়?

কুমুদ। সেও বোধ হয় বাগানে হাওয়া খাচ্ছে।

মালতী। দাদা! শুধু হাওয়া খাইলে কি 'নবমীর নিশি পোহাইবে?' একটু জল খাও। পূজার আসরে গান গাহিয়া তোমার মাথা গরম হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

রজনীর রহস্য।

ফিনল্যাণ্ডে এক কৃষক যুবার বাস।

সে দেশের ভূমি অনুর্ব্বর; সেখানে কৃষিকার্য্য বড় কষ্টসাধ্য। সে দেশে বনবেণীবিলসিত সরসী-চিত্রিত বিশাল ভূভাগে দূরে দূরে লোকের বসতি। এই জনবিরল প্রদেশে কৃষকেরা দায়ে পড়িয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে; নিজের সুখদুঃখের ভাবনা ভাবিয়া,প্রকৃতির লীলা-বিলাস দেখিয়া দিন কাটায়; আর উষর ভূমি চষিয়া কৃপণা ধরিত্রীর বক্ষ হইতে জীবন-যাত্রার উপকরণ-মাত্র সংগ্রহ করে।

কিন্তু এত অভাবে পড়িয়াও, একাকী এত ক্লেশ সহিয়াও, এই যুবার মনে আনন্দ ও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি ধরিত না। কেবল সন্ধ্যাবেলা যখন সরোবরের জল হইতে কুয়াসা উঠিয়া বনের চারিধার ছাইয়া ফেলিত, পৃথিবীর সুদূর মধুর ছবি অদৃশ্য হইত, তখন তাহার মনে কেমন এক রকম অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার আবেশ হইত। এই পিপাসা,—অজ্ঞাত রহস্য জানিবার এই বাসনা তাহার মনে এত প্রবল হইয়া উঠিত যে, সে কোনও কাজ করিতে পারিত না, বিশ্রামও করিতে পারিত না; উন্মনা হইয়া কেবল চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত।

তাহার মনে হইত, ঐ কুহেলিকা-জালের অন্তরালে কোথায় যেন মহান্ ও বিচিত্র রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে, সে রহস্য না জানিতে পারিলে বাঁচিয়া সুখ নাই।

এই ভাবে দিন যায়। এক দিন গ্রীষ্মকালে নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক জন যাদুকর আসিল। যুবক ভাবিল, এত দিন পরে মনের মত মানুষ মিলিয়াছে, যে রহস্য জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল, এই লোকটা হয় ত তাহাকে সেই রহস্য-ভেদে সাহায্য করিতে পারিবে। এই সব ভাবিয়া যুবা এক দিন সন্ধ্যাকালে যাদুকরের নিকট গিয়া তাহাকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিল, এবং তাহার সাহায্য চাহিল। যাদুকর বলিল, "তুমি যে রহস্য জানিতে চাহিতেছ, সে রহস্য জানিবার উপায় আমি তোমাকে বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু সাবধান, এ রহস্য জানিয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে না।" যুবক যাদুকরের কথায় নিরস্ত হইবার পাত্র নহে।

সে বলিল, "এই রহস্য জানিতে না পারিলেও আমার সুখ নাই। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, আমি এ রহস্য ভেদ করিবই।"

যাদুকর বলিল, "বেশ, তবে এই রুটীর টুকরাটি লও, যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখ, গ্রীষ্মের সায়ং-পর্ব্বের দিন সন্ধ্যার সময় নাগরাজ সদলবলে যখন বনের ধারে আসিয়া সোনার পাত্রে স্বর্গীয় ছাগদুগ্ধ পান করিবেন, ঐ সময়ে তুমি যদি কোনও কৌশলে রুটীর টুকরাটি দুধে ডুবাইয়া লইয়া তখনই খাইয়া ফেলিতে পার, তবেই যে রহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তাহা জানিতে পারিবে। কিন্তু আবার বলি, সাবধান, এ দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর।"

গ্রীষ্মের সায়ং-পর্ব্বের আর কয় দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যুবক প্রত্যহ অধীরভাবে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করে, দিনে দিনে বিচিত্র রহস্য জানিবার জন্য তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠে। অবশেষে একদিন নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যা আসিল, যুবক কাজ সারিয়াই বনপ্রান্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইল।

বনের ধারে উপস্থিত হইয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, যেখানে এতদিন সমতল ভূমি ছিল, সেখানে একটা পাহাড় রহিয়াছে! পাহাড় দেখিয়া যুবা ভাবিল, "ইহাই তবে সেই মায়াভূমি।" তখন সে পাহাড়ের একটু দূরে দাঁড়াইয়া নাগরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিল; সেই আলোকে পাহাড়ের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি আলোকিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যুবক

যুবা আবার চারি পাশে ফোঁস ফোঁস—সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পাইল; চাহিয়া দেখিল, শত শত সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহার পাশ দিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে।

সময় হইয়াছে বুঝিয়া যুবক সর্পগণের অনুসরণ করিল; পাহাড়ের নিকট গিয়া দেখিল, পাহাড় যেন ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতেছে, পাহাড়ের চূড়ার উপর বৃক্ষকাণ্ডের মত একটা প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে, তাহার চারি দিকে দলে দলে সাপ কিল বিল করিতেছে। প্রকাণ্ড সর্পটি লেজে ভর দিয়া সেই সর্পসভার মধ্যে সগৌরবে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

কৃষক যুবক পাহাড়ে উঠিল।

পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া দেখিল, নাগরাজের মাথায় সোনার মুকুট ঝকমক্ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নাগরাজ যেন দংশন করিবার জন্য সরু 'লিক্‌লিকে' জিভ বাহির করিল। ভয়ে যুবকের সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখিল, তাহার ও নাগরাজের মাঝখানে দুগ্ধপূর্ণ একটা স্বর্ণপাত্র রহিয়াছে। তড়িতের মত বেগে সে ধাঁ করিয়া রুটীর টুক্‌রাটি বাহির করিল, সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া টুক্‌রাটি দুধের মধ্যে ডুবাইল। তাহার পর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তীরবেগে পাহাড় হইতে নামিয়া রুদ্ধশ্বাসে বাটীর দিকে দৌড়িতে লাগিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে রুটীর টুক্‌রাটি খাইয়া ফেলিল। তখন তাহার মনে হইল, সর্পগণ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ গর্জ্জন করিতেছে, যেন তাহারা তাহাকে দংশন করিবার জন্য ক্রোধভরে তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে। যুবক ক্রমাগত দৌড়াইতে লাগিল। যখন মায়া-শৈল অনেক পশ্চাতে পড়িল, তখন অত্যন্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে তাহার আর এক পদ অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না। তখন সে ক্ষান্ত হইল। শ্রান্ত ক্লান্তদেহে হাঁপাইতে হাপাইতে বনের মধ্যে ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইল।

যখন কৃষক যুবার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দিবাবিভায় চারি দিক সমুজ্জ্বল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল; কি হইয়াছে, কোথায় আসিয়াছে, দেখিতে লাগিল। চারি দিকে চাহিয়া যুবা বুঝিল, কাল রাত্রিতে সে যেখানে দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিল, সে স্থান এখান হইতে অনেক দূরে। কিন্তু কি চমৎকার, তাহার শরীরে ত শ্রান্তি ক্লান্তির লেশমাত্র নাই! আজ সে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছে, জীবনে বুঝি তেমন আর কখনও করে

নাই। দুগ্ধপানে তাহার শরীরে নূতন বল আসিয়াছে, নবীন শক্তির সঞ্চার হইয়াছে।

সমস্ত দিন সে অধীরভাবে সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—রাত্রি হইলেই যে সে বনের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিতে পারে। দিনান্তে যখন গোধূলি দেখা দিল, তখন যুবক অজ্ঞাত রহস্য জানিবার জন্য গভীর বনে প্রবেশ করিল। চলিতে চলিতে সে একটি পরিচিত খাতের নিকট গিয়া পড়িল। সেই খাতের চারিধারে ধবল বার্চ্চ বৃক্ষের সারি, উহার তলদেশ সরস ও কোমল কর্দ্দমময়, অনেকটা বিলের অগাধ পঙ্কবিস্তারের মত কোমল ও জলসিক্ত, বিষম গ্রীষ্মের দিনেও সে স্থান শুকায় না।

কিন্তু আজ রাত্রিতে খাতটা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় দেখাইতেছিল না। খাতের কিছু দূর হইতেই যুবক দেখিল, খাতের চারিধারে চন্দ্রালোকে কি যেন ঝক-ঝক করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিল, খাতের চারিধার হইতে অতি উজ্জ্বল অমল ধবল মর্ম্মর-সোপানমালা তলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, সে পঙ্ক-প্লাবিত ভূমি নাই; সেখানে নির্ম্মল জলরাশি,—পল্বল রম্য স্নানাগারে পরিণত হইয়াছে।

দেখিয়াই যুবক বুঝিল, এইখানে নিশ্চয়ই কোনও অপরূপ ঘটনা ঘটিবে। তখন সে একটা প্রকাণ্ড বার্চ্চ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইল; কি হয় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহার বোধ হইল, চারিধারে বনভূমি বহু শ্বেতবর্ণা, প্রভাময়ী, সঞ্চারিণী মূর্ত্তিতে আকীর্ণ হইয়াছে! স্বর্গীয় দুগ্ধের স্বাদ না পাইলে এই মূর্ত্তিগুলি তাহার খণ্ড কুহেলিকার শ্রেণী বলিয়াই বোধ হইত।

কিন্তু এখন তাহার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়াছে। সে দেখিল, সেই মূর্ত্তিশ্রেণী, কতকগুলি পরম রূপবতী তরুণীর মূর্ত্তি—তেমন রূপ সে কখনও চোখে দেখে নাই—কখনও মনেও কল্পনা করিতে পারে নাই,—তরুণীদিগের স্বর্ণ কেশভার এলাইয়া পড়িয়াছে, অতি শুভ্র কমনীয় তনুলতা লাবণ্যে ঝলমল করিতেছে, তাহাদিগের দেহ এমন লঘু, এত সুন্দর যে, স্ফটিকস্বচ্ছ বলিয়া ভ্রম হয়। তরুণীরা মর্ম্মর-সোপানের প্রান্তে আসিয়া একে একে অঙ্গের শুভ্র সূক্ষ্ম বসন খুলিয়া ফেলিল, ধীরে ধীরে নির্ম্মল জলে নামিল। আর পর সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে নাচিতে লাগিল, নাচিতে নাচিতে অতি কোমল কলকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল।

যুবক আনন্দপুলকিতদেহে, মুগ্ধনয়নে, বিস্ময়ভরে সেই তরুণীদিগকে দেখিতে লাগিল, তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এক একবার তাহার ভয় হইতে লাগিল, বুঝি বা সুন্দরীরা তাহার হৃদয়-স্পন্দনের শব্দ শুনিতে পায়। চারি দিকে অনন্তবিস্তৃত জ্যোৎস্নামদবিহ্বল বনরাজি তাহার নিকট আর রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল না।—এখন তাহার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়াছে, বনের সকল রহস্য এখন তাহার চোখে ধরা দিয়াছে। সুদূর পূর্ব্বগগনে মুদিতার রক্তচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়া কৃষক যুবাকে শীঘ্র সূর্য্যোদয়ের কথা জানাইল। দিগন্তে রক্তচ্ছটা যতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল, তরুণীদিগের লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি ততই নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে পৃথিবী হইতে শ্বেত কুজ্ঝটিকা উঠিয়া যবনিকার মত সুন্দরীদিগকে আবৃত করিল। সূর্য্য উঠিলে যুবক দেখিল, খাতটি পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, সে মায়া-সোপান-মালা অদৃশ্য হইয়াছে।

তখন সে ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিল; শিশির-খচিত দূর্ব্বাদলশয্যার উপর দিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। কুটীরে ফিরিয়া সে শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও সেই মায়া-খাতে ফিরিয়া গিয়া রজনার সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিবার বাসনা তাহার মনে জাগিতেছিল।

যুবার শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সে সমস্ত দিন কোনও কাজ করিতে পারিল না; রাত্রি হইবামাত্র বনের দিকে চলিয়া গেল। বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পল্বলটি আবার রম্য মর্ম্মর-স্নানাগারে পরিণত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে তরুণীদল সেখানে আবির্ভূত হইল। তেমনই নৃত্যগীত চলিল। দেখিয়া শুনিয়া যুবকের প্রাণ জুড়াইল।

পর দিন রাত্রিতেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিল। চতুর্থ রজনীতে সে যখন বনে গিয়া সেই মুক্ত প্রদেশে উপনীত হইল, তখন সবিস্ময়ে দেখিল, ডোবাটি দিনের বেলা যেমন ছিল, রাত্রিতেও সেইরূপ রহিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে ব্যর্থ আশায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রজনীর মোহন দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিল; তাহার পর যখন রাত্রি পোহাইল, তখন হতাশ হইয়া ব্যথিতহৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইলে যুবা আবার সেই স্থানে ফিরিয়া গেল; এবারও পূর্ব্বের মত কিছুই দেখিতে পাইল না। এমনই করিয়া এক সপ্তাহ কাটিল। প্রতি রাত্রিতে সে নিরাশ ব্যথিতহৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেই মোহিনী

তরুণীদিগের দর্শনাশায় নুতন নুতন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিত, কিন্তু তাহার মনের আশা পূরিত না।

এই সময় নিকটে এক গ্রামে মেলা বসিল। সুযোগ পাইয়া বন্ধুজনের সহিত দেখা করিবার আশায় বহু ক্রোশ দূরস্থ গ্রামের কৃষকগণ প্রফুল্লহৃদয়ে দলে দলে মেলায় আসিতে লাগিল।

পূর্ব্বে মেলার সময় কৃষক যুবা যেমন আমোদ করিত, যেরূপ আহ্লাদে ভরপূর হইয়া থাকিত, তেমন আর কেহই পারিত না। সে যেমন কৃষক-কিশোরীদের সহিত হাস্য পরিহাস করিত, তাহাদিগকে যেরূপ আনন্দে মাতাইয়া নৃত্যসঙ্গীতে লইয়া যাইতে পারিত, তেমন আর কেহই পারিত না। তথাপি আজিও কোনও কিশোরী রূপে গুণে অন্যের অপেক্ষা তাহার নিকট আদরিণী হইতে পারে নাই। এ বৎসর সে পূর্ব্বকার মত মেলায় গেল বটে, কিন্তু দেখিল, তাহার চোখে সমস্তই বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার বোধ হইল, সমস্ত মানুষের ও তাহার মধ্যে একটা প্রাচীর যেন উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে; সে আর অন্য সকলে যেন এক জগতের লোক নহে। পূর্ব্বে সে যে সকল বালিকার রূপের আদর করিত, তাহারা যেন এখন শ্রীহীনা, কুরূপা; তাহাদিগের আলাপ যেন অপার্থিব, অর্থহীন। তখন যুবক বুঝিল, এই কিশোরী কুমারীদিগকে দেখিয়া তাহার মনে যে বিতৃষ্ণার উদয় হইয়াছে, তাহা লুকাইয়া রাখিবার সাধ্য তাহার নাই। সে উৎসব শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং বনের নিভৃত নেপথ্যে আবার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পর একদিন সে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে পথে সেই যাদুকরের—যে তাহাকে প্রকৃতির গূঢ় রহস্য জানিবার উপায় বলিয়া দিয়াছিল,—তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবক যাদুকরকে আপনার মনের ব্যথা জানাইল।

যাদুকর বলিল, "তোমার মনের সাধ ত মিটিয়াছে। তুমি রজনীর অতি গূঢ় রহস্য জানিয়াছ, তবু সন্তুষ্ট হও নাই? তুমি বনে যে দৃশ্য দেখিয়াছ, উহা জলদেবতা মেটস্থালিয়াস ও ক্ষিতিদেবতা মুরুইডেসের কন্যাগণের মিলন-মেলা। যে স্নান ও নাচ দেখিয়াছ, তাহার দ্বারাই ঐ দুই দেবতার মধ্যে পুরাতন মৈত্রী-বন্ধন পুনঃস্থাপিত হয়। উহাতেই ধরিত্রী ফল-শস্যশালিনী হন।"

আশাদীপ্তনয়নে যুবক বলিল, "তারা আবার কবে আসিবে, কবে আবার তাহাদিগকে দেখিতে পাইব ?"

যাদুকর বলিল, "গ্রীষ্মকালে ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি তাহাদিগের মিলনোৎসব হয়—*কিন্তু এ মিলন শত বৎসর অন্তর একবার ঘটে। তুমি তত কাল* বাঁচিবেও না, এ জীবনে তাহাদিগকে আর দেখিতেও পাইবে না।"

কৃষক যুবক উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল দৃষ্টিতে যাদুকরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বড় করুণ কাতরকণ্ঠে বলিল,—"আমাকে এ কথা বুঝাইয়া বলা তোমার উচিত ছিল।"

যাদুকর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি সে কথা শুন নাই।"

যাদুকর চলিয়া গেল।

সেই অবধি কৃষক যুবক জীবনে আর সুখের মুখ দেখে নাই। কাজে তাহার মন বসিত না, দিন রাত্রি পলকের জন্য বিশ্রাম করিতে পারিত না। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা লোপ পাইল, শরীর ক্রমে শীর্ণ ও রোগে জীর্ণ হইল,—অকালে বার্দ্ধক্য দেখা দিল। এই ঘটনার পর বহু বৎসর অতীত হইতে না হইতে সে মরিয়া গেল। যাহারা তাহার জীবনের কাহিনী জানিত, তাহারা পরস্পর মৃদুস্বরে বলাবলি করিত,—"লোকটা মরিয়া জুড়াইয়াছে।" *

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পালিতা।

প্রেসিডেণ্ট মহোদয় নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও শান্তিরক্ষকদিগকে বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আজ অবধি ২৭১৫ খানি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। বালিকা এমিলি ম্যাকেফারের দুরদৃষ্টে বহু সম্ভ্রান্ত ও দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্যথিত এবং তাহার ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমার সেক্রেটারী সমস্ত চিঠি বাছিয়া রাখিয়াছেন। সব চিঠি পড়িয়া আমি আপনাদিগকে অনর্থক কষ্ট দিতে চাহি না। চারিখানিমাত্র পড়িলেই অবশিষ্টগুলির মর্ম্ম মোটামুটি আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

---

* পুরাতন ফিনিস উপকথার ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

"দয়া ও অনুকম্পাবশতঃ আমি প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত বিপ্লবপন্থী ম্যাকেফারের বালিকা কন্যাকে আমার গৃহে আনিয়া সন্তানবৎ পালন করিবার কামনা করিয়াছি। যদি দেশের আইন প্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে আমি পিতৃমাতৃহীনা, বান্ধববর্জ্জিতা বালিকাকে আমার কাছে রাখিয়া তাহাকে সংসারের ভীষণ দারিদ্র্য ও দুঃখময় জীবন হইতে রক্ষা করিতে চাহি। ইতি

ব্যারিঙ্গারিয়া, মার্কুইস্ ডি সিয়ন্।

"কাউন্টেস্, ডচেস্ ও রাজকুমারীদিগের স্বাক্ষরিত দুই শত অনুরূপ মর্ম্মের পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় পত্র পাঠ করিতেছি, শুনুন,—

"ম্যাকেফার যখন বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহার হিতাহিতজ্ঞান ছিল না। একটা উন্মাদনার ঝোঁকে সে এইরূপ গুরুতর কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। পিতার পাপে নির্দ্দোষ কন্যা কষ্টভোগ করিবে, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। (পত্রলেখক চারি পৃষ্ঠাব্যাপী যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, সে অংশটুকু বাদ দিয়া পড়িতেছি) বালিকার চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমি সুশিক্ষা দ্বারা তাহাকে সমাজের উপযোগী করিয়া তুলিব। বিপ্লবপন্থীদিগের প্রদত্ত শিক্ষার বীজ তাহার কোমল সুকুমার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। ইতি

রেজিনাল্ড ডুয়ান্
সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পব্যবসায়ী।

"বড় বড় কারখানার অধিকারীদিগের স্বাক্ষরিত এবংবিধ ৩২০ খানি পত্র পাইয়াছি। তৃতীয় চিঠিখানি এইরূপ,—

"আমি ধনবান নহি, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে আমি অক্লেশে ম্যাকেফারের দুর্ভাগিনী কন্যার সাহায্য করিবার ভরসা রাখি। যদি আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি এমিলিকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। ইহাতে মানবোচিত কর্ত্তব্যই পালন করা হইবে। মার্সেল জর্জ্জেন্
বণিক।

"এই মর্ম্মের পনের শত পত্র আসিয়াছে। এইবার চতুর্থ প্রকারের চিঠি পড়িতেছি, শুনুন,—

"আমাদের সম্প্রদায় সাম্যবাদের বিরোধী, আমারা বিপ্লবপন্থী। স্বাধীনতা-লাভই আমাদের সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত ম্যাকেফারের সুকুমারমতি বালিকা কন্যাটিকে আমরা প্রতিপালন করিবার বাসনা করিয়াছি। যে আদর্শে তাহার পিতার জীবন গঠিত হইয়াছিল, যে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া ম্যাকেফার আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই আদর্শে আমরা বালিকার চরিত্র গঠিত করিতে চাই, সেই মূলমন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিতে পারিলে আমরা ধন্য হইব। ম্যাকেফারের স্বহস্তলিখিত মন্তব্য এতৎ সহ প্রেরিত হইল। ইতি রোমেন্ জিনেষ্টাল
সহকারী সূত্রধর ও বিপ্লবপন্থী সম্প্রদায়ের সম্পাদক

"এরূপ উদারতা ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লাভ করা গৌরবের বিষয় নহে কি? কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বে বালিকার পিতার সহিত একার পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।"

ম্যাকেফারের মতামত লওয়া হইল। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, প্যারী নগরীর আর্কবিশপ, শিক্ষা-বিভাগের সদস্য ও সেনেটের প্রায় দ্বাদশ জন সভ্যের অভিমত সংগৃহীত হইল। জনসাধারণের মন্তব্যও বাদ পড়িল না। মোটের উপর, যাহার জন্য এত অনুষ্ঠান, সেই বালিকা এমিলি ব্যতীত, দেশের ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, সকলেরই মতামত গৃহীত হইল।

অবশেষে সকল পক্ষকেই সন্তুষ্ট ও শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্থির হইল যে, বালিকা এমিলি যথাক্রমে মার্কুইস্ ডি সিয়ন্, রেজিনাল্ড ডুরান, মার্সেল জর্জ্জেস্ ও রোমেন্ জিনেষ্টারের গৃহে ছয় মাস করিয়া বাস করিবে।

মার্কুইস্ ডি সিয়ন্ উৎসাহভরে সমাদরে বালিকাকে গ্রহণ করিলেন। সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগের নিকট তিনি সেদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পরিবারভুক্ত আত্মীয়গণের অপেক্ষাও তিনি বালিকাটিকে অধিক সমাদরে রাখিবেন।

এমিলির আনন্দবিধানের জন্য পনেরটি সুন্দর, সমুজ্জ্বল, রেশমী-বস্ত্র-মণ্ডিত পুত্তলিকা ক্রীত হইল। বালিকার নিমিত্ত বহুমূল্য চমৎকার পরিচ্ছদ আসিল। দুইটি পরিচারিকা তাহার প্রসাধন ও পরিচর্য্যার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত হইল। কয়েক জন শিক্ষয়িত্রী তাহাকে জটিল ও সরল, বোধ্য ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনে বালিকা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, অথবা বিস্ময় প্রকাশ করিল না! অতি শৈশব হইতেই সে দেখিয়া আসিতেছে, লোকে স্বার্থসিদ্ধির উপায়-স্বরূপ তাহাকে অবলম্বন করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং সে ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে আনন্দ ও অথবা নিরানন্দের ভাব প্রকাশ করিল না। পুতুলগুলি যে তাহারই, তাহা ঠিক সে জানিত না। সে ভাবিল, অদৃষ্টলক্ষ্মীর অনুগ্রহে কিছু দিনের জন্য সে ক্রীড়ণকগুলি লাভ করিয়াছে। আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে!

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে অভিনয় করিতে হইতেছে, ইহাই তাহার জীবনের মহা দুঃখ। বহুমূল্য কোমল মখমলে মণ্ডিত বিচিত্র ভূষণে পরিচারিকারা প্রত্যহ তাহাকে সাজাইয়া দিত। তার পর প্রাসাদের বহির্ভাগে

দ্বিতলস্থ ছাদের উপর সে বসিয়া থাকিত। উদ্দেশ্য,—ম্যাকেফারের বন্ধুবর্গ দেখুক, বালিকা কত সুখে, কত আদরে রহিয়াছে!

মার্কুইস্ তাহাকে চালাক, চতুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা ও যত্ন করিতেন। যে দিন ভোজের আয়োজন হইত, সেদিন সর্ব্বাগ্রে উজ্জ্বল বসনে ভূষিত করিয়া বালিকাকে মজলিসে পাঠান হইত। সুচিত্রিত, সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে সুখসেব্য আসনে বালিকা নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া থাকিত। সুন্দরী বিলাসিনীরা অপেরা-গ্লাস-সংযোগে সকৌতুকে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেন!

সম্রান্ত বিলাসিনীরা বলিতেন, "বিপ্লববাদীর সেই মেয়েটি না? উহার প্রতি সদয় ব্যবহারে আপনার মহত্ব ও সদাশয়তা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, আপনার কার্য্য প্রশংসনীয়। মেয়েটি বড় সুন্দরী ত! উহাকে গৃহে রাখায় বোমার আশঙ্কা আর আপনার নাই। আগামী ২৯শে তারিখের বল-নাচের মজলিসে আমরা উহাকে লইয়া যাইতে চাই। আপনার আপত্তি আছে কি? নাচের মজলিসে বালিকাটি উপস্থিত থাকিলে বোমার ভয় থাকিবে না। পর দিন প্রাতে উহাকে নিশ্চয় ফিরাইয়া দিব।"

মার্কুইসের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না। বালিকাটি শুধু বোমার প্রতিষেধক, জীবন-রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। সে একটা মহাপ্রদর্শনী! আর কাহারও গৃহে এমনটি নাই!

কিন্তু বালিকা এমিলি এরূপ ব্যাপারে ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষয়িত্রীদিগের অতিরিক্ত অনুরাগ-প্রকাশেও বালিকা ক্রমশঃ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কোন দিন যদি তাহার মুখ একটু ম্লান হইত, অমনই সঙ্গীত-শিক্ষা সে দিন বন্ধ হইত। একবারের স্থলে যদি কোনও দিন সে দুই বার হাঁচিত, অমনই ভূগোল ও ব্যাকরণের পাঠ সে দিনের মত স্থগিত হইত!

তাহারা প্রত্যহ দুই বেলা বালিকাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইত। সকল প্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত বক্তৃতা ও স্তোত্র-পাঠের সময় তাহাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। তাহার কোমল অন্তরে ধর্ম্মের গুরুতর ও কঠোর বিষয়গুলি মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য কি বিপুল চেষ্টা! ভূতপূর্ব্ব সম্রাটদিগের প্রতি তাহার যাহাতে শ্রদ্ধা জন্মে, তজ্জন্য শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব কালের সন তারিখ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যহ আলোচনা করিতেন।

কিন্তু বেচারা কিছুতেই সন তারিখ ঠিক রাখিতে পারিত না। নৃপতিদিগের নামও পর্য্যায়ক্রমে সে আবৃত্তি করিতে পারিত না।

নির্দ্দিষ্ট ছয় মাস শেষ হইলে মার্কুইসের প্রাসাদ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইল। সে দিন শোকপ্রকাশের কি হুড়াহুড়ি! মর্ম্মভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া বালিকা চলিয়া গেল। প্রাসাদের সর্ব্বত্র শোক যেন উথলিয়া উঠিতেছিল! সংবাদপত্রের স্তম্ভেও অত্যন্ত করুণরসাত্মক প্রবন্ধ বাহির হইল।

এমিলি মনে মনে ভাবিতেছিল, "আমি এমন কি করিয়াছি যে, এত ভালবাসা ও শোকের অভিনয়!"

রেজিনাল্ড ডুরানের গৃহেও অনুরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল। এক উৎসবক্ষেত্র হইতে ভিন্ন উৎসবক্ষেত্রে সে নীত হইতে লাগিল। বড়দিনের উৎসব, নাচের মজলিস, সর্ব্বত্রই বালিকা এমিলি বিরাজিতা! সুদৃশ্য পুত্তলিকা, বিচিত্র খেলানা ভারে ভারে তাহার জন্য আসিতে লাগিল। পণ্ডিতগণ তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। এবার কেবল ধর্ম্মশিক্ষাটা বাদ পড়িল। সম্রাট ও রাজন্যদিগের পূজার পরিবর্ত্তে '৯৩ খৃষ্টাব্দকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইল।

তাহারা বালিকাকে বিচিত্র যন্ত্রাগার ও বিরাট শ্রমশিল্পালয়ে লইয়া যাইত। পনের দিন অন্তর রেজিনাল্ড ডুরান বালিকাকে কাছে বসাইয়া সকলের সমক্ষে কত আদর, কত যত্ন করিতেন। চুম্বনে চুম্বনে বালিকাকে ছাইয়া ফেলিতেন। দেশের মধ্যে বিপ্লবের আশঙ্কা পুনরায় যখন ঘনীভূত হইল, তখন এমিলির আদর যত্ন আরও বাড়িয়া গেল! খেলানা ও পরিচ্ছদে বালিকার কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। ডুরান গভীরতর স্নেহে বালিকাকে আরও ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল! বালিকা তখন মার্শেল জর্জ্জেসের আলয়ে প্রেরিত হইল।

স্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এবার বালিকার অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। মার্শেল জর্জ্জেসের গৃহে বিলাসিতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। তিনি অত্যন্ত পরিমিতব্যয়ী ও হিসাবী।

ম্যাকেফারের কন্যা এত দিন বিলাসে লালিত হইয়াছিল। এখন সামান্য আহার, পরিমিত ব্যবহারে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

মার্শেল জর্জেস্‌ও তখন মনে মনে ভাবিতেছিলেন, স্বেচ্ছায় আপদটাকে স্কন্ধে লইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছেন! কিন্তু তিনি এই মানসিক পরিবর্ত্তনের কোনও লক্ষণই বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য ভাবে তিনি যে উদারতা ও বদান্যতার প্রচার করিয়াছেন, এখন সাধারণ্যে তাহার বিরুদ্ধ মতই বা কি প্রকারে প্রকাশ করা যায়! সুতরাং সমস্যা কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে এমিলিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাইয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন!

বোর্ডিংএর অধ্যক্ষ বালিকাটিকে পাইয়া মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দিত হইলেন। আর কিছু না হউক, এখন বিপ্লবপন্থীদিগের বোমায় তাঁহার বিদ্যালয়টি ধ্বংস হইবার আশঙ্কা আর রহিল না।

অধ্যাপকেরা বালিকার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নূতন পদ্ধতিতে তাহার শিক্ষা আরব্ধ হইল। প্রতি ছয় মাসে পরস্পর-বিরোধী শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে বালিকা কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিতে-ছিল না। এক দলের প্রদত্ত শিক্ষা যাহাকে পূজা করিত বলিত, ভিন্ন মতে তাহাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিত।

সে দেড় বৎসরে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষার তিন প্রকার উপদেশ পাইয়াছিল। সে পিয়ানো বাজাইবার ও তিন প্রকার অঙ্গুলি সঞ্চালন করিবার উপদেশ পাইয়াছিল। এইরূপে পরস্পরবিরোধী শিক্ষা-পদ্ধতির পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তনে সমাজ ও শিক্ষার সকল প্রকার বিধানের প্রতি বালিকার চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতে লাগিল।

ছয় মাস পরে শূন্যমনে শুষ্কহৃদয়ে সে বোর্ডিং পরিত্যাগ করিল। জীবন তখন তাহার একটা শূন্যগর্ভ প্রহসনের মত বোধ হইতেছিল।

এইবার রোমেন্‌ জিনেষ্টেলের উপর এমিলির ভরণপোষণের ভার পড়িল।

বুলভার্ড চারোনি পল্লীর এক প্রান্তে একটি অন্ধকারময় কক্ষে তাহার বাস। দ্বিতলের একটি কক্ষে সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়ের বৈঠক বসিত। নিম্নের একটি গৃহে জিনেষ্টেলের দ্বারা সম্পাদিত "ব্লড্‌" অর্থাৎ "রক্ত" নামক একখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত। সে কাঠের মিস্ত্রী ছিল। কিন্তু ছুতারের কাজ সে যত না করুক, বহু লোকের মস্তিষ্ক সে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। বন্ধুবর্গ দিবারাত্রি তাহার গৃহে বসিয়া জটলা করিত।

এখানে এমিলিকে প্রধান অংশ অভিনয় করিতেই হইবে। অবরুদ্ধ নেতার সে কন্যা। স্বাধীনতার মন্ত্র-প্রচারের জন্যই ম্যাকেফারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তজ্জন্যই আজ এমিলির এই অবস্থা। এত দিন পরে শত্রু পক্ষের কবল হইতে সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। পিতার কার্য্যভার এখন তাহার উপরেই পড়িবে। ম্যাকেফারের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহাতে সফল হয়, তজ্জন্য এমিলিকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। যে আদর্শে পিতার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহারই পুষ্টি ও উন্নতিকল্পে বালিকাকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

সে আদর্শ টা কি ?

বা ! সে কি তাহা জানে না ?

তাহারা এমিলিকে একটা উচ্চ টুলের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিত। বক্তৃতাকালে সে নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া থাকিত। বক্তাদিগের উৎসাহের উৎস তাহাকে দেখিলেই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

এমিলির চিত্তক্ষেত্র হইতে তাহারা সাধারণ শিক্ষার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চারি ব্যক্তি ধ্বংস-নীতির উদ্দেশ্য তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। এমিলি এইরূপ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-প্রণালীর হিড়িকে পড়িয়া অস্থিরচিত্তে ব্যাকুলভাবে বলিত,—"হে ভগবন্, তুমি আজ আছ, কাল নাই!—হায়! সাধারণ মানুষের মত আমি কেন এক পাশে পড়িয়া থাকিতে পাই না? কোনও অনৈতিহাসিক বালিকার ন্যায় শান্তিতে জীবন-যাপন কি আমার অদৃষ্টে নাই?"

সিয়ন্-প্রাসাদে সে আবার ফিরিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার সুন্দর পুতুলগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে! শিক্ষয়িত্রী কেহ নাই, সকলেই বিদায় লইয়াছেন। আসন্ন সামাজিক বিপ্লবের কোনও আশঙ্কা তখন ছিল না। চারি দিকে শান্তি বিরাজিত। নগরবাসীর গৃহ বারুদ অথবা বোমা দ্বারা ধ্বংস হইবার কোনও সম্ভাবনা আর নাই। এখন আর কেহ বালিকাকে বিপদনিবারক মহৌষধের ন্যায় গ্রহণ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছিল না।

এমিলি এবার ভৃত্যদিগের কক্ষে বসিয়া তাহাদের সহিত আহার করিত। পূর্ব্বে যাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল, তাহাদেরই সহিত সে অবস্থান করিত। মাসের শেষে ঘটনাক্রমে মার্কুইসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে

তিনি বলিতেন, "কে, তুমি?—কেমন, তোমার যাহা যাহা দরকার, সব পাইতেছে ত? বেশ সুখে আছ?"

আর কোনও কথা হইত না। মাকু্‌ইস চলিয়া যাইতেন।

বালিকা নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে বড় একটা বাহির হইত না। পরিচারিকাদিগের নিকট হইতে ছোট ছোট উপন্যাসের বহি চাহিয়া লইয়া পাঠ করিত। সহিসদিগের কাছে বসিয়া গল্প শুনিত। তাহার মনে স্ফূর্ত্তির লেশমাত্র ছিল না। তাহার বিষণ্ণতা দিন দিন বাড়িতেছিল।

রেজিনাল্ড ডুরানের গৃহেও তাহাকে ভৃত্যবর্গের সহিত আহার করিতে হইত। বাড়ীর সকলেই তাহাকে এড়াইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়! সে যেন একটা গলগ্রহ! তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যে দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক, এ চিন্তা ডুরাণের হৃদয়ে বৃশ্চিকের ন্যায় সর্ব্বদাই দংশন করিত। একদিন কাল্পনিক বিভীষিকায় তাঁহাদের আপাদমস্তক যে বেতসপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল, এ কথা মনে হইলে লজ্জায় তাঁহার মাথা হেঁট হইত।

আবার মার্শেল জর্জ্জেসের আবাসে এমিলি ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয় বার সে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করায় মার্শেল জর্জ্জেস যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহা আনন্দজ্ঞাপক কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

সৌভাগ্যক্রমে বালিকা পীড়িত হইয়া পড়িল। বাড়ীর লোকেরা তখন গাড়ী করিয়া পীড়িতা বালিকাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। মার্শেল জর্জ্জেস্‌ও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বালিকা অবশিষ্ট কাল তথায় রহিল।

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া এমিলি রোমেন্ জিনেষ্টেলের কুটীরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে তথায় ছিল না। তাহার মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তাহার বন্ধুবর্গের কেহ এমিলিকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। ম্যাকেফারের কন্যাকে আশ্রয় দিয়া শেষ কি তাহারা জীবন বিপন্ন করিবে?

নিরুপায় বালিকা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিল। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "অন্যান্য পৃষ্ঠাপোষকদিগের নিকট আবেদন কর।"

মার্কু্‌ইস্ ডি সিয়ন তখন ইতালীতে। তিনি শীঘ্র ফিরিবেন না। রেজিনাল্ড ডুরান পরলোকে। মার্শেল জর্জ্জেসের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমি দুইবার তোমার ভার লইয়াছি, আর পারিব না। এখন পথ দেখ।"

একদিন দেশের সমগ্র লোক যাহাকে পালিতা কন্যারূপে পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এখন ২৭১৫টি পরিবারের কেহই তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন না!

মানব জাতির এই অবিচারে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি সাম্যবাদী, কি বিপ্লববাদী, রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কুটীরবাসী মানবমাত্রেরই প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। মানুষগুলা কি ভণ্ড, কি কাপুরুষ! পৃথিবীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। অদৃষ্টকে সে ধিক্কার দিল।

একদা সন্ধ্যাকালে কোনও নাট্যশালার বাহিরে দাঁড়াইয়া সে ভিক্ষা করিতেছিল। কাতারে কাতারে সুসজ্জিত শকটসমূহ আসিতেছে, যাইতেছে। সহিস ও চালকের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ গ্যাসালোকে ঝকমক্ করিতেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত নয়নে বালিকা বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। সহসা তাহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় ঘৃণার সঞ্চার হইল। একখণ্ড ইষ্টক তুলিয়া লইয়া সে সন্নিহিত রাজচিহ্নাঙ্কিত একখানি সুদৃশ্য শকট লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।

চীৎকার করিয়া সে বলিল, "এইরূপে পৃথিবীর সব লোক উৎসন্ন যাক্।"

গাড়ীর কাচবাতায়ন দুর্ব্বলহস্তনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের আঘাতে ভগ্ন হইল না। কিন্তু পুলিস ছুটিয়া আসিল বালিকা এমিলিকে ধরিয়া ফেলিল।

মার্কুইস্ ডি সিয়ন দেশভ্রমণের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গাড়ী তাঁহারই। অভ্যন্তরে মার্কুইস বসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনি বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলেন, তিন জন বলিষ্ঠ পুলিস-কর্ম্মচারী এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশা বালিকাকে আকর্ষণ করিতেছে। বালিকা তাহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ললাটে হস্তার্পণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তিনি বলিলেন, "এ মুখখানি কোথায় দেখিয়াছি! কিন্তু কোথায়?"

গাড়ী চলিয়া গেল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* পীয়ের ভেরার রচিত করাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত

চিত্রশালা।

মহর্ষি বশিষ্ঠ।

"ভার্য্যা সহ সমাসীন শান্ত ঋষিবর,
সম্মুখে গম্ভীর স্নেহ শোভে হোম-গবী।"

কবি ঋতেন্দ্রনাথ মনোজ্ঞ ভাষায় মহর্ষি বশিষ্ঠের যে মনোহর পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, শ্যাম কুশদূর্ব্বাদল-সমাচ্ছাদিত প্রান্তরে হোমগাভী ও আশ্রমমৃগাদিপরিশোভিত শান্ত গম্ভীর পূত তপোবনের যে উজ্জ্বল চিত্র বিন্যাস করিয়াছেন,—স্বভাবশিল্পী স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ, অকালে পরলোকগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে এই নয়নমনোমদ চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তিনি যেমন সুশিল্পী, কাব্যকলায় তাঁহার তেমনই প্রগাঢ় প্রীতি ও বিশেষ অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ সোদর কবি ঋতেন্দ্রনাথের গভীর হৃদয়ভাব তাঁহার কবিতায় যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঋষিদম্পতির চিত্রবিন্যাসে শিল্পী তাঁহার চিত্রে সাধ্যমত সেই আর্য্যতপোবনের পবিত্র সৌন্দর্য্যরাশির বিকাশে তিলমাত্রও অযত্ন করেন নাই।

শিল্পী হিতেন্দ্রনাথ কোনও শিল্পাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন না, তবে তাঁহার যে আন্তরিক শিল্পানুরাগ ছিল, তাহাতে প্রকৃতিই তাঁহাকে শিল্পী করিয়া তুলিয়াছিল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি অকালে মহাকালের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন,—তিনি জীবিত থাকিলে সময়ে এক জন আদর্শ শিল্পিরূপে বঙ্গীয় শিল্পিসমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। এমন শিল্পী কোরকেই বিনষ্ট হইলেন—আর তাহার বিকাশ দেখিতে পাইলাম না। তথাপি তাঁহার শিল্প-কলিকা-মধ্যে তিনি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনাদরের বস্তু নহে—তাহার অন্তর্নিহিত মধুর আস্বাদ অনুভব করিবার বিষয়; বস্তুতঃ তাহা শিল্পানুরাগীর প্রীতিসমালোচনার বিষয়ীভূত। তাঁহার সেই অপুষ্ট-চিত্রকলাজাত 'মহর্ষি বশিষ্ঠ' নামক যে আলেখ্যটি আজ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল, কলাগৌরবে ইহার স্থান নিতান্ত অল্প উচ্চ নহে। চিত্রনীতির নিয়মানুসারে ইহা অনেকটা পরিশুদ্ধভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে শিল্পী যে নিসর্গচিত্রের বিন্যাস করিয়াছেন, তাহা (Heroic Landscape painting) বিরাট বা বীররসাত্মক নিসর্গচিত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার পাত্রসমাবেশ (Composition) চিত্রসূত্রানুসারে অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল চিত্রের সম্মুখভূমিতে Foreground of Picture) তৃণগুল্মাচ্ছাদিত আরও কিঞ্চিৎ স্থান থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক, ইহাতে দিগ্বলয়-সমীপবর্ত্তী মুক্ত ও তুষারমণ্ডিত তুঙ্গশৃঙ্গ (offskip s) যাহা মেঘরাগরঞ্জিত আকাশের পার্শ্বে কোথাও উজ্জ্বল ও কোথাও বা ম্লান হইয়া মেঘেরই মত যেন মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অচলক্রোড়ে নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনীও বেশ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত। এতদ্ব্যতীত নিকটস্থ পাহাড় তরুগুল্ম গোমৃগাদির সন্নিবেশও যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বিজ্ঞানশুদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষির বন্দনার ভাবও

অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মোটের উপর এ চিত্র দেখিয়া হিতেন্দ্র বাবুর যে সুন্দর পরিকল্পনাশক্তি ও চিত্রবিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মূল চিত্রখানির সহিত এই মুদ্রিত ত্রিবর্ণ-চিত্রের তুলনা করিলে বুঝা যায়, ইহাতে সেই সৌন্দর্য্য সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। এ দেশীয় ত্রিবর্ণ-চিত্রে এখনও সকল বর্ণের সম্যক বিকাশ হইতে দেখা যায় না। একটী বিষয়ে অন্যসাধারণ শিল্পীর ন্যায় হিতেন্দ্র বাবুরও বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, সে কারণ তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না, যে হেতু ইহা এ পর্য্যন্ত এ দেশীয় শিল্পিগণের সাধারণ দোষ বলিয়াই পরিগণিত। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে প্রত্যেক শিল্পীরই সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তদ্বিষয়ে সাবধান করিবার জন্যই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। ইহা 'মহর্ষি বশিষ্ঠ' চিত্রেরই সমালোচনা বলিয়া যেন কেহ গ্রহণ না করেন।

যে কোনও চিত্রাঙ্কনকালে চিত্রের প্রতিপাদ্য স্থান, কাল ও অবস্থার বিষয় শিল্পীর চিন্তা করা আবশ্যক। চিত্রান্তর্গত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, তাহার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি রক্ষা করা বিধেয়; উদাহরণস্বরূপ এই 'বশিষ্ঠাশ্রম' সম্বন্ধেই বলিতে পারা যায় যে, চিত্রাঙ্কন করিবার পূর্ব্বে শিল্পীর বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, প্রাচীন ইতিহাস বশিষ্ঠাশ্রমের ভৌগোলিক স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা পরিজ্ঞাত হইলে, শিল্পী সহজেই সেই প্রদেশসুলভ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সাহায্যে তাঁহার চিত্রের পরিকল্পনা আরও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিতেন। বশিষ্ঠাশ্রম প্রসিদ্ধ অযোধ্যা নগরের নিকট অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যেই অবস্থিত, পশ্চাতে বা চিত্রের তলপৃষ্ঠে (back-ground) পূতসলিলা সরযূ, ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইলেও, তুঙ্গশৃঙ্গ অচলমালার সমাবেশ সম্পূর্ণই অসম্ভব, সুতরাং নদীসৈকতে ও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের সন্নিবেশ প্রকৃত স্থানোচিত হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ে ভারতের শিল্পিগণ এ পর্য্যন্ত আদৌ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। সাহিত্য ও কাব্যের ন্যায় চিত্রশিল্পে ঐতিহাসিক সত্য সংরক্ষিত না হইলে, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইতে পারে না। তাহা না হইলে দেশও শিল্পসম্পদে যথার্থ সমৃদ্ধ ও উন্নত হইবে না, ইহা অবধারিত সত্য।

সন্ধ্যা দেবী।

ইহা হিতেন্দ্র বাবুর পরিকল্পিত আর একখানি মিশ্রশ্রেণীর চিত্র। আধুনিক কোনও কোনও সাময়িক পত্রিকার আদর্শে 'চিত্রপরিচয়' লিখিবার এক নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। 'চিত্র-পরিচয়' বা 'চিত্রব্যাখ্যা' বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। যে কোনও চিত্রের অল্পাধিক সমালোচনা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা বা পরি-চয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, বা ছিল বলিয়া এত দিন জানা যায় নাই। যে চিত্র নিজেই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয়স্থল, যে চিত্র বিশ্বের সার্ব্বজনীন ভাষা, যাহা অনুবাদিত বা ভাষান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই 'বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, (the drawing is a simple kind of shorthand which requires no translation.) তাহার আবার পরিচয় দিব কি?

'একটি গাভী বৃক্ষমূলে দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ,—ক্ষেত্রের শ্যামল তৃণ-চর্ব্বণে নিরত, সহসা গ্রীবা উত্তোলন করিয়া বক্রভাবে পার্শ্বের দিকে দেখিল, বৎসটি ধীরে ধীরে দূরবর্ত্তী হইতেছে, তখন সেই গাভী চঞ্চলনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া হাম্বারবে যেন বৎসকে নিকটে আহ্বান করিতেছে।' এই ক্ষুদ্র দৃশ্যটি যে কোনও নিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক চিত্রক্ষেত্রে বিন্যস্ত হইলে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর বুঝিবার জন্য বোধ হয় ভাষান্তরিত করিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। যে কোনও ভাষাভাষী তাহা দর্শনমাত্রই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। সুতরাং কোনও চিত্রের সমালোচনা-স্বরূপ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় বা চিত্রকলা-বিধানানুসারে তাহার যথাসম্ভব দোষগুণের বিচার ব্যতীত, সেই চিত্রাত্মক প্রত্যক্ষ ভাবের কথা চিত্র-পরিচয়-রূপে কোনও ভাষায় বৃথা লিপিবদ্ধ করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। যে চিত্রনামধেয় বস্তুর সেরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক হয়, তাহা বোধ হয় চিত্রপদবাচ্য হইবার যোগ্য নহে। কাব্যে যে ভাব কবি তাঁহার বিচিত্র শব্দাবলীর সাহায্যে যে ভাষায় ব্যক্ত করেন, সেই ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা উপলব্ধি করেন, অন্যের বা অশিক্ষিতের পক্ষে তাহা অবোধ্য। কিন্তু চিত্র-শিল্পী কর্ত্তৃক সেই ভাব কলাসাহায্যে চিত্রে নিবদ্ধ হইলে, তাহা মস্তিষ্কবিহীন ব্যতীত অন্য কাহারও দুর্ব্বোধ্য থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, আমরা হিতেন্দ্র বাবুর এ চিত্রখানি লইয়া সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহি না। তবে তাঁহার চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, ইহাতে তাঁহার কত দূর শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রে প্রতিপন্ন বিষয় যে কি, তাহা ভাষার সাহায্যে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং এই চিত্র দেখিবামাত্র যে কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, 'সন্ধ্যার একটি সুন্দর দৃশ্য তিনি চিত্রিত করিয়াছেন, আর মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যাসতী পর্ব্বতপাদে ঐ উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর হইতে যেন প্রকৃতির সাময়িক ভাবরাশিকে আকুলপ্রাণে আহ্বান করিতেছেন। নদীসৈকতে অনেক সুন্দরী রমণী শিশুপুত্রগণ সহ সান্ধ্যশোভা উপভোগ করিতেছেন।' এই শব্দ কয়টি এ স্থলে লিখিত না হইলেও, চিত্রের বিষয়গত ভাব বুঝিবার পক্ষে নিশ্চয়ই কাহারও কষ্ট হইত না।

কলাবিধানানুসারে পূর্ব্বকথিত চিত্রের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই ইহা কোন শ্রেণীর চিত্র, তাহা আমাদিগের দেখা আবশ্যক। এরূপ বলিবার কারণ,—শিল্পী ইহাতে সন্ধ্যারাণীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, সুতরাং এই অংশটি প্রকৃতির বহির্ভূত, তাঁহার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা-সিদ্ধ (Designed) সামগ্রী, এবং অবশিষ্টাংশ প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাহা (Heroic Landscape Painting) বিরাট বা বীররসাত্মক চিত্রের অন্তর্ভূত। শিল্পী হিতেন্দ্র বাবু বিরাট শ্রেণীর নিসর্গ-চিত্রাঙ্কণেই যেন একপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাব-গুলি অতি স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ। চিত্রে দিগ্বলয় বা লীয়মান রেখার সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও মেঘাকাশের যেরূপ ধীর ক্রমমিল (Hermoney) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতই শিল্পানুরাগী দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিবে। দূরস্থিত বৃক্ষগুলিও তলপৃষ্ঠস্থিত দৃশ্যাবলীর অনুরূপ মনোমদ ও বিশুদ্ধ ভাবেই চিত্রিত। কিন্তু সম্মুখের পাহাড় ও শিলাখণ্ডগুলি তেমন সুন্দর হয় নাই। এগুলিতে সেই স্নিগ্ধ কোমল ভাবের সুন্দর বিকাশ হয় নাই। এগুলির বর্ণ-বিন্যাস ও রেখাপাত অপেক্ষাকৃত (stiff) তীব্রতর হইয়াছে। সন্ধ্যাদেবীর পশ্চাৎস্থিত

বৃক্ষটিও বড় ভাল হয় নাই। অনেকটা অস্বাভাবিক ধরণের হইয়াছে, যেন নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত বৃক্ষটি চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, পাহাড়ের উপর জাত তরুলতা যে সমতল ভূমির বৃক্ষাদি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের, তাহা সকলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। নিসর্গ-চিত্রে তরুলতাদি চিত্রিত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। পাশ্চাত্য শিল্পিকুলের মধ্যেও অতি অল্প চিত্রকর তাহা যথাযথ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। নিসর্গ-চিত্রের মধ্যে বিবিধ তরুরাজির সৌন্দর্য্য-সমাবেশ বোধ হয় উহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। বিভিন্ন বৃক্ষের পরস্পর আকারগত ও বর্ণগত স্বাতন্ত্র্য, তাহাদের চাকচিক্য ও অবিরত পবন-কম্পিত সচলভাব নিসর্গ-চিত্রের জীবনস্বরূপ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অতি অল্পসংখ্যক শিল্পীই এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রতিমূর্ত্তি (Figures) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বলিতে হয়, হিতেন্দ্র বাবু মন্দ করেন নাই। তাঁহার মূর্ত্তি-কল্পনা বেশ পরিস্ফুট, জীবন্ত, কর্ম্মশীল ও কালবোধক হইয়াছে। কিন্তু তিনি ঠিক এদেশীয় ভাববোধক করিয়া পরিচ্ছদ অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে পাশ্চত্য ভাবের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত উন্মুক্ত স্থানে বস্ত্রাদির যেরূপ গতিশীল ভাব হওয়া আবশ্যক, কেবলমাত্র সন্ধ্যাদেবীর বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও স্থলে তাহার বিকাশ হয় নাই। তবে তাঁহার চিত্রের আলোচনায় ইহা বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার চিত্রিত সম্মুখ-ভূমি (Foreground of Pictures) সেরূপ উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, তাঁহার চিত্রিত দূরদৃশ্যটি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার চিত্রের সম্মুখভূমি এই দূর-দৃশ্যের ন্যায় নিপুণভাবে চিত্রিত হইলে চিত্রখানি নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হইত। তিনি আপন মনে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা যে এরূপ ভাবে সমালোচিত হইবে, হয় ত তিনি তাহা ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহার কার্য্য যে ভবিষ্যতে বহু শিল্পানুরাগীর আদর ও আলোচনার বস্তু হইয়া থাকিবে, তাহা নিশ্চিত। দোষ গুণের মিলনই জগৎ—নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা অবিমিশ্র গুণ কখনও সম্ভবপর নহে। তবে যাহাতে দোষের অপেক্ষা গুণের আধিক্য থাকে, তাহা আদরের বস্তু হয়। সেই জন্য স্বর্গীয় হিতেন্দ্র বাবুর চিত্র দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; আর হতাশপ্রাণে ভাবিতেছি, আমাদেরই দুরদৃষ্টবশতঃ অকালে উদীয়মান শিল্পী হিতেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি!

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহযোগী সাহিত্য।

বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশ।

বিগত অগষ্ট মাসের "মডারন্ রিভিউ" নামক সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত জন্ ল নামক জনৈক ইংরাজ লেখক বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে আধুনিক ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও [illegible]যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অবস্থা বিশদরূপে আলোচিত

হইয়াছে। 'কালা' অর্থাৎ বৈদেশিকগণ কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত ক্রমশঃ সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, অলস ও অভিমানী ব্রহ্মবাসিগণকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া চীন বণিক, ভারতীয় শ্রমজীবী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীরা কিরূপে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে, প্রবন্ধকার তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মবাসিগণ শিশুর ন্যায় সরলচিত্ত ও সুন্দর। কিন্তু তাহাদিগের চরিত্রের এই বিশেষত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। লেখক বলিয়াছেন, যদি কোনও উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর ও কোনও সূক্ষ্মদর্শী লেখক ইতিমধ্যে ব্রহ্মবাসীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া না রাখেন, তাহা হইলে অদূর উত্তরকালে সে শ্রেণীর ব্রহ্মবাসীকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিচিত্র মনুষ্যজাতির কোনও ইতিবৃত্ত আর খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে না। এই নির্দ্দেশ বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী!

ব্রহ্মদেশ ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের লোকবিশ্রুত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে লেখক বলেন,—

"এখানে অভাব-পীড়িতের সংখ্যা অত্যল্প; অধিকাংশ অধিবাসীর অবস্থাই সচ্ছল বটে; কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবর্গ অথবা লক্ষ্মীর বরপুত্র সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজদিগের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তাঁহাদিগকে কোনও মতেই বিত্তশালী বা ঐশ্বর্য্যবান বলা যায় না। ইউরোপীয়গণ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল ও শালকাঠ রপ্তানী করিতে আরম্ভ করায়, উহাদিগের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্ম দেশের জমীদারী স্বত্ব যাহাতে ক্রমশঃ বৈদেশিকগণ বহুপরিমাণে ক্রয় করিতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে তথায় অধুনা নানাবিধ নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইতেছে।"

ব্রহ্মদেশে দরিদ্র্যের ভীষণতার সম্বন্ধে লেখক বলেন, "প্রকৃতপক্ষে কোনও অভাবপীড়িত পুরুষ, রমণী, অথবা শিশু, এমন কি, একটা বৃহৎ পরিবারও প্রয়োজন হইলে সন্নিহিত কোনও মঠে আশ্রয় লইয়া থাকে। সেখানে আহার্য্য ও সময়ে সময়ে বাসস্থানও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কোনও বিষয়ের অভাব নাই। দানেও তাঁহারা মুক্তহস্ত। দ্বাদশবর্ষ বয়সেই ব্রহ্ম-বালককে অন্ততঃ কিছুকাল মঠে অবস্থান করিতে হয়। সুতরাং মঠের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা থাকে। উহা তাহাদিগের পক্ষে নূতন স্থান নহে। বিশেষতঃ, সাহায্যপ্রার্থী, অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র পূর্ব্বে তাহার স্বচ্ছল অবস্থায়, মঠ ও উহার সন্ন্যাসীদিগকে আহার্য্য

প্রভৃতি দান করিয়া আসিয়াছে;—অবস্থার যদি পুনরায় উন্নতি হয়, তাহা হইলে পুনরায় সাহায্য করিবার আশাও রাখে। সুতরাং মঠের সাহায্য লইতে তাহাদিগের মনে কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না; তাহারা হীনতাও বোধ করে না।"

শ্রীযুক্ত জন্ ল মহোদয়ের মতে, প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রবর্ত্তনে ব্রহ্মদেশে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রতিযোগিতা দেশটাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবাসীর চরিত্র প্রতিযোগিতার অনুকূল নহে।"

ব্রহ্মে দারিদ্র্য ও দুঃখ-বৃদ্ধির কারণনির্দ্দেশকালে লেখক বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবাসীর আলস্যপ্রবণতা ও চরিত্রের কতিপয় বিশেষত্বই উহাদিগের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার মুখ্য কারণ।

"ব্রহ্মবাসী অর্থ সঞ্চয় করিতে জানে না। যাহার এক শত মুদ্রা আয়, সে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই আশী টাকা দান করিয়া ফেলে, বাকী বিংশতি মুদ্রা নিজের জন্য ব্যয় করে। কিন্তু তাহার এই দানশীলতার মূলে স্বার্থপরতা বিরাজিত। পুণ্যসঞ্চয় হইবে মনে করিয়াই সে প্যাগোডা-নির্ম্মাণে ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ভোজে অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সমস্ত পুণ্যভাগই সে একাকী ভোগ করিতে চায়। অন্যের সহিত ভাগে উক্তরূপ অনুষ্ঠানে কখনই অর্থব্যয় করিবে না। তাহার স্থির বিশ্বাস, বুদ্ধের উদ্দেশে ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে উপঢৌকন দান করিলেই পরজন্মে সে সুখী হইবে—নির্ব্বাণের পথ তাহাতেই প্রশস্ত হইবে। ইহা ভাবিয়াই সে অপরের সহিত একযোগে অথবা ভাগে কোনও প্রকার সাধারণ হিতকর সদনুষ্ঠানে অগ্রসর হয় না। যদি কেহ কোনও মগকে দাতব্য চিকিৎসালয় অথবা অনুরূপ কোনও মঙ্গলানুষ্ঠানে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সে বলিবে, 'কর বাবদ গবর্মেণ্ট আমার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ লইয়া থাকেন; গবর্মেণ্টই উহার জন্য অর্থ ব্যয় করুন না!' বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসন অনুসারেই মগদিগের চরিত্র গঠিত হয়। তাহারা শিশুর ন্যায় সরলচিত্ত ও অসহিষ্ণু। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশানুসারে তাহারা জীবহত্যার বিরোধী। এ নিমিত্ত কোনও মগ সৈনিক, ব্যাধ, কশাই অথবা ধীবর, কোনও কার্য্যেরই উপযুক্ত হয় না। কোন কোন মগ ধীবরের ব্যবসায় করে বটে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে, তাহারা পরজন্মে পশুজীবন প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত দুঃখে ও কষ্টে কালযাপন করিবে। তাহাদের অদৃষ্টে নির্ব্বাণ-লাভ সহজে ঘটিবে না। প্রাণিবধ করিতে নাই বলিয়াই তাহারা

মৎস্ত ধরিয়া ভূমির উপর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে। রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া গেলে তদ্দ্বারা তাহারা নাপ্‌পি নামক একপ্রকার খাদ্য প্রস্তত করে। নাগ্‌পি-ভোজনে শরীরে নানাপ্রকার ক্ষতরোগ জন্মে। অধুনা মগেরা আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু মেষ, ছাগ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তাহারা কুক্কুটশাবকটি পর্য্যন্ত হত্যা করিতে চাহে না। জীবিত মৎস্য বাজারে বিক্রীত হইতে দেখিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করে। তৎপরিবর্ত্তে শুষ্ক মৎস্য ক্রয় করে।

"বৌদ্ধ মগদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার-স্পৃহার অত্যন্ত অভাব। এ কারণে একে অপরের ভাবী মঙ্গলে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা কেবল আত্মোন্নতি-সাধনেই ব্যাপৃত। নিজের মঙ্গলের নিমিত্তই দানে ও দয়াপ্রকাশে তৎপর। স্বদেশবাসীর কল্যাণ, অথবা মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। সে ইচ্ছাও তাহাদের মনে উদিত হয় না। আমিষভোজী অপেক্ষা নিরামিশাষী মানবের হৃদয়ে কলহ-প্রবৃত্তি অল্প, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বদা উগ্র তাম্রকূট সেবনে মানুষকে অধিকতর অলস ও শ্রমবিমুখ করিয়া তুলে। ব্রহ্মদেশে তাম্রকূটের প্রচলন অত্যন্ত অধিক। এমন কি, দুগ্ধপায়ী মগশিশু যখন কাঁদিতে আরম্ভ করে, তখন প্রসূতি তাহাকে শান্ত করিবার জন্ত শিশুর মুখে চুরুট অর্পণ করে। ইহাতে আলস্যপরায়ণতা ও অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধি পায়। মগগণ আলস্যের আদর্শ। কৃষিকর্ম্ম ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে ইহারা বিমুখ। মগেরা কায়িক পরিশ্রম ঘৃণা করে। ব্রহ্মদেশ যখন মগ নৃপতিদিগের অধিকারে ছিল, তখন রাজা স্বয়ং লাঙ্গল ধরিয়া কিছু জমী চাষ করিতেন। মন্ত্রীরাও তাঁহার অনুকরণ করিতেন। মগ নৃপতিগণ সেকালে কোনও প্রকার কলকারখানার কার্য্যে উৎসাহদান করেন নাই। তাঁহাদের সময়ে বাষ্পীয় পোতাদিও নির্ম্মিত হইত না। এ জন্য ইয়োরোপীয়গণ যখন তথায় প্রথম কল ও কুঠীর কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন মজুরের কার্য্য করাইবার জন্ত সহস্র সহস্র,—লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমজীবীকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন।

"মগ বালকমাত্রই সন্ন্যাসী। অল্প দিনের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম পালন করিতে হইলেও, বালক-সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যার জন্য অপর একটি বালক নিযুক্ত হয়। সে সন্ন্যাসী বালকের সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। সন্ন্যাসীরা

স্বহস্তে কোনরূপ কার্য্য করে না। কেবল প্রভাতে একবার ভিক্ষাভাণ্ডহস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আইসে। ভিক্ষাপাত্র অল্পক্ষণেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহাকে যদি পরিশ্রম বলিতে হয়, মগ সন্ন্যাসী সে পরিশ্রমটুকু করিয়া থাকে! মগেরা সন্ন্যাসী হইতে পারিলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করে। ইহজগতে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধারণা তাহাদের নাই। এই জন্য শ্রমবিমুখ মগ বালক 'ফগি' অর্থাৎ ফকিরী অবলম্বন করে। তখন সে কোনও মঠে ভোজন, শয়ন, তাম্বূল-চর্ব্বণ ও ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করে।"

মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের আলোচনা-কালে শ্রীযুত ল বলেন, "রমণীজন্মে নির্ব্বাণলাভ অসম্ভব জানিয়া মগসন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসীদিগের পরিচর্য্যা ও রন্ধনাদিতেই সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করে। তাহাদের মস্তকের কেশ মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে মালা। যখন কোনও কাজ থাকে না, সন্ন্যাসিনী তখন মালা জপিতে থাকে। বৈদেশিক পর্য্যটকেরা অনেক সময় তাহাদিগকে সন্ন্যাসী ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হন। বাস্তবিক মগ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের আকৃতিগত পার্থক্য অতি সামান্য। পুরুষের কটিদেশে ভিক্ষাপাত্র লম্বিত থাকে; রমণীর ভিক্ষাভাণ্ড মস্তকে থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। আলস্যপরায়ণতাই মগ সন্ন্যাসীর প্রধান দোষ। সে দোষ তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার ফল। কিছুকাল তাম্বূল-চর্ব্বণ, উর্ণনাভ লইয়া ক্রীড়া, অবশিষ্ট সময় ভোজন ও নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। এইরূপে কালক্ষেপ করিয়া মগ সন্ন্যাসী ভাবে, সে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে। জনসাধারণও তাহাই বিশ্বাস করে। কোনও ইংরাজ যদি কোনও সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেন, নির্ব্বাণের অর্থ কি? সে বলিবে, উহার অর্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ইংরাজ যদি কোনও পীতবাসধারী ইউরোপীয়কে উক্ত প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনিও বলিবেন যে, পালি ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থে নির্ব্বাণের বিশদ ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু সে গ্রন্থ অদ্যাপি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই!"

বালকবালিকাদিগের উপযোগী, সন্ন্যাসাশ্রম-প্রবর্ত্তিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে লেখক বলেন,—"বালকেরা মঠের বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে শিখে। সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে শাস্ত্রসংক্রান্ত বিষয়েই শিক্ষা দিয়া থাকেন। বালকেরা পাখীর ন্যায় পাঠ মুখস্থ করে। বিদ্যালয়

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সমস্ত বিস্মৃত হয়; মঠের বিদ্যালয়ই ব্রহ্ম দেশের প্রধান বিদ্যাচর্চ্চার স্থান। কিন্তু বৃটিশ-শাসনে তত্রত্য শিক্ষাপ্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর কিছু কাল পরে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীর এমন পরিবর্ত্তন ঘটিবে যে, তখন তাহার কোনও চিহ্নই থাকিবে না। বহুদূরবর্ত্তী কোনও কোনও পল্লী-বিদ্যালয়ে এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী প্রবেশ-লাভ করে নাই। সেখানে দেখা যায়, ৪০।৫০ টি ছাত্র ভূমিতলে বসিয়া আনতমুখে দেশীয় শ্লেট ও পেন্সিল লইয়া লিখিতেছে। পাঠশালার গুরু, সন্ন্যাসী মহাশয় অনতিদূরে মুদিতনেত্রে বসিয়া আছেন। ছাত্রগণ গুরু-মহাশয়ের প্রশ্নটি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছে, এবং উত্তর লিখিতেছে। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বচরিত-শ্রবণ, ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ ও অঙ্কশাস্ত্রে কিছু ব্যুৎপত্তিলাভ হইলেই বালক বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শুধু ভগবানের স্তব ও স্তোত্র ব্যতীত বালক আর সমস্তই বিস্মৃত হয়। কিন্তু মগ বালক বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে বিনয়ী, নম্র ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে শিক্ষালাভ করে। শিষ্টাচার-শিক্ষায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মত গুরু পৃথিবীতে দুর্ল্লভ।"

শ্রীযুত ল আশা করেন যে, অচিরে বৃটিশ গবর্মেণ্টের সাধু চেষ্টায় ব্রহ্ম দেশের শিক্ষাপ্রণালী সমুন্নত হইবে।

"গত বিশ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মের শাসনকর্ত্তৃগণ ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া আসিতেছেন। পরিদর্শক-বিনিয়োগ, পরীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন, বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্যদান ও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে তাঁহারা সমধিক মনযোগ দিয়াছেন। রেঙ্গুন কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমেরিকান ব্যাপ্‌টিষ্ট কলেজে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত কলেজদ্বয়ে বহু মগ ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে মগ-রমণীরা লেখা পড়ার কোনও ধার ধারিত না। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ ব্রহ্মে পদার্পণ করিবার পর রমণীদিগের মধ্যেও বিদ্যালোচনার সূচনা হইয়াছে। ব্রহ্ম গবর্মেণ্টও রমণীদিগের শিক্ষাবিধানে অবহিত হইয়াছেন।"

মগ-সমাজে রমণীর অবস্থা ও ক্ষণভঙ্গুর বিবাহপদ্ধতির আলোচনা-কালে লেখক মহোদয় বলিয়াছেন, "মগ রমণীরা অত্যন্ত স্বাধীনপ্রকৃতি। যুবতীরা যথেচ্ছ বিচরণ ও স্বেচ্ছামত কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা স্বয়ংবরা হন। যত দিন পর্য্যন্ত স্বামী পত্নীর ভরণপোষণে সমর্থ না হন, ততদিন রমণীরা

স্বামী সহ পিত্রালয়ে বাস করেন। ব্রহ্মদেশে বিবাহপ্রণালী অতি সহজ। কয়েক জন সাক্ষীর সমক্ষে পুরুষ ও রমণী একত্র ভোজন করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহ-বন্ধনের উচ্ছেদও অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু মগ দম্পতীর মধ্যে পরিণয়-বন্ধনের উচ্ছেদ বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, মগ পুরুষ প্রায়ই সহজে সন্তুষ্ট, সরলচিত্ত ও প্রণয়ী। সুতরাং পতি-পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনাও বিরল। স্ত্রীও স্বামীর অনেক আবদার প্রফুল্লমনে পালন করেন।"

ইংরাজ ও মগের মধ্যে বিবাহজন্য কুফল সম্বন্ধে লেখক বলেন যে, "উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষেরা সংপ্রতি মগ-যুবতীর সহিত সম্বন্ধস্থাপনে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ ব্রহ্মদেশের প্রথানুসারে মগ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। মগ রমণী ইংরাজের পত্নী হইতে পারিলেই চরিতার্থ হইয়া যান। ইংরাজের পত্নী হইতে পারিলে ইংরাজ-মহিলাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহার চলিবে, এই আকাঙ্ক্ষা মগ রমণীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মগগণ আদৌ এরূপ যৌন সম্বন্ধের পক্ষপাতী নহেন। আইনানুসারে পরিণয় হইলেও তাঁহারা উহা মঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না। উহা যে একটা প্রকাণ্ড ভ্রম, সে বিষয়ে তাঁহারা নিঃসন্দেহ। প্রতি বৎসরই এইরূপ বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ষে বর্ষে সঙ্কর-বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। যতদিন যৌবন থাকে, যতদিন সন্তান না হয়, ততদিন এরূপ বিবাহ মধুর বোধ হয়। কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরাজ স্বামী মগ পত্নীর সাহচর্য্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাহার উপর বর্ণসঙ্কর পুত্রকন্যা লইয়া তিনি সর্ব্বদাই লজ্জায় ম্রিয়মাণ থাকেন, এবং কুণ্ঠিতভাবে কালযাপন করেন। প্রায়ই দেখা যায়, বিবাহের ফলে স্বামী ঘোরতর পানাসক্ত হইয়াছেন। ক্রমশঃ তাঁহার কাজ কর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাঁহাকে ইংলণ্ডস্থিত আত্মীয়বর্গের প্রেরিত নির্দ্দিষ্ট মাসহারায় জীবনযাপন করিতে হয়। আত্মীয়গণও তাঁহার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। মাসহারা প্রেরণকালে তাঁহারা লিখিয়া থাকেন, যদি তিনি জীবনে কখনও ব্রহ্ম দেশ ত্যাগ না করেন, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রয়াস না পান, তাহা হইলে নিয়মিত অর্থ মাসে মাসে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। অন্যথা অর্থসাহায্য বন্ধ হইবে।"

কিন্তু লেখক মগরমণীদিগের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আশাশূন্য নহেন। মগ-রমণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"পাশ্চাত্য প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা ব্রহ্মে অতিক্রুত প্রসৃত হইতেছে। মগরমণীরা পর্দানশীন নহেন। বাইশ তেইশ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহারা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। সুতরাং শিক্ষা-লাভের যথেষ্ট অবসর ও প্রচুর সুযোগ বিদ্যমান। মগযুবতী স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী, পরিচ্ছন্ন ও গার্হস্থ্য বিদ্যায় দক্ষ। ব্যবসায়বুদ্ধিও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। পিত্রালয়ের দ্বারে বসিয়া অন্ততঃ কিছু পুষ্প বিক্রয় করিতে পারিলেও, তাঁহারা আনন্দিত হন। স্বামী দূরদেশে থাকিলে স্ত্রী অর্থ সঞ্চয় করেন। কোথায় কোন জিনিস অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়, কিরূপ টাকা খাটাইতে হয়, মগরমণীয়া তাহা বিলক্ষণ বুঝেন। তাঁহারা সাধ্বী।"

উত্তর ব্রহ্ম বিশ বৎসর ও নিম্ন ব্রহ্ম অর্দ্ধ শত বৎসর মাত্র ইংরাজাধিকারে আসিয়াছে। এই অত্যল্পকালে ব্রহ্মদেশ কিরূপে পাশ্চাত্য-ভাবগ্রস্ত হইল, ইহা ভাবিয়া লেখক বিস্মিত হইয়াছেন!

"মগেরা কায়িকশ্রমে উদাসীন। এ জন্য ব্রহ্মদেশে মজুরের পারিশ্রমিক অত্যন্ত অধিক। এ নিমিত্ত তথায় বাস করিতে গেলে খরচ অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যায়। সমস্ত দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য। প্রত্যেক নগরে, বিশেষতঃ রেঙ্গুনে ইউ-রোপীয় জুয়াচোরের আমদানী হইয়া থাকে। এই জন্য লোক বিশ্বাস করিয়া কোন যৌথ কারবারে টাকা দিতে চাহে না। ব্যবসায়ে মূলধন ব্রহ্মে নাই বলিলেই হয়। নগদ টাকারও বিলক্ষণ অভাব। মগদিগের মধ্যে—যাঁহাদের ঘরে কিছু সংস্থান আছে, তিনি হয় ত এ কথা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ভ্রমণকারী ব্রহ্মে পদার্পণ করিলেই ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ব্রহ্মদেশে ধনী সম্প্রদায় নাই। মগগণ এমন অলস ও দাম্ভিক যে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে আদৌ সম্মত নহেন।"

ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জন্‌ল বলেন,—"সিংহলের অবস্থা স্মরণ করুন। ব্রহ্মের অবস্থা সিংহলেরই অনুরূপ হইবে। ব্রহ্মের সমস্ত খনি এসিয়াবাসী-দিগের অধিকারে আসিবে। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকারীর বিলাসক্ষেত্রে পরিণত হইবে। পাশ্চাত্য-ভাবগ্রস্ত ভারতবাসী, ইউরোপীয় ও মার্কিণ পর্য্যাটকগণ অবকাশকালে ব্রহ্মে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। চীন ও ভারতবাসীরা ক্রমশঃ 'মগের মুলুক' ছাইয়া ফেলিবে। কিছুকাল পরে বৌদ্ধ মগদিগের কাহিনী উপকথায় পরিণত হইবে।"

অবস্থা শোচনীয় নহে কি?

মানসী।

বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন!
চিরদিন ধরি-ধরি,
খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,
সেই এই-এই করি' যাবে কি জীবন?

উদ্বেল সাগর মত
আশা ভালবাসা যত
উছলিবে অবিরত বিরহে কেবল?
কোথা সে পূর্ণিমা-চাঁদ
পেতেছে প্রেমের ফাঁদ—
কেন এ হৃদয়-বাঁধ সদা টলমল?

কার ঘরে কার হাস
ক'রে আছে মধুমাস—
আমি কেন ফেলি শ্বাস শীত কুয়াসায়?
কোথা রূপে ঢলাঢলি,
কোথা প্রেমে গলাগলি—
আমি কেন দুখে জ্বলি' কাঁদি নিরাশায়?

মেঘের ঘোমটা খুলে'
চায় উষা নদীকূলে,
আমি কেন ভাবি ভুলে'—সে চাহিছে বুঝি!
অলক্ষ্যে পোহায় নিশি—
আলোকিত দশ দিশি,
জাগিয়া—জগতে মিশি' দেহে প্রাণে যুঝি।

কাঁপে বায়ু ফুলবাসে,
মনে হয় সে নিশ্বাসে—
কাছে বুঝি আসে-আসে—চমকিয়া উঠি!
তরুতলে পড়ে ছায়া,
মনে হয় তার কায়া—
গিয়ে দেখি আলো-মায়া—মিছে ছুটাছুটি।

শুনি দূরে ডেকে' কয়
কে কেঁদে চলিয়া যায়—
কাছে গিয়ে দেখি, হায়, বহে নির্ঝরিণী!
কাহারো নাহিক দেখা,
কূলে নাই পদ-রেখা—
আমি সুধু ঘুরি একা, কোথা বিরহিণী:

কোথা তুমি, কত দূরে,
কোন্ সুর-অন্তঃপুরে—
স্বর্ণমেঘ ঘুরে' ঘুরে' রাখে কি আড়ালে?—
ফুলে ছেয়ে দেছে দিক,
গাছে গাছে ডাকে পিক,
কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে!

আমি দুখে অভিমানে,
চাহিয়া আকাশ পানে,
বৃথায় কাতর-প্রাণে ডাকি কি তোমায়?
সজল নয়ন-আগে
কেন ইন্দ্রধনু-রাগে
তোমার বদন জাগে স্বপ্ন-সুষমায়!

তুমি কি জীবনে ভুলে'
কখন গবাক্ষ খুলে
দেখ নি বাতাসে দুলে কত দীর্ঘশ্বাস—
কত শোভা, কত গন্ধ,
কত সুর, কত ছন্দ,
কি যন্ত্রণা, কি আনন্দ, কি চির-বিশ্বাস!

কোন্ জন্মে কোন্ লোকে
দেখেছি সহস্র চোখে—
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস!
ছায়া পিছে কায়া নিয়ে
আজীবন ছুটি, প্রিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ-নাশ!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

দারজিলিং।*

বহু দিন পরে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। "দারজিলিং" মধুর, সুখপাঠ্য। পক্ষান্তরে, ইহা নানা তথ্যের ভাণ্ডার, সুতরাং শিক্ষাপ্রদ; ভ্রমণকারীর পক্ষে অপরিহার্য্য। আমরা সংক্ষেপে এই গ্রন্থের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

গ্রন্থকার "বাঙ্গালী" নহেন। বাঙ্গালা দেশ তাঁহার প্রসূতি নহেন, ধাত্রী। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"আমি পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ—বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা নহে। তথাপি শৈশবে বঙ্গদেশে আনীত হইয়া, মহিষাদলের রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, এই দেশেই লালিত পালিত হইয়াছি। ধাত্রীস্বরূপিণী শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির জল-বায়ুতেই আমার চিত্ত ও দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বঙ্গভূমির মোহন সৌন্দর্য্য-সাগরে আমার চিত্ত ডুবিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর ভাব, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ আমার আপনার হইয়া গিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর ভাষা, আমার নিজের ভাষা বলিতে এক্ষণে আমার সঙ্কোচ নাই।"

বাঙ্গালা ভাষায় প্রভাত বাবু অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ বিদ্যমান। অনেক বাঙ্গালীর রচনায় এরূপ ভাষা-বিন্যাস-নৈপুণ্য বিরল, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। যিনি বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর ভাব, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখকে" আপনার করিয়া লইয়াছেন, "বঙ্গভূমির মোহন সৌন্দর্য্য-সাগরে" যাঁহার "চিত্ত ডুবিয়াছে", তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী হইবেন, তাহা অবশ্য বিচিত্র নহে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, প্রভাত বাবুর সাহিত্য-সাধনা সফল হউক।

লেখক মূল গ্রন্থে দারজিলিংয়ের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। পরিশিষ্টে দারজিলিং ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দারিজিলিং সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, প্রভাত বাবু তাঁহার গ্রন্থে সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে

* দারজিলিং।—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দোবে প্রণীত। কলিকাতার ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

সেই সমুদয় তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। দারজিলিং সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু প্রভাত বাবুর গ্রন্থের ন্যায় কোনও-খানিই সুসম্পূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য নহে। দারজিলিং-যাত্রীর পক্ষে এই গ্রন্থ-খানি 'হস্তামলক' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রভাত বাবুর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তথ্য-সংগ্রহে ও তাঁহার সেইরূপ নৈপুণ্য। বিষয়-সন্নিবেশে ও তথ্য-সমাবেশে যে শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও প্রশংসনীয়।

প্রভাতচন্দ্র সৌন্দর্য্যের উপাসক। নিসর্গই তাঁহার দেবতা। এই গ্রন্থের বহু স্থলে তিনি নিপুণ তুলিকায় নিসর্গের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রভাতচন্দ্রের নিসর্গ-বর্ণন নূতন, মৌলিক ;—চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে। প্রথম অধ্যায় হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি ;—"শুভ বৈশাখের শুক্লা ত্রয়োদশী। আকাশ প্রসন্ন, মেঘমুক্ত। জ্যোৎস্না-রজতধারায় স্নাত নৈশ প্রকৃতির কি শুভ্র, সুন্দর, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য! নীলাম্বরে নক্ষত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নালোকে নিষ্প্রভ। জাহ্নবীর কল-কল তরঙ্গে মধ্যে মধ্যে নানাজাতীয় জলচর বিহগের চীৎকার ; সৈকতে নিশাচর পক্ষীর পক্ষশব্দ ও মধুর অস্ফুট কূজন। বঙ্গলক্ষ্মীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইল। তখন অমর বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী' চিত্তপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নদীবক্ষে বঙ্কিমের ও বাঙ্গালীর সেই অমর মাতৃবন্দনা আবৃত্তি করিলাম। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ;—উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল।"

প্রভাত বাবু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিয়া লিখিয়াছেন ;—

"সে দৃশ্য অপূর্ব্ব, কল্পনার অতীত, ধারণা ও বুদ্ধির অগম্য। নির্নিমেষনয়নে, নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দদেহে সেই অপরূপ রূপসুধা-পানে বিভোর হইলাম। নয়ন ফিরাইতে পারিলাম না,—বুঝি সহস্র চক্ষু থাকিলেও সে রূপ দেখিয়া তৃপ্তি হইত না। * * * প্রসন্ন, মেঘমুক্ত, নির্ম্মল আকাশ হাসিতেছে,—সম্মুখে নিবিড়বনানীমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী স্তরে স্তরে বিস্তৃত। তাহার পর পারে অনন্তহিমানীমণ্ডিত, বিশাল, শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময় পর্ব্বতপুঞ্জ সমুন্নতশিরে দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী তুঙ্গশিখর বিংশতি সহস্র ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। ক্ষীণ নীল আকাশের কোলে চিরশুভ্রতুহিনরেখা, উজ্জ্বলে—মধুরে কি সুন্দর সম্মিলন! অনন্ত তুষারস্তূপ স্তরে স্তরে সজ্জিত ও শত শত যোজন বিস্তৃত—সূর্য্যকিরণে সেই

তুষার গলিয়া সহস্রধারে পড়িতেছে,—আকাশের চিত্রপটে সেই সমস্ত ধারা যেন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই গলিত তুষারপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া, কখনও রজত, কখনও কাঞ্চন, কখনও পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ ও বিচিত্র বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে রঞ্জিত হইয়া নয়ন মুগ্ধ করিতেছে। * * * সেই তরঙ্গায়িত তুষারমালার অপর প্রান্তে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ চূড়া, নগরাজ হিমালয়ের গৌরব-মুকুট, এভারেষ্ট ২৯,০০০ ফুট উর্দ্ধে অম্বর স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত মহান্, সুন্দর ও অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইলাম। ভক্তিরসে চিত্ত আপ্লুত হইল, প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। যাঁহার রূপের কণিকামাত্র লাভ করিয়া প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে,—যাঁহার দীপ্তিতে সমগ্র চরাচর দীপ্তিমান,—যাঁহার জ্যোতির ছটায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—সেই সকল সৌন্দর্য্যের আকর, অনন্ত রূপের প্রস্রবণ, পরম সুন্দর ভূমাপুরুষের উদ্দেশে মস্তক ভক্তিভরে প্রণত হইল।

"কিন্তু কি জানি, কোথা হইতে সহসা আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল, এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার সে অপূর্ব্ব দৃশ্য 'নিশার স্বপন সম' আমাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। আমরাও বিষণ্নমনে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলিং-এ প্রত্যাগমন করিলাম।"

নূতন ব্রতী প্রভাত বাবুর বর্ণনার সৌন্দর্য্য ও ভাষার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কয় জন বাঙ্গালী এমন বাঙ্গালা লিখিতে পারেন? অথচ, বাঙ্গলা ভাষা প্রভাত বাবুর মাতৃভাষা নহে।

প্রভাত বাবু বিষয়-ভেদে রচনা-প্রণালী ও ভাষা-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যে ভাষায় তিনি হিমাচলের সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, দৈনিক ঘটনার উল্লেখকালে তিনি সে ভাষা ব্যবহার করিয়া বিড়ম্বনার ভাগী হন নাই। তাঁহার ভাষা মহান ও উদাত্ত সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় মেঘমন্দ্রের সৃষ্টি করে, আবার তুচ্ছ অথচ মনোরম ঘটনার বর্ণনায় শিশুর সরল কলহাস্যের মত, ক্ষুদ্র নগ-নদীর উপলঘাতী মৃদুনিনাদী প্রবাহের মত অবলীলায় ধাবিত হয়। নূতন লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

এই ভ্রমণ-কাহিনীর অনেক স্থলে গ্রন্থকারের চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে।

বর্ণনায়, মন্তব্যে ও ঘটনা-চিত্রে গ্রন্থকার অজ্ঞাতসারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও অত্যন্ত উপভোগ্য। গ্রন্থকার শৈশবে যুক্তপ্রদেশের রুদ্র-রূপে অনুপ্রাণিত ও যৌবনে বাঙ্গালার শ্যামল সৌন্দর্য্যে পুষ্ট হইয়াছিলেন। শৌর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমান অনুরাগ। এই উভয়-ভাব-পুষ্ট তরুণ চিত্তের উদ্যম ও উৎসাহ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা এই গ্রন্থের বহু স্তরে প্রতিফলিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন চিরপরিচিত মিত্রের সহিত গল্প করিতে করিতে নগরাজের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি। "দারজিলিং" এই জন্য উপন্যাসের ন্যায় মনোহর হইয়াছে।

স্থানাভাবে আমরা এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় দিতে পারিলাম না। স্বল্প পরিসরে তাহা সম্ভব নহে।

গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বাঁধাই চমৎকার ও স্বর্ণ-চিত্রে সমুজ্জ্বল। এমন চকচকে ঝকঝকে সুন্দর বহি অতি অল্পই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে। এই গ্রন্থে বাইশখানি উৎকৃষ্ট হাফ্‌টোন ছবি আছে। তন্মধ্যে তিনখানি ত্রি-বর্ণে ও একখানি দ্বি-বর্ণে মুদ্রিত। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, চিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। এই গ্রন্থের তিনখানি চিত্র,—ত্রি-বর্ণে মুদ্রিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভুটীয়া ভিক্ষু "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইল।

"দারজিলিং" মুদ্রণ-পারিপাট্যে, বহিরাবরণের ঐশ্বর্য্যে ও অগণ্য চিত্রের সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত নয়নরঞ্জন হইয়াছে। এই শারদীয় উৎসবে "দারজিলিং" উপাদেয় উপহারে পরিণত হইতে পারিবে।

দেবরোষ।

১

ত্রিলোচনপুরের বুড়া মহেশ্বরের মন্দির কত কাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পল্লীবাসিগণের তাহা অজ্ঞাত। মন্দির-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম ও প্রতিষ্ঠার সন তারিখ উৎকীর্ণ ছিল; কিন্তু ১২৩২ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে মন্দিরের কিয়দংশ ধসিয়া পড়ায়, সেই ইষ্টকখানি অদৃশ্য হয়। মন্দিরটি এইরূপ ভগ্নাবস্থায় প্রায় চারি বৎসর কাল পড়িয়াছিল, কেহ তাহার জীর্ণসংস্কারে হস্তক্ষেপ করে নাই; অবশেষে ১২৩৬ সালে রাণী হরসুন্দরী সহস্রাধিক মুদ্রাব্যয়ে মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করেন। জনশ্রুতি আছে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনস্থ এক দল বর্গী ত্রিলোচনপুরের রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে, রাজ-মাতুল কোষাধ্যক্ষ ভট্টনারায়ণ রাজকীয় ধনভাণ্ডারের বহু ধনরত্ন প্রাসাদ হইতে অপসারিত করেন। কিন্তু বর্গী সৈন্যগণের কবলে নিপতিত হইবার আশঙ্কায় তিনি তাহা গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে পারেন নাই, সে অবসরও ছিল না; সেই জন্য তিনি ত্রিলোচনপুরস্থ বীরভদ্র নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরের মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া সেই সকল ধনরত্ন লুকাইয়া রাখেন।

প্রাসাদ-লুণ্ঠনের পর দিন বর্গীরা রাজমাতুলের চাতুর্য্যের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সন্ধানে চারি দিকে লোক প্রেরণ করে; তিনি অবিলম্বে ধরা পড়েন। কিন্তু বিস্তর পীড়াপীড়িতেও গুপ্তধনের সন্ধান প্রকাশ করেন নাই। তখন বর্গীরা তাঁহাকে বধ করে। রাজাও এই হাঙ্গামায় নিহত হন। এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, রাণী সারদাসুন্দরী পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শিশু পুত্রটিকে লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন বলিয়া দৈবানুগ্রহে তাঁহারা রক্ষা পান। রাণী সারদা-সুন্দরী, রাণী হরসুন্দরীর স্বামী রাজা চন্দ্রশেখর রায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহী।

ত্রিলোচনপুরের রাজবংশ কমলার অকৃপায় এখন নিঃস্ব। গ্রামের জমীদারী এখন মেসার্স ওয়াট্সন্ কোম্পানীর পত্তনী-তালুক-ভুক্ত; জমীদার-বংশীয়েরা এখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিকে বিভক্ত; তাঁহারা কেহ চাকরী করেন; কেহ চাষ আবাদ করেন; কেহ মোক্তারী করেন; কেহ কিছুই করেন না, অর্থাৎ

তাস, পাশা খেলিয়া কালক্ষেপ করেন, এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে মদ্যপান করেন; কিন্তু তাঁহাদের আভিজাত্য-গর্ব্ব মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালার ন্যায় এখনও দেদীপ্যমান।

২

বর্গীর হাঙ্গামা দেখিয়া যে সময় রাজমাতুল ভট্টনারায়ণ যে ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে ধনরত্নাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে সময় সেই কুটীরস্বামী বীরভদ্র চক্রবর্ত্তী যজমানগৃহে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। সে আশ্বিন মাসের কথা। পূজার পর, তিনি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জমীদার পরিবারের সর্ব্বনাশের কথা জানিতে পারেন। সে সময় গৃহে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই ছিল না। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়,—"আমি বুড়া মহেশ্বর, তোমার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে অশ্বথ বৃক্ষমূলে ভূগর্ভে দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছি। এখানে আমি বড় কষ্টে আছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া একটি মন্দিরে স্থাপন কর, এবং তোমার স্বর্গীয়া জননীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও, আমার ভক্ত; মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তোমার অর্থের অভাব হইবে না; তুমি যে স্থানে শয়ন করিয়া আছ, সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে প্রচুর ধনরত্ন পাইবে; তদ্দ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমার সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে।"

বীরভদ্র প্রভাতে উঠিয়া এই অদ্ভুত স্বপ্নাদেশের যাথার্থ্য-নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন ভূগর্ভে প্রোথিত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি নির্দ্দিষ্ট অশ্বথমূলে উপস্থিত হইয়া চারি দিক্ খনন করিতে করিতে ভূগর্ভে একটি দুই হস্ত দীর্ঘ, সুগঠিত, কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তিনি কয়েক জন শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় বুড়া মহেশ্বরকে স্বীয় কুটীরে আনয়ন করিলেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। অদূরে একটি সুপ্রশস্ত জলাশয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল।—সেই সময় হইতেই এই মন্দির 'বুড়ো মহেশ্বরের মন্দির' ও জলাশয়টি 'বুড়ো মহেশ্বরের পুকুর' নামে খ্যাত। গ্রাম-বৃদ্ধেরা বলেন,—ইহাই মন্দিরের ইতিহাস। কিন্তু এই কাহিনী সত্য কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বীরভদ্রের বংশধরগণ এখন এই মন্দিরের সেবায়েৎ, এবং সদাশিব চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান সেবায়েৎগণের অন্যতম।

৩

সদাশিবের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তিনি সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, শুদ্ধাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ; দোষের মধ্যে তিনি বড় কোপনস্বভাব। তাঁহার ক্রোধের প্রাখর্য্য দেখিয়া ত্রিলোচনপুরের বালক বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে 'দুর্ব্বাসা ঠাকুর' বলিয়া ডাকে। আমরা এই আখ্যায়িকায় সেই নামেই তাঁহার পরিচয় দিব।

দুর্ব্বাসা ঠাকুর কিছু কাল কাশীতে বেদান্তের অনুশীলন করিয়াছিলেন; জ্যোতিষেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা; তিনি পরোপকারী ও উচিতবক্তা; আজ কাল উচিতবক্তা লোক সমাজে আদর লাভ করিতে পারেন না, এ কালে তোষামোদেরই জয়-জয়কার! দুর্ব্বাসা ঠাকুর সকলের মুখের উপর স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দেন বলিয়া তিনি গ্রামস্থ অনেকেরই চক্ষুঃশূল; এমন কি, তাঁহার সহিত বচসা হওয়ায় ওয়াটসন্ কোম্পানীর ডিহি ত্রিলোচনপুরের নায়েব কেশবচন্দ্র সরকার গ্রাম্য বাজারের মোড়লগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাজারের বারোয়ারী পূজার পাণ্ডাগণের নামের তালিকা হইতে তাঁহার নামটি অপসারিত করেন। এই উপলক্ষে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের সহিত বারোয়ারীর পাণ্ডাগণের অত্যন্ত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

৪

ইতিমধ্যে গ্রামে স্বদেশীর ডঙ্কা সজোরে বাজিয়া উঠিল।

গ্রাম্যনায়কগণ বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে স্বদেশী মন্ত্রের ঘোষণা আরম্ভ করিলেন। গণ্ডগ্রামসমূহে সভা বসিল। প্রত্যেক সভায় সহস্রাধিক ব্যক্তি সমাগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ভিন্ন পরদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না।" কোনও সভায় বিদেশজাত দ্রব্যাদি দগ্ধ হইতে লাগিল; কোনও সভায় চিকের অন্তরালে বসিয়া পল্লী-রমণীগণ কাচের বিলাতী চুড়ি ভাঙ্গিলেন; বিদেশী সাবান, বিলাতী জুতা, বিলাতী লবণ ও চিনি পল্লীগ্রামের বাজার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্বদেশপ্রীতিবিষয়ক সঙ্গীতে পল্লীপথ মুখরিত হইতে লাগিল; স্কুলের ছেলেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাজারে বাজারে ঘুরিয়া 'পিকেটিং' আরম্ভ করিল। আনন্দ, উৎসাহ ও চাঞ্চল্যে বঙ্গের পল্লীভবনে নবজীবন সঞ্চারিত হইল।

মফঃস্বলস্থ পল্লীসমূহের স্বদেশী সভার সুদীর্ঘ বিবরণে কলিকাতার পত্রিকায় সংবাদপত্রসমূহের স্তম্ভ পূর্ণ হইতে লাগিল। ত্রিলোচনপুরের

অধিবাসিগণ স্বদেশপ্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে, এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বুড়া মহেশ্বরের মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গনেও এক স্বদেশী সভার অধিবেশন হইল। সভায় উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হইল। তখন স্বদেশী সভার প্রতি গবর্মেণ্টের খরদৃষ্টি নিপতিত হয় নাই, সুতরাং গ্রাম্য জমীদার ও অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় স্বদেশী ও বয়কটের সমর্থন-পূর্ব্বক সুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতৃগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কেহ বলিল, "অদ্বিতীয় বিপিন পাল!" কেহ বলিল, "সুরেন্দ্র বাবু কোথায় লাগেন!"

কিন্তু সেই সভায় দুর্ব্বাসা ঠাকুর যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। স্বদেশের দুরবস্থার কথা আলোচনা করিতে করিতে মনোবেদনায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল; বাজারের দোকানদারদিগের বিলাতী মালের পক্ষপাতের কথা বর্ণনা করিতে করিতে ঘৃণায় তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল লোহিতাভ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি বক্তৃতার উপসংহারে আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"হে দেবদেব মহাদেব, তুমি সাক্ষী, তোমার মন্দির স্পর্শ করিয়া গ্রামের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—আর তাহারা জীবনে বিদেশী পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করিবে না। যদি কোনও স্বদেশদ্রোহী এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তবে হে রুদ্র, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে তুমি উপযুক্ত দণ্ড দান করিও; হে শূলপাণি, তোমার সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে তাহার মস্তক চূর্ণ করিও; তোমার নয়নের বহ্নি যেমন মদনকে ভস্ম করিয়াছিল, তোমার রোষাগ্নি-শিখায় সেও যেন সেই ভাবে ভস্মীভূত হয়।"

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কথা শুনিয়া অনেকে চঞ্চলদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তাহারা প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল।

৫

ত্রিলোচনপুরে স্বদেশীর স্রোত কিছু দিন পর্য্যন্ত পূর্ণবেগে চলিল। বাজারের মাড়োয়ারী বস্ত্রবিক্রেতারা বিস্তর বিদেশী মালের আমদানী করিয়াছিল; তাহারা দোকানে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল,—'দোকান তুলিয়া দিবে, কি দেশী মাল আমদানী করিবে।' লিভারপুলের শুভ্র লবণ লবণবিক্রেতার গুদামে পড়িয়া অভিমানে গলিয়া জল হইতে লাগিল। জুতা-বিক্রেতা দেরাজুদ্দীন মিঞা পূজার চালানে অনেক বিলাতী জুতার আমদানী করিয়াছিল; ক্রেতার অভাবে তাহা প্যাকিং-বাক্সেই

প্যাক্‌বন্দী হইয়া পড়িয়া রহিল। ময়রারা দেশী চিনি আমদানী করিয়া ভিয়ান আরম্ভ করিল। গ্রামের স্বদেশী নেতারা নব উৎসাহে পিতলের 'বোগ্‌নো'তে জল গরম করিয়া, পাথরের বাটীতে চা প্রস্তুত করিয়া, গুড়ের সহযোগে তাহা প্রসন্নবদনে গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন; পাছে স্বদেশী ভ্রমে জাভার চিনি খাইয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতে হয়।

গ্রাম্য মোদকেরা জাভার চিনি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশী চিনি ও 'দোলো' দিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল, ইহাতে তাহাদের বিস্তর লোকসান। গোল্লা রসগোল্লার রঙ্গ ময়লা হইতে লাগিল; বিশেষতঃ, অপরিষ্কৃত স্বদেশী চিনিতে এত গাদ উঠিতে লাগিল যে, রসে ফলন কম হইল। তাহার উপর স্বদেশী চিনি জার্ম্মান্ বীট ও জাভার সস্তা চিনির অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য; সুতরাং নির্দ্ধারিত মূল্যে সন্দেশ মিঠাই বিক্রয় করিলে বিশেষ কিছু লাভ থাকে না দেখিয়া তাহারা সন্দেশের মূল্য বৃদ্ধি করিল। ইহাতে তাহাদের জিনিসের কাট্‌তি কমিয়া গেল। তাহারা চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল, কেহ কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"ভাল গেরোয় পড়া গিয়াছে! এখন করি কি?"

৬

ত্রিলোচনপুরের গোবিন্দ মোদক বাজারের প্রধান ময়রা। তাহার দোকানখানি অন্যান্য মিঠায়ের দোকান অপেক্ষা বৃহৎ, দোকানে আট দশ জন চাকর; প্রত্যহ অপরাহ্নে তাহার দোকানে প্রায় এক মন ছানা আমদানী হইত। ঘি, ময়দা, চিনি—মিষ্টান্ন ও পক্কান্নের সকল উপকরণ সে কলিকাতা হইতে আমদানী করিত। গ্রামের মাতব্বর লোকমাত্রই তাহার খদ্দের। গোবিন্দ যেমন ছানাবড়া, মিহিদানা, রসকদম্ব প্রস্তুত করিত, অন্য কোনও ময়রা তেমন পারিত না। ত্রিলোচনপুরের গোবিন্দ ময়রার ছানাবড়া কলিকাতার বহুবাজারের ভীম নাগের কাঁচাগোল্লার সমকক্ষ; এ বলে 'আমাকে দেখ্', ও বলে 'আমাকে দেখ্।' গোবিন্দ ময়রার ছানাবড়া পূজার সময় হাঁড়ি বোঝাই হইয়া দেশ বিদেশে চালান যাইত।

ভিয়ানে স্বদেশী চিনি ব্যবহার আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদে পড়িল। সে নিজের মন বুঝিতে না পারিয়া বুড়া মহেশ্বরের মন্দির স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, "আর কখনও বিদেশী চিনি স্পর্শ করিব

না।" এখন সে পদে পদে ঠকিয়া নিজের নির্বুদ্ধিতাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল। কিছু দিন এই ভাবে লোকসান সহ্য করিয়া সে সকলের চক্ষুতে ধূলিদানের জন্য এক ফন্দী বাহির করিল। কলিকাতার হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে এক প্রকার বাটা চিনি প্রস্তুত হয়; জাভার চিনিতে জল মিশ্রিত করিয়া তাহা জ্বাল দিয়া যখন জমিয়া যায়—তখন তাহা ঠাণ্ডা করিয়া বাটিয়া লওয়া হয়। এই চিনি অনেকে 'স্বদেশী চিনি' বলিয়া চালায়। তাহার মূল্য জার্ম্মান্ বা জাভার চিনির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, কিন্তু দেশী চিনির মত অধিক নহে। বিদেশী চিনির ব্যবহারে যাহারা অসম্মত, এরূপ অনেক অনভিজ্ঞ লোকের নিকট এই চিনি অনায়াসে স্বদেশী চিনি বলিয়া চালাইতে পারা যায়; বিশেষতঃ, পল্লীগ্রামের লোক ইহাতে যে সহজেই প্রতারিত হয়, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গোবিন্দ ময়রা কলিকাতা হইতে এই নকল স্বদেশী এক চালান আমদানি করিল; সেই বাটা চিনিতে গোবিন্দের দোকানের ভিয়েন চলিতে লাগিল; সন্দেশ মিঠাইয়ের রঙ্গ ময়লা হইল না, অথচ তাহার মূল্যবৃদ্ধি করিবারও প্রয়োজন হইল না। স্বদেশী চিনি ব্যবহারের অসুবিধা দূর হইল। অন্যান্য ময়রারা এ রহস্যের সন্ধান পাইল না। গোবিন্দ জানিত, Trade secret গোপনে না রাখিলে ব্যবসায় চলে না, সে কাহারও নিকট কোনও কথা ভাঙ্গিল না।

এইরূপে নকল স্বদেশী চিনি ব্যবহার করায় গোবিন্দের কারবার কিছু দিনের মধ্যে 'ফলাও' হইয়া উঠিল। তাহার দোকানের গোল্লা রসগোল্লা-গুলির দিকে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়, তাহা হংসডিম্ববৎ শুভ্র;—আর অন্যান্য ময়রার দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা লাল্চে, যেন ইষ্টকনির্ম্মিত শালগ্রাম! ক্রেতারা অশ্রদ্ধায় সে দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। কিছু দিনের মধ্যেই গোবিন্দ ময়রার দোকানে তিনখানির পরিবর্ত্তে পাঁচখানি খোলা চলিতে আরম্ভ হইল। সে দোকানের আয়তন বর্দ্ধিত করিল, এবং খোড়ো বাড়ী ভাঙ্গিয়া পাকা ইমারৎ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক লাখ ইট পোড়াইবার বন্দোবস্ত করিল। সময় বুঝিয়া গোবিন্দের স্ত্রী আবদার করিল, "এবার দুর্গোৎসব করিতে হইবে, মা মহামায়াকে একবার বাড়ীতে আনিয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিব।"

৭

ইতিমধ্যে স্বদেশীর উপর পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি পতিত হইল। পুলিসের

গুপ্তচরেরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, বাজারের কোন্ দোকানে দেশী 'বন্দে মাতরম্' পাড়ের কাপড় বিক্রয় হইতেছে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি দেশী কাপড় ক্রয় করে, এবং তাহাদের মধ্যে কত জন সরকারের নিমক ভক্ষণ করে। লিভারপুলে কাহাদের অরুচি ও স্বদেশী 'হুজুগে'র পর কাহারা মাড়োয়ারীর দোকানে বিলাতী কাপড় লওয়া বন্ধ করিয়াছে।

গ্রামে জনরব উঠিল, যাহারা স্বদেশী করিতেছে, শীঘ্রই তাহাদের গৃহে বোমার অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে! এই অমূলক জনরবে গ্রাম্য স্বদেশ-প্রেমিকগণের হৃদয়ে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। যাহারা ৩০এ আশ্বিন স্বদেশী সভায় যোগদান করিয়াছিল, যাহারা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই!" গাহিয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত, তাহাদের উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল, সঙ্গীত-মুখরিত কণ্ঠ নীরব হইল। অনেক স্বদেশপ্রেমিক অসঙ্কোচে বলিতে লাগিল,—"বিলাতী কাপড় কিনিলেই যদি নিষ্কণ্টক হওয়া যায়, তবে স্বদেশীতে কাজ নাই; দেশী তাঁতীরা নির্ব্বংশ হউক, দেশী মিল্ওয়ালাদের কারবার বন্ধ হউক, স্বদেশী দোকানগুলি উঠিয়া যাউক, আমাদের মাথাব্যথার আবশ্যক নাই।" চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল। কোনও দিকে স্বদেশীর আর কোনও সাড়া শব্দ রহিল না। কেবল বঙ্গের শ্যামল-প্রান্তর-প্রবাহিত সমীরণ-হিল্লোল মর্ম্মপীড়িতা ক্ষুব্ধা বঙ্গজননীর দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী আম্রকানন মর্ম্মরিত করিতে লাগিল, এবং ত্রিলোচনপুরের অধিবাসিগণের নিকট স্বদেশীটা উৎকট দুঃস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল।

৮

কিন্তু বুড়া মহেশ্বরের মন্দিরের সেবায়েত দুর্ব্বাসা ঠাকুর দেবচরণ স্পর্শ করিয়া একদিন যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি বিচলিত হইলেন না। গ্রামবাসিগণের মত-পরিবর্ত্তনে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিলেন, "হে বিশ্বদেবতা মহেশ্বর! তুমি এই সকল প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী অধমগণকে চতুষ্পদ না করিয়া দ্বিপদ করিয়া কেন ভবের মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিয়াছ?" গ্রামের লোকের সহিত দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ভয়ঙ্কর মতভেদ উপস্থিত হইল। দুর্ব্বলতার আঘাত করিয়া কথা বলিলে মর্ম্মাহত হয় না, এমন লোক সংসারে বিরল। দুর্ব্বাসা ঠাকুরের অবিচল স্বদেশানুরাগ দেখিয়া ও তাঁহার তীব্র শ্লেষোক্তি শুনিয়া

অনেকেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। সেই সত্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ মাতৃ-ভক্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ যেখানে যাইতেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সেখান হইতে সরিয়া যাইত; যেন তিনিই অপরাধী, তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

বাহিরে সকলকে বিমুখ দেখিয়া দুর্ব্বাসা ঠাকুর ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তিনি দেবচরণে প্রণত হইয়া অশ্রুরুদ্ধনেত্রে বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন,—"বাবা বিশ্বনাথ! তুমি এ কি করিলে? এই অপোগণ্ড অজ্ঞানান্ধ মূঢ়দের কেন স্বদেশদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত করিলে? ইহারা মহামোহে আচ্ছন্ন; ইহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, মনে সাহস নাই, অন্তরে ধর্ম্মভয় নাই; ইহারা কর্ত্তব্য-পথ-বিচ্যুত হইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। এই গড্ডালিকাপ্রবাহ হইতে আমাকে মুক্ত রাখ; আমি ধন মান চাহি না, খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রার্থনা করি না; আমি কাঙ্গাল। হে কাঙ্গালের কাঙ্গাল! আমাকে চিরজীবন কাঙ্গাল করিয়াই রাখ, কিন্তু তোমার চরণে যেন চিরজীবন আমার মতি থাকে; হে বিশ্বেশ্বর, শ্মশানচারী, পন্নগভূষণ, প্রমথনাথ, দেবাদিদেব আশুতোষ! কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়া আমাকে যেন কোনও দিন মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে না হয়। প্রলয়ের ঝটিকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড করুক, তোমার ডমরুধ্বনি শুনিয়া মরণের বিরাট তাণ্ডব আরম্ভ হউক; হে বিশ্বেশ্বর, তোমার শরণাগত দীন ভক্তকে ত্যাগ করিও না। তুমি সর্ব্বত্যাগী, ত্যাগের মহামন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত কর।"

প্রতি শনি মঙ্গলবারে গ্রামের লোক বুড়া মহেশ্বরের মন্দিরে স্ব স্ব 'মানসা' অনুযায়ী পূজা পাঠাইত। মাসে দশ দিন দুর্ব্বাসা ঠাকুরের পালা। দুর্ব্বাসা ঠাকুর ঘোষণা করিলেন, তাঁহার পালিতে বাজারের অপবিত্র চিনি সন্দেশ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। স্বদেশী চিনি বলিয়া বাজারে যে বিদেশী চিনি চলিতেছে, তাহা দিয়া পূজা পাঠাইলে, তিনি পূজার উপচার দেবচরণে নিবেদন করিবেন না। চিনির পরিবর্ত্তে গুড় বা দোলো (গুড়ে চিনি) এবং সন্দেশের পরিবর্ত্তে ছানা ক্ষীর প্রভৃতি ভিন্ন বাবার ভোগ হইবে না।

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের এই অদ্ভুত আবদার শুনিয়া গ্রামে ভয়ঙ্কর আন্দোলন-তরঙ্গ উত্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল,—"দুর্ব্বাসা ঠাকুর ক্ষেপেচে, দাও ওর পালিতে পূজো বন্ধ করে'; ওর উপযুক্ত শাস্তি হোক, উপোস করে' মরুক ঠাকুর।"

৯

গ্রামের অন্যতম জমীদার ও মোক্তার ভবতারণ রায় জ্ঞাতির সহিত বিরোধ করিয়া একটা বড় জিদের দেওয়ানী মামলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত দুই আদালতে হটিয়া শেষে হাইকোর্টে তাঁহার জয় লাভ হয়। ভবতারণ ঢাক বাজাইয়া মহাসমারোহে বুড়া মহেশ্বরের পূজা পাঠাইলেন। মামলায় জয়লাভের সংবাদ পাইলেই তিনি পূজা পাঠাইবেন, 'মানসা' করিয়াছিলেন; সেই জন্য একদিনও বিলম্ব করিলেন না। সে দিন শনিবার দুর্ব্বাসা ঠাকুরের পালি। নয় দিন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার পালি বলিয়া একদিনও কেহ পূজা পাঠায় নাই; দশম দিনে ভবতারণের প্রেরিত পূজার বহুবিধ উপচার দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল।

গ্রামের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির ন্যায় ভবতারণ বাবুও গোবিন্দ ময়রার খদ্দের। গোবিন্দ ময়রার দোকান হইতে তিনি পাঁচ সের চিনি ও পাঁচ সের গোল্লা পূজার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ভবতারণও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন; তিনি জানিয়া শুনিয়া যে অপবিত্র চিনি সন্দেশ দেবপূজার জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না; অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহারও বিশ্বাস ছিল, গোবিন্দ কাশীর কি কোটচাঁদপুরের চিনিতেই ভিয়েন করে। দুর্ব্বাসা ঠাকুর অত্যুৎসাহী স্বদেশপ্রেমিক,—তিনি জানিতেন, গোবিন্দের দোকানের চিনি জাল স্বদেশী, কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটের বাটা জাভার চিনি!

দুর্ব্বাসা ঠাকুর চিনি সন্দেশ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। ভবতারণের ভৃত্য কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ চিনি সন্দেশ কোন্ দোকানের রে, কালা?"

কালা বলিল, "গোবিন্দ ময়রার দোকানের।"

দুর্ব্বাসা বলিলেন, "বিদেশী চিনিতে মহেশ্বরের ভোগ হবে না। গোবিন্দ ময়রার দোকানের বেবাক চিনিই বিদেশের আমদানী। গোবিন্দ ময়রার দোকানের জিনিসে আমি বাবার ভোগ দিই নে; যা, তুই পূজো ফিরিয়ে নিয়ে যা।"

কালা বলিল, "ঠাকুর, এ আপনার কেমনতর কথা? বাবার পূজো দিতে এসে জিনিস 'পত্তোর' ফিরিয়ে নিয়ে যাব! আপনি বলেন কি?"

দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমি ঠিক কথাই বলচি, বিদেশী চিনি সন্দেশ

মহাদেবের ভোগে লাগ্‌বে না। তোর বাবুকে বল্‌গে,—দুর্ব্বাসা ঠাকুর পুজো ফিরিয়ে দিয়েছে।"

কালাচাঁদ বাবুর পেয়ারের চাকর, কিছু প্রগল্‌ভ; সে বলিল, "আপনাদের সরিকদের পালিতে এ সকল গোলমাল কিছুই নেই; আপনার সকল তাতেই বাড়াবাড়ি! জানেন, এ যার তার পুজো নয়, আপনি হিসেব করে' কথা কইবেন।"

দুর্ব্বাসা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমাকে কি তোর মনিবের গোলাবাড়ীর খাতক পেয়েছিস্? ভবতারণকে বল্‌গে, আমি পুজো কর্‌বো না। বিদেশী জিনিস মহাদেবকে নিবেদন কর্‌তে যাদের লজ্জা হয় না, তাদের পালিতে সে যেন পুজো পাঠিয়ে দেয়। গরীবের জন্যে এক ব্যবস্থা, আর বড়লোকের জন্যে আর এক ব্যবস্থা—আমাকে দিয়ে তা হবে না; দেবতার দুয়োরে সকলেই সমান, বড় ছোট নেই।"

যোড়া ঢাকের বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল। কালাচাঁদ প্রভুকে সংবাদ দিল,—দুর্ব্বাসা ঠাকুর পূজা করিবে না, পূজা ফেরত দিবে, বলিতেছে।

ভবতারণ একে জমীদার, তাহার উপর মোক্তার, সমস্ত পিনাল-কোড-খানি তাঁহার মুখস্থ! তাঁহার পূজা-প্রত্যাখ্যান! ভৃত্যমুখে এই সংবাদ শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে বলিলেন, "কি হে বাপু, তুমি আমার পূজা ফেরত দিতে চেয়েছ কেন? তোমার ত ভারী আস্পর্দ্ধা দেখ্‌চি! আমাকে কি 'হেজি পেজি' লোক পেয়েছ?"

দুর্ব্বাসা বলিলেন, "না, তুমি খুব বড়লোক; কিন্তু আমি মহেশ্বরের সেবায়েত, তাঁর পুজোয় আমি অনাচার ঘট্‌তে দেব না। এই মন্দির স্পর্শ করে দেবসাক্ষাতে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি,—জীবনে বিদেশী জিনিস ব্যবহার কর্‌বো না। গোবিন্দ ময়রা জাভার চিনি স্বদেশী বলে চালায়, তার দোকানের জিনিস অস্পৃশ্য। তুমি পুজো ফেরত নিয়ে যাও, আমি অস্পৃশ্য জিনিস দিয়ে ভগবানের পুজো কর্‌বো না।"

ভবতারণ বলিলেন, "তোমার ত দেখ্‌চি ভারী ধর্ম্মজ্ঞান! গোবিন্দ কখনও বিদেশী চিনি ব্যবহার করে না; আর যদি চিনি দেশী না হয়, তাতেই বা কি? যিনি জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তাঁর স্বদেশ বিদেশ নাই,

তাঁর কাছে কোটচাঁদপুর জাভা সব সমান। বেশী পাকামো করো না, সোজা হয়ে পূজা করো।"

দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, আর তোমার ধর্ম্মজ্ঞান বড় টন্‌টনে! তাই তুমি এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখানেই তা ভাঙ্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌চো না। বিদেশী চিনিতে দেবতার পূজো দিতে এসেছ; আমি তোমার পূজো কর্‌বো না, তোমার যা খুসী কর্‌তে পার।"

ঢাক ঢোল ও পূজার উপচার লইয়া ভবতারণ ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদারের টিট্‌কারী বিষদিগ্ধ শরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন।

কিন্তু মোক্তার ভবতারণ রায় পিনালকোডখানি ওলট্‌ পালোট্‌ করিয়াও প্রতীকারের কোনও পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভবতারণের অপমান করিতে সাহসী হইল; সে সুবিধা পাইলে সকলেরই অপমান করিবে—ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল, ভবতারণের অপমানকে সকলে নিজের অপমান মনে করিতে লাগিল। এই অন্যায় ও অপমানের প্রতীকার হওয়া আবশ্যক।

অবশেষে যুক্তি স্থির হইল, দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে 'একঘরে' কর।

গ্রামে ভবতারণের অসাধারণ প্রতিপত্তি। জমীদার-বংশীয় সকলেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেক দোকানদারকে বলিয়া দেওয়া হইল, দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে কেহ কোনও জিনিস বিক্রয় করিবে না। হাটে যাহারা মাছ তরকারী ফলমূল বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের আদেশ করা হইল, দুর্ব্বাসা ঠাকুরকে যেন এক পয়সার জিনিসও বিক্রয় করা না হয়। গ্রামের গোয়ালাদের উপর হুকুম জারী হইল, দুর্ব্বাসা ঠাকুর কাহারও নিকট এক ছটাক ছানা, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ পাইবে না। সকলেই ভবতারণের আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইল।

বুদ্ধিমানেরা গোবিন্দ ময়রাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি মহকুমায় গিয়া দুর্ব্বাসা ঠাকুরের নামে ক্ষতিপূরণের দাবীতে একদফা দেওয়ানী মামলা আরম্ভ কর। তোমার মিথ্যা বদ্‌নাম রটনা করা হইয়াছে, তোমার দোকানের জিনিস অপবিত্র বলিয়া ফেরত দেওয়া হইয়াছে, এখন আর কে তোমার দোকানের জিনিস লইয়া পূজা দিতে সাহস করিবে? তোমার পশার মাটী।

তুমি দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কাছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পার। ঠাকুর এবার 'সায়েস্তা' হইবে, আর 'গোস্তাকি' করিতে সাহস করিবে না।"

গোবিন্দ ময়রা দুর্ব্বাসা ঠাকুরের ব্যবহারে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এ যুক্তি সে সঙ্গত মনে করিল, এবং চাল চিঁড়া বাঁধিয়া মহকুমায় মামলা রুজু করিতে চলিল।

১১

দুর্ব্বাসা ঠাকুরের গ্রামে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি কোনও দোকানে উঠিতে পান না, কেহ তাঁহার সহিত কথা কহে না, কেহ কোনও জিনিস তাহার নিকট বিক্রয় করে না। ঠাকুরের আহার নিদ্রা বন্ধ হইল; পূজার্চ্চনায় ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। গোবিন্দ ময়রা সদম্ভে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"দুর্ব্বাসা ঠাকুরের বড় দেমাক হয়েছে, ঠাকুরের ছানা ক্ষীর দুধ ঘি সব বন্ধ হয়েছে—তাই মহকুমায় গিয়ে তাকে ঘোল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে' এসেছি। অমি এত ক্ষতি স্বীকার করে' স্বদেশী চিনিতে ভিয়েন করি, আমার বদ্‌নাম! ঠাকুরকে জব্দ করে' বিলিতি চিনিতে সন্দেশ তৈয়ারী কর্‌বো—সেই জিনিসে বুড়ো মহেশ্বরের পূজো পাঠাবো—তবে আমি ৺পরাণ মোদকের ছেলে গোবিন্দচন্দ্র মোদক!"

এ সকল কথাই দুর্ব্বাসা ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার আরাধ্য দেবতা ভিন্ন আর কাহার নিকট মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিবেন? গ্রামের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ। শেষে কি ত্রিলোচনপুরের বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে? সমাজ যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার নিকট গৃহ ও অরণ্য সমান। এ অবস্থায় দেশত্যাগী হওয়াই কর্ত্তব্য।

কিন্তু তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা বুড়ো মহেশ্বরকে কিরূপে ত্যাগ করিবেন? যে দেবতার পূজার্চ্চনা তাঁহার জীবনের ব্রত, একমাত্র তপস্যা, কি করিয়া তাঁহার সংস্রব ছাড়িবেন? দেবপূজাতেই তাঁহার সুখ, দেবারাধনাতেই তাঁহার শান্তি। তিনি ব্যথিতচিত্তে দেবতার পূজা করিতে বসিতেন, তাঁহার হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ বেদনা দেবচরণে নিবেদন করিতেন; সেই পাষাণমূর্ত্তি যেন তাঁহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিত। আশুতোষ তাঁহার সকল সন্তাপ হরণ করিতেন।

একদিন তিনি বাজারে কোনও সামগ্রী ক্রয় করিতে না পারিয়া অনশনে অবনতমুখে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে

দেবচরণে লুটাইয়া পড়িলেন। অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার শীর্ণ গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন,—"হে অন্তর্য্যামী, মহাদেব, শরণাগতবৎসল শঙ্কর, তুমি জান আমার অপরাধ কি? তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া আমি যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা পালনের জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি। সেই জন্যই কি এত লাঞ্ছনা, এত বিড়ম্বনা? সমাজে আমি প্রতিপদে অপদস্থ ও উৎপীড়িত হইতেছি, আমার পরিবারবর্গ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে; কেবল তোমার চরণ স্মরণ করিয়া আমি এতদিন এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি,—আর ত সহ্য হয় না প্রভু, তোমার কার্য্যেই আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি. এ জীবন তুমি গ্রহণ কর। এই অপমান উপদ্রব লাঞ্ছনা বিদ্রূপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। আমার দর্প হইয়াছিল, আমি গ্রামের লোককে শাসন করিব, তাহাদের কদাচার দূর করিব; আমি ক্ষুদ্র কীট, আমার এত দম্ভ কেন প্রভু? তুমি আমার দর্প চূর্ণ করিয়াছ, এখন তোমার ত্রিশূলে আমার মস্তক চূর্ণ কর।"

দুর্ব্বাসা ঠাকুর অনাহারে হত্যা দিয়া মন্দিরমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। গৃহে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ অন্নাভাবে রোদন করিতে লাগিল।

১২

সে দিন বর্ষার আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ ছিল। সন্ধ্যার পর বড় দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। গ্রাম্য জমীদার-বাড়ীতে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে দিন গোবিন্দ ময়রা কয়েক মণ ছানাবড়া, জিলিপী ও মিহিদানার বায়না পাইয়াছিল। বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া সে ভিয়েন আরম্ভ করিল।

পাঁচখানি খোলায় সবেগে ভিয়েন চলিতেছিল।

গোবিন্দ তাড়ু নাড়িতে নাড়িতে তাহার সহযোগিগণের সহিত নিজের বাহাদুরীর গল্প করিতেছিল।

গোবিন্দ বলিল, "দুর্ব্বাসা ঠাকুর এবার খুব জব্দ হবে। আমার দোকানের চিনি সন্দেশ অশুদ্ধ, তাতে দেবতার পূজো হয় না; আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি! মামলাটা আগে জিতি, তার পর দেখ্‌বো দুর্ব্বাসা ঠাকুর কেমন করে গাঁয়ে বাস করে। আমি কি চালকলাখেকো ভিখারী বামুনকে ভয় করি? স্বদেশী নিয়ে ধুয়ে খাব! চিরটা কাল বিদেশী চিনিতে কারবার চালিয়ে এলাম, আজ বলে তা অশুদ্ধ, তাতে দেবতার পূজো হয় না!"

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঝটিকাবেগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল। যেন মহা-রুদ্রের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যুতের লেলিহান্ জিহ্বা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নীলাভ শিখা প্রসারিত করিতেছিল। সুগভীর বজ্রনিনাদে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত শিশু চমকিয়া উঠিল। প্রলয়ের আশঙ্কায় গৃহস্থগণ রুদ্ধদ্বার গৃহে বসিয়া কাতরভাবে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

চরাচর কম্পিত করিয়া কড়্ কড়্ শব্দে আবার বজ্রনাদ হইল। গ্রামবাসিগণ সবিস্ময়ে সভয়ে দেখিল, অতি-উজ্জ্বল নীলাভ আলোকস্তম্ভ গোবিন্দ ময়রার দোকানে নিপতিত হইয়াছে!

* * * *

প্রভাতে গ্রামের লোক শুনিতে পাইল, রাত্রে গোবিন্দ ময়রা বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; দোকানের অন্যান্য লোক মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, মরে নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদেশী গল্প।

বসন্তের দিনে।

বসন্তসমাগমে সুপ্তোত্থিতা ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে যখন শ্যামকান্তি উছলিতে থাকে, গন্ধ-মদ-বিহ্বল আতপ্ত পবন যখন আমাদের দেহে সুখাবেশ ঢালিয়া দেয়, যখন সে সুখস্পর্শে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠে, তখন অকস্মাৎ কি এক অপূর্ব্ব সুখে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়। ভ্রমণেচ্ছা প্রবল হয়—অভাবনীয় ঘটনার লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—এক কথায় বসন্তের সৌন্দর্য্য-মদিরা পান করিতে ইচ্ছা হয়।

গত বৎসর বড় শীত পড়িয়াছিল, তাই বসন্তসমাগমে বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। এই ইচ্ছা যেন আমাকে নেশার মত আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

একদিন প্রভাতে জানালা হইতে দেখিলাম, প্রতিবেশীর বাড়ীর ছাদের উপরে আকাশ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। জানালার কাছে ক্যানারী পাখী অবিরাম ডাকিতেছিল। ডাকিয়া ডাকিয়া তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আরও কত পাখী গ্রামে গ্রামে কণ্ঠ তুলিয়া কত সুরে গান গাহিতেছিল। রাজপথ হইতে সুমিষ্ট কলরব উঠিতেছিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন কোথায় যাইব ঠিক্ ছিল না।

পথে যাহাদের সহিত দেখা হইল, তাহাদের সকলেরই মুখ যেন হাসিমাখা। পুনরাগত

বসন্তের আতপ্ত আলোকে যেন সুখের উষ্ণ নিশ্বাস ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সমস্ত সহর যেন প্রেমের হিল্লোলে পূর্ণ। প্রভাতী বেশে সজ্জিতা যুবতীগণের নয়নের অন্তর্নিহিত কোমলতা, তাহাদের লীলায়িত মন্থরগতি আমার হৃদয়ে বিহ্বলতার সঞ্চার করিতেছিল।

কেমন করিয়া যে সীন নদীর তীরে আসিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকখানি ষ্টীমার সুরেজনেজের অভিমুখে যাইতেছিল। সহসা আমারও উপবনে যাইবার প্রবল বাসনা হইল।

দেখিলাম, 'মুস্' জাহাজের ডেক্ যাত্রি-পরিপূর্ণ। প্রথম সূর্য্যালোক এমনই মোহকর যে, ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে ঘরের বাহির হইয়া পড়ে; বেড়াইতে ও গল্প করিতে ভালবাসে।

ষ্টীমারে এক সুন্দরী আমার পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-মহিলা বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার হাব ভাব অবিকল প্যারী-রমণীর মত। তরুণীর সুঠাম ক্ষুদ্র মস্তক। মস্তকে স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশভার। তরঙ্গায়িত আলোক-প্রবাহের ন্যায় সেই কুন্তলদাম ললাটপ্রান্ত অবধি আসিয়া শ্রুতিমূল স্পর্শ করিয়া অংসোপরি পড়িয়াছে; বাতাসে নাচিতেছে; তরঙ্গে তরঙ্গে নামিয়া গিয়াছে। সেই কোমল কুন্তলরাজি এত সূক্ষ্ম, এত লঘু, এমন চিক্কণ, এত উজ্জ্বল যে, চাহিলেই নয়ন ঝলসিয়া যায়। সেই কেশভার চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা দর্শকের মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।

আমাকে বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, আবার তখনই চক্ষু নত করিলেন। দেখিতে দেখিতে স্ফুটনোন্মুখ হাসির মত এক গুচ্ছ চূর্ণকুন্তল তাঁহার মুখপ্রান্তে পড়িয়া সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল।

শান্ত নদীর আয়তন ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। ঈষৎতপ্ত বায়ুমণ্ডলে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। জীব-জগতের মৃদু গুঞ্জনে বায়ুস্তর কম্পিত হইতেছিল।

সুন্দরী আবার আমার দিকে চাহিলেন। এবার তাঁহার দিকে চাহিতেই বোধ হইল, তাঁহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একেই তিনি স্বভাবসুন্দরী। এখন আবার এই চাহনিতে তাঁহার নয়নের সহস্র প্রচ্ছন্ন মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম, সেই দৃষ্টিতে অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীরতা, প্রেমের মাদকতা, কবির কল্পনা-স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষিত সুখরাশি প্রকাশ পাইতেছে।

বাহুপাশে বাঁধিয়া তাঁহার কানে প্রেমের মধুর রাগিণী ঢালিয়া দিবার জন্য যেন আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু বলি বলি করিতেছি, এমন সময় কেহ আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। আমি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক করুণনয়নে চাহিয়া আছেন।

তিনি বলিলেন, "আপনার সহিত আমার একটা কথা আছে।" আমার মুখের ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "কথাটা দরকারী।"

আমি উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে ষ্টীমারের অন্য ধারে গেলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যখন শীত পড়ে, বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হয়, তখন ডাক্তারেরা প্রত্যহই পরামর্শ দেন,—'পা গরম রাখিও, সাবধান যেন ঠাণ্ডা না লাগে, সর্দ্দি কাশি না হয়, যেন বাতে না ধরে।' তখন সকলেই সাবধান হন। ফ্ল্যানেল, গরম কোট, মোটা জুতা ব্যবহার করেন; এত কাঁপড় ক্রয় করেন যে,

তাহাতে দুই মাস বিছানায় পড়িয়া কাটান যায়; কিন্তু যখন বসন্ত আসে, তরুরাজি মুকুলিত হয়, স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া উঠে, মৃদু বায়ু বহে, উন্মুক্ত প্রান্তর নবীন তৃণ পর্ণ ও বাপজালে সজ্জিত হয়, মনে অকারণ উৎকণ্ঠা ও অবসাদের সঞ্চার হয়, তখন কেহ বলে না,—'সাবধান! প্রেমের ফাঁদে পড়িবেন না! প্রেম চারি দিকে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে; সমস্ত ভূতলের শাণিত করিয়াছে, মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। সাবধান! সাবধান! প্রেম বাত, সর্দ্দি, কাশির চেয়ে ভয়ানক। সে কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার মায়ায় পড়িয়া বোকা বনিয়া লোকে এমন ভুল করিয়া বসে যে, জীবনে আর তাহার সংশোধন হয় না'।"

"হাঁ মহাশয়, আমি বলি, দোকানে যেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়,—'সাবধান! প্রতারকের হাতে পড়িও না।' তেমনই 'সাবধান! বসন্ত আসিয়াছে, কেহ প্রেমে পড়িও না।' বলিয়া সমস্ত প্রাচীরে প্রত্যেক বৎসর গবর্মেণ্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। হাঁ, যখন গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন, তখন এ কাজ আমাকেই করিতে হইতেছে। আমি বলি,—'সাবধান! প্রেমে পড়িবেন না। প্রেম আপনাকে 'পাকড়াও' করিল, দেখিতেছি। পাছে হিমে নাক খসিয়া যায়, এই আশঙ্কায় রুসীয়ার লোক যেমন বিদেশী পথিককে সাবধান হইতে বলে, আমিও সেইরূপ আপনাকে সাবধান হইতে বলিতেছি'।"

আমি এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তাঁহাকে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "মহাশয়, আপনি অনধিকারচর্চ্চা করিতেছেন।" লোকটি ধাঁ করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"মহাশয়,—যদি দেখি, কেহ ডুবিয়া মরিতেছে, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকা কি আমার উচিত? শুনুন,—আমার জীবনকাহিনী, শুনুন, তাহা হইলেই বুঝিবেন, কোন্ সাহসে আমি আপনার সহিত এমন ভাবে কথা কহিতেছি।

"গত বৎসর বসন্ত কালে—গোড়ায় আপনাকে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি জাহাজের আফিসে কর্ম্ম করি। সেখানকার বড় দরের কর্ম্মচারীরা সাধারণ মাঝি মাল্লা আনে আমাদিগকে উপেক্ষা করেন, সেটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য জমকালো পরিচ্ছদ পরিয়া গম্ভীরভাবে বিরাজ করেন। সব অফিসার যদি ভদ্রলোক হইতেন! কিন্তু সে কথা যাক্—

"এক দিন আমি আমার আফিস-ঘর হইতে নীল আকাশের একাংশ দেখিতে পাইলাম, সেখানে গোটাকত সোয়ালো উড়িতেছিল। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। তখন আফিসে টাঙ্গানো কালো কালো মানচিত্রের মধ্যে মনের আনন্দে নৃত্য করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

"আফিস হইতে চলিতে যাইবার ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে, আমি আমাদের হনুমানজীর খোঁজ করিতে গেলাম। লোকটা বড়ই রুক্ষস্বভাব। আমি বলিলাম, 'আমার শরীরটা আজ ভাল নাই।' সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'যাও, যাও, আমি ও সব বিশ্বাস করি না—তুমি কি ঠাওরাও যে, তোমার মত লোকের দ্বারা আমার আফিস চলে যে?' কিন্তু তথাপি আমি চট্ করিয়া আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, সীন্ নদীর তীরে আসিলাম। সে দিনটা এমনই উজ্জ্বল, এমনই মেঘমুক্ত ছিল। আমি সেণ্টক্লাউডে যাইব বলিয়া একেবারে 'মুস্' জাহাজে উঠিলাম। কেন যে আমার আফিসের বড়কর্ত্তা আমাকে ছুটী দিলেন না, বুঝিতে পারিলাম না।

"সূর্য্যালোকে আসিয়া আমার প্রাণটা যেন দরাজ হইয়া গেল। জাহাজ, গাছ পালা, তীরস্থ অট্টালিকা, এমন কি, জাহাজের যাত্রীদের পর্য্যন্ত যেন ভালবাসিয়া ফেলিলাম! আমার একটা নূতন কিছু করিবার ইচ্ছা হইল। তখন বুঝি নাই যে, প্রেম আপনার জাল বিস্তার করিতেছিল।

"ট্রকেডেরোতে এক যুবতী ছোট একটি মোড়ক লইয়া ষ্টীমারে উঠিলেন, এবং আমার সম্মুখস্থ বেঞ্চে আসিয়া বসিলেন।

"যুবতী সুন্দরী বটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বসন্তের প্রারম্ভে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে যুবতীদের অধিকতর সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। তাহারা যেন মদিরা, যেন ইন্দ্রজাল, বা ঐ রকম একটা কিছু,—ঠিক্ বলিতে পারি না। ভরপুর আহারের পর যে উচ্ছলিত সুরা পান করা যায়, অনেকটা তাহারই মত।

"আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতেছিলাম, সেও আমার পানে চাহিতেছিল।—এই ঠিক্ আপনাদেরই মত। অনেক ক্ষণ দৃষ্টি-বিনিময়ের পর বোধ হইল, সুন্দরীটি আমার পরিচিতা। মনে হইল, এখন কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। আমি কথা তুলিলাম, সেও উত্তর দিতে লাগিল। বোধ হইল, সে নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা—তাহার সহিত আলাপ করিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

"সেণ্ট্ ক্লাউডে সে নামিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। সে ষ্টীমারের লোকদের কি একটা কাজের কথা বলিবার জন্য ফিরিল। ঠিক সেই সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। দুই জনে পাশাপাশি চলিতে লাগিলাম। বাতাসের মধুর স্পর্শে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আমি বলিলাম,—'উপবন এখন বোধ হয় খুব রমণীয় হইয়াছে।'

"সে বলিল, 'হাঁ।'"

ওখানে একবার বেড়াইলে হয় না? আপনি কি বলেন?'

"আমি কি বলিতেছি, ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে সম্মত হইল। আমরা বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া পাশাপাশি চলিতেছিলাম। বৃক্ষের পল্লবগুলিতে এখনও শীতের তুষারপাতের হাস্যরা-চিহ্ন বর্ত্তমান। নিম্নে হরিৎ বর্ণ তৃণপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে স্নাত হইয়া জ্বলিতেছিল। সকল প্রাণীই যেন প্রেমপূর্ণ চারি দিকে বিহঙ্গকূজন শোনা যাইতেছিল।

"তখন কাননের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমার সঙ্গিনী মনের আনন্দে দৌড়াইতে ও নাচিতে লাগিল। আমিও তাহারই মত দৌড়াইতে ও নাচিতে লাগিলাম। মহাশয়, মানুষ কখনও কখনও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহার পর সে প্রাণঘাতী গীত আরম্ভ করিল! আহা! কবি মুসেটের গান কত কবিত্বপূর্ণ বোধ হইতেছিল। ভাবাবেশে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ ছেলেমানুষীতেই আমাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। মহাশয়! আমার কথা বিশ্বাস করুন, যে নারী প্রান্তরে বসিয়া গান করে, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবেন না—কবি মুসেটের গান করিলে ত কথাই নাই!—

"শীঘ্রই সে শ্রান্ত হইয়া একটা ঢালু জায়গায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। আমি

তাহার পদপ্রান্তে বসিলাম। আমি তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার হস্তধারণ করিলাম। তাহার হস্তে সূচীকার্য্যের চিহ্ন ছিল। আমি ভাবিলাম, এ দাগগুলি পরিশ্রমের পবিত্র চিহ্ন! মহাশয়, পরিশ্রমের পবিত্র চিহ্নের অর্থটা কি জানেন? সেগুলা তাহার শত শত কলঙ্ক-কাহিনীর চিহ্ন,—সাধারণ কারখানার অভিজ্ঞতার চিহ্ন—কুৎসিত গন্ধে কলঙ্কিত আত্মার চিহ্ন—সতীত্বলোপের চিহ্ন—নিত্যদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের চিহ্ন—ইতর স্ত্রীলোকের সঙ্কুচিত মনের চিহ্ন! এই চিহ্নগুলি তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে পবিত্র চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল!

"আমরা উভয়েই সতৃষ্ণনয়নে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়াছিলাম। ওঃ! স্ত্রীলোকের চোখের কি মোহিনী শক্তি! মানুষকে যেন অভিভূত, আত্মহারা ও মোহাবিষ্ট করিয়া তুলে, মানুষের উপর রাজত্ব করে। এ মোহ কি গভীর! ইহাকে কিরূপ আনন্দের আভাসপূর্ণ—কিরূপ অসীম বলিয়া মনে হয়! প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীলোকের নয়নে নিজের আত্মার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। কি বিড়ম্বনার কথা! তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মানুষ এতদিন বুদ্ধিমান্ হইয়া যাইত।

"অবশেষে আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। আমার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। সে বলিল,—'থাক্, পায়ের কাছে বোসো।'

"তখন আমি জানু পাতিয়া তাহার নিকট বসিলাম, এবং হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিলাম। যে কণ্ঠাগত প্রেমের কথা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছিল, তাহাকে সব বলিয়া ফেলিলাম! সে আমার ভাবান্তর দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে চাহিল। যেন তাহার নয়ন বলিতেছিল,—'ওগো বঁধু, এমনই করিয়াই তোমাদের খেলান যায়—আচ্ছা, দেখা যাক্ কত দূর গড়ায়?'

"মহাশয়, প্রেমের হাটে আমরা চিরদিনই ঠকিয়া আসিতেছি, এবং এই কারবারে স্ত্রীলোকেরাই পাকা ব্যবসায়ী।

"আমি ইচ্ছা করিলে তখনই তাহাকে মুঠার ভিতর আনিতে পারিতাম। কিন্তু পরে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ত শুধু প্রেম চাহিয়াছিলাম—নারী-মাধুর্য্যের আদর্শ খুঁজিতেছিলাম। আমি সে সময়টা অন্য কাজে লাগাইতে পারিতাম; কিন্তু তাহা না করিয়া ভাববিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার প্রেমের কথা শুনিয়া যখন সে তৃপ্তিলাভ করিল, তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা সেণ্টক্লাউডে ফিরিয়া আসিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহার বিমর্ষভাব দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—'আমার বোধ হয় এমন দিন মানুষের জীবনে বড় অধিক দেখা যায় না।' আমার বক্ষঃস্পন্দন আরম্ভ হইল।

"আমি তাহার সহিত প্যারী নগর অবধি গমন করিলাম।

"আমি পরের রবিবারে তাহার সহিত দেখা করিলাম। তাহার পরের রবিবারে আবার দেখা হইল। এইরূপে প্রত্যেক রবিবারেই আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। আমি তাহাকে লইয়া বুগীভাল, সেণ্টজার্ম্মান, মেজলাফিত পোয়াসি প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। অর্থাৎ, যেখানে প্রেমের প্রবাহ বহিত, সেইখানেই যাইতাম। মায়াবিনী আমাকে ভালবাসিবার ভাণ করিতে লাগিল।

"তাহার পর একদিন আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিন মাস পরে আমি তাহাকে বিবাহ করিলাম।

"বুঝিলেন ত মহাশয়, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াইল? আফিসের এক জন সাধারণ কেরাণী একাকী জীবন যাপন করে, সংসারে আপনার বলিবার তাহার কেহ নাই; একটা সুপরামর্শ দেয়, এমন বন্ধু নাই। সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে কত কল্পনা করে, কতবার আপন মনে ভাবে যে, মুগ্ধহৃদয়া রমণীর সংসর্গে হয় ত সমস্ত জীবন মধুময় হইতে পারে। তাহার পর একদিন সুখের আশায় সে এইরূপ একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া ফেলে।

"তখন তাহার সেই প্রেমের প্রতিমা, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, ক্রমাগত গালি দিতে থাকে। সংসারের কিছুই বুঝে না, গৃহস্থালীর কোনও কাজ জানে না! কিন্তু সারাদিন তাহার বাজে গল্পেরও অন্ত নাই! যতক্ষণ না মাথা ধরে, ততক্ষণ কেবল মুসেটের গান করে। ওহো! কবি মুসেটের গানই সে কি ভয়ানক রকম জানে! ইহার উপর কয়লাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে। দ্বারবানের কাছে ঘরের কথা বলে। প্রতিবেশিনার নিকট স্বামীর প্রেম সোহাগের গল্প করে। পথের ঝাড়ুদারের কাছে স্বামীর কুৎসা রটায়। তাহার মস্তিষ্ক অসংলগ্ন গল্পে পরিপূর্ণ; নির্ব্বোধোচিত সংস্কারের আধার। কথায় কথায় এমন অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করে যে, না হাসিয়া থাকা যায় না! তাহার কাজে ও কথায় আশ্চর্য্য রকম কুসংস্কার প্রকাশ পায়। তাহার এই ভাব এত প্রবল যে, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলে চোখ ফাটিয়া যায়, চোখে জল আসে।"

প্রেমকাহিনী বলিতে বলিতে লোকটার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; সে থামিয়া গেল। দেখিলাম, সে বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছে।

বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। তাহাকে গোটাকত কথা বলিব মনে করিতেছি, এমন সময় ষ্টীমার থামিল। আমরা সেণ্ট্ ক্লাউডে পঁহুছিলাম। যে সুন্দরী আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ষ্টীমার হইতে নামিবার জন্য উঠিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একটু মধুর হাসি হাসিয়া কুটিলকটাক্ষে একবার আমার দিকে চাহিলেন। সে হাসিতে পুরুষের মুণ্ড ঘুরিয়া যায়!

তরুণী। 'পণ্টুনে'র দিকে চাহিলেন—আমি তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিলাম। কিন্তু সেই লোকটি আমার কোটের প্রান্ত ধরিয়া ফেলিলেন। আমি জোর করিয়া তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ফেলিলাম। তিনি আমার ওভারকোট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন,—"মহাশয়,—যাবেন না! যাবেন না!" বলিতে বলিতে আমাকে খানিকটা পশ্চাতের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। তিনি কথাটা এত চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ষ্টীমারের সকলেই আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। আমি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া অটল হইয়া রহিলাম; কেবল কলঙ্ক রটনা ও বিদ্রূপের ভয়ে সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

সুন্দরী পন্টুনের উপর দাঁড়াইয়া হতাশনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আর আমার হিতৈষী সেই পুরুষপ্রবর আনন্দে হস্তকণ্ডুয়ন করিতে করিতে আমার কানে কানে বলিলেন, "মহাশয়। আজ আপনার ভারী উপকার করিয়াছি।" *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

---

* গীদে মোপাঁসার মূল ফরাসী গল্প হইতে অনূদিত

প্রাচীন ভারতে পণ্যাধ্যক্ষ ও নাবধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য।

[চাণক্য হইতে সঙ্কলিত।]

১। পণ্যাধ্যক্ষ।

পণ্যাধ্যক্ষ, যে সকল পণ্য স্থলে উৎপন্ন, বা জলজাত, এবং যাহা নদী বা স্থলপথে আনীত হইয়াছে, তাহাদের গ্রাহকতা ও মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির অনুসন্ধান করিবেন। তিনি তাহাদের বণ্টন, কেন্দ্রীভূতকরণ ও ক্রয় বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করিবেন।

যে সকল পণ্য অনেক দেশে পাওয়া যায়, তাহা এক স্থানে একত্রীভূত করিতে হইবে, এবং উহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। যখন এই বর্দ্ধিত-মূল্যেই সকলে উহা ক্রয় করিবে, তখন উহার আরও মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইবে।

রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইবে, তাহাও একত্রীভূত করিতে হইবে। বিদেশ হইতে যে সকল পণ্যের আমদানী হইবে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রক্ষিত হইবে। উভয় প্রকার পণ্যই প্রজাকে সুবিধাজনক দরে বিক্রয় করিতে হইবে। যাহাতে প্রজার ক্ষতি হয়, এরূপ উচ্চমূল্য তিনি গ্রহণ করিবেন না।

যে সকল পণ্যের গ্রাহক অধিক, তাহাদের বিক্রয় সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্ধারিত সময় থাকিবে না, এবং তাহাদের একত্রীভূত করিবারও কোনও আবশ্যকতা নাই। বৈদহকগণ (ফেরিওয়ালা) রাজকীয় পণ্য ভিন্ন ভিন্ন হাটে নির্দ্ধারিতমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে, যে ক্ষতি হইবে, সেই হারে ক্ষতিপূরণ দিবে।

যে সকল পণ্য ঘনফল অনুসারে বিক্রীত হইবে, তাহাতে বিক্রীত দ্রব্যের ১/১৬ অংশ ব্যাজী প্রদান করিতে হইবে; যাহা তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন হইয়া বিক্রীত হইবে, তাহার জন্য ১/২০ অংশ এবং সংখ্যানুসারে বিক্রীত হইলে ১/১১ অংশ ব্যাজী স্বরূপ দিতে হইবে।

যাঁহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানী করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন; নাবিক ও যে সকল সার্থবাহ বৈদেশিক দ্রব্য

আমদানী করিবেন, তাঁহাদের শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন; কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন।

যাহারা রাজকীয় পণ্য বিক্রয় করিবে, তাহারা তাহাদের পণ্যমূল্য যেন নির্দ্ধারিত স্থানে উপরে ছিদ্রবিশিষ্ট কাষ্ঠের বাক্সে রক্ষা করে। দিবাভাগের অষ্টম ভাগে তাহারা অধ্যক্ষকে বিক্রেয় অর্থ প্রদান করিয়া বলিবে যে, "ইহা বিক্রয় হইয়াছে, এবং ইহাই অবশিষ্ট আছে।" তাহারা তুলা ও মানদণ্ডও অধ্যক্ষকে প্রত্যর্পণ করিবে। স্থানীয় দ্রব্য-বিক্রয়ে এই রীতি পালন করিতে হইবে।

বিদেশে রাজকীয় পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে;—

বৈদেশিক ও স্থানীয় পণ্যের বিনিময়ের তুলনা করিয়া অধ্যক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, শুল্ক বর্ত্তনি (রোড্-সেস্), অতিবাহক (যান-কর), গুল্মেদেয় কর, তরদেয় (খেয়াঘাটে দত্ত কর-বিশেষ), ভক্ত (বণিক ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের বেতন), এবং ভাগ (বৈদেশিক রাজাকে পণ্যের যে অংশ প্রদান করা হইত —এই সকল ব্যয় করিয়া লভ্যাংশ থাকে কি না। যদি লভ্যাংশ কিছুই না থাকে, তবে স্বদেশজাত পণ্যের সহিত বৈদেশিক পণ্যের বিনিময় করিলে লাভ হয় কি না, অধ্যক্ষ ইহা বিবেচনা করিবেন। যদি লাভ হয়, এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি স্থলপথে তাঁহার পণ্যের চতুর্থাংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন। যে বণিককে অধ্যক্ষ এই কার্য্যে বিদেশে প্রেরণ করিবেন, তিনি অধিক লাভের জন্য সীমান্তরক্ষক এবং নগর ও জনপদের কর্ম্মচারিগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিবেন। বণিক নিজ জীবন ও অর্থ নিরাপদে রাখিবার যত্ন করিবেন। যদি তিনি নির্দ্ধারিত স্থানে না পঁহুছিতে পারেন, তবে তিনি সুবিধা বুঝিয়া পণ্য বিক্রয় করিবেন।

বণিক যানভাগ, পথের ব্যয়, স্বদেশীয় পণ্যের বিনিময়ে বৈদেশিক যে পণ্য পাওয়া যায়, তাহার মূল্য, যাত্রাকাল, পথিমধ্যে বিপদ্-প্রতীকারের উপায়নির্দ্ধারণ, এবং বাণিজ্যবহুল নগরের ইতিহাস, এই সকল বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন।

নদীপথে বাণিজ্যবহুল নগরের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি তাঁহার পণ্যদ্রব্য লাভজনক স্থানে প্রেরণ করিবেন, এবং যে সকল স্থানে লাভের সম্ভাবনা নাই, সে সকল স্থান পরিহার করিবেন।

২। নাবধ্যক্ষ।

নাবধ্যক্ষ সমুদ্রগামী জাহাজ ও যে সকল জাহাজ নদীমুখ, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হ্রদ ও স্থানীয় অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গের নিকটবর্ত্তী নদীতে গমনাগমন করে, তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করিবেন।

সমুদ্রতীরস্থ ও নদী ও হ্রদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। মৎস্যজীবিগণ তাহাদের ধৃত মৎস্যের এক-ষষ্ঠাংশ নৌক-হাটক (মৎস্য ধরিবার অনুমতির জন্য দেয় শুল্ক) স্বরূপ প্রদান করিবে। বণিকগণ পত্তনে তাহাদের নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। রাজকীয় জাহাজে আগত যাত্রিগণ আবশ্যক ভাড়া প্রদান করিবে। যাহারা শঙ্খ ও মুক্তার সংগ্রহে রাজকীয় নৌকা ব্যবহার করিবে, তাহারা আবশ্যক ভাড়া দিবে; অথচ তাহারা নিজ নিজ নৌকাও ব্যবহার করিতে পারিবে।

নাবধ্যক্ষ পণ্যপত্তনে প্রচলিত রীতিনীতির অবধান করিবেন, এবং পত্তনাধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিবেন। পণ্যপত্তনে যখন কোনও বাতাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে, তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার ন্যায় অনুগ্রহ দেখাইবেন (যত্ন করিবেন)।

যে সকল জাহাজের পণ্য জলদুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে; অথবা অর্দ্ধেক শুল্ক লইয়াই তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল জাহাজ গন্তব্য পথে কোনও বন্দরে অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি করিবে, তাহাদিগকে শুল্কপ্রদানে অনুরোধ করিতে হইবে।

হিংস্রিকা (দস্যুজাহাজ), যে সকল জাহাজ শত্রুর রাজ্যে যাইতেছে, এবং যে সকল জাহাজ পণ্যপত্তনে প্রচলিত নিয়মাবলী পালন করে নাই, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে।

যে সকল মহানদীতে শীত ও গ্রীষ্মকালেও পার হওয়া যায় না, তথায় শাসক, নিয়ামক ও ভৃত্যবর্গ সহ বৃহৎ নৌকা রাখিতে হইবে।

যে সকল ক্ষুদ্র নদীর জল বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়, তথায় ক্ষুদ্র নৌকা রাখিতে হইবে। অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পারাপার নিষিদ্ধ—কেন না, তাহা না হইলে রাজদ্রোহিগণ অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিবে। যখন কোনও ব্যক্তি নির্দ্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অসময়ে ও অপর স্থান দিয়া নদী পারাপার

করিবে, তখন তাহার প্রতি প্রথম প্রকারের দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে। অনুমতি ব্যতিরেকে নদী পারাপার করিলে ২৬৪ পণ দণ্ড হইবে।

কৈবর্ত্ত, কাষ্ঠ, তৃণ, পুষ্প ও ফলের বহনকারী, উদ্যানরক্ষক, গোপালক, যে সকল ব্যক্তি অপরাধীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অগ্রবর্ত্তী দূতের পশ্চাদ্‌গামী ব্যক্তিগণ, এবং দ্রব্য, আহার্য্য ও আদেশ পালনকারী ভৃত্য, যাহারা নিজ নিজ খেয়ায় পারাপার হয়, এবং যাহারা গ্রামে বীজ, জীবন-ধারণের আবশ্যক দ্রব্য, পণ্য ও অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করে, তাহারা ইচ্ছামত পারাপার করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ, তাপস, বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিত, রাজ-সন্দেশবাহক ও গর্ভিণীগণ বিনা শুল্কে নদী পার হইতে পারিবে।

বৈদেশিক বণিক্‌গণ, যাহারা এই দেশে অনেক বার আগমন করিয়াছে, এবং যাহারা স্থানীয় বণিক্‌গণের সুপরিচিত, তাহারা পণ্যপত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তি পরের ভার্য্যা, বা কন্যা, বা ধন অপহরণ করিয়াছে, যাহাকে দেখিলে সন্দেহ হয়, বা যাহার সহিত কোনও প্রকার মালামাল নাই, যে হস্তস্থিত মূল্যবান্ দ্রব্য গোপন করিতে চেষ্টা করে, যে সদ্যঃ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে নিজ স্বাভাবিক বেশের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, যে সদ্যঃ সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, যাহাকে ভীত বলিয়া বোধ হয়, যে গোপনে মূল্যবান্ দ্রব্য বহন করিতেছে, যে গুপ্তকার্য্যে অগ্রসর হইতেছে, যে অস্ত্র বা বিদারণক্ষম দ্রব্য লইয়া যাইতেছে, যে নিজ হস্তে বিষ রাখিয়াছে, এবং যে ছাড়পত্র ব্যতীত অনেক দূর হইতে আগমন করিয়াছে, তাহাকে কয়েদ করিতে হইবে।

ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু ও সামান্য বোঝা লইয়া যে নদী পার হইবে, তাহাকে এক মাষা শুল্ক দিতে হইবে।

স্কন্ধে বা মস্তকে বোঝা থাকিলে. গো ও অশ্ব প্রত্যেককে দুই মাষা শুল্ক দিতে হইবে। উষ্ট্র ও মহিষের জন্য চারি মাষা, লঘু শকটের জন্য পাঁচ মাষা, এবং বলদযোজিত শকটের জন্য ছয় মাষা ও বৃহৎ শকটের জন্য সাত মাষা শুল্ক দিতে হইবে। মহানদী হইলে ইহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

জালালউদ্দীন খিলজী।

দাস-বংশের শেষ অধিপতির নাম কায়কোবাদ। কায়কোবাদ অতিশয় কুক্রিয়ান্বিত ও অক্ষম শাসনকর্তা ছিলেন। এই নিমিত্ত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার বিদ্বেষী হইয়াছিল। সেই সুযোগে মন্ত্রী জালালউদ্দীন খিলজী প্রভুর রক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

সুলতান কুতবউদ্দীন আঁইবকের সময় হইতে সুলতান কায়কোবাদের রাজত্ব পর্য্যন্ত যে সকল নরপতি দিল্লীতে আধিপত্য করেন, তাঁহাদের সকলেই তুর্কী। জালাল খিলজী-বংশ-সম্ভূত ছিলেন। (১) এই জন্য তাঁহার রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। দিল্লীর ওমরাহগণ ৮০ বৎসর কাল তুর্কীদিগের অধীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃই তুর্কীর আধিপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা তুর্কীর আধিপত্য-ধ্বংসকারী জালালের বিদ্বেষী হইলেন। জালাল বিবেচনা করিলেন, দিল্লীতে অবস্থিতি করিয়া শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের বিদ্বেষ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইবে, এবং তাহাতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে। এই জন্য তিনি দিল্লীতে প্রবেশ

(১) ঐতিহাসিক নিজাম আহমদের মতে খিলজী-বংশের আদিপুরুষের নাম কালিজ খাঁ। কালিজ খাঁ চেঙ্গিস খাঁর ভগিনীপতি ছিলেন। নিজাম আহমদ চেঙ্গিস খাঁর ভগিনীকে প্রতিহিংসা-পরায়ণা কলহপ্রিয়া রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁহার 'বনি-বনাও' ছিল না। একবার তাঁহার সঙ্গে কালিজ খাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়। চেঙ্গিস খাঁ ভগিনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি তিন সহস্র অনুচর সহ ঘোর ও সিস্তানের মধ্যগত পার্ব্বত্য স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোনও কোনও ইতিহাসবেত্তার মতে পয়গম্বর নোয়া হইতেই খিলজী-বংশের উৎপত্তি। নোয়ার তৃতীয় পুত্রের নাম ইয়াকেস। ইয়াকেসের আট (কোনও কোনও মতে এগার) পুত্র ছিল। এই ইয়াকেসের অন্যতম পুত্রের নাম খিলজী। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক এলফিনষ্টোন্ খিলজীদিগকে তাতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জাক্‌সারটিস নদীর কূলে ইহাদের এক শাখার বাস ছিল। কিন্তু অন্য এক শাখা খ্রীঃ দশম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ঘোর ও সিস্তানের মধ্যগত প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছিল। গজনীর সুলতান সবক্তগীন ও মাহমুদের রাজত্বকালেই আমরা খিলজীদিগকে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। খিলজীগণ বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। জালাল এই খিলজী-বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম মালেক। মালেক গিয়াসউদ্দীন বলবনেরয়া জত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া স্বীয় ক্ষমতার বলে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

না করিয়া কিলুঘরি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অচিরে কিলুঘরি বিচিত্র সৌধমালায় ভূষিত হইয়া উঠিল। ব্যবসায়ীরা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তথায় পণ্যশালা স্থাপন করিল। লোকে কিলুঘরিকে নূতন নগরী নামে অভি-হিত করিতে লাগিল। জালালের ক্ষমতা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। অব-শেষে বিদ্বেষী ওমরাহগণও তাঁহার সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় সদাশয় ও ক্ষমাশীল মোসলমান অধিপতি কখনও ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

জালাল শত্রুকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে মোগলেরা ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। তিনি তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করেন। এক সহস্র মোগল তাঁহার বন্দী হয়। কিন্তু জালাল ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান-পূর্ব্বক নিরাপদে স্বদেশে গমন করিবার অনুমতি দেন। আমরা তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও সদাশয়তার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক খাজু জালালের মস্তক হইতে রাজমুকুট কাড়িয়া লইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, এবং স্বনামে খোতবা ও সিক্কা প্রচলিত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সহ রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হন। জালাল শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরব্ধ হয়। রাজসেনাপতি জয়শ্রী লাভ করিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বন্দী করেন; তাহার পর তাঁহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজসকাশে লইয়া যান। সুলতান তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া রুমাল দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া বলিয়া উঠেন,—"এ কি!" তিনি তাঁহাদের বন্ধনমোচন করিবার আদেশ করেন, এবং নানারূপ সদ্ব্যবহারে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে যত্নশীল হন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ সদয় ব্যবহার খিলজী ওমারহগণের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা নানা উপায়ে আপনাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি একদিন বলেন,—"ক্ষমাপ্রদর্শনই শত্রুকে বশীভূত করিবার প্রকৃষ্ট পথ। যদি মোসলমানের রক্তপাত ব্যতীত রাজত্ব করা সম্ভবপর না হয়, তবে আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করিতেছি। কারণ, আমি ঈশ্বরের ক্রোধ সহ্য করিতে পারিব না।" (১)

(১) জালাল ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী প্রভুর রক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া রাজপদ অধিকার করেন।

এইরূপ অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা ও সদাশয়তা নিবন্ধন লোকের মন হইতে রাজভীতি দুর হয়। ইহার ফলে কতিপয় ওমরাহ উৎসাহিত হইয়া জালালকে হত্যা করিয়া মালিক তাজউদ্দীন কুচি নামক এক জন প্রতিষ্ঠাবান্ সেনাপতিকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই সকল ওমরাহের সহিত কুচি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন তাঁহারা কুচির ভবনে ষড়যন্ত্র-সম্পর্কীয় পরামর্শের জন্য মিলিত হইয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন। সুরাপানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলেন। সমবেত ওমরাহগণের মধ্যে এক জন মনে মনে সুলতানের হিতৈষী ছিলেন। তিনি অন্যের অলক্ষ্যে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসমীপে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সুলতান তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া আনিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল রাজবিপ্লব-প্রয়াসী ওমরাহগণকে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকটে আনয়ন করে। তিনি তাঁহাদিগকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। তাহার পর আপনার তরবারি কোষ-মুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট নিক্ষেপ করিয়া বলেন,—"যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমরা এই তরবারি উত্থিত কর।" ওমরাহবর্গ ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন; তাঁহাদের কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। কিন্তু অবশেষে মালিক নশরৎ নামক এক জন ওমরাহ সাহসে ভর করিয়া বলিয়া উঠেন,—"মদ্যপের বাক্য বায়ুর ন্যায় অসার। জাঁহাপনার অভাবে এরূপ সদাশয় ও মহদন্তঃকরণ অধিপতি কোথায় পাইব?" সুলতান নশরতের বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া ঈষৎহাস্যসহকারে সুরা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সুরা আনীত হইলে তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে এক পাত্র প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি অবশিষ্ট ওমরাহদিগকে পুনর্ব্বার যথোচিত ভৎর্সনা করেন; পরে সকলের অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া বিদায় দেন।

সুলতান জালালউদ্দীন অকুণ্ঠিতচিত্তে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ক্ষমা করিতেন। কিন্তু অবশেষে ষড়যন্ত্রের ফলেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল। আমরা সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন এই ষড়যন্ত্রের

কিন্তু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া তিনি পুর্ব্বস্বভাব পরিত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে ফেরিস্তা লিখিয়াছেন,—He * * laid entirely aside his cruelty * * * became remarkable for humanity and benevolence.

নায়ক ছিলেন। সুলতান আলাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দীন ধীশক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু পাপানুষ্ঠানে তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না ; তিনি বিশ্বাস হনন করিয়া আপনাকে কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আলাউদ্দীন ক্রমাগত কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠেন, এবং রাজসিংহাসনে লোলুপ হন। কিন্তু রাজ্যলাভলালসা চরিতার্থ করিবার উপযোগী অর্থবল তাঁহার ছিল না। এই কারণ তিনি দেবগিরি লুণ্ঠন করিবার মনন করিলেন। আলা আট সহস্র পরাক্রমশালী অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন, এবং দেবগিরির রাজাকে অসতর্ক রাখিবার উদ্দেশ্যে চান্দেরী আক্রমণই অভিযানের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়া হঠাৎ দেবগিরির দ্বারদেশে সসৈন্যে উপনীত হইলেন। এই সময় যাদব-বংশীয় রামদেব রায় দেবগিরির অধিপতি ছিলেন। তিনি শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে নির্ভর করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া আলাউদ্দীন প্রচার করিলেন যে, কেবল অগ্রবর্ত্তী সৈন্য দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছে, মূল সৈন্য পশ্চাতে আসিতেছে। আলার কৌশলজালে পতিত হইয়া রামদেব ভীত হইলেন, এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আলা অর্থ-নিস্ক্রয়ে দেবগিরি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজা প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। আলা সর্ত্তমত দেবগিরি পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দেবগিরির রাজকুমার সৈন্য সহ উপনীত হইলেন, এবং পিতার নিষেধ সত্ত্বেও আলার নিকট দুর্ব্বাক্যপূর্ণ পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া আলা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করি-লেন। তুমুল যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। রাজ-কুমারের হঠকারিতা নিবন্ধন দেবগিরির দুর্দ্দশার সীমা রহিল না ; অবশেষে রামদেব অগণ্য ধনরত্ন ও ইলিচপুর প্রদেশের কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া আলার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন ; আলা অতুল যশের ভাগী হইলেন। এই যুদ্ধলব্ধ যশ ও অগণ্য ধনরত্নই তাঁহার সিংহাসনারোহণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

এই জয়বার্ত্তা দিল্লীতে পঁহুছিলে সুলতান অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন, এবং আনন্দজ্ঞাপন জন্য সুরাপান করিয়া আমোদ প্রমোদে নিরত হইলেন। তাহার পর তিনি আলাউদ্দীনকে রাজধানীতে আগমন করিবার জন্য সস্নেহে আহ্বান করিলেন। আলা সুলতানের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই দেবগিরি আক্রমণে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, রাজদরবারে আমার শত্রুর অভাব নাই। আপনার বিনা অনুমতিতে আমি দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ শত্রুগণ এই উপলক্ষে আপনাকে আমার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অতএব রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে আমার মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া একবার আমাকে দর্শন দিলেই আমি নির্ভয় হইতে পারি। এই পত্র পাঠ করিয়া সুলতান বলিলেন, আমি স্বয়ং গমন করিয়া আলাকে আনয়ন করিব: আলা আমার পুত্রতুল্য। মন্ত্রিগণ আলার দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি স্নেহে অন্ধ হইয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহাদের কাহারও সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। সুলতান আলা উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কারা প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী মাণিকপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে আলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম খাঁ তাঁহাকে বলিলেন, আপনাকে দলবল সহ দেখিলে আলার আশঙ্কা দূরীভূত হইবে না। স্নেহান্ধ সুলতান এই বাক্যে একাকীই আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আলা সুলতানকে দেখিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, তার পর সস্নেহে বলিলেন, "আলা, আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। তবে কেন এ অবিশ্বাস?" এই সময় আলাউদ্দীন পূর্ব্বনির্দ্দেশমত সঙ্কেতধ্বনি করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সুলতানের জীবনের অবসান করিয়া দিল।

জালালউদ্দীন কিঞ্চিদধিক আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

কালিদাস ও ভবভূতি।

২। শকুন্তলা ও সীতা।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে শকুন্তলার চরিত্রে আমরা কালিদাসের প্রতিভার পূর্ণবিকাশ দেখি।

প্রথম অঙ্কেই দেখি, বল্কলপরিহিতা যুবতী শকুন্তলা অপর দুইটি যুবতীর সহিত তপোবনে পুষ্পবৃক্ষে জলসেচনে নিযুক্তা। পুষ্পমধ্যে তিনটি যেন জীবিত পুষ্প। চারি দিকে তপোবনের ছায়া, শান্তি ও নির্জ্জনতা। শকুন্তলা নেপথ্যে সখীগণকে ডাকিতেছেন, "ইদো ইদো পিঅসহীও।" সেই মধুর আহ্বান পাঠক যেন কর্ণে শুনিতে পাইতেছেন! তাহার পরে যখন জলকুম্ভ-কক্ষে সখী সহ শকুন্তলা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন দেখি—একখানি ছবি।

প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ও শকুন্তলার কথোপকথনে আমরা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই। অনসূয়া যখন দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "তাত কণ্ব তোমার এই নবমালিকা-কুসুমকোমল দেহকে আলবাল-পূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন", শকুন্তলা কহিতেছেন "শুধু তাত কণ্বের আদেশ নয়; ইহাদের প্রতি আমারও সহোদরস্নেহ বিদ্যমান আছে।"

এই একটি কথায় আমরা শকুন্তলার হৃদয়ের অনেকখানি দেখিতে পাই। তরুলতাদের সহিত শকুন্তলার স্নেহ, যেমন মানুষ মানুষকে ভালবাসে, সেইরূপ। সেই শান্ত তপোবনে অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সখী, কিন্তু তরুলতা ভাই ভগ্নী! তিনি যেন সেই শ্যাম প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র ভ্রাতা ভগ্নীদের যেন নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন! আর সখীদিগের সহিত তাহাদের বিষয় লইয়াই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে, চূতবৃক্ষ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে, অমনি তিনি কহিতেছেন—"দাঁড়াও সখি, ও কি বলে শুনিয়া আসি।" এই বলিয়া শকুন্তলা চূত বৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনি প্রিয়ংবদার যেন বোধ হইল, যেন একটি লতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিল। অনসূয়া বলিলেন,—"বনতোষিণী স্বয়ংবরা হইয়া সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে।

তুমি কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "বনতোষিণীকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আপনাকেও বিস্মৃত হইব"—এই বলিয়া পুষ্পিতা বনতোষিণীকে আর ফলভরে অবনত সহকারকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। এত একাগ্রমনে দেখিতেছেন যে, প্রিয়ম্বদা পরিহাস করিলেন যে, শকুন্তলা এত স্নেহে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে, বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত সংমিলিত হইয়াছে, শকুন্তলার মনের ভাব যে সেও আপনার অনুরূপ বর লাভ করে। শকুন্তলা বলিলেন, "এটি তোমার মনোগত ভাব।" তাহার পরে মাধবী লতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ দেখিয়া সখীদিগের পরিহাসে ঐ একই ভাব দেখি! এ কি মধুর ভাব! এ অপূর্ব্ব সারল্যের কাছে মিরাণ্ডার সারল্য যেন ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়।

সহসা এই শান্ত সরল স্বচ্ছ চরিত্রের উপর দিয়া মৃদুপবনহিল্লোল বহিয়া গেল। সরসীবারি কাঁপিয়া উঠিল। এক সুন্দর সৌম্য যুবাপুরুষ আসিয়া যেন সেই তপস্যা ভঙ্গ করিল! নিদ্রিত সুকুমার শিশু যেন জাগ্রত হইল। সহসা দেখিলাম, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও নারী। দেখিলাম যে, এই হৃদয় শুধুই শান্ত স্নেহ ও নিরাবিল সারল্যেই গঠিত নহে! ইহাতে প্রেমিকের অস্থৈর্য্য আছে, ছল আছে, অসূয়া আছে। অতিথি রাজাকে দেখিয়াই শকুন্তলার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাব আসিল! তিনি রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। এই প্রথম অঙ্কেই স্থানে স্থানে শকুন্তলার মনের বক্রতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রথম অঙ্কে যখন সখীদ্বয় শকুন্তলার মনোভাব জানিতে পারিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন,—"শকুন্তলা, যদি এ সময়ে তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিতেন!" শকুন্তলা যেন কিছু জানেন না এই ভাবে বলিলেন,—"তদো কিং ভবে।" অথচ মনে মনে ভাবিতেছেন, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত না। সখীদ্বয় উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলে জীবনসর্ব্বস্ব-দানেও এই অতিথিকে সমুচিত সৎকার করিতেন।" তদুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন,—"অবেধ তুহ্মে কিম্পি হিঅএ কদুই মন্তেধ ণ বো বঅনং সুণিস্সং।" মুখে বলিতেছেন, তোমরা কি মনে ভাবিয়া এ কথা বলিতেছ, তাহা জানি না, অথচ সে কথা তিনি বেশ জানেন। তিনি মুখে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, অথচ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা বা সংকল্প নাই! চলিয়া যাইতে তাঁহার বল্কল শাখায় জড়াইয়া যাইতেছে। নারীর এই মধুর ছলনা—পদে পদে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার মনের স্বাভাবিক বক্রতা আরও বিকাশ পাইয়াছে। তিনি মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া সখীদের কাছে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং প্রেমিকলাভে সখীদ্বয়ের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা, রাজাকে প্রণয়পত্র লিখিতে শকুন্তলাকে উপদেশ দিলেন। শকুন্তলা প্রেমলিপি রচনা করিলেন,

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা রত্তিং পি।
নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহহখমনোরহাই অঙ্গাইং।"

রাজা অন্তরাল হইতে এই সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি ক্রমে এই তাপসী-ত্রয়ের কাছে আসিলেন। তিনি যে পৌরব রাজা দুষ্মন্ত, এ বিষয়ে আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। পরে প্রিয়ংবদা রাজাকে বলিতেছেন,—

"তেণ হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ভঅবদা মঅণেন ইমং অবত্থন্তরং পাবিদা তা অরিহসি অবভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বইদুং।"

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা স্বীয় ভবিষ্যৎ সপত্নীদিগের প্রতি বক্রোক্তি করিলেন।—"হলা অলং বো অন্তেউর বিরহপজ্জুন্‌সুএণ রাএসিণা অবরুদ্ধেণ।" এইখানে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি তাঁহার অসূয়ার ভাব দেখিয়া আমরা সমধিক বিস্মিত হই। এতও তিনি জানিতেন! বিবাহের প্রস্তাব ঠিক্ হইয়া গেল! রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, শকুন্তলাই তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবেন! সখীদ্বয় দেখিলেন যে, এখন প্রণয়িযুগলকে প্রেমালাপ করিবার অবকাশ দেওয়া উচিত! এই ভাবিয়া সখীদ্বয় যখন ছল করিয়া শকুন্তলাকে রাজার সহিত একাকিনী রাখিয়া গেলেন, তখন শকুন্তলা সহসা একটু শঙ্কিত হইলেন। এরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই, তাই বোধ হয় তাঁহার এই ক্ষণিক সঙ্কোচ। তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা ধরিলেন। শকুন্তলা দেখিলেন, তাঁহার মান যায়। তিনি বলিলেন, "ছাড়ুন ছাড়ুন, ধরিবেন না, আমি আমার প্রভু নহি।" তাহার পরে রাজা যখন প্রস্থানোদ্যতা শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরিলেন, তখন শকুন্তলা কহিলেন,— "পৌরব, বিনয় রাখুন, ঋষিরা চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছেন।" চলিয়া যাইয়াই শকুন্তলা ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"পৌরব, অভাগিনী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন না।" কিন্তু শকুন্তলা একেবারে যাইলেন না! অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া রাজার অনুরাগকল্পিত বাণী শুনিতে লাগিলেন। পরে করভ্রষ্ট মৃণালবলয় খুঁজিবার ব্যপদেশে আবার রাজার সন্নিধানে আসিয়া বলয়

পরিবার ছলে তাঁহার সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মুখচুম্বনে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে নামমাত্র! তাহার পরে গৌতমীর আগমনে রাজা লুক্কায়িত হইলে শকুন্তলা রাজাকে উদ্দেশে পুনরামন্ত্রণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এই তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া আমরা ব্যথিত হই। হাজার হউক তিনি তাপসী! মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার আচরণ আরও সংযত হইত নিশ্চয়। কেহ কেহ বলেন যে, তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগ কালিদাসের রচিত নয়। তাহা না হইলেও, এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে পুরুষের প্রেমভিক্ষা করা কুলটারই শোভা পায়। স্বয়ংবরা হওয়া পতিত্বভিক্ষা নহে—পত্নীত্বদান! যেখানে প্রেমালাপের পরে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, সেইখানেও পুরুষই নারীর প্রেম যাচ্ঞা করে। আমরা Shakespeareএ দেখি বটে যে, মিরাণ্ডাই ফার্ডিনাণ্ডের প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন!

I am your wife, if you will marry me—If not I die your maid, to be your fellow you may deny me, but I'll be your servant whether you will or no.

কিন্তু সে ভিক্ষার মধ্যে এমন একটা সারল্য, গাম্ভীর্য্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে, যেন বোধ হয় সে ভিক্ষাই দান। এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে—এ একটা প্রতিজ্ঞা! Ferdinand বিবাহ করুন না করুন, তা Mirandaর কাছে কিছু যায় আসে না; তিনি যেন Ferdinandকে বলিতেছেন, "বিবাহ করিবে? কর; আমি তোমার স্ত্রী হইব। বিবাহ করিবে না? করিও না; আমি তোমার অনুরক্ত দাসী রহিব। তুমি কি চাও?—বাছিয়া লও!" এ যেন রাজ্ঞী প্রজাকে দান করিতেছে। ইহা প্রেমভিক্ষা নহে।

কিন্তু শকুন্তলার ভিক্ষা—ভিক্ষা, কিংবা আত্মবিক্রয়! "দেখ, আমি যদি তোমায় আমার যৌবন দিই,—এই ভাব। তুমি কি দিবে? কিছু দাও না দাও, আমায় রক্ষা কর।" এখানে কেবল দৈন্যজ্ঞাপন ও যাচ্ঞা।

আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশে কালিদাসের সময়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবটা কবিরা ঠিক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। বৈদিক যুগে কামের দুই স্ত্রী ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—রতি ও প্রীতি। রতি ক্রমে ক্রমে তাহার সপত্নী প্রীতিকে নির্ব্বাসিত করাইল, এবং কামের একমাত্র প্রেয়সী হইয়া দাঁড়াইল। হরকোপানলে মদন ভস্ম হইয়া 'অনঙ্গ' হয়েন। কামের

এই 'অনঙ্গ' অবস্থা কিন্তু কাব্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। শরীরী কাম সাংসারিক হিসাবে পুরাতন কাব্যসাহিত্যে অত্যধিক নির্ভয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যেও পুরাকালে কামের অত্যধিক অত্যাচার ছিল। ক্রমে কাম পরিশুদ্ধ হইয়া Shelley ও Browningএর অশরীরী প্রেমে পরিণত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস স্বাভাবিক প্রতিভাবলে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতির যে কতক আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা এই শকুন্তলাতেই দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলায়ই হউক, বিক্রমোর্ব্বশীতেই হউক, আর মেঘদূতেই হউক, সময়ের হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। অবশ্য শকুন্তলার প্রথম তিন সর্গে প্রেমের প্রথম উচ্ছল অবস্থা। কিন্তু মেঘদূতে ত তিনি প্রেমের সংযত অনুরাগ দেখাইতে পারিতেন। তাহা তিনি দেখান নাই।

ভবভূতির সময়ে, মনে হয় যে, প্রেম নিরাবিল হইয়া আসিয়াছিল। বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে ভবভূতির কল্পনার উপরে কোনও দেশের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভবভূতির এ বিষয়ে সুবিধা ছিল। তিনি প্রেমের বহুদিন-সহবাসজনিত নির্ভর দেখাইতেই বসিয়াছিলেন। কালিদাস সে সুযোগ পান নাই। তথাপি কালিদাস এ অবস্থা দেখাইবার সুযোগ একবার খুঁজিয়াও লইতে পারিতেন। তাই মনে হয়, কালিদাসের মনে এত উচ্চ ধারণা কখনও উদিত হয় নাই।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার যে তরুলতাদিগের প্রতি স্নেহ দেখি, চতুর্থ অঙ্কে আবার তাহাই দেখিতে পাই। তাহার সহিত কিন্তু প্রেম আসিয়া মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তন্ময় হইয়া তপোবনে দুষ্মন্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—এত তন্ময় যে, দুর্ব্বাসার উপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার অভিশাপ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলেন না। পরে কণ্ব মুনি আসিলে শকুন্তলা তাঁহার সমক্ষে আসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইলেন। কণ্ব মুনি ধ্যানে সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইলেন।

যখন শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তখন তরুলতাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ তাঁহার হৃদয় ছাপিয়া উঠিতেছে। তিনি প্রিয়ংবদাকে কহিতেছেন,—

'হলা পিয়ম্বদে অজ্জউত্তদংসণুস্সুআএবি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ চলণা মে পুরোমুহা ণ পিবড্ডন্তি।'

শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন—যে পতির জন্য তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন বলিলেই হয়,—তথাপি এই তপোবন ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার পা উঠিতেছে না। তপোবনও যেন সেই আসন্ন বিরহে ম্লান। তখন শকুন্তলা সেই মাধবীলতাকে গিয়া কহিতেছেন,—"লতাভগিনি! আমায় আলিঙ্গন কর।" কণ্বকে কহিলেন,—"তাত, ইঁহাকে দেখিবেন"; সখীদ্বয়কে কহিতেছেন,—"এই বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেখিও;" আবার কণ্বকে কহিতেছেন,—"এই গর্ব্ভভারমন্থরা হরিণী প্রসব হইলে আমায় সংবাদ দিবেন।" তাহার পরে অনুগামী হরিণশিশুকে কহিতে-ছেন,—"বৎস, আমার অনুগমন করিয়া কি হইবে? পিতা তোমায় লালনপালন করিবেন, ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শকুন্তলার এই ভাবটি এত কোমলকরুণ যে, পড়িতে পড়িতে প্রায় কাঁদিতে হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়—তাপসী, এদের মধ্যে ত বেশ সুখে ছিলে! এই তপোবনের শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে তোমার শান্তপ্রবৃত্তি ত বেশ মিলিয়াছে! এখানে তোমার কিসের অভাব ছিল?—এদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ? কিন্তু উদ্দাম প্রেম সকল বাধা নিষেধ তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছে। আর রাখে কে?

শকুন্তলার এই প্রেম অধীর, উদ্দাম, প্রবল। এ প্রেম হয় নিজবলে সর্ব্বজয়ী হইবে, নয় একটা প্রবল সংঘাতে চূর্ণ হইবে। শকুন্তলার প্রেম শেষোক্ত ধরণের। তাঁহার প্রেম যেরূপ প্রবল, তাঁহার চরিত্রের সেরূপ বল ছিল না। সাবিত্রী হইলে সব বাধা বিঘ্ন স্বীয় চরিত্রবলে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেন। কিন্তু শকুন্তলা কোমলা তাপসী, তাই তাঁহার প্রেম প্রবল ধাক্কা খাইল। তিনি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। সে সংঘাতে সেই প্রেম চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু বিবাহ তাহাকে ঘেরিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

এই সংঘাত পঞ্চম অঙ্কে। এই পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার আর এক মূর্ত্তি দেখি। প্রথমতঃ, রাজসভায় শকুন্তলার একটা সশঙ্ক সঙ্কোচ দেখিতে পাই। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত রাজসভায় যাইতে রাজপুরী সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু শকুন্তলা যেন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কোলাহল শুনিতে পাইতেছেন না। দেখিলে শুনিলে তিনিও বিস্মিত হইতেন। তিনি আসন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন; অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন। "আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন?" ইহা আশঙ্কার লক্ষণ ব্যতীত

আর কিছুই নহে। পরে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব যখন রাজসভায় গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন, রাজার উত্তর শুনিবার জন্য শকুন্তলা উৎকর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন,—"কিন্নু কৃখু অজ্জউত্তো ভণিস্‌সদি।"

রাজা যখন বলিলেন,—"অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্", শকুন্তলা তখনও প্রত্যাখ্যান আশঙ্কা করেন নাই। কেবল ভাবিলেন,—"হদ্দী হদ্দী সাবলেবো সে বঅণাবক্‌খেবো।" তাহার পরে যখন রাজা প্রশ্ন করিলেন,—"আমি ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম?" তখন শকুন্তলা ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ! যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম।" ভাবিলেন যে, রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় ত অস্বীকৃত। পরে রাজা যখন নিরবগুণ্ঠনা শকুন্তলাকে দেখিয়াও বিবাহ অস্বীকার করিলেন, তখন শকুন্তলা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পাঠক, লক্ষ্য করিবেন যে, শকুন্তলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই। এখন অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি রাজাকে সানুরাগে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া ডাকিয়াই অভিমানে এ সম্বোধন প্রত্যাহার করিয়া সসম্মানে কহিলেন,—"পৌরব! ধর্ম্মমতে পাণিগ্রহণ করিয়া পরিশেষে অস্বীকার করা কি উচিত হইতেছে?" পরে শকুন্তলা রাজাকে বিহাহ-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যখন অঙ্গুরীয় দেখাইতে পারিলেন না, তখন আমরা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি। শেষে একবার শেষ প্রয়াস -পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; ব্যর্থ হইলেন। এখনও আমরা শকুন্তলার রুদ্রমূর্ত্তি দেখি নাই। পরিশেষে যখন রাজা সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর চাতুরীর অপবাদ চাপাইলেন, তখন শকুন্তলার গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—

অণজ্জ! অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্‌খসি? কো ণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্‌স তুহ অণুআরী ভবিস্‌সদি।"

প্রতারিতা নারীর সমস্ত লজ্জা রোষ ঘৃণা তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার রোষরক্তিম আনন দেখিয়া দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। সাধ্বী ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন,—

তুম্‌হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মখিদিঞ্চ লোঅস্‌স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥
সুটুঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবটুঠিদা।

পরে গৌতমী যখন তাঁহাকে বলিলেন,—"হায় বৎসে, পুরুবংশীয়েরা মহৎ, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তুমি শঠের হস্তে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছ!" তখন শকুন্তলা মহা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন শকুন্তলা হতাশস্বরে কহিলেন,—"এ শঠও আমায় পরিত্যাগ করিল, তোমরাও করিলে!" এই বলিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেই শার্ঙ্গরব ফিরিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"আঃ পুরোভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে।" তখন শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিলেন,—

"ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি বিপর্য্যয়ে ত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।"

পুরোহিতের এই লজ্জাকর প্রস্তাব শুনিয়া শকুন্তলা কহিলেন,—"ভগবতি বসুন্ধরে, আমায় স্থান দাও!" আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলি যে, যে কেহ আসিয়া এই প্রতারিতা অসহায়া বালিকাকে স্থান দাও। সকলে সেই সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুরোহিত পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন যে, "এক জ্যোতিঃ নামিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।" তখন আমরা ভাবি যে, বাঁচা গেল! রাজার গৃহে পরীক্ষার্থ থাকার চেয়ে তাঁহার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। শকুন্তলা রাজার প্রত্যাখ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপকে পদাঘাত করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইখানেই কালিদাসের কল্পনার মহত্ব! এখানেই শকুন্তলা-চরিত্রের চরম বিকাশ। এইখানেই সাধ্বী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। অসতী স্ত্রী যেমন এত দূর অধঃপাতে যাইতে পারে যে, প্রণয়ীর জন্য নিজের পুত্রহত্যা পর্য্যন্ত (যাহা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও ভীষণ) করিতে পারে, সাধ্বী সতী সেইরূপ এত উচ্চে উঠিতে পারে না পতির (যাহার চেয়ে স্ত্রীর পূজ্য আর কেহ নাই) নিষ্করুণ অবমাননাকে তুচ্ছ করিয়া গর্ব্বভরে শিরঃ উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পরিণামে কবি দেখাইলেন যে, দুষ্মন্ত-কৃত শকুন্তলার প্রত্যাখান অন্যায়, যে ঋষির অভিশাপ সাধ্বীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধ্বীর মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে পারে না। সে অভিশাপ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে থাকে দূরে সসম্মানে, হাত জোড় করিয়া!

দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে দংশন করিয়া আপনি পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইল, শকুন্তলার পক্ষে এ ক্ষণিক যন্ত্রণামাত্র।

সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলা বিরহিণী—

> বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
> অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

কিন্তু এ বিরহ পূর্ব্বোক্ত বিরহ হইতে ঈষৎ পৃথক্। প্রথম বিরহ প্রথম প্রেমেরই মত উচ্ছ্বল, অনিয়ত। এ বিরহ—দৃঢ়, শান্ত, সংযত। প্রথম বিরহে আশঙ্কা ও সন্দেহ; এ বিরহে বিশ্বাস ও অপেক্ষা। এই বিরহে বিশেষত্ব আছে—একটা অপূর্ব্ব মাধুরী আছে।

এই অঙ্কেই শকুন্তলা-চরিত্রের একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখি। সে তাঁহার পুত্রগর্ব্ব! তাঁহার প্রত্যাখ্যাত সমস্ত স্নেহ তাঁহার পুত্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কালিদাস তাহা নেপথ্যে দেখাইয়াছেন! নাটকে দেখিতে পাই যে, শকুন্তলার পুত্র অত্যধিক আদরে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহার মাতার নাম উচ্চারণমাত্র সে তাহার ক্রীড়ণকও ভুলিয়া যায়। শকুন্তলা বালকের সহিত অধিক কথা কহেন নাই। কিন্তু যে কয়টি কহিয়াছেন, তাহা অর্থে যেন কাঁপিতেছে। বালক যখন জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?" তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন,—"অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর!" এই উত্তরে পুত্রস্নেহ,পতির অন্যায়, দৈবের অত্যাচার,—সব আছে। শকুন্তলা জানিতেন যে, তিনি কোন পাপ করেন নাই। তিনি কেবল সরল-চিত্তে ভাল বাসিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তথাপি এরূপ হইল কেন? এই উত্তরে পুত্রের প্রতি, স্বামীর প্রতি, বিধাতার প্রতি সাধ্বীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র বুঝিল না, তাই নীরব রহিল। রাজা বুঝিলেন, তাই তিনি রোরুদ্যমানা শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। বিধাতা এ কথা শুনিলেন, তিনি তিনি তাঁহাদের মিলন সম্পাদন করিয়া দিলেন।

শকুন্তলা-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পাই না। বিশেষত্বের মধ্যে তপোবনের সহিত তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি কোমলা, প্রেমিকা, গর্ব্বিণী, পুত্রবৎসলা তাপসী। অন্যত্র তিনি সামান্যা নারীমাত্র। প্রথম অঙ্কে সখীদ্বয়ের সহিত কথাবার্ত্তা সাধারণ কুমারীর। প্রিয়ম্বদা যখন পরিহাস করিলেন—বনতোষিণী সহকারলগ্না হইয়াছে, শকুন্তলা

আমিও যেন অনুরূপ বর পাই—এই ভাবে তাহার পানে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাহার উত্তরে শকুন্তলা কহিলেন,—"এস দে অভণো চিত্তগদো মণোরহো।"—এরূপ কথা কাটাকাটি আধুনিক বঙ্গরমণী, প্রতিনিয়তই করিয়া থাকে। তাহার পরে পরপুরুষের সম্মুখে প্রত্যেক বিবাহযোগ্যা বালিকাই শকুন্তলারই মত লজ্জায় অধোমুখী হয়। তাহার পরে রাজাকে দেখিয়া মনে প্রেমের উদয়,—

কধং ইমং জণং পেক্‌খিঅ তবোবনবিরোহিণো বিআরস্‌স গমনীয়াহ্মি সংবুত্তা।"

এরূপ প্রেমোদয়ও সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে love at first sight. প্রিয়ংবদা রাজাকে যখন শকুন্তলার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আরও যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন বোধ হইতেছে।" তখন শকুন্তলা তাঁহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে শাসাইলেন। এরূপ ব্রীড়ার অভিনয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রিয়ংবদা রাজার কাছে শকুন্তলার বিবাহের কথা তুলিলে শকুন্তলা কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া যে কহিলেন,—"প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই কহিতেছে, আমি চলিলাম।" অথচ চলিয়া যাইবার জন্য আদৌ তাহার কোনও অভি ্রায় নাই! নারীর এই মধুর ছলনা ও পরে যাইতে অনিচ্ছা -নারীজনসমাজে দুর্লভ নহে!

এই নাটকের শকুন্তলা-চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষ না থাকিলেও, ইহা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাভারতের শকুন্তলাকে কালিদাস অনেক বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা কামুকী। কালিদাসের শকুন্তলা প্রেমিকাতে আরম্ভ করিয়া দেবীতে শেষ হইয়াছেন। তদুপরি কালিদাসের শকুন্তলা স্নেহে, সৌহার্দ্দ্যে, তেজে, কারুণ্যে একটা মনোহর সৃষ্টি। মহাভারতের শকুন্তলাকে যে কালিদাস কত দূর উঠাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে, মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উক্তি, নাটকে বর্ণিত উক্তির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মহাভারতে শকুন্তলা তাঁহার জন্মের গর্ব্ব করিতেছেন। তিনি যে অপ্সরা মেনকার কন্যা, আর দুষ্মন্ত যে মানবমাত্র, এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন।

এখানে শকুন্তলা মেনকার নাম করিয়া তাঁহার মোকদ্দমা যত দূর সম্ভব খারাপ করিয়াছেন। দুষ্মন্ত উত্তর দিতে পারিতেন যে, যে নর্ত্তকীর কন্যা, তাহার কথার আবার মূল্য কি!

কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলা-চরিত্রের তেজে দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত

স্তম্ভিত হইয়াছেন। শকুন্তলার অবমাননায় তাঁহার সহিত সহানুভূতিতে পাঠক প্রায় কাঁদিয়া উঠেন।

শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী; ঋষিকন্যা হইয়াও প্রেমিকা; শান্তির ক্রোড়ে লালিতা হইয়াও চপলমতি। তাঁহার লজ্জা নাই, সংযম নাই, ধৈর্য্য নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যার সহিত এক নিশ্বাসে তাঁহার নামোচ্চারণ করা চলে না। তবে কি গুণে তিনি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়িকা হইলেন?

দুষ্মন্ত যে কারণে এই নাটকের নায়ক হইয়াছেন, শকুন্তলাও তাহার অনুরূপ গুণে এই নাটকের নায়িকা হইয়াছেন। শকুন্তলা চরিত্রের মাহাত্ম্য (দুষ্মন্তেরই মত) পতনে ও উত্থানে।

প্রথম তিন অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। দুষ্মন্তের সহিত প্রেমে পড়িয়া তিনি নিজের সঙ্গে সখীদ্বয়ের সহিত চাতুরী আরম্ভ করিলেন—যাহা তাপসীর যোগ্য মনোভাব নহে। পরে তিনি দুষ্মন্তের সঙ্গে যেরূপ নির্লজ্জ রহস্যালাপ করিলেন, তাহা তাপসীর কেন, কোনও কুমারীর পক্ষেও লজ্জাকর। যদি শকুন্তলা মিরাণ্ডার মত সরলা সংসারানভিজ্ঞা হইতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম। কিন্তু তিনি সংসারেরই বিবাহযোগ্যা কুমারীর ন্যায় বক্রোক্তি ও অভিনয় করিতে শিখিয়াছেন। তিনি পরোক্ষে ভাবী সপত্নী-দিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সর্ব্বশেষে প্রতিপালক পিতৃসম স্নেহময় মহর্ষির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পণ—একেবারে অধঃপতনের প্রায় চরম সীমা। কুমারসম্ভবে যদিও শিব গৌরীর পূর্ব্ব-জন্মের পতি, তথাপি শিব যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, গৌরী বলিলেন,—পিতাকে জিজ্ঞাসা কর। কণ্বকে জিজ্ঞাসা করা শকুন্তলার সৌজন্য নহে, তাঁহার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল। এ কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই। কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে তিনি লজ্জিতা হইয়াছিলেন; অনুতপ্তা হয়েন নাই। স্নেহময় কণ্ব তাঁহাকে ক্ষমার চেয়েও অধিক করিলেন; তথাপি তাঁহার অণুমাত্র অনুতাপ হইল না। তিনি বস্তুতঃ পতিতা হইলেন। তবে এ পতনে বিবাহই একটিমাত্র পুণ্যের রেখা। তাহাই দুষ্মন্তকে ও তাঁহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের তাঁহাদের উত্থানের পথ রাখিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল তাঁহার প্রত্যাখ্যানে। তাহার পর দীর্ঘ বিরহব্রত যাপন করিয়া তাঁহার

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। তাঁহাদের মিলনের অন্তরায় দূর হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে আবার তাঁহাদিগের মিলন হইল।

দুষ্মন্তেরই মত শকুন্তলা দোষে গুণে একটি মিশ্রচরিত্র। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য দোষে গুণে। দোষে গুণে সে চিত্র অতুলনীয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান।

১। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি।

সমাজদেহের জীবনবৃত্তান্তের নাম ইতিহাস। মানবদেহে ব্যাধি উপস্থিত হইলে সুচিকিৎসক যেমন ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহের, এমন কি, তাহার পিতামাতার দেহেরও ইতিবৃত্ত জানিয়া লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তেমনই সমাজ-চিকিৎসকের বা সংস্কারকের পক্ষেও সমাজের ইতিবৃত্ত জানিয়া লইয়া সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কেন এমন হইয়াছি, ইত্যাদি বিষয় জানা থাকিলে, ভবিষ্যতে কি হইতে পারি, তাহা নিরূপণ করা সহজ হয়। ভবিষ্যতে সমাজের কোন্ পথে চলা উচিত, সমাজের ভবিষ্যৎ আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, অতীতের ইতিহাস তাহা সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে না; কেন না, অতীতের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ আদর্শ বর্ত্তমানকালের জনগণের মনঃপূত না হইতে পারে। কিন্তু ইতিবৃত্তের আলোচনা দ্বারা অতীতের সমাজের "পরিণাম-নিয়ামক-নীতি" বুঝিয়া লইতে পারিলে, ভবিষ্যতে সমাজের গতি কিরূপ হইতে পারে, তাহা কতক পরিমাণে অনুধাবন করা যাইতে পারে; এবং এইরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফলে কোন্ আদর্শের অভিমুখে সমাজকে চালিত করা সম্ভব, এবং কোন্ আদর্শের অভিমুখে চালিত করা সম্ভব নহে, তাহাও নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাস-আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু কৌতূহল-নিবৃত্তি নহে, ইতিহাসের ব্যবহারিকতাও যথেষ্ট। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে যখন ভারতবাসীর প্রাণ বিবিধ অভিনব আদর্শের আকর্ষণে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সমাজও জড়তা ত্যাগ করিয়া, কাল-স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া, হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া সন্তরণে উদ্যত হইয়াছে, তখন ইতিহাসের আলোক লইয়া না চলিলে, নিরাপদে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

কার্য্যক্ষেত্রে ইতিহাসের সহায়তা-লাভের প্রধান অন্তরায়,—আমাদের সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব। আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণের নিতান্ত অভাব নাই। এ যাবৎ বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী ও সরকারী আর্কিওলজিকল্ ডিপার্টমেণ্ট বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। সোসাইটীর কার্য্য অধিকাংশ স্থলেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, সুতরাং সে কার্য্য ক্রমিকতাহীন। আর্কিওলজিকেল্ ডিপার্টমেণ্ট 'লোহিত ফিতা'র বেষ্টনে আবদ্ধ, সুতরাং ধীরে ধীরে পদ-বিন্যাস করিতে বাধ্য। এ পর্য্যন্ত সোসাইটী ও সরকারী প্রত্নবিভাগের যত্নের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসসম্বন্ধীয় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। সুতরাং সত্বর স্বদেশের ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন করিয়া, উহাকে উন্নতির পথে পথপ্রদর্শক করিয়া লইয়া চলিতে হইলে, সুধু সোসাইটীর বা সরকারী বিভাগের মুখ চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। জেলায় জেলায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত করিয়া যথারীতি ইতিহাসের উপাদানের অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্. এ. "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" নামক একটি পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত করিয়া ১৩১৬ সালের শ্রীপঞ্চমীর সময় হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। কুমার শরৎকুমার "মোহনলাল" নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রণেতা, সাহিত্য-পরিষদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক, বিপন্ন সাহিত্য-সেবকের আশ্রয়তরু, এবং "ভারতশাস্ত্রপিটকে"র প্রবর্ত্তকরূপে বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের শিষ্যরূপে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া, বিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুসারে ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহার্থ গুরুদেবের সহিত মিলিত হইয়া লুপ্ত-শাস্ত্র-প্রচারে ব্রতী ছিলেন। এইবার "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র অধিনায়ক-রূপে কোদালি কুঠার হস্তে মাঠে নামিয়াছেন। দিনাজপুরের অনরেবল মহারাজ শ্রীযুত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ও কুমার শরৎকুমারের অগ্রজ দীঘাপতিয়ার অনরেবল রাজা শ্রীযুত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, এবং দীঘাপতিয়ার কুমার

শ্রীযুত বসন্তকুমার রায় এম্. এ., বি. এল এবং কুমার শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায় অর্থদানে ও সহানুভূতি দ্বারা সমিতির কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। দীঘাপতিয়ার রাজাবাহাদুর ও তাঁহার সহোদরগণের ইতিহাসানুরাগ বংশানুগত। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের পিতা ৺রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর একান্ত ইতিহাসভক্ত ছিলেন। তিনি নাবালক অবস্থায় ৺ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে প্রত্নতত্ত্বচূড়ামণি মিত্র মহোদয় তাঁহার হৃদয়ে ইতিবৃত্ত-ভক্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যের অধ্যয়ন রাজা প্রমথনাথের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল, এবং তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকাগার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস-গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

"বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নবিদ্ শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় সমিতির উপদেষ্টার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা মিউজিয়মের আর্কিওলজি শাখার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় সহযোগী পণ্ডিতবর শ্রীযুত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকরক্ষক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ কুমার আবশ্যক-মত সাগ্রহে সমিতির কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণী সঙ্কলিত হইতেছে। আশা করা যায়, অনতিকালমধ্যেই যন্ত্রস্থ হইবে। সমিতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্য বিগত শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুসন্ধান কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

২। দীঘাপতিয়ার রাজবংশ।

শারদীয় পূজার সময় দীঘাপতিয়ার রাজাবাহাদুর অক্ষয় বাবুকে ও লেখককে রাজভবনে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমরা দীঘাপতিয়ায় উপনীত হইয়া দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মুসলমান আমলে নবাব বা সুবাদারগণ সামন্ত শ্রেণীর জমীদারগণকে মধ্যস্থ করিয়া প্রজাশাসন করিতেন। সে আমলের জনসাধারণের ইতিহাস সামন্ত জমীদারগণের ইতিহাসের সহিত জড়িত। সুতরাং নবাবী আমলের বাঙ্গালীর ইতিহাস জানিতে হইলে, তৎকালীন সামন্ত জমীদারগণের ইতিহাস

বিশেষরূপে আলোচ্য। উত্তরবঙ্গে এখনও এই শ্রেণীর কয়েকটি জমীদার-বংশের প্রতিনিধিগণ কতক পরিমাণে আপন আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে দিনাজপুর, তাহেরপুর, পুঁঠিয়া, নাটোর ও দীঘাপতিয়ার রাজবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বংশের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে রেভিনিউ বোর্ডের ও কোম্পানীর দপ্তরের কাগজপত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। দীঘাপতিয়া সম্বন্ধে অল্প সময়ে সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ঘটে নাই। রাজপরিবারের পরম্পরাশ্রুত কিংবদন্তী ও খানকয়েক সাবেক দলীল হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিন নাটোর রাজ-বংশের আদিপুরুষ রামজীবন রায় নৌকাযোগে চলন বিলে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় সহসা কলম গ্রামের একটি বালকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বালকটি রূপবান্ ছিলেন। রামজীবন বালকের দুইটি কথায় বুঝিতে পারিলেন, সে যেমন রূপবান্, সেইরূপ প্রতিভাশালীও বটে। গুণগ্রাহী রামজীবন যখন জানিতে পারিলেন, বালকটি পিতৃমাতৃহীন, তখন তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নাটোরের রাজভবনে আনিয়া, পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই বালক দীঘাপতিয়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়। বালক দয়ারাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মহারাজ রামজীবন তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভূষণায় সুপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায়ের বিদ্রোহাচরণ-দমনার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে সেনা প্রেরিত হইয়াছিল, তখন মহারাজ রামজীবন নবাবী সেনার সহায়তার জন্য একদল সেনা প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং দয়ারামকেই নাটোর সেনার নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশোহর অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সীতারাম পরাভূত ও বন্দী হইয়া, (নাটোরের প্রবাদ অনুসারে) নাটোরে নীত হইয়াছিলেন। সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদাবাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের নাটোর রাজের লভ্যাংশ লইয়া আসিয়া সেনাপতি দয়ারাম নাটোরের রাজভবনে পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একটি জিনিস পঁহুছাইয়া দেন নাই। যেখানে এখন দীঘা-পতিয়ার রাজবাড়ী, সেইখানে জঙ্গলের মধ্যে দয়ারাম একটি জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এ কথা যখন নাটোর রাজের কানে উঠিল, তখন অনু-সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া দেখা গেল, দয়ারামের লুকান ধন আর কিছু নয়,—রাজা সীতারামের আরাধ্য দেবতা "কৃষ্ণজী"। মহারাজ রামজীবন দয়ারামের ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ কৃষ্ণজীর সেবার জন্য একখানি তালুকের মকররি মৌরসী স্বত্ব প্রদান করিলেন। এই অবধি দীঘাপতিয়ার ভূসম্পত্তির সূত্রপাত হইল। যেখানে কৃষ্ণজীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইখানে দয়ারাম কৃষ্ণজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং মন্দিরের সমীপে স্বীয়

ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিলেন। দয়ারাম ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিয়া মহারাজ রামজীবনের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পারিতোষিকস্বরূপ মহারাজের নিকট হইতে আরও অনেকগুলি তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে * রামজীবনের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রামকান্ত নাটোরের গদীতে আরোহন করিলেন। রামকান্ত যতদিন নাবালক ছিলেন, ততদিন দয়ারাম তদীয় অভিভাবকরূপে নাটোর জমীদারী একাকীই শাসন করিয়াছিলেন। পরে রামকান্তের দেওয়ান ও রামকান্তের মৃত্যুর পরে তদীয় বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেওয়ান-রূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নাটোর জমীদারীর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। দয়ারাম রায় কোন সময়ে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তিনি নবাব মীর কাশেমের আমোল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ আছে, এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানরূপে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেশ-শাসন আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রাণী ভবানীও দয়ারামকে অনেকগুলি তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল তালুক লইয়াই বর্ত্তমান দিঘাপতিয়ার রাজষ্টেট।

দয়ারাম রায় যে অসাধারণ প্রতিভাশালী, ধর্ম্মভীরু ও অতিশয় কার্য্যকুশল ছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; নতুবা পিতৃমাতৃহীন নিঃস্ব তিলি বালক কদাপি অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর নাটোর রাজের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া নানাবিধ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল সে পদে অধিরূঢ় থাকিতে পারিতেন না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ প্রতিভাবান ও কার্য্যকুশল বাঙ্গালী আরও কয়েক জন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজনগরের রাজবল্লভ, মহারাজা নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও দেবী সিংহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার এই সকল দিক্‌পালের মধ্যে দয়ারাম রায়ের শ্রেষ্ঠতার কারণ,—তাঁহার তৎকালদুর্লভ সততা। যাঁহারা বাঙ্গালার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত আছেন, তাহারা জানেন, দয়ারাম রায় যখন দেওয়ান, তখন নাটোরের জমীদারী কিরূপ বৃহদায়তন ছিল, এবং নাটোরের মহারাজ কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন! দীর্ঘকাল এত বড় জমীদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে নাটোরের প্রবল রাজশক্তি পরিচালন করিয়াও দয়ারাম ধনবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহার দীঘাপতিয়ায় বাসভবনে কৃষ্ণজীর মন্দির ভিন্ন আর একখানিও ইষ্টকগৃহ ছিল না। তাঁহার যে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, সকলই মহারাজ রামজীবন বা রাণী ভবানীর প্রদত্ত; একখানি তালুকও নগদ মূল্যে ক্রীত হয় নাই। দয়ারাম রায় যখন ইহধাম ত্যাগ করিলেন, তখন পুত্র

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "রাণী ভবানী", চতুর্থ পরিচ্ছেদ;—সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত।

জগন্নাথ রায়কে একরূপ নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। তখন ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) মন্বন্তর বাঙ্গালা দেশকে শ্মশানে পরিণত করিতেছিল। বাঙ্গালার একতৃতীয়াংশ অধিবাসী এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার শস্যহীন শূন্যপ্রান্তর মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছিল। যখন আবার সুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, তখনও লোকাভাবে আবাদ অসম্ভব হইল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবসানে জমীদারগণের ক্লেশ বরং বাড়িয়া উঠিল। জনশূন্য জমীদারী হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইল।

দয়ারাম রায় কোনও সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া যান নাই; সুতরাং মন্বন্তরের অবসানে জগন্নাথ রায়ের আর কষ্টের সীমা ছিল না। তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি আদৌ নাটোরের জমীদারীর অন্তর্ভূত ছিল, এবং রাজস্ব নাটোর-সরকারে দাখিল করিতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে জগন্নাথ রায় কতকগুলি তালুক নাটোরের হিসাব হইতে পৃথক্ করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোম্পানীর সহিত উহাদের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু প্রজাশূন্য জমীদারী হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া দেওয়া জগন্নাথের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তিনি হতাশ হইয়া জমীদারী ইস্তফা দিতে প্রস্তুত হইলেন। এই দুর্দ্দিনে এক জন মহিলার ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও শ্রমশীলতার গুণে দীঘাপতিয়ার জমীদারী রক্ষা পাইল। এই মহিলা জগন্নাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী নন্দরাণী। সাধারণ গৃহস্থের মত জগন্নাথ রায়ের হাল গোরু ও খামার জমী ইত্যাদি ছিল। স্বামীকে হতাশ ও বিষাদমগ্ন দেখিয়া নন্দরাণী বলিলেন,—"আমি ধান ভানিয়া সংসার প্রতিপালন করিব, জমীদারীর আয়ের একটি পয়সাও চাহি না। তুমি কোন প্রকারে রাজস্ব আদায় করিয়া জমীদারী রক্ষা কর।" দয়ারাম রায়ের সততায় অর্জ্জিত ভূসম্পত্তি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু জগন্নাথ ও নন্দরাণীর সাংসারিক ক্লেশের আর সীমা রহিল না। বড় কষ্টে ইঁহারা দিনপাত করিতে লাগিলেন। নন্দরাণীর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার ১৬টি সন্তান হইয়াছিল।* তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রাণনাথ ভিন্ন সকলেই একে একে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। দীঘাপতিয়ার রাজবাড়ীতে প্রবাদ এই যে, অভাবজনিত ক্লেশ ও অযত্নই জগন্নাথ ও নন্দরাণীর সন্তানগণের অকালমৃত্যুর কারণ। কালক্রমে বাঙ্গালার দিন ফিরিতে লাগিল। মন্বন্তরের কঠোর পীড়নে মরুভূমিতে পরিণত বাঙ্গালা লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শস্যশ্যামলা হইয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা শোকসন্তপ্ত জগন্নাথের অদৃষ্টে সুদিন দেখিয়া যাওয়ার সুখটুকুও লেখেন নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ রায়ের দুঃখময় জীবনের অবসান হইল। নন্দরাণীর বয়স তখন ৩৮ বৎসর।

---

* The Calcutta Review [illegible]

একমাত্র পুত্র প্রাণনাথের বয়স ৫ বৎসর। দীঘাপতিয়ার জমীদারীর রাজস্ব বাবদ তখন কোম্পানীকে দিতে হইত ২০০০০৲ এবং নাটোর-সরকারে ৩০০০০৲। নাটোরের গদীতে তখন রাজর্ষি রামকৃষ্ণ সমাসীন। দীঘাপতিয়া তখনও নাটোর হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে নাই। নন্দরাণীর ইচ্ছা ছিল, মহারাজা রামকৃষ্ণ দীঘাপতিয়ার জমীদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া সরবরাকার বা মেনেজার নিযুক্ত করিয়া দেন। রাজসাহীর কালেক্টর সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দীঘাপতিয়ার জমীদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে গেল। * দীঘাপতিয়ার আধুনিক ইতিহাসে, প্রাণনাথ রায়ের দত্তকপুত্র দানশীল ৺রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর এবং তদীয় দত্তক পুত্র, দয়ারাম রায়ের কনিষ্ঠ দুহিতার বংশোদ্ভব পরহিতব্রত ৺রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের জীবনের অনেক ঘটনা ও অনেক কীর্ত্তিকলাপ স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান হইতে পারে না।

* শেষোক্ত ঘটনাগুলি শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের একখানি প্রাচীন নোটবুকে প্রাপ্ত রাজসাহীর কালেক্টর কর্ত্তৃক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অগষ্ট তারিখে বোর্ড অফ্ রেভিনিউর W. Cowper Esqএর বরাবরে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে সঙ্কলিত— ;
"Praunnaut Roy, son of Jagernaut Roy, deceased, and Grandson of Dyaram Roy, former Dewan of the Zemindars of Rajshahye, being the proprietor of Turuffs Nundukoojah, Kulna aud Jadabpore &c. Talooks in this district lately separated, and being a child about five years of age (ascertained by enquiry and ocular demonstration) is consequently within the description of disqualified landholders entitled to the Board's superintendence as a Court of Wards and as such, I beg leave to request their sanction to the appointment of a manager and guardian for the care of his estate and person agreeably to the Regulation of 15th July 1791.

2. "The sudder jummah of the Talooks of this landholder being near twenty thousand Rupees per an num ,and the jummah of his kerary mehals, which though the fixed rent of them ispayable to the zemindar must necessarily be placed under the general manager of the Estate, ex ceeding thirty thousand Rupees. I have diligently endeavoured to find a person well-qualified, by responsibility as well as capacity, to be the Serberaker ; and Ram Chowdry inhabitant of Halsa in the vicinity of Nattore as well as of Sreemant Roy's place of residence, and possessing with his brother landed property paying a revenue of about eight thousand Rupees per annum appearing to be far better qualified than any other person pointed out to me, indeed in every respect, well qualified. I have nominated him to the trust of Sarberaker on his giving security and executing the prescribed obligation ; and beg leave to recommend him for the confirmation of the Board in this office, to be, of course, held by him no longer than whilst he shall discharge the duties of it satisfactorily under the general regulations, of which I have furnished him with a copy for his guidance.

3. "I have also nominated and beg leave to request the Board's confirmation of Dubno Naik an old servant of the family, and I believe well

৩। বরদেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী।

আমরা বিগত শারদীয় অবকাশে যে কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি স্থানের—রাজসাহী জেলার দুইটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। বরদেশ্বরী দীঘাপতিয়ার অনতিদূরে অবস্থিত নেপাল দীঘি গ্রামের জাগ্রত দেবতা। নেপাল দীঘি একটি পুরাতন গ্রাম। "নেপাল দীঘি" নামক একটি দীঘি হইতে গ্রামের এই নামকরণ হইয়াছে। এই গ্রামে "মদন দীঘি" নামক আরও একটি পুরাতন দীঘি আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাটী কাটিবার সময় এই দীঘির এক পার হইতে একটি বাঁধা ঘাটের ভগ্নাবশেষ উঠিয়া পড়িয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী "গোয়াল দীঘি" গ্রামে "গোয়াল দীঘি" বা "গোপাল দীঘি" নামে আর একটি পুরাতন দীঘি আছে। নেপাল দীঘির বরদেশ্বরী সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ,—এই মূর্ত্তিটি পূজাপটল সহ নিকটবর্ত্তী ঢাকোপাড়া গ্রামে ক্ষেত্রকর্ষণসময়ে একটি তামার ঢাকের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রামেশ্বর পঞ্চানন ঐ মূর্ত্তি আনিয়া নেপাল দীঘি গ্রামে স্থাপন করেন। রামেশ্বরের অধস্তন অষ্টম হইতে দশমপুরুষীয় বংশধরেরা এখন বরদেশ্বরীর সেবা করিতেছেন। মূর্ত্তিখানি পিত্তলনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি। মস্তকোপরি সাতটি সর্প ফণা ধরিয়া রহিয়াছে, এবং মূর্ত্তির ক্রোড়ে একটি শিশু। বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকায় মূর্ত্তির আর কোনও অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তিটি কোন্ ধ্যানের দ্বারা পূজিত হইতেছে, তাহা পূজকেরা বলিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা যে মূর্ত্তির অনুরূপ প্রকৃত ধ্যানটি জানেন, এরূপও মনে হয় না। এই বরদেশ্বরী কোন্ অতীত যুগের বিলুপ্ত ধর্ম্মের বা উপাসনাকাণ্ডের চিহ্ন।

আমরা বরদেশ্বরী দর্শন করিয়া, নওগাঁ থানার অন্তর্গত বান্দাইখাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। বহু ভগ্ন ইষ্টকে পূর্ণ একটি স্তূপের উপর সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তূপে উঠিবার পথের ধারে একটি বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণে ভাস্কর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহার সুপ্রশস্ত প্রভামণ্ডল বা চালির কারুকার্য্য বড়ই চমৎকার। মূর্ত্তিখানি অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় কাৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। লোকেরা নাককাটা কালী নামে

---

qualified for the turst, to the office of Paishkar and Guardian, on his executing the obligation prescribed for the latter * *

"His appointment to the Guardianship is agreeable to the mother of Praunnaut Roy who is living and I understand about 38 years of age, and whose inclination I thought advisable to pay attention to in this appointment, as far as was compatible with other considerations, though I have not judged it advisable to do so in the election of a manager for the Estate as she is herself unacquainted with business, and understood to be under the influence of Raja Ramkishen who having testified an unbecoming desire to appoint the manager of this Estate, I was solicitous to prevent his having any concern in such appointment lest a sacrifice of the Talookdar's interest might be the consequence."

ইহার পাদমূলে চিনি, কলা, মাথার চুল উৎসর্গ করিয়া থাকে। আমরা মূর্ত্তিটি তুলিয়া আনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি তেঁতুল গাছের গোড়ায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। এত বড় বিষ্ণুমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

স্তূপের উপরে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। ভূমিকম্পে ইষ্টকনির্ম্মিত 'মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একখানি ক্ষুদ্র টীনের ঘর মন্দির রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ঘরের ভিতর এতগুলি পাষাণপ্রতিমা একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, যে ইহাকে মন্দির না বলিয়া ক্ষুদ্র মিউজিয়ম বলাই সঙ্গত। যে জিনিসটি সিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোনও মূর্ত্তি নহে, একটি কষ্টি পাথরের স্তম্ভের মামলা। তাহার মধ্যভাগে একটি চতুষ্কোণ ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রের মধ্যস্থ লোহার দ্বারা ইহা স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন ছিল। এই চতুষ্কোণ ছিদ্রটি এখন সিদ্ধেশ্বরীর "যন্ত্র"রূপে পরিগণিত। ইহার উপরে রক্ষিত একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সিদ্ধেশ্বরীর পদচিহ্নরূপে পূজিত হইতেছে। সিদ্ধেশ্বরী ব্যতীত এই মন্দিরে আরও আট খানি পাষাণমূর্ত্তি ও একখানি মূর্ত্তিযুক্ত চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড আছে। আটখানি পাষাণমূর্ত্তির মধ্যে তিনখানি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুরমূর্ত্তি, একখানি চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ, অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু-ধারী হংসবাহন ব্রহ্মারমূর্ত্তি, এবং আর চারিখানি দেবীমূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তি কয়টিরই শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের সংস্থান একই রূপ। দক্ষিণোর্দ্ধ্বহস্তে গদা, দক্ষিণের নিম্ন হস্তে পদ্ম, বামোর্দ্ধ্ব হস্তে চক্র, বাম নিম্নহস্তে শঙ্খ। গলে বনমালা।

দেবীমূর্ত্তি কয়েকখানিই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তন্মধ্যে পূজক প্রথমখানির চামুণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিল। মূর্ত্তিখানি ক্ষুদ্র, মূর্ত্তির দেহ অত্যন্ত জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালোপম। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মূর্ত্তিট সম্বন্ধে আর কিছু আমার স্মরণ নাই। দ্বিতীয়খানি ষড়্ভুজা। দক্ষিণ পার্শ্বের উর্দ্ধকরে তরবারি, মধ্যম করে কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই, অধঃকরে ত্রিশূল, এবং ত্রিশূলাগ্রে একটি দ্বিভুজ মূর্ত্তি বিদ্ধ রহিয়াছে। বাম পার্শ্বের অধঃকর ত্রিশূলবিদ্ধ মূর্ত্তির কেশাকর্ষণ করিয়াছে; মধ্যম করে ধনুক, এবং উর্দ্ধ করে ঢাল। মূর্ত্তিখানির মুখের আকার মানুষের মুখের মত নহে। পাদপীঠে একটি গণেশমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় মূর্ত্তি অষ্টভুজা, অস্থিচর্ম্মসার, কঙ্কালোপম, একটি শয়ান মানুষের উপরে উপবিষ্টা; উর্দ্ধের দুই হস্তের দ্বারা একটি হস্তীকে উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত। এই মূর্ত্তিটি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। চতুর্থ স্ত্রীমূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

আমি মূর্ত্তি কয়েকখানি বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্ত্তি কয়েকখানি চিনিতে পারি নাই বলিয়া সন্তোষজনক বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" এই সকল মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছেন। ফটো দেখিতে পাইলে বিশেষজ্ঞগণ এই সকল মূর্ত্তির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন। বান্দাই খাড়ার মূর্ত্তিগুলি এ যুগের

নহে। ভগ্নস্তূপের আকার দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন কালে—পাল কি সেন-রাজগণের আমলে, এই স্থানে কতকগুলি মন্দির ছিল, এবং এই সকল মূর্ত্তি সেই সকল মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে মন্দিরগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরসমূহে অধিষ্ঠিত দেবতাগণ নগ্ন ভগ্ন অবস্থায় অজ্ঞাত-কুলশীল অতিথির মত বর্ত্তমান মন্দিরের এক কোণে আশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর পূজা স্থানমাহাত্ম্য এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে।

একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার এক পৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে ধ্যানী বুদ্ধ, এবং অপর পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্মের দলে দলে চারি দিকে দশাবতার অঙ্কিত। এই প্রস্তরখণ্ড হইতে জানিতে পারা যায়, যে সময়ে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সজীব ছিল, এই সকল মূর্ত্তি সেই সুদূর অতীতের দেবতা। সেকালে বৌদ্ধ ও তথাকথিত হিন্দুসম্প্রদায়ের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তৎসম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৪। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পালবংশের অভ্যুদয় হইতে সেনবংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপযোগী নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, পাল-অভ্যুদয়ের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, সপ্তম শতাব্দীর প্রাক্কালে, শশাঙ্ক নামে বাঙ্গালায় এক জন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহার আধিপত্য এক সময়ে কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম ছেদন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক ধর্ম্মবিদ্বেষের বশীভূত হইয়া, কিংবা বৈরনির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এখন বলা যায় না। কিন্তু আমরা এখনই দেখিতে পাইব, পাল ও সেনরাজগণের সময়ে এরূপ ঘটনার সংঘটন সম্ভবপর ছিল না।

পালরাজগণ সকলেই পরমসৌগত অর্থাৎ গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে দেবপাল স্বীয় জনক ও পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"শাস্ত্রার্থভাজা চলতোঽনুশাস্য
বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে।
শ্রীধর্ম্মপালেন সুতেন সোঽভূৎ
স্বর্গস্থিতানামনৃণঃ পিতৃণাম্॥" (১)

"শাস্ত্রার্থবিদ্, স্বধর্ম্মত্যাগী বর্ণনিচয়কে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মপথে স্থাপনকারী শ্রীধর্ম্মপাল নামক পুত্র লাভ করিয়া গোপাল স্বর্গস্থিত পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।"

এখানে শাস্ত্রের অর্থ,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র। "পরমসৌগত"

(১) Indian Antiquary, Vol. XXI, Ph. 253—259.

ধর্ম্মপালও তথাকথিত হিন্দু রাজার মত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াছিলেন, এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধানানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—"পরমসৌগত" নারায়ণ পাল সহস্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপি (২) অনুসারে (৩) "পরম-সৌগত" প্রথম মহীপাল (১০২৬ খ্রী অঃ)

"ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্চাং শ্রীমানকারয়ৎ ॥"

"গৌড়াধিপ শ্রীমান্ মহীপাল, স্থিরপাল, এবং বসন্তপালের দ্বারা ঈশান (শিব), এবং চিত্রঘণ্টা (দুর্গা) এবং অন্যান্য শত শত কীর্ত্তিরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

এই মহীপাল দিনাজপুর জেলার বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের দ্বারা "ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য......বিষুবসংক্রান্তৌ বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা" ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেছেন। ঐ জেলার মনহলি গ্রামে প্রাপ্ত তাম্র-শাসনের দ্বারা বাঙ্গলার শেষ পাল-নৃপতি "পরমসৌগত" মদনপাল তদীয় পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকার বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত-শ্রবণের দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীবটেশ্বর স্বামিশর্ম্মাকে "বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য" ভূমিদান করিতেছেন। (৪)

পালরাজগণ বৌদ্ধ হইয়াও যেমন "অহিন্দু" ছিলেন না, তেমনই তাঁহাদের পরবর্ত্তী সেনারাজগণ "হিন্দু" হইয়াও বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন না। লক্ষ্মণ সেনের সভায় এক দিকে যেমন "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"-কার হলায়ুধ ছিলেন, আর এক দিকে তেমনই "ভাষাবৃত্তি"-কার বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবও সেই সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। পুরুষোত্তম "ভাষাবৃত্তি"র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

"নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণং।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে ॥"

"ভাষাবৃত্তিবিবৃতি"-কার সৃষ্টিধর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"বৈদিক-প্রয়োগানর্থিনো রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্যাজ্ঞয়া প্রকৃতে কর্ম্মণি প্রসজন্ বৃত্তের-ঘুতায়াং হেতুমাহ।" এক স্থলে পুরুষোত্তম দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—"ন দোষঃ প্রতি বৌদ্ধদর্শনে" ;—"বৌদ্ধদর্শনে দোষের লেশও নাই।" (১) লক্ষ্মণসেনের আর এক জন সভাসদ্ বৈষ্ণবচূড়ামণি জয়দেব দশাবতার-স্তোত্রে গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

---

(২) Annual Report, Arch. survey of India, 1903—1904, P. 221.

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, ১৭১ পৃঃ।

(৪) ঐ, ঐ, ১৫১ পৃঃ।

(১) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয় "ভাষাবৃত্তি" ও তাহার টীকা হইতে এই কয়টি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

"হে বুদ্ধরূপী কেশব! পশুহত্যা-দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তুমি যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যনিচয়কে নিন্দা কর।"

এখানে জয়দেব "শ্রুতিজাতং" পদের "সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং" বিশেষণটি প্রদান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের এবং বুদ্ধকর্ত্তৃক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

এ চিত্রের অবশ্যই আর একটা দিক্‌ও আছে। ভাগবতে বুদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (১।৩।২৪):—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

অসুরদিগকে মিথ্যা ধর্ম্মের দ্বারা মজাইয়া তাহাদের বিনাশসাধন করিবার জন্য বুদ্ধরূপী বিষ্ণু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" পুরাণকারগণ এই বিকট মত প্রচার করিয়া আপনাদিগের হৃদয়ের ভীষণ বৌদ্ধবিদ্বেষ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছেন। নৈয়ায়িক উদয়ন আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া এক স্থানে বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"বৌদ্ধস্য শিরস্যেষ প্রহারঃ।" (২) সেন-যুগে বাঙ্গলারই এক অংশের রাজা হরিবর্ম্মার মন্ত্রী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও মীমাংসক ভবদেব ভট্ট বালবলভীভুজঙ্গ ভুবনেশ্বরের একখানি শিলালিপিতে "বৌদ্ধাম্ভোনিধি-কুম্ভসম্ভবমুনিঃ", "বৌদ্ধধর্ম্মরূপ সাগরের গণ্ডূষকারী অগস্ত্য" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (৩) কিন্তু পৌরাণিক ও দার্শনিকগণের মত সঙ্কীর্ণচেতা ধর্ম্ম-যাজকের ও মতদ্বৈধ-অসহিষ্ণু তার্কিকের ভ্রূকুটীমাত্র। সেকালের জন-সাধারণ—হিন্দুসাধারণ এ সকলে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভক্তকবি জয়দেবের সহিত গাইতেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

তার পরেই যবনিকা-পতন; হিন্দুর রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপ; এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুর চিত্তের স্বাধীনতার—ধর্ম্মে স্বাধীনতার বিজয়নিশান বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

অমৃত।

নিত্য উঠে বেদধ্বনি বিধাতার মঙ্গলমন্দিরে,
নিত্য বহে সৌন্দর্য্যের অনুপম আনন্দ-হিল্লোল
সপ্তবর্ণে স্বপ্তস্বরে পূর্ণ করি' অনন্তের কোল,
বিশ্ব-বাসনার গীতি বাজি' উঠে মধুর গম্ভীরে!

(২) কুসুমাঞ্জলি, প্রথমস্তবক, এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক, ৭১ পৃঃ। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্. এ. এই অংশটি লেখককে দেখাইয়া দিয়াছেন।

(৩) নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট।

নব নব জীবনের সুকোমল সুরভি নিশ্বাসে
উড়ায়ে ধ্বংসের ধূলি ভস্মশেষ সৃষ্টির শ্মশানে,
নূতন হাসিয়া উঠে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত প্রাণে
ঢালে আনন্দের মধু অভিনব বিকাশে বিলাসে!
এই জন্ম-মরণের অবিশ্রান্ত ঘাত—প্রতিঘাতে
আন্দোলিত অন্তহীন অতি ক্ষুব্ধ সিন্ধুর মাঝার,
বিরাজিছ হে বাঞ্ছিত, হে অমৃত, নিত্য নির্ব্বিকার,
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন—শিব ধ্রুব, পূর্ণ আপনাতে।
এ কি অপরূপ লীলা, হে বিরাট, অমৃত-মূরতি!
আপন বন্দনা গাহি' আপনারে করিছ আরতি!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাতৃশ্রাদ্ধ' নামক একটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন।' এক প্রবন্ধেই দার্শনিকতার ও মাতৃভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। 'মাতৃশ্রাদ্ধে' হেঁয়ালি ছন্দে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মা 'অনন্ত পিতামাতা'র অবতার, অতএব 'মা তুমি আছ।' বক্তব্য বিষয়কে এত জটিল করিয়া তোলা যায়, তাহা আমরা জানিতাম না। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বিবৃত বিবরণ' হইতে সঙ্কলিত 'লঙ্কার বৌদ্ধ বিহারে' বিশেষত্ব বা নূতন কোনও তথ্য নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমুদ্রাতঙ্কের বিস্তৃত কাহিনী উপভোগ্য। আশা করি, তাহা ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নিবন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় একবারও তিব্বতের উল্লেখ করেন নাই! 'শ্রী' স্বাক্ষরকারার 'মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ' চলনসই রচনা,—ভাষা ঠাকুর-বাড়ীর ছাঁচে ঢালা। শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজের 'ব্রাউনিং' উল্লেখযোগ্য। লেখক ভাষাবিন্যাসে অসাবধান ও স্থানে স্থানে যথেচ্ছাচারী না হইলে প্রবন্ধটি আরও মনোজ্ঞ হইত। নমুনা,—'ব্রাউনিং লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন।' এরূপ অস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য বিশদ হয় না। লেখক ক্ষমতাশালী। আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি রচনার প্রসাধনে অবহিত হইবেন। শ্রীযুত পাঁচুলাল ঘোষের 'মনের দাগ' নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সাধনা করিলে নূতন লেখক গল্প-রচনায় সিদ্ধ হইবেন।—এই ক্ষুদ্র গল্পের দুই একটি চরিত্র তূলির দুই একটি টানে বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচু বাবু লিখিয়াছেন,—'নির্দ্দোষী'। নির্দ্দোষকে দীর্ঘ ঈকারটি বখশিস্ না দিলে কোনও ক্ষতি হইত না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের 'শক্তির শক্তি' কবিতা, চারি চরণে সমাপ্ত।

তাহারও শেষ দুই চরণ অবোধ্য। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর 'কলঙ্ক' কবিতার বক্তব্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

'বেলা বয়ে যায়, উন্মাদ বায় আসি' কহে বার বার
'সন্ধ্যা হয় যে, অন্ধ কুসুম খোল অন্তর-দ্বার।
মুকুল-গন্ধ অন্ধ ব্যথায়
কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,
লুটাইতে চায় সন্ধ্যার গায় রুদ্ধ আবেগ ভার,
বিকাইতে চায় চরণের পরে কৌমার সুকুমার।'

পুষ্পবালিকার 'কৌমার বিকাইবার' কাহিনী কবিত্বের বিষয় বটে!—'উন্মাদ বায়' ঘাড়ে না চড়িলে যে কোনও ভদ্র কবি 'সুকুমার কৌমারে' অন্য ভাব ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। কবির কল্পনাও অত্যন্ত উদ্ভট,—

'মন্থর পদে সন্ধ্যা নামিল কাজল তিমিরে আঁকা!'

কাজল তিমির, অর্থাৎ কাজলের মত তিমির। তাহাতে আঁকা সন্ধ্যা, না কাজল তিমির দিয়া আঁকা সন্ধ্যা? আর তাহাই বা কি বস্তু? আবার,—

'দুয়ারে অতিথি, অন্তরে ব্যথা সম্ভব সে কি থাকা?'

দুয়ারে যখন অতিথি থাকে, তখন বাগচী কবির পুষ্পবালিকাদের অন্তরে ব্যথা থাকা সম্ভব কি?—ইহাই কি কবির অভিপ্রেত অর্থ? অন্বয়ের কি দৌড়! পুষ্পবালিকাদের যখন বাপ মা নাই, তখন তাহারা বাতাবী-কুঞ্জে যাহা ইচ্ছা করিতে থাকুক, কিন্তু বাগচী কবিরা কোন সাহসে সারস্বতসমাজে কৌমার্য্য-বিক্রয়ের 'চাপা খেউড়' গাহিতে আসেন, তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কবি উপসংহারে বলিয়াছেন,—

'কলঙ্কী মন, মুগ্ধ হৃদয়— একি পরিণাম তোর!'

আমরা বলি,—হায় বাঙ্গালা কবিতা! হায় বাঙ্গালী কবি! 'এ কি পরিণাম তোর!' সৌভাগ্যক্রমে পুষ্পবালিকাদের অভিভাবক নাই; থাকিলে এই শ্রেণীর কবিদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। শ্রীযুত যদুনাথ সরকারের 'বিকানীর' ও শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকারের 'ভাষা-শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত মোক্ষদাচরণ ভৌমিকের 'কার্য্য-কারণ' নামক চতুষ্পদীর শেষ দুই চরণে 'জীবনে'র সহিত 'কারণে'র মিল দেখিতেছি। চারি ছত্র রচনা, তাহার দুই ছত্রেও গোঁজা মিল। কিন্তু কবিরা বলিবেন,—

'তবুও লিখিতে হবে,
কি লয়ে' পরাণ রবে!
কাঁদিয়া 'প্রবাসী' পানে চাহি বারে বার!'

তবে লিখুন। বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিকুঞ্জ কাঁটায় আগাছায় পূর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠুক। কাণা ও খোঁড়া কবিতা না ছাপাইয়া প্রথমে মক্স করিলে হয় না? সকলেই কবিতা লিখিবার শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। কবিতা-রচনাই সাহিত্য-সেবার একমাত্র পথ নহে। অন্য পথে ভারতীর উপাসনা করিলে হয় না? শ্রীযুত শিবরতন মিত্রের 'গঙ্গা-

নারায়ণ-বিরচিত ভবানী-মঙ্গল' প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস। শ্রীযুত অবিনাশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'আমার লেখা' কবিতা নহে, ছড়া। কষ্টকল্পনার এমন নমুনা আজকাল বাঙ্গালা মাসিকেও সচরাচর দেখা যায় না। অত জোরে 'কাতুকুতু' দিলে তাহা 'চিমটী'তে পরিণত হয়, হাস্যের পরিবর্ত্তে জ্বালার সৃষ্টি করে। কিন্তু লেখকের ছন্দে অধিকার আছে। তাঁহার মিলগুলিও চমৎকার! তবে তাঁহার রচনার যাহা উদ্দেশ্য—হাস্যরসের সৃষ্টি, তাহারই অত্যন্তাভাব। শ্রীযুত নন্দলাল বসু 'জগাই মাধাই' নামক চিত্রে জগাই ও মাধাইয়ের কল্পনায় পটুতার পরিচয় দিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথের একমাত্র উল্লেখযোগ্য শিষ্য—শ্রীযুত নন্দলালের চিত্রে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র ছাপ অত্যন্ত অল্প! দুই এক স্থলে অল্প অস্বাভাবিক হইলেও, এই চিত্রখানি স্বভাবের পরিপন্থী নহে।

সুপ্রভাত। কার্ত্তিক। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতি' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর 'তুলসীদাস' প্রবন্ধে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী 'বিক্রমপুরে সৌরপ্রভাব' প্রবন্ধে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক স্বতঃসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রত্নপাণ্ডিত্যের 'ভুর ভাঙ্গিয়া' দিয়াছেন। যুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাগরণ' নামক গানে বারো চরণে বারো বার 'জাগো' আছে। তাহার বদলে 'নাচো', 'কোঁদো', 'হাসো', 'কাঁদো', 'গাও', 'খাও' প্রভৃতি বসাইয়া দিলেও অর্থের কোনও ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য, 'জাগো' যে শ্রেণীর অর্থ ব্যক্ত করিতেছে, সেই শ্রেণীর অর্থ! স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের 'তোমার স্বরূপ' নামক গানটি ভাবুকের উপভোগ্য। 'শারদলক্ষ্মী' কবিতার দ্বিতীয় চরণেই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন,—

'কে এলেন আজ সিক্ত মেঘের রক্ত রথেতে!'

আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, তাহা সঙ্কোচের সহিত স্বীকার করিতেছি। কিন্তু করুণাময় কবি স্বয়ং শেষ চরণে হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন,—

'ঐ এলেন বুঝি শারদলক্ষ্মী বিশ্বের জননী!'

কিন্তু 'সিক্ত মেঘের রক্ত রথ' কি? 'শারদলক্ষ্মী'কে কবি সহসা 'বিশ্বের জননী' করিয়া দিলেন কেন, তাহাও ত বুঝিতে পারিলাম না। আবার,—

'অমল মুখের পুণ্য হাসি,
আকাশেতে যাচ্ছে ভাসি!'

—আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা আকাশে ভাসমান 'পুণ্যহাসি' দেখিতে পান, এই মর-জগতে অক্ষম কবিতা যে 'মুচকী' হাসির সৃষ্টি করে, সে হাসি আদৌ তাঁহাদের চোখে পড়ে না!

দেবালয়। কার্ত্তিক। শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'শান্তরূপ' নামক কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 'চেতনা সঞ্চারি গোপন আগারে' প্রভৃতি মামুলী 'কাব্যি' আর ভাল লাগে না। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে' নামক স্তবে 'দেবালয়ে'র চাতাল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত বোঝাই হইয়া গিয়াছে। 'চারু' প্রথমেই একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন,—'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' কবি—সমসাময়িক সমগ্র জগতে তাঁহার তুল্য প্রতিভাবান কবি কেহ প্রাদুর্ভূত হয় নাই।' বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার রায় উদজারযান ও যবক্ষারযানের সাহায্যে বকযন্ত্রে এই মত প্রতিপন্ন করিলে, সত্যই বাঙ্গালীর বুক দশহাত হইয়া উঠিবে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল সমালোচনায় এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বাঙ্গালী জগতের সাহিত্যের দরবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। 'সমসাময়িক সমগ্র জগৎ' যতই উদ্ভট হউক, সেই জগতের সমগ্র সাহিত্যের এমনতর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিবার শক্তি এ মর্ত্ত জগতে সকলের নাই। আমরা ত আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিতেই পারি না! অতএব, বাঙ্গালীর এই গৌরবটুকু অম্লানবদনে পরিপাক করিবার চেষ্টা করিব। আর 'বিশ্বসাহিত্যের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ' মনীষী শীল ও ডাক্তার রায় চারু সমালোচককেও 'সমসাময়িক সমগ্র জগতের একমাত্র সমালোচক' বলিয়া স্বীকার করিবেন, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ নাই!—রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই কামধেনুর মত দোহন করিলেই 'আধ্যাত্মিক' দুগ্ধ দান করে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে পীড়ন করিয়া আধ্যাত্মিক রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিয়াছেন। 'পসারিণী' কবিতার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ এই শ্রেণীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিশ্লেষণী শক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। চারু সমালোচক লিখিয়াছেন,—'বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল। অন্তরের প্রশান্ত একই, বাহিরের বিচিত্ররূপিণী!' বিস্ময়কর নহে কি? এ দার্শনিকতা যে রবারের অপেক্ষাও অধিকতর স্থিতিস্থাপক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? তর্কের অনুরোধে চারুর এই দার্শনিক mandateও না হয় শিরোধার্য্য করিলাম। তাহার পর, চারু সমালোচক লিখিয়াছেন,—'ইনি "পসারিণী" বেশে আমাদের কাছে গতায়তি (গতায়াত নহে! উহা ত মুটে মজুর সকলেই লেখে!) করেন। পসারিণী "কোথা কোন বহুদূরে বিদেশের রাজপুরে" রতনের হাটে বিকিকিনি করিতে চলিয়াছে। আজ এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন দুপ্রহরে

"সম্মুখে দেখ ত চাহি, পথের যে সীমা নাহি,
তপ্তবায়ু অগ্নিবাণ হানে।"

'এখন আমি নিশ্চিন্ত নীরবে একাকী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি—

"হেথা দেখ শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল;
কূলে কূলে ভরা দীঘি, কাকচক্ষু জল।

থাক তব বিকিকিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।"

'তুমি রতনের হাটে যে পসরা লইয়া চলিয়াছ, তাহা আমার কাছে নামাইয়া আমায় একবার দেখাইয়া যাও। ওগো প্রত্যক্ষ, ওগো Immediate, তুমি পরোক্ষের সংবাদ, Infinity'র তত্ত্ব আমাকে বলিয়া যাও।' পাঠক! মূল ও ব্যাখ্যা দেখিয়া বলুন,—এই কবিতার এই ব্যাখ্যা কি উৎকট দার্শনিকতারও ও উদ্ভট আধ্যাত্মিকতার উন্মত্তপ্রলাপ নহে? 'নির্জ্জন দুপ্রহরে' কবি যদি শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল দেখাইয়া কোনও পসারিণীকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে কি মনে হয় যে, সসীম অসীমকে আহ্বান করিতেছে? এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়া কেহ যদি বলে,—তলস্পর্শ Infinite অর্থাৎ অতলস্পর্শকে আহ্বান করিতেছে, তাহা হইলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকে কি? সে ব্যাখ্যাও এত অসমঞ্জস, এত উদ্ভট হয় কি? 'পসারিণী অন্তরের এক'; কেন না, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সে তাই! অতএব, নির্জ্জন দুপুরে শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া গেল! ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের পসারিণীর হাতে ঝাঁটা ছিল না, তাই রক্ষা! নতুবা কি হইত, বলা যায় না। হে ভগবন্! রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব;—তুমি তাঁহাকে এই চারু সম্প্রদায়ের নির্ল্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জ্জলা খোসামুদী ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।

শ্রীযুত রামপ্রাণ গুপ্ত 'এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী 'সুখ' নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতায় লিখিয়াছেন,—

'——— ——— জন্মি রাজকুলে,
লক্ষ প্রজা দিবারাত্রি নমে পদমূলে;
ধনীর দুলাল তবু মিলিয়াছে মান
বিশ্ববিদ্যালয়ধামে———'

ইহাতেও নিস্তার নাই; আবার ঘন ক্ষীরের উপর চাঁপা কলা,—

'পরিপূর্ণ সুন্দর তনু নীরোগ সুন্দর!'

কবি আক্ষেপ করিয়াছেন,—'তবু ঘুচিল না দুঃখ!' বাগচী কবি রাজকুলে জন্মিয়াছেন বটে, কেন না, জমীদারও রাজা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার 'ধাম'ও বটে! 'ঐ দেখা যায় আনন্দধাম'—ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত স্মরণ করুন। তার পর 'সুন্দর' তনু। রাজকুল, বিদ্যা ও সুন্দর, যাহার জীবনে এই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিল, হায়! তাহার 'তবু ঘুচিল না দুঃখ!'

আমরা কবিকে আশ্বাস দিয়া বিশারদের ভাষায় বলি,—

'ভ্যালা মোর বাপ! আচ্ছা মন্দ!
বসে' বসে' বেশ লিখছ পদ্য!'

উপনিষদে ক্ষাত্রের-প্রভাব।

এখন যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বোধ হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ। এই উপনিষদে বৈদেহ জনক নামক এক সম্রাটের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উপনিষদে তিনি 'মেধাবী', 'অধীতবেদ', 'উক্তোপনিষৎক' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, দেখা যায়। (১) ইনি বিদেহ দেশের সম্রাট্ ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, জনক এক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে কুরুপাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইলে রাজার জানিবার ইচ্ছা হইল যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কে ব্রহ্মিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা পারগ। সেই জন্য তিনি সহস্র গো দক্ষিণাস্বরূপ উপস্থিত করিয়া প্রত্যেকের শৃঙ্গে দশ দশ স্বর্ণপদক সংযুক্ত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—"যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্"—"আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গোসহস্র গ্রহণ করুন।" কোনও ব্রাহ্মণই ঐ পণ-গ্রহণে সাহসী হইলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে অনুমতি করিলেন,—"বৎস, এই গোসহস্র স্থানান্তরিত কর।" ক্ষত্রিয়ের স্বয়ংবরে কোনও সাহসী রাজা কন্যাগ্রহণ করিলে অন্যান্য রাজারা অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ তাঁহাকে সাহসে আক্রমণ করিতেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিল। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ—ত্বং নো খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি!" তখন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর প্রবল প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভূজ্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেককেই যথোচিত উত্তর দিয়া নিরস্ত করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আপনারা মৌনী হইলেন কেন? যাঁহার যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।" কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না।

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি।—বৃ ৪।৩।৩৩।

আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি।—বৃ ৪।৩।১।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সম্রাট্ জনক এই তর্কসভার সভাপতি ছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আবার এই জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। এখানে জনক প্রশ্ন করিতেছেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে ব্রহ্ম-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সকল বিবৃত করিতেছেন। অবশেষে জনক ব্রহ্মবিদ্যার চরমতত্ত্ব লাভ করিয়া শিষ্যভাবে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন,—"এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।"—"হে সম্রাট্, ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে। যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলে জনক বলিলেন, ভগবন্! বিদেহরাজ্য আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন করিলাম।" এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয় রাজা জনককে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজর্ষি জনকের পরিচয়স্থলে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইত ;—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই বৈদেহ জনকের আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি উপদেশ আদান করিতেছেন না, প্রদান করিতেছেন। এখানে তিনি শিষ্য নহেন—শিক্ষক। আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে (ইঁহার সহিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি অশ্বতরের কোনও সম্বন্ধ আছে না কি?) গায়ত্রী "তুরীয় দর্শত পদ" গূঢ়তম রহস্য উপদেশ করিতেছেন। যে পদের স্তুতি করিয়া ঋষি বলিতেছেন, ইহা "পরোরজঃ"—অজ্ঞানতিমিরের অতীত। ইহা জানিলে সাধক শুদ্ধ, পূত, অজর, অমর হয়।

"এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা * * এবং-বিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি।"—বৃ ৫।১৪।৮

এই গায়ত্রীর উচ্চতত্ত্ব বিবৃত করিয়া বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন,—

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি।—বৃ ৫।১৪।৮

বৈদেহ-জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—তুমি যদি গায়ত্রীবিৎ, তবে হস্তী হইয়া বহন করিতেছ

কেন ? (ইহা বোধ হয় রূপক)। বুড়িল বলিলেন,—সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ জ্ঞাত নহি। উত্তরে জনক বলিলেন,—

অগ্নিরেব মুখং। যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্ ,যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ॥—বৃ৫।১৪।৮

"অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। যেমন অগ্নিতে বহু ইন্ধন দিলেও অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করে, সেইরূপ গায়ত্রীবিৎ বহু পাপ করিলেও সে সমস্ত বিধূত হইয়া তিনি শুদ্ধ, পূত, অজর, অমর, অমৃত হয়েন।"

এইরূপ বৈদেহ-জনক বুড়িলকে গায়ত্রীর গূঢ় রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে লিখিত আছে যে, প্রবাহণ জৈবলি এবং শিলক ও দাল্‌ভ্য নামক দুই জন ব্রাহ্মণ উদ্গীথে নিপুণ ছিলেন। এক দিন তাঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া উদ্গীথের রহস্য-কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন (উদ্গীথ সামবেদের নিগূঢ় মন্ত্র—স্বর-রহস্য)। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—"আপনারা উভয়ে ব্রাহ্মণ, আপনারা অগ্রে বলুন, আমি শ্রবণ করি।"

ভগবন্তৌ অগ্রে বদতাম্। ব্রাহ্মণয়োর্বদতো বাচম্ শ্রোষ্যামি।—ছা ১।৮।২

তখন প্রবাহণ জৈবলি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ; ব্রাহ্মণদ্বয় কতক দূর অগ্রসর হইয়া নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। কারণ, উদ্গীথের "উপনিষদ্" তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তখন প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—

অন্তবৎ বৈ কিল তে সাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইহার অধিক আমি জ্ঞাত নহি। আপনার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি।" "হন্ত অহং এতদ্ ভগবত্তো বেদানি"।—ছাঃ ১।৮।৮

তখন প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাদিগকে উদ্গীথের রহস্য উপদেশ করিলেন। সেই রহস্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন,—

তং হৈতং অতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায় উক্ত্বোবাচ।—ছা ১।৯।৩

ইহা হইতে জানা যায় যে, উত্তরকালে অতিধন্বা শৌনক (নামের বিশেষণ হইতে মনে হয়, ইনিও ক্ষত্রিয় ছিলেন) উদরশাণ্ডিল্যকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

এই প্রবাহণ জৈবলির আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে পুনরায় সাক্ষাৎ পাই। সেখানে জীবের উৎক্রান্তি (মৃত্যুর পর পরলোকগতি ও পুনর্জন্ম) রাজা জৈবলি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, দেখা যায়। এই রহস্যবিদ্যার নাম পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা গোপ্য রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পঞ্চম অধ্যায়ের বিবরণ এইরূপ,—অরুণের পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—"কুমার, তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন কি?" শ্বেতকেতু বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়!" তখন প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে একে একে জীবের উৎক্রান্তি, দেবযান, পিতৃযান পথ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পর পর পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেতকেতু প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"ন ভগবন্"—"না মহাশয়, আমি জানি না।" তখন জৈবলি বলিলেন,—"যদি এ সকল তত্ত্ব না জান, তবে কেমন করিয়া বলিলে যে, তুমি শিক্ষিত হইয়াছ?" শ্বেতকেতু মহালজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"সে ক্ষত্রিয়বন্ধু আমাকে পর পর পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিল। আমি একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি আমাকে কেমন শিক্ষিত করিয়াছেন?" পিতা বলিলেন,—"এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না। যদি জানিতাম, তবে কি তোমাকে না বলিতাম?" (২) তখন পিতা-পুত্রে রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্ গৌতম, আপনি কি বিত্তের অভিলাষ করেন?" গৌতম বলিলেন,—"হে রাজন্, আমি মানুষের বিত্ত আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনি আমার পুত্রকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করুন।"

স হ কৃচ্ছ্রীবভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ॥—ছা ৫।৩।৭

অর্থাৎ, গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—

---

(২) পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকং চ নাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকং চ ন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি।—ছা ৫।৩।৫

"কিছু দিন অপেক্ষা করুন।" তাহার পর বলিলেন যে, "হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই। সেই জন্যই সমস্ত লোক ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন।" পরে রাজা গৌতমকে সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিলেন, এবং উপদেশান্তে বিদ্যার স্তুতি করিয়া বলিলেন,— (৩) "যিনি এই পঞ্চ অগ্নি জ্ঞাত হন, তিনি পতিতের সহিত সহবাসেও পাপলিপ্ত হন না। যিনি এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, তিনি পূত, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।"

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, জন্মান্তর সম্বন্ধে এই নিগূঢ় তত্ত্ব পূর্ব্বকালে জৈবলির মত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্মণেরা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এখানেও এই বিদ্যার উপদেষ্টা প্রবাহণ জৈবলি। বৃহদারণ্যকের বিবরণ ও ছান্দোগ্যের বিবরণে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কেবল দুই এক স্থলে ভাষার কিছু তারতম্য। প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমকে বলিতেছেন,—

স হোবাচ যথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।—বৃ ৬।২।৮

অর্থাৎ, "হে গৌতম, আমার অপরাধ লইবেন না। এই বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কখনও কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই। কিন্তু আপনার মত যোগ্য ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। অতএব আপনাকে এই বিদ্যা উপদেশ করিব।"

ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই বিদ্যার আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে ইহার উপদেষ্টা গর্গবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজা চিত্র। তিনি গৌতমপুত্র শ্বেতকেতুকে জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্বেতকেতু বলিলেন,—

"নাহমেতৎ বেদ।" আমি ইহা জানি না। "হন্ত আচার্য্যং পৃচ্ছামি।" "আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিলেন,—"অহমপি এতন্ন

---

(৩) অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে। শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।—ছা ৫।১০।১০

বেদ"—"আমিও ইহা জানি না।" তখন তিনি শিষ্যরূপে সমিৎ-হস্তে রাজা চিত্রের সমীপস্থ হইলেন, এবং চিত্রের নিকট হইতে এই গূঢ় রহস্যের বিবরণ অবগত হইলেন।

"স হ সমিৎ-পাণিশ্চিত্রং গার্গ্যায়ণিং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচ ব্রহ্মার্হোঽসি গৌতম যো ন মানমুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি।"

বৃহদারণ্যকে উপনিষদ্-রহস্যের উপদেশকর্ত্তা আর এক ক্ষত্রিয়-রাজার আমরা সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নাম অজাতশত্রু। তিনি বেদবিদ্যাভিমানী দৃপ্ত বালাকির দর্প চূর্ণ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে তাঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—গর্গবংশীয় দৃপ্ত বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি"—"তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব।" অজাতশত্রু বলিলেন,—"বেশ।" তখন বালাকি পর পর সূর্য্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে ইত্যাদিতে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যত দূর অবগত ছিলেন, একে একে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু রাজা রাম রায়ের ন্যায় বলিলেন,—

ইহ বাহ্য, কহ পরে আর। "স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ।"—বৃ ২।১।১৩।

তখন দৃপ্ত বালাকি নীরব হইলেন।

অজাতশত্রু বলিলেন,—"এই পর্য্যন্ত।" বালাকি বলিলেন,—"হাঁ, এই পর্য্যন্ত।" অজাতশত্রু বলিলেন,—"নৈতাবতা বিদিতং ভবতি"—"ইহার দ্বারা জানা গেল না।' তখন বালাকি বলিলেন,—"তবে আপনি আমাকে উপদেশ করুন।"—

স হোবাচ গার্গ্যঃ উপ ত্বা যানীতি।—বৃহ ২।১।১৪

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং বৈ তদ্যদ্‌ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্‌ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি। ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি।—বৃহ ২।১।১৫

অজাতশত্রু বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য উপস্থিত হইবেন,—ইহা বিপরীত ব্যাপার। যাহা হউক, আপনাকে বলিতেছি।" তখন রাজা অজাতশত্রু জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদন করিলেন।

কৌষিতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা এই অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই বিবরণ মূলতঃ বৃহদারণ্যকের অনুগত। কেবল স্থানে স্থানে ভাষাগত প্রভেদ। সেখানেও ক্ষত্রিয় অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ

বালাকিকে উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য উপদেশ করিতেছেন। কৌষিতকী উপনিষদের বিবরণ এইরূপ ;—

তত উহ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তৎ স্যাদ্ যৎক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি।—কৌষিতকী ; ৪।১৮

"তখন বালাকি সমিৎ-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—'আমাকে উপদেশ করুন।' অজাতশত্রু বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের 'উপনয়ন' করিবে, ইহা বিপরীত ব্যবহার। তথাপি আপনাকে উপদেশ করিব।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আর এক জন উপনিষদের রহস্যবেত্তা ক্ষত্রিয়-রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার নাম অশ্বপতি কৈকেয়। তিনি পাঁচ জন "মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়" ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের গুরুস্থানীয় ভগবান্ আরুণিকে বৈশ্বানর আত্মার (universal self) উপদেশ করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণের আরম্ভ এইরূপ ;—

প্রাচীনশাল উপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥১॥

তেহ সম্পাদয়াংচক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥২॥

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ॥৩॥

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪॥

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার সহ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ নমেস্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু মে ভগবন্ত ইতি ॥৫॥

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেৎ তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥৭॥

"উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবীপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষপুত্র জনক ও অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল, এই পাঁচ জন মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—আমাদের আত্মা কি ? ব্রহ্ম কি ? তাঁহারা স্থির করিলেন যে, 'অরুণপুত্র উদ্দালকই বৈশ্বানর

আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। এস, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি।' তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। উদ্দালক ভাবিতে লাগিলেন,—এই সকল মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ আমাকে প্রশ্ন করিবেন, আমি সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিব না; অতএব অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন,—'মহাশয়গণ, অশ্বপতি কৈকেয় সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। চলুন, তাঁহার নিকট যাওয়া যাক।' তাঁহারা অশ্বপতির নিকটে গেলেন। অশ্বপতি প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পূজা করিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আমার রাজ্যে কোনও চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, পরদারী নাই, স্বৈরিণী নাই। হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে যে ধন দিব, আপনারাও তাহাই পাইবেন। আপনারা এখানে অবস্থান করুন।' তাঁহারা বলিলেন,—'যে জন্য আমরা আসিয়াছি, আপনাকে বলা আবশ্যক। সম্প্রতি আপনি বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। উহা আমাদের উপদেশ করুন।' রাজা বলিলেন—'কাল উত্তর দিব।' পরদিন প্রভাতে তাঁহারা সমিৎ-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার না করিয়াই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায়ে আমরা আর এক জন ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণের উপদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হই—

"অধীহি ভগবঃ ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।" "হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন।" এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সনৎকুমার দেব-ক্ষত্রিয়। "ভগবান্ সনৎকুমারঃ তং হ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।"

সনৎকুমার দেব-সেনাপতি—স্কন্দ। নারদ শিষ্যভাবে তাঁহার সমীপস্থ হইলে সনৎকুমার বলিলেন,—"তুমি যত দূর বিদ্যালাভ করিয়াছ—তাহা আমাকে বল। তাহার উপর যাহা, তাহা আমি উপদেশ করিব।" নারদ বলিলেন,—"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, রাশি, দৈব, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্রবিৎমাত্র, আত্মবিৎ নহি।'

সোঽহং ভগবঃ শোচামি। তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তি।—ছা—৭।১।৩

"হে ভগবন্, তথাপি আমি শোকের অধীন। আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।" তখন ভগবান্ সনৎকুমার সোপানে সোপানে উঠিয়া নারদকে ভূমা-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। কারণ, ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। এই ভূমাই ব্রহ্ম। সনৎকুমার বলিতেছেন,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্। —ছা—৭।২৫।১

তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই নিখিল। এইরূপে দেব-ক্ষত্রিয় সনৎকুমার ব্রাহ্মণ নারদকে তমসের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।—ছা ৭।২৬।২

ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরা উপনিষদের যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছিলেন, সে সমস্তেরই বিবরণ যে উপনিষদে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না; কিন্তু আমরা উপরে যে সকল বিবরণের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়ের উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে কিরূপ পরিচয় পাওয়া গেল? আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে প্রবাহণ জৈবলি উদ্গীথের ও বৈদেহ-জনক গায়ত্রীর গূঢ় রহস্য (যাহাকে উপনিষদ্ বলা হইত) বিবৃত করিতেছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, জীবের উৎক্রান্তি, গতাগতি ও পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব যে রহস্য-বিদ্যায় নিবদ্ধ ছিল, ক্ষত্রিয়-রাজা প্রবাহণ জৈবলি ও চিত্র গার্গ্যায়ণি সেই নিগূঢ় পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশ করিতেছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, অশ্বপতি কৈকেয়—

"কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম"

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম=আত্মা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক এই আর্য্য সত্যের প্রচার করিতেছেন। আমরা আরও দেখিতেছি যে, ক্ষত্রিয়-রাজা অজাতশত্রু বেদবিদ্যাবিৎ বালাকিকে বৈশ্বানর আত্মার গূঢ় রহস্য বিবৃত করিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে আমরা দেখিয়াছি যে, দেব-ক্ষত্রিয় সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভূমা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

ব্রহ্মবিদ্যার এই চরম উপদেশ বিবৃত করিতেছেন। অতএব, এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না যে, উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের প্রভাব বিশিষ্টভাবে বিদ্যমান।

এই ব্যাপার দেখিয়া, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিতেছেন দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশে নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। অধ্যাপক ডয়েসন্ তাঁহার উপনিষদ্-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।—(৪) "উপনিষদের প্রচারিত আত্মতত্ত্বের সহিত বেদের কর্ম্মকাণ্ডের এতই বিরোধ যে, এই আত্মবিদ্যা—যাহা পরবর্ত্তী কালে উপনিষদসমূহে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই বিদ্যা কর্ম্মকাণ্ড-প্রিয় ব্রাহ্মণসমাজের আদর লাভ করিতে পারে নাই। ইহা উপনিষদ্-(রহস্য)-রূপে মনীষী ক্ষত্রিয়সমাজের মধ্যে গুপ্তভাবে প্রচারিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার দূরে দূরে রহিতেন। অতএব ইহা বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যখন ব্রাহ্মণেরা এই বিদ্যালাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।" "কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে মতের বিরোধ আছে সত্য। যিনি আত্ম-তত্ত্বের অধিকারী, যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি জগৎকে মায়ার বিলাস বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করা অসম্ভব। কিন্তু অধিকারিভেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব নহে। সেই জন্য প্রাচীন আর্য্যসমাজের বিধান ছিল যে, মনুষ্য-জীবন চারি ভাগে বিভক্ত হইবে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। 'ব্রহ্মচারী

---

(4) As a matter of fact the doctrine of the Atman standing, as it did, in such sharp contrary to all the principles of the vedic ritual, though the original conception may have been due to Brahmans was taken up and cultivated primarilly, not in Brahmana but in Kshatriya circles and was first adopted by the former in latter times. That this teaching with regard to the atman was studiously withheld from them ; that it was transmitted in a narrow circle among the kshatriyas to the exclusion of the Brahmans ; that in a word it was Upanishad.—*Philosophy of the Upanishad P. 19.*

অন্যত্র ডয়েসন এইরূপ লিখিয়াছেন,—This antagonism of the atman doctrine to the sacrificial cult leads us to anticipate that at the first it would be greeted with opposition by the Brahmanas * * This antagonism may have been the reason why the doctrine of the atman, although originally proceeding from Brahmans like Jaggabalka received its earliest fostering and development in the more liberal-minded circles of the kshatriyas ; while among the Brahmans it was on the contrary shunned for a long period as a mystery (Upanishad) and continued therefore, to be withheld from them.

Do P. 396

ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" অর্থাৎ, মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মচারী হইবে, পরে গৃহস্থ হইবে, পরে বনচারী বানপ্রস্থ হইবে, এবং পরিশেষে প্রব্রজ্যা করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এই সন্ন্যাস-দশাতেই জীব আত্মবিদ্যার অধিকারী হইত। তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিধি-নিষেধের অপেক্ষা থাকিত না। তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনও থাকিত না, সম্ভাবনাও থাকিত না। এইরূপ সাধককে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবাভিসন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥—গীতা।

"যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যাঁর সন্তোষ, তাঁহার পক্ষে কোনও কার্য্য নাই।"

উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দাসূচক যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার প্রয়োগ এইরূপ আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর পক্ষে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে যে এইরূপ সন্ন্যাসীর একান্ত অভাব ছিল, এরূপ ভাবিবার কি কারণ কাছে? বরং ইহাই মনে করা সঙ্গত যে, যেমন ক্ষত্রিয়সমাজে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণসমাজেও কর্ম্ম-কাণ্ড-নিরত ও আত্মবিদ্যারত উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, পিপ্পলাদ, অরুণি (শ্বেতকেতুর পিতা) এইরূপ আত্মবিদ্যারত ব্রাহ্মণের নিদর্শন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডরত বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আত্মবিদ্যা সমাদৃত হয় নাই, ইত্যাদি পাশ্চাত্য মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অথচ উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় উপদেশসমূহ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণেরাই লাভ করিতেছেন। এ ব্যাপারের প্রকৃত কারণ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিদিগের মতে. ভগবান্‌ই সমস্ত বিদ্যার প্রবর্ত্তক। তিনিই সমস্ত প্রজ্ঞা, সমস্ত জ্ঞানের আদি।

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।—শ্বেত ৪।১৮

"তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।" সেই জন্য পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন,—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্‌"—[যোগসূত্র; ১।২৫] "তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার বীজ রহিয়াছে।" অতএব ভগবান্‌কে

শাস্ত্রযোনি বলে [শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (৫) ব্রহ্মসূত্র ; ১।১।৩] সেই জন্য বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্‌যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।

—বৃ ২।৪।১০

অর্থাৎ, “যেমন বিনা প্রযত্নে প্রাণিগণের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান—সমস্ত বিদ্যাই সেই মহান্ ভূত (ব্রহ্ম) হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।” সেই জন্য ঋষিরা বলেন—বেদ নিত্য। কেহ কেহ ইহার এরূপ অর্থ করেন যে, বেদের শব্দ বা ভাষা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদিকাল হইতে সেইরূপ ছিল, এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea) নিত্য। ইহাই বিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে, এবং চিরদিনই থাকিবে। তাহা নিত্য, তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা এই বিদ্যার দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্ব্বেও সেই বিদ্যা বিদ্যমান ছিল, পরেও থাকিবে। “ঋষ্ দর্শনে।” ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ, ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কারকর্ত্তা, বা প্রচারক—প্রবর্ত্তক নহেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বেও আমেরিকা বিদ্যমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণবলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়োরোপে তখনও কেহ দর্শন করেন নাই।—অতএব এ বিদ্যার দ্রষ্টা বা আবিষ্কারকর্ত্তা নিউটন। এইরূপ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ)—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও ছিল। কোনও ঋষি ধ্যানদৃষ্টিবলে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহার

---

(৫) মহতো ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।—ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্য্য-সত্যের দ্রষ্টৃমাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ অনাদি। অশরীরিভাবে এই বিদ্যা পূর্ব্বাপর বিদ্যমান ছিল। ঋষি তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীরী বিদ্যাকে শাস্ত্রকারেরা স্ফোট বলেন। এই স্ফোটবাদের সহিত প্লেটোর (Plato) প্রচারিত "idea"-বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্ফোটরূপে যেমন বেদ নিত্য, idea রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়-কালে এই স্ফোট বা idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়।

যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বং সমাদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥—শঙ্করোদ্ধৃত বচন।

"যুগান্তে বেদ, ইতিহাস প্রভৃতি যে বিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছিল, মহর্ষিগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে তপস্যা দ্বারা সেই বিদ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হন।'

এই মহর্ষিগণ পূর্ব্বকল্পের সিদ্ধ মহাপুরুষ। এখন যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্ব্বে অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত বিশ্ব ভগবানে তিরোহিত হয়। সেই অবস্থায় পূর্ব্বতন সৃষ্টি-নাটকের অভিনেতা—সকল জীব, ভগবানে বিলীন হইয়া থাকেন; পরে প্রলয়ের অবসানে যখন আবার সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন সেই সমস্ত জীব ভগবান্ হইতে পৃথক্ হইয়া আবার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বকল্পের অবসানে যে সকল জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ ভগবানে একীভূত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কল্পে তাঁহারা জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবার আবির্ভূত হন। কপিল, ঋষভদেব, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি—এইরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। তাঁহারা জগতের হিতার্থ আবার দেহধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রচার করেন। কিন্তু ভগবান্ই বেদের বিদ্যার আদিপ্রবর্ত্তক। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥ - শ্বেতাশ্বতর—৬।১৮

"ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন।" (৬) বেদ বিদ্যার নামান্তর।

---

(৬) ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বে—৫।২

"ভগবান্ প্রথমজাত কপিলবর্ণ ঋষি (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানসমূহের দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।"

ভগবান্ হইতে যে ব্রহ্মা প্রথমতঃ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েক স্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে,—

"সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ"—বৃ ২।৬।৩, ৪।৬।৩

"কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ।"—বৃ ৬।৫।৪

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভু ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা প্রথমে এই বিদ্যা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে সনগ প্রভৃতি এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্। যে পূর্ব্বং দেবঋষয়শ্চ তদ্ বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ।—শ্বেত ৫।৬।

"এই বেদের রহস্য উপনিষদে নিগূঢ় বিদ্যা (যাহা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত), সেই বিদ্যা ব্রহ্মা অবগত হন। যে সকল দেবতা ও ঋষিগণ পূর্ব্বে সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।" ব্রহ্মার নিকট হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। সেই জন্য পতঞ্জলি ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—যোগসূত্র ১।২৬

"ভগবান্ কালের অতীত; সেই জন্য তিনি পুরাতন গুরুগণেরও গুরু।" ব্রহ্মা হইতে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে;—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং, অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

—মুণ্ডক ১।১।১—২

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

"সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান করি, যিনি আদিকবির (ব্রহ্মার) হৃদয়ে বেদ সঞ্চারিত করেন, (যে বেদ সুধীগণেরও দুর্ব্বোধ্য), এবং যিনি আপন স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন।"

'বিশ্বস্রষ্টা, জগৎভর্ত্তা, আদিদেব ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে, এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন।' এবং অঙ্গিরা ঋষিই ব্রহ্মবিদ্যার ঐ অংশ ভারতবর্ষে প্রচার করেন। মুণ্ডক উপনিষদের শেষে কথিত হইয়াছে যে, এই সত্য, ঋষি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন (তদেতৎ সত্যম্ ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ)। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

এতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।

—ছান্দোগ্য ৩।১১।৪ ৮।১৫।১

অর্থাৎ 'এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছেন, প্রজাপতি মনুকে, এবং মনু মানবগণকে।'

এইরূপে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। এইরূপে গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলে। যাহাতে এইরূপ সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে, বিদ্যাপরম্পরায় নির্ব্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। যে বিদ্যা বা জ্ঞান সম্প্রদায়বর্জ্জিত—যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা বা কল্পনাপ্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। সেই জন্য উপনিষদে অনেক স্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কে কোন্ বিদ্যাকে প্রথম প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে কিরূপে সেই বিদ্যার প্রবাহ প্রবাহিত ছিল, অনেক স্থলে তাহার বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, দেখা যায়। এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখকে বংশব্রাহ্মণ বলে। বৃহদারণ্যকে ২।৬, ৪।৬, ৬।৬ ও ৬।৫ অংশ ঐরূপ বংশব্রাহ্মণ। ঈশ উপনিষদের ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্ যে নঃ তদ্ বিচচক্ষিরে।—ঈশ; ১০।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগ তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, তাহা পুরাকালের রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল।—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥

"এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বান্‌কে উপদেশ করিয়াছিলাম। বিবস্বান্ মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত এই যোগ পূর্ব্বে রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন। কিন্তু ইহা দীর্ঘ-কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ আমি পুনরায় উপদেশ করিলাম।"

গীতাতে এই বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ পবিত্রম্ ইদমুত্তমম্।" শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা।" তাঁহার মতে. ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। কিন্তু রাজবিদ্যার অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত নহে। উপনিষদের বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে,এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত ছিল, এবং উপনিষদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ক্ষত্রিয়-রাজারাই ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার সুসঙ্গত নাম রাজবিদ্যা। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এ বিদ্যাকে কেন রাজবিদ্যা বলিত, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না।

অতো মাং ঈশ্বরঃ সৃষ্টা জ্ঞানেনাযোজ্যতাসকৃৎ।
বিসসর্জ্জ মহীপীঠং লোকস্যাজ্ঞানশান্তয়ে॥
অধ্যাত্মবিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা।
তদনু প্রসৃতা লোকে রাজবিদ্যেত্যুদাহৃতা॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং অধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা রাঘব রাজানঃ পরাং নির্দ্দুঃখতাং গতাঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ ; মুমুক্ষুপ্রকরণ ; ১১।৭।১৭।১৮

"পরে ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিলেন, এবং লোকের অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য মহীতলে প্রেরণ করিলেন। * * * * এই অধ্যাত্মবিদ্যা পূর্ব্বে রাজাদিগকে উপদিষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই রাজগণ হইতেই লোকে প্রচারিত হইয়াছিল; সেই জন্য ইহার নাম রাজবিদ্যা। এই উত্তম গুহ্যতম, অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজগণ পরম দুঃখের সীমা অতিক্রম করেন।"

এই বিবরণই সঙ্গত মনে হয়। ইহার সহিত গীতোক্ত বিবরণের ও উপনিষদের বিবরণের সহিত সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে প্রবাহিত রহস্যবিদ্যা কর্ম্মকাণ্ডরত কর্ম্মকাণ্ড বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অপরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। এ বিদ্যালাভের জন্য তাঁহারা রাজর্ষিদিগের সমীপস্থ হইবেন, এবং সমিৎ-হস্তে শিষ্যভাবে তাঁহাদের নিকট বিদ্যা যাচ্ঞা করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা।"

"নীচ হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।" এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যে উপনিষদ্-যুগে উচ্চ রাজর্ষিদিগের নিকট হইতে সর্ব্বোত্তম বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত, এবং এই সঙ্গত ব্যাপারের মীমাংসা করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ এ সম্বন্ধে যে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন, তাহার অনুমোদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অগ্নিহোত্রী।

যুগ-যুগান্তের পরে ভারতের এ অগ্নি-শরণে,
মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লয়ে হে তরুণ অগ্নিহোত্রিগণ!
উড়াইয়া ভস্মভার যেই বহ্নি করেছ চয়ন,
চির-সঙ্গী করি' তারে রাখ—রাখ জীবনে মরণে!
ঋষিদের বেদমন্ত্রে অতি উগ্র তপস্যার বলে,
তপোবন-তরুচ্ছায়ে যেই বহ্নি লভিল প্রকাশ,
তার অকম্পিত শিখা—বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল উদ্ভাস
সত্যের কৌস্তুভ-প্রভা ফুটাইল কর্ম্মযজ্ঞস্থলে!
অই বহ্নি—অই শিখা তোমাদেরো দেখাইবে পথ,
জীবনমন্থন করি' তোমরাও লভিবে অমৃত!
আজি যারা দীন-হীন, ম্লান মৌন হেয় অনাদৃত,—
হ'বে তারা গরীয়ান্ কর্ম্মে ধর্ম্মে উন্নত মহৎ।
বিপুল সাধনাক্ষেত্র—অবিচ্ছিন্ন নিরবধি কাল,
তপস্যায় চির-সিদ্ধি—ঘুচে যায় মোহ-ইন্দ্রজাল!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

দ্রবিড়।

২

দক্ষিণাপথে পুরুষের বেশ একই প্রকারের। ললনাকুলে তাহার বিপরীত। ইহাতে প্রাদেশিকতা ও বর্ণভেদতত্ত্ব নিহিত। মরাঠা ও কণাড় নারীর পরিচ্ছেদ একরূপ। উভয়েই কচ্ছসংযুক্ত বস্ত্র পরিধান করে। নথের ব্যবহার নাই; তাহার পরিবর্ত্তে নাসালম্বনরূপে একটি মুক্তা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর মরকত-বিজড়িত কর্ণিকা বা উজ্জ্বল হীরক-অলঙ্কার কর্ণশোভা বিধান করে। স্বুবর্ণ গ্রৈবেয়ক ও কাঞ্চী উল্লেখযোগ্য। (১) তৈলঙ্গ-স্ত্রী কচ্ছ বিস্তৃত করিয়া দেন। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণী সম্মুখের লম্বমান কুঞ্চিত বস্ত্রদাম বামভাগে আলম্বিত করিয়া অদৃশ্য করিয়া বেষ্টন দেন। বস্ত্রাঞ্চল কঞ্চুকপটের উপর দুলিতে থাকে। কেশ পৃষ্ঠোপরি বেণীর আকারে বা বিজড়িত অবস্থায় নিম্নমুখে অবস্থিত। দ্রাবিড় শূদ্রার কেশবন্ধনপ্রণালী সাঁওতাল-অঙ্গনার মত পশ্চাৎ দিকে এক গুচ্ছ অপরটির বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া মধ্যে গ্রন্থি দ্বারা নিষ্কাশিত করিয়া দিতে হয়। কর্ণভূষা কদর্য্য; ছিদ্রবৃদ্ধি করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য। সধবা হস্ত নিরাভরণ করা অন্যায় বিবেচনা করেন না। সম্মুখের কুঞ্চিত বস্ত্র দক্ষিণে নিক্ষেপ করিয়া, কিয়ৎভাগ কটীপার্শ্বে বহির্গত রাখিতে হয়। তাহাদের কচ্ছদান নিষিদ্ধ। (২) খৃষ্টান্ মহিলাগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করায় অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তিন্নাভেলিতে গৃহদাহ, দেব-ধ্বংস প্রভৃতি বহু অনর্থপাত হইয়া গিয়াছে। মস্তক পর্য্যন্ত গাত্রে শ্বেতবর্ণ দ্বিতীয় বেষ্টনবস্ত্র-প্রদান মুসলমানীদের প্রথা। (৩)

মধুরা ও মদুরা, ইহার কোনটি প্রকৃত বা সংস্কৃত, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। এই প্রকারে রামনাথকে রামনাদ বলা হয়। তামিল বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা ২৭; তন্মধ্যে স্বর ১২, ব্যঞ্জন ১৫; স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয় না। ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। অনেকগুলি অক্ষরকে

(১) তাঞ্জোরে উৎকৃষ্ট মেখলা প্রস্তুত হয়। তৈলঙ্গের পাদকটকের সহিত বঙ্গীয় বাঁক-মলের সাদৃশ্য আছে। পাদাভরণ কিঙ্কিণী সমসূত্রে আবদ্ধ।

(২) ত্রিকচ্ছ হইতে পারে না।

(৩) দক্ষিণা হিন্দুমহিলা আমাদের নারীদের মত শিরোবস্ত্র আকর্ষণ করিয়া পুরুষকে সম্মান জ্ঞাপন করেন না।

মাত্রাহীন করিলে, ব্রাহ্মী বর্ণের সাদৃশ্য মিলে। ইহাতে জ্ঞান হয়, তামিল ভাষার ন্যায় তাহার স্বতন্ত্র অক্ষর ছিল না। দ্রাবিড় বর্ণে কতকগুলি সমান্তরাল কোণ দেখিয়া চেনা যায়। মলিয়ালী বর্ণ তদ্রূপ, দেখিয়াছি। মৌর্য্য বর্ণলিপি হইতে ভারতের তাবৎ অক্ষর এক ব্রাহ্মী শ্রেণীভুক্ত। কেবল অশোকের গান্ধার অক্ষর খরোষ্ঠী। তাহা দক্ষিণ হইতে বামমুখী। সেমেটিক আরব্য বিপর্য্যস্ত লিপি সহ উহা তুলনীয় নহে। আর্য্যবংশীয় পহ্লবী নামক প্রাচীন পারস্য অক্ষরের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য গ্রন্থ-অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রীদের উচ্চারণ এমনই বিশদ যে, হ্রস্ব দীর্ঘ স-কার ব-কারের প্রভেদ শ্রবণমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হয়। লিখিবার কালে আমাদের মত বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতে পারে না। আবৃত্তিকালে যেখানে অক্ষর-অনুমান বা পদাংশ-যোজনা করিতে বিলম্ব হয়, সেখানে এক প্রকার কম্পিত সুর ব্যবহার করিয়া সময় পূর্ত্তি করিয়া লন। দেশজ ভাষার সহিত কোনও সংস্রব না থাকায় গ্রন্থ অক্ষরের উচ্চারণ বিকার-গ্রস্ত নহে।

ব্রাহ্মণগণ তামিল ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিলাইয়া থাকেন। ইহাতে প্রাচীন ভাষা রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। আদি দ্রাবিড়-সাহিত্য, জৈন-গ্রন্থপ্রধান। পরিয়া-জাতীয় ভাই ভগিনীর রচিত কবিতা সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে।

বিশুদ্ধ তামিল শব্দ দেখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্-গণ স্থির করিয়াছেন, আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে দ্রাবিড় জাতি অসভ্য ছিল না। রাজা ও গায়ক ছিল। তাহারা দুর্ভেদ্য গৃহে বাস করিত। নৌকা, ঔষধ, অঙ্ক ও ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার হইত। তাহারা কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ, কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন, ও মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার জ্ঞান রাখিত। যুদ্ধে ধনুর্ব্বাণ, অসি ও পরশু ব্যবহৃত হইত। তাহাদের গ্রাম, উদ্যান ও নগর থাকার প্রমাণ আছে। দেবতা "কো"-পদবাচ্য। তাঁহার সম্মানার্থ "ইল" অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্য কর্ণাট্টকে "কোইল" কহে। "আমি প্রয়াগে যাইতেছি," এই বাক্য দ্রাবিড় ভাষায় "নান প্রয়াগকু পোগিরেন", কর্ণাটীতে "নানু প্রয়াগিগে হোগাতেনে", এবং তৈলঙ্গী কথায়, "নেনু প্রয়াগুকু. পোণ্টানু" এই পৈশাচিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রয়াগ শব্দে যে "কু" বিভক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হিন্দী "কো" ভিন্ন আর কিছু নহে। আর্য্য উপনিবেশীদের

প্রাকৃত ও আধুনিক হিন্দীর মূল এক; তজ্জন্ত এমন হইয়াছে। স্থানাদির নাম সংস্কৃত হইলে ঔপনিবেশিক "ম" বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। "ইগে" বিভক্তিটি কর্ণাটী। বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীতে বিভক্তি নাই,—যেন শিশুর ভাষা। তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, "পোণ্টামু" স্থলে "পোতানু", এবং বক্তা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ হইলে "গোগিরেন" না বলিয়া "পোরে" উক্তি করিবেন। ইহার কারণ আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই, এই জন্য অদ্ভুত জ্ঞান করি। "আমি" শব্দ তিন ভাষাতেই প্রায় একবিধ,—"নান", "নানু", কিংবা "নেনু"। ক্রিয়াপদ "পোগিরেন," কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে "পোণ্টামু" হইয়াছে। "হোগাতনে" রূপের ধাতু স্বতন্ত্র।

পরিয়া (পরইআন) জাতি সামাজিক সম্মানে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইংরাজ আধিপত্যের উৎপত্তিকালে তাহারা, যাহাকে সমাজের দক্ষিণহস্ত বলে, সেই, সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ ইহাতে নিরপেক্ষ ছিলেন। পরইআনগণ কহে,—তাহারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সংখ্যাতেও অধিক। চর্ম্মকার প্রভৃতি পঞ্চ শিল্পী ও অন্ত্যজগণ বামহস্ত বলিয়া কথিত। স্বদেশীয় কর্ত্তৃক শাসিত জনপদে,—থিরুবাঙ্কোড় ও মহীশূরে নায়ার ও ব্রাহ্মণ পথে বহির্গত হইলে, পরিয়া ভ্রমণ করিতে সক্ষম নহে। যদি ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, বা স্পর্শ হয়, রীতিমত নিগ্রহ পায়; যেন আফ্রিকায় ভারতবাসী। আমরা অন্ত্যজ স্পর্শ করিলে অপবিত্র হই, এখানে দর্শনমাত্র অশৌচ ঘটে। পরইআর অর্থে পার্ব্বত্য। উহারা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত। অপর শ্রেণীকে আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, এবং উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেও ইচ্ছুক নহে। বস্ত্রবয়ন, শূদ্র, কৃষক ও ইউরোপীয় জনের দাস্যবৃত্তি ভিন্ন তাহার জীবিকার উপায়ান্তর নাই। পরশুরামের মাতৃমুণ্ড ও চণ্ডিকা ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা পার্ব্বতীকে স্বজাতীয়া মনে করে। দেবীর উৎসবকালে জনৈক পরিয়া পুরুষের সহিত তাঁহার বৈবাহিক তালিসূত্র বন্ধন হয়। এই জাতিতে বিস্তর শৈব বৈষ্ণব কবি ও সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বজাতি দ্বারা দেশীয় ভাষায় যাজনক্রিয়া হইয়া থাকে। পুরোহিত জাতীয় বিবাদের মীমাংসক। তিনি অর্থদণ্ড করিতে পারেন। জাতিচ্যুত করেন না।

অন্যান্য দ্রাবিড় জাতির ন্যায়, পরিয়াগণের, মস্তক ঈষৎ চেপ্টা, নাসিকা অনুচ্চ ও প্রশস্ত, মুখকোণ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, ওষ্ঠাধর স্থূল, মুখমণ্ডল

প্রশস্ত ও মাংসল, মুখশ্রী কদর্য্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ়, শরীর স্থূল, বর্ণ শ্যামল হইতে ঘোরকৃষ্ণ হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার আমিষ তাহাদের ভক্ষ্য, তথাপি ইহারা সমাজের দক্ষিণহস্তমধ্যে গণ্য। এই দক্ষিণ শ্রেণীতে বৈশ্য বর্ণের কমাটি ও লদারু মুসলমান অন্তর্ভুক্ত আছেন। সম্মান করিবার ব্যক্তি না থাকিলে স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইতে পারা যায় না। সমাজের বামহস্ত বিভাগে চর্ম্মকারের কর্ত্তৃত্ব প্রবল। এই সকল প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

আদিম নিবাসী হওয়া হেয় নহে। মনস্বী কোচবিহারের রাজা জন-সংখ্যাগ্রহণকালে স্বহস্তে আপনাকে অনার্য্য লিখিয়া দেন। ব্রাহ্মণ-শাসনে এই প্রাচীনত্ব অমর্য্যাদার কারণ হইয়াছে। আর্য্যসমাজে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন রহিত হইলে. আদিম নিবাসীদের কন্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। সমবেদনা হীন হইয়া গেল। তদবধি উহাদের শুভশংসা লুপ্ত হইয়াছে।

রামেশ্বর দ্বীপ।

বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, পুরুষোত্তম হইয়া অবশেষে চারি ধাম সম্পূর্ণ করি-বার জন্য এখানে আসিতে হয়। আমরা "টপাল" অর্থাৎ ত্বরিত অশ্ব-যানে আরোহণ করিয়া রামনাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। পথে, কাশীর দেবদর্শনার্থ যাত্রাগতপ্রাণ বঙ্গীয় বিধবাগণ পদব্রজে চলিয়াছেন, দেখিতে পাইলাম। মধ্যে এক পান্থনিবাসে থাকিতে হয়। তথায় এক ভৈরবীর সহিত আলাপ হইল। রুদ্রাক্ষবিক্রেতাও আসিয়াছে। এই স্থান সেতুপতির অধিকারভুক্ত। তাঁহার সিংহাসন তথাকথিত বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত একখানি কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর স্থাপিত। রাজা সেই বানর-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দেন। শিবগঙ্গা ও রামনাথে সেতু-পতির বৃষভলাঞ্ছিত মুদ্রা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। সৈকত-প্রান্তর হইতে সুদূরে এক বৃহৎ মণ্ডপে রাক্ষসবৎ প্রকাণ্ড শ্যামল মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে কেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মধুর রামকথা স্মরণে আসিতে লাগিল।

আমাদিগকে পম্বন প্রণালী নৌকায় পার হইতে হইবে। বাল্মীকি এ স্থলে কহিয়াছেন ;—

> আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
> নিষেদুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে কথং কার্য্যমিতি ব্রুবণ্॥

এই বিবরণে ঐতিহাসিকতা থাকিলে, রামচন্দ্রের অনুচরগণ বানরবৎ

দ্রাবিড়দিগকে আর্য্যীকৃত করিয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, বুঝিতে হয়। আমরা সমুদ্রে ভাসিলাম। সেতু কল্পনার সামগ্রী নহে। রসাতল হইতে উত্থিত জলমগ্ন শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হইল। চত্বারিংশ বৎসর পূর্ব্বে পম্বন দ্বীপ হইতে পরপারস্থ মণ্ডপে রামেশ্বরের সচল মূর্ত্তি সেতুর উপর দিয়া স্থলপথে উৎসব উপলক্ষে যাতায়ত করিতেন। বাষ্পীয় পোতের গতিবিধির জন্য, ইংরাজস্থপতি সেই পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন। সময়ে বালুকা নিষ্কাশিত করিবার প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর মৌশুমী বায়ুর সাহায্যে মুসলমান নাবিক এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ তরণী কলিকাতায় লইয়া গিয়া থাকে,—জগন্নাথের ঘাটে অবস্থিতি করে। কূলে অবতীর্ণ হইয়া পার হওয়া সহজ মনে করিলাম। "সংসারমিব নির্ম্মমঃ" কহিতে হইবে। করপত্রবৎ নাগদ্বীপের ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভাব। দক্ষিণে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। তরঙ্গমালা ধীরে ধীরে যাইয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। শঙ্খ-শম্বুকাদি বিচিত্রবর্ণ প্রাণী তীর বহিয়া উঠিতেছে; বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিমে সে ভাব নহে। ভয়ানক কাণ্ড। সমুদ্রোর্ম্মি উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিতেছে। নানা প্রকারের মৎস্য মকরাদি ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছে। উড্ডীয়মান মৎস্য পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক লম্ফ দিয়া উঠিয়া পুনরপি জলে মগ্ন হইতেছে। দ্বীপমধ্যে নারিকেলকুঞ্জে মৎস্যজীবিগণের বাস। তাহার পর আদম সেতু, মান্নার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে লঙ্কার পরিখাস্বরূপ মহার্ণব বিক্ষিপ্ত। এই দিক্ যেমন বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ, তেমন আর কোনও ভাগ নহে। পক্ষীর কলরবে তাহা মুখরিত হইতেছে। তুত্তিকুড়ির সম্মুখে, খ্রীষ্টান্ জালজীবিগণ মুক্তা আহরণের জন্য শুক্তি সংগ্রহ করে। "ঐ যে শৈলখণ্ডটি সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে, উহার গাত্রে, নারিকেল-শস্যের ন্যায় একপ্রকার শুভ্র পদার্থ লক্ষিত হইবে। এগুলিও প্রাণী। ইহারা গতিশক্তিবিহীন। যেমন অম্বুরাশি উহার উপর দিয়া গেল, অমনি মুখব্যাদান করিয়া কীট উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর যাবতীয় জীব ইহার পরিণতি হইতে সমুৎপন্ন।" জাল ফেলিলে তাহাতে আটার মত এই জীব, কপর্দ্দক, কর্ক্কটী ও নানাপ্রকারের স্বচ্ছ জীব তুলিতে পারা যায়। আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে মহোদধিতীরে স্পঞ্জ-জাতীয় বিবিধ জীবের কোষ আহরণ করিয়া মহা আমোদ বোধ করিলাম। শ্বেত প্রবালকীট কি সুন্দর! গৃহশোভার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। স্বভাবের স্বহস্তনির্ম্মিত প্রস্তরক্ষোদিতবৎ কারু-

কার্য্য, এমন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে। ছত্রাকার পুষ্পের মধ্যে পত্র-বিতানতলে শিরাসহযোগে স্তরক্রমে কত অংশপরম্পরা রচিত হইয়াছে। প্রবাল বালুকাযুক্ত হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত করে। বেলাভূমিতে আলোকস্তম্ভের দিকে অগ্রসর হইয়া, বহুদূরব্যাপী স্থানে তাহার ভগ্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। বাষ্পীয় পোতের গতিবিধি নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য এখানে এক জন দ্রাবিড়জাতীয় তরিক বাস করেন। তাঁহার নাম নাগ-লিঙ্গম্। তিনি আপনাকে রাবণবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। আমাদের হস্তে লঙ্কাপতি হেয়ভাবে বিত্রিত হওয়াতে তিনি দুঃখিত। বানর ও রাক্ষস, উভয়েই আদিম ভারতবাসী। লঙ্কাবতার সূত্রে রাবণ প্রতাপশালী বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া বর্ণিত।

রত্নাকরের তরণস্থান হইতে যোজনান্তে দেবালয়। কয়েক ধনু অগ্রসর হইলে, উপাধ্যায় আমাকে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। রামেশ্বরের দ্বারের দুই পার্শ্বে সিংহলের রাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত দ্বিরদ-দন্ত উত্তানভাবে রক্ষিত। কদলী, নারিকেল ও দাড়িম্বে গ্রথিত চন্দ্র-মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পে গৃহ সজ্জিত। ফুলের বেশে হিরণ্যগর্ভ মহাদেব আচ্ছন্ন আছেন। মৌলিতে হিরণ্য শেষ কয়েকটি ফণা বিস্তার করিতেছে। তিন প্রস্থ দেবমূর্ত্তির এক সচল বিগ্রহ নিশীথে পার্ব্বতীর গৃহে গমন করেন। মন্দিরগাত্রে ধনুর্দ্ধারী রাম, সীতা, সত্য ও কলিযুগের মূর্ত্তি। কলি স্ত্রীকে স্বীয় স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া মাতাকে তাড়না করিতেছে।

শ্রীরঙ্গম্।

ত্রিশিরাপল্লীতে রেল হইতে অবতরণ করিয়া আমরা এই বদ্বীপে উপনীত হই। আদৌ যাহা বক্তব্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যের ভাষায় তাহা কীর্ত্তন করিব,—

"সপ্তপ্রাকারমধ্যে সরসিজমুকুলোদ্ভাসমানে বিমানে
কাবের্য্যোর্মধ্যদেশে মৃদুতলফণিরাট্‌শেষপর্য্যঙ্কভাগে।
নিদ্রামুদ্রাভিরামং কটিনিকটশিরঃ পার্শ্ববিন্যস্তহস্তং,
পদ্মাধাত্রীকরাভ্যাং পরিচিতচরণৌ রঙ্গনাথং ভজামি।"

কথিত আছে,—সপ্তম শতাব্দীতে, চোলরাজ কর্ত্তৃক দেবায়তন নির্ম্মিত হয়। বিজয় রঙ্গনায়ক তাহা বর্দ্ধিত করিয়া লেন। ফরাসীগণ বৃটিশ-বাহিনীর ভয়ে এক সময় দুর্গরূপে ব্যবহার করিবার জন্য আরও প্রাকার বাড়াইয়া যান। তিন প্রাকারের মধ্যে গ্রাম। চতুর্থে দেবস্থান।

বৈকুণ্ঠ উৎসব উপস্থিত দেখিয়া, আমি চিত্রিত-ললাট, কোলাহলমগ্ন, আচার্য্যমণ্ডলী ভেদ করিয়া উচ্চ মণ্ডপতলে গমন করিলাম। বিচরণশীল মূর্ত্তির আরতি হইতেছে। রৌপ্য-ঘটের উপর বৃহৎ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত। দেব-অঙ্গে মুক্তাবলীর মধ্যে হীরক-দোলক, যেন কৌস্তভের মত ভাস্বর। ইহা অনেক দিন মনে থকিবে। অদ্যতন রাত্রের কার্য্য শেষ হইলে এক জন দীর্ঘশিরস্ত্রাণ ধারী ও অঙ্গরক্ষাবৃত প্রতিহারী জনতা ভঙ্গ করিয়া দিল। নারায়ণ শয়নকক্ষে গমন করিলেন। আমরা প্রতিবেশীর মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঘৃতপক্ক কলায়ের ডাইলের লবণাক্ত লুচির মত আকৃতি বড়া ও মালপুয়া সেবা দিয়া নিশা পোহাইলাম। আচারিগণের মৃদঙ্গ-করতালি-সংযুক্ত গীতধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় যুবরাজের প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত গোপুরের পুত্তলিকাগুলির মুখে ভাব আছে, যেন শোণিত শিরার কিঞ্চিৎ আভাস মিলে। স্থানবিশেষে উজ্জ্বলবর্ণসংযোগে আরও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। মারুতিকে, পুষ্পসজ্জা দিয়া, সম্মুখে ফুলের চন্দ্রাতপ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মিষ্ট ভাত, খেচরান্ন ও মোহনভোগের গোলক বিক্রীত হইতেছে। তাহার এক পার্শ্বে ঘোল খাইবার সামগ্রী আছে।

অর্জ্জুনমণ্ডপ কদলীবৃক্ষ ও সহকারপল্লবে শোভিত হইয়াছে। রামানুজ ও পরবর্ত্তী গুরুগণের ধাতুময় সালঙ্কৃত বিগ্রহ সিংহাসনে বসাইয়া আচারিগণ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া দিলেন। উৎসব দ্বাবিংশতি দিন স্থায়ী হইবে। যাত্রীদের জন্য সোলার সাজ দিয়া অষ্টচ্ছদী আবাস নির্ম্মিত হইতেছে। জনপদের অন্য ভাগে জম্বুকেশ্বর শিব দর্শন করিয়া আসিলাম। ইহা পঞ্চমূর্ত্তির অন্যতর অপ্-মূর্ত্তি। মন্দিরের মধ্যে কোনও আকার নাই। একটি উৎস হইতে জল নির্গত হইতেছে।

বৈচিত্র্যে কে না আকৃষ্ট হয়? পাণ্ডিত্যের সহিত যে কোনও মত প্রচার করিতে পারিলে, তাহার অনুবর্ত্তী সংগ্রহ করা দুরূহ হয় না। প্রতিবাদ দ্বারা, উহাতে যে সার আছে, এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রামানুজ আচার্য্য, মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের মত, কৃমীকান্ত চোলের ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অখিল ভারতে শ্রীসম্প্রদায় স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গলপট প্রদেশে পরম্বদুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বিদ্বান্ কেশব ত্রিপাঠীর পুত্র প্রতিভাবান্ রামানুজ বাল্যজীবন এই শ্রীরঙ্গে অতি-

ষাহিত করিয়াছিলেন। তখনই তিনি বিষ্ণুপ্রেমে আত্মহারা হইলেন। বিবিধ-রঙ্গাবতারক নারায়ণ দক্ষিণে রঙ্গনাথ হইয়াছেন। আচার্য্য সেই রঙ্গে বৌদ্ধ জৈন অনেককে মুগ্ধ করিলেন। কত তীর্থঙ্কর ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষ্যের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে যতিরাজ এখানেই দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার ৭০ জন গৃহস্থ শিষ্য পীঠাধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারা বড়গল ও পিঙ্গল শাখায় বিভক্ত হইয়া উপদেশ বিতরণ করিতেছেন। দুই দলের বৈরিতার জন্য একটি বিগ্রহ অপহৃত হয়! তজ্জন্য দণ্ডশক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

পিঙ্গল সম্প্রদায়ের গুরুপাট কেরল ও দ্রাবিড়ের মধ্যসীমায় তোতাদ্রি নামক স্থানে অবস্থিত। প্রধান আচার্য্য এক জন যতি। তিনি শ্বেত-বহির্বাস-পরিহিত দণ্ডী। ইঁহাদের দুই বা তিন দণ্ড একত্র বদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। দেবতার কফি ফলের ক্ষেত্র লাভজনক। ভক্তগণ মনস্কামনা পূর্ণ হইলে, নারায়ণকে দ্রোণপরিমিত তৈল দ্বারা স্নান করাইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ-প্রশমনের জন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী রামাৎ এই মঠের শিষ্য। চৈতন্য রামানুজ-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও, বাঙ্গালী বৈষ্ণবকে এখানকার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে দেখা যায় না।

এই বংশজাত নড়াদু রঙ্গাচার্য্যের সহিত আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি শতাবধানী। এককালে অনেক কার্য্যে মন দিতে পারেন; অথচ কবি। ক্রীড়া, গণনা, গল্প, এক সঙ্গে হইতেছে। এমন সময় কেহ কহিল,—গৃহে অগ্নিদাহ উপস্থিত; তথাপি অবধানী উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন না। আমি একত্র বিভিন্ন ভাবের শ্লোকের পাঁচটি অংশ দিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ভাগে এক এক বিচ্ছিন্ন চরণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যোগ করিয়া দেখিলাম, চমৎকার সদর্থপূর্ণ চ্যুতসংস্কৃতবিহীন কবিতাপঞ্চক প্রস্তুত হইয়াছে!

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

বিদেশী গল্প।

অকৃতজ্ঞতা।

টিকট্ জুতার কারখানায় কাজ করিত। দুনিয়ায় তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না। ফরাসী দেশের ক্যালভাডো নগর তাহার জন্মস্থান। সে

দীর্ঘাকার, দৃঢ়কায়, গৌরবর্ণ পুরুষ। সুন্দর গুম্ফরাজি তাহার কমনীয় মুখমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। টি্কটের প্রকৃতি শান্ত ও নম্র। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় সে সকল কার্য্য নিরূপিত সময়ে সম্পাদন করিত। মিতাচারিতার জন্য তাহার সুনাম ছিল। কারখানায় কাজ করিয়া সে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিত। টি্কট্ প্রত্যহ কার্য্যালয় হইতে গৃহে ফিরিত, তার পর প্রণয়িনী জুলির কর্ম্মস্থলে বেড়াইতে যাইত। আর কোথাও সে বড় একটা যাইত না। জুলির সহিত প্রেম জন্মিলেও উভয়ের বিবাহে কিছু বিলম্ব ছিল। প্রণয়িনীর কয়েকটি ছোট ছোট ভ্রাতা ও ভগিনী ছিল, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া না তুলিয়া জুলি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয় নাই।

নির্দ্দিষ্ট কাল সামরিক বিভাগে কাজ করিবার পর টি্কট্ জুতার কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিল। বাসভবন, জুতার কারখানা ও জুলির কার্য্যালয় একই রাজপথের উপর অবস্থিত। টি্কটও সেই পথটুকু ছাড়া আর কোথাও বেড়াইত না। ক্ষৌরকারের গৃহ ও তামাকের দোকান প্রভৃতি তাহারই সন্নিহিত, সুতরাং তাহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজনও ছিল না।

এই নির্দ্দিষ্ট পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে বেড়াইয়া সে সন্তুষ্ট থাকিত। কখনও সে জন্য সে এতটুকু স্ফূর্ত্তির অভাব বোধ করিত না। স্বল্পভাষী হইলেও টি্কটের সহিত অন্যের অতি শীঘ্র বন্ধুত্ব জন্মিত। পরিচিত কোনও ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে সে পরম বন্ধুভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিত। অপরিচিতের সহিতও সে সর্ব্বদা মিত্রবৎ ব্যবহার করিত।

কেহ তাহাকে কখনও কোনরূপ নেশা করিতে দেখে নাই। টি্কটের হৃদয় গভীর, প্রেমময় ও বন্ধুবৎসল। রাত্রিকালে আহারান্তে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতে করিতে সে প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে সে দিনের 'বাইক' ক্রীড়ার ফলাফল জানিয়া লইত। তার পর নিয়মিত সময়ে শয়ন করিত। সে 'বাইক্' ক্রীড়ার বড়ই পক্ষপাতী ছিল।

খেলার সময় বালকেরা তাহাকে মধ্যস্থ মানিত। সেও সাগ্রহে কার্য্যভার গ্রহণ করিত।

"মসিয়ে টি্কট্, দেখুন ত, আমাকে ও ফাঁকি দিতেছে।"

"ঠিক বটে! ওহে ছোকরা, আমি দেখিয়া ফেলিয়াছি। এ তোমার বড় অন্যায়।"

কোন প্রতিবেশিনী বাম হস্তে শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অপর হস্তে

ঝোড়া-বোঝাই কয়লা, সুরার বোতল, দুগ্ধপাত্র, রুটী ও শাক-সব্‌জীর থলে লইয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাইলে, ট্রিকট্‌ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সাহায্যে উদ্যত হইত।

"আমি রুটী ও মদের বোতলটা লইয়া যাইতেছি। কিন্তু যদি ভ্রমক্রমে অপর কাহারও ঘরে গিয়া পড়ি, তখন আমার অপরাধ লইও না।"

এমন প্রায়ই ঘটিত।

মধ্যে মধ্যে প্রতিবেশীরা তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু টাকাও ধার লইত। সেই বাড়ীর পঞ্চম তলে মিকন্‌-পরিবারের বাস। তাহারা সর্ব্বদাই ট্রিকটের নিকট টাকা ধার করিত। সে বিষয়ে তাহাদের আদৌ চক্ষুলর্জ্জা ছিল না।

মিকন্‌ এক জন শ্রমজীবী। দৈনিক সে দুই টাকা উপার্জ্জন করিত। স্থানীয় নাট্যশালায় রাত্রিতে অভিনয় করিয়া সে আরও অতিরিক্ত বারো আনা করিয়া প্রত্যহ পাইত। শ্বাসযন্ত্রের আকস্মিক স্ফীতিবশতঃ মিকন্‌ এক দিন পীড়িত হইয়া পড়িল। সময়ে ট্রিকটের সাহায্য না পাইলে পাঁচটি অপগণ্ড সন্তান সহ দরিদ্র মিকন্‌-দম্পতীকে অনাহারে মারা যাইতে হইত। পীড়ার সময় মিকনের উপার্জ্জন বন্ধ হইল। থিয়েটারের চাকরীটিও বুঝি আর থাকে না। কর্ত্তৃপক্ষ অন্য অভিনেতার সন্ধান করিতেছিলেন।

ট্রিকট্‌ এই দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিল।

"কোনও চিন্তা নাই ভাই, তোমার পরিবর্ত্তে থিয়েটারে আমি অভিনয় করিব। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি এখনই যাইতেছি। যদি তাঁহারা আমাকে মনোনীত করেন, তোমার চাকরী বজায় থাকিবে। অবশ্য, প্রতি রজনীতে অভিনয় করিয়া যে বেতন পাইব, তোমাদিগকেই আনিয়া দিব। কোনও চিন্তা করিও না।"

রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ট্রিকটের আবেদনে সম্মত হইলেন। সে দীর্ঘাকার ও সুপুরুষ। নূতন একখানি সামরিক গীতিনাট্য অভিনীত হইবে। প্রুসিয়ান্‌ সৈনিকের বেশে তাহাকে চমৎকার মানাইবে।

দীর্ঘকাল মিকন্‌ রোগশয্যায় পড়িয়া রহিল। গীতিনাট্যখানিও বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হইতে লাগিল। ট্রিকট উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ প্রুসিয়ান্‌ সৈনিকের ভূমিকা অভিনয় করিল।

প্রতি রজনীতে সে অভিনয়লব্ধ অর্থ আনিয়া এই নিঃসহায় দরিদ্র

পরিবারের সাহায্যকল্পে মিকনের হস্তে অর্পণ করিত। মিকনের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান ক্ষুদ্র লোলোকে ট্রিকট্ অত্যন্ত স্নেহ করিত। তাহার দুগ্ধ প্রভৃতি বাবদ সে আরও কিছু টাকা মিকন্‌কে দিত। লোলোর বয়ঃক্রম তখন দুই বৎসর। বালকের আনন পাণ্ডুর, গ্রীবা দীর্ঘ, নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি আগ্রহব্যঞ্জক। ট্রিকট্ বালকটিকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

প্রুসিয়ান্ সৈনিকের ভূমিকা অভিনয়ে ট্রিকটের বেশ নাম বাহির হইল। পল্লীর সকলেই তাহার অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ হইল। লোকের মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না।

এক দিন সে ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় কারখানার কোনও কারিগর সকৌতুকে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই যে প্রুসিয়ান্, তুমি এসেছ? এস, আমার পাশে ব'স, ভাই!"

ভোজনাগারের ভৃত্যটি নূতন। সে অল্প দিন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে ট্রিকটের নাম জানিত না। প্রুসিয়ান্ বলিয়া সে মনে মনে তাহাকে চিনিয়া রাখিল। পরদিন আহারসময়ে ভৃত্যটি সেই শ্রমজীবীকে জানাইল যে, প্রুসিয়ান্‌টি আজ অনেকক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল।

সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই ট্রিকটের এই নবাবিষ্কৃত নকল নামকরণে বড়ই কৌতুক অনুভব করিল। কারখানার অন্যান্য কারিগরেরাও ট্রিকটকে এই নূতন উপাধি লাভ করিতে শুনিয়া অত্যন্ত আমোদিত হইল। ক্রমে ক্ষৌরকারভবনে, তামাকের দোকানে, প্রতিবেশীদিগের নিকট এ কথা প্রচারিত হইল। লোকের মুখে মুখে "প্রুসিয়ান্" নামটি ফিরিতে লাগিল।

"নমস্কার, মসিয়ে প্রুসিয়ান্!"

"ভদ্র মহোদয়গণ, আসুন, আজ আপনাদের সহিত আমাদের প্রুসিয়ান্ বন্ধুটির পরিচয় করাইয়া দিচ্ছি।"

* * * * *

মিকন্ রোগমুক্ত হইয়া রঙ্গালয়ের চাকরী ফিরিয়া পাইল। ট্রিকট অবশ্য তখন আর প্রুসিয়ান্ সৈনিকের ভূমিকা অভিনয় করিত না। কিন্তু তাহার নূতন নকল নামটি আর গেল না। প্রত্যহ ঐ নামে অভিহিত হওয়ায় উহার মৌলিক হাস্যরসটুকু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। কোনও নামের প্রকৃত অর্থ যখন লুপ্ত হয়, তখন শুধু নামটিই থাকিয়া যায়। লোকে তখন সেই নামেই ডাকে।

টি্রকট্‌কে এখন সকলে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই "প্রুসিয়ান্" বলিয়া ডাকিত। সেও বিচার-বিতর্ক না করিয়া উত্তর দিত। কিছু কাল পরে পল্লীতে বহু নূতন ভাড়াটিয়ার আমদানী হইল। তাহারা কেহই টি্রকটের আসল নাম জানিত ন। যাহারা জানিত, তাহারাও ক্রমে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সে দিন রবিবার। চা-র দোকানে রাজনীতির চর্চ্চা হইতেছিল। টি্রকটের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ। যুক্তিতর্কের দ্বারা সে বিপক্ষদলের মত খণ্ডন করিতেছিল। যাহার সহিত প্রথম বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সে ইহাতে বিষম চটিয়া গেল। যে হারিয়া যায়, সেই বেশী রাগে। অন্য কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সে টি্রকট্‌কে "নোংরা প্রুসিয়ান্" বলিয়া বিদ্রূপ করিল। যাহারা এতক্ষণ কোন পক্ষেই যোগ দেয় নাই, এই নূতন বিশেষণে টি্রকটকে অভিহিত হইতে শুনিয়া তাহারা টি্রকটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। পরদিবস পুন-রায় অসমাপ্ত তর্কযুদ্ধের অবতারণা হইল। ব্যাপারটা সে দিন অনেক দূর গড়া-ইল। মন্তব্যগুলি ক্রমশঃ তীব্র ও বিষাক্তভাবে টি্রকটের প্রতি প্রযুক্ত হইল।

ঘটনার পর দিবস ভোজনাগারে প্রবেশ করিবার সময় টি্রকট্ শুনিতে পাইল, কেহ কেহ বলিতেছে, "জ্বালাইল দেখিতেছি! আবার নোংরা প্রুসিয়ান্‌টা হাজির!"

বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। অঙ্কুরোদ্ভিন্ন বৃক্ষ অতি দ্রুত বর্দ্ধিতায়তন হইল। এক দিন টি্রকটের প্রণয়িনী জুলির সহিত কার্য্যালয়ের অপর এক শ্রমজীবীর কোনও বিষয় লইয়া বচসা হইল। ব্যঙ্গস্বরে সে জুলিকে বলিল, "এখানে কেন? তোমার সেই নোংরা প্রুসিয়ান্ প্রেমিকের কাছে যাও।" জুলি এ কথায় অত্যন্ত অপমানিত হইল, এবং বিরক্তি বোধ করিল। টি্রকটের সহিত দেখা হইবামাত্র সে তীব্রস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কেন তোমাকে নোংরা প্রুসিয়ান্ বলে?"

পুনঃ পুনঃ অনেকের কাছে প্রণয়পাত্রের জন্য লাঞ্ছিত হইয়া জুলির মন টি্রকটের প্রতি বিমুখ হইল। সাক্ষাৎ হইলেই এই কথা উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। অবশেষে জুলির সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। বিদায়কালে রমণী তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "তুমি ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সহিত দেখা করিও না। তোমার গায় প্রুসিয়ান্‌দের মত দুর্গন্ধ!"

এই নিদারুণ উপেক্ষা ও শাণিত বিদ্রূপ-বাক্যে ট্রিকট্ মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইল। তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার গায় দুর্গন্ধ! এমন কথা জুলি তাহাকে বলিল?

ক্রমে তাহার অভ্যাসসিদ্ধ ব্যবহারেও নানা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। যে প্রসন্ন হাসিটি সর্ব্বদা তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত, দিন দিন তাহা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কাহারও সহিত সে আর বড় একটা বাক্যালাপ করিত না। অসাধারণ সহিষ্ণুতাও সে যেন ক্রমশঃ হারাইতেছিল। পল্লীবাসীরা তাহার বিষণ্ণ কাতর মলিন মুখখানি দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিত, "নোংরা প্রুসিয়ান্‌টা এখন দিনরাত মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া থাকে কেন বল ত?"

এত দিন ট্রিকটের বিশ্বাস ছিল, তাহার বন্ধুর সংখ্যা অনেক। কিন্তু সে বন্ধুবর্গের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল!

তখন সত্যই নিজের সম্বন্ধে ট্রিকটের মনে একটা অনিশ্চিত সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

মনকে প্রবোধ দিবার জন্য সে ভাবিত, "কিন্তু সত্যই ত আর আমি প্রুসিয়ান্ নহি।"

ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই মাসের শেষ তারিখে কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী ট্রিকট্‌কে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে, আর এক সপ্তাহ পরে তাহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে।

তিনি বলিলেন, "এখানে বিদেশীর স্থান হইবে না।"

ট্রিকট্ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "আমি বিদেশী নহি। ক্যালভাডো নগর আমার জন্মভূমি। সেনা-বিভাগের প্রশংসাপত্র দেখুন।"

"কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি এখানে থাকিলে অন্য কোনও কারিগর এখানে কাজ করিবে না, বলিতেছে। সুতরাং তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

বহু চেষ্টার পর, অতি কষ্টে সে আর একটি কাজের যোগাড় করিল। কিন্তু একটা চিন্তা অহর্নিশি তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিত। অনেক সময় দোকানের জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে ভাবিত, "সত্যই কি আমি দেখিতে প্রুসিয়ানদের মত?"

তাহার প্রথমা প্রণয়িনী জুলি এখন তাহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যাহার তাহার কাছে ট্রিকটের নামে নানারূপ কুৎসা রটাইয়া

বেড়াইতে লাগিল। সুন্দরী, সুনীলা জুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার সমুদয় অপরাধ ট্রিকটের স্কন্ধে অর্পিত হইল। সকলেই তাহার নিন্দা করিতে লাগিল। ট্রিকট্ যে বাড়ীতে থাকিত, তাহারই পঞ্চম তলের অধিবাসিনী কোনও যুবতী পরিচ্ছদ-বিক্রেত্রী ট্রিকটের প্রণায়নীর স্থান অধিকার করিবার আশা করিয়াছিল, কিন্তু ট্রিকট্ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করায়, ক্ষুব্ধা রমণী শেষে তাহার ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রাণপণ চেষ্টায় পল্লীর যাবতীয় রমণী ট্রিকটের প্রতি বিরূপ হইল। শিশুরাও জননীদিগের উদাহরণ অনুকরণ করিতে লাগিল।

সোপানপথে উপরে উঠিবার সময় ট্রিকটের সহিত দেখা হইলে সুন্দরীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিত, "উঃ! কি দুর্গন্ধ! আমরা কি শেষে প্রুসিয়ায় আসিয়া পড়িলাম না কি?"

কখনও কখনও ট্রিকট্ সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের হস্ত, জামার 'কফ্' আঘ্রাণ করিয়া দেখিত।

আত্মসম্মান-রক্ষাকল্পে বিদ্রূপকারীর মুখে মুষ্ট্যাঘাত করা অপেক্ষা স্থান-ত্যাগই ট্রিকট্ সঙ্গত মনে করিল। সে বাড়ীওয়ালাকে জানাইল, সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

এক রবিবারে সে একখানি ঠেলা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল। উপর তল হইতে বড় বড়, ভারী ভারী জিনিস একা নামাইয়া আনা অত্যন্ত কষ্টকর; সোপানপথও অপ্রশস্ত। নিকটে অনেকেই দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইল না। ট্রিকট্ ভাবিয়াছিল, মিকন্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু সে তাহার গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র মিকন্-পত্নী মুখ বাড়াইয়া বলিল, "আমার স্বামী বাহিরে গিয়াছে।"

ট্রিকট্ বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। বহুকষ্টে, কোনরূপে সে আস্‌বাবপত্রগুলি নীচে নামাইয়া আনিল। ছোট বড় অনেকগুলি দুষ্ট বালক তাহার চারি পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের জনক-জননীরাও স্ব স্ব গৃহের বাতায়ন-সমীপে দাঁড়াইয়া বালকদিগকে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিতেছিল। ট্রিকটের দুর্দশা দেখিয়া তাহারা হাসিতেছিল। টানাটানি করিয়া জিনিসগুলি গাড়ীর উপর তুলিবার সময় হঠাৎ একখানি ছবির কাচ ভাঙ্গিয়া গেল। অমনই রাজপথের চারি দিক হইতে উল্লাস-সূচক বিদ্রূপ হাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

টি্রকট্ সে দিকে কান দিল না। সে নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। নষ্টমতি বালকদিগের মধ্যে সে মিকনের পুত্রদিগকে দেখিতে পাইল। তখন টি্রকটের দেহে স্বেদ ঝরিতে লাগিল। গাড়ী বোঝাই হইয়াছিল। টি্রকট যথাস্থানে দাঁড়াইয়া গাড়ী ঠেলিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার পরম স্নেহ-ভাজন, মিকনের শিশুপুত্র লোলোর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। লোলো পলকহীন-নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নোংরা প্রুসিয়ান।"

অপমানে, লজ্জায়, দুঃখে টি্রকট যেন মরমে মরিয়া গেল। সহসা তাহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল। সে যেন আর চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। অবনত-মস্তকে টি্রকট ধীরে ধীরে গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। তখন সে ভাবিতেছিল, সত্যই সে "নোংরা প্রুসিয়ান্" বটে!*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

চীনদেশ ও অধিবাসী।

বিগত অক্টোবর মাসের "মডারন রিভিউ" নামক সুপরিচালিত সাময়িক পত্রে শ্রীযুত আশুতোষ রায় নামক জনৈক লেখক চীনদেশ ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক ধারাবাহিক-রূপে চীনদেশের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি তাহার সূচনামাত্র। শ্রীযুত রায় মহাশয় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিন বৎসর কাল চীন দেশে বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চীনরাজ্য সম্বন্ধে তিনি যে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সাহিত্যের পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম।

"বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে খিদিরপুর ডক্ হইতে ইংরাজ সেনাদলের সহিত জাহাজে চড়িয়া আমি চীনরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। বক্সার-বিদ্রোহ-দমনের জন্যই এই অভিযান। বিদ্রোহের বিবরণ এ স্থলে অনাবশ্যক, সংবাদপত্র-পাঠকেরা তাহার বিবরণ অবগত আছেন। টাকুবারে পঁহুছিতে আমাদের ছাব্বিশ দিন লাগিয়াছিল। সেখান হইতে

---

* লিয়ন্ ক্লাপির রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

ছোট ষ্টীমারে চড়িয়া পিহো নদ উত্তীর্ণ হইলাম। পরপারে সিন্‌হো নগর। তথা হইতে রেলযোগে চীনরাজধানী পিকিন্‌ নগরে উপনীত হইলাম। ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা পিকিন্‌কে 'নিষিদ্ধ নগরী' নামে অভিহিত করেন। নগরের চারিধারে নীলবর্ণের ইষ্টক-নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গাকার গৃহ। চীন-সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগর এইরূপ ইষ্টক-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের উচ্চতা ত্রিশ ফুট, অর্থাৎ কুড়ি হাত। দেওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান। সমুদায় প্রাচীরটা ইষ্টক-নির্ম্মিত নহে। উহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকার স্তূপ; চারি পার্শ্বে ইটের খিলান, অথবা গাঁথনি। প্রাচীরের উপরিভাগে কোথাও একটিও কামান নাই। শুধু প্রত্যেক তোরণের পার্শ্বে দুই চারিটি করিয়া কামান দেখিতে পাওয়া যায়। দেওয়ালের নিম্নভাগ অর্থাৎ ভিত্তিমূল প্রস্থে প্রায় চব্বিশ ফুট, অর্থাৎ ষোল হাত হইবে। উপরিভাগের বিস্তৃতি আট হাত। তোরণের ঊর্দ্ধদেশে দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গাকার গৃহসমূহ বিরাজিত। প্রাচীর ও তোরণের রক্ষিগণ এই সকল গৃহে বাস করে।

"প্রাচীরের উপরিভাগে, প্রতি ষাট গজ ব্যবধানে এক একটি দুর্গাকার গৃহ। প্রত্যেক তোরণের উভয়-পার্শ্বস্থ দেওয়াল প্রস্থে দ্বিগুণ হইবে। নগর-মধ্যে বসবাসহীন শূন্য-প্রান্তরের পরিমাণ ও সংখ্যা এত অধিক, তত্রত্য একতল গৃহগুলির উচ্চতা এত অল্প যে, কি করিয়া নগরমধ্যে অধিবাসী-দিগের স্থান-সঙ্কুলান হয়, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নগরের অধিকাংশ ভাগ সম্রাটের বাস-ভবন ও প্রমোদোদ্যানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাজকীয় অট্টালিকা ও ধর্ম্ম-মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। রাজপথগুলি প্রস্তরাকীর্ণ ও সুবিস্তৃত; কিন্তু সযত্ন-সংরক্ষিত নহে। পিকিনের প্রধান প্রধান রাজবর্ত্ম প্রস্থে এক শত ফুট। কিন্তু বর্ষাকালে পথগুলির দুর্দ্দশা শোচনীয়। পয়ঃপ্রণালীর একান্ত অভাব; জলনির্গমের কোনও সুবিধাই নাই। নগরের ভূমিও সর্ব্বত্র প্রায় সমতল। এ জন্য সঞ্চিত বর্ষাবারি নির্গত হইতে পারে না। নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। 'চঙ্গলু' অর্থাৎ ঘণ্টা-প্রাসাদ রাজকীয় প্রাচীরের উত্তর তোরণ ও তাতার-পল্লীর সীমান্তে অবস্থিত। এই অট্টালিকার সম্মুখভাগে 'নবদ্বারী' অধ্যক্ষের কার্য্যালয়। নগরের শান্তিরক্ষার ভার ইঁহারই উপর অর্পিত। প্রচণ্ড ঘণ্টা-ধ্বনি নগরের সর্ব্বত্রই পরিশ্রুত হয়। রাজকীয় প্রাচীরের দক্ষিণ তোরণের

সম্মুখে প্রধান বিচারালয়। তাতার-পল্লীর মধ্যস্থলে এক ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট বিশাল প্রান্তর। ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত তাতার-পল্লীর মধ্যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। পল্লীর অভ্যন্তরে তৃতীয় আর একটি প্রাচীর-বেষ্টিত পবিত্র স্থান আছে। সম্রাট্ ব্যতীত অন্য কেহ তথায় যাইতে পারে না। এই স্থানের নাম 'নিষিদ্ধ প্রাচীর'। এখানে সম্রাট্ ও তাঁহার মহিষীর ব্যবহারের জন্য নিভৃত প্রাসাদ-নিচয় বিরাজিত। প্রাসাদগুলির উত্তরাংশে প্রায় এক-ক্রোশ-ব্যাপী একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র। সম্রাটের চিত্তবিনোদনের জন্য তথায় কৃত্রিম শৈল-শ্রেণী, বনভূমি ও উদ্যান রচিত হইয়াছে। 'নিষিদ্ধ প্রাচীরে'র অন্তরালে যে সকল প্রাসাদ ও বিচারালয় প্রভৃতি রাজকীয় অট্টালিকা আছে, তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশল, ভাস্কর-শিল্প-চাতুর্য্য অতুলনীয়। সমগ্র চীন-সাম্রাজ্যে তাহার তুলনা নাই।

"নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে সূর্য্যদেবের মন্দির। মার্ত্তণ্ডদেব পূর্ব্বগগনে সমুদিত হন বলিয়া তাঁহার মন্দির পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। পশ্চিম প্রান্তে চন্দ্রদেবের মন্দির। দেশের ঋতু অর্থাৎ জলবায়ু অনুসারে চীনদেশে লোকে গৃহ নির্ম্মাণ করে। সমস্ত অট্টালিকাই দক্ষিণদ্বারী। চীনেরা উত্তর দিকে কোনও জানালা অথবা দরজা রাখে না; একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা গৃহের পূর্ব্বভাগকে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া মনে করে। চীনদেশের গৃহস্বামীর নাম 'আয়োংকিয়া'।

"অতিথিদিগের জন্য তাহারা বাটীর বাম পার্শ্ব নির্দ্দিষ্ট রাখে। কৃষিদেবী অর্থাৎ লক্ষ্মীর মন্দির নগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। মন্দিরের পরিধি প্রায় এক ক্রোশ বিস্তৃত। মন্দির-সংলগ্ন এই পবিত্র ক্ষেত্র সম্রাট্ সুবর্ণ-নির্ম্মিত হল দ্বারা প্রতি বৎসর কর্ষণ করেন। তদুপলক্ষে বলি উৎসৃষ্ট হয়। 'নবদ্বারী পল্লী'র প্রাচীর-সন্নিকটে পশ্চিম ভাগে 'ঈশ্বরের মন্দির'। মন্দির-প্রাঙ্গণের পরিধি প্রায় দেড় ক্রোশ। মন্দির-চূড়ার তিনটি স্তর। প্রত্যেক স্তর মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত। সোপানশ্রেণী অমল-ধবল প্রস্তরে রচিত। প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উপবাস-গৃহ। দেবোদ্দেশে পশুবলির দিবসত্রয়-পূর্ব্বে সম্রাট্ এইখানে অনশনব্রত পালন করেন। কৃষিলক্ষ্মীর মন্দির-সম্মুখস্থ প্রান্তরে যে শস্য উৎপন্ন হয়, দেবতার পূজার জন্য তাহা সঞ্চিত থাকে। সম্রাট্ ও তদীয় কর্ম্মচারিবর্গ বৎসরে একবার এই ক্ষেত্রে শস্য বপন করিয়া থাকেন। তাতার-পল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বিশাল জলাশয়,—সীমাহীন

প্রান্তর। পিকিনের জনসাধারণের জন্য এই ক্ষেত্রে শস্য ও তরকারী উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষিলক্ষ্মী ও ঈশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে একটি হ্রদ; জলদেবতা বরুণের নামানুকরণে হ্রদটির নাম 'হিলুং'। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হইলে চীনসম্রাট হ্রদতীরে বসিয়া বরুণদেবের পূজা করেন। প্রজাসাধারণ সম্রাটকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানে। সম্রাটের গ্রীষ্মনিবাস পিকিন হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী ইয়েন-মিং-ইয়েন নামক স্থানে অবস্থিত। এই স্থানের পরিধি প্রায় দ্বাদশ বর্গ মাইল। রাজধানীর সমতলক্ষেত্র হইতে এই গ্রীষ্মনিবাস সহস্র ফুট উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। স্থানটি পরম রমণীয়। চারি দিকে সুদৃশ্য বিচরণভূমি ও পুষ্পোদ্যান। উদ্যানমধ্যে সম্রাট্ ও মহিষীর বাসোপযোগী ত্রিশটি প্রাসাদ। সম্রাট মন্ত্রিবর্গ, রক্ষী ও অনুচরগণ সহ সম্রাট্ গ্রীষ্মকালে এই রমণীয় স্থানে বাস করেন।

"পিকিন নগর হইতে সম্রাটের প্রাসাদ দুই ঘণ্টার পথ। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পচিত্রিত উদ্যান, বিচিত্র কৃত্রিম শৈলমালা, উপত্যকাভূমি, খাল ও হ্রদ। সম্রাটের সহিত যদি কোনও বৈদেশিক সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তাহা হইলে দরবারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নয়বার ভূমিতলে মস্তক নত করিতে হয়। তার পর তিনি সম্রাটের সকাশে নীত হন।

"চীনরাজ্যের পুলিস কি সুশৃঙ্খলে তত্রত্য বিশাল জনতাকে পরিচালিত করে! দায়িত্বভার থাকাতেই শান্তিরক্ষকগণ স্বকার্য্যে এত অবহিত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা চীন-শাসনপ্রণালীর গুণের পরিচায়ক। প্রত্যেক নগরে দশটি করিয়া মণ্ডল। এক এক মণ্ডলের অধীন নির্দ্দিষ্টসংখ্যক গৃহস্থ। প্রত্যেকেরই উপর এক একটি কার্য্যভার ন্যস্ত। তাহারা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী। গৃহস্থ নিজ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতার জন্য দায়ী।

"সন্ধ্যার অত্যল্প কাল পরেই চীন নগরের তোরণ রুদ্ধ হইয়া যায়। নগরের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলে সুবৃহৎ ঘণ্টা থাকে। সেখান হইতে ঘণ্টাধ্বনি হইলেই নগরের সর্ব্বত্র সে শব্দ শ্রুত হয়। রক্ষিগণ এই ঘণ্টানিনাদ-শ্রবণমাত্র তোরণদ্বার রুদ্ধ করে। তখন কেহ বাহিরে যাইতে, অথবা ভিতরে আসিতে পারে না। বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ ব্যতীত রক্ষিগণ কাহাকেও ভিতরে আসিতে অথবা বাহিরে যাইতে দেয় না। প্রত্যেক নাগরিককে নিশাকালে পথ চলিবার সময় লণ্ঠন জ্বালিয়া বাহির হইতে হয়।

যদি কেহ লণ্ঠন না জালিয়া পথে চলে, দেশের আইনানুসারে তাহার দণ্ড হয়। রাজধানীর গণ্ডীর মধ্যে যে সকল লোকের বাস, যদি তাহাদের কেহ গুরুতর অপরাধবশতঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে, তাহার বাড়ীর অন্য পরিজন, এমন কি, সেই গৃহে যে কেহ বাস করিবে, তাহাকে পর্য্যন্ত অবিলম্বে সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ভিন্ন নগরে চলিয়া যাইতে হয়। অপরাধীর সম্পর্কিত কেহ রাজধানীর সীমার মধ্যে বাস করিতে পায় না। চীন পুলিসের ন্যায় দক্ষ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শান্তিরক্ষক অন্যত্র বিরল। দায়িত্বভার থাকাতেই চীনশান্তিরক্ষকেরা সুশৃঙ্খলে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। চিঙ্কু প্রাসাদ তাতার-পল্লীর মধ্যস্থলে অবস্থিত।

"নগরসীমার মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। উহার নাম 'যন্ত্রণা-গৃহ'। উহা ঠিক্ গৃহ নহে—একটি অন্ধকূপবিশেষ। এই কারাকক্ষটি দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট, প্রস্থে চারি ফুট, এবং উচ্চতায় আট ফুট। গৃহের তলদেশে একটি গহ্বর। উহার উপরিভাগে লৌহদণ্ডসমূহ স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট। দেখিতে অনেকটা কয়লার উনানের ন্যায়। এই বিচিত্র কক্ষটির একটিমাত্র দ্বার। গুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধীকে এই কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। এই ভীষণ কারাকক্ষের উল্লেখমাত্রেই নগরবাসীরা আতঙ্কে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে থাকে। নরহত্যাকারী অথবা প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নিপ্রদানের অপরাধে কেহ অভিযুক্ত হইলে, বলপূর্ব্বক তাহাকে এই কক্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। শৃঙ্খলিত অবস্থায় লোহার শিকের উপর অপরাধী শায়িত হইলে নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। অগ্নির উত্তাপে হতভাগ্য দগ্ধ হইতে থাকে। এইরূপে চব্বিশ ঘণ্টা কাল শাস্তিভোগের পর হতভাগ্যের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। এই পৈশাচিক দণ্ডের কথা শুনিলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে। বক্সার-বিদ্রোহের সময় উপযুক্ত রক্ষী ব্যতীত আমরা কেহ নগরের বাহির হইতাম না। তখন জনরব শুনিয়াছিলাম, কোনও বৈদেশিক চীনদিগের হাতে পড়িলে, তাহারা তাহাকে অনাহারে রাখিয়া শেষে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে চীন-দ্বিভাষী আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, তিনিও এই জনরবের সমর্থন করিয়াছিলেন।

"রাজপ্রাচীরের উত্তরাংশে লামা-মন্দির অবস্থিত। এরূপ চমৎকার ও রমণীয় প্রাসাদ চীনসাম্রাজ্যে বিরল। লামা পুরোহিতগণ এই মন্দিরে বাস করেন। বহু তান্ত্রিক দেবদেবীর পিত্তলমূর্ত্তি মন্দিরে বিরাজিত।

পালিভাষায় লিখিত বহু হস্তলিপি পবিত্র মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত। শাক্য মুনির একটি বৃহৎ দারুময় মূর্ত্তি মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ।

কাউণ্ট টলষ্টয়।

সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক, ত্যাগধর্ম্মের প্রচারক, ঋষিকল্প কর্ম্মবীর ও বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাউণ্ট লিয়ো টলষ্টয় বিগত ২০শে নবেম্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রুসিয়ার কোনও মহাসম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিপুল ধনসম্পত্তি ও রাজসম্মানের অধিকারী হইয়াও, ত্যাগী মহাপুরুষ সার সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অধর্ম্ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। জীবনে যাহা তিনি ধ্রুব সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কর্ম্মের দ্বারা তিনি তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। রুসিয়ার সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত ধর্ম্মমত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অন্যায় কর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন মসীযুদ্ধ করিয়া নিজমত প্রচার করিয়াছেন। জগতে ছোট বড় নাই, ধনী নির্ধন নাই, ভগবানের প্রেমময় রাজ্যে সকলেই সমান, এই মহাবাণী তাঁহার উদার মহান হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কঠোর তপস্যায় তিনি যে মহামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, উপন্যাস, গল্প, সামাজিক, রাজনীতিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রবন্ধনিচয়ে তিনি উজ্জ্বল অক্ষরে তাহার বিষয় লিখিয়া পৃথিবীময় মন্ত্রবীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন। বিশ্ববাসীর চিরন্তন দুঃখ, দারিদ্র্যপীড়িত মানবসমাজের নিদারুণ অভাব, বেদনা ও যন্ত্রণা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্য তিনি লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভোগবিলাস, যশঃ, প্রতিপত্তি, রাজসম্মান, তিনি কিছুরই ভিখারী ছিলেন না। অতুল পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি প্রজাসাধারণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বরচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ, এমন কি, গ্রন্থস্বত্ব পর্য্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে রুসিয়ার কোনও হোটেলে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া অসংখ্য কৃষাণ, অনুরক্ত ও ভক্ত জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় গমন করেন। রোগশয্যায় শায়িত ঋষিকল্প ত্যাগী মহাত্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"জগতে অসংখ্য আর্ত্ত, পীড়িত ও চিরদুঃখী রহিয়াছে, আমার কাছে এত লোক কেন?" মৃত্যুকালেও

টলষ্টয় দুঃখীর বেদনা ভুলিতে পারেন নাই। এই কথাগুলি তাঁহার অন্তিম বাণী। এমন কথা খ্রীষ্ট ব্যতীত ইউরোপের আর কোনও মহাপুরুষের মুখ হইতে মৃত্যুকালে নিঃসৃত হয় নাই।

আমেরিকার জনৈক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, শ্রীযুত জেম্‌স্ ক্রীমান্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টলষ্টয়কে দেখিবার জন্য তাঁহার যাস্‌নিয়া পলিয়ানায় অবস্থিত পল্লীভবনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। ক্রীমান্ সেই সময়ে টলষ্টয়-সংক্রান্ত যে সকল বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। আমরা "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহার সারসংকলন করিয়া দিলাম।

"দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, শীত ঋতুর মাঝামাঝি আমি যাস্‌নিয়া পলিয়ানায় টলষ্টয়ের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। হিম-ঝটিকার অবসানে তখনও সমগ্র দেশ তুষারপ্রাচীরে বেষ্টিত। পবনপ্রবাহে পুষ্পের কোমল মৃদু সৌরভ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দেশের ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ক্রমে তিরোহিত হইতেছিল। কাউণ্ট এখনও নিরামিষাশী। কিন্তু তাঁহার পত্নী ও কন্যা কখনও কখনও মাংস আহার করিয়া থাকেন। কন্যাটি পিতার সঙ্গিনী ও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান সহকারিণী। টলষ্টয় মুখে বলিয়া যাইতেন, কন্যা তাহা লিখিয়া লইতেন। পত্নী ও চিকিৎসককে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত টলষ্টয় মধ্যে মধ্যে অতি সামান্যপরিমাণ সুরা পান করিয়া থাকেন।

"আমি যখন টলষ্টয়ের অতিথি, সে সময়ে তাঁহার বিনামানির্ম্মাতা বন্ধু সেখানে ছিল না। টলষ্টয় মধ্যে মধ্যে বন্ধুর দোকানে বসিয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। পল্লীর সকলেই টলষ্টয়ের একান্ত অনুরক্ত ও ভক্ত; কিন্তু আমি দেখিলাম, কাউণ্ট যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন। নিজের গৃহেই যেন তিনি নিজে অতিথি! কাহারও সহিত তাঁহার যেন কোনও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল না।"

লেখক তাহার পর কাউণ্ট-পত্নীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন,—"তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নীর সাংসারিক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে টলষ্টয়ের আহার বিহার, বেশভূষা, এমন কি, মাথা গুঁজিবার স্থানেরও বিলক্ষণ অভাব ঘটিত। কাউণ্টের ন্যায় তাঁহার পত্নীরও মনে যদি এ ধারণা জন্মিত যে, অর্থ সম্পত্তির মালিক হইবার কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই, তাহা হইলে টলষ্টয়ের অশ্বারোহণে ব্যায়াম বন্ধ হইত, পুস্তকাগারও থাকিত না।

"বীণাপাণির আরাধনায়, সাহিত্যসেবায় যে দিন হইতে টলষ্টয় আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তির নির্ঝরধারা উৎসারিত হইতে আরম্ভ হয়। আহারকালে টলষ্টয় আমার সহিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাদ্‌জি মোরার' (Hadji Mourar) সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। জীবদ্দশায় কাউণ্ট এই উপন্যাসখানি মুদ্রিত করিবেন না, বলিলেন। টলষ্টয়পত্নী ও তাঁহার কন্যাও এই অপূর্ব্ব উপন্যাসখানি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, 'যুদ্ধ ও শান্তি' (War and Peace) অথবা 'আনা কারেনিনা' (Ana Karenina) অপেক্ষাও এই উপন্যাসখানি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

"গ্রন্থের নায়ক হাদ্‌জি ককেসস্ প্রদেশের সুলতান ও ধর্ম্মপ্রচারক স্যামিলির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে ভীষণ রণস্থলের উজ্জ্বল বর্ণনা। যুদ্ধে নিহত বীরের ছিন্নমস্তক শত্রুসৈন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে সুরাপানোন্মত্ত রুষ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কি বিদ্রূপ!

"ইদানীং টলষ্টয় বার্দ্ধক্য ও অজীর্ণরোগ সত্ত্বেও প্রায় অশ্বপৃষ্ঠে ব্যায়ামের জন্য ভ্রমণ করিতেন। তিনি প্রত্যহ চারি ঘণ্টা কাল পাণ্ডুলিপির সংস্কারে কালযাপন করিয়া থাকেন।

"টলষ্টয়ের প্রবন্ধ অথবা উপন্যাস লিখিবার প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ তিনি প্রবন্ধ অথবা গল্পের খসড়া একখানি অথবা দুইখানি কাগজে লিখিয়া রাখেন। কন্যা তৎক্ষণাৎ 'টাইপ্-রাইটিং' যন্ত্রের সাহায্যে উহা নকল করিয়া ফেলেন। পর দিবস টলষ্টয় কন্যার লিখিত কাগজগুলি দেখিয়া ভাষার ঝঙ্কারে ও বর্ণনার বিচিত্র রাগে উদ্ভাসিত করিয়া প্রবন্ধ অথবা উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে কয়েক পৃষ্ঠা লিখিত হইলে, কন্যা পুনরায় উহা নকল করিয়া ফেলেন। পরদিবস কাউণ্ট আবার সেইগুলি দেখিয়া লিখিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্যাও নকল করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ গ্রন্থের কলেবরও বাড়িতে থাকে। টলষ্টয় রুষীয় ভাষাতেই তাঁহার সমুদয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন।

"পিতার সাহিত্যচর্চ্চার সাহায্যকল্পে কন্যাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু তনয়া তাঁহার এতই অনুরাগিণী যে, তিনি সহাস্যমুখে, উৎসাহদীপ্ত ও উৎফুল্ল হৃদয়ে এই কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। টলষ্টয়ের যৌবনকালে তাঁহার পত্নী স্বয়ং এই কাজ করিতেন। 'যুদ্ধ ও শান্তি' নামক সুবৃহৎ উপন্যাস-

খানি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে না কি তিনি উহা পঞ্চদশবার নকল করিয়াছিলেন। এখন 'টাইপ্-রাইটিং' যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় নকলকারিণীর পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে।

"মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি কাউণ্টেসের সহিত অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানে বেড়াইয়া আসিলাম। তাঁহার প্রকৃতি অতি সুন্দর, হৃদয় সহানুভূতি-স্নিগ্ধ। কাউণ্টেসকে দেখিলেই তিনি যে বুদ্ধিমতী, সুন্দরী ও বিদুষী, সে সম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি যাসনিয়া পলিয়ানার পল্লীভবনে আসিয়াছেন। কাউণ্টেস ত্রয়োদশটি সন্তানের প্রসূতি। টলষ্টয়ের পীড়ার সময় তিনিই স্বামীর শুশ্রূষাকারিণী। কাউণ্ট স্বেচ্ছাকৃত আত্মনির্ব্বাসনের কঠোরতা পত্নীর মধুর সস্নেহ ব্যবহারে ও সাহচর্য্যসুখেই অনায়াসে সহ্য করিতেন। সকল কার্য্যেরই তিনি প্রধানা সহকারিণী। স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহধর্ম্ম, স্বামী বিপদে পড়িলে উদ্ধারের উপায়-অন্বেষণ, সমস্তই কাউণ্টেসকে করিতে হয়। সম্রাট্ টলষ্টয়ের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করিতে চাহিলে পতিব্রতা পত্নী স্বামীর পক্ষাবলম্বন করিয়া সম্রাটের কাছে গিয়া দরবার করিয়া থাকেন।

"যাস্নিয়া পলিয়ানার পল্লীকুটীরগুলি কাউণ্ট-পত্নীর চেষ্টার ফলেই ক্রমশঃ ইষ্টকালয়ে পরিণত হইয়াছে। কাউণ্টের পশুশালায় মেষাদি নানাবিধ পশুপাল দেখিলাম। অশ্বশালেও অনেকগুলি অশ্ব রহিয়াছে। মেষগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

"টলষ্টয়ের জমীদারী প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন। অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ পুষ্পকাননে গোলাপ, বিগোনিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ফুলের গাছ। বিচিত্রবর্ণ-পুষ্পচিত্রিত কুঞ্জের অনতিদূরে একটি চতুষ্কোণ তৃণশ্যামল সযত্ন-রক্ষিত ক্ষেত্র। তাহার চারি পার্শ্বে দুই সারি ফলপুষ্পিত উচ্চ বৃক্ষ। এই মনোরম বৃক্ষবীথির মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে টলষ্টয়ের কল্পনা মুখর হইয়া উঠে। উপন্যাস ও দার্শনিক প্রবন্ধের উপাদান মস্তিষ্কে সঞ্চিত হইতে থাকে।

"টলষ্টয়ের বাসভবন আড়ম্বরপরিশূন্য, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ও শ্বেতবর্ণ-সমুজ্জ্বল। উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কক্ষগুলি দ্বিতলে অবস্থিত। প্রাচীনবংশের গৌরব-চিহ্নস্বরূপ কতিপয় তৈলচিত্র এখনও কক্ষগুলির মধ্যে বিদ্যমান আছে। কাউণ্টের পাঠাগার ও আমার শয়নকক্ষ গ্রন্থ ও হস্তলিপিতে পরিপূর্ণ। পুস্তকাধারগুলি সযত্নে সংরক্ষিত। প্রত্যেক আধার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় চিহ্নিত।

গ্রন্থতালিকাও ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য। পাঠাগারে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সামাজিক প্রবন্ধ, উপন্যাস, সকল প্রকার গ্রন্থই আছে। জেনারেল বুথের 'Darkest England', হেন্‌রী জর্জের রচিত 'Progress and Poverty', সেল্‌ডন্‌ প্রণীত 'In His steps' প্রভৃতি গ্রন্থের পার্শ্বে রুষীয় গ্রন্থকারদিগের রচিত পুস্তকগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত দেখিলাম। প্রাচীরের একাংশে সশৃঙ্গ মৃগমুণ্ড, তাহার নিম্নে উভয় পার্শ্বে বিবিধ ফটোগ্রাফ্। সর্ব্বোপরি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের চিত্র। গৃহকোণে ফটোগ্রাফীর যন্ত্র, একটি ত্রিপাদ টেবিল। প্রাচীরের অপরাংশে গ্যারিসন্, তুর্গেনিফ্ ও হেন্‌রী জর্জের আলেখ্য। চতুর্দ্দিকে কেবল গ্রন্থ। গ্রন্থের পর গ্রন্থ, তাহার উপরে গ্রন্থ ও অসংখ্য পাণ্ডুলিপি। প্রায় সকল কক্ষেই পুস্তক। যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, কেবল রাশি রাশি গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি। চিরজীবনের চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধনিচয়ই কক্ষগুলির প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় ও অমূল্য সম্পত্তি। কি অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্নের অপূর্ব্ব নিদর্শন!

"কাউণ্ট-ভবনের চতুর্দ্দিকে নদীশোভন শত শত বিঘাব্যাপী উর্ব্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও অরণ্য প্রসারিত। শত শত কৃষাণ মনের আনন্দে কৃষিকর্ম্মে নিরত।

"চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে উদ্যানের এক প্রান্তে আসিবামাত্র গৃহস্বামীর দেখা পাইলাম। তিনি তখন উভয় হস্ত পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া, কি চিন্তা করিতে করিতে অবনতমস্তকে পাদচারণ করিতেছিলেন। চারি দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন,—'এ সব কিছুই আমার নয়। আমার কোনও কিছুই থাকা সঙ্গত নয়। স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিয়া আমি বড়ই ভুল করিয়াছি।'

'এমন রমণীয় স্থান, অনুগত পরিজনবর্গ, এ সকলের দিকে চাহিয়াও আপনি মৃত্যুকামনা করেন কেন?'

'সত্যই মৃত্যু আমার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমি অকারণ মরিতে চাহি না। ধর্ম্মের জন্য, সাধক যেমন তাহার ইষ্টদেবতাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে চাহে, আমি ঠিক্ তেমনই ভাবে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে চাই। মিতব্যয়িতা, অর্থোপার্জ্জন, অথবা দেশের শাসননীতি সম্বন্ধে আমার তেমন কোনও আগ্রহ নাই। মানুষ নানা বিষয়ে চিন্তা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে। খ্রীষ্টানের জীবনে একটিমাত্র সমস্যা আছে—জীবনের উদ্দেশ্য

কি? কেমন ভাবে আমি অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব, কিরূপেই বা মরিব? এই সমস্যার সমাধানই খ্রীষ্টানের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

"টলষ্টয়ের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বাক্য অথবা ভাষার দ্বারা বুঝান কঠিন। যে কেহ একবার কিছু কাল তাঁহার-সহিত বাস করিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ বুঝিয়াছেন যে, টলষ্টয় ঠিক খৃষ্টের আদর্শে আপনার জীবন পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহার ধারণার অনুসারে সাধারণ মানবের জীবন যাপন করা অত্যন্ত অসম্ভব, অমনই টলষ্টয় প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন যে, 'এই কথার দ্বারা এই বুঝায়, পৃথিবী ও মানবসমাজ যীশুর প্রচারিত সহজ ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে পড়িয়া আছে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতাও বহুপ্রাচীন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।'

"জগতের সাহিত্য দিন দিন কোন্ পথে চলিতেছে, টলষ্টয় তীক্ষ্দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কিছুই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। টলষ্টয়ের বিশ্বাস, প্রকৃত মহান ব্যক্তিদিগকে মানবসমাজ উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে।

"আজ অপরাহ্নে টলষ্টয়ের পাঠগৃহে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছি। উজ্জ্বল দীপালোকশিখা তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে। আমার বোধ হইল, টলষ্টয় যেন কোনও সাধক, কোনও ঋষি, দেবভাববিশিষ্ট কোনও মহাত্মা! তাঁহার প্রসন্ন ললাট, সুদীর্ঘ নাসিকা, উজ্জ্বল দীপ্তিময় নয়ন-যুগল, লোলচর্ম্ম ও রজতশুভ্র দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি দেখিলে তাঁহাকে কোনও মহাপুরুষ বলিয়াই ধারণা জন্মে। স্বপ্নভাবাবিষ্ট ঈষৎ-বিষণ্ণ পবিত্র ও সৌম্য মুখমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় ভক্তিভরে নত। টলষ্টয়ের দৃষ্টি যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জবা।

১

তটিনীতীরে বিরল-বিন্যস্ত রসাল ও খর্জ্জুরবৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র গৃহে জবা দাসীর বাস। গৃহখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পরিপাটী। তাহাতে সচ্ছলতার প্রফুল্ল শ্রী নাই, দীনতার ম্লানমূর্ত্তিও নাই। গৃহ যেমন পরিপাটী, গৃহপ্রাঙ্গণ তেমনই পরিচ্ছন্ন—সংস্কৃত, সম্মার্জ্জিত, গোময়লিপ্ত। গৃহখানি দেখিলে গৃহস্থের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

জবা দাওয়ায় বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রাঙ্গণস্থিত রৌদ্র-তপ্ত ধান্যে তাহার দৃষ্টি নাই। জবা দেখিতেছে,—নদীবক্ষঃ ভেদ করিয়া কত নৌকা আসিতেছে—যাইতেছে। কোনখানি পণ্যসম্ভারে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া মন্থরগতিতে অদূরস্থিত হাটের অভিমুখে চলিয়াছে; কোনখানি শূন্যবক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া অন্তঃসারশূন্য লোকের ন্যায় স্বীয় লঘুত্ব প্রমাণিত করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

জবা কিশোরী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম; চক্ষু দুটি বিলোল বিস্ফারিত; মুখশ্রী কমনীয়। জবার হস্তে চুড়ী আছে, কিন্তু সীমন্তে সিন্দুর নাই। জবা তন্ময়-চিত্তে নদীর দিকে চাহিয়া আছে। পশ্চাতে সযত্নসঞ্চিত ধান্যে বৃষভশ্রেষ্ঠ উদর পূর্ণ করিতেছে, সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এমন সময় জবার ননদিনী গৃহকর্ত্রী শ্যামা দাসী স্নানান্তে জলের কলসী কক্ষে সেখানে উপস্থিত হইলেন। "হ্যাঁলা বউ, তোর ও কি ভাব? ধানগুলো সব ষাঁড়ে খেয়ে গেল, তা তুই দেখ্‌তে পাস্‌ না?" ননন্দার আগমনে ও ঝঙ্কারে ভ্রাতৃবধূ চমকিয়া উঠিল। স্বীয় অনবধানতায় লজ্জিত, শঙ্কিত হইয়া বৃষভবরকে তাড়াইয়া দিল, এবং বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য পৈঠায় আসিয়া বসিল। ননন্দার ঝঙ্কার তখনও শেষ হয় নাই;—"তবে বউকে বলা আর মাঠে বসিয়া কাঁদা দুইই সমান!" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শ্যামা রন্ধন কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন।

নাপিতের ঘরে বিবাহে অনেক পণ দিতে হয়, সুতরাং প্রায়ই বিগত-যৌবন প্রৌঢ়ের সহিত শিশু অথবা বালিকা কন্যার বিবাহ হয়। জবার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। জবার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মতিলাল পরামাণিক চল্লিশের নিকটবর্ত্তী হইয়া জবাকে স্ত্রীরূপে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। জবার পিতা মাতা ছিল না, সুতরাং তাহার খুল্লতাত নগদ

তিন শত টাকার বিনিময়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বৃদ্ধের নিকট বিক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। জবা তখন অনাবৃতদেহে মতিলালের কোলে উঠিয়া বেড়াইত। লোকে তামাসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত,—"জবা, মতি তোকে কেমন ভালবাসে?" যত্নে পালিতা জবার চক্ষু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। এমনই করিয়া মতিলাল তাহাকে আট বৎসর কোলে পিঠে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল; তার পর যখন জবা মতিলালের সহিত তাহার সম্পর্ক বুঝিতে শিখিল, তখন একদিন ক্লান্তবর্ষণ শ্রাবণসায়াহ্নে মতিলাল তাহার সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া লইয়া চলিয়া গেল। শোকজর্জ্জরিতা শ্যামার জবা বই আর সংসারে বন্ধন রহিল না।

তার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। গ্রামপ্রান্তে, জমীদার বাটীর অনতিদূরে, তাহাদের কুটীর সময়ে সময়ে এত নির্জ্জন, এত শূন্য বোধ হইত যে, শ্যামা যখন বাড়ী না থাকিত, জবা তখন গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া অন্যমনে নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। গৃহ যত শূন্য মনে হইত, হৃদয় তত লঘু হইয়া আসিত। জবা নৌকা গণিত; তীরস্থিত হোগ্‌লা সকল কেমন মাথা নোয়াইয়া সান্ধ্য সমীরণের বন্দনা করিত,—জবা অনিমিষ্-নয়নে তাহাই দেখিত; আর তাহারও হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া কাহার উদ্দেশে প্রধাবিত হইত।

নিকটে কোনও প্রতিবেশী ছিল না, সুতরাং শৈশবে ও বালিকা-বয়সে জবা নিকটবর্ত্তী জমীদার-বাটীতে খেলা করিতে যাইত। জমীদারের একমাত্র পুত্র জবা অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়। জবা তাহার সহিত খেলা করিত; আর মধ্যে মধ্যে জমীদারের ভগিনী পিত্রালয়ে আসিলে, তাঁহার ছোট ছোট কন্যাদের সহিত জবার বড়ই ভাব হইত। জবা তখন প্রায় সমস্ত দিন জমীদার-বাড়ীতে থাকিত, এবং বালক বালিকাদের সহিত একত্র আহার করিত। বলা বাহুল্য, জমীদার-পুত্র সদানন্দ ও তাহার পিসীর কন্যাগণও মধ্যে মধ্যে মতিলালের বাটীতে খেলিতে আসিত। শ্যামা তাহাদিগকে মুড়ি বাতাসা ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিত।

এই সূত্রে জবার সহিত সদানন্দের বেশ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তার পর জবা যখন বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া কৈশোরে উপনীত হইল, তখন নবযৌবনপ্রফুল্ল কান্তরূপ সদানন্দের প্রতি তাহার অনুরাগ ও তাহার প্রতিপালক পিতার বয়সী মতিলালের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা—এই উভয়ের

মধ্যে অনেকটা প্রভেদ জন্মিয়া গেল। মতিলাল তাহার স্বামী, যখন জবা এ কথা বুঝিতে পারিল, তখন তাহার আশৈশবসঞ্চিত ভক্তি ও কৈশোরের অকস্মাৎলব্ধ ধারণার মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। মতিলালের শয্যাসঙ্গিনী হইতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জবা মতিলালের শয্যায় অকুণ্ঠিতভাবে আশ্রয় লইয়াছে; এমন কি, শ্যামার শয্যা অপেক্ষা মতিলালের শয্যার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা অধিক ছিল; কিন্তু এখন সে শয্যায় যাইতে তাহার সঙ্কোচ শঙ্কায় পরিণত হইত। সংযত-ব্যসন মতিলাল তাহার সঙ্কোচে আঘাত করিতে ইচ্ছা করিত না; সে সহিষ্ণু ও সংযত চিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে জানিত। কিন্তু নির্দ্দয় কাল এক দিন তাহার প্রেম-তপস্যা নিষ্ফল করিয়া দিল। শ্যামার নিদারুণ শোকের আঘাত জবার হৃদয়ে প্রতিঘাত করিল;—কিন্তু সে ব্যথায় স্বামীর শোক অপেক্ষা প্রতিপালকের বিয়োগবেদনাই অধিক ছিল।

মতিলালের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে জমীদার সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; —উদ্দেশ্য, পুত্রের শিক্ষা। কিন্তু জননীর অঞ্চলের নিধি, পিতার স্নেহের দুলাল সদানন্দের লেখাপড়ায় তত আস্থা দেখা গেল না। অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং স্নেহশীল পিতা মাতা পিতৃপুরুষের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ দিকে যৌবনের উন্মেষে পল্লীগ্রামের জমীদার-পুত্র সহরের সহজলব্ধ বহু বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিলেন। স্বীয় চরিত্রের আভা পুত্র-চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া ভুক্তভোগী পিতা প্রমাদ গণিলেন; ছেলের বিবাহ দিবার জন্য সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধানে ঘটক ঘটকী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, সহরের সুন্দরী সুচতুরা কন্যার হাতে পড়িলে পুত্র সংযত হইবে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতা জমীদার-পুত্রকে জামাতার পদে বরণ করিতে সম্মত হইলেন। এমন কি, অল্প দিনে তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক হইল যে, সুন্দরী কন্যা অপেক্ষা সালঙ্কারা কন্যা লাভের জন্য সদানন্দের জননী ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সাহসী সদানন্দ ত অলঙ্কার চায় না—সে সৌন্দর্য্য চায়। কথাটা সে পিতা মাতাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। শুভদিনে শুভলগ্নে সদানন্দ হৃদয়লক্ষ্মীকে ঘরে আনিল।

প্রায় দেড় বৎসর সহরে বাস করিবার পর জমীদার বাবু ঘটক

ঘটকীদের প্রগল্‌ভ প্রতিজ্ঞা ও বৈবাহিকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পুত্রবধূ সহ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বহুদিন পরে সদানন্দ বিবাহ করিয়া দেশে আসিয়াছে, গ্রামের যাবতীয় লোক বধূ দেখিতে আসিল। শ্যামার সহিত জবাও আসিল। পথিমধ্যে সদানন্দের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সদানন্দকে দেখিয়া জবা ঘোমটা টানিয়া দিতেছিল; সদানন্দ বাধা দিয়া বলিল,—"জবা, আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দিতেছ কেন?" শ্যামা সে কথার প্রতিধ্বনি করিল, সুতরাং জবার আর ঘোমটা দেওয়া হইল না। অনেক দিন পরে জবার যৌবনোদ্ভাসিত সুন্দর মুখ সদানন্দের বড় মিষ্ট বোধ হইল, সদানন্দের চন্দনচর্চ্চিত সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে জবার হৃদয় আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সদানন্দ মতিলালের আকস্মিক মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করাতে শ্যামার হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল।

জবা বহু দিন জমীদার বাটীর অন্দরে প্রবেশ করে নাই। আজ সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সহর হইতে আনীত কত নূতন জিনিস গৃহসজ্জা পরিপুষ্ট করিয়াছে। জবা বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে তাহা দেখিতে লাগিল। জবা মনে করিয়াছিল, সদানন্দের স্ত্রী সহরের মেয়ে, সুতরাং হয় ত তাহাদের সহিত "ছোট লোক" বলিয়া আলাপ করিবে না। কিন্তু সদানন্দের স্ত্রী মৃণালিনী "মিসিবাবা"র ছাত্রী, সুতরাং জাতিবিশেষের প্রতি তাহার অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে জবার সহিত তাহার বেশ সদ্ভাব জন্মিল। জবার গৃহ তাহাদের খিড়কীর নিকট, সুতরাং মৃণালিনী তাহার সহিত সই পাতাইল। বাক্স খুলিয়া তাহাকে কত পুতুল, খেলনা, গন্ধ-তৈল, সাবান, চিরুণী, আরসী দেখাইল। খেলনার মধ্যে মৃণালিনীর বিবাহ-বাসরের একখানি ফটো ছিল। সেখানি দেখিয়া জবার গণ্ড একটু আরক্তিম হইল। মৃণালিনীর সদয় ব্যবহারে জবার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হইয়া গেল—এক জন সমবয়স্কা সঙ্গিনী লাভ করিয়া সে প্রীত হইল। উভয়ের সদ্ভাব দেখিয়া শ্যামাও আনন্দিতা হইল। জবার মলিন মুখ, বিষাদকরুণ দৃষ্টি ও ধ্যানমৌন মূর্ত্তি, আত্মবিস্মৃতি মধ্যে মধ্যে শ্যামার হৃদয়ে বড় গুরু আঘাত করিত। বর্ষীয়সীর হৃদয়ে বিধবা যুবতীর অব্যক্ত ব্যথা শেলের মত বাজিত। শ্যামা অনেক সহিয়াছে, তবুও তাহার সহিষ্ণুতা বিক্ষুব্ধ হইত।

সন্ধ্যার পর সদানন্দ শ্যামার দাওয়ায় আসিয়া বলিল। সে তামাক খাইতে চাহিলে শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। মতিলাল বাঁচিয়া থাকিতে সদানন্দ আসিয়া তাহাদের বাটীতে লুকাইয়া তামাক খাইত। তাই তামাকের কথায় শ্যামার চক্ষে অশ্রুধারা ছুটিল। সদানন্দ সান্ত্বনা দিল,—"আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমাদের ভাবনা নাই, শ্যামা। আর আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে না, সর্ব্বদা তোমাদের দেখিব।" সংসারে শ্যামাকে এরূপ ভরসা দিবার লোক ছিল না। শ্যামা গদ্‌গদকণ্ঠে সদানন্দকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেকক্ষণ কথা কহিয়া শ্যামা দাওয়ায় মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। তখন জবার সহিত সদানন্দ কথা কহিতে লাগিল,—"জবা, আমরা যখন বাটী ছিলাম না, তখন তোমার মন কেমন করিত না?" জবা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সদানন্দের অদর্শনে জবার যে বিশেষ কিছু কষ্ট হইত, জবা ত তাহা অনুভব করিতে পারে নাই; তবে আজ সদানন্দকে দেখিয়া জবার এত আহ্লাদ হইতেছে কেন? ইহা বোধ হয় নূতনত্বের মোহ। দুঃখের আঘাত ও নির্জ্জনতার ক্লেশের পর বাল্যসঙ্গীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলে মানুষের মন বুঝি এমনই হয়। জবা প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল,—"আচ্ছা, এতদিন বিদেশে ছিলে, কখনও কি আমাদের কথা মনে হইত না?" সদানন্দ সাগ্রহে উত্তর করিল,—"হইত বই কি! তোমার কথা মাঝে মাঝে মনে হইত।"

সদানন্দের কথা শুনিয়া জবা লজ্জিত হইল, কিন্তু সদানন্দ যে তাহার মন রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিল, জবা তাহা বুঝিতে পারিল না। নাগরিকের চতুরতা, আর মুগ্ধহৃদয়া পল্লীবিধবার সরলতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; কিন্তু বিলাসলালিত সদানন্দ জবার পুণ্য-নিষ্ঠা ও হৃদয়ের গৌরব বুঝিতে পারে নাই। অনেকক্ষণ কথা কহিয়া সদানন্দ চলিয়া গেল।

২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জমীদার-বাটীর বৈঠকখানা হইতে হারমোনিয়মের মধুর সুরসংযুক্ত কলকণ্ঠের করুণগীতি উঠিয়া জবার গৃহপ্রাঙ্গণ পরিব্যাপ্ত করিয়া হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে। জবা সুপ্তা শ্যামার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। আজ প্রায় এক মাস শ্যামার শরীর অপটু হইয়াছে—তাহার উপর চারি দিন সন্নিপাত জ্বর। সমস্ত দিন রৌদ্রের উত্তাপে ও জ্বরের জ্বালায়

শ্যামা অস্থির হইয়াছিল ; সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণের স্পর্শে তাহার একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে। একটু পূর্ব্বে সদানন্দ আসিয়া শ্যামার তত্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছে। জবা এখন নিঃসঙ্গ—নিতান্ত একাকিনী। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জবা সংসার নিতান্ত স্বজনহীন বোধ করিতেছিল। অদূরাগত কোমল মধুর সঙ্গীত এক একবার জবার হৃদয়ে একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছিল। যখন গান ফুরাইবে, তখন জবা সুখের এই সামান্য অবলম্বন হইতেও বঞ্চিত হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গীতের শেষ তান শূন্যে মিলাইয়া যাইতে না যাইতে শ্যামার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্যামা ডাকিল,—"বউ, একটু জল দাও।" জবা জল দিল, শ্যামা বিশুষ্ক কণ্ঠ তৃপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বউ, বাবু কতক্ষণ চ'লে গেলেন?" জবা উত্তর দিল,—"অনেক ক্ষণ।" তার পর উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জবা বলিল,—"ঠাকুরঝি, আমি ক' দিন থেকে তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌ব মনে কর্‌ছি। বাবু যে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসেন, এটা ভাল দেখায় না। আজ তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া তামাসা করিয়া গেল।"

শ্যামার বিশীর্ণ গণ্ড গড়াইয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল, অন্যমনা জবা তাহা অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারিল না। শ্যামা জানিত, এই রোগশয্যা তাহার শেষশয্যা। বহুদিন বহু আহ্বানের পর নির্দ্দয় শমনের কর্ণে তাহার কাতর প্রার্থনা পঁহুছিয়াছে। দুর্ব্বহ জীবনের যন্ত্রণার অবসান-কামনায় শ্যামা যেমন উৎসুক, সহায়হীন স্বজনহীন বিধবা বালিকা ভ্রাতৃজায়ায় ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তেমনই উৎকণ্ঠিত। শ্যামার উভয় সঙ্কট। বাঁচিয়া সুখ নাই—মরণেও শান্তির আশা নাই। শ্যামা কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "বউ আমি আর ক'দিন? তোমার যে কেউ নাই, এক জন ত তোমার দেখিবার লোক চাই।" জবার হৃদয়ে এক নূতন তরঙ্গের আঘাত লাগিল। জবা এতদিন এ কথা একবারও মনে করে নাই। জবা নিতান্ত নিরাশ হইল ; চতুর্দ্দিক শূন্য বোধ করিল। শ্যামা-বিহীন ভবিষ্যৎ জবার বড় অন্ধকার—ভয়াবহ মনে হইল। উভয়ে নীরব—উভয়েই চিন্তামগ্ন। নিম্নে নদীবক্ষে মাঝিরা উজান বাহিয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছে,—

ও যার গাঙ্গের কূলে বাস ও তার ভাবনা বারো মাস,
বড় ঝাপটে ভরা বাদলে সদা(ই) উলট পালট প্রাণ।

জবা আর শুনিতে পাইল না। বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়া জবা তাহার আত্ম-ভবিষ্যৎ-বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। শ্যামা ডাকিল, "বউ, বড় শীত, ঘরে চল।" জবা নীরব, নিস্পন্দ। শ্যামার অশ্রু উৎস পুনঃপ্রবাহিত হইল।

শ্যামা অনেক সহিয়াছে। জবার মত পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তবে জবার সৌভাগ্য-সিন্দুর যত শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়াছিল, শ্যামার তাহা অপেক্ষা একটু অধিক বয়সে সে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছিল। শ্যামা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে এক মাসের কন্যা কোলে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। আট বৎসর কন্যা প্রতিপালন করিয়া শ্যামা স্বামীর ভিটায় প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে ঘরজামাই করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা বিমুখ, দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে শ্যামার কন্যা বিসূচিকা রোগে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কন্যার শোক প্রশমিত হইতে না হইতে তাহার জামাতা স্ত্রীর অনুবর্ত্তী হইল। শ্যামার দ্বিতীয় সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া শ্যামা অশ্রুসিক্তলোচনে ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিল। কিন্তু শনি তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কয়েক বৎসর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর তাহাদের জননী বৈধব্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। শ্যামার ভ্রাতা বই সংসারে আর কেহ রহিল না। তার পর কত দিনের, কত বৎসরের প্রতীক্ষা ও সঞ্চয়ের পর শ্যামা ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তৃতীয়বার সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা শ্যামার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। জলবুদ্‌বুদের ন্যায় শ্যামার সুখ-স্বপ্ন নিমেষে মিলাইয়া গেল,—রহিল বিষতীব্র স্মৃতি, আর হিন্দু বিধবার সেই সর্ব্বস্ব,—নিষ্ঠা।

শ্যামা এত সহিয়াছে, তবু আজ যেন তাহার পূর্ব্ব শোক জবার ভবিষ্যৎ-চিন্তার নিকট লঘু হইয়া যাইতেছে। মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃত, তথাপি শ্যামা স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন উপেক্ষা করিয়া আরও কিছু দিন বাঁচিলে ভাল হয়, মনে করিতেছে। শেষে শ্যামা প্রার্থনা করিল, "ভগবান, অনেক সহিয়াছি, আরও না হয় কিছু সহিব। আর কিছু দিন ভুলিয়া থাক। জবা একটু বড় হউক, আপনার ভাল-মন্দ বুঝিতে শিখুক।" যমের হৃদয়ে দয়া আছে। তিনি সাবিত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রগুপ্তের হিসাবে বকেয়া বাকী নাই। সুতরাং শ্যামাকে যাইতে হইল। প্রায় এক

পক্ষ কখনও অজ্ঞান, কখনও সজ্ঞান অবস্থায় রোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শ্যামা একদিন সেই নির্জ্জন পল্লীবাসে শান্ত নিশীথে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

জবা তখনও শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল। জবা মনে করিল, শ্যামার যেমন মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, এও সেই অবস্থা। কিন্তু যখন বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সে শ্যামার কোনও প্রকার চৈতন্যের লক্ষণ অনুভব করিতে পারিল না, তখন ভয়ে ভয়ে মৃতার কপাল ও কপোল স্পর্শ করিল। উভয়ই হিম-শীতল! জবার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল। শ্যামার নাসিকার নিম্নে অঙ্গুলি রাখিয়া জবা শ্বাস প্রশ্বাস উপলব্ধি করিতে পারিল না। তখন সে বুঝিতে পারিল, সব ফুরাইয়াছে!

জবা ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত,—সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তের চিন্তা আজ এক পক্ষ জবার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে! একবার জবার মনে হইল, ছুটিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। কিন্তু কোথায় যাইবে—কাহার আশ্রয় লইবে! সেই গৃহের বাহিরে—শ্যামার মৃত্যুর পর জবার যে সব অন্ধকার! ভয়ে, চিন্তায় জবার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। জবা শুনিয়াছিল, মৃত্যুর সময় যমদূতেরা লইতে আসে, তবে ত গৃহ তখন যমদূতে—ভূত প্রেতে পরিপূর্ণ! জবা শিহরিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদসঞ্চার হইল। যে মুখ—যে চক্ষু সর্ব্বদা জবার সহায়, ভরসা, আশ্রয় ছিল—তাহা ক্রমে জবার ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। জবা আর সে মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

জবা প্রদীপ নিভাইয়া দিল। আলোক ছিল ভাল; অন্ধকারে জবা অধিক বিচলিত হইল। তাহার মনে হইল, দেবযোনিরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে—বুঝি শ্যামার প্রেতাত্মাও তাহাদের সহিত মিলিয়াছে। জবা অন্ধকারে শ্যামার কাঠের সিন্দুকের দিকে গেল। শ্যামা বলিয়াছিল, ঐ সিন্দুকে জবার জন্য শ্যামা পঞ্চাশটি টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। উহাতে জবার গহনাও ছিল। কিন্তু জবা অদ্য অর্থ বা অলঙ্কার চায় না। জবা চায় তাহার মৃত স্বামীর ক্ষুর! যখন মুমূর্ষু শ্যামা রোগশয্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, তখন জবা স্থির করিয়াছিল, সদানন্দ অথবা অন্য কেহ ইহজগতে তাহার অভিভাবক হইতে পারে না। জবা বিচার করিয়াছিল, যদি তাহার দ্বিতীয় অভিভাবকের অধিকার

থাকিত, সমাজ এত দিন তাহাকে সে অভিভাবক দান করিত। মুসলমানদের তাহা হয়, হিন্দুর হয় না। সদানন্দ! তুমি আমার নিকট চিরসুন্দর—কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে, তুমি যে তাহার অভিভাবক। তুমি ব্রাহ্মণ—জমীদার; আমি শূদ্র—অনাথা। ঠাকুরাণী যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিল, সে তাহার আন্তরিক কথা নয়—সে একটা আলেয়া! তাই জবা স্থির করিয়াছিল, জীবনের এ পার অন্ধকার—তাহাতে যে আলোক দেখা যায়, সে আলেয়া মাত্র, নিমেষে মিলাইয়া যায়। পর পার—সেও অন্ধকার, কিন্তু সেখানে আশা আছে। সেখানে যাইতেই হইবে, তবে বিলম্বে লাভ কি? সদানন্দ! তুমি মৃণালিনীকে লইয়া সুখী হও—পার যদি জন্মান্তরে আমার হইও।

তাই জবা স্বামীর ক্ষুরের সন্ধান করিতেছিল। অন্ধকারে বিকৃতমস্তিষ্ক জবা চঞ্চলহৃদয়ে কম্পিতহস্তে তাহা খুঁজিয়া পাইল না; অথবা ভাল করিয়া খুঁজিবার ভরসা হইল না। সিন্দুক মৃত্যুশয্যার এত সন্নিহিত যে, একবার মৃতার হস্তে জবার পদ স্পৃষ্ট হইল। জবা মনে করিল, বুঝি প্রেত-দেহ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। জবা আর সে ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। অর্গল উন্মুক্ত করিয়া জবা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে নদীতীরে উপস্থিত হইল। তার পর?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিমারণ্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

থুলিং মঠের উত্তর সীমা শতদ্রু নদী। পশ্চিম সীমা চাপ্‌রাঙ্গের পর্ব্বতশ্রেণী। দক্ষিণেও উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতসমূহ। পূর্ব্বে মৃণ্ময় উচ্চ পর্ব্বত। ইহার মধ্যস্থ সমতল ভূমিতে থুলিং মঠ সংস্থাপিত। মঠের চতুর্দ্দিকেই শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মঠ-প্রাচীরের বাহিরে অধিবাসীদিগের বাস। দূর হইতে এই স্থানটি একটি সহরের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। আমরা প্রথমে আসিয়াই মঠ-প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই মঠ-প্রাচীরের মধ্যে লামা ও ডাবাদের বাসস্থান। বিষ্ণু সিংহ আমাদিগকে লামার বাটীতে লইয়া গেল।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, ক্ষুধায় পিপাসায় অধীর হইয়াছি। চামর হইতে

অবতীর্ণ হইবারও শক্তি নাই। বিষ্ণু সিংহ ও একটি লামা আমাকে চামর হইতে অবতরণ করাইল; আস্তে আস্তে দোতালার উপর উঠাইয়া দিল। লামাটি অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার দশা দেখিয়া যথেষ্ট চা ও ছাতু আহারার্থ দিলেন। আমি আহার করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। এখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল, চলিবারও শক্তি হইল। আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, এই লামার বাড়ীটিও প্রকাণ্ড প্রাচীরে বেষ্টিত। ছাগল, ঘোড়া, চামর, ভেড়া প্রভৃতি গ্রাম্য পশু প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা রহিয়াছে। অনেকগুলি বিদেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরাও এখানে আশ্রয় লইয়াছে। লামা তাহাদের সহিত হিসাবপত্র করিতেছেন, এবং লবণ ও সোহাগা ওজন করিয়া দিতেছেন। লামা এক জন মস্ত ব্যবসায়ী ও আড়তদার। তাঁহার আড়তেই আজ আমি অতিথি। তিনি নিম্নতলার একটি ঘর আমার সঙ্গী ও ভৃত্যদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন, এবং আমার থাকিবার জন্য উপরতলায় একটি ঘর দিলেন। এই বাড়ীটি দোতালা। প্রাচীর প্রস্তরনির্ম্মিত। একতালাও প্রস্তরনির্ম্মিত। দোতালা কাষ্ঠনির্ম্মিত। দোতালার উপরে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারি দিকে চারিটি ঘর। ঘরের সম্মুখে ঘেরা বারেণ্ডা, সেই বারেণ্ডায় লামার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরটিতে লামার শয্যাগৃহ। সম্মুখের ঘরটিতে দেবালয়। দেবালয়ের পার্শ্বস্থ গৃহে লামার তোষাখানা, এবং অপর ঘরটিতে অতিথিশালা।

আমি কিছুক্ষণ এ দিক ও দিক ভ্রমণ করিয়া উপরে আসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অদ্য আর মঠ-দর্শনের সুবিধা নাই। সন্ধ্যার পর অনেকগুলি লামা ও ডাবা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মঠ সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, থুলিং মঠই এ অঞ্চলের মঠ সকলের শ্রেষ্ঠ, এবং থুলিং মঠের লামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লামা, এই কথা সত্য কি?" আমার কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে এক জন লামা বলিলেন, "সত্য কি? এ কথা খুব: সত্য। তিব্বতদেশীয় লোকেরা ও তিব্বতের প্রধান লামা এই মঠকে এই অঞ্চলের প্রধান মঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, পূর্ব্বে এই মঠেই বদরীনারায়ণ ছিলেন, আমরা অনাচারী হইয়াছি বলিয়া বদরীনারায়ণ এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এখন যে বদরিকাশ্রমে বদরীনারায়ণ দেখিতেছেন, ইহা কোনও কাশী-লামার প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বদরীনারায়ণ এই স্থান হইতে

অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। থুলিং মঠ, অর্থাৎ স্থল-মঠ। যখন পৃথিবী জলমগ্ন হন, তখন এই স্থানে স্থল ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত স্থান জলনিমগ্ন ছিল। তাহার পর জল সুরিয়া যাওয়াতে তাহার মধ্যে স্থল বাহির হইয়াছে। সুতরাং এই আদিম স্থানকে এই দেশের লোকেরা মহাতীর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। এই মঠের প্রধান লামা এক্ষণে এখানে নাই। তিনি তপস্যা করিবার নিমিত্ত অন্য পর্ব্বতগুহায় গিয়া বাস করিতেছেন। থুলিং মঠের লামার শক্তি অপরিসীম। কোনও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোক এই মঠের লামার আসনে আসীন হইতে পারেন না। যিনি যোগী, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী, তিনিই লামার আসন অধিকার করিয়া থাকেন। এখানকার প্রধান লামা লাসার প্রধান লামা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যদি সেই লোক কোনও প্রকার দোষে দূষিত হন, তবে তিনি এই মঠের লামার আসনে উপবেশন করিবামাত্র আসন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। এই আসনের প্রভাব আমরা অনেকবার দর্শন করিয়াছি। আমাদের এই মঠের লামার রাজার অধিকার আছে। ইনি রাজ্যশাসন বিষয়েও দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা। ইহার নিকটবর্ত্তী চাপরাঙ্গেরও এক জন রাজা আছেন। তিনিও ইঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোনও রাজকার্য্য করিতে পারেন না। ইনি চাপ্‌রাঙ্গের রাজাকে নিযুক্ত করিতে পারেন না, কিন্তু বরখাস্ত করিতে পারেন। এই রাজ্যের সমস্ত রাজাই লাসা হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন। কৈলাস, খুজ্‌রুনাথ ও মানস সরোবরের মঠ ভিন্ন প্রায় ১০০ মঠ আমাদের লামার অধীন। সেই সব মঠের লামার পদ শূন্য হইলে লাসার প্রধান লামার সম্মতি লইয়া ইনিই লামা নিযুক্ত করেন, এবং লামা ও ডাবাদিগের বিচার ইঁহার হাতেই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন ত আপনাদের প্রধান লামা এখানে নাই; এখন মঠের কার্য্য কে চালাইতেছে?" লামা উত্তর করিলেন, "আমার উপরেই মঠের কার্য্যের ভার অর্পিত, কিন্তু আমি গদীতে বসিতে পারিব না; গদীর নিম্নে বসিয়া সকল কার্য্য চালাইব। রাত্রিতে আমার এখানে থাকিবার অনুমতি নাই। আমি মঠের কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতস্থ গুহায় রাত্রি যাপন করিব, এবং প্রাতঃকালে আসিয়া মঠের কার্য্য করিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, আপনি কখন গুহাতে যাইবেন?" লামা বলিলেন, "শীঘ্রই যাইব। লামা ও ডাবাদের আহারাদি সম্পন্ন হইলেই বাঁশী বাজিবে। বাঁশী বাজিলেই আমি গিয়া সমস্ত ঘর বন্ধ করিব। সদর দুয়ারে চাবী দিব।

এক জন লামা বা এক জন ডাবা বাহিরে থাকিতে পারিবেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে ত আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম; ইহাতে আমার অনেক অপরাধ হইয়াছে।" লামা বলিলেন,"না; ইহা আমার কর্ত্তব্য। আপনি কাশীর লামা. সুতরাং আমাদের গুরুস্থানীয়, এখন আবার আপনি আমাদের অতিথি। আপনার অভ্যর্থনা করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি।"

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময় মন্দির হইতে বংশীধ্বনি হইল। লামা ত্রাস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; এবং বলিলেন, "কল্য কখন আপনি মঠ দেখিতে যাইবেন?" আমি বলিলাম, "প্রাতঃকালেই যাইব।" লামা বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই। প্রাতঃকালে আমি আসিয়াই আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" লামাকে বিদায় দিয়া আমি শয়ন করিলাম। লামার সঙ্গে আরও অনেক কথা হইয়াছিল;" কিন্তু সকল কথা আমার মনে নাই। তবে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনারা কাহার উপাসক?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমাদের মঠে সকলপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে, এবং শাক্য মুনির মূর্ত্তি আছে—কেহ কেহ শাক্যমুনির উপাসনা করেন। কিন্তু প্রধান লামা ও তাঁহার অনুগত শিষ্যেরা মহাকালীর উপাসক। এখানে এক মহাকালীর মূর্ত্তি আছে। তাঁহার মুখ অন্ত লোকে দর্শন করিতে পারে না। যখন আমরা উপাসনা বা জপ করিতে যাই, তখন ঐ মূর্ত্তির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া জপ ও উপাসনা কার্য্য সমাধা করিয়া থাকি। আসিবার সময় আবার সেই মূর্ত্তির মুখ বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়া রাখি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই দেবীমূর্ত্তি অপরে দর্শন করিতে পারে না কেন?" লামা উত্তর করিলেন, "অতি পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি সকলেরই দর্শনযোগ্য ছিলেন; একবার এক জন লোককে দেবীমূর্ত্তি গ্রাস করেন; সেই অবধি এই মূর্ত্তির মুখ কাহাকেও দেখিতে দিই না। এই দেবী-গৃহের দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে; লামারা ভিন্ন অন্ত কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কোন্ কোন উপকরণে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন?" লামা উত্তর করিলেন, "মদ্য, মাংস, চা, ও ছাতু।"

সে যাহা হউক, পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিলাম, তৎপর কিছু চা ও ছাতু খাইয়া লামার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে কতকগুলি চাবী হস্তে করিয়া লামা উপস্থিত হইলেন। আমি লামাকে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলাম। লামা

বলিলেন, "এখন বসিবার সময় নহে, মন্দির দর্শনের সময় উপস্থিত; আপনি চলুন।" আমি লামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবদর্শনে বহির্গত হইলাম। লামা প্রথমতঃ মন্দিরের গেট পার হইয়া একটি প্রকাণ্ড হলের মধ্যে আমাকে লইয়া গেলেন। সেই হলের দৈর্ঘ্য—শত হস্তের কম হইবে না। প্রস্থে ৫০ পঞ্চাশ হস্ত। এই প্রশস্ত হলটি উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা। আমি হলে প্রবেশ করিয়াই দেখি, হলের মধ্যস্থলে রাস্তা, উভয় পার্শ্বের মৃত্তিকার বেদীতে দেবমূর্ত্তি সুসজ্জিত। আমি এই সকল দেবমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে একেবারে হলের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, একটি সুবৃহৎ দেবীমূর্ত্তি একটি প্রশস্ত ও উচ্চ বেদীতে স্থাপিত। মূর্ত্তিটি দশভুজা, ত্রিনয়না, সিংহবাহিনী রং হরিতাল-নিভ, মুখ সহাস্য, দেখিলেই বোধ হয় তিনি দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিবার জন্য এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। এই দেবীমূর্ত্তিদর্শনে প্রাণ মন মুগ্ধ হয়, পাষণ্ডেরও ভক্তির উদয় হয়। একবার দেখিলে আর নিমিষ পড়ে না। আমি অনিমিষনয়নে দর্শন করিতে লাগিলাম। লামা বলিলেন, "এখানে বিলম্ব করিলে হইবে না; আরও অনেক দেবতা দর্শন করিতে হইবে।" অনিচ্ছা সত্বেও আমি লামার সঙ্গে চলিলাম। এখানে যে সব মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা আমাদের দেশে নাই। পুরাণে তন্ত্রে যে সকল মূর্ত্তির নাম ও ধ্যান আছে, অনেক মূর্ত্তি সেই সকল ধ্যানের সঙ্গে মেলে। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে দেবমূর্ত্তি, দেবীমূর্ত্তি, ঋষিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রসভার মূর্ত্তিই অধিক। বৌদ্ধমূর্ত্তিও অনেক আছে। সেই বিষয়ে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তির কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এই সব মূর্ত্তি তাম্র, পিত্তল, অষ্টধাতু ও মৃত্তিকায় নির্ম্মিত।সকল মূর্ত্তিই সুঠাম ও সুগঠিত। এক কথায় বলিতে গেলে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা বহু শত বৎসর এই নির্জ্জনে পরিশ্রম করিয়া এই সকল মূর্ত্তিতে আপনার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। লামার তাড়নায় এই দেবালয় হইতে বাহিরে আসিতে হইল। বাহিরে আসিয়াই প্রধান মন্দিরের প্রবেশদ্বার। বামে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। লামা এই সময় আমার সঙ্গীদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিলেন, এবং নিজে সেই ক্ষুদ্র মন্দিরের চাবী খুলিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। লামার সঙ্গে সঙ্গে আমি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলে, লামা আবার ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিলেন, এখানে দশ বারটি আলোক জ্বলিতেছিল, সুতরাং মন্দিরের কোথায় কি আমি দেখিতে পাইলাম। লামা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "ইনিই আমাদের উপাস্য দেবীমূর্ত্তি, ইঁহাকে আপনি প্রণাম করুন, এবং আমি এই মূর্ত্তির মুখ খুলিয়া দিতেছি, আপনি দর্শন করুন।" মূর্ত্তির মুখাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, ইনি দক্ষিণা কালিকা, অতিভীষণ মূর্ত্তি, মুখের

দিকে চাহিলে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। মনে হয়, মা অসুর-নাশিনী হইয়া দৈত্যকুল বিনাশ করিতেছেন ও ভক্তকে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন, মা লোলজিহ্বা, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, গলে মুণ্ডমালা, হস্তে ছিন্ন মস্তক, অসি, বর ও অভয়। এমন জীবন্ত মূর্ত্তি আমি কখনও কোথাও দেখি নাই। এই মূর্ত্তির নিকট লামা তিব্বতীয় ভাষায় স্তব পড়িতে লাগিলেন; গভীর নিনাদে ডম্বুরু বাজাইতে লাগিলেন। এই স্তব ও বাদ্যে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, এবং আমিও সপ্তশতী চণ্ডীর স্তোত্রাদি মাহাত্ম্য পাঠ করিতে লাগিলাম। আমাদের পাঠ শেষ হইলে লামা মায়ের মুখে আবরণ দিলেন। আমরা উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। আমি বাহির হইবার পর লামা মন্দিরের দ্বারে চাবী লাগাইলেন।

এই মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের দ্বারদেশে আমার সঙ্গীরা আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরের গবাক্ষ অথবা দ্বার অধিক নাই। ঘন অন্ধকারে আবৃত। সম্মুখের মনুষ্য-দিগকেও দেখা যায় না। লামা আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দিরের ভিতরে লইয়া গেলেন। মন্দিরের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এই সব ঘৃতপ্রদীপই মন্দিরের ও মন্দিরস্থ দেবতার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রথম স্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃতপ্রদীপ। এক একটা প্রদীপে এক মণেরও অধিক ঘৃত জ্বলিতেছে। দ্বিতীয় স্তরের প্রদীপগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এইরূপে একবিংশতি স্তরেতে প্রদীপ সুসজ্জিত। এই মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তি শাক্য মুনির। শাক্য মুনি হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মূর্ত্তি স্থির ও গম্ভীর; দেখিলে বোধ হয়, মহামুনি শাক্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। মূর্ত্তিটি লম্বে ১৩ কিংবা ১৪ হাত। এই মূর্ত্তির আসন সমতল ভূমি হইতে ১৫।১৬ হাত উচ্চে। তাহার পর সারি সারি প্রদীপ-শ্রেণী। এই দীপ-শ্রেণীর আলোকে এখন মন্দিরের কোনও কোনও অংশ দেখিতে পাইলাম। এই মন্দিরটি পূর্ব্বোক্ত মন্দির অপেক্ষাও বৃহৎ। মধ্যে ৩২টি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগুলিকে আশ্রয় করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে লামারা বসিয়া আছেন। কেহ পাঠ করিতেছেন, কেহ পড়াইতেছেন, কেহ ডম্বুরু বাজাইতেছেন, কেহ ভজন করিতেছেন। সকলেই স্থির, ধীর ও গম্ভীর। কাহারও মুখে অন্য শব্দ নাই, কেবল শাস্ত্র-পাঠ চলিতেছে। লামাগণের সম্মুখে ডাবাগণের আসন। তাঁহারাও পাঠ করিতেছেন। প্রধান মূর্ত্তিও লামাগণের আসনের সম্মুখে একটি সর্ব্বতো-ভদ্রমণ্ডল। এই মণ্ডলের উপর লামারা পূজা করেন। আমি ইঁহাদিগকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া একটি ক্ষুদ্রপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আর একটি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

ক্রমশঃ

দেশের কথা।

আমাদের ইতিহাস নাই। কারণ, ইতিহাস নামধেয় কোনও পুরাতন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে স্থির হইয়া গিয়াছে,—আমাদের ইতিহাস ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইয়া গিয়াছে,—ইতিহাস রচনা করিবার প্রতিভা ছিল না বলিয়াই, আমাদের ইতিহাস ছিল না।

অন্যান্য বিষয়ে প্রতিভার অভাব ছিল না। অনন্ত নভোমণ্ডলের অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের ন্যায় কঠিন শাস্ত্রের অনুশীলন করিবার প্রতিভা ছিল। অতল সমুদ্রতল হইতে মণিমুক্তা আহরণ করিয়া অলঙ্কার গঠন করিবার প্রতিভা ছিল। তদপেক্ষা অধিক অতলস্পর্শ মানব-মনের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া মনস্তত্ত্বের আলোচনায় বিবিধ দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থরচনার প্রতিভা ছিল। কেবল সর্ব্বজনবিদিত সাংসারিক ঘটনানিচয়ের ধারাবাহিক কাহিনী লিখিয়া রাখিবারই প্রতিভা ছিল না। কথাটা চিরদিনই কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধানে যত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ততই তাহা অধিক অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে।

আমাদের ভাষায় ইতিহাস শব্দটি চিরদিন প্রচলিত আছে। স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে—বৈদিক সাহিত্যের প্রথম বিকাশের সূত্রপাত হইতে, এই শব্দটি আমাদের সকল যুগের সাহিত্যেই প্রচলিত আছে। ইতিহাসের লক্ষণ কি, (১) "সামাণ্য-বিশেষবতা-লক্ষণেন" তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই সকল লক্ষণ ধরিয়া, তাহাকে পুরাণ নামক সুপরিচিত গ্রন্থ হইতে পৃথক্ শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইবার কারণ-পরম্পরারও অভাব নাই। (২) কেবল ইতিহাস নামধেয় গ্রন্থ ছিল না, কিন্তু ইতিহাস শব্দটি ছিল, তাহার লক্ষণ কি, তাহাও অপরিচিত ছিল না,—এরূপ সিদ্ধান্তে স্বভাবতই আস্থা স্থাপন করিতে সাহস না হইবারই কথা। তথাপি 'সাহেব'দিগের

---

(১) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

(২) রামায়ণে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেখাদেখি, আমাদের দেশেরও অনেক লেখক অবনতমস্তকে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া, কেহ "হা হতোঽস্মি" করিয়া থাকেন, কেহ বা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন! কথাটা কত দূর সত্য, তাহার বিচার-কার্য্য আরব্ধ হয় নাই। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রমাণ-আবিষ্কারের নিতান্ত অভাব ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, অনেকগুলি কথার বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথম কথা,—অন্যান্য দেশে যে প্রয়োজনসাধনের জন্য ইতিহাস-সংকলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, আমাদের দেশে কখনও সেরূপ প্রয়োজন বর্ত্তমান ছিল কি না? দ্বিতীয় কথা,—প্রয়োজন বর্ত্তমান থাকিলেই হইল না, সেরূপ প্রয়োজন প্রকৃত প্রয়োজন বলিয়া কখনও অনুভূত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না? তৃতীয় কথা,—আমাদের দেশে ইতিহাস কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছিল; তাহা কি কখনও লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই? চতুর্থ কথা,—যদি কখনও সেরূপ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত, তবে তাহা কোথায় গেল? পঞ্চম কথা—বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, বিলুপ্ত হইবার কিরূপ অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত হইয়াছিল? শেষ কথা,—সাহিত্য একবার জন্মগ্রহণ করিলে, সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে না, কিছু না কিছু পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। আমাদের দেশে পুরাকালে ইতিহাস রচিত হইবার কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না? একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এক সঙ্গে এতগুলি কথার আলোচনা শেষ করিতে হইলে, নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবেই সকল কথার আলোচনা করিতে হইবে। তাহাতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিফল হইবার আশঙ্কা নাই। বিষয়টির যথাযোগ্য বিচারকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য সাহিত্যিকগণকে আহ্বান করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিচারকার্য্য আরব্ধ হউক,—সত্য কালক্রমে অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করিবে।

আমাদের দেশের যে সকল কথার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত নানা উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এখনও অনেক কথার বিশ্বাস্য প্রমাণ আবিষ্কার করিবার আশায় সমগ্র সভ্যসমাজের পুরাতত্ত্বনিপুণ সুপণ্ডিতবর্গ আন্তরিক অধ্যবসায়ের সহিত তথ্যাবিষ্কারে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের কল্যাণে আমরা জানিতে পারিয়াছি,—আমাদের দেশে অতি পুরাকাল হইতে রাজ্য ছিল, রাজ্যস্থাপনের ও রাজ্যশাসনের প্রতিভার ও ক্ষমতার অভাব ছিল না, ভারতবর্ষের বাহিরেও—বহুদূর

পর্য্যন্ত—জলে স্থলে—আমাদের প্রভাববিস্তারের জন্য সমুচিত অধ্যবসায়েরও অভাব ছিল না। এই সকল কার্য্যসাধনের জন্য বিবিধ ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন যে পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে অতি পুরাকাল হইতে বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া লোকসমাজকে নানা তত্ত্বের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তাহাদের অনুষ্ঠিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিশুদ্ধিরক্ষার্থ গুরুপরম্পরাগত উপদেশাবলী ধারাবাহিকরূপে রক্ষা করিবার প্রয়োজনে সম্প্রদায়গত ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা যে পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যান্য দেশে যে সকল প্রয়োজনসাধনের জন্য ইতিহাস-সংকলনের সূত্রপাত হইয়াছিল, আমাদের দেশেও যে তাহার সকল শ্রেণীর প্রয়োজনই বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সংশয়প্রকাশের কারণ নাই।

এই প্রয়োজন প্রকৃত প্রয়োজন বলিয়া পুনঃপুনঃ অনুভূত হইবার অনেক কারণ ছিল। রাজ্য ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ ছিল, সন্ধিবন্ধন ছিল, স্বদেশের ও বিদেশের মধ্যে নানা স্থানে দূতাদি প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল, বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে নানা রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা ছিল, এবং অনেক সময়ে বংশকীর্ত্তনাদি দ্বারা পূর্ব্বকাহিনীর পরিচয়-প্রদানেরও প্রয়োজন উপস্থিত হইত। এখনও পুরাতন সাহিত্যে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল প্রয়োজন যে প্রকৃত প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনরূপ ইতিহাস না থাকিলে, এই সকল প্রয়োজন অন্য কোন্ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

এই সকল কারণে, কোনও না কোনও শ্রেণীর ইতিহাস প্রচলিত থাকা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইলেই, লিখিত ইতিহাস প্রচলিত থাকা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লিখিত ইতিহাস প্রচলিত থাকিবার কোনরূপ প্রমাণ না থাকিলেও, তাহা নিতান্ত অসম্ভব সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। কিন্তু লিখিত ইতিহাস প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

লিখিত ইতিহাস যে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রমাণের

অনুসন্ধানকার্য্যে কেহ সমধিক যত্ন প্রকাশ করেন নাই। কবি কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে যাহা কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—পুরাকালে ইতিহাসের গ্রন্থের একেবারে অভাব ছিল না। তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থবিলোপের কারণ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ তিরোহিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে তাহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিভাত হয়। সাধারণতঃ মুসলমানের স্কন্ধেই গ্রন্থ-নাশের সকল অপরাধ ন্যস্ত হইয়া আসিতেছে। তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক কল্পনা বলিয়া, তাহার অধিক আর কোনরূপ কারণের অনুসন্ধানের জন্য কেহ ক্লেশ স্বীকার করিতে সম্মত হন না। কিন্তু মুসলমানের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেও আমাদের দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের অভাব ছিল না, লুণ্ঠন নরহত্যা অপরিচিত ছিল না, পরাজিত জনপদ অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইবার অসদ্ভাব ছিল না। দেশ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায়, বহুবার বহু বিপ্লব আমাদের দেশকে উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। তাহাতে কাঙ্গালকুটীর সকল সময়ে বিপর্য্যস্ত না হইলেও, রাজভবন পুনঃপুনঃ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। যেখানে ইতিহাসের লিখিত ভাণ্ডারের অবস্থান, তাহা এইরূপে পুনঃপুনঃ বিপর্য্যস্ত হইবার সময়ে গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইবার কারণ সংঘটিত হইয়াছে।

ইতিহাসের সহিত রাজার ও রাজপুরুষবর্গের সংস্রব কিছু অধিক থাকায়, জনসাধারণের পক্ষে ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই শ্রেণীর সমুদয় গ্রন্থ নকল করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবার কথা ছিল না। যতদিন দেশের শাসনকার্য্যে দেশের লোকের কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল, ততদিন জনসাধারণের পক্ষেও ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইতিহাসের গ্রন্থ নকল করিয়া রাখিবার যাহা কিছু প্রয়োজন অনুভূত হইত, পরাধীনতার যুগে, সে প্রয়োজনও আর অনুভূত হয় নাই। সুতরাং যে কারণে সংক্ষিপ্তসার সংকলিত হইবার পর অনেক মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই স্বাভাবিক কারণেই—প্রয়োজনের অভাবে—ইতিহাসের গ্রন্থও একে একে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য কেবল মুসলমানকেই অপরাধী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়া আলোচনা করিলেও, ইতিহাসের গ্রন্থ লিখিত ও প্রচলিত হইবার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও সংকলিত হইতে পারে। তারানাথের গ্রন্থে এক

শ্রেণীর প্রমাণের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তারানাথ এক জন বৌদ্ধ শ্রমণ, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু তাঁহার জীবন-কাহিনীর অতি অল্প কথাই বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত। তারানাথ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে তদ্দেশের ভাষায় একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা নিতান্ত আধুনিক সময়ের ঘটনা হইলেও, তাঁহার গ্রন্থে পুরাকালের অনেক তথ্য উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থের সকল কথাই আমাদের কথা। কিন্তু ইহা আমাদের ভাষায় অনূদিত হয় নাই। আমাদের সাহিত্যেও ইহার যথাযোগ্য আলোচনা স্থানলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তারানাথের গ্রন্থ সভ্য-সমাজের সুধীবর্গের নিকট অপরিচিত নাই। এই গ্রন্থ এক জন রাসায়নিকের (৩) যত্নে আবিষ্কৃত হইয়া, আর এক জন অধ্যবসায়শীল সাহিত্যিকের (৪) যত্নে জর্ম্মণ ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। কোন কোন ইংরেজ-লেখক তাহার কোন কোন অংশ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ও সংকলিত করিয়া গিয়াছেন। (৫) এইরূপে তাঁহাদের কৃপায় এই গ্রন্থের কিছু কিছু বৃত্তান্ত অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবার পর, এত কালেও তাহা যথাযোগ্য ভাবে বঙ্গভাষায় আলোচিত হয় নাই।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথের গ্রন্থ সংকলিত হয়। তৎকাল পর্য্যন্ত যে সকল ইতিহাসের গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, তিনি উপসংহারে তাহার পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—"যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এই গ্রন্থ কোন্ কোন্ গ্রন্থকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লিখিত হইল, তিনি জানিয়া রাখুন,—তিব্বত দেশে সময়ে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-মূলক নানা গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হইয়া থাকিলেও, আমি এ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীর কোনও ধারাবাহিক ইতিহাসের গ্রন্থের সন্ধান লাভ করিতে না পারিয়া, দুই একটি সুপরিচিত কাহিনী ব্যতীত, অন্যান্য বৃত্তান্তের জন্য তিব্বতীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তাহা হইতে বিবরণ-সংকলনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। মগধের পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্রের গ্রন্থের যেরূপ

---

(৩) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে Vassiliev কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত।

(৪) ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Schiefuer কর্ত্তৃক জর্ম্মণ অনুবাদ প্রকাশিত।

(৫) Heeley ও Miss E Lyall কর্ত্তৃক অংশতঃ ইংরাজি ভাষায় অনূদিত ও সংকলিত। তাহারই কোনও কোনও অংশ কনিংহাম, হাভেল প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

ব্যাখ্যা গুরুপণ্ডিতগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে সেই গ্রন্থকেই আবার গ্রন্থের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ক্ষেমেন্দ্রভদ্রের গ্রন্থে রাজা রামপালের শাসন সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিত আছে। এই গ্রন্থ ব্যতীত আরও দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমার ইতিহাস সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। একখানির নাম 'বুদ্ধ-পুরাণ',—ইন্দ্রদত্ত নামক জনৈক ক্ষত্রিয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত ;—তাহাতে সেনবংশের চারিজন নরপতির শাসন সময় পর্য্যন্ত নানা ঘটনা ১২০০ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। আর একখানি পণ্ডিত ভটঘটি নামক ব্রাহ্মণের বিরচিত বৌদ্ধাচার্য্যগণের ধারাবাহিক বিবরণ।" (৬)

এই শ্রেণীর ইতিহাসের গ্রন্থ এখন এ দেশে দুর্ল্লভ, অথবা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলেও, তাহার নকল নেপাল, তিব্বত ও চীনদেশে এখনও প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস নাই বলিয়া "হা হতোঽস্মি" করিয়া যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কলরবে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সকল গ্রন্থের অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য এখনও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন নাই। তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, গৃহে বসিয়া ইতিহাস রচনা করিবার বিড়ম্বনাই এখনও আমাদিগকে সাহিত্য-সেবার গৌরবলাভের জন্য লালায়িত করিয়া রাখিয়াছে!

---

(৬) If any one ask on what authorities this work depends, let him know that although many fragmentary histories of the origin of the (Budhist) religion, and stories, have been composed in Tibet, I have not met with any complete and consecutive work ; I have, therefore, with the exception of a few passages, the credibility of which proves their truth, taken nothing from Tibetan sources. As, however, I have seen and heard the comments of several Guru-Panditas on a work in two thousand *slokas* composed by KSHEMENDRABHADRA, a Pundita of Magadha, which narrates the history as far as King Ramapalà, I have taken this as my foundation, and have completed the history by means of two works, namely the *Budhapurana*, composed by Pandita INDRADATTA of a Kshatriya family, in which all the events up to the four Sena Kings are fully recorded in 1200 *slokas*, and the ancient History of the Succession of Teachers (âchâryas) composed by the Brahman Pandita BHATAGHATI.—Extracts from Taranath's History of Buddhism in India, by W. L. Heeley, B. C. S., published in the Indian Antiquary. Vol. iv, pp. 101—104.

এখনও তথ্যানুসন্ধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইলে, নানা বিবরণ সংকলিত হইবার আশা আছে। সাহারার মরুভূমির মধ্যে, মধ্য আফ্রিকার সিংহশার্দ্দূলাক্রান্ত ও তদপেক্ষা নৃশংসতর নরখাদক মনুষ্যসমাজাধিকৃত দুর্গম দেশে তথ্যাবিষ্কারের জন্য যাঁহারা জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহাদের তুলনায় আমাদের পক্ষে আমাদের দেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া কত সহজ, কত স্বাভাবিক, কত প্রীতিপ্রদ! অনেকবার এ দেশে সাহিত্যসম্মিলন হইয়া গেল, আবারও উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছে;—কিন্তু ইহার কথা কে বলিবে, কে শুনিবে, এই মহাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য কাহারা গৃহকোটর ছাড়িয়া বাহির হইবে, কাহারা উত্তরসাধক হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয়দান করিবে,— এখনও তাহার অধিক পরিচয় সংকলিত করিতে পারি নাই। আবার ঢক্কানিনাদে সাহিত্যসম্মিলনের উৎসব সূচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাহাতে কি ইহার কথা আলোচনা করিবার জন্য পাঁচ মিনিটের অধিক মহামূল্য সময় নষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া কেহ ধৃষ্টতা-প্রকাশে সাহসী হইবেন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হাসি ও অশ্রু।

হাসির সোনার রেখা যেখানে যেখানে ফুটে,
অশ্রু-মুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিমান্;
আনন্দ করুণা মাঝে সুন্দরের ছবি উঠে,
দু'টি সুরে ঝঙ্কারিত বিশ্ব-বন্দনার গান!
এখানে ঝরিছে অশ্রু, ওখানে হাসির মেলা,
বরিষার পাশে যেন শরৎ দিতেছে দেখা,—
অবিরাম—অবিরাম হাসি অশ্রু করে খেলা
এ বিশ্বের ছবিখানি হাসি অশ্রু দিয়ে লেখা!
দিন আসে, দিন যায় বিলায়ে বিমল হাসি,
নিশি আসে নিশি যায় বরষিয়া অশ্রুকণা;
মানবের সুখ দুঃখ, স্নেহ—ভালবাসাবাসি,
মাধুরী-মন্দির মাঝে হাসি-অশ্রু আলিপনা!
কাঁদিয়া জনম গেল!—যাক্ তাহে ক্ষতি নাই,
অশ্রু-বিম্বে বিম্বে যদি সুন্দরের দেখা পাই!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

হিমারণ্য।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

সেই গৃহেতে অতি বিশাল বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। আমি একখানি মইতে চড়িয়া মূর্ত্তির পাদস্পর্শ করিলাম। এই মূর্ত্তি যোগাসনে আসীন, ধ্যানে নিমগ্ন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একটি গলির মধ্যে পড়িলাম। এই গলিটি প্রধান মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরের প্রধান ঘরে প্রবেশদ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত গলির উভয় দিকেই দেবগৃহ, প্রত্যেক গৃহই দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। এই সব গৃহের চাবী লামার হস্তে। লামা এক একটি গৃহ খুলিতেছেন, আর গৃহস্থিত দেবমূর্ত্তি দর্শন করাইতেছেন। প্রথম ৫।৬টি গৃহে বৈদিক মূর্ত্তি। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অর্য্যমা, পুরু ও প্রচেতা-গণের মূর্ত্তি। তাহার পর তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের মূর্ত্তি। তৎপরে পৌরা-ণিক দেবদেবীমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্নও অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম, যাহা কখনও দেখি নাই, বা যাহার বিষয় আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে কোনও উল্লেখ নাই। এই সকল মূর্ত্তি তাম্র, পিত্তল, ও অষ্ট ধাতুর নির্ম্মিত। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি এখানে নাই। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে দশমহাবিদ্যা ও দশ অবতারের মূর্ত্তি উল্লেখ-যোগ্য।

একটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যে অনন্তশায়ী ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি। তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে সুসজ্জিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি। তাহার সম্মুখস্থিত বিশাল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রকোষ্ঠের ঠিক মধ্যস্থলে বিংশভুজা, পদ্মাসনা ও ত্রিনয়না অতি-বৃহৎ দেবীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির প্রত্যেক হস্তই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। এই মূর্ত্তি এত বৃহৎ যে, আমি গৃহসমতল হইতে দেবীর হস্ত স্পর্শ করিতে পারিলাম না। এই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে সুসজ্জিত শক্তিমূর্ত্তি। অন্য এক মন্দিরে যাইয়া দেখি, দ্বাদশ ভৈরবমূর্ত্তি। এই সব দ্বাদশ মূর্ত্তির মধ্যে শিবমূর্ত্তি। শিবমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ভূত, প্রেত ও পিশাচমূর্ত্তি। শিবমূর্ত্তিটি শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত; মুক্ত জটা, মস্তক ফণিভূষণে সুসজ্জিত। নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। দেখিয়া বোধ হইল, আমি কৈলাসে আসিয়া প্রত্যক্ষ শিব দর্শন করিতেছি।

এইরূপে আমি ১০৮টি মন্দির দর্শন করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় প্রধান মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর, লামা বলিলেন, "আপনি

এখন বাসস্থানে যান। আহারান্তে আবার আমি লইয়া আসিয়া অপরাপর স্থান দর্শন করাইব।" লামার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক আমি বাসায় আসিলাম। আহারাদি সমাপন করিতে প্রায় ২টা বাজিয়া গেল।

আহারান্তে আমি বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে লামা আসিয়া উপস্থিত। লামার সঙ্গে কিছুকাল কথাবার্ত্তা কহিয়া পুনর্ব্বার মন্দির-দর্শনে বাহির হইলাম। প্রধান মন্দিরের দ্বারদেশ ভেদ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই একটি সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। সেই সিঁড়িতে আরোহণ করিয়া আমরা দ্বিতলায় উঠিলাম। এই গৃহটি পুস্তকালয়। গৃহের উভয় পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে সুসজ্জিত রাশি রাশি পুস্তক। এই পুস্তকগুলি আমাদের সেকেলে পুঁথি। কাঠের মলাট, রক্তবর্ণ বস্ত্রে বেষ্টিত। লামা আমার অগ্রে অগ্রে গেলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। পথ আর শেষ হয় না। উভয় পার্শ্বে পুস্তকরাশি। এই পুস্তকরাশি ভেদ করিয়া অবশেষে গৃহের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া দেখি, এক জন বৃদ্ধ লামা পুস্তক পাঠ করিতেছেন। ইনিই এই পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ। লামাজি তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। আমাদের পরস্পর অভিবাদন ও পরিচয় আদি শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ পুস্তকালয়ে কত পুস্তক আছে?" তিনি বলিলেন, "৫ লক্ষ।" আমি বলিলাম, "এই অল্প স্থানে ৫ লক্ষ পুস্তক হইবে, ইহা আমার অনুমানে আসে না।" পুস্তকালয়াধ্যক্ষ বলিলেন, "এইরূপ আরও ৩টি গৃহ আছে। অতঃপর আপনাকে সকল গৃহগুলিই দেখাইব।" এই বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং আমাকে সমস্ত ঘরগুলিই দেখাইলেন।

ইহার এক একটি ঘরের দৈর্ঘ্য ৯০ হাত হইতে ১০০ হাত পর্য্যন্ত। প্রস্থ ৩০ হইতে ৪০ হস্ত পর্য্যন্ত। এই সব গৃহে পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আসনে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই পুস্তকালয় কিরূপ প্রাচীন, এবং কি কি পুস্তক আছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "এই মঠ ও পুস্তকালয় যে কত দিনের, তাহা আমি জানি না। তবে আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, কাশী হইতে পদ্মমুনি এই পুস্তকালয় ও দেবমূর্ত্তি সহিত এখানে আগমন করেন। এই মঠ তাঁহার সংস্থাপিত, এবং দেবদেবীমূর্ত্তি তাঁহার দ্বারা আনীত। তিব্বতবাসীরা পূর্ব্বে রাক্ষস ছিল, পদ্মমুনি তাহাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া

মানুষ করিয়া তোলেন। আমরা শাক্যমুনি অপেক্ষা পদ্মমুনিকেই অধিক মান্য করিয়া থাকি। আমি শুনিয়াছি, এই পুস্তকসমূহ কাশীর শাস্ত্র, কেবল তিব্বতীয় অক্ষরে অক্ষরান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষা সংস্কৃত।" যখন অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত এই সকল কথা হইতেছিল, তখন তাঁহার সম্মুখে একখানি পুস্তক ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই পুস্তকের নাম কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "গৌতমা"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই পুস্তকে কি কি লেখা আছে? আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রবণ করান।" তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া আমাকে শ্রবণ করাইলেন। আমি বুঝিলাম, এই সকল গৌতম সূত্র, ভাষা সংস্কৃত, তবে তিব্বতীয় উচ্চারণে দুর্ব্বোধ্য। আমি লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই রাশি রাশি পুস্তক কিরূপে রক্ষা হইতেছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "পঞ্চাশ জন লামা এই সকল পুস্তকের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পুস্তক জীর্ণ হইলে তাঁহারা তাহার প্রতিলিপি করিয়া রাখেন; পুস্তকের পত্র জীর্ণ হইলে সেই পত্রটি নূতন করিয়া লিখিয়া রাখেন, কোনও পুঁথি যদি দুর্ব্বোধ্য থাকে, তাহা সুবোধ্য করিয়া লেখেন, এবং তাঁহারা সকলেই লামা ও পণ্ডিত লোক।" এই সকল পুস্তকের পত্র কাগজের। হিমালয় পর্ব্বতে এক রকম দেশীয় টগর ফুলের অনুরূপ বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষের ছাল বাদ দিয়া মধ্যের অংশ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শত বর্ষেও সেই কাগজ জীর্ণ বা কীট দ্বারা নষ্ট হয় না।

এই পুস্তকালয়ের সম্মুখেই একটি সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির। এই মন্দির এখন শূন্য, পূর্ব্বে এই মন্দিরে বদরিনারায়ণ ছিলেন। এখনও থুলিং মঠের লোকেরা বৈদ্যনাথ-দর্শনে যাত্রা করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রকোষ্ঠ এখন বন্ধ। লামা না আসিলে এই প্রকোষ্ঠ খোলা হয় না। এই পুস্তকালয় দর্শন করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। আমার সঙ্গী লামাও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

আমি আমার বাসস্থানে আসিয়া লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই থুলিং মঠে কতগুলি লামা ও ডাবা বাস করেন? তাঁহাদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহারের বিষয় আমাকে বলুন।" লামা উত্তর করিলেন, "এখানে ১২ শত লামা ও ৪ শত ডাবা বাস করিয়া থাকেন। বৈশাখ হইতে আশ্বিন প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত লামা ও ডাবারা বাণিজ্যব্যবসায়ের জন্য মণ্ডিতে

যাইয়া থাকেন; তাঁহাদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে না। আর ১৩ শত লামা ও ডাবা সর্ব্বদা এইখানেই বাস করেন। যে সকল লামা ও ডাবা বাহিরে যান, তাঁহারা পরীক্ষিতচরিত্র। যাঁহার চরিত্র বিষয়ে প্রধান লামার কণামাত্রও সন্দেহ থাকে, তাঁহাদের শৌচ ও প্রস্রাব ভিন্ন অন্য কারণে মন্দিরের বাহিরে যাইবার হুকুম নাই। লামা ও ডাবারা এক ঘরে থাকেন, এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এক জন বৃদ্ধ লামা কতিপয় যুবক লামা ও ডাবাকে লইয়া এক গৃহে থাকেন, এবং একত্র অধ্যয়ন ও ভোজন করেন, একাকী কেহই বাহিরে যাইতে পারেন না। প্রাতঃকালে প্রভাত হইবার পূর্ব্বে মন্দিরের উপর হইতে বংশীধ্বনি হয়। সেই ধ্বনি শুনিয়া মঠস্থ লামা ও ডাবারা জাগ্রত হইয়া থাকেন। তৎপরে আমি আসিয়া মঠের চাবী খুলিয়া দিই। তখন দল বাঁধিয়া সকলে প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাহিরে যান। ইহার এক ঘণ্টা পরে আবার বংশী-নিনাদ হইয়া থাকে; তখন সকলকেই মন্দিরে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাহার পর আহারের ঘণ্টা হয়। ছাতু ও চা আহার করিয়া লামা ও ডাবারা নিজ নিজ কার্য্যে গমন করেন, এই মঠে গৃহস্থদের থাকিবার নিয়ম নাই। লামা ও ডাবাদিগকে মঠের যাবতীয় কার্য্য করিতে হয়, বেতনভোগী ভৃত্য এই মঠে একটিও নাই। রন্ধন, মন্দির-মার্জ্জন, মন্দিরে প্রদীপ জ্বালা, সমস্ত দেবালয়ের দেবতাদিগকে মার্জ্জন ও সেবা করা লামা ও ডাবাদিগের কার্য্য, পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই ভৃত্যের কার্য্য করিতে হইবে। লামা ও ডাবারা এই মঠ হইতে কেবল অন্ন ও বস্ত্র পাইয়া থাকেন, সকলকেই রীতিমত অধ্যয়ন করিতে হয়, কেহই দিবাতে নিদ্রা যাইতে পারেন না। সকলকেই একটা না একটা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। লামা বা ডাবারা প্রধান লামার অনুমতি ভিন্ন মঠ-প্রাচীরের বহিঃস্থ গ্রামে যাইতে পারেন না, যদি কেহ কখনও প্রধান লামার হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামে যান, তবে তাহাকে মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি কেহ চরিত্র-ভ্রষ্ট বলিয়া ধরা পড়েন, তাহা হইলে, তাহার লামার পোষাক কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং তিনি যতদিন মঠের অন্নবস্ত্র পাইয়াছেন, হিসাব করিয়া তত পরিমাণ টাকা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। যিনি থুলিং মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি তিব্বতের কোনও মঠেই স্থান পাইবেন না।

লামার সঙ্গে এই সমস্ত কথাবার্ত্তায় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল।

তৎপরে মন্দির হইতে বংশীধ্বনি হওয়ায় আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি আপন মঠে চলিয়া গেলেন। আমিও শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। মন্দির-প্রাচীরের বাহিরে নগর। নগরের অধিবাসীরা গৃহস্থ; কৃষি ও বাণিজ্য ইহাদিগের উপজীবিকা; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। আমি যতগুলি নগরবাসী দেখিলাম, সকলেরই পরিধান ছিন্ন কম্বল, আহারও সেইরূপ; কিন্তু মনের অবস্থা খুব ভাল। সকলেরই মুখ হাস্যময়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই আনন্দহীন নহে। নগরবাসীদের গৃহের পরিচ্ছন্নতা একবারেই নাই। ২০।২৫ ঘর গৃহস্থ মৃত্তিকা-গহ্বরে বাস করিতেছে—গৃহ আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ, কাহার সাধ্য, পল্লীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করে। আমি নগরে বাহির হইলে অনেকগুলি নরনারী আমাকে দেখিতে আসিলেন, এবং নানাপ্রকার খাদ্য, ফলমূল উপহার দিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পর আজ মূলা পাইলাম, মূলার শাক পাইলাম। কেহ কেহ শুষ্ক মাংস উপহার দিলেন। এই তো অধিবাসীদের ব্যবহার। মন্দিরের দক্ষিণ সীমায় আড়ৎ। এই আড়তে মানাপাশের লোকেরা আসিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকে। বদরিনারায়ণের এক মাইল উত্তরে কয়েকখানি গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের নামই মানা। এখান হইতে থুলিং মঠে ৫।৬ দিনে যাওয়া যায়। মানাগ্রামবাসীরা অতি বিকট চড়াই ও বরফরাশি অতিক্রম করিয়া থুলিং মঠে যায়। তাহার নাম মানাপাস। মানাপাস সমুদ্র-সমতল হইতে ২২ হাজার ফিট উচ্চ। এই মানাপাসের লোকেরা হিন্দী জানে, এবং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। আচরণ ও আচার ভুটিয়াদের অনুরূপ। মানাপাসের লোকেরা তাহাদের আড়তে আমাকে লইয়া গেল, এবং যথেষ্ট চা ও ছাতু উপহার দিল, আর বলিল, "এই চা ও ছাতু আপনি যত্নপূর্ব্বক লইয়া যাইবেন, রাস্তায় আর আহারীয় কিছুই মিলিবে না।" ক্রমশঃ।

প্রাচীন ভারতে মানহানি ও রাজবিদ্রোহ।

১

মানহানি (বাক্‌পারুষ্যম্)।

অপবাদ, অবজ্ঞাসূচক বাক্য ও ভৎর্সনা—এই তিন প্রকারে মানহানি হয়। শরীর, প্রকৃতি, শিক্ষা, বৃত্তি, জাতীয় চরিত্র, শরীর সম্বন্ধে অপবাদ (যথা অন্ধ ব্যক্তিকে অন্ধ বলিয়া ডাকা, খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ডাকা)—এই সম্বন্ধে কুবচন প্রয়োগ করিলে তিন পণ অর্থ দণ্ড হইবে। মিথ্যাপবাদে ছয় পণ দণ্ড হইবে। যদি অন্ধ কি খঞ্জকে স্তুতিস্বরূপ নিন্দা করা যায় (যেরূপ অন্ধকে 'শোভনাক্ষ', খঞ্জকে 'শোভনদন্ত') তাহা হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। কুষ্ঠী, উন্মাদ, ক্লীবদিগের কুৎসাতেও ঐরূপ দণ্ড হইবে। নিন্দিত ব্যক্তির প্রতি সত্য, মিথ্যা, অথবা নিন্দাসূচক স্তুতি প্রয়োগ করিলে দ্বাদশ পণ, এবং তদূর্দ্ধ অর্থ দণ্ড হইবে।

যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হন, তবে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। যদি নিম্নপদস্থ হয়, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। পরস্ত্রীর নিন্দা করিলে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে।

যদি ভ্রম, মত্ততা, বা মোহের জন্য নিন্দা-বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।

কুষ্ঠ, কি উন্মাদ কি না, এ সম্বন্ধে চিকিৎসক বা প্রতিবেশীর প্রমাণই সমধিক গ্রাহ্য হইবে। ক্লীবত্ব সম্বন্ধে স্ত্রীলোক, মূত্রফেন ও বিষ্ঠা জলে নির্মজ্জিত হয় কি না—এই সকল প্রমাণ গৃহীত হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যাবসায়ীর মধ্যে যদি নিম্নশ্রেণীস্থ কেহ উচ্চশ্রেণীস্থ কাহারও প্রকৃতি সম্বন্ধে অপবাদ দেয়, তবে তিন পণ হইতে উর্দ্ধে আরও দণ্ড হইবে। যদি উচ্চশ্রেণীস্থ কেহ নিম্নশ্রেণীস্থ কাহারও অপবাদ করে, তবে দুই পণের নিম্নে দণ্ড হইবে। 'কুব্রাহ্মণ' এই প্রকার বচনেও উল্লিখিত প্রকারের দণ্ড হইবে।

শ্রুতোপবাদ অথবা বাজীকরদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে অপবাদ করিলে শিল্পী বা বাদ্যকর ও জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধেও এই নিয়ম বর্ত্তিবে।

স্বদেশ বা গ্রামের মানহানি করিলে প্রথম প্রকারের, স্বজাতি বা সঙ্ঘের

মানহানি করিলে মধ্যম প্রকারের, এবং দেবতা ও চৈত্যের মানহানি করিলে উত্তম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে।

২

রাজদ্রোহিতা-নিবারণের ব্যবস্থা।

যে সকল ব্যক্তি রাজার উপজীবী হইয়াও তাঁহার শত্রুতাসাধন করে, অথবা তাঁহার শত্রুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জন্য গুপ্তকার্য্যে নিযুক্ত গূঢ়পুরুষ, অথবা সন্ন্যাসীর বেশে রাজভক্ত গূঢ়পুরুষ নিযুক্ত করিতে হইবে; অথবা (ত্রয়োদশ ভাগে বর্ণিত উপায়াবলম্বনে) মতভেদকরণে সক্ষম গূঢ়পুরুষ নিযুক্ত করিতে হইবে।

বিপ্লবকারী অমাত্য ও অমাত্য-সম্প্রদায়, যাহাদের প্রকাশ্যে দমন করা সম্ভব নয়, রাজা রাজ্যরক্ষার জন্য তাহাদের গোপনে শাস্তি প্রয়োগ করেন।

গুপ্তচর, রাজদ্রোহী মন্ত্রীর ভ্রাতাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া রাজসমীপে সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাইবে। রাজা, রাজদ্রোহী মন্ত্রীর সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতাকে অধিকার ও ভোগ করিতে আদেশ দিয়া, ভ্রাতার দ্বারা মন্ত্রীকে আক্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ভ্রাতা, শস্ত্র দ্বারা বা বিষপ্রয়োগে মন্ত্রীকে হত্যা করিলে, ঐ স্থানেই ভ্রাতৃঘাতী বলিয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে। রাজদ্রোহী পারশব (ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভ-জাত) ও পরিচারিকা-পুত্রের প্রতিও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অথবা, গুপ্তচর কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাজদ্রোহী মন্ত্রীর ভ্রাতা পৈত্রিক বিষয় অধিকারের জন্য প্রার্থনা করিবে। যখন প্রার্থী ভ্রাতা রাত্রিকালে মন্ত্রীর দ্বারদেশে বা অন্যত্র শয়ানাবস্থায় থাকিবে, তখন তীক্ষ্ণ গুপ্তচর তাহাকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়া প্রচার করিবে, "অহো! উত্তরাধিকারের জন্যই এই ব্যক্তি উহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।" "পরে, হত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজা রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে শাসন করিবেন। গুপ্তচরগণ রাজদ্রোহী মন্ত্রীর সম্মুখে উত্তরাধিকার-প্রার্থনাকারী ভ্রাতাকে ভয় দেখাইবে। পরে, যখন প্রার্থী ভ্রাতা রাত্রিকালে মন্ত্রীর দ্বারদেশে বা অন্যত্র শয়ানাবস্থায় থাকিবে ...ইত্যাদি।

গুপ্তচর, রাজদ্রোহী মন্ত্রিপুত্রকে তোষামোদ করিয়া বলিবে যে, "আপনি যদিও রাজপুত্র, তথাপি কেবল শত্রুভয়ে আপনাকে এই স্থানে রাখা হইয়াছে।" রাজা গোপনে এই ভ্রান্ত মন্ত্রিপুত্রকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া বলিবেন, "যদিও

তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছ, তথাপি মন্ত্রীর ভয়ে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারি নাই।" পরে, গুপ্তচর তাহাকে, মন্ত্রীকে নিহত করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিবে। কার্য্য-শেষ হইলে ঐ স্থলেই মন্ত্রিপুত্রকে পিতৃঘাতক বলিয়া নিহত করিতে হইবে।

ভিক্ষুণী স্ত্রী যে সকল ঔষধে ভালবাসার উদ্রেক হয়, এইরূপ ঔষধ রাজদ্রোহী মন্ত্রিপত্নীকে প্রদান করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া মন্ত্রিপত্নীর দ্বারা রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবে।

এই সকল প্রক্রিয়া বিফল হইলে, রাজা রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে অনুপযুক্ত সৈন্য এবং তীক্ষ্ণচর সঙ্গে দিয়া অসভ্য জাতি, গ্রাম, নূতন রাষ্ট্রপাল, বা সীমান্তাধ্যক্ষ দমন করিতে, অথবা বিদ্রোহী—নগর অধিকার করিতে, অথবা নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে রাজকীয় কর-বহনকারী পথিকগণকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করিবেন। উল্লিখিত কার্য্যে হাঙ্গামা হইলে, দিনে বা রাত্রে তীক্ষ্ণচরগণ, অথবা দস্যুবেশী চরগণ মন্ত্রীকে নিহত করিয়া প্রচার করিবে যে, মন্ত্রী যুদ্ধে হত হইয়াছেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রাকালে বা বিহারকালে রাজা রাজদ্রোহী মন্ত্রিগণের সহিত সাক্ষাৎ-অভিলাষে তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইবেন। তীক্ষ্ণচরগণ গোপনে অস্ত্রবহন করিয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া মধ্যম কক্ষে পঁহুছিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইবে, এবং যখন দ্বাররক্ষকগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রসহিত ধৃত হইবে, তখন রাজদ্রোহী মন্ত্রিগণের সহকারী বলিয়া পরিচয় দিবে। সাধারণে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দ্বার-রক্ষকগণ মন্ত্রিগণকে নিহত করিবে, এবং তীক্ষ্ণচরগণের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিগণকে ফাঁসি দিতে হইবে।

নগরবহির্ভাগে বিহারকালে রাজা রাজদ্রোহী মন্ত্রিগণকে নিজ আবাসের সন্নিকটে বাসা দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন। রাজরাণীর বেশে দুশ্চরিত্রা রমণী মন্ত্রিগণের আবাসমধ্যে ধৃত হইলে, মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অগ্রসর হইতে হইবে।

আচার বা সন্দেশ-বিক্রেতা রাজদ্রোহী মন্ত্রীর নিকট কিছু আচার বা সন্দেশ "আপনার পক্ষেই ইহা উপযুক্ত" এইরূপে স্তুতিপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিবে। পরে উহা ও অর্দ্ধ বাটী জলের সহিত বিষ একত্রিত করিয়া নগরবহির্ভাগে রাজার জলপানের সহিত মিশ্রিত করিবে। সাধারণে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ

করিয়া রাজা রাজদ্রোহী মন্ত্রী ও পাচককে বিষপ্রয়োগকারী বলিয়া হত্যার আদেশ দিবেন।

যদি কোনও রাজদ্রোহী মন্ত্রী যাদুগিরিতে অনুরক্ত থাকেন, গুপ্তচর সিদ্ধ যাদুকরের বেশে মন্ত্রীর বিশ্বাসোৎপাদন করিবে যে, তিনটি সুন্দর জিনিস (কুম্ভীর, কূর্ম্ম ও কর্কট) উৎপাদন করিলে, মন্ত্রী অভীষ্ট বস্তুতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। যাদুগিরিতে যখন নিযুক্ত থাকিবে, তখন গুপ্তচর বিষপ্রয়োগে অথবা লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া মন্ত্রীকে নিহত করিয়া প্রচার করিবে যে, মন্ত্রী যাদুগিরিতে অনুরক্ত থাকিবার সময় হত হইয়াছেন।

চিকিৎসকের বেশে গুপ্তচর রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে বিশ্বাস করাইবে যে, মন্ত্রী মারাত্মক বা দুঃসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। পরে ভেষজ ও পথ্যের ব্যবস্থা-কালে মন্ত্রীকে বিষপ্রয়োগ করিতে হইবে। গুপ্তচরগণ আচার ও সন্দেশ-বিক্রেতার বেশে সুবিধানুযায়ী মন্ত্রীকে বিষ প্রয়োগ করিবে।

রাজদ্রোহী ব্যক্তিগণকে দূরীভূত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

রাজা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিবে, তাহাদের দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যখন কোনও রাজদ্রোহী ব্যক্তিকে দূরীভূত করিতে হইবে, তখন অপর রাজদ্রোহী ব্যক্তিকে অনুপযুক্ত সৈন্য ও তীক্ষ্ণচর সঙ্গে দিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে আদেশ প্রদান করিবে,—"ঐ দেশে বা দুর্গে যাইয়া সৈন্যগঠন কিংবা রাজকর আদায় কর। অমাত্যের স্বর্ণ রাজকোষভুক্ত কর; অমাত্যের কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন কর; দুর্গ নির্ম্মাণ কর; উদ্যান প্রস্তুত কর; নূতন জনপদ স্থাপন কর; নূতন খনি আবিষ্কার কর; হস্তী ও কাঠের জন্য বন প্রস্তুত কর; রাষ্ট্রপাল বা সীমানা নির্দ্ধারণ কর; এবং যাহারা তোমার কার্য্যে বাধা দিবে, বা তোমাকে সাহায্য না করিবে, তাহাদের বন্দী কর।" এই প্রকারে অপর পক্ষকে প্রথমোক্ত পক্ষকে দমন করিবার জন্য উপদেশ দিবে। যখন উভয় দলে বিবাদ ঘটিবে, তখন তীক্ষ্ণ চরগণ অলক্ষ্যে অস্ত্র-নিক্ষেপে রাজদ্রোহীকে নিহত করিবে। পরে, এ জন্য অপর সকলকে বন্দী করিয়া শাস্তি দিবে।

যখন সীমানা, ক্ষেত্রজাত দ্রব্য, গৃহের সীমা লইয়া, অথবা কোন দ্রব্য, যন্ত্র, শস্য, ভারবাহী পশু সম্বন্ধে, অথবা উৎসব ও মিছিলের সময়

যদি তীক্ষ্ণচর দ্বারা রাজদ্রোহী গ্রামে, নগরে, বা পরিবারে বিবাদ সংঘটিত হয়, তবে তীক্ষ্ণচরণগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিবে যে,—"এই ব্যক্তির সহিত যে বিবাদ করে, তাহার এই দশা হয়," এবং পরে ঐ অপরাধের জন্ত অপরকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

যখন রাজদ্রোহী ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাদ ঘটে, তখন তীক্ষ্ণচরগণ তাহাদের ক্ষেত্রে, শস্যক্ষেত্রে, গৃহে অগ্নিপ্রদান করিতে পারে; তাহাদের আত্মীয় বন্ধু ও ভারবাহী পশুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিবে, এবং পরে বলিবে যে, "রাজদ্রোহিগণের উৎসাহে তাহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছে।" এবং এই অপরাধের জন্য অপরকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

গুপ্তচরগণ রাজদ্রোহী ব্যক্তিগণকে দুর্গে বা রাষ্ট্রদেশে নিমন্ত্রণ করিবে; পরে বিষপ্রয়োগকারিগণ বিষ প্রয়োগ করিবে, এবং তখন ঐ অপরাধের জন্য রাজদ্রোহিগণের শাস্তি হইবে।

ভিক্ষুকী স্ত্রী কোনও রাজদ্রোহী প্রধান ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া বলিবে,—অপর কোনও রাজদ্রোহীর স্ত্রী, কন্যা অথবা পুত্রবধূ প্রথমোক্তকে ভালবাসে। ভিক্ষুকী ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত অলঙ্কারাদি লইয়া অপর ব্যক্তিকে বলিবে যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনার স্ত্রী, কন্যা, বা পুত্রবধূর প্রতি ভালবাসা জ্ঞাপন করিতেছে। রাত্রিতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ....ইত্যাদি।

যুবরাজ, বা সেনাপতি, যে সকল বৈরভাবাপন্ন ব্যক্তি রাজদ্রোহী সৈন্য কর্ত্তৃক ভয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অনুগ্রহ দেখাইতে পারেন, এবং তাহাদের অসাক্ষাতে তাহাদের প্রতি বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিবেন। তখন, এ প্রকারে ভীত অপর ব্যক্তিগণ অনুপযুক্ত সৈন্য ও তীক্ষ্ণ গুপ্তচর সঙ্গে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে। সুতরাং রাজদ্রোহনিবারণের সকল উপায়ই একই প্রকারের।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল ব্যক্তির দমন হইয়াছে, তাহাদের পুত্রগণ যদি নিরাকার থাকে, তবে তাহাদের পিতার সম্পত্তি তাহাদের দেওয়া হইবে। এই প্রকারেই সকল ব্যক্তিই রাজার পুত্র ও পৌত্রগণকে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া অনুবর্ত্তন করিবে, এবং তাহা হইলে মনুষ্যকৃত বিপদ আপদ নিবারিত হইবে।

ক্ষমাবান হইয়া ও বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে বিপদাশঙ্কা না থাকিলে, রাজা গোপনে নিজ প্রজা ও যাহারা শত্রুর পক্ষাবলম্বন করিবে, তাহাদের শাস্তি দিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

শিক্ষা।

[মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ; ১।১৬]

সারি-পুত্র সুগতের বন্দিয়া চরণ
কহিলেন একদিন,—"ব্রাহ্মণ শ্রমণ
অতীতে কি বর্ত্তমানে কেহ নাই প্রভু,
তব সম, ভবিষ্যতে হবেও না কভু।"
বুদ্ধ রহিলেন মৌন! কিছুক্ষণ পরে
কহিলেন মধুকণ্ঠে সহাস্য অধরে,—
"সারি-পুত্র, তব বাক্য অতি অনুপম,—
উদার সাহসভরা সিংহনাদ সম।
কহ তুমি,—লভেছ কি এত গূঢ় জ্ঞান
অতীতের—পূর্ণ, শুদ্ধ, বুদ্ধ ভগবান
যত এসেছেন এই অনন্ত নিখিলে
তুমি কি তাঁদের চিত্ত নিজ চিত্তবলে
আয়ত্ত অধীন করি' পাইয়াছ সীমা?
তাঁহাদের প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম, বিনয়, করুণা
সব কি তোমার প্রাণে পেয়েছে প্রকাশ?"
"নহে প্রভো, আমি তার পাইনি আভাস।"
কহিলেন বুদ্ধ পুন,—"ভাবী, বর্ত্তমানে
সম্যক সম্বুদ্ধ যাঁরা স্বচ্ছন্দ নির্ব্বাণে,
তাঁদের হৃদয় সাথে তব পরিচয়
হয়ে গেছে?" "তাও প্রভো নয়।"
রহিলা নীরব বুদ্ধ ; শিষ্য কহে, "স্বামী,
কিছুই জানি না, দেব, কিছু নাহি জানি।"

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত

বিদ্যাপতির 'পারিজাত-হরণ'।

পণ্ডিত বিদ্যাপতি "পারিজাত-হরণ" নামক রাগরঙ্গময় এক গীতিনাটক সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ; নায়িকা সত্যভামা।

নাট্যারম্ভে শক্তি ও শিবের বন্দনাসূচক মঙ্গল-গীত। তৎপরে প্রথম দৃশ্যে রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার। রুক্মিণী দেবীর প্রস্থান; ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের স্বগত শ্লোক-পাঠ,—

ভূমিভারনিবারণায় দুরিতচ্ছেদায় শুদ্ধাত্মনাং
বেদার্থ-ব্যবহারণায় পরিত্রাণায় ধর্মস্য চ।
দর্পস্য প্রশমায় দুষ্টমনসাং দেবদ্বিজদ্রোহিণাং
ব্রহ্মেন্দ্রাদিমদক্ষয়ায় চ ময়া লব্ধাবতারো ভুবি॥

তৎপরে বহু সখী সহ রুক্মিণীর প্রবেশ; তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার ও বসন্তরাগে গান,—

অনগণিত কিংশুক চারু চম্পক বকুল বকহল ফুলিয়॥
পুন কতহু পাটলী পটলি নীপ নিবার মাধব মল্লিয়॥
করযোড়ী রুকমীন কৃষ্ণ সঙ্গ বসন্ত-রঙ্গ নিহারহিঁ।
ঋতু রভস শিশির সমাপি রসময় বিহারহিঁ।
নিজ মদহিঁ মাতলী পল্লবচ্ছবি লোহিতচ্ছরি ছাজহিঁ।
পুন কেলি কলমল কতহি আকুল কোকিলাকল কুঞ্জহিঁ॥ ইত্যাদি।

এমন সময় আকাশপথে শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত উপবীতধারী ব্রহ্মতেজঃ-প্রদীপ্ত নারদ তথায় উপনীত হইলেন। কৃষ্ণ-বন্দনার পর মহামুনি তাঁহাকে একটি পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা রুক্মিণীকে উপহার দিলেন।

রুক্মিণী আপনাকে "ধন্যাহং" জ্ঞান করিয়া সাহস রাগে গাহিতে লাগিলেন,—

আজ জনম ফল ভেলা। সব সখি পরিহরি মোহি ফুল দেলা॥
পূরব পূজল হাম গৌরী। আশা দেল পরিপূরল মোরি॥
উপর রহল মোর মাথে। ষোড়শ সহস্র বরনারীকো সাথে॥

এ দিকে সত্যভামা ভাবিতেছেন যে, তিনি স্বামিসোহাগে সোহাগিনী,—শ্যামগরবে গরবিণী; মহামূল্য মণিময় কনকভূষণে ভূষিতা সত্যভামা সখী সহ পঞ্চম রাগে গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন,—

সখি হে রভস রজ চলু কুলবাড়ী। তাঁহারে মিলিত তোহি মদন মুরারি॥

তিনি প্রাণবল্লভের রূপমাধুরী চিন্তা করিতে করিতে সোহাগভরে আসিতেছেন,—

কনক মুকুট মাণিক ভল ভাবা। মেরুশিখর জনু দিনমণি বাসা॥
সুন্দর নয়ন বদন সানন্দা। উগল যুগল কুবলয় মন্দা॥
বনমালা উর উপর উদারা। অঞ্জন গিরিবর সুরসরি-ধারা॥
পীত বসন তাঁহা ভূখন মণি। জনি নবঘন উর ঘনদামিনী॥

সত্যভামা জীবন ধন মন সর্ব্বস্ব দিয়া হরিচরণ সেবা করিতে আসিতেছেন,—

জীবন ধন মন সর্ব্বস দেবা। সে ময় করব হরি-চরণক সেবা॥

কিন্তু হায়! সত্যভামা আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন যে, রুক্মিণী পারিজাত লাভ করিয়াছেন! তবে ত শ্যামসোহাগে তিনি সোহাগিনী নন! তবে ত হৃদয়বল্লভের অন্তরের নিভৃত নিকেতনে তাঁহার স্থান নাই। সত্যভামার চারুবদনচন্দ্রমা হতাশার মেঘে ম্লান হইয়া গেল। কৃষ্ণ তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া সত্যভামাকে তিনি প্রেমপুরঃসর কহিলেন,—

প্রিয়ে মনোগ্লানিং মা কুরু।

তৎপরে শ্লোক পাঠ করিলেন,—

মালিন্তেন মলীমসী কৃতমুরঃ কম্পেন চোৎকম্পিতং
মোহেন দ্রবিতং বিলোচনজলৈঃ সান্দ্রে পুনঃ শোষিতং।
নিক্ষিপ্তঞ্চ সগদ্গদেন বচসা কারুণ্যবারান্নিধৌ
বিশ্লেষেণ পুনর্মদীয়হৃদয়ং জন্তুং কুতো শেষ্যম্॥

অভিমানিনী সত্যভামা উত্তর করিলেন না। তাঁহার সখী সুমুখী নটরাগে কৃষ্ণকে কহিলেন,—

কি কহব মাধব তনিক বিশোষে। আপনহুঁ তন ধনি পাব কলেশে॥
আপনহি আনন আরসি হেরি। চানক ভরম কাঁপ কত বেরি॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে কহিলেন, "সুমুখী তথা বিধেয়ং যথা আপয়েৎ মাং দেবী।" সুমুখী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সত্যভামা স্বামীকে কিছু কহিলেন না; কিন্তু সখীকে লক্ষ্য করিয়া কেদার রাগে গাহিতে লাগিলেন,—

পুরব প্রীতি রীতি যোঁ হরি বিসরল তথিহুঁ হনক নাহি দোষে।
কতেক যতন সোঁ যঁ প্রতিপালিয়ে সাপ ন মানয় পোষে॥
কহুঁ লেহ যঁ হরি পরগা সব কেবলচাল অপমানে।
বেগ সহস্রদশ অমিয় ভিজাবিয় কোমল না হয় পাথানে॥

হায়, হায়! পূর্ব্বের প্রেমপ্রীতি হরি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে

তাঁহার দোষ কি? যতই যত্ন করিয়া বিষধরকে পালন কর না কেন, সে কি কখন পোষ মানে? দশ সহস্রবার অমিয় দিয়া পাষাণকে সিক্ত কর না কেন, তাহা কি কখনও কোমল হয়?

এইরূপে সত্যভামা খেদ করেন; কখনও আপনার কপালের দোষ দেন; কখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভৎর্সনা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মান ভাঙ্গাইবার সাধ্য হাত। তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া সত্যভামার চরণতলে পড়িয়া গেলেন। তাহার পর উত্থান করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সত্যভামাকে কহিলেন,—

"হে প্রিয়ে মাং প্রসীদ।"

জয়দেব গোস্বামীর "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিতে স্বয়ং ভগবানকে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু সত্যভামার চরণতলে নায়ককে ফেলিবার জন্য তাঁহাকে আসিতে হয় নাই। যাহা হউক, সত্যভামার মান ভাঙ্গিল না। শ্রীকৃষ্ণ রসিক; তিনি মানরসের আস্বাদন করিতে জানেন। তুমি আমি হয় ত এত সাধাসাধি ভালবাসিতাম না; বহির্বাটীতে চলিয়া যাইতাম। কিন্তু কাহার সঙ্গে কাহার তুলনা? যিনি রসিকা প্রেমিকা, তিনিই মানের মহিমা বুঝেন; তিনিই মান করিতে জানেন। আবার যিনি রসিক, তিনিই সে মানের সম্মান করিতে জানেন; তিনিই মানসাগরে ঝাঁপ দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মানিনীর মান ভাঙ্গাইতে যে ক্লেশ করিতে হয়, সে ক্লেশ কত মধুময়! সত্যভামার উদ্দেশে কৃষ্ণ মালব রাগে গাহিতে লাগিলেন,—

ওগো মানিনি অরুণ পূরব দিশ রহলি সগর নিশি
গগন মলিন ভেল চন্দ, মুনি গেল কুমুদিনী
তইও তোহার ধনি মুনল মুখ অরবিন্দ।

অস্যার্থে শ্লোক,—

রুচিং কুবন্তি কৌমুদী হিমতে বদন্তি কমলং ততঃ শৃণু সমস্তং কুক্কুটাঃ। ইত্যাদি

পূর্ব্বাকাশ অরুণরঞ্জনে রঞ্জিত হইতেছে; নিশানাথ মলিন হইতেছে; কুমুদিনী মুদ্রিত হইতেছে; কমলকলি বিকশিত হইতেছে; তবে কেন তোমার বদনকমল প্রস্ফুটিত হইতেছে না?

কমল বদন কুবলয় দুহুঁ লোচন অধর মধুর নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল কিয়ে তোর হৃদয় পাথানে।

অস্যার্থে শ্লোক,—

আস্যং তে সরসীরুহেন রচিতং নীলোৎপলাভ্যাং দৃশৌ
বন্ধুকেন রদচ্ছদৌ তিলতরোঃ পুষ্পেণ নাসাপুটী।

ইত্যেবং বিধিনা বিধায় কুসুমৈঃ সর্ব্বং বপুঃ কোমলং।
ক্রূরং মানসমশ্মনা পুনরিদং কস্মাদকস্মাৎ কৃতং ॥

মুখ তোমার সরসীরুহে, নয়ন তোমার নীলোৎপলে, অধরোষ্ঠ তোমার বন্ধুককুসুমে, নাসিকা তোমার তিল-ফুলে বিধি গঠন করিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ কুসুম-কোমল করিয়াছেন; কিন্তু তোমার হৃদয়টি কেন তিনি সহসা পাষাণে রচনা করিয়া কঠিন করিলেন?

মানিনীর দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" কিন্তু সত্যভামা কথা কহিলেন না। প্রাণনাথ তখন শাস্তি ভিক্ষা করিলেন। অপরাধ করিয়াছি বটে; তাহার সাজা হইয়া যাক; তাহা হইলেই অপরাধের অপনোদন হইয়া যাইবে। প্রতিফল-ভোগেই পাপের অবসান হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি দণ্ড চাহিলেন? সে অতি কঠোর দণ্ড; যথা,—

ভৌঁ কমান বিলোকন বাণে। বেধহ বিধুমুখি কর সমধানে॥ ইত্যাদি

তোমার ভ্রূ-ধনুক হইতে নয়নবাণ নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বিদ্ধ কর।

এখন মানের শেষ হইবার উপক্রম হইল; এবারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে—সুমুখীর প্রতি নহে,—স্বয়ং পতির প্রতি সত্যভামা কেদার রাগে গাহিলেন,—

তাহি অবসর তাহি ঠাম। মাধব কিয়ে বিসরল মোর নাম॥
আর কি করব পরকার। মাধব অপযশ ভরল সংসার॥
সবহু পায়ল অবকাশ। মাধব জগ ভরি কর উপহাস॥
*   *   *   *   *
পরম করম মোর বাম। মাধব সকল তকর পরিণাম॥

এই গীত গাহিতে গাহিতে সত্যভামা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—
"হে ভুবনেশ্বরি, আমি তোমার প্রতি দয়াপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিতেছি, তুমি কেন আমার প্রতি কৃপাবলোকন করিতেছ না; তুমি যত দিন প্রসন্না থাকিবে, তত দিন কাহারও দুর্দ্দশা থাকিবে না; তুমি কুপিতা হইলে আমারও দুর্দ্দশা ঘটিবে।"

অবশতনু সত্যভামা সখী সুমুখীর দেহে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া মল্লার রাগের ঝঙ্কারে কহিতে লাগিলেন,—

মাধব করিয় মোর সমাধানে। দিয় মোহি পারিজাত তরুদানে॥
এহি ক্ষণ ত্বরিত করিয় পরমাণে। নহি তঁ হমর অবশ অবসানে॥
এহি পরি হমর পুরত অভিমানে। হাঁসিতহ সহি নহি হোয় অপমানে॥

রুক্মিণী কেবল একটি ফুল পাইয়াছেন; সত্যভামা ফুলের গাছটি পর্য্যন্ত চাহিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার অদেয় কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ দৌবারিককে কহিলেন, "ধর্ম্মদাস নারদকে আসিতে কহ।" নারদ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, "নারদ! তুমি ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া ইন্দ্রকে কহ যে, আমাকে যেন পারিজাত-তরু তিনি পাঠাইয়া দেন; তাঁহাকে ইহাও কহিও যে, যদি তিনি আমার আদেশ পালন না করেন, তবে শচীর কুচকুঙ্কুম তাঁহার যে বক্ষঃস্থল সুশীতল করে, তাহা আমি বিদ্ধ করিয়া ফেলিব।"

নারদ ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শচীপতি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্র কহিলেন, "বেশ, যুদ্ধই হউক; বিনা যুদ্ধে আমি পারিজাতের একটি পাতাও কৃষ্ণকে দিব না।"

নারদ ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ সমর-সজ্জা করিয়া পারিজাত-হরণে বহির্গত হইলেন।

অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। তখন কৃষ্ণ-বিরহে সত্যভামা বিরহিণী। ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের জয় হইল। সুভদ্রা নারদ ঋষির নিকট যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া সত্যভামাকে তাহা কহিলেন। সত্যভামা তাঁহাকে মণিময়-মাল্য-দানে পুরস্কৃত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত তরু লইয়া আসিয়া সত্যভামাকে প্রদান করিলেন। পরিতুষ্টা সত্যভামাকে নারদ কহিলেন,—"পারিজাত তরুতলে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।" দ্রৌপদীর সহিত ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, "নারদের কথা সত্য।" সত্যভামা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিব?"

"প্রিয়ং পদার্থং দেয়ম্।"

শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুমোদন করিলেন। তখন সত্যভামা কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ভিন্ন আমার আর প্রিয় পদার্থ কি আছে? আমি তাঁহাকেই দান করিব।"

মরি, মরি, কি অপরূপ! হিন্দু কবি ভিন্ন এ ভাব আর কেহ কি দেখাইতে পারিয়াছে? কি সুন্দর কল্পনা! সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিলে ভাল করিয়া ইহার রসাস্বাদন হয় না। হয় ত, এই গ্রন্থ-কুসুমের এক একটি পাপড়ি ভাঙ্গিয়া পাপসঞ্চয় করিলাম। কিন্তু কৃষ্ণকথা ছাড়ি নাই; তাই ভয় নাই।

সত্যভামার কথা শুনিয়া নারদ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কুশগ্রহণ করাইয়া যথারীতি সংকল্প-শ্লোক পাঠ করাইলেন। সত্যভামা পড়িলেন, "অদ্য অমুকমাসে, অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ ইতো বৈকুণ্ঠাদি লোকে আর্য্যপুত্র-চরণ-ভজন-কামা আর্য্যপুত্রেণ সহ পারিজাতবৃক্ষং বনস্পতিদৈবতং নারদায় অহং দদে।" দানের পর দক্ষিণা-মন্ত্র পাঠ করিয়া সত্যভামা দান করিলেন। নারদ কহিলেন, "স্বস্তীতি।"

তৎপরে নারদ সুভদ্রাকে কহিলেন, "তুমি কি দান করিবে।"

সুভদ্রাও আপন আর্য্যপুত্রকে দান করিলেন। নারদের আহ্লাদের আর সীমা নাই,—তিনি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে কৃতদাস পাইয়াছেন। তিনি উভয়কে হুকুম করিলেন,—

হলং বিভর্ত্তু শ্রীকৃষ্ণঃ কুদ্দালঞ্চ ধনঞ্জয়ঃ। ঋয়োর্বা স্কন্ধমারুহ্য ভ্রমিষ্যামি যথাসুখং॥

কৃষ্ণার্জ্জুন কহিলেন, "তাহাই হউক, অহো! ব্রহ্মণ্য-লীলা ঈশ্বরেরও অবিদিত।" তখন নারদ কহিতেছেন, "না, এ দাসদ্বয়কে আমার রাখা চলিবে না। কে বিশ্বকে ও বৃকোদরানুজের পেট পুরাইবে? আমি ইহাদিগকে বিক্রয় করিব।" তৎপরে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন, "চাই—দাস চাই, দাস চাই?" তাহার পর সত্যভামা ও সুভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিতেছেন, "তোমরা যদি কিনিতে চাহ, তবে তোমাদিগকে বিক্রয় করিব। সত্যভামা! তুমি কিনিবে কি না, কহ; নতুবা রুক্মিণী কিনিতে চাহিতেছে।" নারদ পাকা ব্যবসায়ী। এইরূপে পণ্যের দাম বাড়াইতে লাগিলেন, এবং খরিদ্দার জুটাইতে লাগিলেন। সত্যভামা কহিলেন, "দাম কত? দাম কত?" "সুবর্ণভারসহস্ররত্নং"।

সত্যভামা তাহাই দিলেন। নারদ কহিলেন, "আমি এ সব লইয়া কি করিব? একটি ধেনু দাও।" সত্যভামা তাহাই দিলেন।

আর যবনিকাপাতে বিলম্ব নাই। সকলে মিলিয়া ললিত রাগে গাহিতে লাগিলেন,—

জলধর সময় করথু জলদানে। তরণি রহথু ধরণী ধন ধানে॥—ইত্যাদি

ধীরে ধীরে যবনিকার পতন হইল।

এই গীতিনাট্যের গীতগুলির মিথিলায় বড় আদর। তথায় "পারিজাত-হরণ" সুর-তানলয়ে গীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গানেই বিদ্যাপতির ভণিতা। কোথাও তিনি ভণিতা দিয়াছেন,—

সুমতি বিদ্যাপতি ভণ পরমাণে। জগমাতা দৈ হিন্দুপতি জানে॥
সুমতি উমাপতি ভাণে। মহেশ্বরী দৈ হিন্দুপতি জানে।

উমাদেবী বিদ্যাপতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিদ্যাপতি সুগনা মৌজার রাজা শিবসিংহের সমীপে এই গীত গাহিয়াছিলেন। শিবসিংহকেই তিনি হিন্দুপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার মহিষীকে কখনও মহেশ্বরী, কখনও বা জগমাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফিরোজশাহ বাদশাহের নিকট হইতে ২০০ লক্ষ্মণাব্দে জোইনী-নিবাসী কামদেব পণ্ডিত মিথিলা রাজ্য প্রাপ্ত হন। রাজা শিবসিংহ তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবারের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—
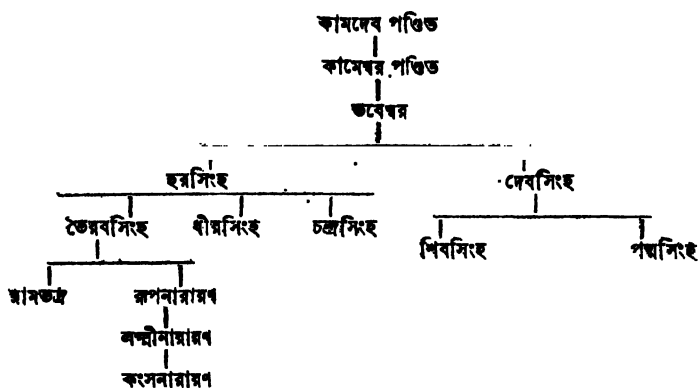
এই রাজবংশের সহিত বিদ্যাপতি-বংশের সংস্রব প্রায় পু[illegible]। মিথিলার লোকে বিদ্যাপতিকে বিদাপৎ পণ্ডিত কহে। তিনি শৈব ছিলেন। ১৩০৭ সালে মিথিলার পণ্ডিতদিগের নিকট শুনিয়াছি,—বিদ্যাপতি বার্দ্ধক্যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

কাঙ্গাল লছমন।

বন্ধু তাহার আপিসের কষ্টের কথা বলিতেছিল। আমি বলিলাম,—"তোমার যদি এত কষ্ট তো চল আমার সঙ্গে কাণপুরে, সেখানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরী একটা করে দিতে পারব।"

বন্ধু বলিল,—"আর কিছু দিন যাক্।" আমি বুঝিলাম, বন্ধুর বাড়ী ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। হাসিয়া বলিলাম, "ঐ তো মুস্কিল!—বাড়ী ছাড়তে চাও না!"

বন্ধু কহিল, "সে জন্য নয় ভাই!—সত্য বলচি!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আর কি জন্য?" বন্ধু বলিল, "আমাদের হেড্ জমাদার—লছমন সিংএর জন্য।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "লছমনের জন্য!—দেখো, নাম ভুল করছ না ত?"

বন্ধু কহিল, "না;—তবে শোন।" এই বলিয়া কেরোসিনের ল্যাম্পটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বন্ধু ভাল হইয়া বসিল। বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"সে আজ ছ' বৎসরের কথা। বড় সাহেব একদিন ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবু! 'অস্লারে'র ওখানে একখানা 'ফ্যান্' অর্ডার দিলাম, কিন্তু কৈ পাঠাইল না; তুমি না হয় নগদ দাম দিয়া একখানা কিনিয়া আনো।' এই বলিয়া সাহেব আমার হাতে দেড় শ' টাকা দিলেন।

অস্লারের ওখানে গিয়া শুনিলাম, তাহারা ফ্যানের জন্য কোনও চিঠি পায় নাই। তখনই তাহারা একখানা চারব্লেড্ ফ্যান্ 'ক্রেডিট্ অ্যাকাউণ্টে'ই পাঠাইয়া দিল, নগদ দাম লইল না—পাছে আমাদের সাহেব ভাবেন, টাকার জন্য ফ্যান্ পাঠান হয় নাই।

আপিসে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সাহেব হঠাৎ পীড়িত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি টাকা সঙ্গে করিয়াই বাড়ী আসিলাম।

পরদিন মহিম এক শত টাকার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—'মহিম! আমার টাকা কোথায়!'

মহিম পাগলের মত একবার চারিধারে চাহিয়া বলিল,—'এঁ্যা—তা জানি—কিন্তু কি করি। তুমি কোনোখান থেকে যোগাড় করে দিতে পারবে না?—আমি চার পাঁচ দিনের মধ্যে শোধ করব।'

তখন দশটা বাজে। রাস্তায় শিশি-বোতলওয়ালা—সুর করিয়া 'বিকৃরী-ই' হাঁকিতেছিল। 'মুংকা-দাল' তখনও ক্ষান্ত হয় নাই। বরফওয়ালা আম বেচা শেষ করিয়া 'আম্‌স-অৎ' ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। বর্ষাস্নাত শ্যামল প্রকৃতির উপর ভাদ্রের রৌদ্র পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে।

এত বেলায় আপিসের সময় এক শ' টাকা পাই কোথায়?—কে এখন ধার দিবে?—এক আপিসের সেই দেড় শ' টাকা।—কিন্তু সে কি দুঃসাহসের কাজ!

কি করি—মহিমের মুখের ভাব দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না—অবশেষে দুঃসাহসের কাজই করিয়া বসিলাম। টাকাটা যে কত বিপদ মাথায় লইয়া কোথা হইতে দিলাম, মহিমকে খুলিয়া বলিলাম। মহিম আমায় আশ্বাস দিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল। মহিম চলিয়া গেলে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিলাম—কাল যদি সাহেব আপিসে আসেন—টাকার কথা জিজ্ঞাসা করেন?

পরদিন আপিসে গিয়া শুনিলাম—সাহেবের বড় অসুখ।—আঃ! একটু নিশ্চিন্ত হইলাম! ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম—যেন পাঁচ দিনের ভিতর সাহেব না আসেন।

ভগবান আমার প্রাণের আকুল আবেদন শুনিলেন, কিন্তু মহিম—কৈ? সে ত টাকা দিয়া গেল না! মহা ভাবনায় পড়িলাম—টাকা পাওয়া দূরের কথা, মহিমের এখন দেখাই পাই না—যখনই যাই, মহিম বাড়ী নাই!

টাকাকড়ির বিষয়ে পুরুষের শেষ সম্বল—স্ত্রীর গহনা। তাও অনেক দিন খোয়াইয়াছি। বৃথা ভাবনায় দশ দিন কাটিয়া গেল। সাহেব রোগমুক্ত হইয়া আফিসে 'যয়েন' করিলেন।

আমি প্রাণ হাতে করিয়া নিত্য আপিস করিতে লাগিলাম; অপরাধীর মনের অশান্তি যে কি ভয়ানক, এ কয় দিনে হাড়ে হাড়ে তা বুঝিলাম। সাহেব আমায় ডাকিতেছেন শুনিলেই আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিত—ভাবিতাম, সাহেব বুঝি টের পাইয়াছেন!

কিন্তু সাহেব 'ক্যানে'র সম্বন্ধে কোনও কথাই তুলিলেন না—ক্রমে আমিও টাকার কথা কতকটা যেন ভুলিতে লাগিলাম!

হঠাৎ একদিন বড় সাহেবের কামরায় আমার ডাক পড়িল। আমি

ঢুকিতেই তিনি আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফ্যান কিনিবার জন্ত তোমায় না নগদ টাকা দিয়াছিলাম?' আমার স্বরটা কাঁপিয়া উঠিল; আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে—হ্যাঁ।'

সাহেব অস্লার কোম্পানীর 'ফ্যানে'র বিলখানি দেখাইয়া বলিলেন,—'তবে কি অসলার কোম্পানী জুয়াচুরী করিয়া আবার বিল পাঠাইয়াছে—বলিতে চাও?'

আমি তখন যে কারণে টাকা দিয়া আসি নাই বলিলাম, কিন্তু বুঝিলাম, সাহেবের বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন—'তবে টাকা ফেরৎ দাও নাই কেন?'

হঠাৎ দিনের আলো যেন নিবিয়া গেল—অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম—পায়ের নীচে স্থান যেন সরিয়া গেল!—কি বলিব? সত্য কথা?—না, তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। আমি মুহূর্ত্তকালের পরিত্রাণের আশায় একটা মিথ্যার আশ্রয় লইলাম,—বলিলাম, 'টাকা লছমনের কাছে রাখিয়াছি—আনিয়া দিতেছি।'

সাহেব এবারেও আমায় অবিশ্বাস করিলেন; বলিলেন,—'তোমায় যাইতে হইবে না—আমি জমাদারকে ডাকাইতেছি।' ভাবিলাম—এবার গেলাম!

জমাদার ঢুকিতেই সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জমাদার! তোমরা পাশ্ শশী বাবু যো রূপেয়া রাখা, ও হাম্‌কো কাহে নেই দিয়া?'

জমাদার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'হাম্‌রা পাশ্ রূপেয়া?'

সাহেব জমাদারকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন। যাইবার সময় আমার বিবর্ণ মুখের উপর লছমনের দৃষ্টি পড়িল।

সাহেব জমাদারকে বিদায় দিয়া আমার দিকে নিতান্ত অবজ্ঞার ভরে চাহিলেন। আমার কপাল দিয়া বিন্ বিন্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। আমি একটা ঢোক্ গিলিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সাহেব উত্তেজিত স্বরে ঘৃণার ভরে বলিলেন, 'তুমি এত বড় 'চীট্', লায়ার! আমি তোমায় এখনি পুলিসে 'হ্যাণ্ডওভার' করিব।'

ভাবিলাম, ডুবিতে তো বসিয়াছি, সত্য যা ঘটিয়াছে, একবার বলিয়া দেখি—যদি সাহেবের দয়া হয়—রক্ষা পাই!

এমন সময়ে আবার লছমন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হুজুর! একঠো কসুর হো গিয়া!' সাহেব রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'কেয়া কসুর?'

লছমন তখন অপরাধীর স্বরে বলিল, 'হামরা খেয়াল নেহীথা—বাবুজী এক মাহিনাকা বাক্তি হো গিয়া হামরা পাস্ দেড় শো রোপেয়া রাখা হায়; একদম্‌সে খেয়াল নেহী থা! রুপেয়া হাম্ লে আয়া হুজুর!'

লছমন এমন স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিল যে, আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! এবার সাহেবও লছমনের চাতুরী ভেদ করিতে পারিলেন না! তিনি লছমনের কথা বিশ্বাস করিলেন, এবং শান্তভাব ধারণ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বাবু! কিছু মনে করিও না।'

আমি সেলাম করিয়া সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইলাম। বাহিরে আসিয়া আমি লছমনের হাত ধরিয়া বলিলাম, 'লছমন! আজ তুমি না থাক্‌লে আমার কি হইত?'

লছমন আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'ভগবান তোমায় বাঁচিয়েছেন! নয় ত আমার কি সাধ্য!'

কি গভীর আস্থা!—কি সুন্দর অহঙ্কারশূন্যতা! ইচ্ছা হইল, লছমনের পায়ের ধুলা লই! কিন্তু পারিলাম না।

লছমনকে বলিলাম, 'লছমন! তুমি তো সাহেবের কাছে আমায় নির্দ্দোষ দেখাইলে—কিন্তু তুমি নিজে আমায় কি মনে কর?'

লছমন উত্তর করিল, 'বাবু! ব্যাপারটা কি, আমিও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি!' আমি তখন তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম। শুনিয়া সে বলিল, 'তাই ভগবান তোমায় বাঁচিয়েছেন—'

আমি লছমনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দেড় শ টাকার কথা তুমি কেমন করে জানলে?'

লছমন বলিল, 'আমি দেখিলাম, অসলার কোম্পানীর লোক আসিবার পরই তোমার ডাক্ পড়িল। তাহাতেই ভাবিলাম, ঐ টাকা লইয়াই গোল হইয়াছে। সাহেবের ঘরে যে একখানা নূতন পাখা আসিয়াছে, তাহা জানিতাম। তাই ভগবানের নাম করিয়া দেড় শ টাকাই বলিয়া ফেলি!'

কিছু দিন পরে অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করিয়া লছমনের ঋণ শোধ করিলাম। মাহিনা পাইয়া কুড়িটি টাকা লছমনকে বখ্‌শিশ্ দিতে

গিয়াছিলাম। কিন্তু লছমন তাহা মাথায় ঠেকাইয়া আমায় ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'বাবু! আমি টাকার কাঙ্গাল নই।'

বন্ধু এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু লছমনের জন্য তুমি চাকরী ছাড়তে পারছ না কেন, তা ত বল্‌ছে না।"

বন্ধু বলিল—"হাঁ, কিছু দিন পরে এই কেরী সাহেব আসে। কেরীর জ্বালায় চাকরী ছাড়িবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু লছমন কোনও মতে চাকরী ছাড়িতে দিল না। সে বলে, 'আর তিনটা বছর থাকো—তার পরে যেখানে ইচ্ছা যাইও—আমিও তখন দেশে চলিয়া যাইব।' তাই চাকরী ছাড়িতে পারিতেছি না।—লছমনের ঋণ ত শুধিবার নয়। তবু তার একটি সাধ যদি মিটাইতে পারি।"

বন্ধু আবার নীরব হইল। তখন রাস্তার অন্ধকার ঘন হইয়া গ্যাসের আলোককে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি বলিলাম, "আচ্ছা। এখন আসা যাক্—কিন্তু একটা কথা,—লছমনের অমন করিবার কারণ কি?"

বন্ধু বলিল, "তা ত জানি না; তবে শুনেছি, আমার বয়সী ওর একটি ছেলে ছিল; আমার সঙ্গে তার নাকি সাদৃশ্য ছিল।"

লছমন যে কিসের কাঙ্গাল, তা এতক্ষণে বুঝিলাম।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বিদেশী গল্প।

শয়তান।

১

মুমূর্ষু রমণীর রোগশয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কৃষক চিকিৎসকের পানে ফিরিয়া চাহিল। বৃদ্ধা প্রশান্তভাবে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। মৃত্যু আসন্ন, তথাপি তাহার মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটে নাই। অন্তিম মুহূর্ত্ত—শেষ যাত্রার নিমিত্ত সে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিরনব্বই বৎসর সে পৃথিবীতে নানা খেলা খেলিয়াছে। আর কতকাল! যে কোন মুহূর্ত্তেই দোকানপাট তুলিতে হইবে। কিন্তু বৃদ্ধা তজ্জন্য বিন্দুমাত্র কাতর নহে।

আষাঢ়ের উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি উন্মুক্ত দ্বার ও বাতায়নপথে গৃহমধ্যস্থ মৃত্তিকাপাত্রনিচয়ে পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল, চারি পুরুষের ব্যবহৃত

অসমতল কক্ষতলে নৃত্য করিতেছিল। আতপ্ত পবনপ্রবাহ দিগন্তপ্রসারী শস্যক্ষেত্র, তৃণপুঞ্জ ও পত্রবল্লরীর বিচিত্রগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। অশ্রান্ত ঝিল্লীরবে বাতাস ও আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাক্তার কণ্ঠস্বর আরও একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "হোনোরি, তোমার মাকে এ অবস্থায় একা ফেলিয়া কোথাও যাইও না। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যু হইতে পারে।"

বিষণ্ণভাবে কৃষক বলিল, "কিন্তু ক্ষেতের ধান আমাকে এখন কাটিতেই হইবে। অনেকদিন ধরিয়া শস্যকর্ত্তন বন্ধ রহিয়াছে। আকাশের অবস্থা এখন ভাল, এই সময়ে শস্য ঘরে আনিতে না পারিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। মা, কি বল?"

তাহার জননীর অস্থিমজ্জাগত লোভের স্পৃহা মৃত্যুর ছায়াস্পর্শেও বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক কালের অভ্যাস হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে। সে নয়ন সঙ্কেতে ও ভ্রূভঙ্গী দ্বারা পুত্রের সঙ্গত প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল। তার পর হোনোরীকে শস্যকর্ত্তনের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। সে একাকীনী থাকিবে, তাহাতে ক্ষতি কি?

ডাক্তার মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন। সক্রোধে ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি একটা জানোয়ার! আমি কিন্তু তোমাকে কখনই এ কাজ করিতে দিব না। যদি আজই শস্যকর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে, ধাত্রী র‍্যাপেটকে ডাকিয়া আন না কেন? সে তোমার মার কাছে থাকিবে। এখনই তুমি যাও; আমার কথা শুনিতে পাইতেছ? যদি আমার উপদেশমত কাজ না কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুকালেও আমি কাহাকেও আসিতে দিব না। কুকুরের মত তুমি একটা বিছানায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। আমার কথা বুঝিয়াছ?"

কৃষকের আকৃতি দীর্ঘ ও কৃশ; তাহার বুদ্ধিটাও কিছু কম ছিল। সে সহসা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মাতার ন্যায় সে-ও বিলক্ষণ কৃপণ-স্বভাব। এ দিকে ডাক্তারের কথাতেও সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কৃষক বলিল, "মার কাছে থাকিবার জন্য বুড়ী র‍্যাপেট কত টাকা লইবে?"

ডাক্তার বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন, "তা আমি কি জানি। যত দিন বা যতক্ষণ তোমার বাড়ী সে থাকিবে, টাকার পরিমাণও সেই অনুপাতে

হইবে। তাহার কাছে গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পার। কিন্তু আমি বলিয়া যাইতেছি, এক ঘণ্টার মধ্যে ধাত্রীকে এখানে আনা চাই; বুঝিয়াছ?"

কৃষক বলিল, "আমি এখনই যাইতেছি; আপনি রাগ করিবেন না, মঁসিয়ে।"

ডাক্তার কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় বলিলেন, "দেখ, আমার সঙ্গে চালাকী করিও না। রাগের মাথায় আমি সব করিতে পারি।"

কৃষক মাতার কাছে আসিয়া হতাশভাবে বলিল, "যখন ডাক্তার কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন আর দেরী করি কেন? আমি এখনই ধাত্রী র‍্যাপেটকে ডাকিতে চলিলাম। ততক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাক। বেশী নড়িও চড়িও না।"

কৃষক চলিয়া গেল।

২

রজকিনী ধাত্রী র‍্যাপেট বৃদ্ধা। প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কেহ মরিলে, অথবা রোগশয্যাপার্শ্বে থাকিবার প্রয়োজন হইলে র‍্যাপেট কার্য্যভার গ্রহণ করিত। এ বিষয়ে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া বৃদ্ধা বাড়ী আসিয়া জীবিত ব্যক্তিদের জন্য কাপড় ইস্ত্রি করিতে বসিত। শুষ্ক আপেলটির মত তাহার শরীর আকুঞ্চিত; লোভ ও ঈর্ষ্যায় হৃদয় পরিপূর্ণ। সারাজীবন কাপড় ইস্ত্রি করিতে করিতে তাহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বাঁকিয়া গিয়াছিল। মুমূর্ষুর মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা বৃদ্ধার মনে আদৌ স্থান পাইত না। বরং মরণাহতের কাতর রব শুনিতে তাহার ভালই লাগিত। মৃত ব্যক্তির বিষয় ব্যতীত তাহার নিকট অন্য কোনও প্রসঙ্গের কথা শুনিতেই পাওয়া যাইত না।

যখন হোনোরী বন্‌টেম্প তাহার বাড়ীতে পঁহুছিল, বৃদ্ধা তখন পল্লীবাসী-দের কলার ইস্ত্রির জন্য মাড় তৈয়ার করিতেছিল।

"নমস্কার ধাত্রী র‍্যাপেট, এখন আছ কেমন?"

মস্তক ফিরাইয়া সে বলিল, "আর বাছা, অমনই এক রকম আছি। তোমার খবর কি?"

"আমি ভাল আছি; কিন্তু মার বড় অসুখ।"

"তোমার মা?"

"হাঁ গো, আমার মা।"

"তার কি হয়েছে?"

"পাততাড়ি গুটাইবার চেষ্টায় আছে।"

বৃদ্ধা জলের পাত্র হইতে হাত সরাইয়া লইল। তাহার সিক্ত অঙ্গুলি বহিয়া নীলাভ জলকণা পাত্রমধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অকস্মাৎ সহানুভূতিস্নিগ্ধ স্বরে সে বলিল, "বল কি? তোমার মার অবস্থা এত খারাপ?"

"ডাক্তার বলিতেছেন, রাত্রিটা কাটে কি না সন্দেহ।"

"তা হ'লে অবস্থা বড়ই খারাপ—বল?

হোনোরী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা পাড়িবে, ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত শব্দ যোগাইল না দেখিয়া সে স্পষ্ট করিয়াই কথাটা পাড়িবার সঙ্কল্প করিল।

"মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যার জন্য তুমি কি লইবে, বল। আমি বড়লোক নই, তা বোধ হয় তুমি জান। একটা চাকর পর্য্যন্ত রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। এই জন্যই আমার মার শরীর এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দিন রাত কাজ, চব্বিশ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কাজ করিয়া তাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিরনব্বই বৎসর বয়সে মা আমার বিশটি রমণীর কাজ একা করিয়া আসিয়াছে। আজকাল আর এ রকম শক্ত হাড় দেখাই যায় না।"

ধাত্রী র‍্যাপেট গম্ভীরভাবে বলিল, "দুই রকম দর আছে। বড়লোকের বেলা, দিনে দশ আনা, রাত্রিকালে দুই টাকা। গরীবদের জন্য দিনে পাঁচ আনা, রাত্রিকালে দশ আনা। তুমি গরীব মানুষ, শেষের দরই দিও।"

কৃষক চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার জননীর প্রকৃতি সে বিশেষরূপে অবগত ছিল। ডাক্তারের আশঙ্কা সত্ত্বেও সে জানিত, তাহার মাতা সপ্তাহাধিক কালও টিকিয়া যাইতে পারে।

সে বলিল, "ও রকম বন্দোবস্ত চলিবে না। মোট একটা চুক্তি হউক। মার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তুমি কি পারিশ্রমিক লইবে, বল। আমার উভয়তই লোকসান। ডাক্তার বলিতেছেন, শীঘ্রই মৃত্যু হইবে। যদি তাই হয়, তোমার লাভ, আমার ক্ষতি। আর যদি দুই এক দিন বুড়ী বাঁচে, আমার লাভ, তোমার লোকসান।"

ধাত্রী বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে কৃষকের পানে চাহিল। মুমূর্ষুর শুশ্রূষাকল্পে পূর্ব্বে কখনও সে কাহারও সহিত লাভ-ক্ষতিজনক কোনও চুক্তি করে নাই। বৃদ্ধার মন চঞ্চল হইল। লাভের বাসনা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিল। বৃদ্ধা ভাবিল, তাহাকে ঠকাইবার জন্য কৃষক কথাটা পাড়ে নাই ত?

সে বলিল, "তোমার মার অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিয়া আমি কোনও কথা বলিতে পারিতেছি না।"

"তবে এস, দেখে যাও।"

হাত মুছিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ধাত্রী কৃষকের অনুসরণ করিল। পথিমধ্যে আর কোনও কথা হইল না।

রৌদ্রতাপে ক্লিষ্টদেহ গো-পাল ভূমিতলে বসিয়া রোমন্থন করিতেছিল। তাহারা পথিকযুগলকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, যেন তাহারা সরস তৃণ প্রার্থনা করিতেছিল।

কুটীরদ্বারে আসিয়া হোনোরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "যদি এতক্ষণ সব শেষ হইয়া গিয়া থাকে?"

তাহার মনোগত অভিপ্রায় কণ্ঠস্বরে যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কিন্তু বৃদ্ধার মৃত্যু হয় নাই। শয্যার উপর সে উত্তানভাবে শুইয়াছিল। তাহার শীর্ণ, কর্কটদংষ্ট্রার অনুরূপ বক্র বাহুযুগল বেগুনী রঙ্গের গাত্রাবরণের উপর ন্যস্ত। দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থিবদ্ধ শিরাসমূহ স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে। ধাত্রী র‍্যাপেট শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মনোযোগ-সহকারে বৃদ্ধার সর্ব্ব শরীর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। নাড়ীর গতি, বক্র শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া পরীক্ষান্তে সে মুমূর্ষুকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। কণ্ঠস্বর পরীক্ষা শেষ হইলে সে বাহিরে উঠিয়া গেল। হোনোরীও তাহার অনুগমন করিল। বৃদ্ধা সংকল্প স্থির করিয়াছিল। আজ মুমূর্ষুর রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিবে না, তাহা স্থির।

কৃষক বলিল, "এখন কি ঠিক করিলে?"

ধাত্রী বলিল, "বুড়ী আরও দুই তিন দিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তুমি সর্ব্বসমেত আমাকে চারিটি টাকা দিও।"

কৃষক সবিস্ময়ে বলিল, "চার টাকা! বল কি? তোমার মতিভ্রম হয়েছে না কি? পাঁচ ছয় ঘণ্টার বেশী রোগী বাঁচিবে না, আর তুমি চার টাকা চাহিতেছ?"

উভয়ে বহু তর্কবিতর্ক হইল। কোনও পক্ষই সহসা মীমাংসায় আসিতে চাহিল না।

অবশেষে ধাত্রী বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সময় যাইতেছে, ক্ষেত্রের শস্য ঘরে আনিতে না পারিলে অত্যন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা। অগত্যা কৃষক ধাত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

"বেশ্; চার টাকাই দিব। মৃতদেহ স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে থাকিতে হইবে।"

কৃষক দীর্ঘপাদক্ষেপে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়া গেল। প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে পক্ব শস্যশীর্ষসমূহ জ্বলিতেছিল, বাতাসে দুলিতেছিল।

৩

ধাত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

শেলাইয়ের কাজ সে কিছু কিছু সঙ্গে আনিয়াছিল। রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে পারিত। ইহাতে তাহার আরও কিছু আয় হইত।

অকস্মাৎ সে পীড়িতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, পাদরী মহাশয় কি তোমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন?"

বৃদ্ধা মস্তক আন্দোলিত করিয়া জানাইল, পুরোহিত আদৌ আসেন নাই। ধাত্রীর ধর্ম্মজ্ঞান, অনুষ্ঠানের স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। সে এই কথা শুনিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হা ভগবান্! এখনও পুরোহিত ডাকা হয় নাই? কি আশ্চর্য্য! আচ্ছা, আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

ধাত্রী দ্রুতবেগে ধর্ম্মমন্দিরাভিমুখে দৌড়িল। বালকেরা পথে খেলা করিতেছিল। তাহারা বৃদ্ধার দ্রুতগতিদর্শনে ভাবিল, নিশ্চয়ই কোনও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।

অবিলম্বে পুরোহিত আসিলেন। তাঁহার সহকারী ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে চলিল। অদূরে ক্ষেত্রমধ্যে যে সকল কৃষাণ কার্য্য করিতেছিল, তাহারা পাদরী মহাশয়ের শুভ্র পরিচ্ছদ দর্শনে মস্তক অনাবৃত করিয়া দাঁড়াইল। রমণীরা শূন্যে ও বক্ষে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করিল।

বহু দূর হইতে হোনোরী তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "পাদরী মহাশয় কোথায় যাইতেছেন?"

কোনও বুদ্ধিমান কৃষক বলিল, "বোধ হয় তোমার মাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেছেন।"

হোনোরী বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "হবেও বা।"

তার পর পুনরায় সে নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

পাদরী মহাশয় বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম-কথা শুনাইয়া চলিয়া যাইবার পর ধাত্রী র‍্যাপেট মুমূর্ষুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সে ভাবিতেছিল, বুড়ী বেশী দিন বাঁচিবে না কি?

দিনের আলো নিবিয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পবন মৃদু হিল্লোলে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রবাহিত হইতেছিল; প্রাচীর-বিলম্বিত ক্ষুদ্র চিত্রপট দুলাইয়া দিতেছিল। বাতায়নের পীতাভ যবনিকা—এক সময়ে উহা কর্পূর-শুভ্র ছিল—পবন-প্রবাহ-সংস্পর্শে, মুমূর্ষুর প্রাণ-বিহঙ্গেরই মত ডানা উড়াইয়া মহাপ্রস্থানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

রাত্রিকালে হোনোরী গৃহে ফিরিয়া আসিল। শয্যাপার্শ্বে গিয়া সে দেখিল তাহার জননী তখনও বাঁচিয়া আছে। কৃষক পূর্ব্ব অভ্যাস মত বৃদ্ধার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

পর দিবস প্রত্যূষে পাঁচটার সময় ধাত্রী র‍্যাপেট আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে ধাত্রী রুগ্নার কক্ষে ফিরিয়া আসিল। হোনোরী তখন স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্য ভোজন করিতেছিল।

রমণী বলিল, "কি খবর, তোমার মা মরিয়াছে?"

ধাত্রীর প্রতি দুষ্টামি-পূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কৃষক বলিল, "না; মার অবস্থা যেন আজ অপেক্ষাকৃত ভাল।"

কৃষক ক্ষেত্রে চলিয়া গেল।

ধাত্রী বুঝিল, বৃদ্ধা হয় ত এমনই ভাবে আরও দুই তিন দিন, এমন কি, সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ক্ষুব্ধহৃদয়া ধাত্রীর মন এই চিন্তায় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইল। এই শঠ, প্রবঞ্চক কৃষক ও তাহার মুমূর্ষু জননীর প্রতি ধাত্রীর মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিল। হতভাগী মরিতেছে না কেন?

ধাত্রী শেলাইয়ের কাজ তুলিয়া লইয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। মুমূর্ষুর লোলচর্ম্ম; আকুঞ্চিত শীর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

কৃষক মধ্যাহ্নে আহারার্থ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মন আজ অত্যন্ত প্রফুল্ল। ক্ষেত্রের শস্যসম্ভারে গৃহপ্রাঙ্গণ ক্রমশঃ পূর্ণ হইতেছিল।

৪

ধাত্রী ব্ল্যাপেট নৈরাশ্যে, ক্ষোভে উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিল। এক এক মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে, আর তাহার বোধ হইতেছে, যেন কৃষক ও তাহার মাতা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রাপ্য গণ্ডা হইতে তাহাকে প্রবঞ্চিত করিতেছে। উঃ একান্ত অসহ্য! ধাত্রীর হৃদয়ে একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠ ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেই তাহার অবশিষ্ট জীবনপ্রবাহ-টুকু বাহির হইয়া যায়!—কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। সহসা আর একটা উপায় ধাত্রীর মনে উদিত হইল। সে পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, তুমি কখনও শয়তানকে দেখিয়াছ"?

বৃদ্ধা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না।"

ধাত্রী তখন মুমূর্ষুর হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিবার জন্য ভীতিজনক নানা গল্পের অবতারণা করিল। সে সব কাহিনী শুনিয়া আতঙ্কে, বিভীষিকায় বৃদ্ধার সর্ব্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ধাত্রী বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া দিল যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শয়তান প্রত্যেক পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে আবির্ভূত হয়। তাহার হস্তে যমদণ্ড, মস্তকে তিনটি শৃঙ্গ। শয়তান পীড়িতের কাছে দাঁড়াইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে। তাহাকে একবার দেখিলে মৃত্যু অবধারিত। দুই চারি মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটিবে। সেই বৎসরে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কে কে শয়তানকে দেখিয়াছিল, ধাত্রী তাহার তালিকা দিল। জোসেফাইন লাইল, ইউলি-ব্যাটিয়ার, সোফি প্যাডাগনিউ, সারপিন্ গ্রস্পাইড্ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিল। বৃদ্ধা এই সমস্ত বিভীষিকাপূর্ণ কাহিনী শুনিয়া শয্যার উপর ছটফট করিতে লাগিল। মস্তক ঈষৎ বক্র করিয়া সে গৃহকোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল। ধাত্রী ব্র্যাপেট ইত্যবসরে অলক্ষ্যে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। কক্ষান্তরে গিয়া সে তাক হইতে একখানি বিছানার চাদর লইয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল। উনানের উপর হইতে জল গরম করিবার পাত্রটি লইয়া মাথার উপর রাখিল। তাহার তিনটি পদ শয়তানের তিনটি শৃঙ্গের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। বামহস্তে একটি পাত্র-তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি মোটা লাঠী ধারণ করিল। তার পর ধাত্রী

থালাখানি উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিল। পাত্রটি ভীষণ ঝন ঝন শব্দে ভূমিতলে পতিত হইল। একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধাত্রী ব্যাপেট পীড়িতার শয্যার নিকটস্থ পরদা তুলিয়া ধরিল। তার পর নানারূপ অঙ্গভঙ্গীসহকারে সে তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

ভীষণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মুমূর্ষু প্রাণপণবলে দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ শয্যা হইতে উত্থিত করিল। প্রবল উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার শক্তিহীন দুর্ব্বল দেহ আবার শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। সব শেষ হইল।

তখন ধাত্রী ব্যাপেট পরম প্রশান্তভাবে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। বিছানার চাদর ভাঁজ করিয়া তাকের উপর তুলিয়া রাখিল; জল-গরমের পাত্রটি উনানের উপর বসাইয়া রাখিল। লাঠীখানি গৃহকোণে রক্ষা করিয়া চেয়ার দেওয়ালের পার্শ্বে স্থাপিত করিল।

অভ্যস্ত হস্তে ধাত্রী শ্বেতবস্ত্রের দ্বারা মৃতার সর্ব্বদেহ আবৃত করিয়া দিল। একটি পাত্র শয্যার উপর রাখিয়া পুণ্য পূত বারির কিয়দংশ তাহাতে ঢালিয়া দিল। তার পর শয্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়া ভক্তিভরে ভগবানের স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে সে খুব ওস্তাদ ছিল; স্তোত্রগুলি তাহার কণ্ঠস্থ।

রাত্রিকালে গৃহে ফিরিয়া যখন হোনোরী ধাত্রীকে স্তোত্র পাঠ করিতে শুনিল, তখন সে সমস্তই বুঝিয়া লইল। হায়! ধাত্রী তাঁহাকে পাঁচ আনা পয়সা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে! সে তিন টাকা এগার আনার কাজ করিয়াছিল; পাঁচ আনা বৃথা গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সাজাহান নাটক।

কবিবর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। "সাজাহান" সেই নাটকগুলির অন্যতম।

ঐতিহাসিক নাটকের রচনা উভয় সঙ্কটের কথা। ইতিহাস রক্ষা করিতে

গী দে মোপাসাঁর রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

গেলে কল্পনাকে খর্ব্ব করিতে হয়; অথচ কল্পনার গতি উন্মুক্ত না রাখিলে নাটক উৎকৃষ্ট হয় না। সেই জন্য সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নাটক রচনা করা এক প্রকার অসম্ভব। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটক হ্যামলেট্, লীয়ার, ওথেলো, বা ম্যাকবেথের উপাদান যে ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, সে ইতিহাস প্রবাদের অন্ধকারে মিশিয়া আছে। পরন্তু নাটকের প্রধান চরিত্র যদি পবিত্র বা উন্নত না হয়, তাহা হইলে সে নাটক উচ্চ অঙ্গের হয় না। কারণ, নাটকের প্রধান চরিত্রের কণ্ঠেই কবি তাঁহার নিজের কথা-অন্তর্জীবনের গভীর তত্ত্ব—প্রতিভাদীপ্ত ভাষায় ধ্বনিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সে চরিত্র অপকৃষ্ট হইলে কবি সেই সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন না, অপাত্রে ন্যস্ত হইলে কবির উক্তি অস্বাভাবিক শুনায়। ভাবুক হ্যামলেটের, বা উন্মাদ লীয়ারের মুখে সেক্সপীয়র মনোরাজ্যের যে সকল উচ্চ কথা বা মানব-হৃদয়ের গভীর তত্ত্ব উচ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, কৃতঘ্ন ও ঘাতক ম্যাকবেথের কণ্ঠে সেরূপ পারেন নাই। ম্যাকবেথ জীবনের যে হত্যাকলুষিত ও পাপপঙ্কিল স্তরে বিচরণ করিয়াছেন, সে স্থান হইতে মনের উন্নত বা পবিত্র স্তরে উত্তোলন করিবার ক্ষমতা সেক্সপীয়রেরও সাধ্যাতীত। বারত্রয়-মাত্র ম্যাকবেথের বিভ্রমগ্রস্থ শোকতপ্ত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া কবি যেন অতর্কিতভাবে নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত কারণে ম্যাকবেথ নাটক লীয়ার বা হ্যামলেট্ নাটকের সহিত তুলনায় উচ্চ অঙ্গের নাটকের হিসাবে নিকৃষ্ট; অথচ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী নাটকের (Stage play) হিসাবে ম্যাকবেথ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

সাজাহান সুপরিচিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তাঁহার জীবন-কাহিনী মহৎ, পবিত্র, বা আদর্শ চরিত্রের অনুকূলও নহে। এ কথা "পাষাণী"র মত অনুপম নাট্য-কাব্যের রচয়িতার অবিদিত ছিল না। তিনি সাজাহান নাটক শ্রব্য বা উচ্চ অঙ্গের নাটকের ভাবে রচনা করেন নাই, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য লিখিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাউক, সাজাহান নাটকের চরিত্রগুলিকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিতে গিয়া কবি ইতিহাসের বাধা অতিক্রম করিতে কত দূর সক্ষম হইয়াছেন।

নাট্যকার সাজাহানকে স্থবির, সন্তান-স্নেহ-প্রবণ, কোমলপ্রাণ, শান্তি-প্রয়াসী ও ক্ষমাশীল রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যেই সাজাহানের চরিত্র কবির ইচ্ছানুরূপ আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ছবি সর্ব্বত্রই

নিপুণ বর্ণরাগে উজ্জ্বল, কোমল তুলিকা-স্পর্শে সুন্দর। সাজাহান যখন বিদ্রোহী পুত্রগণকে শাসন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন,—"বেচারী মাতৃহারা পুত্র-কন্যারা আমার। তাদের শাসন করবো কোন প্রাণে জাহানারা। ঐ চেয়ে দেখ, ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস-ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ, তার পর বলিস্ শাসন কর্ত্তে।" তখন তাঁহার অপত্য-স্নেহের গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, তাঁহার চতুর্দ্দশ সন্তানের জননী, প্রিয়তমা বেগম মমতাজের উপর জীবনব্যাপিনী মমতার কথা মনে পড়ে, তাজমহলের মন্ত্রপূত নামোচ্চারণে তাঁহার অক্ষয় ও অপূর্ব্ব স্থাপত্যকীর্ত্তি-কলাপের কথা মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তাঁহার কবিত্বময় মৃত্যুকাহিনী, আগ্রা দুর্গের অতুল-শোভাময় বারাণ্ডা হইতে বক্রগতি যমুনা-তটে তাজের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চিরনিদ্রাভিগমন। যখন ঔরঙ্গজীবের আজ্ঞায় বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া সাজাহান নিস্ফল ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া উঠেন, "আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান। এই কে আছো! নিয়ে আয় আমার বর্ম্ম আর তরবারি।" তখন তাঁহার আমেদনগর-বিজয়াদি বীরত্ব-কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হয়, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ জরাহত কেশরীর ব্যর্থ গর্জ্জনে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। আবার যখন দারার পরাজয় ও ঔরঙ্গজীবের দিল্লীর তক্তৃতাউসে আরোহণবার্ত্তাশ্রবণে সাজাহান একবার দুর্গের বাহিরে যাইয়া প্রজাগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার সুশাসনের কথা, প্রজাবাৎসল্যের কথা, ন্যায়বিচারের কথা, দস্যু-তস্করাদিবিরহিত রাজ্যে অভূতপূর্ব্ব শান্তি-স্থাপনের কথা মনে পড়ে, আর তাঁহার দুরবস্থায় মন করুণার্দ্র হইয়া উঠে। দারার হত্যা-নিবারণের জন্য তিনি যখন আগ্রা দুর্গের উচ্চ কক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হয়েন, এবং পরে দারার হত্যা-সংবাদে উন্মত্তবৎ হইয়া সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার দুর্ব্বহ শোকভারে প্রাণ মুহ্যমান হইয়া আসে। পরিশেষে যখন তাঁহার সকল দুঃখের কারণ ঔরঙ্গজীবকে অনুতাপক্লিষ্ট ও বিশীর্ণদেহ দেখিয়া পুত্রের সমস্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে সন্তান-স্নেহের প্রাবল্য দেখিয়া বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া যায়।

কিন্তু ইতিহাসের কথা স্মরণ করিলে সাজাহানের এই সুন্দর ছবিখানি মলিন হইয়া যায়। পিতৃদ্রোহিতা ও সিংহাসন-লাভের জন্য ভ্রাতৃযুদ্ধ মোগল-

সম্রাটদিগের বংশানুক্রমিক আচরণ। উহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। সাজাহান নিজে দুইবার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরও মৃত্যুশয্যায় শায়িত আকবরের বিপক্ষে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া পুত্রদের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই সাজাহান কেবল দারাকে নিকটে রাখিয়া অপর পুত্রত্রয়কে সুবাদারীর বা রাজপ্রতিনিধিত্বের ব্যপদেশে দূরদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা স্মরণ করিলে পুত্রগণের বিদ্রোহ-বার্ত্তা শুনিয়া সাজাহানের মুখে "এ রকম কখন ভাবিনি। অভ্যস্ত নই।" প্রভৃতি বাক্য অসঙ্গত ও ভানমাত্র বলিয়া মনে হয়। বিদ্রোহী পুত্রদের দমন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যখন বলেন, "ঈশ্বর পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়াছিলে কেন?" তখন যৌবনে তাঁহার এ জ্ঞান হয় নাই ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পার উদয় হয়। যখন মনে পড়ে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র দোয়ার সেকোকে কৌশলে প্রতারিত করিয়া, এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, তাঁহাদের সকলকেই নির্ব্বিচারে হত্যা করিয়া, সেই আত্মীয়-শোণিত-রঞ্জিত-হস্তে দিল্লীর রাজদণ্ড ধারণ করেন, তখন তাঁহার মুখে "আমি এমন কি পাপ করিয়াছি খোদা" উক্তি জগদীশ্বরের নিকট নিতান্ত নির্লজ্জ অনুযোগের মত শুনায়। মেনুসীর (Signor Manouichi.) কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাজাহানের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মেনুসী বলেন, সাজাহান তাঁহার ভ্রাতা সাহারিয়ার ও তাঁহার দুই নিরীহ পুত্রকে একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, ঐ কক্ষের দ্বার গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনাহারে হত্যা করেন। মেনুসী সাজাহানের ব্যভিচার, গুপ্তহত্যা ও ইন্দ্রিয়-সেবা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সাজাহানের বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক, কারাবাস প্রভৃতি ক্লেশ তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

সাজাহানের ইতিবৃত্তের সহিত লীয়ারের কাহিনীর একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই রাজা, জরাগ্রস্ত, রাজ্যভ্রষ্ট, এবং সন্তানগণের নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত। সাজাহানকেও নাট্যকার লীয়ারের অবস্থায় ফেলিয়াছেন, এবং সাজাহানের হৃদয়ও লীয়ারের মত কোমল ও সহজে বিক্ষোভপ্রবণ করিয়া গড়িয়াছেন। কিন্তু লীয়ারের আদর্শে সাজাহান পঁহুছিতে পারেন নাই। ইহাতে নাট্যকারের

গুণপনার অভাব নাই। প্রতিবন্ধক ইতিহাস। বিদ্রোহী পুত্রগণের, বিশেষতঃ ঔরঙ্গজীবের, দুর্ব্যবহারে ও দারার হত্যায় সাজাহানের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু কালবশে তাঁহার হৃদয়ের সে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়,এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন। কিন্তু কৃতঘ্ন কন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক আচরণে লীয়ারের হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা আর যুক্ত হয় নাই, কর্ডিলিয়ার মৃত্যুর চরম আঘাতে তাহা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। লীয়ার নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের যে মহাদৃশ্যগুলি ক্ষোভ, রোষ, বিস্ময়, অনুতাপ, করুণাদির আলোড়ন-বিলোড়নে মনকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, সাজাহান নাটকে সেরূপ কোনও দৃশ্যের সমাবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। মহম্মদ ব্যতীত বিদ্রোহী পুত্রদের অন্য কাহারও সহিত সাজাহানের সাক্ষাৎই হয় নাই। আর মহম্মদ, পিতার আজ্ঞায় তিনি বন্দী, সাজাহানকে শিষ্ট বাক্যে এই সংবাদ দান ব্যতীত তাঁহার প্রতি কোনরূপ কুবচন প্রয়োগ বা নিষ্ঠুর ব্যবহারও করেন নাই। শেষ দৃশ্যে নাট্যকার সাজাহানের সহিত ঔরঙ্গজীবের যে কাল্পনিক সাক্ষাৎ করাইয়াছেন, সে সাক্ষাৎ বিদ্রোহ, হত্যা প্রভৃতি ঘটনার বহুবর্ষ পরের কথা, তখন সাজাহানের মনের তাপ শীতল হইয়া গিয়াছে। লীয়ার কর্ডিলিয়াকে বঞ্চিত করিয়া অত্যাচারী কন্যাদ্বয়কে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সাজাহান দারাকে বঞ্চিত করিয়া ঔরঙ্গজীবকে সর্ব্বস্ব দান করেন নাই। সুতরাং ঔরঙ্গজীবের উপর আদান-প্রদান সম্বন্ধে কৃতঘ্নতা দোষ আসে না। পরন্তু ঔরঙ্গজীব রিগান ও গনেরিল-এর মত পিতার উপর মর্ম্মন্তুদ বাক্যবাণ বর্ষণ বা উৎপীড়নও করেন নাই। তাহার উপর সেক্সপীয়র গণেরিল্ ও রিগানের কাল্পনিক চরিত্রের কালিমা নাটকোচিত ভাবে গাঢ়তর করিয়া দেখাইয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু ঔরংজীবের ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর সেরূপ ইচ্ছামত মসীলেপন করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত সেরূপ করিলে ইতিহাসের অপলাপ ও ঔরংজীবের প্রকৃত চরিত্রের প্রতি অবিচার করা হইত। কিন্তু ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে,উৎপীড়কের প্রতি বিতৃষ্ণা না জন্মিয়া সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে; উৎপীড়িত সাজাহানের নির্য্যাতনের তীব্রতা লঘু হইয়া গিয়াছে। সাজাহানকে নাট্যকার লীয়ারের মত বহির্জ্জগতের ঝটিকার সহিত অন্তরের ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপ মিলাইবার অবসর দিয়াছেন। কিন্তু রজনীর ঘনান্ধকারে নিরাশ্রয় ও পথহারা লীয়ারের মস্তকের উপর দিয়া ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল; আর সাজাহান আগ্রার প্রাসাদের মর্ম্মরপাষাণে জাফ্রিকাটা বাতায়ন

পথে যমুনার উপর ঝড়বৃষ্টির খেলা দেখিয়াছিলেন! উভয়ের বংশগত ও শিক্ষাগত চরিত্রের মধ্যেও তুল্যরূপ ব্যবধান! নাট্যকার নিরুপায়। ইতিহাস তাঁহার কবিকল্পনাকে শতরজ্জুবন্ধনে টানিয়া রাখিয়াছে, ঊর্দ্ধগামী হইতে দেয় নাই। •

লীয়ার নাটকে নির্য্যাতন প্রধানত লীয়ার একাকীই ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু সাজাহান নাটকে উৎপীড়নটা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। দারাই বোধ হয় উহার চরম ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের উপরই মনোযোগ ও সহানুভূতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। দারা ধর্ম্মমতে উদার, অকপট ও বীর; কিন্তু কুটবুদ্ধিতে ও কর্ম্মপটুতায় ঔরংজীবের সহিত তাঁহায় তুলনাই হয় না। ইতিহাসের এই চিত্র নটেকেও স্থান পাইয়াছে। পরন্তু দারার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ছবি নাট্যকার বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। দারাকেও নাট্যকার পত্নীগতপ্রাণ ও সন্তান-স্নেহ-বিগলিত-হৃদয় রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে স্ত্রীপুত্রগণের অসহ্য কষ্ট দর্শনে তিনি যখন উন্মাত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার প্রিয়পত্নী নাদিরাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হয়েন, সে চিত্র ভীষণ হইলেও, তাঁহার চরিত্রে সঙ্গত। ইতিহাস বলে যে, তিনি অধীর ও অসহিষ্ণু ছিলেন। নাদিরার মৃত্যুকক্ষে, নীচ জিহন খাঁর সম্মুখে সিপারকে কাঁদিতে দেখিয়া দারা যখন রুক্ষভাবে "সিপার"! বলিয়া ডাকিয়া বালকের দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন দারার আত্মসম্মানজ্ঞানের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে।

দারা উৎপীড়িত; ঔরংজীব উৎপীড়ক। দারার দুঃখে সহানুভূতি উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে ঔরংজীবের উপর বিতৃষ্ণা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকে ঔরংজীবের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সে বিতৃষ্ণা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না। দারার মৃত্যুদণ্ড দিবার সময় ইতস্তত করণ, দারার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ, জিহন খাঁ নিহত হইলে সন্তোষপ্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাসসঙ্গত কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু নাটকে সেগুলি ঔরং-জীবের আন্তরিক অনুভূতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে ফলে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের ক্ষতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নাট্যকার দারা-চরিত্রের দোষগুলি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দারার প্রতি সহানুভূতি-উদ্রেকের সহায়তা করিয়াছেন। দারা দাম্ভিক ছিলেন; বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া ক্ষমতার আস্বাদে তাঁহার ঔদ্ধত্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিবাদ আদৌ সহিতে পারিতেন না। আমীর

ওমরাহগণকে অকারণে অবমাননা করিতেন। মেনুসী বলেন, দারা তাঁহার এক ক্রীতদাস আবার খাঁর সহিত সকল বিষয়ে তাঁহাদের তুলনা করিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। সঙ্গীতকলানুরাগী অম্বর-রাজ জয় সিংহকে তিনি "ওস্তাদজী" সম্বোধনে উপহাস করিতেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী উপপত্নী-দিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ছিলেন, এবং সাজাহানের বর্দ্ধিতপ্রতাপ মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন, এরূপ দুর্নামের কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তিনি বিপৎকালে আমীর ওমরাহগণের সহায়তা প্রাপ্ত হয়েন নাই। নাট্যকার এ সকল কথার উল্লেখ না করিয়া ভালই করিয়াছেন।

নাট্যকার ঔরংজীবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে এক বিরাট পুরুষ-কারের চিত্র। নাট্যকার অতি সন্তর্পণে ও আন্তরিক সহানুভূতির সহিত এই চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং তাঁহার যত্ন যে সর্ব্বতোভাবে সফল হইয়াছে, এ কথা রসজ্ঞমাত্রই স্বীকার করিবেন। ঔরংজীবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দুরদর্শিতা, কার্য্যতৎপরতা, বিপদে স্থৈর্য্য, আত্মদমন ক্ষমতা স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ঔরংজীবের মহান্ চরিত্রের সহিত তুলনায় তাঁহার ভ্রাতাদিগের চরিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়, এবং তাঁহার রাজ-নৈতিক বুদ্ধির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাঁহারা যে শিশুর মতই অক্ষম, তাহাও নাটকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাপর চরিত্রের ন্যায় ঔরংজীব-চরিত্রেরও দোষগুলি নাট্যকার যত দূর সম্ভব অন্তরালে রাখিয়াছেন। কিন্তু দোষগুলি এতই গুরুতর যে, শত চেষ্টাতেও তাহাদের কালিমা ধৌত হইবার নহে। ঔরংজীব যে কেবল শঠের সহিত শাঠ্য করিতেন না, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন বুঝিলেই করিতেন, তাহা নাটকেই প্রকাশ পাইয়াছে। জাহানারার প্ররোচনায় মোরাদ তাঁহাকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি মোরাদকে সম্রাট সম্বোধন করিয়া ও নিজে মক্কায় যাইবার ভান করিয়া প্রতারিত করিয়াছিলেন। তিনি যে নিষ্ঠুর ছিলেন, তাহার আভাসও নাটকেই আছে। তিনি দারা ও সিপারকে কঙ্কালসার হস্তীর পৃষ্ঠে মলিনবস্ত্রে দিল্লী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। ইহা ভীষণ নিষ্ঠুরতা। বার্ণিয়ার বলেন, দারার মৃত্যুর আদেশ দিবার সময় দুঃখ প্রকাশটা কূটবুদ্ধির অভিনয়মাত্র। মেনুসী বলেন, দারার মুণ্ড পাইলে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া,দারার

ঃকে যে একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ ছিল, উহাতে তাহা পরীক্ষা করিয়া সাজাহা-
নের আহারের সময় ঐ মুণ্ড একটি বাক্সে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া উপঢৌকন-
স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। ঔরংজীব-চরিত্রের এই অন্ধকার দিকটি কুহেলিকাচ্ছন্ন
রাখিয়া নাট্যকার ভালই করিয়াছেন। অপরাপর চরিত্রেরও তিনি গুণের
দিকটাতেই আলোকপাত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ঔরংজীব-চরিত্রের প্রতি
সহানুভূতিবশত কোনও বিশেষ পক্ষপাত করেন নাই। পরন্তু তিনি
ঔরংজীবের জটিল চরিত্রের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবগুলির স্বভাবোচিত ভাবে
সমন্বয় করিয়াছেন। ঔরংজীব যে রাজনীতিক প্রতিভাবলে ভারতের
সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে, এবং তিনি মনের যে
সঙ্কীর্ণতার দোষে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন,
তাহাও নীহারিকার আকারে নাটকে বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের
ভূমিকা পাঠ করিলে মনে এক ধ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুঝি বা নাটকে ঔরংজীবের
শুধু রাজর্ষি-মূর্ত্তিতেই সাক্ষাৎ পাইব! নাটক পড়িলে সে ভ্রম থাকে না।
ভূমিকাটি না লিখিলেই হইত!

ঔরংজীব নিজের দুষ্কৃতির কৈফিয়ৎস্বরূপ স্বগতোক্তি করিয়াছেন। শ্রব্য
নাটকে স্বগতোক্তির স্থান আছে; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য লিখিত
নাটকে স্বগতোক্তি অসঙ্গত। অভিনেতা যখন মনের চিন্তা দর্শকগণের
সমক্ষে উচ্চারিত করিতে থাকেন, তখন নিতান্তই অস্বভাবিক বোধ হয়।
বাতুলের মুখে প্রলাপ, বা বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখে প্রভুপত্নীর সৃষ্টিছাড়া আদেশ
সম্বন্ধে স্বগতোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে উচ্চৈঃস্বরে
স্বগতোক্তি অতীব বিরল।

অভিনয় স্বভাবসুন্দর করিতে হইলে, মনের প্রবল উত্তেজনায় বা আবেগে
আত্মবিস্মৃত পাত্র বা পাত্রী ব্যতীত অন্যের মুখে রঙ্গমঞ্চে স্বগতোক্তির আরোপ
সঙ্গত আছে।

মোরাদকে নাট্যকার সাহসী, বীর, সুরাপ্রিয় ও গণিকাসক্ত রূপে চিত্রিত
করিয়াছেন। ইতিহাসও তাহাই বলে। মোরাদের উদরসর্ব্বস্ব ও
মৃগয়ানুরক্ত বলিয়াও খ্যাতি ছিল, এবং তিনি সম্রাট হইলে মুসলমানধর্ম্মের
কোনও ক্ষতি হইত না। তিনি মুসলমানধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন, এ কথাও
ইতিহাসে আছে। তিনি ঔরংজীব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন; সুতরাং
তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ঔরংজীবের মত প্রখর ছিল না, ইহা নিশ্চিত। নাট্যকার

যদি মোরাদের নির্ব্বুদ্ধিতার রং কিছু বেশী করিয়া ফলাইয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

সুজা যে সাহসী ও সমরপ্রিয় ছিলেন,এবং রণক্ষেত্রের বিভীষিকার মধ্যেও নৃত্যগীতে মত্ত হইতেন, এ কথা ইতিহাসে আছে। ঐতিহাসিকগণ,"বলেন-তিনি ঘোর বিলাসী ও অত্যধিক ব্যসনাসক্ত ছিলেন। নাট্যকার তাঁহাকে পত্নীগতপ্রাণ, সরলচেতা, উন্নতমনা ও ভাবুক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

টলষ্টয়ের সাহিত্য-সাধন।

যিনি বিশ্বমানবের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রসন্নমনে দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি কামনার কল্প-কানন ইউরোপে নিষ্কাম ধর্ম্মের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগতের জনসমাজে বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তির অম্লান অমর রশ্মিরেখায় সাহিত্যের তপোবন আজি আলোকিত, সেই সত্যের সাধক, মঙ্গলের উপাসক ও সৌন্দর্য্যের পরম ভক্ত কাউণ্ট টলষ্টয়ের নাম পৃথিবীর সর্ব্বদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সময়ে সেই প্রতিভাশালী পুরুষসিংহের পুণ্য-কথা ও সাহিত্য-সাধনার আলোচনায় আমাদিগের লাভ আছে। তাই আমরা কোনও রসজ্ঞ ইংরাজ লেখকের একটি নিবন্ধ অবলম্বনে টলষ্টয়ের প্রদীপ্ত প্রতিভা ও মহনীয় মনুষ্যত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কাউণ্ট টলষ্টয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিখ্যাত ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক রুসো মানব-মনের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়ের রহস্যরাজি বিচিত্রবর্ণে সাহিত্যের স্বর্ণমুকুরে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। রুসোর পর কাউণ্ট টলষ্টয় মানব-চিত্তের রহস্যরাজি উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতের সাহিত্য-সম্পদ বাড়াইয়া গিয়াছেন। রুসো যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেশ কাল পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জগতের চিরন্তন সম্পত্তি রূপে পরিণত হইয়াছিল। টলষ্টয়ের সাহিত্যও বিশ্বমানবের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে টলষ্টয়ের

গ্রন্থরাজির এত সমাদর ; তাই সেই শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রমূর্ত্তি মহাত্মার পুণ্য-স্মৃতি এখন সকল দেশে শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পচন্দনে পূজিত হইতেছে।

সাহিত্যের তপোবনে প্রবেশ করিয়া রুসোকে অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছিল ; সাহিত্যের লীলায়িত কল-প্রবাহকে নূতন পথে বহাইতে হইয়াছিল; যে সময়ে ফরাসী নর নারী ভলটেয়ারের কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রসমদিরায় বিহ্বল, সেই সময়ে রুসো তাহাদিগকে অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন, নূতন আনন্দ বিলাইয়াছিলেন, নব নব সৌন্দর্য্যের ছটায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রুসোর এই সাহিত্যসাধনা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। রুসোর ন্যায় কাউণ্ট টলষ্টয়কেও অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছিল। দেশের লোক যে সময়ে জ্ঞানগর্ব্বে দৃপ্ত, সমগ্র সমাজ যখন বৈজ্ঞানিক ডারউনের প্রভাবে, মুগ্ধ সেই সময় কাউণ্ট টলষ্টয় তাহাদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়াছিলেন। কুলগরিমাসম্পন্ন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কৃষকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে লোকে তাঁহার কথা শুনিয়াছিল, তাহা নহে। শুধু অকপট ও সরল বিশ্বাসের বলে তিনি এ অসাধ্যসাধন করিতে পারেন নাই। প্রদীপ্ত ধর্ম্মানুরাগের দ্বারা বিলাস-বিভ্রমময়ী, বিজ্ঞান-গর্ব্বিতা পাশ্চাত্যভূমির অধিকারীদিগের মন ভিজাইতে পারা যায় না। রুসোর মত টলষ্টয়েরও মনুষ্য-হৃদয়ে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি ছিল। তাই তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

বাল্যকথা।

অনেকে বলিয়া থাকেন, রুসিয়ার রুদ্র শাসন-নীতি ব্যক্তিবিশেষের আভ্যন্তরীণ শক্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টির পক্ষে বড়ই অনুকূল। ঐ রূপ ঘটনা ক্ষেত্রে পড়িলে শক্তিশালী পুরুষের শক্তিমত্তা ও প্রতিভার বিকাশ অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কাউণ্ট টলষ্টয়ের জীবনে আমরা এই উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারই দেখিতে পাই। দূর-প্রসারিণী অক্ষুণ্ণ দিব্যদৃষ্টি কাউণ্ট টলষ্টয়ের জীবন-সঙ্গিনী। জন্মাবধি তিনি এই তেজস্বিনী ও অকুণ্ঠিত দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টি সর্ব্বভেদিনী, ইহার সম্মুখে কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকিত না। তাই কাউণ্ট টলষ্টয়ের শত্রু মারেজকোভস্কি বলিয়াছেন,—সে কালের বর্ব্বর মানবের ন্যায় তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিই কাউণ্ট টলষ্টয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। টলষ্টয় শৈশবে পিতার চরিত্র বুঝিতে পারিতেন; ভৃত্যকে উচ্চ পদে

দিবার সময়ে তাঁহার পিতার কণ্ঠস্বরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইত, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার ভগিনীর ফরাসী 'গবর্ণেস' বা শিক্ষয়িত্রী যখন যেমন ছলাকলা ও বিলাসলীলা প্রকাশ করিতেন,তাহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। বহু বৎসর পরেও টলষ্টয় তাঁহার বর্ণতূলিকার কয়েকটি স্পর্শেই তাঁহাদিগের পুরাতন ভৃত্যের অবিকল ছবি আঁকিয়াছিলেন। এই পুরাতন ভৃত্য টলষ্টয়ের গৃহশিক্ষকের পরম বিশ্বাসভাজন ছিল। সে যাহা হউক, টলষ্টয় যেরূপ নিপুণতার সহিত চিত্রিত চরিত্রের 'ভিতরের মানুষটিকে' ধরিয়া দেখাইতে পারিতেন, এমন আর কোনও ঔপন্যাসিকই পারেন নাই। তাঁহার বাল্যস্মৃতি-প্লুত শৈশব-চিত্রে, কৃষকের দুর্গন্ধদুষ্ট কুটীরের দৃশ্য বর্ণনায়, এবং বিলাসসম্ভার-সজ্জিত, শিল্পভূষণসমৃদ্ধ ও ইতিহাসবিশ্রুত রম্য প্রসাদ রাজির আলেখ্যেও তাঁহার এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় অভিব্যক্ত।

বৃদ্ধ শিক্ষক।

আমরা এইখানে টলষ্টয়ের অকুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আর একটি পরিচয় দিব। কেমন করিয়া তাঁহার এই দিব্য দৃষ্টি সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভিতরের মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিত, তাহা দেখাইব। আপনারা বোধ করি, বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এলফন্‌স ডোডের "The Last Lesson" বা শেষ শিক্ষা নামক নক্সাটি পড়িয়াছেন। এই গল্পে ফরাসী শিক্ষক স্কুলের বোর্ডে স্বদেশের অমৃতময়ী ভাষায় শেষবার "Vive La France!" এই মাঙ্গলিক বাণী লিখিতেছেন। আমার বোধ হয় লেখক এই গল্পে তাঁহার বিস্মৃত শৈশবের একটু সুধা-সৌরভ, বাল্য-জীবনের স্নেহজড়িত ও মধুময় সঙ্গের একটু কোমল কমনীয়তাকে এই গল্পে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। কাউণ্ট টলষ্টয়ও তাঁহার বাল্যস্মৃতির আলেখ্যে, জাতীয় জীবনের ঘোরদুর্দ্দিনের তিমিরময় পটে ডোডের ন্যায় নিপুণতা সহকারে একটি ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই চিত্রে কোথাও করুণ রসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই। দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনা করিবার মহামন্ত্রে শঙ্খধ্বনি করেন নাই। এই চিত্র মনুষ্য-জীবনের একটি নিখুঁত ছবি। কাউণ্ট পরিবারের বালকদিগকে মস্কো নগরে প্রেরণ করা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা-দিগের বৃদ্ধ শিক্ষক কার্ল্ আইভানোভিচকে চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাই চিত্রের সর্ব্বস্ব। অতি সাধারণ ঘটনা। বালকেরাও শিক্ষকের বড় অনুরাগী নহে, এবং শিক্ষকটিও এই পরিবারের বহু দিনের পুরাতন বন্ধু

সহেন ; কোনও পক্ষেই বিদায়বেদনা-প্রকাশের বিশেষ অবসর দেখা যায় না। কিন্তু টলষ্টয় এমনই কৌশলে ছবিটি আঁকিয়াছেন যে, চিত্রের দিকে চাহিলেই আপনি দেখিতে পাইবেন, আপনার সম্মুখে সেই জরাজীর্ণ ক্লান্ত শিক্ষক বসিয়া রহিয়াছেন। ব্যর্থ আশ্বাসে শীর্ণ বাহু আন্দোলিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিতেছেন, বাড়ীর কর্ত্রী তাঁহাকে কত ভাল বাসেন ; কিন্তু গৃহস্থালীর উপর তাঁহার কোনও কর্ত্তৃত্বই নাই। এই দারুণ শীতে তাঁহাকে সুখের আবাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এই বিশ্রামনিকেতন হইতে আবার সংসারের কুটিল আবর্ত্তে ঝাঁপ দিতে হইবে। মোপাসাঁ এই চিত্র আঁকিতে বসিলে ঠিক টলষ্টয়ের মতনই হয় ত ছবিটি আঁকিতেন ; কিন্তু শেষে শ্লেষরঞ্জিত কণ্ঠে একটা টিপ্পনী না কাটিয়া থাকিতে পারিতেন না। ডিকেন্স হইলে ঐরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া করুণাবিগলিতহৃদয়ে দুই ফোঁটা চখের জল ফেলিতেন। কিন্তু কাউণ্ট টলষ্টয় এ স্থলে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্।

সিবাস্তপুল।

কাউণ্ট টলষ্টয়ের এই দিব্যদৃষ্টি চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। আর এই দৃষ্টির প্রভাবে তিনি নিজ জীবনের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন বলিয়া তাঁহার জীবন কার্য্য-বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠদ্দশা, সমাজে প্রবেশ, বিলাসতরঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন, তিনি এরূপ কৌশলে লিখিয়া গিয়াছেন, যেন আর কেহ তাঁহার পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয়ে লেখনী চালনা করে নাই। কিন্তু সত্য বলিতে কি, তিনি যেমন করিয়া জীবনের ঘটনারাজির বিশ্লেষণ ও চিত্রণের কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয়, শুধু মসী দিয়াই ঐ সকল কথা লিখেন নাই, মসীর সঙ্গে আরও কিছু ছিল। কিন্তু টলষ্টয়ের জীবনে আর একটি দিক আছে। সেটি তাঁহার ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব। তিনি প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই কোনও বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতেন না। তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। সকল বিষয় প্রশ্ন করিয়া বুঝিতেন, তদ্ভিন্ন তিনি নিজের হৃদয়-রহস্য বুঝিবার জন্য আত্ম-হৃদয়কে প্রশ্ন করিতেন। এই দুই শক্তির সমাবেশের ফলে তিনি অকুণ্ঠিতদৃষ্টিতে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। তাই তিনি একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বেই ঔপন্যাসিকের সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও গুণগ্রামের অধিকারী হইয়াছিলেন। "সিবাস্তপুলের স্মৃতি" নামক গ্রন্থে তাঁহারা এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অতুলনীয় সাধুতা ও আন্তরিকতা

পরিদৃষ্ট হয়। টলষ্টয় মানব-চরিত্রের চিত্রণে ও বিশ্লেষণেই যে কেবল সাধুতার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি আপনার প্রতিও সম্পূর্ণ সাধুতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সিবাস্তপুলের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকালে এক জন সামান্য সৈনিকের মনের ভাব কিরূপ হয়, যদি তাহা দেখিতে চান, এই পুস্তকেই তাহার পরিচয় পাইবেন। দেখিবেন, পরিচিত স্থান হইতে বিদায়গ্রহণকালে সৈনিকের মনে প্রথমে ক্ষোভের সঞ্চার হইতেছে; তাহার পর শত্রুপক্ষের অনুসরণের ভয় আসিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। এ একটি স্থূল চরিত্রের স্থূল চিত্রমাত্র। যে চিন্তার স্পর্শে বিপুল জন-সমাজের হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হইতেছে, "War and Peace" বা "সমর ও শান্তি" নামক উপন্যাস লিখিবার সময় তিনি সেই চিন্তাধারাকে ধরিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় অন্তর্ব্যথাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মানব-হৃদয়ের রহস্য-চিত্রণের চিরপ্রচলিত রীতিকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে দুঃখদৈন্যপীড়িত বাসনাবিমুগ্ধ মানব-সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে তিনি শৈশবে ধাত্রীগৃহে মানুষের হৃদয়-প্রবৃত্তির খেলা দেখিতে শিখিয়াছিলেন, নররুধিররঞ্জিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তিনি সেই সুদূরগামিনী অন্তর্দৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ করিবার জন্য তিনি আত্মহৃদয়কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসিতেছিলেন। War and Peaee এবং সিবস্তপুলের ক্ষুদ্র চিত্রে তাঁহার যে অন্তর্দৃষ্টি শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার "The Cossacks" নামক উপন্যাসের উন্মুক্ত ও সুন্দর চিত্রে সেই অন্তর্দৃষ্টির দিব্যদ্যুতি প্রতিফলিত। এই উপন্যাসের মধ্যেই তাঁহার "Auna Kareuin" নামক অপূর্ব্ব উপন্যাসের বীজ নিহিত। এই অক্ষুণ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে তিনি এই কর্ম্মবৈচিত্র্যময় সুখদুঃখবেদনাপূর্ণ সংসারের অনন্ত ও বিচিত্র রস-ভাব-প্রবাহ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তির অদ্ভুত লীলা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে নাই। কাউণ্ট প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক। নিসর্গের বিচিত্র শক্তির তাঁহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইত; তিনি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মৃণ্ময়ী লোকধাত্রী বসুন্ধরা ও সেই মৃণ্ময়ীর মৃত্তিকাকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত কৃষককুলের প্রতি তাঁহার সমবেদনা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার সাধারণ জীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

জীবনের সার সম্পত্তি।

এরূপ শক্তিশালী পুরুষ হইয়াও টলষ্টয় জীবনের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য সে শক্তির নিয়োগ করেন নাই ; মনুষ্য-জীবনে যাহা মহীয়ান ও গরীয়ান, সংসার-সমুদ্রে সেই সারধনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। সৈনিকপুরুষ ও মৃগয়াবিলাসী হইয়াও তিনি পিপাসার্ত্তহৃদয়ে সাহিত্য ও ললিত কলার,—দর্শন ও বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে টলষ্টয় তাঁহার অগাধ ও উদগ্র উৎসাহের অপব্যয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া সেই একই প্রশ্ন নিরন্তর উত্থিত হইতেছিল। তাঁহার দুইখানি মহান্ উপন্যাস—"War and Peace" এবং Anna karenin"র দুইটি প্রধান চরিত্র পিয়ারী ও লেভিনের চরিত্রে তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে ও স্থিরদৃষ্টিতে জীবন-সমস্যার উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, টলষ্টয় সে সময় ধ্যানমৌন ঋষির ন্যায় জ্ঞানদীপ্ত দিব্যদৃষ্টিতে জীবন-সমস্যার উত্তর খুঁজেন নাই,—তখন সমাজের উচ্চ স্তরের—প্রেমোৎসবময় কামনা-কুঞ্জের বিলাসবিমুগ্ধ নর-নারীর চরিত্রের রহস্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ;—তখন পার্থিব ভোগবিলাসের সুধা ও গরল আকণ্ঠ পান করিয়া ভোগে তাঁহার অরুচি ধরিয়াছিল। কাউণ্ট টলষ্টয়ের হৃদয়ের এই দুইটি প্রতিবিম্ব—পিয়ারী ও লেভিন প্রথমে নূতন জ্ঞানের পিপাসায় উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়াছিল ; শেষে আবার পুরাতন ও সনাতনের আকর্ষণে সে পথ ছাড়িয়া সহজ ও সরল জীবন-পথের পথিক হইয়াছিল। ইহারা কৃষকদিগকে আপনাদিগের গুরু বলিয়া মানিয়াছিল ; কৃষকদিগের নিকট অনেক নূতন তথ্য শিখিয়াছিল। কেন না, কৃষকেরা অনাহতদৃষ্টি—তাহাদিগের তেজস্বিনী দৃষ্টিতে প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, টলষ্টয়-চরিত্রের দুইটা দিক আছে। প্রথম, কাব্য-শিল্পী টলষ্টয় ; দ্বিতীয়, ধর্ম্মভাবোন্মত্ত টলষ্টয়—"Tolstoi, the artist, and Tolstoi the religious fanatic" কিন্তু আমার বোধ হয়, যে সকল সরলপ্রকৃতি পাঠক টলষ্টয়ের Resurection উপন্যাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা টলষ্টয়ের চরিত্রে এরূপ সাহিত্যিক সীমারেখা অঙ্কিত করিবেন না। টলষ্টয়ের মধ্যে এমন দুইটি ভাব নাই। বাল্যে যে টলষ্টয় তেজস্বিনী অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে কারল্ আইভানোভিচের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বাপর সেই এক টলষ্টয়কেই দেখিতে পাইতেছি।

বৃদ্ধ টলষ্টয়।

ভিয়েনার বিখ্যাত লেখক হুগো গ্যানজ টলষ্টয়ের একটি শব্দ-চিত্র আঁকিয়াছেন। হুগো গ্যানজ যখন এই লোক-বিশ্রুত ঔপন্যাসিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর। যিনি পাশ্চাত্য সমাজের বিলাস-বিভ্রম-লালিত সভ্যতার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যদিগের ন্যায় সরল, সুন্দর ও আড়ম্বরহীন জীবন-পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে যাইবার সময় লেখকের মনে নানা ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, টলষ্টয়ের যে কাব্যকীর্ত্তি ও ত্যাগের মহিমা তাঁহার মনে মোহের বিস্তার করিয়াছে, এইবার হয় ত সেই মোহ ঘুচিয়া যাইবে। ধর্ম্মমতবাদ ও ধর্ম্মবক্তৃতার অন্তরালে যে মানুষের কল্পনা এতদিন করিয়া আসিয়াছি, হয় ত সে 'প্রকৃত মানুষটি'কে দেখিতে পাইব না। কাউণ্ট টলষ্টয় কি কেবল বিশ্বাসধর্ম্মের প্রচারক? মানুষের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্যই কি সংসারের নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন? কে জানে! এইরূপ দ্বিধা ও সংশয়ের পর গ্যানজ টলষ্টয়ের দর্শন লাভ করেন।

তিনি বাণীর কমল-বনের কলহংস কাউণ্ট টলষ্টয়ের নিম্নলিখিত চিত্র আঁকিয়াছেন।—শুভ্র ও ভূয়িষ্ঠরোম ভ্রূযুগ এক দিকে নিমগ্ন নয়নোপরি ছায়া বিক্ষেপ করিয়াছে; অন্য দিকে আত্মজ্ঞানদৃপ্তা বুদ্ধির লীলাভূমি উন্নত ললাটপটের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। নাসিকা বৃহৎ—ললাট-সন্ধির দিকে সূক্ষ্ম, নিম্নভাগে সুপুষ্ট ও সুগঠিত। দীর্ঘ শুভ্র গুম্ফরাজি ওষ্ঠাধর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দ্বিধাকৃত তরঙ্গায়িত শুভ্র শ্মশ্রু চিবুকপার্শ্ব হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। মস্তক বিপুলায়তন নহে, কিন্তু সুগঠিত ও সুসন্নদ্ধ। বিশাল ও দৃঢ়-গঠিত স্কন্ধদেশ সৈনিক পুরুষের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত। ক্ষুদ্র-পদ-যুগল রুসিয়ান বুটের গর্ভে বিন্যস্ত ও লঘুগতি। পদক্ষেপ ও মুখমণ্ডলের ভাবব্যঞ্জনা তরুণজনোচিত। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, যিনি যুদ্ধবাদের ঘোর শত্রু, তাঁহার মূর্ত্তিতে পূর্ব্বতন সৈনিক-কর্ম্মচারীর হাবভাব পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। কৃষকের সাজে সজ্জিত থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে মহৎকুলোদ্ভব পুরুষপ্রধানের মহিমা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। মিঃ গ্যানজ টলষ্টয়কে দেখিয়া নিরাশ হন নাই, তাঁহার মোহ-মদিরা-মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গে নাই। যাঁহারা প্রতিভার প্রভায়

ইউরোপ আলোকিত হইয়াছে, যাঁহার কম্বু-কণ্ঠের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া ইউরোপের ধর্ম্মবিশ্বাসহীন নরনারী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া গ্যানজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, —"এইমাত্র আমি যাঁহার কর-পল্লব ধারণ করিলাম, তিনি বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মচেতনার অবতারস্বরূপ।"

টলষ্টয়ের স্থান।

যে বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের সমাবেশবলে বর্ত্তমান যুগের চিন্তা-তরঙ্গিণীর প্রবাহ বহিতেছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই পৃথিবীর জন-সমাজে কাউণ্ট টলষ্টয়ের স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সত্য ও ধ্রুব ভিন্ন তিনি জীবনের আর সমস্তই ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি বা ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহার অন্তরে যে মহামন্ত্রের—যে সার সত্যের প্রচার করিয়াছে, তিনি প্রসন্নচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কামপুষ্ট—স্থূল সুখ ভোগ করিয়াও স্থূল সৌন্দর্য্যের আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সংসার-সাগর হইতে ভাব ও রস গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ করি, আর কোনও ঔপন্যাসিক তেমন পারেন নাই। সমরমদবিহ্বলতা ও যুদ্ধের করাল সৌন্দর্য্যকে ধর্ম্মস্বরূপ করিয়া তিনি নির্দ্বন্দ্বের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের আরাধনা করিয়া তিনি স্বীয় ত্যাগধর্ম্মের নিদর্শন রূপে কৃষকের দীনবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একাকী সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিয়া গিয়াছেন, উন্মদ রাজশক্তির প্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; স্বেচ্ছাতন্ত্রের সংহার-লীলা দেখিয়া কুণ্ঠিত হন নাই; অসন্দিগ্ধচিত্তে—অবিচলিতহৃদয়ে—লাভ-ক্ষতি গণনা না করিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। রুষিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্র এই মহীয়ান পুরুষের কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। টলষ্টয় একবার রুষিয়ার রাজপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি কোথায় আছি, তাহা তাঁহাদিগের অগোচর নাই; ইচ্ছা হইলেই তাঁহারা আমাকে ধরিতে পারেন।" যে বিপুল সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গ ভীতিস্তম্ভিত ও মূক—সে দেশে স্বেচ্ছাতন্ত্র অনেক ভয়াবহ অনুষ্ঠান অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু এই মহিমান্বিত মহাপুরুষ—কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের মহীয়ান মনুষ্যত্বের সম্মুখে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-তন্ত্র কুণ্ঠিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ। প্রথমে 'বেণুবাদিনী'র রঞ্জিত চিত্র। 'অজন্টা গুহা চিত্রাবলী হইতে শ্রীগণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক গৃহীত প্রতিলিপি।' 'চিত্র-পরিচয়ে' ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'বেণুবাদিনীর সর্ব্বাঙ্গে একটি গতির হিল্লোল আছে।' তাহা সত্য। দুঃখের বিষয় এই যে, তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র উপাসক নকলনবীশগণের চিত্রে গোঁড়ামী ভিন্ন অন্য কোনও হিল্লোল দেখা যায় না। তাহার পর, ভাষ্যকার বলেন,—'অনেকে প্রাচ্য শিল্পকে অস্বাভাবিক বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। এই চিত্র তাঁহাদের কথা অস্বীকার করিতেছে।' প্রাচ্য শিল্পে যদি অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তাহা হইলে, তাহা প্রাচ্য শিল্পে বিদ্যমান বলিয়াই ব্যঙ্গের অতীত হইতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে 'বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি দড়' হইয়া থাকে;—'শিষ্য-বিদ্যাই গরীয়সী হইয়া উঠে। প্রাচ্য শিল্পের অনুকারী ও অন্ধ উপাসকদিগের চিত্রে এই অস্বাভাবিকতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অস্বাভাবিকতাই যেন প্রাচ্য শিল্পের প্রাণ! 'বেণুবাদিনী'র স্বাভাবিকতা কেবল কি প্রাচ্য শিল্পের অক্ষম অনুকরণের বিরুদ্ধবাদদের কথাই অস্বীকার করিতেছে? ইহা কি অবনীন্দ্র-পন্থী পটুয়াদিগকে স্বাভাবিকতার গৌরব ও উপযোগিতাও শিক্ষা দিতেছে না? অন্ধ অনুকরণ কখনও 'কলা'র গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও সে চেষ্টা পণ্ড হইতেছে। ইহাই স্বাভাবিক। শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 'ভক্ত ও অবমান' নামক সন্দর্ভে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। সন্দর্ভের শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রবি-ভক্তি প্রকটিত দেখিতেছি। ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে যাঁহার অনভিভবনীয় প্রভাবে এই ভাবের পুণ্য-জাগরণ হইয়াছে'—ইত্যাদি। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে 'বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে' এ ভাব ছিল না। ভক্তের লীলাভূমি বঙ্গে ভক্তি-ভাব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বেণু'র খোঁচায় তাহার 'পুণ্য-জাগরণ' হইয়াছে; ভাব-খোকার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়াছে! সেই জন্যই কি তাহার 'বাহানা'য় ও চীৎকারে কাণ পাতা ভার হইয়া উঠিতেছে? শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিগণের কথা দূরে থাক, চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রভৃতিও বিধুশেখর-কলম-নিঃসৃত ভক্তি-ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া গেলেন! নির্লজ্জ তোষামোদ আর কাহাকে বলে? তবে ইহা ভক্তের ভক্তি, ভক্তের অবমান নহে, সত্যের অবমান। শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'স্নেহের বন্ধন' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এমন সুন্দর গল্প সচরাচর বাঙ্গালা মাসিকে দেখা যায় না। স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র শিশু-চিত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। দীনেন্দ্র বাবু সঞ্জীবের ভূমিকার অধিকারী হইয়াছেন। শিশু-হৃদয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। করুণ রসেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বাৎসল্যের মাধুর্য্যে করুণ রস মিশাইয়া তিনি স্বর্গীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেন। ছোট গল্পে এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। 'স্নেহের বন্ধনে' মাণিক ও তাহার ঠাকুরদাদা মুকুন্দের প্রেম-চিত্রে দীনেন্দ্রকুমার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত কালিদাস রায়ের 'গলিত পত্রে' যে শীতের প্রভাব দেখিতেছি, তাহা বাঙ্গালার নহে। কবি কালিদাসের 'পত্র' অর্থাৎ পাতা বলিতেছে,—

> 'ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের রুধির,
> শুকাইয়া কিশলয়ে দিয়ে যাব ছায়া।'

সাধু সঙ্কল্প, সন্দেহ কি? কষ্টকল্পনার তাড়নায় পাঠকের বুকের রক্তও যখন শুকাইয়া যাইতেছে, তখন অনায়াসে আশা করা যায়, গলিত পত্রের এই সাধু সঙ্কল্প অপূর্ণ থাকিবে না। শ্রীযুত মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সংক্ষেপে 'জেবউন্নিসা বেগমে'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মজুমদারের 'সন্ধ্যায়' ছন্দে গ্রথিত ও অস্পষ্ট। অতএব, ইহাও কবিতা। কবি বলিতেছেন,—'জীবনের সর্ব্ব বাধা টুটে তোমার আমার মাঝে এসেছে সংযোগ।' সুতরাং—

> 'তাই এই অবনত সন্ধ্যা-পক্ষপুটে
> অনুভবি তোমারই মিলন-সম্ভোগ।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহুবার 'জীবন-বাধা' টুটিয়াছে, অতএব নজীর আছে। সুতরাং কবিরও সর্ব্ব-বাধা টুটিল! সব টুটিলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাব-প্রকাশের বাধা টুটিল না। সেই জন্য কবিকে লিখিতে হইল,—

'অবনত সন্ধ্যা-পক্ষ-পুটে।'

এখন, 'বুঝ লোক! যে জানো সন্ধান!' সন্ধ্যা-পক্ষপুটে—সন্ধ্যারূপ পাখীর পক্ষপুটে।—যখন পক্ষপুট আছে, তখন সন্ধ্যাকে পাখী না করিলে চলে না। যেমন, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ।' গঙ্গার গর্ভে গয়লা-পাড়া থাকিতে পারে না! কিন্তু তবু 'মানে' হয়। সন্ধ্যার পক্ষ থাকে না,—'পুট' থাকে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু সন্ধ্যার 'পক্ষপুট' কবির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক—অপরিহার্য্য বলিলেও চলে। কেন না, 'অবনত সন্ধ্যা-পক্ষ-পুট' নহিলে কবি 'মিলন-সম্ভোগ' 'অনুভব' করিতে পারেন না! উঃ কি সৃষ্টিছাড়া কল্পনা!—আমরা বাহুল্যভয়ে সমগ্র কবিতাটির ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আর, শেষভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ, বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত—গদ্যে যাহাকে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বলে। শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্ত বহুকাল পরে 'মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধে সংস্কারক কেশবচন্দ্রের ওকালতী করিয়াছেন! অমৃতবাবু বলেন,—'অনেকে ত স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াই দেখিতেছেন, জাতিভেদ মানিলে আর চলে না। জাতিভেদ মানিলে কেমন করিয়া মুসলমানকে এক মায়ের সন্তান বলিবেন?' বাস্তবিক, অমৃত বাবুর মুন্সীয়ানা—চিন্তার ও কলমের—দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিহারীলাল গাহিয়াছিলেন,—

'তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে?'

হিন্দুরাও গাহিবেন,—হে অমৃত!

তবুও মানিতে হবে,
কি লয়ে 'স্বদেশী' রবে!

ইত্যাদি। 'কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন' করিতে পারেন নাই। অমৃতও পারিবেন না। জগতের কোনও ভেদ এত সহজে, লেখনীর ও রসনার আঘাতে 'ছিন্ন' হয় না। ব্রাহ্ম লেখকগণ জাতিভেদ-রূপ হিন্দুর ভাঙ্গা কুলায় ছাই না ফেলিয়া এখন দিন কতক আপনাদের সমাজে মন দিন না। জাতিভেদ ত দূরের কথা,—ব্রাহ্মসমাজের মন্দির-ভেদ যে আজও ঘুচিল না! দেখিতে দেখিতে আদি, ভারতবর্ষীয়, সাধারণ, নববিধান, প্রতাপ—প্রভৃতি কত 'ভেদ' হইয়া গেল। আবার সেদিন ভবানীপুরে বিপিন বাবুর 'তাব্‌লো-সমাজ' গজাইয়া উঠিয়াছে।—[তাব্‌লো-লব্ধ অর্থে নির্ম্মিত, তাই ঐ নামে নির্দ্দেশ করিলাম। উক্ত সমাজের নাম কি, বলিতে পারি না।] চিকিৎসক! আগে আপনার রোগ আরোগ্য কর। পরে পরের ভেদে রিপুকর্ম্ম করিও! শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিদায়' পড়িয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। ইহার ছন্দের বহর কে মাপিবে? বাঙ্গালায় এমন ডুবুরী কে আছে যে, 'বিদায়ে'র 'গভীর মর্ম্মে ডুব দিয়া'—ক্রমে আমরাও কবি হইয়া উঠিতেছি, কবিত্ব কি সংক্রামক!—ইহার উদ্দেশ্য, অর্থ, গভীর-রহস্য উদ্ধার করিবে? কবি গাহিতেছেন,—

'যতটুকুন সময় হাতে পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে,
অধিকাংশ গিয়াছে তার বাধা বিপদ অতিক্রমে;'

কিন্তু পাঠকের দুর্ভাগ্যক্রমে অবশিষ্ট সময়টুকু কবি মুক্তিমণ্ডপে বা তাস-পাশায় খরচ না করিয়া 'বিদায়' রচনায় বাজে খরচ করিয়াছেন। বলিতেছেন,

'আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম অনাদি এই নদীতটে!'

আহা! যদি আর উঠিয়া 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠে উল্টা-ভাবে বসিয়া সাহিত্য-সংসারে দেখা না দিতেন! 'অনাদি নদীর তটে আছাড়' খাইয়াও যে কবিত্বের হাঁসপাতালে যাইবার প্রয়োজন হয় না, সে কবিত্ব কি 'ডানপিটে'! শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ত্রুটি' লেখকগণের দ্রষ্টব্য। 'দেয়ালের আড়াল' চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ক্ষুদ্র গল্প।

আখ্যান-বস্তু মন্দ নহে। রচনার আদ্যোপান্তে 'চারুচন্দ্রী' মুদ্রাদোষ—খুড়ি!—originality! বর্ণনা শুনুন,—'শুভ্র মুখখানি যেন স্বচ্ছ শাদা মেঘের উপর কালো কুচকুচে রামধনু।' অপূর্ব্ব বটে। পাঠক! বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। এক জন কবি গাহিয়াছিলেন,—'বিচ্ছেদ কাঁঠালের আঠা।' কিন্তু বিচ্ছেদ কাঁঠাল নহে; বিচ্ছেদের গাছে কোনও কালে কাঁঠাল ফলে না। কবির মগজে কাঁঠাল ফলিয়াছিল কি না, তাহাও জানা নাই। কিন্তু 'বিচ্ছেদ কাঁঠালের আঠা' সুরে জোরে চলিয়া গিয়াছে। 'কালো কুচকুচে রামধনু'ও সেইরূপ কবির সৃষ্টি। তাহার পর,—'মুখখানি তার হাসির মতো।' হাসি দেখিয়াছেন? সেইরূপ মুখ! বাল্যে শুনিয়াছিলাম,—'উপমাকালিদাসস্য।' আবার কি কবি কালিদাস চারুরূপে ছলিতে আসিলেন?—চারু বাবু নাম হইতে 'চন্দ্র' বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেই গল্পের হিন্দুস্থানীর মত বলিতে পারেন,—'হাম্ তো কম্‌লী ছোড়া, কম্‌লী হাম্‌কো ছোড়্‌তা নেহী!' তিনি 'চন্দ্র'কে ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু চন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে না। এই গল্পের কট্‌কটে কবিত্বই তাহার প্রমাণ। শ্রীযুত আশুতোষ রায়ের 'চীন-প্রবাস', শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষের 'জীবন-বৈচিত্র্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী হেমলতা দেবী 'ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ' প্রবন্ধে বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রয়াগ বা এলাহাবাদ' সময়োপযোগী। শ্রীযুত জগদীশ গুপ্তের 'কথন' মুদ্রিত করিবার কারণ কি? ইহার উল্লেখ করিয়াও বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যের অপমান করিলাম। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে 'শব-ব্যবচ্ছেদে'র বিধি ভাষান্তরিত করিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু ছিল না, তাঁহারা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। 'চ-বৈ-তু-হি'গুলির উল্লেখ করিবার স্থান নাই। এবার 'সংকলন ও সমালোচন' দেখিতে পাইলাম না।

ভারতী। পৌষ। প্রথমেই 'প্রতীক্ষা' নামক একখানি ছবি। নারীর অর্দ্ধমূর্ত্তি। প্রতীক্ষা কি শোথের মত? চিত্রতার মুখে স্ফীতি দেখিয়া শোথই মনে পড়ে। ইহার কোথায় প্রতীক্ষা, তাহা ত চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইল না। সম্পাদিকার 'নালগিরির টোডা জাতি' ছবি দেখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে। উত্তম। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খুনে' গল্প পড়িয়া মনে প্রশ্ন উদিত হয়,—কে খুনে? লেখক, না গল্পের নায়ক? কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকারের 'কার্য্যকরী শিক্ষা' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুত কালিদাস রায়ের 'গলিত পত্র' নামক তথাকথিত কবিতাটি 'প্রবাসী' পত্রেও মুদ্রিত হইয়াছে। 'চয়নে' 'প্রতিহিংসা' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য। 'ভারতী' সুপ্রবন্ধের অভাব চিত্রে পূর্ণ করিয়াছেন।

বীরভূমি। পৌষ। শ্রীযুত শিবরতন মিত্রের 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'রাজা অশোকে' নূতন তথ্য নাই, কিন্তু সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। 'সঙ্করে' শ্রীযুত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় 'তিন সন্ন্যাসী' নাম দিয়া কাউন্ট টলষ্টয়ের রচিত একটি সুন্দর গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। পাঠক এই গল্প পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত 'পরলোকে মানুষ' প্রবন্ধে প্রেত-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। 'বীরভূমি' কবি-পদ-ভরে টলমল করিতেছে। কবিতাগুলি অপাঠ্য। ভগবান 'বীরভূমি'কে এই কবি-সম্প্রদায়ের প্রভাব হইতে মুক্ত করুন।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

দশম অধ্যায়।

এখান হইতে ইয়ংবেল বিদায় লইয়াছে। গরমের ভয়ে নিমা আর আমার সঙ্গে যাইবে না; সে থুলিং মঠেই থাকিবে। সুতরাং আমাকে এখন দুইটি চামর ভাড়া করিতে হইবে। আর অধিক দিন এখানে থাকিব না। অদ্যই এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব। চামর ভাড়া করিতে আর আমায় কোনও কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। এই আড়তে এক জন লোক ছিল; সে গঙ্গোত্রীর দিকে যাইবে। তাহার দুইটি চামর ছিল। সে চামর দুইটি আমাকে ভাড়া দিব, এবং নিজে পথপ্রদর্শক হইয়া আমার সঙ্গে যাইবে, প্রতিশ্রুত হইল। এই লোকটি হোতি পাশের লোক ও ব্যবসায়ী; অনেকগুলি ছাগ ও মেষ ক্রয় করিয়াছে; গঙ্গোত্রীতে যাইয়া বিক্রয় করিবে। ইহার ৫।৬ জন ভুটিয়া ভৃত্য আছে। অবস্থাও ভাল। এ আমার সঙ্গী হইল। আমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

আমি যে লামার অতিথি, তিনি আমার হঠাৎ যাইবার কথা শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "আমি লামা হইলেও বিষয়ী। আমি বিষয় লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং আপনার কোনও সেবা করিতে পারিলাম না। আপনি অদ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কল্য প্রাতে যাইবেন।" ইঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আর এক জন লামা বলিলেন, "না, এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। শীত ঋতু আগত, বরফপাতের চিহ্ন সব লক্ষিত হইতেছে, পাখী একটিও নাই, তাহারা সব অপরাপর পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে; বরফপাতের ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে এই সব পাখী নিম্নে চলিয়া যায়। আর যে সব বন্য চামর ও ঘোটক এই সব প্রদেশে থাকে, তাহারাও নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। মালা পাশের ব্যবসায়ীরা কেহ অদ্য চলিয়া গিয়াছে, কেহ কাল, কেহ পরশ্ব যাইবে। যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে কাশীলামা অদ্য এই স্থান পরিত্যাগ না করিলে নিরাপদে জমুথানা গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম

করিতে পারিবেন না। অদ্যই লামাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা অত্যন্ত বিপদ।" লামাজীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার আশ্রয়দাতা লামা আমার আহারীয় প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু সিংহ প্রভৃতি আমার সঙ্গীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া চামর প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেলেন।

নিতিপাশের লোকটি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "যদি রাস্তাতে বরফপাত হয়, তবে আমার সর্ব্বনাশ। আমার একটি ছেলে ও ভৃত্য জন্মুখানার নীচের পর্ব্বতে পাঁচ শত ছাগ ও দুই শত মেষ লইয়া আছে। আমি গেলে সে আমার সঙ্গে যাইবে। আর আমার সঙ্গে যে সব ছাগল, মেষ ও চামর আছে, বরফপাত হইলে তাহার একটিও বাঁচিবে না; আর, আমার স্ত্রীও ছোট ছোট তিনটি ছেলে সুন্দুমে আছে, তাহারাও বিনষ্ট হইবে। শীঘ্র শীঘ্র না গেলে কাহারও প্রাণ বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।" আমি বলিলাম, "তাহাতে ভয় কি? আহারান্তেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতেছি।"

দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ হইল। বেলা ১১টার সময় আমরা থুলিং মঠ পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য রাস্তা বড় মন্দ নহে। শতদ্রুর তীরে তীরে যাইতে হইবে। তার পর ছোট একটি চড়াই পার হইয়াই অদ্য আমরা ছাপরাঙ্গে যাইয়া বিশ্রাম করিব। থুলিং মঠ হইতে ছাপরাঙ্গ অনুমান ছয় মাইল রাস্তা। আমরা আজ খুব দ্রুতপদে চলিতেছি। সকলেরই মুখ বরফপাতের ভয়ে ম্লান। কেমন করিয়া গঙ্গোত্রী যাইয়া পহুছিব, সকলেরই মুখে এই কথা। অদ্য রাস্তাতে বড় কষ্ট হইল না। অনুমান বেলা ৪টার সময় আমরা ছাপরাঙ্গের নীচে একটি গুহাতে আশ্রয় লইলাম।

গুহাটি নদীতীরে। গুহার মালিক এক জন ভূটিয়া। এই গুহাটির চতুর্দ্দিকেই শস্যক্ষেত্র; গম, যব পাকিয়াছে। গুহার মালিকেরা শস্যসংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত। ইহা জানা আবশ্যক, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গৃহস্থই গুহাতে বাস করিয়া থাকেন। আমি যে গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সে গুহাটি এ স্থানের গৃহস্থের লবণের গোলা। আমি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখি, গুহার এক দিকে রাশীকৃত লবণ রহিয়াছে। ভূটিয়া গৃহস্থটি তাড়াতাড়ি সেই সব লবণ অন্য গুহাতে স্থানান্তরিত করিয়া গুহাটি পরিষ্কার করিয়া দিল। আমি গুহাতে আসন করিলাম। ইহার পার্শ্বেও অপর একটি গুহা ছিল। আমার সঙ্গীরা উহাতে আশ্রয় লইল।

এই ভুটিয়া গৃহস্থটি পরম ধার্ম্মিক। ইহাদের তিনটি পুত্র। এই তিনটির মধ্যে দুইটিকে থুলিং মঠের ডাবা করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহারা সংসারত্যাগী। কনিষ্ঠকে লইয়া স্বামীস্ত্রী গৃহস্থধর্ম্ম যাপন করিতেছে। এই দেশের রীতি এই যে, যাহারা ধার্ম্মিক গৃহস্থ, তাহারা পুত্রদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক থুলিং মঠে দান করিয়া থাকে। এই গৃহস্থ তাহাই করিয়াছে। অদ্য গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মঠ হইতে ছুটী লইয়া মাবাপকে দেখিতে আসিয়াছে। মা বাপ তাহাকে দেবতার মত সেবা করিতেছে। পুত্রস্নেহ ইহাদের মনে আছে কি না, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু ইহাদের উভয়ের আচার-ব্যবহারে দেখিতেছি, পুত্রকে ভক্তির সহিত সেবা করিতেছে। এই নবীন ডাবা এখনই থুলিং মঠে চলিয়া যাইবেন। মা বাপ কতকগুলি আহারীয় বস্তু তাহার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন, এবং পুত্রকে লইয়া আমার কাছে আসিলেন। বাপ বলিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, এ যেন সন্ন্যাসব্রত পালন করিতে পারে।" পুত্রটি আমাকে প্রণাম করিয়া থুলিং মঠের দিকে চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে দৃষ্টিপথের অতীত না হইল, মা বাপ ততক্ষণ অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া রহিল। পরে তাহারা নিজকার্য্যে চলিয়া গেল।

এখন বিষ্ণুসিংহ আমাকে বলিল, "আমাদের চা ফুরাইয়া গিয়াছে। রাস্তাতে চা নাই। ছাপরাঙ্গ হইতে চা না লইলে আর কোথাও চা পাওয়া যাইবে না।" আমি বলিলাম, "তবে যাও, শীঘ্র ছাপরাঙ্গ হইতে চা লইয়া আইস।" বিষ্ণুসিংহ ছাপরাঙ্গের দিকে চলিয়া গেল।

ছাপরাঙ্গ একটি রাজধানী। ছাপরাঙ্গের রাজার নাম ছাপরাঙ্গ পুং। রাজা এখন ছাপরাঙ্গে নাই। তিনি রাজ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বিধিপূর্ব্বক ডাকাতদের শাসন করিবার জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ত। দূর হইতে ছাপরাঙ্গ রাজধানী দেখা যাইতেছে। রাজধানীটি দর্শন করিয়া আমার বোধ হইল, যেমন গঙ্গার বড় পাহাড়ীতে শালিক প্রভৃতি পাখীরা ঘন ঘন শ্রেণীবদ্ধ গর্ত্ত করিয়া রাখে, সেইরূপ একটি উপপর্ব্বতে দূর হইতে সহস্র সহস্র গর্ত্ত দেখা যাইতেছে। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, সেই সকল পর্ব্বতের গহ্বরেই ছাপরাঙ্গের অধিবাসীদের বাস। এই ছাপরাঙ্গের রাজধানীতে একটি চিত্রশালা আছে। এই চিত্রশালাতে ইংরাজ ভিন্ন নানাজাতীয় মনুষ্যদিগের ছবি রহিয়াছে। কোল, ভীল, সাঁওতালের

রক্ষক কতিপয় লামা। আমি নিজে ছাপরাঙ্গে যাই নাই। সুতরাং ছাপরাঙ্গ রাজ্যের অন্যান্য বিবরণ লিখিতে পারিলাম না।

অনুমান রাত্রি ৮টার পর চা লইয়া বিষ্ণু সিংহ ফিরিয়া আসিল। তৎপরে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিন্দু বিন্দু বরফ পড়িতেছে। কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতসমূহ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। নিকটস্থ নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়াছে। অদ্য আর জল খাওয়া যাইতেছে না। ভৃত্যেরা অগ্নির তাপে বরফ গলাইয়া জল করিল। সেই জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া চা চাহিলাম। আজ চার জল প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। বরফ গলাইয়া চা প্রস্তুত হইল। আমরা সকলে চা পান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে আমরা যে গৃহস্থের অতিথি হইয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "অদ্য বরফ-পাতে রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। অদ্য আপনারা আমার অতিথ্য গ্রহণ করুন। কল্য প্রভাতে যাইবেন।" ইহার কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের যাত্রা বন্ধ হইল। আমি বাহিরে যাইয়া দেখি, প্রায় ১০০ লোক এখানে আড্ডা লইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক মেষ, ছাগ, চামর ও ঘোটক আছে। ইহারা সকলেই মালা পাশ অতিক্রম করিয়া মালা প্রভৃতি গ্রামে যাইবে। অদ্যকার বরফপাতে ইহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। কেহ কেহ ক্রন্দন করিতেছে; কেহ কেহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছে; কেহ কেহ বলিতেছে, "যখন অদ্য হইতেই বরফপাত আরম্ভ হইল, তখন বোধ হয় পশুপাল ও বাণিজ্যের দ্রব্যসমূহ সহ আমরা মারা যাইব, আর রক্ষা নাই।" আমার মনেও যে ভয় হয় নাই, তাহা নহে; তবে ভয়ের আবেগ অতি কম। গুহাতে আসিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরাও মুখ মলিন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এবং জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি বলিলাম, "মন মলিন করিলে নিয়তি ত্যাগ করিবে না। যদি বরফপাতেই মৃত্যু ঘটে, তবে রক্ষা করিবে কে? তোমরা আহারের উদ্যোগ কর, আর বিলম্ব করিও না।" আমার কথা শুনিয়া ভৃত্যেরা আহারের উদ্যোগ আরম্ভ করিল।

বেলা ১১টার সময় রৌদ্র উঠিল। বেলা ২টার মধ্যে বরফ গলিয়া রাস্তা ঘাট নদী পরিষ্কার হইল। এখন সকলের মনে আশা হইল যে, এ স্থান হইতে যাইতে পরিব। এই দিবস এই স্থানেই অবস্থিতি করিলাম। অদ্য প্রায়

৮ ক্রোশ রাস্তা যাইতে হইবে। রাস্তা ভাল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের মধ্য দিয়া সামান্য রাস্তা পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে জলও আছে। কিন্তু কাষ্ঠ একেবারে নাই। আমরা রাস্তা চলিতেছি ও সামান্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছি। এইরূপে চলিয়া অনুমান বেলা ৮টার সময় একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে তাড়াতাড়ি আহার সম্পন্ন করিয়া আবার রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

এখন বেলা ১২টা। খুব বাতাস উঠিয়াছে, মেঘও করিয়াছে, বরফ-পাতের খুব সম্ভাবনা। আধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই বরফবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তার সঙ্গে ঝড়। ছর্‌রা গুলির ন্যায় বরফখণ্ডের দ্বারায় শরীর বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি চামরের উপর সওয়ার ছিলাম। বায়ুবেগে চামরকে ঊর্দ্ধে উঠাইল। আমার দুই জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে ও চামরকে রক্ষা করিল। পূর্ণানন্দজী বায়ুবেগে উঠিয়া যাইতেছিলেন; সঙ্গী এক জন ভুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি চামরের উপর অসাড় হইয়া বসিয়া আছি। হস্তপদ অসাড় হইয়াছে; চামর আস্তে আস্তে চলিতেছে। এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পঁহুছিলাম। এখানে কাষ্ঠ আছে। ভৃত্যেরা অগ্নি জ্বালাইয়া আমাকে ও পূর্ণানন্দকে গরম করিল। এখনও কিছু কিছু বরফ পড়িতেছে। এই স্থানও নিরাপদ নহে। আর ২।৩ মাইল না গেলে নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারিব না। সুতরাং প্রাণভয়ে সকলেই দ্রুত চলিতে লাগিলাম। বেলা ৫টার সময় মাঠ পার হইলাম। এখন ভীষণ উৎরাই। সুতরাং আমাকে চামর পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে নিম্নে অবরোহণ করিতে হইল। একেবারে স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিলাম। যেখানে নামিলাম। সে স্থান নদীতীর। স্থানের নাম মূর্ত্তি। এই স্থানে ১০।১২টি তাম্বু আছে। আর কতকগুলি প্রস্তরের ঘের আছে। এখানে বাতাস বা বরফপাত নাই। এখন অল্প অল্প রৌদ্র উঠিয়াছে। সুতরাং স্থানটি বড় আরামপ্রদ বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ প্রস্তরের ঘেরের মধ্যে আমরা আড্ডা লইলাম। তাম্বুগুলি লোকে পরিপূর্ণ। তাম্বুতে আশ্রয় লইলাম না। এখানে যথেষ্ট কাষ্ঠ আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাশি রাশি কাষ্ঠ সংগৃহীত হইল। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। সকলেই অগ্নির সহায়তায় দারুণ শীতের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম। আবার বৃষ্টি। এবার আর রক্ষা নাই। বিষ্ণু সিংহ বড়ই ব্যস্ত হইয়া কোনও তাম্বুতে আমার

ও পূর্ণানন্দের জন্য একটু স্থান ভিক্ষা করিতে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টার পর আসিয়া আনন্দের সহিত আমাকে সংবাদ দিল, এখানকার পুলিসের তাম্বুতে আপনাদের দুই জনের স্থান হইয়াছে। আমি ও পূর্ণানন্দ বিষ্ণু সিংহের সঙ্গে পুলিসের তাম্বুতে প্রবেশ করিলাম। তাম্বুটি অতি সংকীর্ণ, তবে খুব গরম। অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, চা প্রস্তুত হইতেছে। তাম্বুবাসীরা আমাদিগকে তাম্বুর ভিতরে স্থান করিয়া দিল। তাম্বু-রক্ষার জন্য পুলিসের দুইটি লোক তথায় রহিল, আর চারি জন অন্য তাম্বুতে আশ্রয় লইল। এখানে আসিয়া একটু গরম হইল। পুনঃ পুনঃ চা পান করিতে লাগিলাম। অবশেষে নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

মুর্ত্তি পুলিসের একটি প্রধান আড্ডা, এবং তিব্বতের একটি প্রবেশদ্বার। নিলং পাশ অতিক্রম করিয়া যদি ভিন্নদেশীয় কোনও লোক এখানে আসে, তবে তাহাদিগকে এখানেই গ্রেপ্তার করে। এই মুর্ত্তি অতিক্রম না করিয়া তিব্বতে যাওয়া যায় না। এখানকার পুলিস-কর্ম্মচারীটি বড় ভদ্রলোক। সে আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত স্থান দিল। আর আমরা নিম্ন প্রদেশে যাইতেছি জানিয়া আমাদিগকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এই রাত্রি আমরা এখানে বাস করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিন আমরা সকলেই অনাহারে ছিলাম। প্রভাতে উঠিয়াই দেখি, আহার প্রস্তুত। সঙ্গীরা আহার করিল। আমার আহারে তত রুচি ছিল না। তাহাদের অনুরোধে আমিও কিছু আহার করিলাম। আমার শরীর আজ বড়ই অসুস্থ। পূর্ব্বদিবসের বরফের চোট্ এখনও সামলাইতে পারি নাই। আর কোথাও থাকিবারও উপায় নাই। বরফপাত আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি দিনই অল্প অল্প বরফপাত হইবে। তিব্বতে যাহারা বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিল, তাহারা নীচে নামিয়া গিয়াছে। আমার ভৃত্যেরা বরফপাতের ভয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্য উপায় নাই।

আমি চামর আরোহণে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। রাস্তাতে আর অন্য রকম কষ্ট নাই। আজও খুব ভাল রাস্তা। প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার জ্বর আসিল। আর চলিতে পারি না। জীনের উপর বসিয়া থাকা অসম্ভব। আমার ইচ্ছা, এই মাঠের মধ্যেই

হাঁকাইতে লাগিল। আমি এক প্রকার চেতনাহীনপ্রায় চামরের উপর বসিয়া রহিলাম।

৪ ঘণ্টা পরে আমরা একটি গুহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া চামর হইতে নামাইয়া আমাকে গুহার মধ্যে লইয়া গেল। আমি জ্বরে অচেতন হইয়া গুহার মধ্যে পড়িয়া রহিলাম। পর দিবস প্রাতঃকালে আমার চেতনা আসিল। এখন আমি সচেতন হইয়াছি, ইহা দেখিয়া সঙ্গীরা সকলেই আনন্দিত হইল। বিষ্ণু সিংহ বলিল, "এখনই আপনাকে চামরে আরোহণ করিতে হইবে; কারণ, দুই এক দিনের মধ্যেই এই সব স্থান বরফে ডুবিয়া যাইবে। যেরূপ বরফ পড়িতেছে, ইহাতে গঙ্গোত্রী না গেলে বিশ্রামের স্থান পাওয়া যাইবে না।" আমি তাহার কথাতে কিছু চা পান করিয়া চামরে আরোহণ করিলাম।

অদ্যকার পথও ভাল। তবে একটি সুবৃহৎ নদী পার হইতে হইবে। এই ভাবনা। কি করিব, নিরুপায় হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা ১১টার সময় নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই নদীটির নাম পুলিং। এই নদী পার হইলেই পুলিং নামক গ্রামে উপস্থিত হইব। অতি কষ্টে নদী পার হইলাম, এবং বেলা ১ টার সময় পুলিং গ্রামে পঁহুছিলাম। পুলিং একটি ছোট খাট গ্রাম। এই গ্রামে যথেষ্ট সমতল ভূমি আছে, এবং বহুলপরিমাণে শস্য হইয়া থাকে। এই শস্যের মধ্যে যবই প্রধান, এবং ধান্য ও মটরও কম নয়। এই গ্রামের অধিবাসীরা নিরীহ ও অতিথিপরায়ণ। এই গ্রামে দুই চারি জন লামা আছে ও তিনটি গ্রাম্য মঠ আছে। লামাদের প্রধান কার্য্য,—গ্রাম্য বালকদিগের শিক্ষা, চিকিৎসা ও শান্তি, স্বস্ত্যয়ন। এই গ্রামে ভূতের উপদ্রব কিছু বেশী, এবং লামারাই ভূতের রোজা। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৪।৫ খানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের লামাদিগকে সেই সব গ্রামে যাইয়া শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও ভূতের রোজাগিরি করিতে হয়। এই গ্রামের লামারা ভিক্ষাভোজী। পুলিং গ্রাম তিব্বত রাজের একটি প্রধান আড্ডা। নিলং পাসের লোকেরা পুলিং নদীর পরপারে যাইতে পারে না। পুলিং গ্রাম পর্য্যন্ত আসে। এবং এখানেই চা, বুট, ও যবের পরিবর্ত্তে নুন, সোহাগা ও পশম বিনিময় করিয়া লয়। সুতরাং এই গ্রামকে একটি আড়ত বলিলেও হয়। আমি এই গ্রামে পঁহুছিলে গ্রামবাসীরা আমাকে একটি ভাল ঘর দিল, এবং আহারের সমস্ত বস্তুই প্রদান করিল। এই গ্রামে আসিয়াই আমার জ্বর হইল। সুতরাং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোনও প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে পারি নাই। ক্রমশঃ।

শঙ্খ।*

সাহিত্যের গত শ্রাবণের সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের প্রদীপ ও কনকাঞ্জলির কবিত্ব আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার নূতন কাব্যগ্রন্থ "শঙ্খ" উপহার পাইলাম। এই প্রবন্ধে "শঙ্খে"র সমালোচনা উপলক্ষে অক্ষয়কুমারের কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

কবি পুস্তকখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;—প্রথমাংশ,—কবি-কাহিনী ; দ্বিতীয়াংশ,—গার্হস্থ্যকথা ; তৃতীয়াংশ,—মানসী।

পুস্তকখানির "শঙ্খ" নামকরণের উপযোগিতা ল্যাণ্ডর (Landor) হইতে উদ্ধৃত কবিতাংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

I have sinuous shells of pearly hue Within * * *
Shake one and it awakens, then apply Its polished lips to your attentive ear
And it remembers its august abodes, And murmurs as the ocean murmurs there.

১ম। কবিকাহিনী।

উপক্রমণিকায় কবি বলিতেছেন, তাঁহার হৃদয়-শঙ্খ সংসার-সাগরের কূলে পড়িয়া আছে—

আসে যায় কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি,
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!

যৌবনে কবি "যেখানে মাধুরী ছবি সেখানে আকুল" হইতেন। যৌবনান্তে "কবি" বলিতেছেন—

আমরা জীবন গড়ি মরণে মধুর করি
নিরাশায় নব আশা ;
শিশুরে হৃদয়ে টানি, রমণীরে দেবী মানি
যুবজনে ভালবাসা।
পীড়িতের লাগি বুঝি পতিতের ব্যথা বুঝি
সচেতন রাখি দেশ ;
আমরা দেশের প্রাণ, প্রীতি স্মৃতি, ধ্যান জ্ঞান,
আমরা আদি ও শেষ।

"প্রতিভার উদ্বোধন" কবিতায় বিজ্ঞানের সহিত কবিত্বের সংমিশ্রণ করিয়া কবি সৃষ্টি-তত্ত্বের সরস ও সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—পরমাণু-সমষ্টি হইতেই এ জগতের উদ্ভব। সেকালে এপিকুটেটস্ বলিতেন,—পরমাণুপুঞ্জের এই সংযোগ আকস্মিক ঘটনামাত্র। এ কালে হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন,—উহা কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্র-বিমুখী, এই দুই শক্তির

---

* শঙ্খ।—কবিতাপুস্তক। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

প্রভাবে সংঘটিত; কিন্তু পরমাণুর পশ্চাতে যে আর কিছু আছে, তাহা অনুমান করা কেবল কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। আমাদের সাংখ্যদর্শন-কারও পরমাণু স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লয়েন। কবি কিন্তু শুধুই জড়পরমাণু হইতে এই মহাবিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তিনি পরমাণুর পশ্চাতে চিন্ময়ী শক্তির বিকাশ, সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টাকে দেখেন। কবি বলেন,—

বিধাতার নিকাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা;
চমকিল নব আশাভরে
আনন্দের পরমাণুকণা!

বিধাতার সৃষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির কল্পনা সমাপ্ত করা কবির কার্য্য। স্রষ্টার ভিতরে যে আদি কল্পনা নিহিত আছে, কবির অন্তরেও তাহা বিদ্যমান। কবি বলেন,—

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টিক্রিয়া
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা।
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে চিন্ময়ী চেতনা!
এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ অসীমায়—
নর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য্য-মহিমায়।
লয়ে এস সে আদি কল্পনা,
সুখে দুখে মরণে নির্ভর,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম অনাদি অক্ষয়!

রচনান্তে প্রতিভার ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সকল কবিই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। কবি "প্রতিভার নিবর্ত্তনে" বলিতেছেন,—

কোন্ অমরীর দেবদেহ
ছিল মর্ম্মে জড়ায়ে গোপনে—
দিয়া শোভা, দিয়া প্রেম-স্নেহ,
নাহি দিত বুঝিতে আপনে,
চলে গেছে অলক্ষ্যে কখন্—
কি চঞ্চল দেবতার প্রীতি!
এ কি সত্য—কল্পনা—স্বপন?
না এ কোন জন্মান্তরস্মৃতি?

প্রতিভার নিবর্ত্তন হইলে—কবির অন্তরের ভাবনিচয় সুপ্ত হইলে তাঁহার বাহিরের অনুভূতি প্রবল হয়; ইন্দ্রিয়সমূহ জাগ্রত হইয়া উঠে। কবি তখন "আর্ত্ত" হইয়া ক্রন্দন করেন,—

স্নেহ কি চঞ্চল মর্ম্ম কি ক্ষুধার্ত্ত অস্থি চর্ম্ম
সহস্র তাড়না।
এত নিগ্রহের মাঝে ভুলিতেছি তব কাজে
কর হে মার্জ্জনা।

কবি বলেন,—এই আর্ত্ত অবস্থা হইতে তিনটি উপায়ে শান্তিলাভ হইতে পারে; প্রীতি, শ্রী (Art) অথবা "ত্রয়ী"র (ধর্ম্মের) আশ্রয় গ্রহণ করিলে মনের সন্তাপ বিদূরিত হয়। তাই কবি প্রথমে প্রীতির, পরে শ্রীর ও শেষে ত্রয়ীর শরণাপন্ন হইয়াছেন।

কন্যা, নববধূ, গৃহিণী ও স্থবিরা, নারীর এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের মূর্ত্তি-কল্পনায় কবি শ্রীতির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। নববধূ অতি মধুর মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছেন,—

হে গৃহিণী, দীপ আনি' দেখ বধূ-মুখখানি এসেছে নূতন দেশে কোলে তুলে লও হেসে
হাসিতে মধুর অতি রোদনে মধুরতর, ভালবেসে'—ভালবেসে' পরে আপনার কর।

চিত্র, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও কবিতা, শ্রীর এই চারি মূর্ত্তিতেই কবি তাঁহাকে হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্কিতা রমণীর অঙ্গে কবি দেবললনার শ্রী চিরজাগ্রত দেখেন; ভাস্কর-ক্ষোদিত পাষাণ-প্রতিমায় কবি অনন্ত-জীবন-শ্রী লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হয়েন; সঙ্গীতের করুণ উচ্ছ্বাসে কবির হৃদয়ে অমৃত-প্লাবন উপস্থিত হয়; কবিতার রসোল্লাসে কবির মানসকাননে নব বসন্ত নিত্য বিরাজ করিতে থাকে। কাব্যশ্রীর প্রসাদে গীতগোবিন্দ-পাঠকালে কবির মনে হয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, এবং রাধা তাঁহারই বিরহে রোরুদ্যমানা; শকুন্তলা পাঠ করিবার সময় তাঁহার মনে হয়, তিনিই দুষ্মন্ত, এবং শকুন্তলা তাঁহারই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় লালায়িতা; কাদম্বরী অধ্যয়নকালে তাঁহার ভ্রম হয়, তিনিই পুণ্ডরীক, মহাশ্বেতা তাঁহারই মৃত্যুসংবাদে চিরব্রহ্মচর্য্যপালনরতা। এইরূপে কবি আত্মহারা হইয়া কখনও বা মনে করেন, তিনি বিরহী যক্ষ; কখনও উর্ব্বশী-পরিত্যক্ত পুরূরবা; কখনও ভাবেন, তিনি দময়ন্তী-হারা নল; কখনও বা অনুভব করেন, তিনি সতীদেহস্কন্ধে তাণ্ডবনৃত্যকারী মহাদেব। আবার কখনও বা কবি আপনাকে পাষাণ-স্থপতির অমর-রচনা "মর্ম্মর-স্বপ্ন" তাজমহলের স্থাপয়িতা সাজাহান ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

"ত্রয়ী" কবিতায় কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় ধর্ম্ম-সাধনা। ধর্ম্মসাধনা শক্তি-মন্ত্রে, কৃষ্ণমন্ত্রে, অথবা বৈদিকমন্ত্রে হইতে পারে। শক্তি-আরাধনায় কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইলে মদমাৎসর্য্যাদি-জনিত মনের সঙ্কীর্ণতা বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণমন্ত্রে প্রেমের পীযুষধারা-বর্ষণে জগৎ আনন্দময় বলিয়া ভক্তের প্রাণে প্রতিভাত হয়, এবং বৈদিক মন্ত্রের সাধক রোমাঞ্চিতকলেবরে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখেন,—

সোম-গন্ধে সামচ্ছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজলি' অম্বর!

কবিকাহিনীর কবিতাগুলি পাঠ করিলে, কবির মনের গতি কোন দিকে, আমরা তাহা দেখিতে পাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতার দিকে। আধ্যাত্মিক ভাবেই তাঁহার বস্তুর স্বরূপনিরূপণ, এবং সৌন্দর্য্যবোধ। কবি উচ্চগ্রামে তাঁহার হৃদয়-বীণার সুর বাঁধিয়াছেন; বীণা উদারা মুদারা অতিক্রম করিয়া তারায় উঠিয়া বাজিতেছে।

২য়,—গার্হস্থ্য-কথা।

প্রথমেই কবির একটি প্রার্থনা। দুঃখী, সুখী, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি, কবি, সকলেই নিজ নিজ মনের মত কামনা করেন। সংসারী অক্ষয়কুমার প্রার্থনা করিয়াছেন,—

গৃহী আমি জীব-যুদ্ধে ডাকি হে কাতরে
দয়াময় হও হে সদয়।

গৃহস্থাশ্রমের সুখদুঃখ ভোগ করিয়া কবি যখন দেখিলেন, সংসারে পিতৃহীন, মাতৃহীন, সন্তানহারা ও বিপত্নীক হইতে হয়; শিশুর মৃত্যু, পুত্রকে মাতৃহীন, কন্যাকে মাতৃহীনা, প্রিয় বন্ধুর অকাল-মরণ, বালবিধবার বিষাদমলিন মুখ প্রত্যক্ষ করিতে হয়; সৎকে অসৎ, বিনয়ীকে দাম্ভিক, সুখীকে দুঃখী দেখিতে হয়; তখন কবি জীবন-রণে পরাভব মানিয়া সংসারের শ্মশানপ্রান্তে ভগবানের নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিয়াছেন,—

এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক শেষ
তুমি যেন আর—
একটি একটি করি' ন্যায় তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার।

এই গার্হস্থ্যকথার কবিতায় অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় কাব্যকুঞ্জে এক নূতন সুর ঝঙ্কৃত করিয়াছেন। অবিরত প্রেমের গান-শ্রবণে অবসাদগ্রস্ত বঙ্গীয়-কাব্যামোদীর প্রাণে এই কবিতাগুলি স্বাদবৈচিত্র্যের আভাস দিবে। বেলা মল্লিকা যূথিকার সুবাসে আমাদের গৃহাঙ্গন নিত্যসুরভিত থাকিলেও, বহিরুদ্যানের গোলাপের উজ্জ্বলতর শোভা দেখিতেই আমরা উন্মত্ত। আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ সেই ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির মৃদুগন্ধ যে কত স্নিগ্ধ, কত মধুর, নিত্যপরিচয়ে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সন্তানস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, দৈনন্দিন গৃহস্থ-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও আচার-উৎসবের কথায় কোনও নূতনত্ব নাই—Romance নাই, সুতরাং সেগুলি কাব্যকলার অন্তর্ভূত হইবার উপযোগী নহে, যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা অক্ষয়কুমারের এই গার্হস্থ্য-কথার কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। "বন্ধুর

বিবাহে", "পঞ্চদশবর্ষ গত", "হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়", "নৃত্যকৃষ্ণ বসু" কবিতাগুলিতে আমরা কবির হৃদয়ের একটি দুর্লভ গুণের পরিচয় পাই,—আমরা বুঝিতে পারি, বন্ধুদিগের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, বন্ধুদের স্মৃতি কবির হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। অনেকগুলি কবিতাতে কবির সন্তান-স্নেহ উজ্জ্বলে মধুরে পরিব্যক্ত হইয়াছে। "কন্যার বিবাহে" কবিতাটি বাঙ্গালী-জীবনের একটি হর্ষবিষাদ-বিজড়িত মধুরছবি মনশ্চক্ষে প্রতিভাত করে। মাতৃহীন, মাতৃহীনা ও বালবিধবার করুণ কাহিনী, প্রাণকে শোকের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করে। অদৃষ্টপূর্ব্বমৃত্যুদৃশ্য পিতৃহীন বালকের মৃত পিতাকে নিদ্রিত ভ্রমে অনির্দ্দিষ্ট-বিপদাশঙ্কায় কাতর ক্রন্দন, সমবেদনার গুরুভারে মনকে দলিত মথিত করিয়া দেয়। বিপত্নী-কের মুখে "ঘরে যেন কেহ নাই পথে যেন সব" প্রভৃতি সরল সত্য কথাগুলির গভীর ব্যথা হৃদয়ের অন্তস্তলে যাইয়া প্রবেশ করে।

"আহ্বান" ও "সদ্যোজাতা কন্যা" শীর্ষক কবিতা দুইটিতে প্রতীচ্যের বিবর্ত্তনবাদের বা ক্রমবিকাশতত্ত্বের (Theory of Evolution) এবং প্রাচ্যের জন্মান্তরবাদের অভিব্যক্তি আছে। কবিতার আবরণের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের প্রবাহ অন্তঃসলিল বহিয়া গিয়াছে। কোমলকান্ত কবিতার আচ্ছাদনে বিজ্ঞানের কাঠিন্য অনুভবই করা যায় না।

"জন্ম ও মৃত্যু" কবিতাটি পাঠ করিলে ইংরাজ কবি চার্লস ল্যাম্বের On an infant dying as soon as born" শীর্ষক উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার কথা মনে পড়ে। ল্যাম্বের কবিতার সহিত অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, একই উদ্দেশ্যে ও একই অবস্থার কবিতা-রচনাকালে ইংরাজ ও বঙ্গীয় কবির চিন্তাস্রোত কিরূপ বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ল্যাম্বের কবিতার নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টির সহিত অক্ষয়কুমারের

> বারেক মেলিল আঁখি, ফেলিল নিশ্বাস,
> কত জন্ম-পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ!

পংক্তিদ্বয় পাঠ করিলে, পাঠক জন্মান্তরবাদী বঙ্গীয় কবির ও পরজন্মে অবিশ্বাসী ইংরাজ-কবির ধ্যান-ধারণার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

> She did but open eye, and put
> A clear beam forth; then straight up shut
> For the long dark; never more to see
> Through the glasses of mortality.

উক্ত কবিতায় শিশুর জন্মমাত্র মৃত্যুতে বিধাতার কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, জন্মমৃত্যু-রহস্যের এই দুর্বোধ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মানসে ল্যাম্ব যে সকল আনুমানিক কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সহিত, অক্ষয়কুমার "শিশুহারা" কবিতায় সেই একই উদ্দেশ্যে বিধাতাকে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে, আমরা ইংরাজ ও বাঙ্গালী কবির কল্পনার প্রভেদ আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারি। "শঙ্খে"র "শিশুহারা জননী" বিলাপ করিয়াছেন,—

হা বিধি,
কেন রে করিলি তারে চুরি!
অভাব কি হয়েছিল স্বরগে মাধুরী?
ভরিতে কাহার বুক
হরিলে আমার সুখ!
তার সেই হাসিমুখ চাঁদে নাহি দিলে—
যেত কি রে সব আলো নিবিয়া অখিলে?
বুকখানা ভেঙ্গে' চুরে'
কার বুকে দিলি জুড়ে'—
আমার সে বুক-বাঁধা বাহু দুটি তার?
ছিঁড়ে দিল কোন্ শাখা কল্পলতিকার!
আমারে করিয়া অন্ধ
কারে দিলি সে আনন্দ?
কোন্ স্বর্গ-হরিণীর অন্ধ শিশু ছিল—
সেই দুটি টানা চোখে আবার চাহিল!
কোন নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোৎস্না হাসে,
কোন মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে—
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে!
কোন্ অপ্সরার বীণা
হতেছিল সুরহীনা?
দিয়ে তায় আধকথা—নবীন ঝঙ্কার,
বিষণ্ণ দেবতা-কুলে ভুলালি আবার!
বাছা রে,
আজি স্বর্গ-রঙ্গভূমে
কত দেবী তোরে চুমে।
সে আনন্দ-কোলাহলে খুঁজিস কি মোরে?
পেয়েছে কি হেন কেহ
জানে জননীর স্নেহ।
তেমনি কি ভয়ে ঘুমে নামায় না তোরে।
শত কোলে ফিরে' ফিরে'
কার কোলে ঘুমালি রে—
আপন করিলি কারে মারে করে' পর।
জীবন- শ্মশান-কূলে
বসে' আছি বড় ভুলে'।
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দর দর—
আজ তুই কোথা, বাছা, কত দূরান্তর!

এই কবিতাটির সহিত পাশ্চাত্যের আর একটি সুন্দর গীতি-কবিতার সাদৃশ্য আছে। সেটি ভিক্টর হিউগোর Epitaph। কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

He lived and ever played, the tender smiling thing.
What need, O Earth, to have plucked this flower from blossoming?
Hadst there not then the birds with rainbow colours bright,
The stars and the great woods, the wan wave, the blue sky?

What need to have rapt this child from her thou hadst placed him by
Beneath those other flowers to have hid this flower from sight.
Because of this one child thou hast no more of might ;
O star-girt Earth , his death yields thee not higher delight !
But oh ! the mother's heart with woe for ever wild,
This heart whose sorrow bliss brought forth such bitter birth
This world as vast as those, even thou, O sorrowful Earth,
Is desolate and void because of this one child !"

ফরাসী সাহিত্যের মহারথী ভিক্টর হিউগোর কবি-প্রতিভার সহিত দীন বঙ্গ-সাহিত্যের সেবক অক্ষয়কুমারের কবিত্বের তুলনা করিলে ধৃষ্টতা হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কবিজনোচিত ভাব-প্রবাহের প্রভেদ-প্রদর্শনমাত্র। রসজ্ঞ পাঠক হিউগোর কবিতাটির সহিত অক্ষয়কুমারের কবিতাটি মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, জড়বাদী পাশ্চাত্য কবির উপমাগুলি পার্থিব বস্তুতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু অধ্যাত্মবাদী বঙ্গীয় কবির কল্পনা মর্ত্ত্য ছাড়িয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর। পরন্তু বঙ্গীয়-কবির "আলুথালু মতিচ্ছন্না" শিশুহারা মাতার শোকের চিত্র বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণে যে তীব্রবেদনার ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করে, উল্লিখিত ইংরাজ ও ফরাসী কবির সংযত শোকোচ্ছ্বাস সেরূপ করে না।

"সন্ধ্যা" কবিতায় অক্ষয়কুমার সন্ধ্যার নারী-রূপ কল্পনা করিয়া উপমাকে বন্ধুর ও পিচ্ছিল পথে বহু দূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অমর মহাকবি মধুসূদনও মেঘনাদবধ মহাকাব্যে পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদার রাজসভায় প্রবেশের চিত্রবর্ণনায় উপমার দৈর্ঘ্য বর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়াছেন,—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার , জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !

মধুসূদন যে এই সুদীর্ঘ উপমা-গঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি না। কবির কষ্টকল্পনা উপমার অগ্রগতির সহিত পদে পদে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সন্ধ্যাবর্ণনার উপমা অতি সহজগতিতে চলিয়া গিয়াছে।

"শঙ্খে"র গার্হস্থ্য-কথার কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। ইতালী দেশে সনেটের উদ্ভব। সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ড্স্-

ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌, রসেটী প্রভৃতি বহুতর ইংরাজ কবি সনেট-রচনায় যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনই চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছেন। সনেটের ছন্দের কয়েকটি কঠোর নিয়ম আছে। সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে, এবং সনেটে একটিমাত্র ভাবের উত্থান ও পতন (ebb and flow) না থাকিলে সনেট হয় না। যাঁহারা বলেন, ক্ষুদ্রগীতিবহুল বঙ্গীয়-কাব্যসাহিত্যে সনেটের স্থান নাই, তাঁহারা সনেটের বিশেষত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করিতে পারেন না। মধুসূদনের অনেকগুলি কবিতাই প্রকৃত সনেট। অক্ষয়কুমারের চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিও সনেট; প্রত্যুত সেগুলি নিখুঁত ও উচ্চ অঙ্গের সনেট-নামে অভিনন্দিত হইবার পূর্ণমাত্রায় দাবী করিতে পারে। আমরা "শঙ্খে"র সনেটগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

"আদর", "মাণিক", "পঞ্চদশবর্ষ গত" ও "পূজার পর" কবিতাগুলি হাস্য-রসসিক্ত। কবি স্বীকার করিয়াছেন, "আদর" কবিতাটির প্রত্যেক শ্লোকের শেষাংশ ইংরাজ-কবি হুড্‌ হইতে গৃহীত। হুডের A paternal ode to my infant son নামক কবিতা "আদরে"র আদর্শ। হুড উক্ত কবিতায় ও "Domestic asides" প্রভৃতি আর কয়েকটি কবিতায় যে কৌশল অবলম্বন করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছেন, সেই কৌশল অক্ষয়কুমার "আদরে" সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন, অথচ কবিতাটি অনুসরণ বলিয়া বোধই হয় না।

"মাণিক" কবিতাটি পাঠ করিলে বাল্যকালের সেই অতীত সুখের মধুর স্মৃতিগুলি সঞ্জীবিত হইয়া যেন মনের ভার লঘু করিয়া দেয়। মাণিকের শাসনবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সাধগুলি স্বভাবসুন্দর। মাণিকের পিতার মনের মধ্যেও যে সময়ে সময়ে ঐরূপ অবাধ মুক্তির কল্পনা ক্রীড়া করে না, এ কথা বলা কঠিন। সুতরাং মাণিকের উক্তিগুলির মধ্যে কত-গুলিই বা মাণিকের নিজস্ব, এবং কতগুলিই বা কবির কল্পনা-প্রসূত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। "The pet lamb" নামক কবিতায় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন মেষশাবক-পালয়িত্রী বালিকাটির কথাগুলির মধ্যে কোনগুলিই বা সেই বালিকাটির, এবং কোনগুলিই বা তাঁহার কল্পিত উক্তি, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন,—

> "That but helf of it was hars and half of it was mine;
> Way, more than half to hhe damsel must belong."

সেইরূপ, অক্ষয়কুমারও বোধ হয় মাণিকের উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন।

"বঙ্গভূমি" কবিতাটি অল্প দিন হইল "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়া ইতিমধ্যেই সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। মনে হয়, কালের বিচারে উহা "বন্দে মাতরম্", "আমার দেশ" প্রভৃতি অমর স্তোত্রগুলির পার্শ্বে স্থান পাইবে।

৩য়,—মানসী।

এই কবিতাগুলি প্রেম-বিষয়ক। কিন্তু সচারচর প্রেমের গান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এ কবিতাগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কবির এই প্রেম ইন্দ্রিয়লালসাবর্জ্জিত; পার্থিব কলুষতার লেশমাত্র ইহাতে নাই। কবির মানসমোহিনীর কায়া স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী ও গীতিময়ী। তিনি অশরীরিণী। কবি এ জীবনে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেবল তাঁহার বিরহই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে কবির প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিরাট শূন্যভাব রহিয়া গিয়াছে। কবি যেন "কোন্ লোকে সহস্র চোখে" তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি যেন জন্মজন্মান্তর তাঁহারই পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, এবং এ জীবনও যেন কবির "ধরি ধরি" করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। কবি মধুর "প্রভাতে" তাঁহার ছায়াময়ী মানসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে কি কখনও অনুভব করে নাই, কবির দীর্ঘশ্বাসের সহিত জড়িত হইয়া—

কত শোভা, কত গন্ধ,
কত সুর, কত ছন্দ,
কি মন্ত্রণা, কি আনন্দ, কি চির বিশ্বাস,

তাহাকে আহ্বান করিতেছে। কবি নিঝুম "মধ্যাহ্নে" তাহারই স্বপ্নে বিভোর হইয়া শূন্যমনে উদাসনয়নে চাহিয়া থাকেন। ধূসর "সায়াহ্নে" তিনি চিন্তা করেন, যেন তাঁহার জীবনের সকল সাধই পূর্ণ হইত, যদি কেবল "সে" আসিত। অন্ধকার "নিশীথে" কবি তারকার অক্ষরে অক্ষরে "সেই কথা সেই ব্যথা সেই প্রাণে ভোর ভোর" উচ্ছলিত হইতে দেখেন। "জ্যোৎস্নারাত্রে" কবি প্রকৃতির মোহকরী "শোভায় সৌরভে গানে" আকুল হইয়া শেষ প্রার্থনা করিয়াছেন, আর যেন তাঁহাকে মরণের পরপারে এ জীবনের মত হা হা করিয়া ছুটিতে না হয়, এ জন্মের মৃত্যুই যেন তাঁহার

শেষ মৃত্যু হয়, এই গানই যেন তাঁহার শেষ বিরহসঙ্গীত হয়, এ জগতেই যেন তাঁহার সকল বাতনার অবসান হয়।

এই কবিস্বপ্নময় প্রেমসঙ্গীতের মাধুরী বর্ণনাতীত। এ গানে মনকে উদাস করে; প্রাণে একটা ব্যাকুলতা আনিয়া দেয়; ইহার উন্মাদনা ও তন্ময়তা সংক্রামক। এ প্রেমসঙ্গীত পশুভাব জাগরিত করিয়া মনকে অধোগামী করে না; কি এক উদার সৌন্দর্য্যস্পৃহায়, দুর্লভ প্রেমের স্বপ্নে প্রাণকে বিভোর করিয়া দেয়; সত্য শুভ সুন্দরের দিকে মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

এই সুপবিত্র ও সুমহান্ প্রেমসঙ্গীতের কল্পনা ও অভিব্যক্তি কবি বিহারীলালের শিষ্যেরই যোগ্য।

শঙ্খের কবিতাগুলির মধ্যে যে একটি ভাবের শৃঙ্খলা আছে, এ প্রবন্ধে কেবল তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনা-নৈপুণ্যের খুঁটিনাটি বা সামান্য ত্রুটী দেখাইবার চেষ্টা করি নাই। "শঙ্খে"র অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই জন্য কবিত্বের সৌন্দর্য্য বা লিপিকৌশল দেখাইবার উদ্দেশ্যে কোনও কবিতা উদ্ধৃত করিলাম না। এ স্থলে "শঙ্খে"র কেবল একটি অভাবের উল্লেখ করিব, এবং একটিমাত্র বিশেষত্বের উদাহরণ দিব।

"শঙ্খে" হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে সনেট আছে; কিন্তু মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের নামে আর দুইটি সনেট না থাকাতে, সনেটগুলি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে কবি এই অভাব পূরণ করিবেন।

অক্ষয়কুমার মনস্তত্ত্বের কবি। তাঁহার কবিতায় স্বতন্ত্র প্রকৃতি-বর্ণনা নাই। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা কেবল ভাব বিকাশের জন্য। কিন্তু কবি কত অল্প কথায় স্বভাবশোভার কিরূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন, কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য "মধ্যাহ্নে"র চারি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

চাতক কাতরে ডাকে চরে বক নদী বাঁকে,
ডাকে ঘুঘো ঘুঘু ঘুঘু লুকালে কোথায়!
গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

"কনকাঞ্জলি" ও "প্রদীপ" কাব্য দুইখানিতে আমরা অক্ষয়কুমারের কবিত্বের যে সকল গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, "শঙ্খে"ও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম ;—সেই মনস্তত্বের মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি, সেই বাক্যের সদ্ব্যবহার, সেই শব্দ-সঙ্গীত। "শঙ্খে"র কবিতাগুলির একটি গুণ,—তাহাদের বিষয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভাষার পার্থক্য। "মাণিকে"র ভাষায় ও "পিতৃহীনে"র ভাষায় যেমন প্রভেদ, তেমনই আবার গার্হস্থ্যকথায় অপরাপর কবিতার ভাষার সহিত কবি-কাহিনীর ও মানসী কবিতার বাক্যবিন্যাসের তারতম্য। ভাষার এই বৈচিত্র্যের গুণে কবিতাগুলি "একঘেয়ে" মনে হয় না। কিন্তু অক্ষয়কুমারের কবিতায় ভাষার বাহার অপেক্ষা ভাবের সৌন্দর্য্যই মনকে অধিকতর আকৃষ্ট ও মোহিত করে। অক্ষয়কুমার বাক্যসর্ব্বস্ব অন্তঃসারশূন্য কবিতা রচনা করেন না ; মনোভাণ্ডার পূর্ণ না হইলে তিনি কবিতা লেখেন না। তাই তাঁহার কবিতা মনের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ও স্থায়ী চিত্র প্রদান করে,—শুধু "কি যেন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া" ভাবের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে না। যে ভাবগুলি 'ধরা ছোঁয়া' যায় না, কবি যেন কি এক যাদুবলে অতি সহজে তাহাদিগকেও চক্ষুর উপর ধরিয়া দিয়াছেন। যাহা ব্যক্ত করা যায় না, তাহাও সরল ও সুন্দর ভাবে কবি পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহা অক্ষয়কুমারের অক্ষয় প্রতিভারই পরিচায়ক। "শঙ্খে"র কবিতাগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একাগ্র ভক্তিতে প্রাণ অতিমাত্র ব্যাকুল না হইলে কবি বাগ্দেবীর পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করেন না। তিনি কবিতাকে আরাধ্যা জ্ঞান করেন, অবসর-কালের ক্রীড়নক ভাবেন না। আমাদের বিশ্বাস, "শঙ্খ" সাহিত্য সংসারে অক্ষয়কুমারের সুনাম উচ্চতর রবে ধ্বনিত করিবে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বিদেশী গল্প।

প্রতিশ্রুতি।

প্রত্যুষের ট্রেনে ইস্‌ভান্‌ সারকানি সমুদ্রতীরবর্ত্তী কিরালিফুর্দো নগরে পঁহুছিলেন। হোটেলে আসিয়া তিন ঘণ্টা সুনিদ্রার পর যুবক শয্যা ত্যাগ করিলেন। প্রসাধনশেষে, নীলবর্ণের সার্জ্জের উপর সারকানি একটি কর্পূরশুভ্র গ্রীষ্মকালের উপযোগী কোট পরিধান করিলেন। তখন অবশ্য গ্রীষ্মাধিক্য হয় নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন, শ্বেত পরিচ্ছদে তাঁহার রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ মুখমণ্ডলের শোভা রমণীর মন মুগ্ধ করিবে।

ভোজনসময়ে অকস্মাৎ বাক্‌দত্তা পত্নী ও তাহার আত্মীয়বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

ভাবী মিলনের চিন্তায় সারকানির হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। এডিথকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। কিন্তু তথাপি হৃদয়ের এক প্রান্তে একটু আশঙ্কার ছায়াও ঘনীভূত হইয়াছিল। সে যদি পরীক্ষার উপাধি সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করে? তিনি কি উত্তর দিবেন, এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই বিষয়েই এডিথ প্রথম প্রশ্ন করিবে।

শেষ সাক্ষাৎকালে তিনি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া তিনি ভবিষ্যতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধক ঘটায় তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সারকানি এখনও ডাক্তার হন নাই।

প্রণয়িনীকে তিনি কিরূপ কথার কৌশলে ভুলাইবেন, চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় হোটেল-গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল। আমুকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমুকা এডিথের কনিষ্ঠা। তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ। সে কৃশাঙ্গী। তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, চপলতার চিহ্নমাত্রবর্জ্জিত। বালিকার প্রকৃত নাম মারিস্‌কা; কিন্তু এডিথ তাহাকে আমুকা অর্থাৎ 'শিশু মাতা' বলিয়া ডাকিত।

বর্ত্তমান বিলাসময় যুগে তাহাকে দেখিলে সে কালের বুদ্ধিমতী, শ্রমপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীদিগের কথা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে। বাস্তবিক আমুকা স্বল্পভাষিণী, চতুরা ও অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু। গত দুই বৎসর হইতে সে ভৃত্যবর্গকে কেমন সুশাসনে রাখিয়াছে। এডিথকে পরিচারকগণ ততটা আমোলে আনিত না; কিন্তু আমুকার আদেশ অবহেলা করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। প্রভাতে সকলের অগ্রে সে শয্যা ত্যাগ করিত। পিতা ও ভ্রাতৃগণের কোনও বিষয়ে সামান্য অভাবটুকুও না ঘটে, সে দিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। গৃহস্থালীর সকল কার্য্যের ভারই সে নিজের হস্তে লইয়াছিল। তাহার সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাহাকে 'শিশুমাতা' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

আমুকা সারকানির জন্য একটি ছোট পুলিন্দা আনিয়াছিল।

গম্ভীরভাবে সে বলিল, "এডিথ! ইহা আপনার কাছে পাঠাইয়াছে।"

সারকানি সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়াছি, এডিথ কি তাহা জানেন ?"

"হাঁ।"

"পুলিন্দায় কি আছে, আনুকা ?"

"আপনি খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি এখন একবার 'মুদীর' দোকানে যাইতেছি। পনের মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন ত ?"

"নিশ্চয়।"

বালিকা চলিয়া গেল। সারকানি পুলিন্দার সবুজ ফিতাটি খুলিয়া ফেলিলেন। এডিথের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র ছিল। তিনি উহা খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

"বিগত দুই বৎসর ছয় মাস ধরিয়া আপনি আমাকে দুই শত ষোলখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আজ সেগুলি ফিরাইয়া দিলাম। আমার কোনও চিঠি যদি আপনার কাছে থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আনুকার হাতে দিলে বাধিত হইব। গত কল্য অপরাহ্নে এখানকার চিকিৎসক ডাক্তার বারটালান্ কাটোনাকে আমি বাকদত্ত স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়াছি, জানিবেন। ইতি। এডিথ।"

সারকানি চমকিয়া উঠিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা।"

এডিথের পত্রগুলি লইয়া সারকানি একটি টোটাভরা পিস্তল পকেটে রক্ষা করিলেন। তার পর অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, ধর্ম্মমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগস্থ একটি ছোট তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর একটি দীর্ঘাকার কৃষক যুবক নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে বসিয়া হাস্যবদনা একটি সুন্দরী কৃষকবালা যুবকের কর্ণ একটি তৃণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছিল।

সারকানি এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিলেন না।

ক্রমশঃ তিনি গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রশীকরসিক্ত স্নিগ্ধ পবন তাঁহার আননে প্রতিহত হইতেছিল ; পরিচিত পুরাতন সমুদ্রসৈকতে তরঙ্গাভিঘাতশব্দ যেন তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিতেছিল। 'ডেভিল্‌স্‌ ডিচ্' নামক একটি ক্ষুদ্র শৈলের উপর উঠিয়া তিনি ছায়াশীতল ক্ষুদ্র নির্ঝরের ধারে বসিয়া পড়িলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই স্থলেই তিনি সর্ব্বপ্রথম এডিথের নিকট প্রণয়জ্ঞাপন ও ডাক্তারী পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

যুবক পত্রগুলি খুলিয়া একে একে পাঠ করিলেন। পত্রের প্রত্যেক ছত্রে প্রত্যেক বর্ণে শুধু প্রেম ও ডাক্তারী পরীক্ষায় সাফল্য-লাভের কথা বর্ণিত। কোনও কোনও চিঠির স্থলে স্থলে কোনও কোনও প্রেম-কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। সুকণ্ঠ বিহঙ্গ যেমন আপনার মধুর কণ্ঠস্বরে আপনি মুগ্ধ হয়, সারকানি নিজের লেখায় তেমনই নিজে অভিভূত হইলেন। সহসা পত্রগুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া তিনি পকেট-বহি বাহির করিয়া লিখিলেন,—

"তোমার জন্যই আজ আমি আত্মহত্যা করিতেছি। আমার জীবনে আর কোনও সুখ, কোনও আশা নাই। কি জন্য আর বাঁচিয়া থাকিব ? বুডাপেস্ত নগরে আমার খুড়া মহাশয়ের নিকট আমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইলে আমি অনুগৃহীত হইব। আমার পকেট-বহির মধ্যে যে চিত্র ও

কেশগুচ্ছ আছে, মৃত্যুর পর সে গুলি আমার হৃদয়ের উপর রক্ষিত হইলে সুখী হইব। সমাধি-স্তম্ভে যেন কোনও স্মৃতিলিপি না থাকে, ইহাই আমার অন্তিম অনুরোধ।"

যুবক লিখিত পত্রাংশ পকেট-বহি হইতে ছিন্ন করিলেন। গলাবন্ধ হইতে একটি আলপিন খুলিয়া লইয়া উহার সাহায্যে পত্রখানি সম্মুখস্থ বৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ করিলেন। একটি সিগার ধরাইয়া লইয়া সারকানি তৃণশ্যামল ভূমির উপর দেহ বিছাইয়া দিলেন। প্রভাতসমীরসঞ্চালিত বৃক্ষপত্র কেমন নৃত্য করিতেছিল, যুবক তাহাই দেখিতে লাগিলেন। গাছের উপর একটি পাখী পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

সারকানি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বৃথা গান, বৃথা চেষ্টা, আমাকে মরিতেই হইবে।"

পকেট হইতে এডিথের প্রতিমূর্ত্তিখানি বাহির করিয়া তিনি আগ্রহভরে দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর আকৃতি সুন্দর, কমনীয়; একবার দেখিলেই পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করে। রমণীর মুখভঙ্গী, বসিবার প্রণালী ও পরিচ্ছদের পরিপাট্য আধুনিক সভ্যতা ও বিলাসিতার অনুমোদিত। স্বর্ণপ্রভ লঘু কেশগুচ্ছ আননের পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নয়নের দৃষ্টি কি গভীর রহস্যময়!

সারকানি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমাকে মরিতেই হইবে!"

সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, কেহ যেন লঘুগতিতে তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। বৃক্ষপত্রে, লতাগুল্মে প্রহত পরিচ্ছদের খসখস ধ্বনি শ্রুত হইল। যদি সে হয়!—সারকানি নয়ন নিমীলিত করিলেন। অঙ্গসঞ্চালনে তাঁহার সাহস হইল না।

বালিকা আমুকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ কি, পিতা, আপনি এখানে?"

"কে, আমুকা, তুমি?"

বালিকা বলিল, "হাঁ! আপনার সহিত আমার একটা কথা আছে।"

তাহার এক হস্তে সদ্যোচয়িত আরণ্যপুষ্পে পরিপূর্ণ একটি সাজি। সন্নিহিত একখানি প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট হইয়া বালিকা একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। বৃক্ষকাণ্ডে নিবদ্ধ পত্রখানি তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। যুবকের হস্তস্থিত পিস্তলটিও সে লক্ষ্য করিল।

প্রশান্তস্বরে বালিকা বলিল, "আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিয়াছি। আপনি আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন। কেমন, ঠিক নয় পিতা?"

তাহার প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে সারকানি বিস্মিত হইলেন। বিমর্ষভাবে তিনি বলিলেন, "তুমি এখানে আসিলে কেন?"

"আমি জাম কুড়াইতে আসিয়াছি। এডিথের বাকদত্ত স্বামী বারটালান্ কাটোলান্ কাটোনার আমাদের ওখানে আজ নিমন্ত্রণ; আপনি বোধ হয় সে সংবাদ শুনিয়াছেন।"

সারকানি ম্লানহাস্যে বলিলেন, "তুমি সেই কথা আমায় বলিতে আসিয়াছ?"

বালিকা ঘাসের উপর বসিয়া ফল কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "কেন আপনাকে বলিব না?"

আমুকার-উপেক্ষায় সারকানি অন্তরে অন্তরে আহত হইলেন। তিনি আর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর যুবক বলিলেন, "দেখ আমুকা, তুমি বুঝি ভাবিতেছ, আমি সত্য সত্য

আত্মহত্যা করিতে পারিব না, কেমন? না, তা' নয়। তুমি বুদ্ধিমতী, সত্য; কিন্তু তুমি কখনই আমাকে সংকল্পভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।"

বালিকা বলিল, "আমি আপনার সংকল্পে বাধা দিতে আসি নাই। আপনি না হইয়া আমি হইলেও ঠিক এইরূপই করিতাম।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সারকানি বলিলেন, "সত্য আম্নুকা, আমার একটুও বাঁচিবার সাধ নাই।"

আম্নুকা বলিল, "কিন্তু একটা কথা আছে। আমি হইলে প্রতিশোধ না লইয়া আত্মহত্যা করিতাম না।"

"সে কিরূপ, আম্নুকা?"

"শুনুন, বলিতেছি। আপনি কখনও ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, এই বিশ্বাস হওয়াতেই এডিথ আপনার সহিত বিবাহের চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এখন যদি আপনি এইরূপে আত্মহত্যা করেন, এডিথ এবং জগতের লোকে বলিবে, 'হতভাগ্য পিস্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছে।' আমি হইলে তাহা করিতাম না। এরূপে উপেক্ষিত হইবার পরই একেবারে বুডাপেস্ত নগরে গিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতাম। তার পর প্রশংসাপত্রখানি এডিথের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নীরবে আত্মহত্যা করিতাম। তখন এডিথ বলিত, 'আমি পিস্তাকে বিশ্বাস করি নাই বলিয়াই আজ সে জীবনোৎসর্গ করিয়াছে।' পুরুষমানুষ হইলে, আমি এইরূপে প্রতিশোধ দিতাম।"

যুবক ললাটে হস্তার্পণ করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, আম্নুকা। আমি তোমার কথামতই কাজ করিব। এডিথকে দেখাইব যে, আমি পুরুষ মানুষ।"

বালিকা ফল কুড়াইতে লাগিল। সারকানি পুনরায় আর একটি সিগারেট ধরাইলেন।

"বাঃ, এই ফলটি চমৎকার!"—আম্নুকা দেখিতে পাইল না। যুবক তাহার অলক্ষ্যে জামটি কুড়াইয়া পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিলেন।

"এই যে একটা—ঐখানে, আর একটা—"

ক্রমশঃ পাত্রটি জামে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

আম্নুকা বলিল, "আমি এখন বাড়ী যাইতেছি। আপনার গলাবন্ধের আলপিনটি গাছে রহিয়াছে; দেখিবেন, ভুলিবেন না।"

সারকানি পত্রখানি শতাংশে ছিন্ন করিলেন। পিনটি গলাবন্ধে বিদ্ধ করিয়া হোটেলে ফিরিলেন।

মন্দিরের পার্শ্বস্থ তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়া উভয়ে যখন দ্রুতপদে চলিতেছিলেন, সেই সময়ে সুন্দরী কৃষকবালা উচ্চহাস্যে প্রান্তর-পথ মুখরিত করিতে করিতে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নিদ্রোত্থিত কৃষক যুবক টুপী তুলিয়া লইয়া দীর্ঘপদক্ষেপে কৃষকনন্দিনীর পশ্চাতে ধাবিত হইল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* ফেরেঙ্ক হারাজ্‌গ রচিত হঙ্গেরীয় গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

মাতৃবাণী।

[হিজরী ৭২]

"মা গো, মা গো, হের আজি অতি দুঃসময়,"
কহে আবদুল্লা আসি জননী-চরণে,
"যা' ছিল সম্বল সব হইয়াছে ক্ষয়,—
বহু সৈন্য পলাতক পর্ব্বতে কাননে।
তোমার আদেশ চাহি,—করিব সংগ্রাম ?
কিংবা সেই খালিফেরে ভেটিব প্রণাম ?"
তখন নিশীথ রাত্রি। নীরব আকাশ।
দূর নগরের মাঝে বিজয়-উল্লাস
থাকি' থাকি' জাগি' উঠে; প্রতিধ্বনি তার
শৈল-প্রাচীরের গাত্রে করে হাহাকার।
জননী আস্মা দেবী, আকাশের পানে
আয়ত নয়ন মেলি' চিন্তাকুলপ্রাণে
কোন্ দৈববাণী লিখা নক্ষত্র অক্ষরে
খুঁজিতেছিলেন যেন সুনীল অম্বরে।
আকুল তনয় তাঁরে কহে পুনর্ব্বার,—
"মা গো মা, আদেশ দাও, কি করিব আর!"
"শোন বৎস", কহিলেন দেবী মনস্বিনী—
কণ্ঠস্বরে তাঁর ধ্রুব বিশাল রাগিণী—
"শোন বৎস, ধ্রুব সত্য বলি' মানো যারে,
তার তরে ক্ষুদ্র প্রাণ তুচ্ছ এ সংসারে;
যাহার লাগিয়া তুমি করিতেছ রণ,
মিথ্যা যদি ভাব তাহা,—যুদ্ধ অকারণ।"
পুত্র কহে,—"মা গো, যবে হ'ব রণে মৃত,
এ দেহ সহস্র রূপে হবে যে লাঞ্ছিত!"
"ক্ষতি কি ?" জননী কহে, "সেই অপমানে
আত্মা যে হাসিবে তোর, স্বর্গের সোপানে।"

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

কালো মেয়ে।

শ্যামবাজারের মেয়ে দেখিয়া আসিয়া সকলে বলিল,—"হাঁ একেই বলে সুন্দরী! যেমন রং, তেমনই মুখ—তেমনই গড়ন পিটন—যেন একখানি প্রতিমা!"

রমেশ আমার মাতাকে বলিল, "মাসীমা! আমি ত আগেই বলেছিলাম, সুন্দরী বউ করতে চাও তো কলকাতার দিকে সম্বন্ধ দেখ। তখন সব বলেছিলে,—'কেন পাড়াগাঁয়ে কি সুন্দরী জন্মায় না?' এখন?"

জননী ভাবী বধূর সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া খুব খুসী হইলেন,—বলিলেন, "তা বেশ বাবা! তোমাদেরই তো সেই কথা রইল! এখন ঠাকুর করুন, মা লক্ষ্মীর আমার 'আয়পয়' ভাল হোক্।"

রমেশ কলিকাতার পক্ষ লইয়া বলিল, "তা মাসীমা! কলকাতার মেয়েরা কি শুধু কাঙ্গালেরই ঘরে পড়বে? ধরতে গেলে বড়মানুষের ঘরের বউএরা বেশীর ভাগ কলকাতার মেয়ে!"

এবার মা আমার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "অমন কথা বলো না বাবা! তোমার ছোট খুড়ী কি কলকাতার মেয়ে? তোমার সেজ পিসী, তিনিও তো বড়মানুষের ঘরের বউ—তিনি কি কলকাতার মেয়ে?" এইরূপ আরও বহু উদাহরণ দিয়া মা ইঙ্গিতে বলিয়া লইলেন যে, তিনিও নিজে পল্লীর কন্যা হইয়াও বড়মানুষের ঘরে পড়িয়াছেন।

আমি পাশের ঘরে বসিয়া রমেশ ছোঁড়ার উপর খুব চটিতেছিলাম। ছোঁড়াকে পাঠালুম কোথায় আমার রিপোর্টার করে, ছোঁড়া কি না এসে মার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে!

খানিকক্ষণ পরে রমেশচন্দ্র খুব গম্ভীরভাবে আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন—যেন 'নর্থ পোল্' আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন—এমনই মুখের ভাবটা! দেখিয়া আমার হাড় জ্বলিয়া গেল! আমি বলিলাম, "কি হে! অত গম্ভীর 'চাল' কেন? বলি খনি টনি কিছু বের করে এসেছ নাকি?"

রমেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "খনি হ'লে ত সুবিধা ছিল! এ শুধু একটি মণি!—দ্বিতীয়ো নাস্তি!"

আমি মনে মনে অনন্দিত হইয়া বলিলাম, "তা বেশ! এখন মণিটি আসল, না ঝুঁটো? কলকাতার বাজারে জহরী 'পাকা' হওয়া চাই!—"

রমেশ বিজ্ঞতার ভাব মুখে ফুটাইয়া বলিল, "রমণী-রত্ন চিন্‌বার জন্যে এ চোখ দুটোকে অনেক দিন থেকে সায়েস্তা করা গিয়েচে ভায়া!"

আমি বলিলাম, "বেশ! এখন হেঁয়ালী রাখো—কেমন দেখ্‌লে, বল!"

"তা বুঝ্‌তে গেলে তোমাকে দেখাতে হয়—তা ছাড়া আর উপায় নেই!"

"কেন, বলেই বোঝাও না।"

"তা হ'লে কবি হওয়া দরকার।"

"কেন মিছে জ্বালাতন কর—কেমন দেখলে বল।"

"আচ্ছা, বলছি; কিন্তু ভাই! শুভদৃষ্টির সময় আমার নিন্দুক বলে গাল দিও না,—সে রূপের ঠিক বর্ণনা করিবার ভাবা আমার নাই!"

আমি রমেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, বলে যাও ত, আমি নয় একটু বেশী করে ভেবে নেব!"

রমেশ তখন রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করিল,—"রঙটা অতি সুন্দর! চাঁপার রঙে আর গোলাপের রঙে এক করে' তাতে একটু জ্যোচ্ছনা মেশানো! গড়ন যেন মার্ব্বেল ষ্ট্যাচু—অথচ শক্ত-শক্ত ভাব নেই! মুখখানি—আধ ফোটা যুঁয়ের মত—ফুটফুটে স্নিগ্ধ! এক রাশ চুল; কপালখানি তৃতীয়ার চাঁদ—ভুরু দুটি দেখলে মনে হয়, যেন চকোর দুখানি ডানা মেলে চাঁদের পানে উধাও হয়ে ছুটেছে। চোখ দুটি টানা টানা—লজ্জা-মাখান! নাকটির বর্ণনা কর্‌তে পারলুম না! কারণ, নাকের যতগুলি কবি-কল্পিত বর্ণনা আছে,—বাঁশী, গরুড়ের নাক,পাখীর ঠোঁট—তার একটাও আমার পছন্দ হয় না! তবে 'তিলফুল জিনি নাসা' কাব্যে পড়েছি—কিন্তু তিলফুল আমি কখনও চোখে দেখিনি।"

আমি বলিলাম, "থাক্! আর বর্ণনায় কাজ নেই;—কি নাম?

"প্রতিমা।"

আমি ভাবিলাম—রূপের যোগ্য নাম! জিজ্ঞাসা করিলাম, "বয়স কত?"

রমেশ গালে হাত দিয়া বলিল, "যাঃ! ঐটেই বুঝে আসিনি—তবে তোমার চেয়ে ছোট হবে!"

আমি রমেশকে একটা মৃদু ধাক্কা দিলাম।

'পাকা দেখা'র দিন পুরোহিত মহাশয়, বামাচরণ কাকা, রমেশ আর বাবা গিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আমাকেও কন্যা পক্ষের লোক আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ২৭এ বৈশাখ বিবাহ।

২৭এ বৈশাখ খুব ঘটা করিয়া বিবাহ করিতে গেলাম। কত আলো! কত গাড়ী! আগে পিছনে বাজনা! মাঝখানে আমার ফিটন বড় বড় চারিটা ঘোড়ায় ধীরে ধীরে টানিতেছে! রাস্তার দু'পাশের বাড়ী হইতে ছেলে মেয়েরা আমায় উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। সেদিন তাদের চোখে আমি একটা দেখিবার জিনিস—বর! তা হাজার কালো কুৎসিত হই!

লগ্ন উপস্থিত। 'স্ত্রী-আচারে'র (আমার মতে স্ত্রী-অত্যাচার) আমি 'কলা-তলায়' প্রেরিত হইলাম। সেইখানে—শুভদৃষ্টি! আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম!—এ কি!—ঘোরতর ষড়যন্ত্র!

কন্যা সম্প্রদান হইয়া গেলে কনে দেখিয়া রমেশ উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি! এত বড় জুচ্চুরি!—কনে বদল! চলুন, আমরা বর উঠাইয়া লইয়া যাই!" পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে; সুতরাং পাত্র উঠাইয়া লইয়া যাওয়া বৃথা; তবে এ কন্যা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত। মনু বলিয়াছেন,—

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ॥"

সেই সময় বাবা সকলের মাঝে রমেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা রমেশ! তুমি ঠাণ্ডা হও; কন্যার পিতা প্রবঞ্চনা করেন নাই; আমিই অপরাধী।"

রমেশ "অ্যাঁ!" বলিয়াই নীরব হইল। সমবেত জনমণ্ডলী বাবার কথায় বিস্মিত, স্তব্ধ, বিরক্ত!

আর আমি?—ক্ষুব্ধ অভিমানে আমার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! বাবা টাকার লোভে আমার সঙ্গে এমন ব্যাপারটা করিলেন! কেন, তিনি ত বলিতে পারিতেন,—"তোমাকে এখানে বিবাহ করিতে হইবে।"—তা না করিয়া বাবা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিলেন!

* * * * * * *

যাহাই হউক, ভগবান আমার বেদনা দূর করিয়াছেন—পদ্মাকে বিবাহ করিয়া আমি সুখী হইয়াছি। যিনি কালো কোকিলকে সুকণ্ঠ দিয়াছেন, তিনি আমার কালো পদ্মাকে কোমল সুন্দর হৃদয় দিয়া গড়িয়াছেন। রূপ কয় দিন থাকে? ঢেউয়ের মত উথলিয়া উঠিয়া ছায়ার মত মিলাইয়া যায়। রূপ আগুনে পোড়ে; গুণ মরণে উজ্জ্বল হয়। রূপ ক্ষণিক, গুণ চিরকালের। পদ্মার রূপ নাই, গুণ আছে। তাহাতেই আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

বিবাহের দুই বৎসর পরে বাবার রোগশয্যায় বসিয়া সেবা করিতেছি। হঠাৎ বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবার আর আমায় তোমরা রাখিতে পারিবে না। আমার ডাক পড়েছে।—এই অন্তিম কালে আমি যদি কিছু বলি, বিশ্বাস করিবে কি ?"

আমি বিস্মিত হইয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমার বিবাহে আমি খুব প্রবঞ্চনা করেছি, এই কথাই সকলে জানে। আমি চলিয়া গেলে তোমারও ঐ ধারণা থাকবে—বাবা প্রবঞ্চক! জগতের আর সকলের মনে যে ধারণা থাকে, থাক; তোমার মনে আমার সম্বন্ধে ও ধারণা রেখে যেতে পারিব না—তা হ'লে আমার সুখে মরা হবে না। তাই বলছি,—যদি এ সময় কিছু বলি, বিশ্বাস কর্‌বে কি ?"

আমি উদ্বেলিতস্বরে বলিলাম, "আপনার কথা কবে অবিশ্বাস করেছি ?"

বাবা তখন আমাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "প্রফুল্ল! প্রবঞ্চনা আমি করি নাই—আমি শুধু ভদ্রলোকের মান রাখিবার জন্য প্রবঞ্চক সাজিয়াছিলাম! আজ যদি বৌমা আমার, গুণের বাঁধনে সকলকে না জড়াতেন, তা হ'লে এ কথা তুমিও টের পেতে না! আমি সে সময় ভদ্রলোকের মান রেখেছিলুম, ভগবানও আমায় দয়া করিয়াছেন;—এমন গুণবতী বধূ ক' জনের ভাগ্যে হয় ?"

বলিতে বলিতে বাবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভক্তিতে আমার হৃদয় বাবার পদতলে লুটাইতে লাগিল! মনে মনে বলিলাম, উঃ! মানুষ চেনা কি শক্ত!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ঐতিহাসিক রসায়ন।

১

মনুষ্য-দেহ অতি প্রাচীন ও উপভোগ্য বিষয়। নশ্বর হইলেও মহিমসম্পন্ন। শাস্ত্র বলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান এই দেহ হইতেই লাভ করা যায়।

বিজ্ঞান-চর্চ্চার তীব্রতা দেখিয়া আমাদিগের আশা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বোধ হয়, শীঘ্রই মনুষ্য-দেহ তাহার শাস্ত্রকথিত পূজ্য স্থান অধিকার করিবে। ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বহুল তত্ত্বের আলোচনা অনায়াসে শারীরতত্ত্বের মধ্যেই

আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এতাদৃশ আলোচনাক্ষেত্র আমাদিগের অতি নিকটে থাকিলেও আমরা তাহাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই! কি হস্তিমূর্খতা! কি ঘোর তামসিক প্রলয়ঙ্করী বিড়ম্বনা!

তাহাই বৈষ্ণবী বলিয়াছিলেন,—

"আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া?"

যথার্থ অভিমান। দেহের এরূপ লাঞ্ছনা ও অপমান করিলে দেহ ক্ষুণ্ণ হয়, পড়িয়া যায়, ভগ্ন হয়, কৃশ হয়, খর্ব্ব হয়।

মনে করিয়া দেখুন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কীদৃশ উন্নতগ্রীব, বিশালবক্ষ ও সহৃদয় মানব ছিলেন। তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কত দূর উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কেবল আমাদিগের নহে, সকল জাতিরই পুরাতন ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস; পুরাতন দেহই দ্রষ্টব্য দেহ। কারণ, সেকালে দেহের একটা গরিমা ছিল।

আপনারা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন? কোন্ দেশ তাহার প্রাচীন ইতিহাস জানে?

কত যুগ, কত মহাজলপ্লাবন, কত সৌরজগতের উৎপাত, কত প্রাকৃতিক সংঘর্ষণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইয়া গিয়াছে, তাহার কি অবধি আছে? তাহার সন্ধান অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায় না, জৈন কিংবা বৌদ্ধ স্তূপে পাওয়া যায় না, হিমালয়-শৃঙ্গে পাওয়া যায় না, জলধির অতল স্তরেও পাওয়া যায় না! যাহা পাওয়া যায়, তাহা যৎসামান্যমাত্র; তাহা লইয়া খণ্ড, প্রাকৃতিক ইতিহাসের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, ক্ষণিক কৌতূহল-নিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, কিন্তু মানবের সত্য এবং সম্পূর্ণ ইতিহাসের ইহারা আনুষঙ্গিক মাত্র।

যিনি সত্য ও সম্পূর্ণ, তিনি কোথায়? মানব-হৃদয়ে। মানবের ইতিহাস যুগে যুগে সেই স্থানে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই শাস্ত্রের লক্ষ্য। যদি সত্য ও সম্পূর্ণ ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্বাদির আলোচনা করিয়া, একটি সত্য ও সম্পূর্ণ ইতিহাস খাড়া করিতে হয়, তবে ইতস্ততঃ অবিরত পিপীলিকার ন্যায় দৌড়াদৌড়ি না করিয়া, অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভার্থ একবার মানবদেহের প্রতি সপ্রেম কটাক্ষপাত করিলে বোধ হয় দেহ অতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিতে পারে।

যখন মহাত্মা ডারউইন বানর-বংশের সহিত মানব-বংশের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছিলেন, তখন আমরা সেইরূপ পুলকিত হইয়া সনাতন লাঙ্গুল-স্থান ঈষৎ আন্দোলন করিয়াছিলাম। মনে করিয়া দেখুন, এই সামান্য পূর্ব্বপরিচয়ে দেহ আপনাকে কতই প্রীত, কতই গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল! যদিও লাঙ্গুল গিয়াছে, এবং লাঙ্গুলের সহিত বংশগৌরব গিয়াছে, কিন্তু মানব যে অমর, লাঙ্গুল-স্থানই তাহার প্রমাণ! এহেন প্রমাণ কোনও শিলাফলকে কিংবা তাম্রশাসনে পাওয়া অসম্ভব।

এইরূপে লাঙ্গুল কেন, গোঁফ, বিষদন্ত, ক্রোধকটাক্ষ, শুণ্ড-চিহ্ন, কর্কট-চিহ্ন, বরাহ-চিহ্ন প্রভৃতি দ্বারা কত পুরাতন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা কি আমাদের মনে আছে? হা বিস্মৃতি! তুমিই ইতিহাসের শত্রু, গৌরবের হন্তা, এবং দগ্ধ হৃদয়ের কালিমাময় অন্ধকার!

শাস্ত্র ও শাস্ত্রপ্রমুখ যোগী ঋষিগণ গভীর ধ্যান ও চিন্তাদি দ্বারা একটা মহাসত্য চিরকাল ঘোষণা করিয়াছেন। জীব নামক পদার্থের কখনও লয় হয় না। আসমুদ্র সৌরজগৎ লুপ্ত হইয়া, পুনরায় আবির্ভূত হইলে, প্রাকৃতিক স্তরে তাহার কোনও ইতিহাস থাকে না। কিন্তু আবার নূতন জগৎ হইতে যে জীব বিনির্গত হয়, এবং সেই জীব হইতে মনুষ্য নামক যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা জীবের আবর্ত্তন হয়, তাহারা অতি পুরাতন। অর্থাৎ, বহু জগতের, বহু যুগের চিহ্ন তাহারা দেহে লইয়া আসে। ঈশ্বর নামক অতি সনাতন পরম ইতিহাসবেত্তা, তাঁহার অতি প্রিয় সন্তানগণের পুরাতন ও নূতন কথা, তাহাদিগেরই শরীরে লিপিবদ্ধ করেন। কারণ, তিনি নিরক্ষর, তাঁহার পুঁথি নাই, তাঁহার ধনসম্বল নাই। তিনি নিরাশ্রয়, হস্তপদ-বিহীন। পাছে তাঁহার ঘোর দৈন্যদশা দেখিলে আমরা কষ্ট পাই, অতএব সেই প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা অদৃশ্য। তাঁহার অস্তিত্ব প্রাকৃতিক প্রত্নতত্ত্বে কিংবা ভূতত্ত্বে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য; কিন্তু জীবের সহিত তাঁহার যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবে তাহারও প্রমাণ এই মানবদেহেই থাকার খুব সম্ভাবনা।

৺পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, 'জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি স্ত্রীলোক। জ্ঞান বাহিরে বসিয়া থাকে; ভক্তি রন্ধনশালায় বসিয়া কাঁদে। বিজ্ঞান জ্ঞানের সহচর। রন্ধনশালাটা দেহ। যদি যথার্থ তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, তবে মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালার অভ্যন্তরে গিয়া চতুষ্কোণের সংবাদ লইলে অন্ততঃ স্ত্রীলোকটারও কোনও উপায় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২

এইরূপ মনে করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত হলধর বসু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। বসুজা মহাশয় আমাদিগের পরমবন্ধু। তাঁহার শরীরতত্ত্ব পরীক্ষা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

অপিচ, বন্ধুবর হলধর বসু পরম জ্ঞানী। জ্ঞানিমাত্রই পুরাতন মাল। জ্ঞানী প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়, বহু-পর্ণ, বহু-রেখ, বহুচক্রবিশিষ্ট। এক একটা যুগের ইতিহাস ইহার এক একটা ডালের মধ্যে। আমাদিগের সাধু প্রস্তাবনায় হলধর বাবু পরম পরিতুষ্ট হইয়া অতি সাবধানে তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

পরীক্ষাপূর্ব্বক যত দূর জানা গিয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে কথঞ্চিৎ আভাস দিলে ভবিষ্যতের অনুসন্ধান-প্রণালী যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

যে শরীর আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যপ্রদেশ অনেকটা ভারতবর্ষের মত। কিন্তু উত্তরাংশের কথা কিঞ্চিৎ বলা উচিত।

ডায়েরী ১১ই জানুয়ারী।—প্রথমতঃ আমরা নাসিকারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবং ক্রমে মুখ-গহ্বরে আসিয়া পড়ি। ইহা অতি সঙ্কীর্ণ প্রদেশ, কিন্তু মহা-ঝঞ্ঝাবায়ুপূর্ণ। উত্তর ভাগে প্রকাণ্ড বরফের চাপ, তাহা 'গ্লেসিয়ার' বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু গলিয়া দক্ষিণবায়ুসংযোগে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছে। এ স্থানটি উত্তর মহাসাগরের সন্নিহিত; কারণ, ইহার দুই পার্শ্বে দুইখানি বিস্তৃত অস্থি,—'ইউরাল পর্ব্বত' ও 'মঙ্গোলিয়ান প্লেটো'র ন্যায় ভূপৃষ্ঠ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কিছু পশ্চিম চাপিয়া আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তাহার আকার 'কাস্পিয়ান' উপসাগরের মত। ইহা দক্ষিণ কর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহারই উত্তরে 'শাকদ্বীপ' (Scythia)।

প্রমাণ।—এ স্থলের জল লবণাক্ত, এবং বরাবর বাম কর্ণে, অর্থাৎ জাপান অভিমুখে গমন করিলে একটা সাঁকোর মত অস্থি পাওয়া যায়। তাহা তিব্বতদেশীয় প্লেটোর মত। ইহার দক্ষিণেই গোবী মরুভূমির মত প্রকাণ্ড জিহ্বা। ইহা দেখিতে শুষ্ক, কিন্তু খনন করিয়া দেখিলে ইহার অভ্যন্তর হইতে ক্ষীরের ন্যায় অতি সুমিষ্ট পদার্থ বাহির হয়। আদিম কালে ইহাই ক্ষীরোদ সমুদ্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমেই 'আরারাট' শৃঙ্গ। এবং মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক কড়ি ও লক্ষ্মী-

প্যাঁচার অস্থি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার কতকগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

"প্রলয়-জলধি-জলে জলে ধৃতবানসি বেদম্।"—জয়দেব।

কি সুন্দর স্থান! হে জিহ্বা! তুমি ব্রহ্মার বাণীস্থল! প্রথম উষা তোমাকে দেখিয়াছিল! প্রথম আর্য্যজাতি তোমারই ক্রোড়ে আশ্রিত! তুমিই সৃষ্টির মূল! জলপ্লাবন সময় ন্যূহ (Naah) মহাশয় নানাবিধ জীবজন্তু দ্বারা মহাতরী (ark) সুসজ্জিত করিয়া এই প্রদেশ হইতে আরারাট-শৃঙ্গে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ত সেদিনের কথা! কিন্তু তাহার কত পূর্ব্বে আর্য্য আদম ও ইভা, কিংবা বুধ ও ইলা, তোমার তপোবনে বিহার করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখে? অহো! কি পরিতাপের বিষয়!

১২ই জানুয়ারী।—মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ আকার প্রকার দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হয় যে, এককালে ইহার সন্নিকটেই নন্দন-কানন ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে, ইহাই ভৌম্য স্বর্গ, এবং যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডব এই স্থান হইতে স্বর্গ আরোহণ করিয়াছিলেন।

আমরাও এই স্থান হইতে স্বর্গাভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। অপরাপর বন্ধুবর্গ তাহাতে বাধা দিলেন।

কারণ;—প্রথমতঃ, একটা ওঁকার ধ্বনি এই প্রদেশ ভেদ করিয়া কোনও অপরিজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যাইতেছিল। ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ও ভয়াবহ।

দ্বিতীয়তঃ, এই স্থান নাসিকা-গতপ্রাণিগণের আবাসভূমি। ইহা-দিগের ভাষা প্রধানতঃ স্বরবর্ণের সমষ্টি। ইহারা যে কেবল ভূত প্রেত, তাহা নহে; কারণ, স্থিরভাবে কর্ণনিবেশ করিলে, বেশ রাগ-রাগিণী-যুক্ত গান শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা উঁ, আঁ, তানঁা, নানঁা শব্দে পরিপূর্ণ।

একটা ইমন কল্যাণ শুনা গেল,—

(আমাদিগের ভাষায়) পঁ মঁ গ রে নি সা, সঁ রেঁ গঁ মঁ প

(তাহাদিগের ভাষায়) অ অঁ অঁ এঁ ই আঁ।—

অর্থাৎ, "হে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক। আমরা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর, এ স্থলে আদিমকাল হইতে পড়িয়া আছি। দেখিবার শুনিবার কেহই নাই; ইতি।"

ইহাদিগের নামকরণ কেবল স্বরবর্ণেই হইয়া থাকে। প্রায় ১২০টি

স্বরবর্ণ আছে। যাহারা অতিশয় ক্ষীণজীবী, অর্থাৎ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, তাহাদিগের নামের মধ্যে ং এবং ৺ই বহুলভাবে প্রচলিত। যাহাদিগের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহারা ঃ ব্যবহার করে। বোধ হয়, উঃ, আঃ প্রভৃতি বিরামপূর্ণ ধ্বন্যাত্মক শব্দ এই দেশ হইতে প্রচলিত।

উত্তরে মঙ্গোলিয়ান্ পর্ব্বতমালা ও দক্ষিণে তিব্বতের পর্ব্বতমালার মধ্যে 'গোবী' মরুভূমির অবস্থান দেখিয়া বেশ অনুমিত হয় যে, মানব-মুখগহ্বরস্থিত দন্তপাটীদ্বয় এই প্রদেশজাত। পূর্ব্বে ন্যুহের মহাতরীস্থ জীবজন্তুগণের জলপ্লাবনকালে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে মহাপ্রস্থানের উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ইয়োসিন যুগের জীব এবং anthropoid বানরগণের প্রথম দন্তবিকাশ এই স্থানে। হাসিলে কিংবা মুমূর্ষু হইলে জীবগণের দন্তপ্রাধান্য আর একটি চিরস্মরণীয় প্রমাণ। এই সকল পর্ব্বতমালার উপরিস্থ তুষারাবৃত উদ্ভিজ্জ-পদার্থসমূহ গোঁফের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় অন্ধকার বোধ হইয়াছিল। ক্রমশঃ সন্ধিস্থল অর্থাৎ Pharynx কিংবা গলদেশের উত্তরভাগে উপস্থিত হইবামাত্র সুন্দর আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। ইহা ছয় মাস থাকে, এবং অবশিষ্ট ছয় মাস তমিস্রাপরিপূর্ণ। বোধ হয়, এই স্থানটা উত্তরায়ণের পথ ছিল। শাকদ্বীপিগণ যে সূর্য্য-উপাসক কেন ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই স্থলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ কর্ণবিবরের নিম্নতল হইতে কপোল, কিংবা পারস্য দেশ বাহিয়া সূর্য্য উপাসকগণের গতি। ইহারা ক্রমে চিবুক অতিক্রম করিয়া বাম কর্ণের দিকে গিয়াছিল।

প্রমাণ।—ইহাই পরমশোভাবিশিষ্ট দাড়ি-বহির্গমনের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রঙ্গভূমি।

পারস্যদেশীয় আর্য্যগণের, এবং বাহ্লীক প্রভৃতি দেশবাসিগণের এখনও দাড়ি রাখিবার যে প্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রমাণস্থল এই দেশ। কিন্তু পূর্ব্বভাগে-চন্দ্র উপাসকগণের সহিত সূর্য্য-উপাসকগণের একটি মহা যুদ্ধ সত্যযুগে ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে চীন হইতে জাপান প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ শ্মশ্রুবিহীন হইয়া পড়ে। তাহাদিগের আকৃতি পিঙ্গল বর্ণ, ঈষৎ পীত, মস্তকে বেণী, অনেকটা চন্দ্রের মত। (পরে পিঙ্গলা নাড়ীর কথা দেখ।)

আমাদিগের পথ থাকিলে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া যাইতাম, কিন্তু দক্ষিণ ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। বোধ হয়, আর্য্যজাতি এই কারণেই হিন্দুকুশ পার হইয়া, এবং বেদের বোঝা মস্তকে করিয়া, ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

৬

১৩ জানুয়ারী। আর্য্যজাতিগণের (কিংবা 'সভ্য' মনুষ্যজাতিগণের বলিলেও হয়) আদি আবাসভূমি, এবং তাহার উত্তরস্থিত স্বর্গলোকাদির কথা বারান্তরে বক্তব্য। দক্ষিণ দিকে আসিলেই প্রথমতঃ হিমালয় দৃষ্টিগোচর হয়।

বন্ধুবর নিধিরাম দাস ইতিপূর্ব্বেই একটা সমগ্র ভারত-ভূপৃষ্ঠের নক্সা টানিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর,—

(চিত্রের অভাবে বিবরণমাত্র দেওয়া গেল।)

১। কণ্ঠের নিম্নে ও বক্ষঃস্থলের উত্তরভাগে দুই পার্শ্বে বিস্তৃত উন্নত ভূপঞ্জর। পশ্চিম দিকে সুলেমান পর্ব্বত ও ইরাণী প্লেটো (দক্ষিণ হস্ত-পঞ্জর)। পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্ম (বাম হস্তের অস্থি-সমূহ)। মধ্য প্রদেশে হিমালয় পর্ব্বত। অত্যুচ্চশিখর গৌরীশঙ্কর (কণ্ঠাগতপ্রাণ) ২৯৫৬০ ফুট = ৫½ মাইল।

২। দাক্ষিণাত্যের শিরোভাগে বিস্তৃত বিন্ধ্য নামক পুরাতন নিম্নস্থ পৃষ্ঠ-পঞ্জর। ইহার পশ্চিম ভাগে আরাবল্লী।

৩। উভয়ের মধ্যস্থ আর্য্যাবর্ত্ত নামক হৃৎপিণ্ড।

৪। Western Ghats নামক দক্ষিণ পদাস্থি।

৫। Eastern Ghats নামক বাম পদাস্থি।

৬। সিংহল। অর্থাৎ, বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ভূযুগের লাঙ্গুলের শেষভাগ।

৭। বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পঞ্জরের দক্ষিণসীমাস্থিত স্ফীত কুক্ষি ও উদর ও তাহারই পশ্চিম দিকে সূর্য্যবংশীয় যকৃৎ ও পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রবংশীয় প্লীহা, উভয় Renal artery (নর্ম্মদা) দ্বারা যুক্ত, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগে নীলগিরি নামক (Pelvis) প্রভৃতি) ভূপঞ্জর।

মানচিত্র দেখিয়া প্রথমে ইহাই সন্দেহ হয় যে, মনুষ্যদেহের মেরুদণ্ড (কশেরুকা মজ্জা বা spinal chord) ভূপৃষ্ঠে দৃষ্ট হয় না কেন?

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, ইহা সৃষ্টির প্রাক্কালের চিহ্ন। ইহা granitoid অর্থাৎ কাকরের গাঁইটের মত, এবং রক্তবর্ণ। এই উভয়মেরু-

বিস্তৃত, মজ্জাপরিপূর্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা আদিম অস্থিখণ্ড পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহা একখানি অস্থি নহে, বহু অস্থিখণ্ড পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহু অস্থিখণ্ড একত্রিত ও পরস্পরের সহিত মালার ন্যায় সংবদ্ধ। তামস মহাপ্রলয়ের সময় ডাকিনী যোগিনীর হুঙ্কারপূর্ণ রণক্ষেত্রে নৃমুণ্ডমালিনীর গলদেশে লম্বমানা যে মুণ্ডমালা দেখা যায়, ইহা বোধ হয় তাহার অন্যতর প্রমাণ। ইহার একভাগে ইড়া নামক সৌরবর্ত্মের পাদচিহ্ন, এবং অন্য ভাগে চান্দ্রবর্ত্মের পুরাতন পিঙ্গলা রেখা; মধ্যে সুষুম্না নামক অতি দুজ্ঞেয় পথ। ইহার স্থানে স্থানে চক্রের ন্যায় চিহ্ন আছে, এবং তাহা হইতে স্তরে স্তরে বহুবিধ জীবশ্রেণী বীজ-রূপে এবং অবশেষে বৃক্ষ-রূপে আবর্ত্তিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ বিস্তার করিয়াছিল, এমত বোধ হয়। কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে সাহস পাইলাম না।

কিন্তু ইহার সহিত দৃশ্য ভূপঞ্জরের যে একটা ঘোরতর সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রতীয়মান হয়। হিমালয় প্রভৃতি উন্নত বক্ষ ও কণ্ঠ-পঞ্জর, ভূবিজ্ঞানমতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। কারণ, ইহার পাদমূলে, এমন কি, অধিকতর উচ্চ প্রদেশেও সামুদ্রিক জীবকঙ্কাল ও উদ্ভিজ্জসমূহের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীতে এরূপ চিহ্নের অভাব। আরাবল্লী রক্তশৈল (Red sandstone)। বিন্ধ্যের কতক অংশ নিম্নস্তরেও তাহাই, এবং বেশী ভাগ Gneiss এবং granite (কাঁকর)। আরাবল্লীর উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসমুদ্র যে এককালে ক্ষীরোদ সমুদ্রের অন্তর্গত দারুণ জলধি ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন (Tethys)। আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বক্ষঃপঞ্জরাদি পৃষ্ঠপঞ্জর হইতে উন্নত স্তরে অবস্থিত। বক্ষঃপঞ্জর ও দাক্ষিণাত্যের ভূপঞ্জরের মধ্যে একটা বিলক্ষণ পর্দ্দা বর্ত্তমান (Diaphragm)। এই সকল চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হয় যে, আর্য্য-জাতি যখন হিন্দুকুশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া এ দেশে আসেন, তাহার বহুপূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় জীবগণ দাক্ষিণাত্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। তখন হিমালয় প্রভৃতির সৃষ্টিও হয় নাই। জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি হিমালয়ের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া ভূতত্ত্ব পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। প্রতীচ্য ভূবিজ্ঞান ও প্রাচ্য পুরাণ গ্রন্থাদি এ

সম্বন্ধে একমত। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হিমালয় আদি সমুদ্রগর্ভ হইতে কি প্রকারে বহির্গত হইয়াছিল? ইহার উত্তরে ভূবিজ্ঞান বলেন যে, ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা।

সত্যযুগের প্রারম্ভ (Palaeozoic period) হইতে জীবের একটা ক্রমিক অটুট আবর্ত্তন দাক্ষিণাত্যে হইয়া গিয়াছে। তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা যায় যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি কেহই হিন্দুকুলের আর্য্য নয়। শাকদ্বীপ প্রভৃতি হইতে যাঁহারা জম্বুদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও মোক্ষমূলর-কথিত 'এ কালে'র আর্য্য হইতে পুরাতন। তবে আমরা কোন আর্য্য?

৪

১৪ই জানুয়ারী। বন্ধুবরের অন্ননালীর এক পার্শ্বে বসিয়া আমরা এই চিন্তায় মগ্ন হইলাম। আমরা কোন আর্য্য?

যে সগর-বংশীয় মহাপুরুষ গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কোন বংশীয়? এবং যে মহাপুরুষ মলয় পর্ব্বতে, হনুমানের ন্যায় ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত (সুন্দরাকাণ্ড দেখ) বানরের সহিত সখ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তিনি পঞ্চনদতীরস্থ কোন বংশের বীর?

আমাদিগের জাতিভেদের উৎপত্তিস্থান কোথায়? আমাদিগের ধর্ম্মের মূল কি?

বঙ্গদেশের জাতিবিচারের কোনও মৌলিক তত্ত্ব পাওয়া যায় কি না? বহু ধর্ম্মবিপ্লবেও জাতিভেদটা থাকিয়া যাইতেছে কেন? ইহা কি ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব? না, বিজ্ঞান আরও কিছু দেখিয়াছেন? জাতির মূল কোথায়?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবশরীর দ্বারা বিশ্বের সাধারণ ইতিহাসমাত্র প্রতিপন্ন হইতে পারে। কোনও জাতিবিশেষের লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সেই চিহ্নগুলির তারতম্য ও ব্যতিক্রম অন্য জাতির চিহ্নসমূহের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। যদি ব্যক্তিবিশেষের জাতি ও চরিত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়, তবে তাহার দৈহিক লক্ষণ ও রেখাসকল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা উচিত।

প্রথম কথা এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে এখন বহুল বর্ণসঙ্করত্ব ঘটিয়াছে। তাহার অনুসন্ধান করা গেল।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মানব-দেহের মধ্যে দুই ভাগ আছে।

১। প্রাকৃতিক ভাগ।

২। পুরুষের ভাগ।

প্রতীচ্য দেহতত্ত্বে ইহাদিগের নাম Sympathetic system, এবং cerbral system. বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়ের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম অনুমিত হয়। বহু সংঘর্ষণের পর একই ধর্ম্মের বিস্তার হইয়া থাকে; কিন্তু মধ্যে মিশ্র ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, এবং শেষে কি হয়, তাহা অজ্ঞেয়; এবং গুহায় নিহিত। আমরা প্রথমে ভাবিয়া আকুল হই যে, কোন্ কালে পুরাতন জম্বুদ্বীপের ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ছিল, এবং বেদের পৌরুষেয় ধর্ম্ম তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বেদের ভাষায় "পুরুষ", এবং দাক্ষিণাত্যের আদিম নিবাসিগণ তখন প্রকৃতি কিংবা "স্ত্রীলোক"। আর্য্যগণ দার্শনিক ও জ্ঞানমার্গাবলম্বী; অনার্য্যগণ (আমরা মোক্ষমূলরের ভাষাই ব্যবহার করিলাম) কিংবা প্রকৃতিপুঞ্জ ভক্তিমার্গীয়, এবং প্রাকৃতিক সংস্কারের দাস। তাহাদিগের স্বাভাবিক মহৎ জ্ঞানের ফল 'তন্ত্র'। উভয়ের সংঘর্ষণে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও তৎপরবর্ত্তী জাতিভেদ। উভয়ের সংঘর্ষণে বহুল ধর্ম্মের প্রচার। কেবল ভারতে নয়। পারস্যে, আরবে, মিশরে, রোমক ও গ্রীক দেশে যে সকল ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহা ইহারই প্রমাণ।

আমাদিগের সন্দেহ হইতে পারে, আর্য্যগণ কি স্ত্রীলোক সঙ্গে আনেন নাই? তাঁহারা কি নিজে কখনও 'প্রাকৃতিক' ছিলেন না?

কিন্তু পুরাণ শাস্ত্র হাস্যপূর্ব্বক কহেন যে, বিশ্ব অজিকার নহে। যাহারা 'প্রাকৃতিক' ছিল, তাহারা ক্রমে 'মুক্ত' হইয়া স্বর্গ নামক স্থানে পুরুষের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং ক্রমে তাহারাই আবার দেহসম্পন্ন হইয়া হিন্দুকুশ ও পঞ্চনদ অতিক্রমপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের প্রকৃতপুঞ্জে আবিষ্ট হইয়াছিল। ইহা এত কাল ধরিয়া হইয়াছিল, হইতেছে, এবং হইবে যে, 'ক্রমবিকাশ' সিদ্ধান্ত মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পড়ে। তখন 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural Selection) বৈদিক সপ্তপদী বিবাহের আসরে কন্যাযাত্রীর মত এক কোণে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকে। 'রাই' কাল ভালবাসে না, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচণের গুণে বাসিতে হয়।

এই অদ্ভুত বিবাহপ্রথা, গান্ধর্ব্ব ও বৈদিক আচারের সংমিশ্রণ, জ্বলন্ত অক্ষরে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম ও জাতীয় ইতিহাস প্রতিপন্ন করিতেছে। কোনও জাতিবিশেষ যে কেন হীনবল, কেন উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতেছে না, কেন ক্রমশঃ তালবৃক্ষপ্রমাণ হইয়া হুঙ্কারধ্বনি সহ-যোগে রণক্ষেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না, কেন কন্দর্পের ন্যায় অপ্সরোগণের চিত্ত বিমোহন করিতেছে না, তাহার এই একই উত্তর। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ ও পরবর্ত্তী প্রকৃতিপুঞ্জের সংমিশ্রণে, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতিপুঞ্জের ক্রমবিকাশ স্তম্ভিত হইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চক্ষুতে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। উভয়েই অনাদি, উভয়েই বিশাল জতি। সাংখ্যের মতে, জাতির মূল,—প্রকৃতি ও পুরুষ। বেদান্তের মতে,—একই জাতি, মায়া।

প্রাকৃতিক ভাগ ও তজ্জাত প্রকৃতিপুঞ্জ (আমাদিগের পৌরাণিক সখা ও সখীগণ) পূর্ব্বকালে উদ্ভিজ্জ ও কীটের দেহ অতিক্রমপূর্ব্বক চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস মেরুদণ্ডে পাওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে তাহারা ঈশ্বর নামক কোনও ভক্তি ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ পরমপুরুষকে জানিত না। তাহারা স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিত। কীট প্রস্তর হইতে উদ্ভূত। প্রস্তর তাহার মাতা। কুম্ভীরের মাতা সরীসৃপ। পক্ষীর মাতা বৃক্ষ; হস্তীর মাতা বরাহ। মানবের মাতা বানর। ক্ষত্রিয়ের মাতা চন্দ্র। ব্রাহ্মণ মাতৃহীন। ব্রাহ্মণ চটিয়া ধরাতল নিঃক্ষত্র করিতে প্রস্তুত; তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়ের পিতা সূর্য্য! ব্রাহ্মণের পিতা ঈশ্বর! প্রকৃতি চটিয়া মহামায়া! এবং ঈশ্বরের ধাম পরমব্রহ্ম! ইহাই বেদের শেষ বক্তব্য।

এই দাঙ্গা হাঙ্গামার চিহ্ন বসুজা মহাশয়ের দেহক্ষেত্রে এখনও বর্ত্তমান! দাক্ষিণাত্যের প্রকৃতি-পুত্রজ, নাসিকাগহ্বরের উত্তরবাসী পরবর্ত্তী পঞ্চনদ অধিকারী আর্য্যগণ কর্তৃক এখনও উৎপীড়িত হইয়া মহা চীৎকার করিতেছে! ইয়োসিন কিংবা মাইয়োসীন ভূযুগে এহেন উৎপাত ছিল না। তখন মানব-দেহের মস্তিক বহু স্থানে চক্রাকারে বর্ত্তমান ছিল। তখনও একটা বৈদিক মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডের শীর্ষে 'আর্য্যগণ' কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত বিলক্ষণ ছিল। ক্রমে বৈদিক মস্তিষ্ক হইতে দর্শনশাস্ত্র একটি বৃহৎ নাড়ী (Prensogastric or Vagus) অবলম্বন করিয়া হৃদয় প্রভৃতি মধ্যদেশ বাহিয়া যকৃৎ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিল।• ইহার ফলে নীলগিরি প্রভৃতি

ভূপঞ্জর স্ফীত হইয়া উদরের আয়তন-বৃদ্ধি ঘটিল। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, সৌরাষ্ট্র, সৈন্ধব, দর্দ্দুর, কিষ্কিন্ধ্যা, কলিঙ্গ, মালব, গুর্জ্জর, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ, এই উদর পূর্ব্বে অধিকার করিয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে Authropoid বানরগণের লাঙ্গুল সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক যুগেও দেখিতে পাই যে, যযাতি-বংশের চোল চেরা, পাণ্ড্য, অন্ধ্র প্রভৃতি বংশধরগণ মধ্যে মধ্যে উদর-আগ্মানের প্রকোপে বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া গৌড়, পৌণ্ড্র প্রভৃতি মৎস্যদেশের খণ্ডে চম্পট দিতেন। ইহার অনেকগুলি চিহ্ন উদরে ও বক্ষঃস্থলে পাওয়া গেল।

আবার দেখা গেল যে, তাতার, বাহ্লীক ও বক্ষু প্রভৃতি হইতে, শক ও হূণ জাতিগণ, দাক্ষিণাত্যে আসিয়া মহা উৎপাত করিতেন। বন্ধুবর নিধিরাম দাস ও ডাক্তার বিনোদবিহারী কর্ম্মকারের সাহায্যে খানকতক প্রস্তর-ফলক ও খনিজ কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া বেশ দেখা গেল যে, এখনও তাহাদিগের মধ্যে বরাহ ও কূর্ম্ম চিহ্ন পাওয়া যায়। এমন কি, স্ফীত প্রদেশে গভীর নির্জ্জন নিশীথিনীকালে শশারু ও কিরাতগণের ডাক বেশ শুনিতে পাওয়া যায়! অথচ অগ্নিমান্দ্য মোটে নাই!

রাজস্থান পুণ্যভূমি। ইহা যকৃতের নিম্নভাগে পিত্তপ্রণালী (Bile duct) অধিকারপূর্ব্বক বর্ত্তমান। পিত্তাধিক্য দেখিয়া বেশ অনুমিত হইল যে, বসুজা মহাশয় ক্ষত্রিয়; কারণ, তিনি পিত্তপ্রধান। এ স্থলে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কায়স্থ জাতির আদিস্থান সূর্য্যের ভাগে, না চন্দ্রের ভাগে? প্লীহার দিকে, না যকৃতের দিকে?

৫

১৫ই জানুয়ারী। আমাদিগের আদ্য হৃৎপিণ্ড কিংবা আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ পরীক্ষা করিবার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে আমরা নর্ম্মদার তীরে অবস্থান করিলাম। বন্ধুবর নিধিরাম দাসকে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রেরণ করা হইল।

কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সকলে পিত্ত দমন করিলাম। ইত্যবসরে আমাদিগের প্রিয়সুহৃৎ জটাধর কবিকঙ্কণ জাতিবিভাগ সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পালি ভাষায়। অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ছন্দ। "When Adam delved and Eve span
Who was then the gentleman?"

কথা। যখন ব্রাহ্মণগণ করিতেন সোমরস পান, তৈয়ারি করিয়া দিত কেটা ?

উত্তর। বৈদ্য রে ভাই বৈদ্য।

কথা। যখন ক্ষত্রিয়গণ করিতেন যুদ্ধেতে প্রস্থান, ইতিহাস লিখিয়া দিত কেটা ?

উত্তর। কায়স্থ রে ভাই কায়স্থ।

কথা। যখন ব্রাহ্মণগণ করিতেন পট্টবস্ত্র পরিধান, সংগ্রহ করিয়া দিত কেটা ?

উত্তর। বৈশ্য রে ভাই বৈশ্য।

কথা। যখন বর্ষাকালে গজাইত নব্যধান, কর্ত্তন করিয়া দিত কেটা ?

উত্তর। শূদ্র রে ভাই শূদ্র।

কথা। যখন গব্যঘৃতসংযোগে নব্যধান্য পোলাও-রূপে হইত প্রকাশ, তখন খাইত বসিয়া কোন ব্যাটা ?

উত্তর। সকলে একত্রে রে—ভাই একত্র।

ইহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, দেখা গেল, অন্ননালী হইতে আহার্য্য উদরে আসিলে পিত্ত গিয়া সেটার সহিত যুদ্ধ করে; কিন্তু রক্তে পরিণত হইলে সকলে একত্র বসিয়া খায়।

এখনও জীব-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনও স্থলে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দিলে ভল্লুক, বানর, সর্প, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ একত্র আসিয়া আহার করিয়া যায়। ভাগাভাগি লইয়া দ্বন্দ্ব হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আহারের সময় জাতিবিচার থাকে না।

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক বঙ্গ, অনার্য্য, কিংবা প্রাকৃতিক জাতির মধ্যেও মহাশয় ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—অঙ্গদ, সুগ্রীব, জাম্বুবান, জটায়ু, জরৎকারু (নাগ), বিভাবসু (বসু), অগ্নিমিত্র (মিত্র), নন্দ (ঘোষ), ইত্যাদি। কিন্তু খাওয়া দাওয়া লইয়া কোনও গোলযোগ হয় নাই। তবে ভাগে কম পড়িলে গোলযোগ হইত।

আমাদিগের মধ্যে তর্কবিতর্কের সূত্রপাত হইয়া পড়িল। তখন সূর্য্যদেব ঈষৎ-মধুর কটাক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক পাটে বসিতেছিলেন।

কথাটা ভয়ঙ্কর জটিল। পূর্ব্বকথিত বৈদিক মস্তিষ্ক প্রকৃতিপুঞ্জের উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া কি প্রকারে জাতিভেদের সমস্যাপূরণ করিয়াছিল ?

বৈদিক মস্তিষ্ক সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম। (পৌরুষেয়।) } একই ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

প্রকৃতিপুঞ্জ। (ভক্তিভরে) অবশ্য, তবে আমাদিগের জন্যও জগতে যেন স্থান থাকে।

বৈদিক মস্তিষ্ক প্রেমভরে দ্বিধা হইয়া গেল। শঙ্কর চটিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন; রামানুজ অন্য পার্শ্বে। জ্ঞানকাণ্ড এক দিকে; কর্ম্মকাণ্ড অন্য ভাগে।

(বৈদিক মস্তিস্ক) জ্ঞান কাণ্ড। তোমরা সকলেই মায়া সন্তান। তবে ব্যবহারিক ভাবে সত্য।

(ঐ) কর্ম্মকাণ্ড। অতএব ইহার একটা বিধান করা উচিত। মনু। স্মরণ রাখা উচিত (স্মৃতি) যে :—প্রথমতঃ মনুষ্য নামক প্রকৃতিপুঞ্জ বহুযোনি-জাত। অতএব, প্রত্যেক যোনির পূর্ব্বসংস্কার এই দেহে আছে। দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক মানবের মধ্যে কোনও না কোনও গুণ প্রবল,—

সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষ—ব্রাহ্মণ
রজোগুণ " " —ক্ষত্রিয়
রজোগুণ ও কিঞ্চিৎ তমোগুণ—বৈশ্য
তমোগুণ " " শূদ্র

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজ্ঞানচর্চ্চায় রত হইবে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে, বৈশ্য ব্যবসায়াদিতে, এবং শূদ্র সেবায়। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটা হুকা থাকিবে। ব্রাহ্মণের হুকায় কড়ি নাই; ক্ষত্রিয়ের এক; বৈশ্যের দুই; এবং শূদ্রের তিন বা ততোধিক কড়ি।—

জীবজন্তুগণ। মহাশয়! আমরা কি জাতি?

মনু। তোমরা মনুষ্য নহ, অতএব তোমাদিগের জাতি নাই। তোমা-দের মধ্যে সকল ব্যবসায়ই বর্ত্তমান। অর্থাৎ, বানর নিজেই তপস্যা করিবে, নিজেই যুদ্ধ করিবে, নিজেই ব্যবসা করিবে, নিজেই হুকার জল ফিরাইবে। অতএব বর্ণবিভাগের কোনও দরকার নাই। তবে ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে আহার করিবে না।

(মানব) প্রকৃতিপুঞ্জ। মহাশয় এ কি নূতন বিধান করিলেন? ইহাতে কোনও গোলমাল নাই ত?

মনু। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) মোটেই না! এই বর্ণবিভাগ একটা পেশা মাত্র। অন্যান্য দেশে যাহাকে পেশা কহে, ভারতবর্ষে তাহাকে জাতি কহে।

অন্যান্য দেশে যাহা 'ধর্ম্ম', এখানে তাহা নিভৃত গুহায় নিহিত। 'ধর্ম্মে'র স্থানে অপাততঃ 'কর্ম্ম' স্থাপিত হইল। ক্রমে যুগে যুগে 'কর্ম্মে'র স্থানে ধর্ম্ম স্থাপিত হইবে। আপাততঃ তোমাদের চলিত পেশার উপর 'জাতি'-বিভাগ সুদৃঢ় করা গেল।"

১৬ই জানুয়ারী। প্রাতঃকালে আমরা Solar plexur এবং lunar plexus দেখিয়া আসিলাম। সেখানে বহুতর প্রকৃতিপুঞ্জের বাসস্থান। তাহারা সূর্য্যবংশী ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশীয়, দ্রাবিড়ী ও তৈলঙ্গী। তাহাদিগের মধ্যে অনেক যোগী ঋষি বর্ত্তমান। তাহারা আমাদিগের theory (সিদ্ধান্ত) শুনিয়া হাসিয়া খুন। এক জন দীর্ঘজটাশালী যোগী পুরুষ প্লীহার বাম পার্শ্বে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—

"হে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ! আমরা বৈদিক বর্ণবিভাগ মানি না। উহা তোমাদিগের পক্ষে প্রহেলিকাবৎ! কিন্তু আমাদিগের সুপরামর্শ এই,—জাতি লইয়া গোল করিও না। উহার মূল অনুসন্ধান করিও না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যোগ শাস্ত্রের উপর স্থাপিত। যোগবিদ্যা ব্রাহ্মণ নামক কোনও জাতিবিশেষের নিজস্ব নহে। ইহা যোগিমাত্রেরই ধন। আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণবিভাগ সমাজসংগঠনের উপযোগী। সংগঠনমাত্রই কল্পনা। কল্পনার পুরুষ ব্রহ্মা। আমরা নিবৃত্তির পথে যাইতেছি। কোনও কল্পনাও নাই, সঙ্কল্পও নাই। আপাততঃ, ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে তোমরা কি ছিলে, তাহাই যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তবে হৃৎপিণ্ডের দিকে যাও। জাতীয় গৌরবকে আমরা তামসিক অহঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করি। এ অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হইলে ভাল মন্দ উভয়েরই আশঙ্কা।"

কি যন্ত্রণা! এই বিশাল দেশে কি একটা ভাবের সামঞ্জস্য নাই? চিরকালই কি ধর্ম্মবিপ্লব চলিয়া আসিবে?

দাক্ষিণাত্যের শরীরতত্ত্ব দেখিয়া এতটুকু বুঝা গেল যে, তাহারা কেবল রন্ধন কার্য্যে পটু। শিশোদীয়, প্রমার, গেহলোতগণ বলেন, তাঁহারা অগ্নিকুণ্ড হইতে আবির্ভূত। আমরা বলি, শোণিত আর্য্যাবর্ত্ত হইতে প্রবাহিত। শারীরতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "দেখ, শোণিতের উৎপত্তি-স্থানই দাক্ষিণাত্যের যকৃতের ভাগ, কিন্তু তাহা আবার সিন্ধুনদ হইতে বহিয়া পূর্ব্ব দিকে আসে, এবং তথায় সংস্কৃত হয়।"

আরও খানিকটা বুঝা গেল যে, হিংসা প্রবৃত্তি এ দিকে জৈন নামক ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রশমিত হইয়াছিল। হিংসা প্রবৃত্তি গেলে ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়। চিতোরের রক্ষাকালী যখন 'ম্যঁয় ভুখা হুঁ' শব্দ করিয়াছিলেন, তখন সহর-কোতওয়াল বিরিঞ্চি সিংহ বলিয়াছিল, "মা! জৈন ও বৈষ্ণবগণ আমাদিগের ক্ষুধা মারিয়া দিয়াছে; তোমার অত চোট্ কেন? শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর গৃহে শাকান্নমাত্র ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।" ইতি 'গল্প' সত্যভাষ।

খানকত জৈন গ্রন্থ ও জীবকঙ্কাল লইয়া আমরা এই অদ্ভুত প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া ততোধিক অদ্ভুত প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু জাতিবিভাগের কোনও সিদ্ধান্ত হইল না।

৬

১৭ই জানুয়ারী। বঙ্গদেশ! অঙ্গদেশ! কোশল! মিথিলা! আঃ! স্ত্রীলোকের মুখ দেখিয়া বাঁচিলাম। রমণীয়, কমনীয়, সকলই আর্য্যাবর্ত্তে। দাক্ষিণাত্যে সকলেই খোট্টা ও তেজঃপূর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তি।

বন্ধুবর নিধিরাম দাস ইতিমধ্যে এত ধর্ম্মলিপি ও তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই!

আমরা শারীরতত্ত্বের আলোচনায় রত হইলাম।

আর্য্যাবর্ত্ত নামক বক্ষঃস্থল স্তন্যশালী। ইহা পরম গৌরবের বিষয়। এখানে পূর্ব্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বিগণ এই স্থানে আসিয়া স্তন্য পান করেন। আর্য্যাবর্ত্ত বৃহৎ নদনদী-সমাকীর্ণ। বিশেষতঃ, ব্রহ্মপুত্র, পঞ্চনদ ও গঙ্গা। ইহার উভয় দিকে পর্ব্বত। ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে এমন সুবিধাজনক স্থান ভূমণ্ডলে নাই।

প্রথমে যখন আর্য্যপুরুষগণ প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তখন সমজদার লোক ছিল না। অতএব তাঁহারা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া এবং দেবগণের দিকে চাহিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাহাই মোক্ষ-মূলরের বেদ।

ক্রমে প্রকৃতিপুঞ্জের উৎপাত হইল। তাহারা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বলি ভক্ষণ করিত। এই সকল উৎপাত লগুড় ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা প্রশমিত করিয়া নূতন যুগে একটা সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার নাম মানব-সমাজ। তাহারা চক্ষু বুজিয়া বেদবাণী শুনিত, এবং কর্ণ দ্বারা বাহির করিত।

ইহার নাম স্মৃতি ও শ্রুতি। কিন্তু তাহারা যজ্ঞাবশিষ্ট বলি খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইল, এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিল। পাঞ্চাল্য আরুণি, উদ্দালক প্রভৃতি শিষ্য, কেহ গোময়, কেহ অর্কপত্র খাইয়া, পাতালে কিংবা কূপে পটাপট্ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখনও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় নাই। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের Practice আর্য্যাবর্ত্তভূমে তখন একচেটিয়া। ইহা লক্ষ্য করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত কটিদেশে বাঁধিয়া চিকিৎসায় লাগিয়া গেলেন। ইহা বৈদ্যজাতির মূল বলিয়া বোধ হয়। ইহাই অনেকের মত। পরবর্ত্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে বৈদ্য সাজিয়া শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছিলেন। এই দুঃখে Scythea হইতে শাকলদ্বীপী মিশ্র-(Misser)-গণ এ দেশে আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইঁহারাও ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু 'মিশ্র' কিংবা জংলা ব্রাহ্মণ; যেমন রাগিণী ইমন কল্যাণ 'মিশ্র'। নিজের পেশা কিংবা 'ধর্ম্ম' ছাড়িয়া অন্য পেশা ধরিলেই সে 'মিশ্র' হইয়া পড়ে। এই সকল বৈদ্যের Practice খণ্ডন করিতে গিয়া কতিপয় ক্ষত্রিয়ও ঔষধের পেশা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই 'মগধ' নামক জরাসন্ধের প্রদেশ স্থাপিত করেন (মার্টিন সাহেবের ইতিহাস।) ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে 'বসু' নামক এক ব্যক্তি রাজগৃহ স্থাপিত করেন (২১৩০ খৃঃ পূঃ)—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মগধের ইতিহাস।

কালক্রমে ইঁহারা বহু পীড়িত ব্যক্তিকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার হিসাব রাখা যমরাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। অতএব ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এক জন মহানুভব ব্যক্তি যমালয়ে গিয়া 'চিত্রগুপ্ত' রূপে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। কাহারও মতে, এই মহাপুরুষই কায়স্থবংশের আদিপুরুষ। এবং কাহারও মতে, ইঁহারা চিত্রগুপ্তের ভ্রাতা চিত্রসেনের বংশোদ্ভূত। এই চিত্রসেনের পুত্র 'বসু' মগধ রাজ্য স্থাপন করেন (অগ্নিপুরাণ)। কাহারও মতে, মনুর করণ জাতিই কায়স্থ। স্কন্দ-পুরাণের মতে, চন্দ্রসেন নামক ক্ষত্রিয় নরপতির রাণী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। অতএব, পরশুরাম গর্ভস্থ অর্থাৎ 'কায়স্থ' শিশুকে বধ করেন নাই। সেই ক্ষত্রিয় শিশুই কায়স্থকুলের আদিপুরুষ। কান্যকুব্জের কায়স্থ বঙ্গদেশে গিয়া বিপাকে শূদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; অগত্যা কুলীন মণ্ডলী তাহা স্বীকার করেন নাই। নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থ কখনও শূদ্র বলিয়া গণিত হয়েন নাই।

ইহার বি:রুে মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্তের এক ই:িহাস আছে। অর্থাৎ, বচন-প্রমাণাদি সংগ্রহপূর্ব্বক দেখান যাইতে পারে যে, দ্বিজজাতির অন্তর্বিবাহে ও বর্ণসঙ্করত্বে বৈদ্য ও কায়স্থকুলের সৃষ্টি।

কিন্তু বর্ণসঙ্কর ও 'অম্বষ্ঠ' প্রভৃতির অর্থ করা কঠিন। ব্রাত্যক্ষত্রিয় লিচ্ছভিস রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় আভিজাত্যে পতিত হইয়া কায়স্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি নিরুদ্ধ করিয়া মোটা বুদ্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, পেশার পরিবর্ত্তনই জাতি-সংখ্যার বৃদ্ধির কারণ। চিকিৎসা নামক ধর্ম্ম যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই 'বৈদ্য' যথার্থ খেতাব। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিতেন, ব্রাহ্মণেরাই লিখিতেন।

চিকিৎসা ও কেরাণীগিরির বিস্তার হওয়াতে, হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই একাংশ নবীন পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখনও পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিতেছে। কাহার পেশা কে করে, তাহা নির্ণয় করিতে সেন্সস্ কর্ত্তৃকপক্ষীয়গণের গলদ্ঘর্ম্ম হয়। যথা, ব্রাহ্মণের জুতার দোকান; ক্ষত্রিয়ের কেরাণীগিরি; বৈশ্যের ডাক্তারী; শূদ্রের বেদব্যাখ্যা; বেহ্মবড়ুয়ার চণ্ডীপাঠ।

এই পেশার পরিবর্ত্তন হৃৎপিণ্ডে যথেষ্টরূপে প্রদীপ্ত। বিজ্ঞানের মতে, আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিশিষ্ট। যদি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের পেশা হয়, তবে জীবন-সংগ্রামে সকলেই ক্ষত্রিয়। রক্ত বিহনে যুদ্ধ হয় না। র:ের সংস্করণস্থান হৃদয়। কিন্তু হৃদয়ের উপর মস্তিষ্কের প্রভুত্ব সমভাবে বর্ত্তমান। মস্তিষ্কের কল্পনা, কর্ম্মের মূল। কর্ম্মই পেশা। যাঁহারা নিবৃত্তি-পথে কিংবা প্রবৃত্তি পথে থাকিয়া সাম্যপ্রচার করেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাহ্মণ। ইহা কল্পনার সাত্ত্বিক সীমা। তাহার নিম্নবর্ত্তী স্তরে জাতি, সমাজ ও প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ইহারা হৃৎপিণ্ডে আসিয়া সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়।

এই হৃৎপিণ্ড তীর্থস্থান বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কেবল দাক্ষিণাত্য নহে, বিশ্বের চতুষ্কোণের প্রকৃতিপুঞ্জ শোণিত-সংস্করণার্থ এখানে উপস্থিত হয়। দ্রাবিড়, কর্ণাট, কিষ্কিন্ধ্যা, পাণ্ড্য, চোল, মালব, সৌরাষ্ট্র, বাল্হীক, মৌর্য্য, বক্তু, শক, হুণ, আরব্য, 'ইরাণী, শ্বেতদ্বীপী, প্লক্ষদ্বীপী, সকলেই চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তীর্থে আসিয়া অন্ততঃ একবার স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যে আর্য্যপুরুষগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে পঞ্চনদে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বহু-

শাখা বহু দেশে বিস্তৃত হইয়া একই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। মহম্মদের তেজ হৃদয়ে, খ্রীষ্টের ক্রুস হৃদয়ে, চৈতন্যের প্রেম হৃদয়ে, বুদ্ধের করুণা হৃদয়ে, জৈনের অহিংসা হৃদয়ে। এহেন মহামন্দিরে জাতিবিচার নাই।

অথচ স্থান কি দুর্ভেদ্য ও অজ্ঞেয়। হৃষীকেশ মহাশয় যে চারিটি গুহার মধ্যে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার নির্ণয় করা তত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে দুঃসাধ্য। Auricle ও Ventricle নিজের সনাতন কর্ম্ম--তালে তালে নৃত্য করিয়া যাইতেছে। সেই পরমস্থান হইতে শত সহস্র নাড়ী শোণিত লইয়া প্রাকৃতিক জগতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সাম্যস্থাপন করিতেছে। শত সহস্র নাড়ী মস্তিকের সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই বিশাল ধর্ম্মের কল্পনা হৃদয়-কন্দরে প্রচার করিতেছে! তাহার সাম্যগান ও শান্তিবাণী যাহারা শুনিতে পায়, তাহারাই ব্রাহ্মণ।

আমরা ইতিহাসের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস কিরূপ বিরাট গাথা, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভারতের ইতিহাস ধর্ম্মের ইতিহাস।

বিজ্ঞান যেদিন স্তিমিতনেত্রে ভারত-ইতিহাসের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবে, সেই দিনই ইতিহাসের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। যে ইতিহাসে ঈশ্বর নাই, সে ইতিহাস নহে। যে ইতিহাস জড়বিজ্ঞানকে জ্ঞান-পথে চালাইয়া দ্বন্দের মধ্যে সাম্য ও প্রেম দেখাইয়া দিতে পারিবে, এবং জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি দেখাইতে পারিবে, তাহাই ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাস।

১৮ই জানুয়ারী। বহু পরিশ্রমের পর বৈরাগ্য আসিয়া পড়িয়াছে। কাহারও মতে জ্যোতিষ, কাহারও মতে ভূবিদ্যা, কাহারও মতে পুরাণ ও প্রত্নতত্ত্ব, কাহারও মতে স্তূপ ও শিলালিপি, এবং কাহারও মতে কুলপঞ্জিকা, এই সকল মত একত্রিত, এবং ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি দ্বারা সংশোধিত করিয়া, ঐতিহাসিক রসায়ন ও বাজীকরণ নামক এক ঔষধের সৃষ্টি করা গেল। তাহাতে লেবেল আঁটিয়া শীঘ্রই প্রচার করা সকলের কর্ত্তব্য। মনুষ্য-জীবন ক্ষুদ্র। রসায়ন ভিন্ন আমাদিগের বলবর্দ্ধনের উপায় নাই।

শেষ।

বসন্ত চলিয়া যায়, বায়ু করে হায় হায়,
পাপিয়ার কলগানে কাঁদে উপবন।
যৌবন হয়েছে শেষ, মরমেতে মোহাবেশ,
নয়নে রয়েছে লেগে রূপের স্বপন!
প্রশান্ত উজ্জ্বল ছবি, ডুবেছে সন্ধ্যার রবি,
স্বর্ণমেঘে স্বপ্নময় বর্ণের বিলাস!
লয়ে তারা হারাবলী, নিশি কেঁদে গেছে চলি,'
ফুটে' শুকতারা-চোখে কি মোহ আভাস!
থেমেছে বীণার গান, মুদারার মধু তান,
আকাশে শিহরে তার পথহারা সুর;
মরণ-শয়ন প'রে প্রভাতে শেফালি ঝরে,
মৃদু মন্দ সমীরণ গন্ধে ভরপূর।
ফুলের পরাগ মাখি', গান গেয়ে গেছে পাখী,
শূন্য শাখা থাকি' থাকি' করে মর-মর।
পূর্ণিমা নিশির শেষে চন্দ্র অস্ত গেছে হেসে
ঘুমায়ে পড়েছে কূলে অলস সাগর!
সারা দিন বরিষার ঝরিয়াছে অশ্রুধার,
ছিন্ন মেঘে ইন্দ্রধনু আঁকা বর্ণরাগে,
ফুরায়ে গিয়াছে সুখ, ব্যথা-ভরা ভাঙ্গা বুক,
অতীতের শত স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে জাগে।
উৎসবের অবসান, ম্লান দীপ, স্তব্ধ গান,
হাসে বিষাদের হাসি জনহীন পুরী,
কাব্য-কথা সমাপন, মুগ্ধ ভাবুকের মন,
মরমে জড়ায়ে আছে অস্ফুট মাধুরী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাহুট কোট।

[মালদহের হজরৎ পাণ্ডুয়া।]

মালদহের হজরৎ পাণ্ডুয়া বা পাড়ুয়া অচিরে পাণ্ডুনগরের বাদশাহী কালের নাম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। মালদহের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় যে দুইটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা * প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রাচীন, এবং তাহাতে "পাণ্ডুনগর" মুদ্রিত রহিয়াছে। পাণ্ডুনগরে "শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ" শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দেব এবং শ্রীশ্রীমন্মহেন্দ্র দেব একদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। "গৌড়দূত" বলেন, রৌপ্যমুদ্রা দুইটির মধ্যে একটিতে ২৩৯ ও অপরটিতে ৪৩৯ শকাব্দ মুদ্রিত আছে। (শকাব্দ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে)। যাহাই হউক, মুদ্রা দুইটির প্রসাদে আমরা হজরৎ পাণ্ডুয়াকে পাণ্ডুনগর বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিব। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ২৩৯ শকাব্দে মালদহের পাণ্ডুনগর হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার অধিকারে ছিল, এবং তাঁহারা স্বাধীন রাজা ছিলেন। পনেরো শত নিরনব্বই বৎসর পূর্ব্বে, পাণ্ডুনগরের অস্তিত্ব ছিল, আজ তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

পাটলিপুত্র নগরে যে সময় গুপ্তবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গালায় পাণ্ডুনগরে শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ নরপতির রাজত্ব করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই সময়ে হুণগণ গুপ্ত রাজগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। থানেশ্বরাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধন ঐ সময়েই বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহারা কিছু পরেই চীনপর্য্যটক হিউ এন্‌থ সঙ্‌ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শোভা দেখিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুনগর বা আদিনাপুর † সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। সেই সময়ে কর্ণসুবর্ণ (সম্ভবতঃ

---

* মুদ্রা দুইটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

† বর্ত্তমান কালের আদিনা মসজিদ্‌ সেকালে আদিনা-পুরস্থ "আদিনা" নামক আদিশূরের সভাগৃহ ছিল। এ সম্বন্ধে লঘুভারত যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়।

দ্বিজ-পঞ্চ বঙ্গদেশে রামপাল নগরে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে আদিশূর গৌড় হইতে তথায় গমন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি কনৌজাগত পঞ্চ-দ্বিজের সহিত পবিত্র গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়স্থ আদিনাপুরের আদিম সভায় মন্ত্রিগণ সহিত বার দিয়া বসিয়া দ্বিজগণকে সম্মানিত ও বর্ত্তমান মালদহস্থিত পঞ্চ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

কাঞ্চন সোনা) গৌড়, পাণ্ডুনগর, আদিনাপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ, কর্ণসুবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য নগরগুলি তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত ছিল। যাহাই হউক, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় ছিল, এ প্রবন্ধে তাহার নির্দ্দেশ অপ্রাসঙ্গিক নহে। তবে আদিনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। কারণ, আদিনার সন্নিকটেই সাতাইশঘরা ও রাহুট-কোট। রাহুটকোট অতিপ্রাচীন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রাহুটকোটের সংক্ষিপ্ত স্থান-পরিচয়।

প্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে রাহুটবাঁক বা কোট নামক একটি প্রাচীন দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রাহুট বাঁকের অনতিপূর্ব্বেই তঙ্গন নামক বিস্তীর্ণা নদী প্রবাহিতা ছিল। সেই নদী পারা-পারের জন্য শত-খিলান-যুক্ত "কড়ির আইল" নামক সেতু বর্ত্তমান ছিল।

কড়ির আইল। ও দেবট কৃতালি।

আজিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আদিনা হইতে একটি সুপ্রশস্ত পথ উক্ত সেতুর উপর দিয়া নদীর পর-পারস্থ "বরেন্দ্রনগরে"র * মধ্য দিয়া সুদূর প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীতীর পর্য্যন্ত যে উন্নত পথ জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, দেশের জনগণ উহার নাম "পৌন্তলের আইল"

পৌন্তলের আইল।

বা "পুন্তলের আইল" বলিয়া জ্ঞাত আছে। ধর্ম্মপাল দেবের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেবট কৃতালির কথা আছে। আমাদের বিশ্বাস, উহাই বর্ত্তমান কালের "কড়ির আইলে"র অপরাংশ। রাহুট কোট

তিনি রামপাল নগরে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। আমরা নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকই ইহার প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারি।

"আদিনায়ামুপবিষ্টঃ সভায়াং মন্ত্রিভিঃ সহ॥"

"রামপালং পরিত্যজ্য গতবানাদিনাপুরে।
স পুনর্ন গতো বঙ্গে ইত্যাদ্যপ্যুচ্যতে জনৈঃ॥"

লঘুভারতোক্ত অন্য একটি বচন প্রমাণে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি "আদিনা" আদিশূরের বাসস্থান ছিল। যথা,—

"অদ্যাপি দৃশ্যতে গৌড়ে তদ্বাসস্থানমাদিনা।"

এই কয়েক ছত্রের বলেই গৌড়ের আদিনা আজিও আদিশূরের বাসস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে।

* আজিও "বরেন্দ্র" নামে ক্ষুদ্র বনভূমি ইষ্টক-প্রস্তরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। পল্লীকথা দ্রষ্টব্য।

হইতে কড়ির আইল নামক প্রাচীন সেতু অধিক দুরবর্ত্তী নহে। রাহুট কোট হইতেই এই প্রাচীন রাজমার্গ প্রথম বিস্তারিত হইয়াছে। এই স্থানে নদীস্রোত একটা বৃহৎ "বাঁক" উৎপাদন করিয়া সে কালে প্রবাহিত ছিল, আজিও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আমাদের বোধ হয়, বাঁকের উপরিস্থ রাহুট কোট বর্ত্তমান কালে "রাহুট বাঁক" নামে পরিচিত হইয়াছে। এ দেশে নদীর বাঁককে "মোড়"ও বলে।

রাহুট বাঁকের পৃষ্ঠপার্শ্বেই "কোট" নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়। কোট অর্থে দুর্গ। উক্ত কোট রাহুটের পূর্ব্ব অংশ মাত্র।

পাণ্ডুয়ার সহিত রাহুট কোটের সম্বন্ধ।

সমুদায় পাণ্ডুয়া নগর তিনটি উন্নত ইষ্টক-মণ্ডিত দুর্গ-প্রাকারবৎ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। অদ্যাপি তাহা ভ্রমণকারিগণ দেখিয়া থাকেন। প্রাকার-ত্রয়ের নাম কুতবসাহেব-কা কোট, চাঁদরাইল গড়, (চাঁদ আইল দুর্গ) ও বাহির গড়, বা বাহির চাঁদ রাইল গড়। এই তিনটি উন্নত প্রাকারের অভ্যন্তরে "রাহুট কোট" নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাহুট কোটও তিনটি সুউচ্চ পরিখা-শোভিত ইষ্টকমণ্ডিত প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাহুট কোট ও সাতাইশ ঘরা আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকার দ্বারা সতরঞ্চের (দাবা খেলার) ঘরের ন্যায় শোভিত ছিল, দেখিতে পাই।

রাহুট কোট সম্বন্ধে মোসলমান ঐতিহাসিকের কল্পনা।
[ফেরেস্তার অঙ্কিত চিত্র হইতে।]

"রাহুট" এই নামটি কোথা হইতে আসিল, তাহার সমাচার হিন্দুর ইতিহাস বা কাহিনীতে নাই। আমরা মোসলমান ঐতিহাসিকের গল্পকথার মধ্যে রাহুট বা রাহুৎ কথার সন্ধান পাই। বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ মুসলমান-কৃত প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা উপকথা বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে উপকথার আতিশয্য দেখিতে পাই।

গল্প-কথার মধ্য হইতে সত্য যে আবিষ্কৃত হয় না, এ কথা বলিবার সাহস আমাদের নাই। সেই কারণে ফেরেস্তার অঙ্কিত চিত্র হইতে রাহুটের একটা গল্প শুনাইয়া অন্যান্য প্রচলিত প্রবাদের কথা বলিব।

ফেরেস্তায় রাহুত।

বহুকাল অতীত হইল, কোচ দেশের এক জন বীরপুরুষ বহু সৈন্য

শাকন ও রাহুৎ।

সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ ও বিহার ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শাকন (শঙ্কর ?)। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির অন্তর্গত, নদী-বেষ্টিত ভূখণ্ডে এক অত্যুত্তম নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত

"গৌড়" নামের উৎপত্তি।

নগরের নাম "গৌড়" রাখিয়াছিলেন। তাঁহার চারি সহস্র সমর-হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী সেনা ও চারি লক্ষ পদাতিক ছিল। আফ্রাসিয়াব্ (Afrasiyab) নামক এক জন তুরানীয় বাদশাহ শাকনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া প্রথমবার বিফলমনোরথ হইয়াও দ্বিতীয় বারে গৌড়নগর পর্য্যন্ত অধিকারপূর্ব্বক শাকনকে বন্দী করিয়া তুরাণে লইয়া যান। তুরাণে প্রতিগমন কালে শাকনের পুত্র রাহুৎ-কে কতিপয় নিয়মে আবদ্ধ করিয়া "গৌড়" রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া-ছিলেন। রাজকুমার রাহুৎ (রোহিত) রোহটস (Rohtas) দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এবং তৎস্থানে এক বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন। এই রাহুৎ-প্রতিষ্ঠিত কোট বা দুর্গই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে "রাহুট্ কোট" নামে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকিবে।

সেই শাকনের প্রতিষ্ঠিত গৌড় নগর বর্ত্তমান মোসলমান গৌড় নহে। সে গৌড় পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ, আদিশূরের সময়েও সেই গৌড় ছিল। আজিও উক্ত অঞ্চলে মহানন্দা-তীরে বল্লাল্ কাঠাল (বল্লাল কাঠাল) ও মোড় বল্লাল্ ভিটা নামক প্রাচীন বল্লালী রাজধানীর চিহ্ন-স্বরূপ ইষ্টক-প্রস্তর-সমাকীর্ণ বনভূমিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এই আখ্যানটি সত্য কি মিথ্যা, তাহা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা ঐতিহাসিক-গণের বিবেচ্য।

রাহুট কোট ও নদীর কথা।

এই গৌড়ের অন্তর্গত সুদৃঢ় রাহুট কোট নামক দুর্গ চতুর্দ্দিকে নদী-বেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে গঙ্গা ও কোশীর সঙ্গমস্থলেই উত্তরাগতা মহানন্দার মিলন হইয়াছিল। তঙ্গন, মহানন্দা, গাঙ্গনীকা, রঞ্জন প্রভৃতি উত্তরাগত নদীসমূহ উত্তরাংশ বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব পার্শ্ব বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণে গঙ্গা, পদ্মা ও কোশীর মিলিত-প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছিল। আজিও বর্ষাকালে তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকৃতি দেবী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং রাহুট ও পাণ্ডুয়া চতুর্দ্দিকেই বিস্তীর্ণ জলে বেষ্টিত ছিল।

আদি গৌড় বা বৌদ্ধ গৌড়।

রাহুট কোটের একটি প্রাচীন-কাহিনী পরিসমাপ্ত করিয়া পরবর্ত্তী কালের কতিপয় জনপ্রবাদ-মূলক কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

দেওতলা (দেবতলা, অনেকে উথ্‌রা দেওতলাও বলিয়া থাকেন। পাণ্ডুয়া, রাহুট কোট, আদিনাপুর, গৌড়, এই সমুদায় স্থান বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণের রাজধানী-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌড় বলিলে আদি গৌড় বা বৌদ্ধ গৌড় বুঝাইবে।

রাহুট কোট বৌদ্ধ গৌড়ের অন্তর্গত।

আমাদের বিশ্বাস আছে, গৌড় নগর বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কারণে আমরা বৌদ্ধ গৌড়, হিন্দু গৌড় ও মোসলমান গৌড় বলিয়া তিনটি স্থান সনাক্ত করিয়া, তাহাদের বিবরণ পল্লী-কথায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এই তিন গৌড়ের কথা প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে। আমাদের আলোচ্য রাহুট কোট ও সাতাশঘরা বৌদ্ধ গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

রাহুট কোটের চিত্র-পরিচয়।

পাণ্ডুয়ার যে অংশে রাহুট কোট নির্দ্দেশিত হইতেছে, তাহার একটি মানচিত্র প্রদান করিলাম। ইহা পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বাংশ, এবং তঙ্গন নদীর তীরবর্ত্তী। রাহুট বাঁকের পূর্ব্বে "কোট" নামক বনভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে উহা রাহুট কোটের অন্তর্গত ছিল। নদীর ভাঙ্গনে প্রাচীন কালের সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরে "মজলিস বাগ" * নামক বাদশাহী আমোলের প্রমোদোদ্যান ছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌গণ পাণ্ডুয়ার বনভূমিস্থ বৃক্ষলতাদির পরিচয় গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইবেন, মালদহের অন্য অংশে কুত্রাপি যে সমুদায় বিবিধাকার ও বিচিত্র বর্ণের উদ্ভিদের একান্ত অভাব, এক পাণ্ডুয়ার বনে সেই প্রাচীনকালে বিদেশ হইতে আনীত সযত্নরোপিত বৃক্ষলতাদির সমাবেশ আজিও দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। বিবিধ ভেষজ-বৃক্ষ-লতাও পাণ্ডুয়ার বনে যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা মজলিস বাগের পরিচয়ার্থ আজিও প্রাণে প্রাণে এই ভীষণ বনে অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

বৈদেশিক উদ্ভিদের কথা।

সমুদায় পাণ্ডুয়ার বনভূমির প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপ-স্থল পরীক্ষা করিলে দেখা

* বাগ অর্থে বাগান বা উদ্যান।

যায়, রাহুট কোট নামক স্থানটি যে প্রকার গঠনে গঠিত, যে প্রকার সুন্দর স্থানে সংস্থাপিত, তাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। ইহা একদিন যে বিশাল রাজান্তঃপুরসমন্বিত, মহান্ দুর্গে রক্ষিত, সুন্দর প্রাসাদমালায় শোভিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

করি-সিংহাঙ্কিত প্রাচীন সেতু।

আদিনার কিয়দ্দূর দক্ষিণে যে "সাঁকো" বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং যাহার উপর দিয়া বর্ত্তমান কালে দিনাজপুরের রাস্তা বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহা ইষ্টকপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সেতুটি প্রাচীনকালে হিন্দু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, কোনও গুপ্তবংশীয় রাজার রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সেতুর উপরের খিলানটি ভগ্ন হইয়া গেলেও নিম্নের পার্শ্ববর্ত্তী অংশে আজিও করী সিংহাদির চিত্র অতি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। এই সেতু-মধ্যপথের পয়ঃপ্রণালীটি আজিও মহানন্দা ও তঙ্গনের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। বর্ষাকালে এই জলপথে নৌকা লইয়া গমনাগমন করা চলে। রাহুট কোটের পার্শ্ব দিয়াই উহা প্রসারিত রহিয়াছে। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে এই জলপথে মহাজনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য-তরণী পণ্য-ভার লইয়া পাণ্ডুয়া নগরমধ্যে বিক্রয় করিত, এবং রাহুটকোটস্থ বণিকগণের বিপণীতে পণ্যভার বহিত। বিপৎকালে উক্ত পথেই রাজগণ গোপনে হয় মহানন্দা নদী, নয় তঙ্গন নদী-পথে পলায়ন করিতেন।

ভিকৃরা।

ভিকৃরা সম্ভবতঃ ভিক্ষুপল্লী। ইহার মধ্য দিয়া সেকালের ইষ্টকময় লুপ্ত রাজমার্গের চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা পূর্ব্বে রাহুট কোট পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল।

রাহুট কোট ও সাতাইশঘরার পশ্চিমে দিনাজপুরের রাস্তা, এবং উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক ক্রমান্বয়ে ব্রীজপুর (বীর্য্যপুর) বিনোদপুর, মজলিসবাগ, কোট, হোসনদীঘী, (হোমদীঘী) ধুলসানান্, হাড়খড়কে,* হাতীডুবি, পঞ্জাপাড়া (পাঞ্জাপাড়া) এবং বারদুয়ার বা বাইশহাজারী প্রভৃতি পল্লী বা মহল্লায় বেষ্টিত ছিল। প্রাচীন কালে উক্ত সীমাবদ্ধ ভূভাগ বহুজনপূর্ণ অট্টালিকা-শোভিত বিশাল পাণ্ডুয়া নগরের একাংশ ছিল, তাহার নিদর্শন পদে পদে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়, সোপানাবলীশোভিত হইয়া আজিও বর্ত্তমান। জলাশয়গুলির সংখ্যা ন্যূনকল্পে দুই শতেরও অধিক

* হাড়খড়কের যুদ্ধাদি ব্যাপারে মৃত জনগণের সম খিক্ষেত্র।

হইবে। ইষ্টক-প্রস্তরময় গৃহ-ভিত্তির সুন্দর চিহ্ন ও প্রাচীন নগরমধ্যস্থ সরল ও বক্র রাজপথের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন ও প্রাচীন কালের সেতুসমূহের ধ্বংসপ্রায় চিহ্নের অভাব নাই। এই স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহল্লার নামও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনপ্রবাদ, এই স্থানে সহরের ধনিগণের বাসস্থান ছিল। পাণ্ডুয়ায় প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহের নিবাসবাটী এই অংশে ছিল।

রাহুট কোট ও সাতাইশঘরা।

আসুন, আমরা প্রধান দুর্গদ্বার দিয়া প্রাচীন রাজা ও বাদশাহগণের বিলাস-নিকেতন সুদৃঢ় রাহুট কোটে প্রবেশ করি। ভিকুরা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে, সম্মুখে একটি সুঠাম দুর্গপ্রাকার নয়ন-পথে পতিত হয়। উক্ত গড় উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে সরল রেখার ন্যায় বিস্তারিত রহিয়াছে। বেউড় বাঁশের ঘন বন এই গড়টিকে হরিত বর্ণে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশাল-কলেবর শাল্মলী তরু বাহু প্রসারিত করিয়া উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান। গড়ের পার্শ্বে পশ্চিমাংশে সুগভীর পরিখা দুর্গমেখলার ন্যায় দূরে হরিত বনে মিশিয়া গিয়াছে।

সম্মুখে গড়ের কিয়দংশ খণ্ডিত। এই খণ্ডিত অংশের সম্মুখস্থিত পরিখা রাশীকৃত ইষ্টকস্তূপে পূর্ণ। সম্ভবতঃ, এই অংশেই দুর্গপরিখার উপর দুর্গপ্রবেশের জন্য ইষ্টকময় সেতু বিদ্যমান ছিল। এই সেতুর উত্তর ভাগে সুদীর্ঘ দীঘীর ন্যায় জলভাগ জলজ তৃণাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে। উহার গভীরতা আজিও প্রশংসার যোগ্য। না জানি এই সেতু-পথ বিজয়ী সেনার জয়নাদে ও আহত সৈনিকের আর্ত্তনাদে কতবার মুখরিত হইয়াছিল। এইটি দুর্গ-প্রবেশের একমাত্র সিংহদ্বার।

রাহুট দুর্গে প্রবেশের প্রধান দ্বার।

এই ইষ্টকস্তূপাকৃতি সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে ও বামে সুদূর পর্য্যন্ত পরিখা ও দুর্গপ্রাকার আজিও দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।

এই দুর্গদ্বারে একদা সুদৃঢ় কবাট অর্গলনিবদ্ধ থাকিত। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আজিও উক্ত অংশে দুর্গ-প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে গড়ের উপর দুইটি সুবৃহৎ স্তম্ভের চিহ্ন বর্ত্তমান। দক্ষিণের স্তম্ভটির এক-তৃতীয়াংশ ও বাম ভাগের স্তম্ভটির মূলদেশমাত্র আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহাদের বিশালতার ও দৃঢ়তার পরিচয় উহারাই প্রদান করিতেছে। দ্বারদেশের

এই অংশে কেবল ইষ্টক। ইষ্টকস্তূপের উপর ইষ্টকস্তূপ প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্ত অংশে ভ্রমণকালে প্রতি পদবিক্ষেপে ইষ্টকস্খলনে পদচ্যুতির সম্ভাবনায় ভীত হইতে হয়। সামান্য অসাবধানতায় পদস্খলন অনিবার্য্য।

তোরণ-দ্বার।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেই দুই পার্শ্বে ইষ্টকস্তূপ ও মধ্যভাগে গভীর পথহীন ইষ্টকাবৃত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে তোরণদ্বারের অভ্যন্তরে উভয় পার্শ্বে সেনানিবাস ছিল, তাহা এই ইষ্টকস্তূপই নীরবে ঘোষণা করিতেছে। শত শত সৈনিক পুরুষ উন্মুক্ত কৃপাণ করে এই স্থানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল, তাহা অনায়াসে কল্পনা করা যায়। এই দুর্গদ্বার ও রক্ষি-সেনা-নিবাস অতিক্রম করিলেই সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র সরোবর। উহার তিন দিকেই বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। সেই সমতল ক্ষেত্র উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক অংশে প্রাচীন ইষ্টকময় গৃহভিত্তির অস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। জনপ্রবাদমূলে অবগত হওয়া যায়, এই স্থানে বৃহৎ "বাজার" ছিল। বড় বড় সওদাগরগণ নিরাপদে বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার আপন আপন বিপণীতে সাজাইয়া ক্রেতৃগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। এখন সেই বাজার হৈমন্তিক ধান্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়াছে।

বাজার।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিদাস পালিত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—মাঘ। প্রথমেই হাকিম মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে 'নাদির শাহ কর্ত্তৃক দিল্লীবাসীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান' নামক একখানি পট,—'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র মহম্মনীয় আদর্শ। এই শ্রেণীর চিত্রই অবনীন্দ্র-পন্থী পটুয়াদিগের অন্যতর উপজীব্য।—এই চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য কি, তাহা বলিতে পারি না। অধ্যাপক শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মালদহের সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি রূপে যে 'অভিভাষণ' পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা 'বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য' নামে 'প্রবাসী'র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সূচনায় দেখিতেছি,—'ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমার যেটুকু আছে, তাহা এই কার্য্যের সহায়তা করিলেও করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের একটু বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি যে সমালোচনা ও উপদেশ প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা আমার যে সব বন্ধুগণ এই সাহিত্যে ডুবিয়া আছেন তাঁহাদের পক্ষে নূতন এবং হয় ত মূল্যবানও হইতে পারে।' কালিদাসের সূত্রধর বলিয়াছিলেন,—

'আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥'

কিন্তু যদু বাবুর 'সপ্রত্যয়ং চেতঃ';—তিনি সভাপতি-কুলে ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি নিজেই একরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার 'সমালোচনা ও উপদেশ' 'নূতন' ত হইবেই, 'হয় ত মূল্য-বান'ও হইতে পারে! আর কিছু নূতন না হউক, 'অভিভাষণ' সাহিত্যে এই ঢক্কানিনাদ নূতন বটে। যদু বাবুর 'ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা যেটুকু আছে', তিনি স্বয়ং তাহা বলিয়া না দিলে, বাঙ্গালী সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতেন। কেন না, এই কয়েক পৃষ্ঠার 'অভিভাষণে' তাঁহার সেই বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের বিশেষ কোনও পরিচয় নাই। যদু বাবু অভিভাষণের যে অংশে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বঙ্গসাহিত্য গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যদু বাবু যে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যে স্বতঃসিদ্ধ। গ্রাম্য ভাষা ও সাধু ভাষার বিরোধ প্রতিভাই ভঞ্জন করুন; অধ্যাপক যদুনাথ তাহা পারিবেন না। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় জানেন,—এই দুই ভাষা ভিন্ন আর একপ্রকার ভাষা,—অপভাষা পেত্নীর মত বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল আবর্জ্জনা সঞ্চয় করিতেছে। যদু বাবু সে সম্বন্ধে মূক। তাঁহার 'অভিভাষণে' দেখিতেছি,—'সাহিত্য সৃজন'। অধ্যাপক 'সৃজনে'র 'সৃষ্টি' করিলেন কেন? সাধু ও গ্রাম্য, কোনও ভাষায় এই অর্থটুকু বহন করিবার বাহনের যখন অভাব নাই, তখন যদু বাবু পদ্য হইতে 'সৃজন'কে ধরিয়া তাহার উপর সোওয়ার হইয়া মালদহে প্রবেশ করিলেন কেন? অধ্যাপক যদুনাথ লিখিয়াছেন,—'আবশ্যকীয়'। যখন 'আবশ্যকে'ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন 'আবশ্যকে'র পশ্চাতে একটি প্রত্যয়ের লাঙ্গুল জুড়িয়া দিয়া, তাহাকে বানরে পরিণত করিয়া, সাহিত্যের আসরে নাচাইয়া লাভ কি? সাধু ও গ্রাম্য শব্দ সম্বন্ধে 'উপদেশ' দিবার পূর্ব্বে যদু বাবু এ সম্বন্ধে স্বয়ং একটু উপদেশ গ্রহণ করিলে ক্ষতি ছিল না। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভি-ভাষণে ভাষার এরূপ লাঞ্ছনা শোভা পায় না। যদু বাবু 'তাঁহাদিগকে'র পরিবর্ত্তে 'তাঁহাদেক' ব্যব-হার করিয়াছেন। ইহাও নূতন বটে। কটকে যোগেশচন্দ্র, পাটনায় যদুনাথ বাঙ্গালা ভাষার সংস্কা-রের জন্য বদ্ধপরিকর। শিশু সাহিত্য এত সংস্কার সহিতে পারিবে ত? শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের সঙ্কলিত 'ভারতের কয়লা' ও শ্রীযুত নিরুপম গুহ ঠাকুরতার 'পুষ্পসার' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন্ত আগ্নেয়গিরি' উপভোগ্য। কিন্তু ভাষা গ্রাম্যতা দোষের 'জীবন্ত আগ্নেয়গিরি'। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'মণি' নামক কবিতায় প্রতিভার প্রসাদ-চিহ্ন দেদীপ্য-মান। শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎসব' ও অন্যান্য কবিতাগুলি পাদপূরণে ব্যবহৃত। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাগরণ' উৎকৃষ্ট রবিকূট। অন্ধ ভক্ত-সম্প্রদায় এই রচনায় 'অন্ধের হস্তিদর্শনে'র আনন্দ উপভোগ করিয়া ধন্য হইবেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী ভাষা হইতে 'দুর্ঘটনা' নামক একটি সুপাঠ্য গল্প চয়ন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়ের 'চীনভ্রমণ' মনোজ্ঞ ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীযুত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্যের সঙ্কলিত 'ভুবনেশ্বর' ও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'গুজরাতি সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার 'সাহিত্যসেবী' প্রবন্ধে প্রচার করিয়াছেন,—আমাদের সর্ব্বস্ব প্রতীচীর আমদানী। তাহা সত্য নহে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'নব্য কবিতা' নামক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করি-

বার চেষ্টা করিয়াছেন,—'প্রকৃত কবিতার অর্থ অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা উপলব্ধির বস্তু।' বাঢ়ম্। সত্যেন্দ্রনাথের ভাব ব্যক্ত করিবার পদ্ধতি, ভাষা ও শব্দবিন্যাস আশ্চর্য্যরূপে রবীন্দ্রনাথের মুদ্রাদোষে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। মনে হয়, যেন সেই পূর্ব্বপরিচিত সত্যেন্দ্র তৈলপায়ীটি রবীন্দ্র কাঁচপোকার প্রভাবে রূপান্তরিত হইতেছে! রবীন্দ্র-পদ্ধতির সহিত সত্যেন্দ্র-ভঙ্গীর প্রভেদ এই যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোকাংশে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার চারি দিকে মানববুদ্ধির দুর্ভেদ্য ভাষার জাল বুনিয়া থাকেন; আর সত্যেন্দ্র হায়েন হইতে খায়েমের বয়েৎ পর্য্যন্ত আব্রহ্মস্তম্ব কিছুই বাদ দেন না। 'প্রবাসী' সত্যেন্দ্রনাথের এই গুরুগম্ভীর কোটেশনের 'পাটী-সাপ্টা'র পরই, এই ধরণের—অর্থাৎ, যাহার অর্থ অভিধানেও দুর্লভ, এবং যাহার উপলব্ধি করিতে গেলে আত্মাপুরুষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন,—একটি কবিতা—কোৎরা গুড় পাঠকের পাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। কবিতাটির নাম 'শীত'। ইহাতে পূরক আছে, রেচক আছে আছে, কবোষ্ণ আছে।

মুকুল। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'চম্পা রাজকন্যা' একটি চলনসই উপকথা। কিন্তু তাঁহার রচিত 'দাঁতে ব্যথা' নামক কবিতায় বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই। হাস্যরসবিকাশের উদ্ভট চেষ্টা আদৌ সফল হয় নাই। ইহাতে 'রস' নাই, তেতো কস্ আছে। ছবিগুলিও রচনার মত ব্যর্থ বটে, তবে 'হাস্যকর' বলা যায়। 'পাগড়ীর কাণ্ড' ইতিহাস, না গল্প, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীমতী প্রিয়ংবদা দেবীর 'ধবলীর বীরত্ব' সুখপাঠ্য; অপেক্ষাকৃত সঙ্ক্ষিপ্ত হইলে আরও মনোরম হইত। 'বানরের প্রভুভক্তি' মন্দ নহে। 'কাগজ' শিশু পাঠকদিগের উপযোগী। পৌষ-সংখ্যায় 'প্রতীক্ষা' নামক সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ গল্পটি রুসিয়ার ঋষি কাউণ্ট টলষ্টয়ের রচিত গল্প হইতে অনূদিত। গল্পটি পড়িয়া আমাদের মত বুড়ারাও প্রীত ও উপকৃত হইবেন। 'মুকুল' ষোল বৎসর চলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মন্বন্তরে 'মুকুল' শুষ্ক হয় নাই, ইহা আমরা সৌভাগ্য মনে করি। বাঙ্গালী 'মুকুলে' সহানুভূতি বর্ষণ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

নির্ম্মাল্য। প্রথম বর্ষ; একাদশ সংখ্যা। শ্রীযুত বসন্তকুমার বসু সম্পাদিত। 'বিবর্ত্তবাদ', 'অশোকের তীর্থভ্রমণ' ও 'মুকুল ও পারিকা' প্রভৃতি ক্রমশঃপ্রকাশ্য। মাত্রা—দুই এক পৃষ্ঠা। পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। ক্ষুদ্র পত্রে এত 'ক্রমশঃপ্রকাশ্য' কেন? শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'নিরুপাধি ব্রহ্ম' উৎকৃষ্ট দার্শনিক সন্দর্ভ। কবিবর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত 'বিক্রমাদিত্য' নামক হাসির গানটি ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'নির্ম্মাল্য' আবার তাহা মুদ্রিত করিলেন কেন, বলিতে পারি না। 'বাবু' প্রভৃতি প্রবন্ধে কোনও বিশেষত্ব নাই। 'উপহার' ও 'সালিম বাগ' প্রভৃতি ছন্দে রচিত বটে, কিন্তু কবিতা নহে। অপাঠ্য। 'উপহারে' 'বিনীত—শ্রী' উত্তর-বঙ্গের কোনও মহারাজের স্তব গান করিয়াছেন। আশা করি, রচনার ন্যায় এই স্তব-পাঠের উদ্দেশ্যও বিফল হইবে না।

কালিদাস ও ভবভূতি।

সীতা।

রাম ও দুষ্মন্তে যেরূপ প্রভেদ, সীতা ও শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ প্রভেদ।

উত্তরচরিতে তিনবার সীতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে সীতার সমগ্র প্রকৃতি আমরা একত্র দেখিতে পাই; তিনি কোমলা, পবিত্রা, ঈষৎ পরিহাসরসিকা, ভয়বিহ্বলা, রামময়জীবিতা। যখন অষ্টাবক্র মুনি আসিলেন, সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অবি তে অপি কুসলং মে সকলগুরুজনস্স আর্য্যায়াঃ চ শান্তায়াঃ।"

অতি সসম্মান মিষ্টসম্ভাষণ। পরে কথায় কথায় যখন রাম অষ্টাবক্র মুনিকে কহিলেন যে, প্রজারঞ্জনার্থ যদি তাঁহার সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার দুঃখ নাই, তখন সীতা এই নিদারুণ প্রস্তাবে ব্যথিত হইলেন না, বরং যেন পরম গৌরব অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন,—

অতএব র.ঘবধুরন্ধরঃ আর্য্যপুত্রঃ।

একেবারে আত্মচিন্তাশূন্য; যেন তাঁহার অস্তিত্ব রামে লীন হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাবক্র মুনি চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ একখানি আলেখ্য লইয়া আসিলেন,—সেই আলেখ্যে রামের অতীত জীবনকাহিনী অঙ্কিত আছে। তিন জন সেই আলেখ্যদর্শনে ব্যাপৃত হইলেন। আলেখ্যে সীতার দৃষ্টি প্রথমেই রামের মূর্ত্তির উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, 'জৃম্ভকাস্ত্রা উপস্তবন্তি ইব আর্য্যপুত্রম্।' পরে মিথিলাবৃত্তান্ত দেখিতেও সীতার দৃষ্টি রামে নিবদ্ধ,—

"অম্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণশোভমানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরখণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুগ্ধমুখমণ্ডলঃ আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।"

সকলে জনস্থান-বৃত্তান্ত দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, লক্ষ্মণ সীতাকে তদ্বিরহে রোরুদ্যমান রামের মূর্ত্তি দেখাইলে সীতার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি ভাবিলেন,

"অয়ি দেব রঘুকুলানন্দ এবং মম কারণাৎ ক্লিষ্টঃ অসি।"

সীতার দুঃখ শুদ্ধ রাম কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া নহে,—সেরূপ দুঃখ সাধ্বী-মাত্রেরই হয়। কিন্তু তাঁহার পরম দুঃখ যে, তাঁহারই বিরহে রাম কষ্ট পাইতেছেন।—এখানেই দেখি যে, আর কেহ নহে, এ সীতা।

সীতার এই ভাব সর্ব্বত্রই দেখি। তৃতীয় অঙ্কে যখন জনস্থানে রাম সীতাময়ী পূর্ব্বস্মৃতিতে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সীতা কহিলেন,—

"হা ধিক্ হা ধিক্ মাং মন্দভাগিনীং ব্যাহৃত্য অমীলন্নেত্রনীলোৎপলঃ মূর্চ্ছিতঃ এব আর্য্যপুত্রঃ হা কথং ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহনিঃসহং বিপর্য্যস্তঃ। ভগবতি তমসে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব জীবয় আর্য্যপুত্রম্॥"

পরে রাম উপবেশন করিয়া যখন কহিলেন, "ন খলু বৎসলয়া সীতাদেব্যা অভ্যুপপন্নোঽস্মি।" সীতা কহিতেছেন, "হা ধিক্ হা ধিক্ কিমিতি মাম্ আর্য্য-পুত্রঃ মার্গিষ্যতি।" বাসন্তী যখন রামকে জনস্থান দেখাইতেছেন, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন, তখন সীতা বাসন্তীকে ভৎর্সনা করিলেন,—"সখি বাসন্তি কিং ত্বয়া কৃতম্ আর্য্যপুত্রস্য মম চ এতৎ দর্শয়ন্ত্যা।" আবার "সখি বাসন্তি কিং ত্বম্ এবংবাদিনী প্রিয়ার্হঃ খলু সর্ব্বস্য আর্য্যপুত্রঃ বিশেষতঃ মম প্রিয়সখ্যাঃ।" "সখি বাসন্তি বিরম বিরম।" "ত্বম্ এব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যা এবম্ আর্য্যপুত্রং প্রদীপ্তং প্রদীপয়সি।" "এবম্ অস্মি মন্দভাগিনী পুনঃ অপি আয়াসকারিণী আর্য্যপুত্রস্য।" "হা আর্য্যপুত্র মাং মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য সকলজীবলোকমঙ্গলাধারস্য তে বারং বারং সংশয়িতজীবিতদারুণঃ দশাপরিণামঃ হা হতাস্মি।"—সর্ব্বত্রই ঐ এক ভাব—রাম আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। "আর্য্যপুত্র আমায় এত দিনে ভুলিয়া যান নাই কেন? তাও যে ভালো ছিল। সকলমঙ্গলমূলাধার রামের তুচ্ছ-আমার জন্য বারবার প্রাণসংশয় হইতেছে।"—এ প্রেম কি জগতে আছে! স্বামীর কল্যাণে সর্ব্বভূতের কল্যাণে আত্মবলিদান —এ প্রেম কি জগতে আছে! থাকে যদি, ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম চিনিয়াছ। না থাকে যদি, ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম কল্পনা করিয়াছ। যে প্রেমে—অপমানে অভিমান নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, অবস্থায় বিপর্য্যয় নাই;—যে প্রেম আপনাতে আপনি পরিপ্লুত, যে প্রেমের জয় উনবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি Browning গায়িয়াছেন—

You have lost me, I have found thee.

—এই প্রেম সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতেই এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গাহিয়াছিলেন। এই গূঢ় তত্ত্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার বলি, ধন্য ভবভূতি!

একবার যেন সীতার ঈষৎ অভিমান হইয়াছিল। রাম যখন সেই সীতাশূন্য নির্জ্জন জনস্থানে বাষ্পগদ্‌গদ উচ্ছ্বসিত স্বরে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন, "প্রিয়ে জানকি!" সীতা "সমন্যুগদ্‌গদ" কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র অসদৃশং খলু এতৎ বচনম্ অস্য বৃত্তান্তস্য।" নিরপরাধা আমায় বনবাস দিয়া তাহার পর এ সম্বোধন শোভা পায় কি? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রতি নিদারুণ অবিচার তাঁহার মনে আসিল, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া রসাতলে বাস যেন কাঁদিয়া উঠিল, প্রজাদিগের অপবাদের প্রতি অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু এ মেঘ মুহূর্ত্তের। তাহার পরেই সীতা আবার সেই সীতা।

"অথবা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরে সম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মাম্ এব মন্দভাগিনীম্ উদ্দিশ্য বৎসলস্য এবংবাদিনঃ আর্য্যপুত্রস্য উপরি নিরনুক্রোশা ভবিষ্যামি। অহম্ এতস্য হৃদয়ং জানামি মম এব ইতি।" আর একবার সীতা অশ্বমেধ যজ্ঞে রামের সহধর্ম্মিণী কে, তাহা জানিবার জন্য "সোৎকম্প" উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই শুনিলেন যে, সে সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি, অমনই সীতা কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ইদানীম্ অসি ত্বম্ অম্মহে উৎখাতং মে ইদানীং পরিত্যাগলজ্জাশল্যম্ আর্য্যপুত্রেণ।" "ধন্যা সা যা আর্য্যপুত্রেণ বহু মন্যতে যা চ আর্য্যপুত্রং বিনোদয়ন্তী আশা-নিবন্ধনং জাতা দেবলোকস্য।"

উপরি-উক্ত দুই স্থানে সীতার যাহা কিছু মানবীত্ব দেখি। অন্য সর্ব্বত্র তিনি দেবী। রাম গমনোন্মুখ হইলে সীতা কহিতেছেন, "ভগবতি তমসে কথং গচ্ছতি এব আর্য্যপুত্রঃ।" তমসা সীতাকে লইয়া "কুশলবয়ো বর্ষগ্রন্থি-মঙ্গল" ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলে সীতা কহিলেন, "ভগবতি প্রসীদ ক্ষণমাত্রম্ অপি দুর্লভং জনং প্রেক্ষে!" রাম চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সীতা তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছেন,—"নমঃ নমঃ অপূর্ব্বপুণ্যজনিতদর্শনাভ্যাম্ আর্য্যপুত্রচরণকমলাভ্যাম্।" এই সুরে সীতার হৃদয়ের মহাসঙ্গীত বিলীন হইয়া গেল।

আর একবার সীতাদেবীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়—সপ্তম অঙ্কে। অভিনয়-দর্শনে মূর্চ্ছিত রামকে সীতা কোমলকরস্পর্শে সঞ্জীবিত করিলেন। সেখানেও সীতা বলিতেছেন, "জানাতি আর্য্যপুত্রঃ সীতাদুঃখং প্রমাষ্টুম্।"

সীতার এই ভাবই এ নাটকে ফুটিয়াছে। নারীজনসুলভ অন্যান্য গুণের সঙ্কেতমাত্র কদাচিৎ আছে। লক্ষ্মণ যখন আলেখ্য দেখাইতেছেন, "এই আর্য্যা সীতা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি," তখন সীতা উর্ম্মিলাকে দেখাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ইয়মপি অপরা কা?" এইখানে সীতার পরিহাসপ্রিয়তার ঈষৎ আভাস দেখি। তিনি ভয়বিহ্বলা, পরশুরামের চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছেন। চিত্রিতা স্পর্নখাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন, "হা আর্য্যপুত্র এতাবৎ তে দর্শনম্।" এই নাটকে তাঁহার গুরুজনে ভক্তি, পালিত পশুপক্ষীতে স্নেহ, পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদিরও সঙ্কেত পাই। কিন্তু সে নামমাত্র। সীতা-চরিত্রের অন্য কোনও গুণ এই নাটকে ফুটে নাই।

বস্তুতঃ ভবভূতির নাটকে সীতার চরিত্রই ভালো ফুটে নাই। যাহা কিছু ফুটিয়াছে, তাহা কোমলত্ব ও অপার্থিব সতীত্ব। তাঁহার রাম যেমন স্ত্রৈণ বাঙ্গালী, তাঁহার সীতা সেইরূপ সাধ্বী বঙ্গবধূ। রামের প্রেমের বিশেষত্ব সীতার হিরণ্ময়ীপ্রতিকৃতিনির্ম্মাণ। আর সীতার প্রেমের- বিশেষত্ব রামের ও জগতের হিতে আত্মবলিদান। এই দুই চরিত্রের মধ্যে রামচরিত্র একেবারে ফুটে নাই; সীতার চরিত্র তবু কতক ফুটিয়াছে। তথাপি আমরা চক্ষুর সম্মুখে সীতাকে দেখিতে পাই না, যেমন শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে না পাইলেও সীতাকে অন্তরে অনুভব করি, যেমন শকুন্তলাকে পারি না। ভবভূতির সীতা নাটকের নায়িকা নহেন; কবিতার কল্পনা।

বাল্মীকির সীতাও নাটকের নায়িকা নয়। তথাপি ভবভূতির সীতার অপেক্ষা সে সীতা স্পষ্ট, পরিস্ফুট। সর্ব্বত্র তাঁহার একটা গতি দেখিতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে বনবাসিনী হইয়াছিলেন, লঙ্কেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; পরিশেষে রামের তাচ্ছীল্যও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ্য করিবার ভঙ্গিমাও অন্যরূপ। সীতা নির্ব্বাসনে রামকে যে কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অভিমানিনী সাধ্বীর উক্তি।

জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশো ভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥
ময়া চ পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতিঃ ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথা তথা পৌরেষু নিত্যদা।
পরমো হ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ॥

তাহার মধ্যে একটা তেজ আছে, সতীত্বের গর্ব্ব আছে, রাজ্ঞীত্ব আছে। লঙ্কাজয়ের পরে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা যে উত্তর দেন, তাহার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণখানি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥
পৃথক্ স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা॥
যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি॥
মদধীনন্তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যামনীশ্বরী॥
সহসং বৃদ্ধভাবেন সংসর্গেন চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্॥
প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ।
লঙ্কাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জ্জিতা॥
প্রত্যক্ষং বা নবগুস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয়া সন্ত্যজ্জয়া বীর ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া॥
ন বৃথা তে শ্রমোঽয়ং স্যাৎ সংশয়েৎ যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরি ক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব॥
ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা।
লঘুনেব মনুষ্যেন স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্॥
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্॥
ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্॥
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥

এ কথা যে ত্রি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোনও নারীর মুখে শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে, সেই আর্যযুগে আমাদেরই দেশে এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের, এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি, ঐশী আধ্যাত্মিকতা এরূপ ভাবে আর কেহ কোনও কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। এখানে সীতার প্রভাবে রামকে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়।

আবার পরিশেষে নির্ব্বাসনান্তে প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য লজ্জাকর প্রস্তাবে সীতা যে নিদারুণ অভিমানে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

তিনটিমাত্র শ্লোক। কিন্তু ইহার মধ্যে অর্থের সমুদ্র। পড়িতে পড়িতে সীতার সঙ্গে সহানুভূতিতে চোখে জল আসে, হৃদয় অভিভূত হয়।

ইহার সহিত ভবভূতির তরল কোমল সীতার তুলনা সম্ভবে না। ইহার সহিত তুলনা করিতে গেলে অষ্টম হেনরীতে প্রত্যাখ্যাতা ক্যাথারিনের উক্তির তুলনা করিতে হয়।

Sir, I desire you do me right and justice
* * * Sir call to mind,
Upward of twenty years I have been blest
With many children by you ; if in the course
And process of this time you can report
And prove it too against mine honour ought
My bond to wedlock or my love and duty
Against your sacred person, in God's name
Turn me away—
My lord my lord I am a simple woman, much too weak
To oppose your cunning, you're meak and humble-mouthed.
You sign your place and calling in full seeming.
With meekness and humility ; but your heart
Is crammed with arrogance. spleen and pride.

Wolseyকে রাজ্ঞী কহিতেছেন,—

Sir
I am about to weep ; but thinking that
We are a queen (or long have dreamed so) certain
The daughter of a king, my drops of tears
I'll change to sparks of fire.

সত্য, ভবভূতি লঙ্কাজয়ের পর সীতার তেজ দেখাইবার মহা সুযোগ পান নাই। কিন্তু নির্ব্বাসনে ও নির্ব্বাসনান্তে সীতার অভিমান দেখাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনদণ্ড সীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবভূতি একেবারে তাহা দেখান নাই। আর অন্তিমে ত তিনি নিঃশব্দে রামসীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন।

কালিদাস কিন্তু একটি সুযোগও ছাড়েন নাই। প্রত্যাখ্যানে কাকুতি অনুনয় নিষ্ফল হইলে শকুন্তলা জ্বালাময় ব্যঙ্গে সে প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিয়াছিলেন। মিলনের সময়েও পুত্র যখন জিজ্ঞাসা করিল "মা এ কে ?" তখন তাঁহার উত্তর,—"ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।" সমস্ত শকুন্তলা নাটকখানির তত্ত্ব ঐখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মর্ত্ত ও স্বর্গ ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে।

সত্য, কালিদাসের শকুন্তলায় ক্যাথারিণের শান্ত স্থৈর্য্য নাই, তাঁহার রাজ্ঞীত্ব নাই। শকুন্তলার আচরণে—প্রথমে আশঙ্কা, পরে অনুনয়, পরিশেষে অভিমান ও ক্রোধ। ক্যাথারিণের আচরণে যুক্তি, গর্ব্ব, স্থির গাম্ভীর্য্য একত্র মিশিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভেদে এ প্রভেদ ঘটিয়াছে। শকুন্তলা নবোঢ়া কিশোরী, রাজ্ঞী হইয়া এখনও বসেন নাই! তাঁহার রাজ্ঞীত্ব আসিবে কি রূপে! তাই তাঁহার উক্তি সরল, সর্ব্বদা একভাবব্যঞ্জক; হয় ভয়, নয় ক্রোধ, কিংবা অনুনয়। ক্যাথারিণ প্রৌঢ়া সংসারাভিজ্ঞা রাজ্ঞী। তাঁহার এ সকল ভাব পরিচিত, আয়ত্ত। তাঁহার হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতিগুলি মিশিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছে। তাই ক্যাথারিণের উক্তি মিশ্র। দুঃখ, ক্রোধ, অনুনয়, আত্মমর্য্যাদা এক সঙ্গে মিশিয়াছে, এবং প্রত্যেক পংক্তিতে সেগুলি একত্র নিহিত রহিয়াছে। কালিদাসের কোনও ত্রুটী নাই। কিন্তু ভবভূতি মহাসুযোগ পাইয়াও সীতার রাজ্ঞীত্ব ফুটাইতে পারেন নাই। কালিদাসের শকুন্তলার সহিত ভবভূতির সীতার তুলনা সম্ভবে না। শকুন্তলা একটা চরিত্র, সীতা একটা ধারণা। শকুন্তলা সজীব নারী, সীতা পাষাণপ্রতিমা। শকুন্তলা উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ হ্রদ। কালিদাসের শকুন্তলা হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, পড়িয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন, উঠিয়াছেন; সীতা কেবল ভালবাসিয়াছেন। নির্ব্বাসনশল্যও তাঁহার সে ভালবাসাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই; নিষ্ঠুরতা সে ভালবাসাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু সে ভালবাসা কোনও কার্য্য করে নাই। সে ভালবাসা জ্যোৎস্নার মত গতিহীন, সূর্য্যমুখীর মত মুখাপেক্ষী, বিরহের মত করুণ, হাসির মত সুন্দর। ভবভূতি বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন—চরম। কিন্তু বিষয় এত উচ্চ যে, তাঁহার কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। তিনি একটা অপূর্ব্বসুন্দর স্বর্গীয় মূর্ত্তি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, যদি এই দেবীকে তিনি জীবনদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জগৎ এমন একটা ব্যাপার দেখিত, যেরূপ ব্যাপার কুত্রাপি কদাপি ঘটে নাই; যে মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মত্ত হইয়া 'মা মা' বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইত, এবং তাঁহার চরণধূলির একটি রেণু পাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। কুমারসম্ভবের গৌরী এইরূপ ধরণের একটা ব্যাপার, কিন্তু এই সীতা তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উঠিত। ভবভূতির সীতা

যেন কোনও হেমন্তের উজ্জ্বল প্রভাতের শেফালিস্মৃতি স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল।

অন্যান্য চরিত্র।

অন্যান্য চরিত্র নাটক দুইখানিতে নাই বলিলেও হয়। শকুন্তলা নাটকে রাজার বিদূষক, কঞ্চুকী, প্রতীহারী, মাতলি ইত্যাদি আছে। আর শকুন্তলার পক্ষে তাঁহার পিতা কণ্ব, সহচরী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া, অভিভাবিকা গৌতমী, আর কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব আছেন। এক দিকে সংসার, আর এক দিকে আশ্রম। কিন্তু তাঁহারা এক রকম নাটকের দর্শকমাত্র। কোনও বিশেষ ভাবে ঘটনার সংযোগ বিয়োগ করেন নাই। তাঁহারা না থাকিলেও এ নাটক একরূপ চলিয়া যাইত।

শকুন্তলায় কণ্বমুনি কেবল চতুর্থাঙ্কে দেখা দিয়াছেন। কি অপত্যবৎসল, কি প্রশান্ত, কি প্রিয়ভাষী! তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় মাতৃহারা বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন, আবার পিতার ন্যায় আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। শকুন্তলা যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ নাই, অভিমান নাই। তিনি যেন কেবল স্নেহে ও আশীর্ব্বাদে পূর্ণ।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহচরী; পরিহাসরসিকা, স্নেহময়ী, আত্মচিন্তাশূন্যা। তাঁহারা এ নাটকে ঘটকীর কার্য্য করিতেছেন মাত্র।

কণ্বের ঋষিভগ্নী গৌতমী তেজস্বিনী ঋষিকন্যা। তিনি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার আচরণে ক্ষুব্ধা। শার্ঙ্গরব তেজস্বী ঋষিশিষ্য। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রতি তাঁহাদের তিরস্কার ক্ষুরধার, তীব্র।

বিদূষকের রসিকতায় বেশ একটু রস আছে। তাঁহার "অনুকূল গলহস্ত" চমৎকার। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যে, তিনি শুদ্ধ বিদূষক নহেন, রাজার প্রকৃত বন্ধু।

উত্তরচরিতে লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু, শম্বূক, বাল্মীকি, জনক, বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা, মুরলা আছেন। এ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি চরিত্রও ফুটে নাই। কেবল লবের চরিত্রে অদ্ভুত শৌর্য্য দেখি।

লবের "কথমনুকম্পতে মাম্",—এই এক কথায় আমরা লবের ক্ষত্রিয় অভিমান ও তেজ দেখি।

চন্দ্রকেতু উদার বীর। দুই অঙ্কের মধ্যেই আমরা তাঁহার সৌম্য সহাস্য

আনন দেখিতে পাই। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা। জনক কন্যাবৎসল পিতা। বাল্মীকি পরশোককাতর মহর্ষি। আর শম্বুক বনানীর দর্শয়িতা। বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা ও মুরলা সীতার দুঃখে দুঃখিনী। তাহার মধ্যে বাসন্তী একটু তেজস্বিনী। সীতার ব্যথা যেন তাঁহার নিজের ব্যথা। কিন্তু তাঁহাতে সীতার অভিমান নাই। সেটুকু যেন সীতা বাসন্তীকে দিয়াছেন। কৌশল্যা ও অরুন্ধতীর কোনও বিশেষত্ব নাই।

লক্ষ্মণ প্রথম অঙ্কে চিত্র দেখাইয়া ও শেষ অঙ্কে সীতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রকেতু লবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং লবের সহিত রামের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। লব যুদ্ধ করিলেন, এবং কুশ রামায়ণ গীত গায়িলেন। শম্বুক রামকে জনস্থান দেখাইয়া বেড়াইলেন। জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা সীতার দুঃখে কাঁদিলেন। বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিতে জর্জ্জরিত করিলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে গুটিকতক সংবাদ দিলেন। দুর্ম্মুখ রামকে সীতার অপবাদবৃত্তান্ত জানাইলেন। তমসা ও মুরলা সীতাদেবীর জনস্থানে আগমনবার্ত্তা দিলেন, এবং তমসা সীতার সহচরী রহিলেন। এ নাটকে ইঁহাদের কার্য্য এইখানেই সমাপ্ত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

হিমারণ্য।

দশম অধ্যায়।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।]

এখন আর আমার অরভোগের সময় নয়। সুতরাং পর দিবস প্রাতঃকালেই অল্প গায়ে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আজ আমাকে মাজিমুণ্ডিতে যাইতে হইবে। এই স্থান হইতে মাজিমুণ্ডি ৮।১০ মাইলের কম নহে। অতি প্রত্যূষে বাহির হইয়া বেলা ২টার পর মাজিমুণ্ডিতে উপস্থিত হইলাম। এই মুণ্ডি গঙ্গোত্রী ও তন্নিকটস্থ গ্রামবাসীদের বাণিজ্যস্থান। তিব্বতের অন্যান্য স্থান হইতে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে। মণ্ডিতে প্রায় এক শত তাম্বু পড়িয়াছে। এখানে তিব্বতীয় ব্যবসায়ীদের সংখ্যা অতি কম। গাড়ওয়ালের ব্যবসায়ীই অধিক। ইহারা চা'ল ও যবের পরিবর্ত্তে লবণ লইয়া থাকে। অল্প পরিমাণে উলও লয়। মেষ ও ছাগল

এই মণ্ডিতে খুব বিক্রয় হয়। অদ্য প্রায় ১০।১২ হাজার মেষ ও ছাগল আসিয়াছে, এবং যথেষ্টপরিমাণ লবণও আসিয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মধ্যে যার যা প্রয়োজন, ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। প্রায় কাহারও অবকাশ নাই। মাজিমুণ্ডির উভয় পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত; মধ্যে কিঞ্চিৎ সমভূমি। সেই সমভূমির মধ্য দিয়া মাজি নদী প্রবাহিত। নদীতীরেই বাজার। এখানে যথেষ্ট কাঠ আছে, জলেরও অভাব নাই। মণ্ডিটি ছোটখাট হইলেও বেশ জমকাল। গভীর অরণ্যের মধ্যে আজ খুব জনতা হইয়াছে।

অনেক দিন পরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও ক্ষেত্রীর দর্শন পাইয়া মন বড়ই প্রফুল্ল হইয়াছে। এতদিন ভুটিয়াদের অনুরূপ আহার করিয়াছি, ভুটিয়াদের ঘরে বাস করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছি, তাহাদের দুর্গন্ধপূর্ণ আড্ডায় আমাদের আশ্রয়স্থান ছিল। আজ মাজিতে হিন্দুর মুখ দেখিলাম। নানাপ্রকার স্তবস্তুতি শুনিতে পাইলাম। হিন্দুর আচারব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। এখানে আমার কোনও অভাব রহিল না। হিন্দুর সন্ন্যাসীকে হিন্দু সাদরে গ্রহণ করিয়া একটি তাম্বু খালি করিয়া দিল। তাহারা নিজেরাই আমার দ্রব্যসামগ্রী তাম্বুর মধ্যে আনিল, আসন করিয়া দিল, এবং এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া দিল। আজ আমার ভৃত্যেরা আমার সেবায় আসিল না। মণ্ডিবাসী ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীরা আমার সেবায় প্রবৃত্ত হইল। আহারাদি তাহারাই প্রস্তুত করিল। তাহাদিগের যত্নে এখানে আর কোনও রকম অভাব রহিল না।

ইহারাও বরফের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ কল্য যাইবে। পরশ্ব দিন এখানে আর কেহ রহিবে না। মণ্ডি উঠিয়া যাইবে। শূন্য বন শূন্য হইয়া পড়িবে। তাম্বুর স্থান বরফ অধিকার করিবে। বন একেবারে প্রাণিশূন্য হইয়া যাইবে। এই মণ্ডির ব্যবসায়ীদের অনুরোধে আমাকে এক দিবস এখানে অপেক্ষা করিতে হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে মাজি পরিত্যাগ করিলাম।

অদ্য জলুখোগা পাস অতিক্রম করিয়া সুন্দুমে যাইতে হইবে। রাস্তা বড়ই কঠিন। বেলা ২টার পূর্ব্বে পাস অতিক্রম না করিলে বরফপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং অদ্য সকলেই দ্রুতগতিতে পথ চলিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, জঙ্গল হইতে জঙ্গলান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিলাম। এইরূপ চলিতে চলিতে বেলা অনুমান

১০টার সময় একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এই নদী পার হওয়া বড়ই কঠিন। তার পর আমার চামরওয়ালা লোকটির সঙ্গে কতকগুলি চামর ও মহিষ ছিল। আমারও জিনিসপত্র ছিল। ইহা লইয়া কেমন করিয়া নদী পার হইব; এই ভাবনা। এই নদীর পরপারে লম্বা লম্বা দুইখানি কাষ্ঠ আছে; সেই কাষ্ঠ দ্বারা পুল প্রস্তুত হইলে, যাত্রীরা নদী পার হইতে পারে।" আমার ভৃত্যদ্বয় অতিকষ্টে নদী পার হইয়া সেই কাষ্ঠ দ্বারা পুল প্রস্তুত করিল। পুল প্রস্তুত হইলে আমরা পার হইলাম। পরে মেষ ও ছাগ পার হইল। আমার চামর দুইটি সন্তরণ করিয়া নদী পার হইল। এই নদীর স্রোত এত প্রখর যে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুই চারি জন মনুষ্য ও বহুসংখ্যক ছাগ ও মেষ ভাসাইয়া লইয়া যায়।

আমরা নদী পার হইলাম। মনে করিলাম, নদী পার হইয়াই কিছুকাল বিশ্রাম করিব। কিন্তু তাহা হইল না। সঙ্গীরা বলিল, "এখন বিশ্রাম করিলে যথাসময়ে জলুখোগা অতিক্রম করিতে পারিব না। সুতরাং বাধ্য হইয়া পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করিলাম। আর চলিতে পারি না। শীতল হাওয়াতে শরীর অসাড় হইয়া গিয়াছে। উর্দ্ধে উঠিতেছি। পথ আর ফুরায় না। বাহন একান্ত ক্লান্ত হইয়াছে। বাহনের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে আর চলে না। আমিও বাহন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছি না। কারণ, রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ; নামিবার স্থান নাই।

বাহন ধীরে ধীরে চলিয়া বেলা ২টার পর জলুখোগার শিখরদেশে আরোহণ করিল। এখানে কিছু সমতল ভূমি আছে। আমরা সকলেই সেই স্থানে বিশ্রাম করিলাম। এখন বড়ই বাতাস উঠিয়াছে। বিশ্রাম প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। কিন্তু শরীর মন এত অভিভূত হইয়াছে যে, কিছুই ভাল লাগিল না। অতি সত্বর উঠিলাম। আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিয়াই চামর পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, এখন উৎরাই। এই বিকট উৎরাইয়ে বাহনারোহণ চলে না; সুতরাং অতি দ্রুতপদে নিম্নে নামিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সুন্দুম নদীতীরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থান বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। অপেক্ষাকৃত গরম। এই নদীতীরেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল; ক্রমে ক্রমে তাহারা আসিয়া জুটিল। জলুখোগা পাস নিরাপদে অতিক্রম করিলাম। এখান হইতে সুন্দুম তিন মাইল। সুন্দুমে আমার চামরওয়ালার স্ত্রীপুত্রাদি বাস করে। সেখানে

যাইয়া আমাকেও অদ্যকার রাত্রি যাপন করিতে হইবে। সুতরাং আর এখানে অধিক বিশ্রাম না করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম, এবং অনুমান রাত্রি ৮টার সময় সুন্দুমে পঁহুছিলাম। আমার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আমার চামরওয়ালা সুন্দুমে পঁহুছিয়াছিল। সে তথায় যাইয়া একটি গুহা পরিষ্কার করিয়া ও অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। সুন্দুমে আর বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না। অদ্যকার রাত্রি সুন্দুমেই যাপন করিলাম। এখানে নদীতীরে একটি সুন্দর গুহা পাইয়াছিলাম। শরীরও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। আশা ছিল, এখানে দুই চারি দিন থাকিয়া কিছু বিশ্রাম করিয়া লইব। কিন্তু তাহা হইল না। প্রাতঃকালেই উঠিয়া দেখি, মাজিমুণ্ডি ভাঙ্গিয়া নীলং পাসের সমস্ত লোক সুন্দুমে ছাউনি করিয়াছে। কাহারও বিশ্রামের ইচ্ছা নাই। যেমন হাট ভাঙ্গিলে ক্রেতা ও বিক্রেতারা হাটকে শূন্য করিয়া রাত্রিভয়ে আপন আপন বাণিজ্যবস্তু লইয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ মাজি-মণ্ডিকে শূন্য করিয়া ব্যবসায়ীরা বরফের ভয়ে আপন আপন গ্রামের দিকে ছুটিতেছে।

অদ্য প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই আমার চামরওয়ালা বলিল, "অদ্য রাত্রে আমার স্ত্রী ছেলে পিলে ও পশুপাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে। অদ্য আমাদেরও এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি মাইল যাইতে হইবে। এই স্থানের সমস্ত লোকই সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিবে। আমার স্ত্রীও সেইখানে গিয়াছে। এখানে আহারাদি করিবারও অবকাশ নাই। মেঘ করিয়াছে। এখনই বরফপাত হইবে। আপনার জন্য চামর প্রস্তুত, শীঘ্র উঠুন।" আমি ভাবী বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া চামরে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গীরা আমার অনুবর্ত্তী হইল।

অনুমান বেলা ১১টার সময় আমরা আড্ডাতে পঁহুছিলাম। সুন্দুমের সমস্ত লোকই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। সহস্র সহস্র চামর, মেষ ও ছাগলে আড্ডাটি পরিপূর্ণ। আড্ডাটির দুই দিকেই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। মধ্যে নদী প্রবাহিত। নদীর উভয় পার্শ্বে যথেষ্ট সমতল ভূমি। এই আড্ডায় কাষ্ঠ ও ঘাসের অভাব নাই। জলও অতি নিকটে। আমার চামরওয়ালার স্ত্রী আমাদের পূর্ব্বে আসিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা আড্ডায় পঁহুছিবামাত্র আমার চামরওয়ালার স্ত্রী আগুন জ্বালিয়া দিল। আমি আগুনের উত্তাপে বসিয়া শীতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলাম।

এখন কিছু কিছু বরফপাত হইতেছে। বরফ-নিবারণের আশ্রয়স্থান নাই, এবং অপরাপর আড্ডার ন্যায় এখানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নাই যে, ঘের প্রস্তুত করিয়া একটু আবরণ করিয়া লই। সুতরাং কম্বল মুড়ি দিয়া বরফপাত হইতে রক্ষা পাইতেছি। ইতিমধ্যে বিষ্ণু সিং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুনের বস্তা সারি সারি করিয়া একটি ঘের প্রস্তুত করিল, এবং তাহার উপর তিন চারিখানি কম্বল দিয়া আবরণ করিয়া দিল। আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরফপাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

বেলা ৩টা পর্য্যন্ত অনবরত বরফপাত হইয়াছিল। বরফপাতে পর্ব্বত শুভ্রবর্ণ; নদীর জল জমিয়াও শুভ্র হইয়াছে; চামর ও ভেড়ার গায়ে বরফ পড়িয়া তাহারাও শুভ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; বরফপাতে সকলই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কেবল আমরা মানুষ, আমাদের রঙ্গের পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখানে বরফপাতে শুভ্রবর্ণ পশু বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কোনও কষ্ট নাই; বরং উৎসাসের সহিত এ দিক ও দিক্‌ বিচরণ করিতেছে। এই সব দেখিয়া মনে আনন্দ হইল বটে, কিছু ক্ষুধা পিপাসায় বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলাম না। অপরাহ্নে কিছু আহারীয় বস্তু প্রস্তুত হইল। তাহা ভাগ করিয়া সকলে আহার করিলাম।

আবার সন্ধ্যার পর বরফপাত আরম্ভ হইল। সকলেই কম্বল মুড়ি দিয়া বরফপাত সহ্য করিতে লাগিলাম। জীবনের আশা কাহারও নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কলরব নিস্তব্ধ হইল। আমরা সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে বরফে চাপা পড়িলাম। রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সকলেই উঠিল, এবং আপন আপন বাণিজ্য-দ্রব্য চামর, ঘোড়া, মেষ ও ছাগের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিল।

আজ আর কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতেছে না; কেহ কাহারও সাহায্য করিতেছে না। সকলেই আপন প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। আমি উঠিয়া দেখি, আমার চামরওয়ালীর স্ত্রী দুইটি ছোট ছেলেকে কম্বল দ্বারা আবরণ করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। তাহার দ্রব্য সামগ্রী সব পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ অনেকেরই দ্রব্য-সামগ্রী ও বাণিজ্য-দ্রব্য এখানে পড়িয়া রহিল। কেহ আর নিজের জিনিসের দিকে তাকাইলও না। আমরা

সকলের পশ্চাৎ পড়িলাম। বিষ্ণু সিং চতুর লোক। সে একটি চামর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আমাকে চড়াইয়া দিল। আর একটি চামরের পৃষ্ঠে আমাদের দ্রব্য সামগ্রী বোঝাই করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। আমার চামরওয়ালা তাহার দুইটি ঘোটকে বিষ্ণু সিংএর সাহায্যে গৃহসামগ্রীও বস্ত্রাদি বোঝাই করিয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

এখন বরফ পড়িতেছে। জীবনের আশঙ্কা যায় নাই, কিন্তু খুব চলিতেছি। বেলা ১২টার সময় বরফ পড়া বন্ধ হইল। আর এক ঘণ্টা চলিলেই আমরা একটি আড্ডায় পঁহুছিতে পারি। কিন্তু তাহা হইল না। আমার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। চামরের পৃষ্ঠে বসিতে পারিলাম না। রাস্তার পাশে একটি গুহার সম্মুখে অবতরণ করিলাম। বাধ্য হইয়া আমার চামরওয়ালা তাহার পশু-পাল লইয়া আড্ডায় চলিয়া গেল। এখানেই আমাদের পাঁচটি প্রাণীর আড্ডা হইল। সম্মুখে যথেষ্ট কাষ্ঠ ছিল। সেই কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিয়া শরীর একটু সুস্থ হইল। এখানে এই দিবস রাত্রি যাপন করিলাম। পর দিবস প্রাতে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অপরাহ্ন তিনটার সময় নীলংয়ে উপস্থিত হইলাম।

সাজাহান।

২

মহম্মদ প্রথমে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, পরে বংশানুক্রমিক প্রথা মত তিনিও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি সাজাহানের নিকট সিংহাসন-লাভের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ঐ স্বার্থত্যাগের কারণ পিতৃভক্তি, কি পিতৃরোষের বিভীষিকা, তাহা তিনিই জানিতেন। মতিভ্রান্ত জরাতুর সাজাহান যে তাঁহাকে ঔরংজীবের বিজয়-দৃপ্ত খড়্গ হইতে রক্ষা করিতে নিতান্তই অক্ষম, ইহা বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার নিশ্চয়ই ছিল। তিনি ঔরংজীবের পুত্র। নাট্যকার কিন্তু মহম্মদ-চরিত্রের এই আত্মত্যাগের ও পরে পিতৃপক্ষপরিত্যাগের যে সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মহম্মদ-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, পরন্তু নাটকের সাধারণ সৌন্দর্য্যও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোলেমান বীর ও সুবুদ্ধি ছিলেন। মেনুসী বলেন, সাজাহান দারার অপেক্ষা সোলেমানের বুদ্ধি ও ক্ষমতায় অধিকতর আস্থাবান ছিলেন।

সে চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের অমর্য্যাদা করেন নাই।

সাজাহান নাটক স্ত্রী-চরিত্রে ভাগ্যবান। নাদিরার কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও পতিভক্তি হিন্দুকুললক্ষ্মীর আদর্শস্থানীয়। মহামায়ার কাহিনী, যে কুলের ললনাগণ পতি ও পুত্রকে জন্মভূমি-রক্ষার জন্য মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া সহাস্য-বদনে জহরব্রত পালন করিত, সেই রাজপুত-কুলেরই উপযুক্ত। পিতার প্রতি ভক্তিমতী তেজস্বিনী জহরৎকে প্রতিহিংসা-সাধন-পরায়ণা ও অভিসম্পাত-মুখরা করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের সহিত চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ঔরংজীব তাঁহার এক পুত্রের সহিত জহরৎএর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে জহরৎ একখানি ছুরিকা দিবারাত্র সঙ্গে রাখিয়াছিল, এবং বলিত, পিতৃঘাতীর পুত্রের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে সে-ঐ ছুরিকা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিবে। আর জাহানারা! সেই বিদুষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, অলোকসামান্যরূপবতী বেগম সাহেবা! যাঁহার ইঙ্গিতে সাজাহানের শেষ জীবনের রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, যিনি স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষার জন্য তাঁহার কারাবাসের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, যাঁহার সমাধির উপর পাষাণসৌধ নির্ম্মিত না হইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে উন্মুক্ত নীলাম্বরতলে, শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই ইতিহাসবিশ্রুত চরিত্রের যোগ্য চিত্রই নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন। জাহানারা যেন সাজাহানকে বিপদে বুদ্ধি ও দুঃখে সান্ত্বনা দিবার জন্য, দারা ও নাদিরাকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, ঔরংজীবকে নিয়তির মত কঠিন বিচারে তাঁহার পাপের গভীরতা, মনের নিগূঢ় কথা, আত্মপ্রবঞ্চনা তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বাদশাহের অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই জাহানারা-চরিত্রের শুভ্র সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু নাট্যকলার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন।

পিয়ারার চরিত্র কাল্পনিক। সুজার দ্বিতীয়া পত্নীর অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহেন, এবং সুজার যে পত্নী পারস্যরাজের কন্যা ছিলেন, পিয়ারা যে তিনিই, নাটকে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং পিয়ারাকে নাট্যকারের ইচ্ছানুরূপ চরিত্র দিবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। কবি তাঁহাকে মনের মত করিয়াই গড়িয়াছেন। পিয়ারা পরিহাসরসিকা, পতিপ্রাণা ললনার এক অপূর্ব্ব চিত্র। পিয়ারা রহস্যের ফোয়ারা—বিমলানন্দের স্ফটিকধারা। তিনি পতির বিপদে সহায়,

সমস্তায় মন্ত্রী, বীরত্বে বল। ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি ছায়ার স্তায় স্বামীর অনুসারিণী, এবং রণে মৃত্যুর আহ্বানে তিনি পতির সঙ্গিনী। পিয়ারার পরিহাস-রসিকতা একটা করুণ কাহিনী। তাঁহার "মুখে হাসি, চোখে জল।" স্বামীর আসন্ন বিপচ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় রুধিরাক্ত, কিন্তু তিনি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রহস্যের স্নিগ্ধ ধারায় পতির দুশ্চিন্তাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে, কৌতুকের তরঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ-স্পৃহা ভাসাইয়া দিতে, এবং হাস্যোজ্জ্বল নয়ন-তড়িতের আলোকে স্বামীর তিমিরাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ আলোকিত করিতে চাহেন। বুদ্ধিমতী পিয়ারার রহস্যালোকে সুজার সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিয়ারার পরিহাসরসিকতায় কিন্তু একটা ক্রটীও আছে। পরমাত্মীয়-গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার মত দুঃসময়ে সমদুঃখভাগিনী স্ত্রীর স্বামীর সহিত পরিহাস কালবিরুদ্ধ ও সম্পর্কবিরুদ্ধ। পিয়ারার সুন্দর চরিত্রে যেন একটা হৃদয়হীনতার ছায়া আনিয়া দেয়। নাট্যকার নিজেই এ ক্রটী লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি পিয়ারার স্বগতোক্তিতে, স্বামীর সহিত সহজ কথোপকথনে, এবং "যা আমার জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি রহস্য কচ্ছ"—সুজার এই অনুযোগবাক্যে, পিয়ারার এই অনুচিত ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এ পরিহাস মৌখিক। অন্তরের কথা নহে।

দিলদারের রহস্যে কিন্তু এরূপ দোষস্পর্শ ঘটে নাই। কারণ, দিলদার সম্রাটবংশের অসম্পর্কীয়, এবং তাঁহার ব্যবসায়ই রসিকতা। দিলদার নামে ছদ্মবেশী জ্ঞানী দানেশমন্দ হইলেও, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন; তিনি নাট্যকারের সৃষ্টি। লীয়ারের যেমন 'ফুল' (fool), মোরাদের তেমনই দিলদার। 'ফুল' যেমন লীয়ারকে তাঁহার দুষ্টা-কন্যাদ্বয়ের কপটতার বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, দিলদারও তেমনই মোরাদকে পিতৃদ্রোহিতার মহাপাপ হইতে এবং ঔরংজীবের সাংঘাতিক ছলনা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শুনে কে? লীয়ার মতিচ্ছন্ন; মোরাদ নির্ব্বোধ। মোগল-বাদশাহগণের দরবারে বিদূষকের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সুতরাং দিলদার-চরিত্র ইতিহাসসঙ্গত, এবং সাজাহান নাটকে সে চরিত্রের সার্থকতা দেদীপ্যমান। দিলদারের ব্যঙ্গোক্তি পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্তকলুষিত ঘটনা হইতে মনকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দেয়, এবং মোরাদ-চরিত্রের ক্রটীগুলি স্পষ্টতর করিয়া তাহার নির্ব্বোধ সরলতায় করুণার উদ্রেক করে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু হাস্যরসে সুরসিক, এবং বিমল পরিহাস-রসিকতায় বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। সাজাহান নাটকের পরিহাস-রসিকতা শুধু একটা হাস্যের তরঙ্গ, আমোদের বুদ্বুদ সৃষ্ট করিয়াই মন হইতে উধাও হইয়া যায় না। সে রহস্যালাপের মধ্যে একটা তীব্র শ্লেষ আছে, যাহা মানসপটে বেশ একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়। পিয়ারা যখন সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে ইত্যাদি উপমা দিবার পর বলেন,—"বাঙ্গালীর বল পিঠে", জয়সিংহ যখন "ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারি না"—এ কথা বলিলেন, তখন তদুত্তরে যশোবন্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন মহারাজ, তিনি স্বজাতি বলে'?" এবং পিয়ারা যখন "আমি মুক্তি চাই না, এ আমার মধুর দাসত্ব" এ কথা বলিলে সুজা উত্তর দেন, "ছিঃ পিয়ারা! তুমি বাঙ্গালীরও অধম!" তখন কৌতুকের হাসিটা ওঠেই মিলাইয়া যায়, এবং প্রাণ যেন একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাতে শিহরিয়া উঠে।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই, সাজাহান নাটকের প্রধান অপ্রধান সকল চরিত্রই সুপরিস্ফুট। বিপরীতপ্রকৃতিবিশিষ্ট চরিত্রগুলির চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া নাট্যকার একের সাহায্যে অপরের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার পার্শ্বে দিলীরের ধর্ম্মজ্ঞান, জিহন খাঁর নীচতার পার্শ্বে সাহানাবাজের উদারতা, যশোবন্তের মনের সঙ্কীর্ণতার পার্শ্বে মহামায়ার মনের মহত্ব কৃষ্ণবর্ণ যবনিকার উপর শ্বেতবর্ণের ছবির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত স্ত্রীপুত্রগণের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় দারা যখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই গোরক্ষক দম্পতীর আবির্ভাব ও জলদান, জয়সিংহের নিকট সৈন্যপ্রার্থনায় ভগ্নমনোরথ হইয়া সোলেমান যখন দিলীর খাঁর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন, তখন "উঠুন সাহাজাদা, মহারাজ আজ্ঞা না দেন, আমি দিচ্ছি, আমি দারার নিমক খেয়েছি, মুসলমান জাত নেমকহারামের জাত নহে।"—দিলীর খাঁর এই সতেজ ও অপ্রত্যাশিত উক্তি, মহম্মদের সাজাহান-প্রদত্ত রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থান, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা ও যশোবন্ত রাজ্যে ফিরিলে মহামায়ার দুর্গদ্বার রুদ্ধ করণ, পিয়ারার রণক্ষেত্রে মরণের সঙ্কল্প, শেষ দৃশ্যে সাজাহানের পদতলে রাজমুকুট স্থাপন করিয়া ঔরংজীবের ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক

ও কাল্পনিক ঘটনাগুলি নাট্যকার নিপুণভাবে নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সিপারের নিকট দারার শেষবিদায় গ্রহণের চিত্র বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। আর যে দৃশ্যে ঔরংজীব স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলকেই বক্তৃতার ও অভিনয়ের মোহে মুগ্ধ করিয়া "জয় ঔরংজীবের জয়" ধ্বনি উচ্চারিত করাইয়াছেন, সে দৃশ্যটি যথার্থই,—জাহানারার কথায়,—"চমৎকার!" বৃদ্ধ বয়সে সাজাহানের অতিরিক্ত ধনরত্ন-লিপ্সার কথা, তাঁহার নিকট ঔরংজীবের বাদশাহী রত্নাভরণ চাহিবার ঐতিহাসিক কথা, সাজাহানের সহিত ঔরংজীবের সাক্ষাতের কাল্পনিক দৃশ্যে, প্রথম সম্ভাষণে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঔরংজীব ডাকিলেন, "পিতা!" সাজাহান উত্তর দিলেন, "আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ? দেবো না, দেবো না; এখনই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে ফেল্‌বো।"

সাজাহান নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, প্রত্যেক দৃশ্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহল সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। বক্তৃতা দীর্ঘ হইলেও অতৃপ্তি আসে না। ইহা সামান্য লিপিকৌশলের পরিচায়ক নহে। রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী আড়ম্বরের সহিত দারার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না করিয়া, উহা যে যবনিকান্তরালে সাধিত করিয়াছেন, সে জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবু নাট্যামোদিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

কবির বঙ্গবিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত-সমূহের অন্যতম "আমার জন্মভূমি" এই সাজাহান নাটককেই গৌরবান্বিত করিয়াছে। নাটকের অন্যান্য সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। দ্বিজেন্দ্রবাবু একাধারে সুকবি ও সুগায়ক। তাঁহার প্রেমাদিবিষয়ক সঙ্গীতসমূহের কথাগুলি এতই মধুর ও সুকোমল যে, সেগুলি ব্রজবুলির মত সুরে লয়ে একীভূত হইয়া প্রাণের মধ্যে যেন সত্যই—

"ভেসে আসে কুসুমিত উপবনসৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।"

বঙ্গের সুবাদার-পত্নীর কণ্ঠে সাজাহানের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বাঙ্গালার প্রাচীন কবিচূড়ামণি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের দুইটি অমূল্য গীতপদ বড়ই উপযোগী হইয়াছে।

এই নাটক-রচনায় নাট্যকার যে শিল্প-জ্ঞান ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহার সম্যক পরিচয় দিতে পারিলাম না। অথচ কয়েকটি ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিতেই হইবে, নহিলে সমালোচনা অঙ্গহীন থাকিয়া যায়।

দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজিডী—চূড়ান্ত ঘটনা। দারার সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত ছিল। সাজাহান বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন—উভয়ই হারাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত, এবং তাঁহার মৃত্যুঘটনায় মন এরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে, নাট্যকারের প্রভূত গুণপণা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য্য থাকে না।

নাটকের চরিত্রগুলির কথার ভঙ্গিমায় ব্যক্তিগত বৈষম্য রক্ষা করিলে নাটকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইত। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির প্রায় সকলেরই মুখে কবি নিজে কথা কহিয়াছেন; সাজাহান, জাহানারা, সুজা, পিয়ারা, নাদিরা, সোলেমান, দিলদার, প্রত্যেকেই এক একটি কবি। এমন কি, তরুণী জহরতের বাক্যেও কবিজনসুলভ ভাবুকতা জাজ্জ্বল্যমান। ভাষার এই বৈচিত্র্যহীনতার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দিল্লীর বাদশাহের পরিবারবর্গ যখন বাঙ্গালায় কথা কহিতেছেন, তখন তাঁহাদের মুখে কোনও প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষা না দিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষা দেওয়া উচিত। চলিত কথোপকথনের যখন কোনও সর্ব্ববাদিসম্মত ভাষা নাই, তখন শ্রুতিমধুর বা ব্যাকরণশুদ্ধ না হইলেও, রাজধানীর ভাষা প্রয়োগ করাই প্রশস্ত। নাট্যকার লিখিয়াছেন,—"দেইগে যাই", "করিস না", "চল্লাম", "চোক বোঁজো", "চোক বুঁজে, হাঁই তুলতে পারি"। কলিকাতার ভাষা, "দিইগে যাই", "করিস নি", "চল্লুম", "চোক বোজা", "চোক বুজে", "হাই তুলতে পারি"।

সাজাহান একখানি উৎকৃষ্ট নাটক, এবং উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি বলিয়াই এত কথা লিখিলাম। নতুবা কত ঐতিহাসিক নামধারী নাটক রঙ্গালয়ে "সমারোহের সহিত অভিনীত" হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

রাহুট কোট।

[মালদহের হজরৎ পাণ্ডুয়া।]

এই হৈমন্তিক ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে দূরে দূরে মালার ন্যায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সরোবর শোভিত। এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে নাতি-উচ্চ একটি গড়ের ইষ্টকমণ্ডিত চিহ্ন নেত্রপথে পতিত হয়। উহা অতিক্রম করিলেই আবার হৈমন্তিক ধান্যক্ষেত্রে শোভিত সরোবর প্রভৃতি ও বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখিতে পাই। এই স্থানের অনতিপূর্ব্বভাগে বনাবৃত উন্নত ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। উহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ স্বচ্ছসরোবরের পাহাড়। এই সরোবরের চারি দিক প্রভূত ইষ্টকে সমাকীর্ণ। নদীতীরে যে প্রকার বালুকাস্তূপ, এই স্থানে তদ্রূপ ইষ্টকরাশির সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সরোবরটির সমুদায় পাহাড় ইষ্টকময়। দক্ষিণ পাহাড়টির সমুদায় অংশই চাঁদনী বা সুন্দর প্রাসাদ ছিল, তাহা বুঝা যায়। এই চাঁদনীর দক্ষিণাংশে আজিও প্রশস্ত উন্নত প্রাচীরের কিয়দংশ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভূতকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। চাঁদনীর উত্তরাংশে সরোবরগর্ভে সুবৃহৎ সুপ্রশস্ত সুন্দর প্রস্তরসোপান এখনও বিদ্যমান। প্রস্তরসোপানের সমুদায় প্রস্তরগুলি হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবালয়াদি হইতে সংগৃহীত; তাহার চিহ্ন প্রত্যেক প্রস্তরে জলন্তভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, কোনও অনভিজ্ঞ মিস্ত্রী বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরে সোপান-শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছে। সরোবরের চতুঃপার্শ্ব ও তলদেশ ইষ্টকমণ্ডিত। পাহাড়ের অভ্যন্তরদেশে পূর্ব্বে বিলাসগৃহ ও সরোবরের বগচর উহার বারান্দায় শোভিত ছিল। উত্তর দিকের অধিকাংশে গৃহ ও বারান্দার চিহ্ন বর্ত্তমান। আজিও বারান্দার তলদেশ স্বচ্ছনীল মেঘের ন্যায় জলরাশি বিধৌত। উত্তরাংশের গৃহ সুরঞ্জিত এনামেল ইষ্টকে বিনির্ম্মিত। ছাদের তলদেশে সুন্দর বর্ণে (fresco paintingএর মত) বিবিধ চিত্রে চিত্রিত। ইহার সংলগ্ন উত্তর অংশে কয়েক বিঘা ভূমি সমতল ও প্রস্তর ইষ্টকে সমাকীর্ণ। জনপ্রবাদ,—উক্ত সমতল অংশের মৃত্তিকাভ্যন্তরে সেকালে বাদশাহগণের "কেলিগৃহ" ছিল। আমরা কতিপয় সাঁওতাল কৃষককে সঙ্গে লইয়া, উক্ত গুপ্ত অংশে প্রবেশের চেষ্টা পাই, এবং এক স্থানে একটি গুপ্ত দ্বারের সন্ধান পাইয়া বহু পরিশ্রমে ইষ্টক অপসারিত করিয়া সাবধানে

কয়েক পদ অগ্রসর হই। দুর্গন্ধে গুহা পরিপূর্ণ; ঘোর অন্ধকার। তাই আমরা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করি। সাঁওতালগণও গুপ্তগৃহের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলায়, সাহস করিয়া প্রবেশ করি নাই।

যাহাই হউক, আমার বিশ্বাস, উক্ত গুপ্তগৃহের সৌন্দর্য্য অদ্যাপি প্রাচীন ভাবেই আছে। এই গুপ্তগৃহের সরোবরমুখী বারান্দা অতি সুন্দর। বারান্দার স্তম্ভগুলি আজিও সুরঞ্জিত সুনীল ইষ্টকে শোভিত রহিয়াছে।

এই বারান্দা দিয়া সুড়ঙ্গপথে সরোবরের উত্তর-পশ্চিম-পার্শ্বস্থ "হাউজঘর" বা হামামখানায় (Room for hot bath) যাইবার সুরঞ্জিত এনামেল ইষ্টকে মণ্ডিত গুপ্ত-পথাংশ আজিও বর্ত্তমান।

সুন্দর প্রাসাদে শোভিত সরোবরের নাম এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। এই সুন্দর সরোবরটিই হাজী ইলিয়াসের দুরবস্থার একমাত্র হেতু। এই সরোবরের নাম "সাম্‌সি।"

মোসলমান ঐতিহাসিক লেখকগণ, বিশেষতঃ গোলাম হোসেন তাঁহার "রিয়াজ-উস্ সালাতিন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—(পুরাতন) দিল্লী নগরের বাহিরে 'সামসি' নামে এক সুন্দর সরোবর ছিল। সেই সরোবরের আদর্শে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া নগরে সামসি খনন ও প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ সামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। যদিও তিনি প্রথমে যুদ্ধে সফলমনোরথ হন নাই, তথাপি পাণ্ডুয়াবাসী জনগণের ভয়ের কারণ হইয়াছিল। ইলিয়াস একডালায় পলায়ন করিয়াছিলেন। এই একডালার যুদ্ধের পরই সামসি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। হাজি ইলিয়াস শাহের সাধের সামসির পরিণাম যাহা দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

গোসলখানা বা হামাম।

সাম্‌সি সরোবরের উত্তর-পশ্চিমাংশে আজিও হামামখানার কতক অংশ বর্ত্তমান। হামাম দ্বিতল, বা ত্রিতল ছিল। ইহার গঠন বৈচিত্র্যময়। মধুচক্রের ন্যায় কতিপয় cell-আকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের সমষ্টি। গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনাগমনের একাধিক দ্বার বর্ত্তমান ছিল। গৃহগুলি সুন্দর সুন্দর এনামেল টাইলে মণ্ডিত। ছাদতল বিবিধ বর্ণরাগে চিত্রিত। হামাম-গৃহের চারি কোণে চারিটি শূন্যগর্ভ স্তম্ভবৎ মিনারেট বিদ্যমান ছিল।

হামামখানার মধ্যস্থ গৃহটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রত্যেক মধুচক্রবৎ সজ্জিত গৃহগুলিতে কুলঙ্গি আছে। তাহাতে এক জন অক্লেশে উপবেশন করিতে পারে। প্রত্যেক গৃহে একাধিক কুলঙ্গি। প্রত্যেক গৃহপ্রাচীরগাত্রে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র বর্ত্তমান। সকল উন্মুক্ত ছিদ্রপথ সমআয়তন নহে।

এই সমুদায় ছিদ্রমুখ হইতে অসংখ্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নল (pipe) গৃহ হইতে গৃহান্তরে, নিম্নতল হইতে উপরের তলে, গৃহ হইতে গৃহান্তর দিয়া প্রাচীরগাত্রে গুপ্তভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। অর্থলোভে জনগণ প্রাচীরগাত্র ভেদ করিয়া নলগুলির অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া অর্থের সন্ধান করিয়াছে।

এই সমুদায় নলমুখ হইতে, ঈষদুষ্ণ জল ফোয়ারার ন্যায় হামাম-গৃহে বর্ষিত হইত। ইহা ব্যতীত শীতল ও উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের জন্যও স্বতন্ত্র নল নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই নলগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তর দিয়া হামামখানায় চারি কোণে স্থিত শূন্যগর্ভ মিনারাকৃতি অংশে সংযুক্ত রহিয়াছে।

বায়ু উষ্ণ করিবার জন্য উষ্ণজলাধার-স্থাপনের চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ভিতের গাত্রে অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। সেই স্থানের গঠনপ্রকৃতিই তাহার কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বায়ু ও জল সুবাসিত করিবার বন্দোবস্তের যে ত্রুটী ছিল, তাহা মনে হয় না।

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় "শব্দবাহী" নলের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার আকার সূক্ষ্ম। উন্মুক্ত মুখটিও ক্ষুদ্র। সেই প্রকার নলের আকৃতি দেখিয়া ও তাহার গতিপথের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলি বায়ুপ্রবাহী নল বা জলবাহী নলের সহিত সংযুক্ত নাই। এই নলগুলি কেবল এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার উন্মুক্ত মুখগুলি গৃহ-প্রাচীরের ঊর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্ন ভাগে দেখিতে পাই।

প্রবাদ আছে, বেগম ও বাদশাহগণ "লুকাচুরী" খেলিবার সময় এই এই ছিদ্রপথে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অনুসরণকারীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেন। কারণ, পার্শ্বের গৃহ হইতে কোনও ছিদ্রমুখে বাক্যোচ্চারণ করিলে মনে হয়, দ্বিতল হইতে শব্দ আসিতেছে। আজিও কোনও কোনও নলে এই প্রকারের ভ্রান্তি উৎপাদন করা যায়। গৃহগুলির গমনপথ এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, অনায়াসে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে উপরের গৃহে গমনাগমন চলিত।

আলোক-প্রবেশের পথও যথেষ্ট বর্ত্তমান। বাতায়নপথ ক্ষুদ্র। গৃহাভ্যন্তর হইতে কেবল আকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হামাম-গৃহের অধিকাংশ গৃহ নষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাও কালসহকারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে।

সাতাইশঘরা।—রাজন্তঃপুর, বা বেগমমহল।

সাম্‌সি ও হামামখানার উত্তর ও পূর্ব্বাংশে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বনভূমিই একদা রাণী বা বেগমমহলের সুন্দর রমণীয় বিলাস-নিকেতন ছিল। সাম্‌সির উত্তরাংশে বেগম-মহল বা সাতাইশ ঘরা প্রবেশের দ্বার ছিল। সাতাইশঘরা বেগম-মহলের বর্ত্তমান নাম। সাতাইশঘরার প্রবেশপথের সম্মুখেই একটি সুন্দর দীর্ঘাকার অপ্রশস্ত জলাধার বর্ত্তমান। তাহাও ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। এই জলাশয়ের পার্শ্ব দিয়া সে কালে অন্দর-মহলে প্রবেশ করিতে হইত। এই স্থানেই খোজা প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল। এইটিই অন্দরমহলে প্রবেশের পথে খোজা সৈন্যগণের প্রহরার প্রথম স্থল ছিল। সেকালের বঙ্গেশ্বরগণের সুরক্ষিত বেগম-মহল আজ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত! তথায় কিছুই নাই। বনের পর বনভূমি নিস্তব্ধতার মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

আমাদের মনে হয়, পাণ্ডুয়ার পতনের বহু পরেও এই স্থানে সাতাইশটি গৃহ বহুদিন পর্য্যন্ত ভূত সৌন্দর্য্যের সাক্ষিস্বরূপ অবশিষ্ট ছিল। সেই কারণে এই বেগমমহলের নাম সাতাইশঘরা হইয়াছে।

সাতাইশঘরায় উল্লেখযোগ্য গৃহ দুইটিমাত্র আছে। কিন্তু এই স্থান পর্য্যটন করিলে দেখিতে পাই, চতুষ্কোণ ভূখণ্ডগুলি সুপ্রশস্ত ইষ্টকপ্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এবং মধ্যভাগে গৃহভিত্তির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকারে একটি মহলের পর আর একটি মহল দাবাখেলার ছকের ন্যায় পর পর দূর হইতে দূরে প্রসারিত রহিয়াছে। আমরা পঞ্চাশের অধিক প্রাচীর-বেষ্টিত মহলের চিহ্ন দেখিয়া শেষ করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ, এই প্রকারের তিন চারি শত মহল ছিল। কোনও কোনও মহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে পাষাণে মণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সকল জলাশয় যে সুগভীর ছিল, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সমুদায় মহলগুলি একটি অতি উচ্চ সুপ্রশস্ত ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। আজিও তাহার কতক অংশ সাম্‌সির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দণ্ডায়মান।

এই অন্দরমহলগুলির মধ্যে একাধিক হামামখানা ছিল। অদ্যাপি তাহার কতিপয় চিহ্ন ও দুইটি হামামখানার কিয়দংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দেখিলাম।

অন্দরমহলের হামামখানা।—জীয়ৎ-কুণ্ড বা জীবন-কুণ্ড।

সামসি হইতে তিন চার রসি দূরে পূর্ব্বে একটি হামামখানা দৃষ্ট হয়। উহা পূর্ব্ববর্ণিত হামাম-গৃহের সমতুল্য। অধিকন্তু মধ্যে ইহার মধ্যভাগে প্রধান গৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি প্রস্তরগ্রথিত সুগভীর কূপ বা ইন্দারা একটি মধুচক্রবৎ cell গৃহ জুড়িয়া রহিয়াছে। সুন্দর এনামেল ইষ্টকে মণ্ডিত। ছাদতল বিবিধ-বর্ণের লতাপাতায় চিত্রিত।

অনেকেই এই কূপটিকে "জীয়ৎ কুণ্ড" বা "জীবন কুণ্ড" বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা পাণ্ডুয়ার নুরকুতব সাহেবের আস্তানার প্রধান বৃদ্ধ কর্ম্ম-কারের নিকট অবগত হইলাম, উক্ত কূপটি জীয়ৎ-কুণ্ড নহে। এই হামাম-গৃহের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটি অংশে একটি ক্ষুদ্র সরোবর আজিও ইষ্টক প্রস্তরে শোভিত রহিয়াছে, এবং উক্ত জলাশয়ের মধ্য-ভাগে চতুষ্কোণ স্থান পাষাণে গ্রথিত রহিয়াছে। তাহা সরোবরের জলের মধ্যে দ্বীপাকারে বর্ত্তমান। উক্ত অংশে গমনাগমনের পাষাণমণ্ডিত পথ হামাম-খানার দিকে অদ্যাপি রহিয়াছে। এই জলাশয়ই "জীয়ৎ কুণ্ড" নামে খ্যাত। পাণ্ডুয়াস্থ সাতাইশঘরার মধ্যস্থ জীয়ৎ-কুণ্ড সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে সময়ে পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডুনগর হিন্দুরাজার রাজান্তঃপুর ছিল, এবং মোসলমান সেনা এ দেশে আগমন করে নাই, সেই কালে "জীবন-কুণ্ড" পাণ্ডুয়া রাজগণের জীবনদায়িনী ছিল। দিল্লীর সিংহাসন বাদশাহী তক্তে শোভিত হইলে পশ্চিম দেশ হইতে দুই একজন মোসলমান ধর্ম্মপ্রচারক এ দেশে ফকীর বেশে আসিতেন। সেই সময়ে দুই এক জন মুসলমান পাণ্ডুয়ার প্রান্তে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও একটা পর্ব্ব উপলক্ষে, কেহ বলেন, এক মুসলমানের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গোহত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল। এই অপরাধে উক্ত মুসলমান পরিবার হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়েন। এই সমাচার দিল্লী সহরে নীত হইলে, দিল্লীশ্বর এক জন মুসলমান গাজীকে কাফেরদিগের দমনার্থ এ দেশে প্রেরণ করেন।

জীয়ৎ কুণ্ডের কথা।

গোহত্যা ও গাজীর আগমন।

গাজী সাহেব বাদশাহ-প্রদত্ত সেনাবল লইয়া পাণ্ডুয়া নগরের অনতিদূরে এক বৃহৎ প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। বৎসরাবধি খণ্ড-যুদ্ধের অভিনয় করিয়া তিনি নিজেই হীনবল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হিন্দুর পাণ্ডুনগর অধিকার বা কাফের-দমনে সক্ষম হইলেন না। সেই সময়ে এক আভীর রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া গাজী সাহেবের শরণাগত ও মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু রাজার গুপ্তকাহিনী ব্যক্ত করিয়া দেয়। তখন গাজী সাহেব অবগত হয়েন যে, বেগমমহলে এক 'জীয়ৎকুণ্ড' আছে। যুদ্ধে হতাহত সেনাগণের উপর উক্ত 'জীয়ৎকুণ্ডে'র বারিবর্ষণ করিলে তাহারা নব-জীবন প্রাপ্ত ও নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে। গাজী সাহেব কৌশলে উক্ত নবদীক্ষিত আভীর কর্ত্তৃক জীয়ৎকুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করান।

প্রবাদ, জীবনকুণ্ডে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটী দেবতা বাস করিতেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে জীবনকুণ্ড অমৃতকুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। গোমাংসপতনে তাঁহারা রথে চড়িয়া স্বর্গে পলায়ন করেন। সেই দিনের ভীষণ যুদ্ধে গাজী-সাহেবের জয়লাভ হয়, এবং হিন্দু রাজা সপরিবারে নদীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করেন। সেই দিনই বহু হিন্দুকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। এই প্রকারের একটি গল্প হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া সম্বন্ধেও কথিত হইয়া থাকে। শা সুফীর বিবরণে কোনও মুসলমান কবি তাহা কলমবন্দ করিয়া গিয়াছেন। সে কবির কল্পনা ও কবিত্ব অদ্ভুত রসে পূর্ণ!

টাঁকশাল।

এই স্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ইহা অপেক্ষা বৃহৎ সরোবরের মধ্যভাগে একটি গোসলখানা বর্ত্তমান। দেশের লোক তাহাকে 'টাঁকশাল' বলে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা একটি সরোবরমধ্যস্থ গ্রীষ্মাবাস ও গোসলখানা। গোসলখানায় গমনের পথও ছিল। ইষ্টক এনামেল করা। ছাদতল বর্ণরাগে চিত্রিত। ভিতের গাত্রে মৃত্তিকানির্ম্মিত নল দৃষ্ট হয়।

রাহুট বাঁক।

সাতাইশঘরার সীমাবহির্ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহভিত্তিচিহ্নে চিহ্নিত, সরোবরে শোভিত যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ আজিও গড়বেষ্টিত ও ইষ্টক প্রস্তরে সমাকীর্ণ, তাহাকে 'রাহুট বাঁক' বলে। ইহাই প্রাচীনকালে সেনানিবাস বা বারাক ছিল। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাতাইশ-ঘরা হইতে মৃত্তিকাতলবাহী গুপ্ত সুড়ঙ্গ এই রাহুট বাঁকের তলদেশ দিয়া পূর্ব্ব-

দিকবর্ত্তী তগমের তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। শুনিতে পাই, অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সন্ধান পাই নাই।

মোটের উপর সমুদায় সাতাইশঘরা ও রাহুট বাঁক পূর্ব্বকালে 'রাহুট কোট' নামে পরিচিত ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত।

পণ্যের মূল্য।

কোনও দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অপর একটি দ্রব্যের সহিত ঐ দ্রব্যের তুলনা করিতে হয়। অর্থাৎ, যে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে হইবে, উহার পরিবর্ত্তে অন্য আর একটি দ্রব্য কতটুকু পাওয়া যায়, ইহাই স্থির করিতে হয়। যদি দুই সের ডালের পরিবর্ত্তে এক সের চাউল পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এক সের চাউলের মূল্য দুই সের ডাল। মূল্য কথাটি এই জন্য তুলনাত্মক। কেন না, যখন বলা হয় যে, এক সের চাউলের মূল্য দুই সের ডাল, তখনই চাউল ও ডালের তুলনা করিয়া মূল্য ধার্য্য করা হয়।

মূল্য বলিলেই যখন তুলনার কথা উঠে, তখন ইহাও সহজে বোধগম্য হইবে যে, দুইটি কারণে পণ্যের মূল্যের তারতম্য হয়। প্রথম, ঐ দ্রব্যটিরই কোনও বিশেষত্ব থাকার জন্য; যাহাকে অর্থনীতি হিসাবে আভ্যন্তরীণ কারণ বলে। দ্বিতীয়তঃ, যে দ্রব্যের সহিত উহার বিনিময় হয়, তাহার বিশেষত্বের জন্য; ইহাকে বাহ্যিক কারণ বলে। চাউলের আমদানী কম হইলে, বা কম চাউল উৎপন্ন হইলে, উহার মূল্য বর্দ্ধিত হয়। এই জন্য চাউলের মূল্যের যে তারতম্য হয়, উহা চাউলেরই জন্য। যদি অতিরিক্ত ডাল আমদানী বা উৎপন্ন হইয়া ডালের মূল্য কমিয়া যাইয়া কম চাল দিয়া বেশী ডাল পাওয়া যায়, (অর্থাৎ চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হয়) তাহা হইলে তাহাকে বাহ্যিক কারণ বলে। এই জন্য অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সকল পণ্যেরই এক সময়ে মূল্যের বৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস হইতে পারে না। "সকল দ্রব্যেরই এক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি হইল," এ কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক দ্রব্যের বিনিময়েই অপর দ্রব্য বেশী পাওয়া যাইবে। ইহা ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ, যখন এক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, তখন অপর দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। চাউলের মূল্য পূর্ব্বে সস্তা

ছিল, এ কথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ চাউল দিলে অল্প-পরিমাণে কোনও দ্রব্য পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই পরিমাণ চাউলে অন্য দ্রব্য অধিকপরিমাণে পাওয়া যায়। মূল্য কথাটি এই জন্য বিনিময়াত্মক; কেন না, কোনও দ্রব্য বিনিময় করিতে হইলে অপর কোনও দ্রব্যের কতখানি পাওয়া যাইবে, মূল্য কথাটি দ্বারা উহা জ্ঞাপিত হয়। এই জন্য ইহা আপেক্ষিকও বটে; অর্থাৎ, এক দ্রব্য অপর দ্রব্য অপেক্ষা কত কম বা বেশী পাওয়া যাইবে, তাহা মূল্যই নির্দ্ধারণ করে। ডালের অনুপাতে চাউলের মূল্য বেশী হইলে, চাউলের মূল্যের তুলনায় ডালের মূল্য কম হইল, ইহাই বুঝায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক পণ্যের বিনিময়ে অপর পণ্য বিনিময় করা হয়। এই প্রকার বিনিময় অত্যন্ত অসুবিধাজনক; এবং এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ অন্য দ্রব্য না দিয়া লোকে মুদ্রা ব্যবহার করে; সেই জন্য মুদ্রাকে দ্রব্যের 'পণ' বলে। এই জন্যই পণকে মূল্যের বিশেষ ভাবান্তর (Particular case) বলা হয়। এক দ্রব্য দ্বারা অন্য দ্রব্য কতপরিমাণ পাওয়া যাইবে, ইহারই নির্দ্ধারণ করিয়া প্রথমোক্ত দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে হয়। সুতরাং একটি টাকার পরিবর্ত্তে যখন কোনও দ্রব্য পাওয়া যায়, তখন ঐ টাকাটিই ঐ দ্রব্যের মূল্য। কিন্তু মুদ্রা পরিমাণনির্দ্ধারক (Measure of value) এবং বিনিময়ের দ্বার (Medium of exchange) বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সেই জন্য মুদ্রা দ্বারা কোনও দ্রব্য কিনিলে, ঐ মুদ্রাকে ঐ দ্রব্যের পণ বলে। যখনও কোনও দ্রব্যের পণের কথা বলা হয়, তখন অপর দ্রব্যের সহিত তুলনার কথা বলা হয়। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, সকল জিনিসেরই এক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস হইতে পারে না। কিন্তু পণের এই প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা যদি অকস্মাৎ দ্বিগুণিত হয়, এবং এরূপ ক্ষেত্রে যদি লোকসংখ্যা ও ব্যবসায় বাণিজ্য পূর্ব্ববৎই থাকে, তবে পণের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে।

অনেকে বলেন যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহের উপর পণ্যের পণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটে। নিম্নে পণ্যের পণ ও গ্রাহকতা ও সরবরাহের সম্পর্কে কিছু বলা যাইতেছে। পণ্যের পণ এরূপ হইবে যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহ সমতুল্য হইবে। কোনও দ্রব্যের পণ কম হইলেই উহার গ্রাহকতা বেশী হয়; অর্থাৎ, অধিকসংখ্যক লোকে উহা ক্রয় করিতে অগ্রসর হয়।

আবার যতই পণ বেশী হইতে থাকে, ততই উহার গ্রাহকতা কম হয়। অর্থাৎ, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক লোকে উহা ক্রয় করিবার জন্য অগ্রসর হয়। মনে করুন, একটি বাড়ী বিক্রীত হইবে, এবং উহার ছয় জন গ্রাহক আছে। প্রত্যেক গ্রাহকই বাড়ী কিনিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উহার জন্য বেশী পণ দিতে চাহিবে। অবশেষে অপর পাঁচ জন অপেক্ষা এক জন অধিক পণ দিয়া ঐ বাটী ক্রয় করিবে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে, তখন পণ এরূপ হওয়া চাই যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহ সমতুল্য হইবে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, এই ছয় ব্যক্তি বাড়ীর দর আপনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, পাঁচ জনের আর বাড়ী কিনিবার সামর্থ্য থাকিবে না। অবশিষ্ট যিনি থাকিবেন, তিনিই বাড়ী কিনিবেন। অর্থাৎ, গ্রাহকতা ও সরবরাহ সমতুল্য হইল, এবং বাড়ীও ক্রীত হইল।

মূল্যের তুলনায় পণ্যদ্রব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। —প্রথমতঃ, যে সমস্ত পণ্যের পরিমাণ কোনও প্রকারেই বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে না, এবং সেই জন্য সেই সকল পণ্যের অধিকারিগণ ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য যথেচ্ছ নির্দ্দেশ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে মৃত শিল্পিগণের ছবির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইলে উৎপাদনের মূল্যাধিক্য হয়। কৃষি ও আকর-জাত দ্রব্যসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ উৎপাদনের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া যাহাদের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। শিল্পজাত দ্রব্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকারের পণ্যের উল্লেখকালে আমরা মৃত শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছি। পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবির অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনেকে উহা ক্রয় করিবার অভিলাষী। কিন্তু তিনি জীবিতকালে যে কয়েকখানিমাত্র ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। এই ছবিগুলি বর্ত্তমানে যাঁহাদের অধিকারে আছে, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ছবিগুলির মূল্য-নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; অর্থাৎ, এ বিষয়ে তাঁহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। এই প্রকার একচেটিয়ার আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হ্যারিসন রোড বা চৌরঙ্গীর বাড়ীগুলির ভাড়া অত্যন্ত অধিক। এই সকল রাস্তার ধারে যে সামান্য জমী আছে, উহাদের মূল্য অত্যধিক। কারণ,

ঐ বাড়ীর সংখ্যা বা জমীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং উহাদের অধিকারিগণ ইচ্ছামত উহার মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আমরা কৃষিজাত বা আকরজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি। কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধি করিতে হইলে, মূলধনের পরিমাণ ও শ্রামিকের বেতন অধিক করিতে হয়, এবং এই জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়। যদি কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহকতা অধিক হয়, তবে অল্লোৎপাদিকা-শক্তি ভূমির কর্ষণ ও উহাতে বীজ রোপণ করিতে হয়; ব্যয় বেশী হয়, এবং সেই জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়।

অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যাদির গণনা করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাতেও যে মূল্যাধিক্য না হয়, তাহা নহে; তবে কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় ইহার মূল্য তত বেশী হয় না। একখানি বস্ত্রের বয়নে যে কার্পাস আবশ্যক হয়, বস্ত্রের মূল্যের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অল্প। এই সকল দ্রব্যের গ্রাহকতা অধিক হইলেও, মূল উপাদানের (Raw material) মূল্য সামান্য বলিয়া ঐ অনুপাতে মূল্যাধিক্য হয় না।

কি প্রকারে প্রথম প্রকারের দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, গ্রাহকতা ও সরবরাহের জন্য দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরবরাহ সীমাবদ্ধ। যদি রবিবর্ম্মা বা সুরেন্দ্রনাথের ছবির সংখ্যা ইচ্ছামত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিত, তবে অনেকেই সে ছবি কিনিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর নহে। যে সামান্য কয়েকখানি ছবি আছে, উহা সকলেই কিনিতে পারেন না। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, কেবল তাঁহারাই উহার গ্রাহক হইতে পারেন। এই জন্য অর্থবিৎগণ এরূপ স্থলে 'গ্রাহকতা' না বলিয়া 'ফলোৎপাদিকা গ্রাহকতা' শব্দের প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চান যে, যাঁহারা ফলোৎপাদক গ্রাহক, তাঁহারাই এই দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক, এবং সামর্থ্যশালীও বটেন। এই যে ফলোৎপাদিকা গ্রাহকতা, ইহারই জন্য পণের তারতম্য হয়। ক, খ, গ, তিন ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের একখানি ছবি ক্রয় করিবার জন্য গ্রাহক, এবং প্রত্যেকেই ৫০০ শত করিয়া টাকা দিতে প্রস্তুত। এ স্থলে এই পণে সরবরাহ অপেক্ষা গ্রাহকতা বেশী। মনে করুন, ক ও খ ৭৫০৲ টাকা দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু গ ৫০০৲র বেশী উঠিতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু তথাপি ফলোৎপাদিকা-গ্রাহকতা সরবরাহ অপেক্ষা বেশী। কেন না,

ছবি একখানিমাত্র, এবং গ্রাহক দুই জন। তৎপর, ক ১০০০৲ ও খ ৯০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। এ ক্ষেত্রে এই ১০০০৲ ও ৯০০৲ টাকার মধ্যে যে কোনও পণে গ্রাহকতা ও সরবরাহ সমতুল্য হইবে। খ ৯০০৲ শত টাকার বেশী দিতে চাহেন না, এবং ক ১০০০৲ হাজার টাকার বেশী দিতে চাহেন না। যদি ক জানিতে পারেন যে, খ ৯০০৲ শত টাকার অধিক দিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা হইলে ঐ চিত্রের ফলোৎপাদক গ্রাহক কেবল তিনিই এক। এবং তিনি ৯০০৲ শত টাকার কিছু বেশী দিয়াই ঐ চিত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্য আমরা বলিয়াছি যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্য ঠিক সাধারণ হিসাবে গ্রাহকতা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে না; কিন্তু গ্রাহকতা ও সরবরাহ সমতুল্য হওয়া আবশ্যক।

দুইটি কারণে মূল্যের তারতম্য হয়। অর্থাৎ, মূল্য দুইটি উপাদানে নির্ম্মিত। প্রথমতঃ, দ্রব্যের উপকারিতা, এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য-আহরণে ক্লেশ। সংক্ষেপে উহাকে আমরা উ ও আ বলিব। উ অর্থাৎ দ্রব্যের উপকারিতা এবং আ অর্থাৎ আহরণে যে পরিমাণে কষ্ট বা ক্লেশ পাইতে হয়। এই উভয় উপাদান বর্ত্তমান না থাকিলে কোনও দ্রব্যেরই বিনিময়-মূল্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্মরাগ মণির বা হীরকের কথা ধরুন। রাজা মহারাজেরা অঙ্গে বা পরিচ্ছদে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন। তাঁহাদের পক্ষে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহারে উপকারিতা বা 'উ' আছে। আবার এই সকল দ্রব্যের আহরণে ক্লেশও বিস্তর। এই জন্য এই দ্রব্যে উ ও আ বর্ত্তমান বলিয়া হীরকের বা পদ্মরাগের মূল্য আছে। এক্ষণে মনে করুন যে, কোনও কারণে তাঁহাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহাদের নিকট হীরক-ধারণ বা পদ্মরাগ-ব্যবহারের কোনও উপকারিতা রহিল না। সুতরাং 'উ' লুপ্ত হইল। আ অবশ্যই থাকিল। কেন না, তাঁহারা উহা ব্যবহার না করিলেও, উহার আহরণে ক্লেশের লাঘব হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় উপাদান বর্ত্তমান না থাকিলে কোনও দ্রব্যেরই মূল্য থাকে না।

এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের বিষয় বিবেচনা করিব। কৃষিজাত দ্রব্য ইচ্ছামত বেশী করা যায় বটে, কিন্তু উহাদের মূল্যবৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ করিলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যায়। মনে করুন, একটি জনশূন্য দ্বীপে ৫০টি লোক যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, এবং সেই দ্বীপের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভূমিগুলি তাহারা

অধিকার করিয়া একটি গ্রাম গঠন করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০ হইল। অধিকপরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হওয়ায় অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বর ভূমি চাষ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্যই ইহাতে চাষের খরচের হার বর্দ্ধিত হইল। অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বর ভূমিতে অধিক সার খরচ করিয়া বা দূরের জমী হইতে ফসল গাড়ী করিয়া আনাতে, এবং এই প্রকার অন্যান্য বাবদে অধিক খরচ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকল শস্যের দরই বর্দ্ধিত হইল। অবশ্য, যাহারা গ্রামেই অধিক উর্ব্বর জমী চাষ করিত, তাহাদের অপরের অপেক্ষা অল্প খরচে ফসল হইতে লাগিল; কিন্তু সকলের সঙ্গে তাহারাও বর্দ্ধিত হারে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। সুতরাং দেখা গেল যে, এই শ্রেণীর পণ্যের পরিমাণ আবশ্যকমত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, কিন্তু অধিক মূল্যবৃদ্ধি হইবে। খনিজাত দ্রব্যও এই নিয়মের অন্তর্গত।

শিল্প দ্রব্যকে অর্থবিৎগণ তৃতীয়-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য, অধিকাংশ শিল্প-দ্রব্যের উপাদানই কৃষিজাত। সুতরাং কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, উভয়েরই মূল্য একই নিয়মে নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে কার্পাস আবশ্যক। কার্পাস কৃষিজাত পণ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষি বা আকরজাত দ্রব্যাদির মূল উপাদানের (Raw Material) অংশই অধিক। কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল উপাদানের অংশের পরিমাণ কম। খানিকটা কার্পাস হইতে খানিকটা কাপড় প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কার্পাসটুকুকে এতগুলি প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত করিতে হয়, এত শ্রামিককে ঐ কার্পাসটুকু লইয়া কাজ করিতে হয়, এত লোককে বেতন দিতে হয়, এত মূল্যবান যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হয় যে, তুলার মূল্য ঐ বস্ত্রখণ্ডে অতি ক্ষুদ্র অংশই অধিকার করে। যদি এই জাতীয় পণ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ গ্রাহকতা সরবরাহ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলেও মূল্য অধিক বৃদ্ধি পাইবে না। পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারাই কার্য্য চলিবে, পরিশ্রমের ব্যয়বৃদ্ধি হইবারও বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং অনেক সময় মূল্যও কম হয়। কেন না, অধিকপরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে অনেকগুলি প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে, অধিকতর পরিপাটীরূপে শ্রমবিভাগ হইতে পারে, দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র চালাইবার জন্য যে ব্যয় হয়, বৃহৎ একটি যন্ত্রে তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয় হয়,

পরিদর্শকের বেতনের হার কমিয়া যায়। সুতরাং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল্য-বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, মূল্যহ্রাস হইতে পারে।

সুতরাং উপরি-উক্ত তিন প্রকার পণ্যের মূল্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে,—

প্রথম শ্রেণীর পণ্যে (অর্থাৎ যাহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ) গ্রাহকতা ও সরবরাহ পণ্যের মূল্য এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে যে, সরবরাহ অপেক্ষা যে অধিক গ্রাহকত থাকে, উহা ঐ মূল্যবৃদ্ধি করিয়া সমতুল্য করিতে হইবে

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, মূল্যবৃদ্ধি না করিলে উহার সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে অবাধ বাণিজ্য, মালামাল প্রেরণের সুব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে গ্রাহকতার বৃদ্ধি হইলে, অপর স্থান হইতে পণ্য আনয়ন করিয়া মূল্য সমতুল্য করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া ইহার পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সামাদ্দার।

নির্লজ্জ।

ডাক-নাম—'কালো'। স্বামী সোহাগ করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন,—'আলো'। সাবিত্রীর রূপ ছিল না, কিন্তু তাহার প্রাণের কোমলতায় সে অভাব পূর্ণ হইয়াছিল।

সাবিত্রীর স্বামী জমীদার। মাঝে মাঝে তাঁহাকে তালুকে যাইতে হইত। সে সময় সাবিত্রীর মনে হইত, দুনিয়াটা যেন শূন্য! গৃহকর্ম্মে তাহার মন লাগিত না; সে খাইয়া সুখ পাইত না। স্বামীর জন্য তাহার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা একটা আকুল অশান্তি গুমরিয়া উঠিত। কোনও মতেই সে তাহা দমন করিতে পারিত না। এই জন্য শ্বশুরবাড়ীর অনেকে তাহাকে লইয়া নানা রহস্য করিত। তবু কিন্তু সাবিত্রী মনের 'রাশ' ঠিক রাখিতে পারিত না। বিধবা নারী যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা ভাবিতে গেলে সাবিত্রী চোখে অন্ধকার দেখিত।

একদিন স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। সাবিত্রী স্বামীকে কহিল, "কবে মেয়ে দেখতে যাবে?"

স্বামী কহিলেন, "দু' এক দিনের ভিতর।" সাবিত্রী কহিল, "চারুর যেন একটি বেশ সুন্দর বৌ হয়। ঠাকুরঝির ঐ একটি ছেলে।"

শিবচন্দ্র বলিলেন, "তোমারও সুন্দরের দিকে ঝোঁক?

"ও মা!—তা হ'বে না?"

"কেন, কালো কি ভালো নয়?—আমি যে কালোরই ভক্ত!" কথাটা বলিয়া শিবচন্দ্র স্ত্রীর প্রতি কোমল কটাক্ষপাত করিয়া হাসিলেন।

সাবিত্রী বলিল, "কালোর ভক্ত হ'তে পারতুম, যদি তার বাঁধন শক্ত হ'ত!"

শিবচন্দ্র বলিলেন "কালোর বাঁধন শক্ত নয়—এ কথা তুমি বলচো?"

"হাঁ! ভ্রমর-গোবিন্দলালের কথা ভেবে দেখ!" শিবচন্দ্র কহিলেন, "আর এই বর্ত্তমান শিবচন্দ্রটিকে একবার ভেবে দেখলে ক্ষতি কি?"

সাবিত্রী বলিল, "তা হোক্; সকলে ত তুমি নয়—চারুর ফরসা বউ হওয়া চাই-ই।"

দুই দিন পরে শিবচন্দ্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁর মুখখানা যেন একটু বিমর্ষ। সাবিত্রী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হয়েছে?" শিবচন্দ্র বলিলেন, "কৈ?—কিছু না!"

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে দেখ্‌লে কেমন?" শিবচন্দ্র কহিলেন, "অমনই এক রকম!"

ইহার অল্প দিন পরে হঠাৎ সাবিত্রীর স্বামী দুর্গাপুর তালুকে চলিয়া গেলেন। পরদিনই ফিরিবার কথা। যাইবার সময় তিনি সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা অবধি করিয়া যান নাই। তখন দুর্গাপুরে খুব কলেরা হইতেছিল। সাবিত্রী ভাবিল, "তাই যাবার সময় বলে' যান নি, পাছে যেতে না দি।" সাবিত্রীর প্রাণটা সদ্যোবন্দী পাখীর মত ছট-ফট করিতে লাগিল।

পরদিন শিবচন্দ্রের বাড়ী আসিবার কথা। স্বামীর জন্য সাবিত্রী জল-খাবারের আয়োজন করিয়া রাখিল। সরবৎটুকু নিজে তৈয়ার করিয়া খানিকটা বরফ আনাইয়া রাখিল; কি জানি, কখন শিবচন্দ্র আসিয়া পড়েন। আঙ্গুর কয়টা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; আর এক বাক্স আঙ্গুরও

আনাইয়া রাখিল। মেয়েটিকে সাজাইয়া নিজে একখানি সিমলার মিহি শাঁড়ী পরিয়া, বাহিরে দ্বারের নিকট কখন গাড়ী আসিয়া থামে, সেই দিকে কান পাতিয়া রহিল।

বেলা তখন দশটা। একখানা গাড়ী আসিয়া সদরে থামিল। সাবিত্রীর বুক হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল! সে স্বামীর প্রতীক্ষায় আপনার ঘরে বসিয়া রহিল। এইরূপই সে করিত।

এমন সময় সাবিত্রীর ননদ অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌ!"

ননদের মুখের ভাব দেখিয়া সাবিত্রীর মুখ শুকাইয়া গেল—ব্যাকুলভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এঁ্যা—কি হয়েচে দিদি?"

বিন্দু দশনে অধর চাপিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল, "দাদা ফের বিয়ে—" সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, "যাঃ!"

সাবিত্রীর এই শান্তিভরা দু' দণ্ডের অবিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিতে বিন্দুর প্রাণ চাহিল না—সে শুধু পাষাণমূর্ত্তির মত খানিকক্ষণ অন্য দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ননদের কথায় সাবিত্রীর প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু তাহার এইরূপ নির্ব্বাক-নিশ্চল ভাব দেখিয়া সাবিত্রীর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল, সে যেন শূন্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মাথাটা 'বন্‌বন্' করিয়া ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দিনের আলো অন্ধকার হইয়া গেল!

* * * *

সাবিত্রীই নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল। নববধূর অঙ্গে অলঙ্কার ছিল না। সাবিত্রী আপনার অলঙ্কারগুলি তাহাকে পরাইয়া দিয়া একবার তার দিকে চাহিয়া দেখিল। রূপ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সাবিত্রী ভুলিয়া গেল যে, নববধূ তার সপত্নী!

সাবিত্রীর ব্যবহারে সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ! এমন লক্ষ্মী বউকে অবহেলা করিয়া শিবচন্দ্র রূপের নেশায় আবার একটা বিবাহ করায় সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

সাবিত্রীকে নিরালা পাইয়া নববধূ ঘোমটা খুলিয়া বলিল, "দিদি! এ গহনাগুলো—" সাবিত্রী কহিল, "না—তোমার গায়েই থাক্।" নববধূ কহিল,—"এ যে তোমার গয়না?"

সাবিত্রী একবার আকাশের পানে চাহিল—ভাবিল,—"আমার!"

ফুল-শয্যার রাত্রে নববধূ খুব গণ্ডগোল বাধাইল—সে সাবিত্রীকে জড়াইয়া রহিল, কোনও মতে শিবচন্দ্রের ঘরে ঢুকিবে না। বধুর অবাধ্যতা-দর্শনে সকলে কহিল, "এঁরি হাতে শিবচন্দ্র জব্দ হবেন—যেমন কর্ম্ম!"

শেষে সাবিত্রীই অনেক করিয়া বুঝাইয়া স্বপত্নীকে স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া আপনি নীচের একটা ঘরে মেয়েটিকে লইয়া শুইয়া রহিল।

এ দিকে নববধূ স্বামীকে খুবই হতাশ করিল। শিবচন্দ্রের নির্লজ্জ প্রেমালাপ সমস্তই বিফল ও ব্যর্থ হইল। প্রভা সেই যে বালিসে মুখ ঢাকিয়া শুইল, সেখান হইতে একটুও নড়িল না! সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। প্রকৃতি যেন একখানি শুভ্র ফিন্‌ফিনে মিহি মসলিনে অবগুণ্ঠিতা! এমন রাত্রিটা বিফলে গেল! শিবচন্দ্র অধীর-আবেগে কহিল, "প্রভা!—প্রভা! একটা কথা কও!"

প্রভা নীরব।

দশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর এক ফুল-শয্যা-রাত্রির কথা শিবচন্দ্রের মনে পড়িল। সে ভাবিল, সে কি সুখের! আবার ভাবিল, কিন্তু এমন রূপ সে রাত্রের ফুল-শয্যাটিকে আলো করে নাই!

তার পর নির্দ্ধারিত দিনে স্বামীর তৃষিত চিত্ত অতৃপ্ত রাখিয়া নববধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। নববধূর ট্রঙ্কে ভালো কাপড় তেমন কিছু ছিল না। সাবিত্রী তার বেনারসী কাপড়, সিল্কের শাড়ী প্রভৃতি যাহা ছিল, সমস্ত দিয়া নূতন বৌর ট্রঙ্ক সাজাইয়া দিল।

ননদ জিজ্ঞাসা করিল,"এ তোমার কি হচ্ছে?—যাঁর সোহাগের জিনিস, তিনিই দেবেন। তুমি কেন তোমার জিনিসপত্র দিতে যাবে?"

সাবিত্রী কহিল, "ও তো সবই তাঁর জিনিস।" ননদ কহিল, "তোমার কি মেয়ে টেয়ে নেই, না আর ছেলেপুলে হবে না যে, আর দরকার নেই!"

বিন্দুর শেষ কথায় সাবিত্রী শুধু একবার ননদের মুখের দিকে চাহিল।

যাইবার সময় প্রভা আবার বলিল, "দিদি, এইবার তোমার গয়না নাও।"

সাবিত্রী খুব সংযতস্বরে কহিল, "ও ত তাঁরি দেওয়া— তোমার গায়েই থাক্।"

বিন্দু সাবিত্রীর উপর খুব রাগ করিল; বলিল, "তুমি বড় হাবা।—এখন দিলে আর বুঝি ও গয়না পাবে?"

সাবিত্রী কহিল,"কি হ'বে আর আমার গয়নায় ?"

"তোমার বুদ্ধির কপালে আগুন!" বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

নববধূ চলিয়া গেলে শিবচন্দ্র কেমন একটা দুঃসহ নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলেন, সাবিত্রী নিকটে থাকিয়াও বহু দূরে!

সে রাত্রেও জ্যোৎস্নায় আকাশ-পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছিল। সেই ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় হেনার গন্ধ মিশিয়া চরাচরে যেন আনন্দময় অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করিতেছিল। সাবিত্রী তখনও নিদ্রা যায় নাই; ঘুমন্ত মেয়েটির পাশে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিল। হঠাৎ দ্বারের নিকট খট করিয়া কিসের শব্দ হইল। সাবিত্রী সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তার স্বামী শিবচন্দ্র দাঁড়াইয়া—চোরের মত!

সাবিত্রী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শিবচন্দ্র নিকটে গিয়া সাবিত্রীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "এস্!—উপরে এস।"

দেখিতে দেখিতে সাবিত্রীর মুখখানা কাঁচা ফোড়ার মত লাল ও শক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা কহিল না, শুধু নীরব ভর্ৎসনার দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিল।

শিবচন্দ্র নিঃশব্দে চোরের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বিদেশী গল্প।

মাছ-ধরা।

শীতকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অল্প অল্প বৃষ্ট পড়িতেছিল। জানুয়ারী মাসের শেষভাগ হইলেও ব্রেসেল নদীর তটভূমির সন্নিহিত ক্ষেত্রে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের মধ্যে তখনও তুষারবিন্দুসমূহ ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

মঁসিয়ে করমেনো সতর্কভাবে নদীর উচ্চ পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

গত রজনীতে তিনি যেখানে 'চার' ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, সে স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া করমেনো সুদৃঢ় ছিপগাছি তুলিয়া লইলেন। জলের মধ্যে বংশযষ্টি প্রোথিত করিয়া, ছিপের সূতায় নূতন বঁড়শী লাগাইলেন।

ময়দার টোপ করমেনো আদৌ পছন্দ করিতেন না। মধুমিশ্রিত

পাঁউরুটীর টোপ তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জলের গভীরতা-পরিমাপের পর তিনি বঁড়শীতে টোপ লাগাইয়া সূতা জলে নিক্ষেপ করিলেন।

তখন তাঁহার হৃদয় শান্তি ও আনন্দে প্রসন্ন হইল। এখন তিনি সত্যই মাছ ধরিতেছেন!

আকাশের নীল-ধূসর আলোকদীপ্তি পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার নয়নে প্রতিফলিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিধারা তাঁহার 'ওয়াটার প্রুফ' কোট বহিয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিপের 'ফাৎনা' ছাড়া অন্য দিকে ছিল না। বৃষ্টিধারার আঘাতে 'ফাৎনাটি' জলের উপর কাঁপিতেছিল। পরমপ্রশান্তমনে একদৃষ্টিতে জলের উপর চাহিয়া করমেনো বসিয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন, বৃষ্টির পর মাছ চারে আসে।

মেঘান্তরাল হইতে মাঝে মাঝে সূর্য্যদেব উঁকি মারিতেছেন। দূরে ধারাস্নাত বৃক্ষবল্লরী মধুর মৃদু সূর্য্যালোকে হাসিয়া উঠিতেছিল। এক একবার 'রোচ্' অথবা 'চব' মৎস্য টোপে ঠোকর দিতেছিল। সহসা ছিপে টান পড়িল। মৎস্যে ও মানুষে কি বিষম দ্বন্দ্ব! যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বঁড়শী-বিদ্ধ মৎস্য আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। মসিয়ে করমেনো ধীরে ধীরে মাছটিকে তীরে তুলিয়া সিক্ত-তৃণ-পূর্ণ ঝুড়ীর মধ্যে রক্ষা করিলেন।

তার পর বিজয়গর্ব্বে তিনি পুনরায় বঁড়শীতে টোপ পরাইলেন। সাফল্যজাত আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অকস্মাৎ কোমল তৃণভূমির উপর মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। করমেনো ফিরিয়া চাহিলেন। জনৈক পুলিস-প্রহরী তীরে দাঁড়াইয়া অভিনিবেশ-সহকারে তাঁহাকে দেখিতেছিল।

মসিয়ে করমোনে বিন্দুমাত্র বিচলিত অথবা কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ত নিষিদ্ধ ঋতুতে মৎস্য শিকার করিতেছেন না। ব্রেসেল নদীতে মাছ ধরাও কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং তাঁহার আশঙ্কার কোনও কারণই ছিল না। আইনের বিরোধী, বিবেকের অননুমোদিত কোনও কর্ম্মই তিনি করেন নাই।

অতি মৃদু ও কোমল কণ্ঠে—পাছে মনুষ্য-কণ্ঠ-স্বরে ভয় পাইয়া মাছ পলাইয়া যায়—প্রহরী বলিল, "মাছ ধরিয়াছেন কি?"

মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ।"

করমেনো ঝোড়ার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। মাছটি তখনও ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছিল।

পুলিসের কর্ম্মচারীও আনমিতমস্তকে মাছটি দেখিয়া বলিল যে, সত্যই বড় চমৎকার মাছ!

সেই সময়ে সুতায় আবার টান পড়িল। করমেনো ছিপে টান মারিবার পূর্ব্বেই 'ফাৎনা' জলে ডুবিয়া গেল।

তিনি সজোরে ছিপ আকর্ষণ করিলেন। সুতায় টান পড়ায় ছিপের অগ্রভাগ এমন বাঁকিয়া গেল যে, মনে হইল, এখনই বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে। করমেনো বাহিরে কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেন না। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া তিনি সুতা ছাড়িতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে আবার গুটাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি পীতবর্ণ বৃহৎ মৎস্যের মস্তক জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। মৎস্যবর জোরে একটা ঝাপ্‌টা মারিল। করমেনোর বোধ হইল, ছিপ বুঝি এখনই তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। তিনি পুনরায় সুতা ছাড়িতে লাগিলেন।

সিপাহী বলিল, "কি চমৎকার মাছ! দেখ্‌বেন—যেন না পালায়!"

করমেনো যখন মাছটিকে টানিয়া তীরে তুলিলেন, তখন সে স্বয়ং ঝুড়িটা সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ-ভাবে সিপাহী বলিল, "মস্ত মাছ! আমার একখানা ঠ্যাংয়ের অপেক্ষাও বড়। একে কি মাছ বলে ম'শায়? আমি এ রকম মাছ কখনও দেখি নাই।"

"একে 'চার' মাছ বলে।" মসিয়ে করমেনো সগর্ব্বে বলিলেন যে, ফরাসী দেশের সকল প্রকার মৎস্যের নাম তিনি অবগত আছেন। "এ মাছ এই নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। বন্যার স্রোতে কোনও রকমে মাছটি এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, অনেক দিন কিছু খাইতে পায় নাই, তাই পাঁউরুটীর টোপ গিলিয়াছে।"

সিপাহী মধুরস্বরে বলিল, "ও! এরই নাম 'চার' মাছ? হা ভগবান্‌! এ কি করিলে!" মসিয়ে করমেনো গর্ব্বপ্রফুল্লনয়নে মাছটি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কেন, ব্যাপার কি?"

"১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখের আইন অনুসারে ১৫ই অক্টোবর হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত 'চার' মাছ ধরা নিষিদ্ধ। আপনার বিরুদ্ধে

আমাকে আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। হা ভগবন্! কেন আমাকে এ বিড়ম্বনায় ফেলিলে!"

করমেনো বলিলেন, "আমি ত ইচ্ছাপূর্ব্বক 'চার' মাছ ধরিতে আসি নাই! চারে যদি মাছটা আসিয়া থাকে, সে দোষ কি আমার? প্রথমতঃ দেখ, 'চার' মাছ ধরিতে হইলে বোলতা অথবা অন্য কোনও পতঙ্গের টোপের প্রয়োজন। আমি কিন্তু পাঁউরুটীর টোপ ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক, এখন তুমি যদি বল, আমি মাছটা জলে ছাড়িয়া দিতেছি।"

প্রহরী বলিল, "তাহাতে মাছ বাঁচিবে না। ক্ষতস্থল হইতে রক্তস্রাব হইয়া স্রোতের জলকে দূষিত করিয়া তুলিবে। আইনে তাহাও নিষিদ্ধ। হা ভগবন্! এ বড়ই বিপদ দেখিতেছি!"

সিপাহীর বাক্যে ও ব্যবহারে সহানুভূতি ও করুণাই প্রকাশ পাইতেছিল। করমেনোর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন।

প্রহরী হাত নাড়িয়া বলিল, "না, মঁসিয়ে টাকা আমি লইব না।" তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের লেশমাত্র ছিল না। "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। প্রচলিত আইন-লঙ্ঘনের অপরাধে আমি আপনার নামে নালিশ রুজু করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা যে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। আমি সব ঠিক করিয়া লইব। আমরা তো পশু নই, মানুষ। আমি উপরিওয়ালার নিকট আসল ঘটনার উল্লেখ করিব। তবে দুঃখ এই, একটা 'চার' মাছের জন্য আপনার সব মাছই হাতছাড়া হইবে। বড়ই পরিতাপের কথা।"

করমেনো সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি রকম? মাছগুলি হাতছাড়া হইবে কেন?"

"হাঁ মহাশয়, মাছগুলি আমি লইয়া যাইব—সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। দয়াময় ভগবন! কেন আমায় এমন বিপাকে ফেলিলে! বড়ই পরিতাপের বিষয়!"

মঁসিয়ে করমেনোর সন্দেহ হইল, এরূপ ভাবে পুলিস-প্রহরীর মাছ বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার আছে কি না। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিলেন না। মনে ভাবিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে, কোনও আপত্তি না করিয়া তিনি যদি মাছ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে এই ভদ্র প্রহরীর মন আরও করুণার্দ্র হইবে।

মৃদু-হাস্যে তিনি বলিলেন, "আমার মাছ ধরিবার সাজসরঞ্জামগুলিও বাজেয়াপ্ত করিবে না ত?"

"না, না। তা করিব কেন? আমি তু আর তুর্কী নই। মাছ ছাড়া অন্ত সমস্তই আপনি লইয়া যাইতে পারেন।"

করমেনো উত্থিতপ্রায় দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। চারের মসলা, টোপ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিল, "আপনার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি দেখিলে সত্যই মনে হয়, আপনি প্রকৃতই এক জন শিকারী। হাঁ মহাশয়, ঐ চারটি কি কি জিনিসে তৈয়ার করিয়াছেন, বলুন ত?"

প্রশংসা-বাক্যে স্ফীত হইয়া করমেনো সগর্ব্বে বলিলেন, "জিনিসটা পুরাতন। সকলেই এ চার তৈয়ার করিতে জানে, তবে জিনিসটা খুব ভালো। কুমারের পোড়া মাটী, বালি, গাছের শুকনো ছাল, রসুন ও বার্লি, সামান্ত পরিমাণ মদে মিশাইয়া তৈয়ার কারিয়াছি। গন্ধটি চমৎকার, মন মুগ্ধ হয়।"

প্রহরী বলিল, "মাছেরা এই চার বড় ভালবাসে; বোধ হয়, ইহার গন্ধে তাহারা মাতাল হইয়া উঠে।"

"কে বলিল মাতাল হয়? আহাম্মুখ যে, সেও জানে, ইহাতে মত্ততা জন্মিতে পারে না।"

প্রশান্ত-ভাবে, বিনয়-নম্র-স্বরে প্রহরী বলিল, "ঠিক কথা, ঠিক কথা। আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি। মঁসিয়ে, কিছু মনে করিবেন না; আমরা সরকারী চাকর; কর্ত্তব্য আমাদের পালন করিতেই হয়।"

করমেনো ঈষৎকুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "পাহারাওয়ালা সাহেব! ঘটনাটা কি বেশী দূর গড়াইবে?"

"আপনার কোনও চিন্তা নাই। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। বিবেক, ন্যায়বুদ্ধি আপনার বেশ আছে, কেমন নয়?"

সত্যই করমেনোর বিবেক ছিল। পুলিস-প্রহরীর ভদ্রব্যবহারে তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার মনে অন্ত কোনও চিন্তাই স্থান পায় নাই। করমেনো ভাবিতেছিলেন, মাছটি গেল! এমন সুন্দর মাছ, ভোগে লাগিল না!

কয়েক দিবস পরে সহসা করমেনোর নামে একখানি 'শমন' আসিয়া উপস্থিত হইল। জল-পুলিসের প্রবর্ত্তিত বিধান লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ মৎস্য-শিকার, পুলিস-প্রহরীর অপমান, তাহাকে উৎকোচ-দানের চেষ্টা, এবং

সরকারী কার্য্যে পুলিস-প্রহরীকে বাধা দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের জন্য তাঁহাকে স্যান্‌টিস্ নগরের আদালতে হাজির হইতে হইবে। করমেনো 'সমন' পাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

পুলিস-প্রহরীর কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে তিনি বলিলেন, "কি আহাম্মুখ!"

যাহা হউক, তখনও তাঁহার মনে আশা ছিল যে, এই ব্যাপারের মধ্যে কোথাও গুরুতর ভ্রম হইয়াছে। মোকদ্দমার শুনানির দিবস সত্য ঘটনা নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে। তাহা হইলে সকলে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু 'সমনে' এতগুলি মিথ্যা কথা লিখিত হইল কেন? বিশেষণগুলি অযথা প্রযুক্ত হইয়াছে। অপরাধটা নিশ্চয়ই যথাযোগ্যভাবে আরোপিত হয় নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালতে পঁহুছিয়া পূর্ব্বোক্ত পুলিস প্রহরীকে দেখিয়া তাঁহার মনে সাহস জন্মিল। সে তখন পুলিশের পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল।

তাহার ব্যবহার পূর্ব্ববৎ ভদ্র ও বিনয়-নম্র।

করমেনোকে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! ব্যাপারটা এত দূর গড়াইবে, তাহা আমি ভাবি নাই! প্রথমতঃ আমার বিশ্বাসই হয় নাই। আপনি দেখিবেন, উকীল ব্যারিষ্টারগণকে শেষে অনুতাপ করিতে হইবে। আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। আপনার কোনও চিন্তা নাই।"

করমেনোর চঞ্চল হৃদয় এই আশ্বাসে অনেকটা শান্ত হইল। তাঁহার মোকদ্দমার ডাক হইলে তিনি ভাবিলেন, এইবার প্রহরী নিশ্চয়ই সত্য কথা প্রকাশ করিবে, আর তাঁহার চিন্তা নাই। প্রহরী সত্যই স্বচ্ছন্দ-ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল,—

"গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে আমি আসামীকে 'চোর' বলিতে শুনিয়া অভিযুক্ত করি।"

করমেনো চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাঃ! আমিই তো উঁহাকে মাছের নাম বলিয়া দিয়াছিলাম! সে ত মাছ চিনিতেই পারে নাই! উঃ! আমি কি নির্ব্বোধ!"

প্রহরী বলিয়া চলিল,—"আমি যখন আসামীকে বলিলাম, এ সময়ে 'চোর'

মৎস্য আইনানুসারে ধরা নিষিদ্ধ, তখন তিনি বলিলেন, ব্রেসেল নদীতে এ মাছ দুষ্প্রাপ্য। শুভাদৃষ্টবশতঃ তিনি মাছটি পাইয়াছেন। অন্যায় কর্ম করিয়াও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ জন্মে নাই। আমি তাঁহাকে আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের অপরাধে অভিযুক্ত করিলে তিনি উৎকোচস্বরূপ আমাকে দুইটি টাকা দিতে চাহিলেন। আমি টাকা লইতে অস্বীকার করিলাম। ভদ্রলোক তখন 'চার' ও টোপ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আসামী বলিলেন যে, চারে মত্ততাজনক দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম। ভদ্রলোক সে জন্য অনুতাপ করা দূরে থাকুক, আমাকে 'মূঢ়, আহাম্মুখ' বলিয়া গালি দিলেন। তখন আমি পুলিসের পোষাকে ছিলাম।"

করমেনো চীৎকার করিয়া বলিলেন, "উঃ কি বদ্ —"

পাছে মোকদ্দমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়, এই আশঙ্কায় করমেনোর উকীল ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন।

বিচারক করমেনোর তিন শত টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। এই তাঁহার প্রথম অপরাধ, এবং তাঁহার নৈতিক চরিত্র বরাবরই ভালো বলিয়া এ যাত্রা তাঁহার প্রতি লঘুদণ্ডের আদেশ হইল। পাছে মক্কেল ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মকদ্দমার অবস্থা খারাপ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় উকীল তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

করমেনো সত্যই তখন পুলিস-প্রহরীর দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অঙ্গভঙ্গী সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। অতি সকরুণ-নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া প্রহরী বিনীতভাবে বলিল, "বড়ই দুঃখিতাপের কথা! উহারা আপনাকে এরূপ ভাবে অপমানিত করিয়া ভালো করে নাই। যাহা হউক, কারাধ্যক্ষের সহিত আমরা বেশ আলাপ আছে! যদি আপনি বলেন—"

করমেনো মুখ ফিরাইয়া লইলেন। *

---

* পীয়ের মিলির রচিত ফরাসী-গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।